তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গণদেবতা



পঞ্চগ্রাম

বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ্ম উপন্যাস

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গণদেবতা

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত)

পঞ্চগ্রাম

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ্মউপন্যাস

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম (একত্র) সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮০

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম: তিরিশ টাকা

গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম প্রসঙ্গে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

('আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

আমার শ্রদ্ধাভাজন গুরুতুল্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মশায় একদিন বাসায় এসে 'ভারতবর্ষে'র জন্য উপন্যাস লিখতে বললেন। সামনের পৌষ থেকেই উপন্যাস দিতে হবে। বোধ করি, বছরে দু শো হিসেবে পারিশ্রমিকের কথা বললেন। এর আগে দেড় বছরে উপন্যাস শেষ ক'রে মোটমাট এক শো পঁচাত্তর টাকা পেয়েছি। কাজেই হতাশা কাটিয়ে ভরসা পেলাম এবং শক্ত হয়ে ব'সে ফাইবারের স্যুটকেসটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে লিখতে ব'সে গেলাম। পত্তন করলাম 'গণদেবতা'র। 'গণদেবতা' এক কিস্তি বের হতেই কাত্যায়নী বুকস্টলের গিরীনবাবু এসে কিছু টাকা দিয়ে চুক্তি ক'রে গেলেন। 'গণদেবতা' যখন লিখতে শুরু করি তখনই মনে পরিকল্পনা ছিল, বইখানির নাম হবে 'গণদেবতা', তার দুটি ভাগ থাকবে—প্রথম ভাগ "চণ্ডীমণ্ডপ", দ্বিতীয় ভাগ হবে "পঞ্চগ্রাম"। 'চণ্ডীমণ্ডপ' প্রেসে দেবার সময় মনে হ'ল, যা বলতে চেয়েছিলাম, তা ঠিক বলা হয় নি। মাসে মাসে কিস্তি-বন্দিতে লিখতে গিয়ে গ্রন্থন শিথিল হয়েছে, গল্প এলোমেলো হয়েছে; বক্তব্য স্পষ্ট হয় নি। তখন পাঁচ ফর্মা—আশি পৃষ্ঠা ছাপা হয়ে গেছে। আমি প্রকাশক গিরীনবাবুকে বললাম, বাকি কপি প্রেস থেকে ফিরিয়ে আনুন। ও ছাপা হবে না।

শঙ্কিত হয়ে গিরীনবাবু বললেন, তা হ'লে?

বললাম, বাকি আমি নতুন ক'রে লিখব। আপনি ভয় করবেন না। আপনার প্রেসের কাজ বন্ধ হবে না। আমি ঠিক চালিয়ে দেব।

বসলাম লিখতে। তখন শরীরে ছিল বল, মনে ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। লিখে যেতে লাগলাম। গিরীনবাবু রোজ আসতেন দশটার আগে, কপি তৈরি থাকত, নিয়ে যেতেন।

এই সময়েই 'কবি'। পুস্তকাকারে বের হ'ল।

তখন হাতের জোর ছিল অসাধারণ। অন্তত দিনে এক ফর্মা দেড় ফর্মা অনায়াসে লিখে যেতে পারতাম। 'গণদেবতা'র ভাবনা কল্পনা সব কিছু সুসম্পন্ন আয়োজনের মত মনের মধ্যে থরে থরে সাজানো ছিল। সে দিক দিয়েও 'গণদেবতা' রচনার গতি মুহূর্তের জন্য ব্যাহত হয় নি। সেবার পূজোর গল্প, মাসিক কিস্তি এবং 'গণদেবতা' এই নিয়ে আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের কয়েক দিন মাস আড়াই সময়ের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ফর্মারও বেশি লিখেছিলাম। 'গণদেবতা' বের হয়েছিল ষষ্ঠীর দিন রাত্রে। কপি শেষ করেছিলাম চতুর্থীর সন্ধ্যায়। বিকেলবেলাতেই শেষ করেছিলাম। শেষ ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম ; হঠাৎ পথ থেকে আবার ফিরে এসেছিলাম ; আবার মনে নতুন কল্পনা গুঞ্জন ক'রে উঠেছে। এসেই আবার ব'সে নতুন ক'রে লিখেছিলাম। এমন কত দিন হয়েছে। একদিনের কথা মনে পড়ছে। 'গণদেবতা'র নায়ক দেবুর স্ত্রী-পুত্র একসঙ্গে মারা গেলে দেবুর মনের অবস্থার কথা লিখতে লিখতে বেরিয়ে গিয়েছি। পথে মনের মধ্যে লেখা জুগিয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে আবৃত্তি করতে করতে বাড়ি ফিরে আবার লিখতে বসেছি।

"সুখ নাই, দুঃখ নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সুখ ফুরাইয়াছে, দুঃখ ফুরাইয়াছে, হাসি হারাইয়াছে, কান্না শুকাইয়াছে, জীবনের সকল কথার শেষ হইয়াছে ; সারা পৃথিবীর সকল রঙ মুছিয়া গিয়াছে ; সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; কেহ নাই, কিছু নাই,—মন অসাড়, দৃষ্টি শূন্য।"

এ কয় লাইন আজও মনে রয়েছে। সে এক অদ্ভুত মগ্নতা! 'গণদেবতা'র শেষে লিখেছিলাম, "দেবু আকাশের দিকে চাহিয়া আত্মহারার মত হাত বাড়াইল, সমস্ত অন্তর পূর্ণ করিয়া সে নীরবে ডাকিল, ভগবান!...একটা দূরাগত ঢাকের শব্দ কানে আসিয়া ঢুকিল, দেবু সচেতন হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। মহাগ্রামের ঢাকের শব্দ, ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রা। ঠাকুর বোধ হয় রথে চড়িলেন। রথ হয়তো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের পথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।"

লেখা শেষ ক'রে কেঁদেছিলাম। ওই কটি লাইনের মধ্যে সে দিন ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের আহ্বানধ্বনি আমার অন্তরকে যে ভাবে বিচলিত করেছিল, সেই ভাবটুকু ফুটে রয়েছে। সেদিন আমিও ওই ভাবে হাত বাড়িয়ে ভগবানকে মনে মনে ডেকেছিলাম।

বই বের হয়েছিল ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়, সে কথা আগেই বলেছি। রাত্রি নটার

সময় গিরীনবাবু কয়েকখানি বই দিয়ে গেলেন। প্রথমে বইখানি দিয়েছিলাম ডাঃ পশুপতি ভটচাজকে। সবচেয়ে কাছে তিনিই থাকতেন। দ্বিতীয়খানা দিয়েছিলাম সুবলকে। সে রাত্রে এসেছিল। সপ্তমীর সকালে উঠে রওনা হলাম লাভপুর। বাড়ির মেয়েছেলেরা তার আগেই চ'লে গেছেন। বই শেষ করবার জন্যে ছিলাম আমি এবং আমার বড় ছেলে। ১৯৪২ সনের সপ্তমীর প্রভাত। বঙ্গোপসাগরে তখন প্রবল তাণ্ডব। কলকাতার আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। এলোমেলো বাতাস, রিমিঝিমি বৃষ্টি। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ তখনও কল্পনার বাইরে। তবু যেন কেমন মনে হয়েছিল আমার। এককালে বছর চার পাঁচ প্রায় চাষীর মতই চাষে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। হালের মুঠো ধরতে আপত্তি ছিল না কিন্তু ধরব বললেই ধরা যায় না, তাতে শরীরের বিশেষ শক্তির দরকার করে—সে শক্তি ছিল না ব'লেই ধরি নি। নইলে অন্য সব কাজই করেছি কৃষাণদের সঙ্গে। পাঁচটা বর্ষা মাথার উপর দিয়ে পার করেছি। বৃষ্টি নামলে ঘরে থাকি নি, মাঠেই ছুটেছি এবং দাঁড়িয়ে ভিজেছি। মেঘের চেহারা কিছু কিছু চিনি। মেঘ দেখে মনে হয়েছিল, এ যেন অচেনা মেঘ। তবে এর রকম-সকম যে ভাল নয়, এতে সন্দেহ ছিল না। একটা প্রবল বর্ষণ নামবে এবং ঝ'ড়ো হাওয়ায় ধানগুলি ভেঙে দিয়ে যাবে ; চাষীরা যাকে বলে 'কেতেন', (কার্তিক মাসের অতিবৃষ্টির নাম—'কেতেন', অনাবৃষ্টির নাম 'কেত্তেরো') তাই হবে ব'লে ভেবেছিলাম।

বোলপুরে ট্রেন যখন পৌছল, তখন বৃষ্টি হচ্ছে। সজনীকান্ত বোলপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার জন্যে। তিনি রেঙ্গুনের পতনের কাল থেকেই বোলপুরে একটা পাকা আড্ডা করেছিলেন। মেয়েছেলে সে সময় বেশির ভাগ বোলপুরেই থাকতেন। সেবার আমার আগেই তিনি বোলপুরে এসেছিলেন। আমি বলেছিলাম, সপ্তমীর দুপুরের ট্রেনের সময় নিশ্চয় যেন স্টেশনে থেকো। বই দিয়ে যাব। পূজোর মধ্যে প'ড়ে শেষ ক'রে বিজয়ায় লাভপুর এসে জানাতে হবে, কেমন হয়েছে।

বাড়ি পৌছলাম একটার সময়। সেখানকার আকাশেও তখনও মেঘ পেঁজা তুলোর মত ফুলে ফুলে উঠেছে। ঝড় প্রলয়ের ভূমিকা রচনা করছে ; এলোমেলো ঝাপটার মধ্যে তাণ্ডব নৃত্যের প্রাথমিক পদপাতের ছন্দ ফুটে উঠেছে, আমরা ধরতে পারছি না। ওদিকে সপ্তমীর পূজাশেষে তখন ভোগের পর আরতি হচ্ছে। ঝড় এল শেষ রাত্রে, তার সঙ্গে বর্ষণ। সকালে অষ্টমী পূজার আয়োজন সব ভেসে যাবে ব'লে মনে হ'ল। বাড়ির পিছনে খিড়কির পুকুরপাড়ে তালগাছ উপড়ে পড়ল ; শ্রীপতিবাবুর মাটির ঘর ধসে গেল ; রাস্তার

ওপর এক কোমর জল ব'য়ে চলেছে। কলকাতায় সাইক্লোন প্রবল হয়েছিল সপ্তমীর সন্ধ্যায়; আমাদের ওখানে প্রবল হ'ল সপ্তমীর শেষরাত্রে অষ্টমীর প্রভাতে; সারাদিনের শেষে অষ্টমীর প্রায় এক প্রহর রাত্রে ঝড়ের বেগ কমল।

এ প্রলয়ের পর বিজয়ার দিন আর সজনীর আসা ঘ'টে ওঠে নি। তবে বিজয়ার পরের দিন চিঠি পেয়েছিলাম। সে চিঠি নেই, হারিয়ে গেছে। সে পত্রে অনেক কিছু ছিল—সে দিনের বাংলা-সাহিত্যের অবস্থা, নতুন সম্ভাবনা, তাঁর প্রত্যাশা ইত্যাদি অনেক কথা। 'গণদেবতা' সম্পর্কে আলোচনা সে সময় অনেক হয়েছে। পরেও হয়েছে। 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' সম্বন্ধে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছি—বাংলার সর্বজনমান্য বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছ থেকে। সে ঘটনা ১৯৪৭ সনের ঘটনা। ডাঃ যাদুগোপাল সে সময় সুদীর্ঘকাল পরে বাংলা দেশে ফিরেছেন; দেশ স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত। বাংলা দেশে মন্ত্রীসভা গঠনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। দিল্লী থেকে আচার্য কৃপালিনী এসেছেন। রাঁচি থেকে এসেছেন ডাঃ যাদুগোপাল—বাংলার বিপ্লবীদলের অবিসম্বাদী নেতা বললে বোধ করি কেউ ঝগড়া করবেন না। যুগান্তরদলের শ্রীযুত সুরেন্দ্র ঘোষ (মধুবাবু) প্রভৃতি তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে তাঁকে দেখতে গেলাম! স্থানটি মনে নেই; খুব সম্ভব আরামবাগ সংহতির কোন আড্ডায় এসেছিলেন সন্ধ্যের পর। পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি বলেছিলেন, 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম' প'ড়ে আমার চমক লেগেছিল। বিপ্লবের গোড়াটা নির্ভুল ধরেছ তুমি—নির্ভুল।

বেশি কথার মানুষ তিনি নন। ওই কটি কথাই আমার 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রামে'র শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

'পঞ্চগ্রামে'র মধ্যে আমার ধ্যান-কল্পনা সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। 'পঞ্চগ্রামে'র শেষে আছে—

"মানুষ বাঁচিতে চায়। মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেই দিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। নিজের দুঃখের মধ্যে জীবন শেষ করিয়াও সযত্নে রাখিয়া চলিয়াছে, পালন করিয়া চলিয়াছে আপন বংশপরম্পরাকে।...সে যাহা বুঝিয়াছে বলিয়া যাইবে। বলিবে, তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না।...মুক্তি আসিবে। সেদিন মানুষের যাহা সত্যকারের পাওনা, তাহা তোমরা পাইবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য আরোগ্য অভয় এ মানুষের পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি

তাহা শোন, আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও অপেক্ষা ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবারও অধিকার কাহারও নাই।"

শেষে নায়ক দেবু, ভারতের চিরন্তন কল্পনার কাল সত্যযুগকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। "সত্যযুগের আমন্ত্রণ। নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেভরা ধর্মের সংসার।…পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার; সত্যের সংসার; ধর্মের সংসার; সুখের সংসার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই; অন্নবস্ত্র ঔষধপথ্য আরোগ্য স্বাস্থ্য শক্তি সাহস অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না। শোষণ থাকিবে না।… মানুষ বলশালী, পরিপুষ্ট সরলদেহ, আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর দুয়ার পথঘাট। ঝকঝকে বাড়ি…সুসমান সুগঠিত পথ।"

ন্যায় ধর্ম সত্যের পর আমি সুখের কথা বলেছি। 'পঞ্চগ্রামে'র ন্যায়রত্ন নায়ক নন, কিন্তু ওই চরিত্রটিই বিরাটতম চরিত্র। মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পরমৈশ্বর্য যদি যুক্ত করতে পারতেন এই পণ্ডিতেরা, রাজনৈতিক দার্শনিকেরা, তবে পৃথিবীর জীবনদর্শনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোজিত হ'ত। রাশিয়াকে বুঝি, চীনকে বুঝি। তাদের দেশের রক্তাক্ত বিপ্লবকে বুঝি, জানি, সেখানে এ অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই আমার। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাশ্চাত্ত্যমতের পণ্ডিতদের মত আমি বুঝি না, কিন্তু ভারতীয় মতে বুঝি। ভারতবর্ষের কুরুক্ষেত্র আমার চোখের সামনে। গীতার "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—এই বাণী আমার কানের পাশে বাজে। সুতরাং তাঁদের দর্শন অনুযায়ী তাঁরা যে শ্রেণীকে দুষ্কৃতিকারী মনে করেন, সেই শ্রেণীকে যদি ধ্বংস করতে চান বা ক'রে থাকেন, তবে তাঁদের দর্শন অনুযায়ী ভ্রান্ত বা অত্যাচারী বলব না। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা কুরুক্ষেত্রেই ও-পর্যায় অতিক্রম করেছি। আমাদের মানস-চৈতন্য ও-স্তর থেকে নূতন স্তরে উপনীত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগে। গীতার ওই "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"-বাণীর পর পরবর্তী অবতার অস্ত্রের পরিবর্তে ভিক্ষাপাত্র হাতে আবির্ভূত হয়ে বলেছেন, "মা হিংসী।" পাপীকে উচ্ছেদ ক'রে পাপকে উচ্ছেদ করা যায় না। পাপকে

বিগলিত করতে হবে। Elemination নয় sublimation। আড়াই হাজার বছর ধ'রে এই সাধনা চলেছে ভারতবর্ষে। বিংশ শতাব্দীতে মহাত্মাজী জীবন দিয়ে প্রমাণ ক'রে গেলেন ভারতের এই সাধনার অব্যাহত প্রবহমানতা। ভারতীয় দৃষ্টিতে এই ভারতের ইতিহাসের উপলব্ধি। পাশ্চাত্যমতে ইতিহাস-ব্যাখ্যাতা আমাকে ভ্রান্ত, এমন কি অজ্ঞও বলতে পারেন, বলুন।

এক

কারণ সামান্যই। সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। এখানকার কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার ও ছুতার গিরিশ সূত্রধর নদীর ওপারে বাজারে-শহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকান ফাঁদিয়াছে। খুব ভোরে উঠিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটায়; ফলে গ্রামের লোকের অসুবিধার আর শেষ নাই। এবার চাষের সময় কি নাকালটাই যে তাদের হইতে হইয়াছে, সে তাহারাই জানে। লাঙলের ফাল পাঁজানো, গাড়ীর হাল বাঁধার জন্য চাষীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। গিরিশ ছুতারের বাড়ীতে গ্রামের লোকের বাবলা কাঠের গুঁড়ি আজও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে সেই গত বৎসরের ফাল্গুন-চৈত্র হইতে; কিন্তু আজও তাহারা নূতন লাঙল পাইল না।

এই ব্যাপার লইয়া অনিরুদ্ধ এবং গিরিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সীমা ছিল না। কিন্তু চাষের সময় ইহা লইয়া একটা জটলা করিবার সময় কাহারও হয় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কার্যোদ্ধার করা হইয়াছে; রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অনিরুদ্ধর বাড়ীর দরজায় বসিয়া থাকিয়া, তাহাকে আটক করিয়া লোকে আপন আপন কাজ সারিয়া লইয়াছে; জরুরী দরকার থাকিলে, ফাল লইয়া গাড়ীর চাকা ও হাল গড়াইয়া গড়াইয়া সেই শহরের বাজার পর্যন্তও লোক ছুটিয়াছে। দূরত্ব প্রায় চার মাইল—কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীটাই একা বিশ ক্রোশের সমান। বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়া ঘাটেই পারাপারে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া যায়। শুক্‌নার সময়ে যাওয়া-আসায় আট মাইল বালি ঠেলিয়া গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। একটু ঘুর-পথে নদীর উপর রেলওয়ে ব্রীজ আছে; কিন্তু লাইনের পাশের রাস্তাটা এমন উঁচু ও অল্পপরিসর যে গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এখন চাষ শেষ হইয়া আসিল। মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—এখন কাস্তে চাই। কামার চিরকাল লোহা-ইস্পাত লইয়া কাস্তে গড়িয়া দেয়—পুরানো কাস্তেতে শান লাগাইয়া পুরি কাটিয়া দেয়; ছুতার বাঁট লাগাইয়া দেয়। কিন্তু কামার-ছুতার সেই একই চালে চলিয়াছে; যে অনিরুদ্ধের হাত পার হইয়াছে, সে গিরিশের হাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রামের লোক এক হইয়া পঞ্চায়েত-মজলিস ডাকিয়া বসিল। কেবল একখানা গ্রাম নয়, পাশাপাশি দুখানা গ্রামের লোক একত্র হইয়া গিরিশ ও অনিরুদ্ধকে একটি নির্দিষ্ট দিন জানাইয়া

ডাকিয়া পাঠাইল। গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। মন্দিরে ময়ূরেশ্বর শিব, পাশেই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামদেবী মা ভাঙা-কালীর বেদী। কালী-ঘর যতবার তৈয়ারী হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙা-কালী। চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের এবং এক কোণ ভাঙা হইয়া আছে; মধ্যে নাটমন্দির। তার চাল কাঠামো হাতীশুঁড়-ষড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়া যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নীচের মেঝেও সনাতন পদ্ধতিতে মাটির। এই চণ্ডীমণ্ডপের এই নাটমন্দিরে বা আটচালায় শতরঞ্জি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।

গিরিশ, অনিরুদ্ধ এ ডাকে না আসিয়া পারিল না। যথা সময়ে তাহারা দুজনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মজলিসে দুইখানা গ্রামের মাতব্বর লোক একত্র হইয়াছিল; হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল—ইহারা সব ভারিক্কী লোক, গ্রামের মাতব্বর সদ্‌গোপ চাষী। পাশের গ্রামের দ্বারকা চৌধুরীও উপস্থিত হইয়াছে। চৌধুরী বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি, এ অঞ্চলে বিশেষ মাননীয় জন। আচার ব্যবহার বিচারবুদ্ধির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। লোকে এখনও বলে—কেমন বংশ দেখতে হবে! এই চৌধুরীর পূর্ব পুরুষেরাই এককালে এই দুইখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন; এখন ইনি অবশ্য সম্পন্ন চাষীরূপেই গণ্য কারণ জমিদারী অন্য লোকের হাতে গিয়াছে। আর ছিল দোকানী বৃন্দাবন দত্ত—সেও মাতব্বর লোক। মধ্যবিত্ত অবস্থার অল্পবয়স্ক চাষী গোপেন পাল, রাখাল মণ্ডল, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতিও ছিল। এ-গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষাল—ও গ্রামের নিশি মুখুজ্জে, পিয়ারী বাঁড়ুজ্জে—ইহারাও একদিকে বসিয়াছিল।

আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল; সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল। ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী যাহারা, ছিরু ধন-সম্পদে তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয়—এই কথাই লোকে অনুমান করে। লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না। এজন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে, লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সেও সকলের উপর মনে মনে রুষ্ট। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে আসিয়া সে জাঁকিয়া বসে।

আর একটি সবল দেহ দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ যুবা নিতান্ত নিস্পৃহের মত এক পাশের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দেবনাথ ঘোষ—এই গ্রামেরই সদ্‌গোপ চাষীর ছেলে। দেবনাথ নিজ হাতে চাষ করে না, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত সে। এ মজলিসে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও সে আসিয়াছে ; অনিরুদ্ধের যে অন্যায় সে অন্যায়ের মূল কোথায় সে জানে। ছিরু পালের মত ব্যক্তি যে মজলিসে মধ্যমণির মত জম্‌কাইয়া বসে, সে মজলিসে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই এই নিস্পৃহতা, নীরব অবজ্ঞার সহিত সে একপাশে থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসে নাই কেবল ও-গ্রামের কৃপণ মহাজন মৃত রাখহরি চক্রবর্তীর পোষ্যপুত্র হেলারাম চাটুজ্জে ও গ্রাম্য ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ। গ্রামের চৌকিদার ভূপাল লোহারও উপস্থিত ছিল। আশেপাশে ছেলেদের দল গোলমাল করিতেছিল, একেবারে একপ্রান্তে গ্রামের হরিজন চাষীরাও দাঁড়াইয়া দর্শক হিসাবে। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষী—অসুবিধার প্রায় বারো-আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকেই।

অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ আসিয়া মজলিসে বসিল। বেশভূষা অনেকটা পরিচ্ছন্ন এবং ফিটফাট—তাহার মধ্যে শহুরে ফ্যাশানের ছাপ সুস্পষ্ট ; দুজনেই সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল—মজলিসের অনতিদূরেই ফেলিয়া দিয়া মজলিসের মধ্যে আসিয়া বসিল।

অনিরুদ্ধ কথা আরম্ভ করিল ; বসিয়াই হাত দিয়া একবার মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—কই গো, কি বলছেন বলুন। আমরা খাটি-খুটি খাই ; আমাদের আজ এ বেলাটাই মাটি।

কথার ভঙ্গিমায় ও স্বরে সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল যেন ঝগড়া করিবার মতলবেই কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছে ; প্রবীণের দলের মধ্যে সকলেই একবার সশব্দে গলা ঝাড়িয়া লইল। অল্পবয়সীদের ভিতর হইতে যেন একটা আগুন দপ করিয়া উঠিল। ছিরু ওরফে শ্রীহরি বলিয়া উঠিল—মাটিই যদি মনে কর, তবে আসবারই বা কি দরকার ছিল ?

হরেন্দ্র ঘোষাল কথা বলিবার জন্য হাঁক-পাঁক করিতেছিল ; সে বলিল—তেমন মনে হলে এখনও উঠে যেতে পার তোমরা। কেউ ধরে নিয়েও আসে নাই, বেঁধেও রাখে নাই তোমাদিগে।

হরিশ মণ্ডল এবার বলিল—চুপ কর তোমরা। এখানে যখন ডাকা হয়েছে, তখন আসতেই হবে। তা তোমরা এসেছ, বেশ কথা—ভাল কথা, উত্তম কথা। তারপর এখন দু'পক্ষে কথাবার্তা হবে, আমাদের বলবার যা বলব—তোমাদের জবাব যা তোমরা দেবে ; তারপর তার বিচার হবে। এত তাড়াতাড়ি করলে

হবে কেন? ঘোড়া ছুটো বাঁধো।

গিরিশ বলিল—তা হলে, কথা আপনাদের আমাদিগে নিয়েই?

অনিরুদ্ধ বলিল—তা আমরা আঁচ করেছিলাম। তা বেশ, কি কথা আপনাদের বলুন? আমাদের জবাব আমরা দোব। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন—আপনারা সবাই যখন একজোট হয়েছেন, তখন এ-কথার বিচার করবে কে? নালিশ যখন আপনাদের, তখন আপনারা বিচার কি করে করবেন—এ তো আমরা বুঝতে পারছি না।

দ্বারকা চৌধুরী অকস্মাৎ গলা ঝাড়িয়া শব্দ করিয়া উঠিল; চৌধুরীর কথা বলিবার এটি পূর্বাভাস। উচ্চ গলা-ঝাড়ার শব্দে সকলে চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। চৌধুরীর চেহারায় এবং ভঙ্গিমাতে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। গৌরবর্ণ রং, সাদা ধবধবে গোঁফ, আকৃতিতে দীর্ঘ। মানুষটি আসরের মধ্যে আপনাআপনি বিশিষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সে এবার মুখ খুলিল—দেখ কর্মকার, কিছু মনে কর না বাপু, আমি একটা কথা বলব। গোড়া থেকেই তোমাদের কথাবার্তার সুর শুনে মনে হচ্ছে যেন তোমরা বিবাদ করবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছ! এটা তো ভাল নয় বাবা। বস, স্থির হয়ে বস।

অনিরুদ্ধ এবার সবিনয়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—বেশ, বলুন কি বলছেন।

হরিশ মণ্ডলই আরম্ভ করিল—দেখ বাপু, খুলে বলতে গেলে মহাভারত বলতে হয়। সংক্ষেপেই বলছি—তোমরা দুজনে শহরে গিয়ে আপন আপন ব্যবসা করতে বসেছ। বেশ করেছ। যেখানে মানুষ ছুটো পয়সা পাবে সেখানেই যাবে। তা যাও। কিন্তু এখানকার পাট যে একেবারে তুলে দেবে, আর আমরা যে এই ছু'কোশ রাস্তা জিনিসপত্র ঘাড়ে করে নিয়ে ছুটব ওই নদী পার হয়ে, তা তো হবে না বাপু। এবার যে তোমরা আমাদের কি নাকাল করেছ সে কথাটা ভেবে দেখ দেখি মনে মনে।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, তা অসুবিধে এতটুকুন হয়েছে আপনাদের।

ছিরু বা শ্রীহরি গর্জিয়া উঠিল—একটুকুন! একটুকুন কি হে? জান, জমিতে জল থাকতে ফাল পাঁজানোর অভাবে চাষ বন্ধ রাখতে হয়েছে? তোমারও তো জমি আছে, জমির মাথায় একবার ঘুরে দেখে এস দেখি পট্‌পটির ঘাসের ধুমটা। ভাল ফালের অভাবে চাষের সময় একটা পট্‌পটিরও শেকড় ভাল উঠে নাই। বছর সাল তোমরা ধানের সময় ধানের জন্যে বস্তা হাতে করে এসে দাঁড়াবে, আর কাজের সময় তখন শহরে গিয়ে বসে থাকবে,—তা করলে হবে কেন?

হরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া উঠিল—এই ক—থা! এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতে একটা তালি বাজাইয়া দিয়া বসিল।

মজলিস-সুদ্ধ সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিল—এই।

প্রবীণেরাও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। অর্থাৎ এই।

অনিরুদ্ধ এবার খুব সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নড়িয়া-চড়িয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিল—এই তো আপনাদের কথা? আচ্ছা, এইবার আমাদের জবাব শুনুন। আপনাদের ফাল পাঁজিয়ে দিই, হাল লাগিয়ে দিই চাকায়, কাস্তে গড়ে দিই, আপনারা আমাকে ধান দেন হাল-পিছু কাঁচি পাঁচ শলি। আমাদের গিরিশ সূত্রধর—

বাধা দিয়া ছিরু পাল বলিল—গিরিশের কথায় তোমার কাজ কি হে বাপু?

কিন্তু ছিরু কথা শেষ করিতে পারিল না; দ্বারকা চৌধুরী বলিল—বাবা শ্রীহরি, অনিরুদ্ধ তো অন্যায় কিছু বলে নাই। ওদের দুজনের একই কথা। একজনা বললেও তো ক্ষতি নাই কিছু।

ছিরু চুপ করিয়া গেল। অনিরুদ্ধ ভরসা পাইয়া বলিল—চৌধুরী মশায় না থাকলে কি মজলিসের শোভা হয়,—উচিত কথা বলে কে?

—বল অনিরুদ্ধ কি বলছিলে, বল!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার, মানে কর্মকারের হাল-পিছু পাঁচ শলি, আর সূত্রধরের হাল-পিছু চার শলি ধান বরাদ্দ আছে। আমরা এতদিন কাজও করে আসছি, কিন্তু চৌধুরী মশাই. ধান আমরা ঠিক হিসেবমত প্রায়ই পাই না।

—পাও না?

—আজ্ঞে না।

গিরিশও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল—আজ্ঞে না। প্রায় ঘরেই দু-চার আড়ি করে বাকী রাখে, বলে, দু-দিন পরে দোব, কি আসছে বছর দোব। তারপর সে ধান আমরা পাই না।

ছিরু সাপের মত গর্জিয়া উঠিল—পাও না? কে দেয় নি শুনি? মুখে পাই না বললে তো হবে না। বল, কার কাছে পাবে তোমরা?

অনিরুদ্ধ দুরন্ত ক্রোধে বিদ্যুৎগতিতে ঘাড় ফিরাইয়া শ্রীহরির দিকে চাহিয়া বলিল—কার কাছে পাব? নাম করতে হবে? বেশ, বলছি।—তোমার কাছেই পাব।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ তোমার কাছে। দিয়েছ ধান তুমি দু'বছর? বল?

—আর আমি যে তোমার কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাব! তাতে ক'টাকা উশুল দিয়েছ শুনি? ধান দিই নাই···মজলিসের মধ্যে তুমি যে এত বড় কথাটা বলছ।

—কিন্তু তার তো একটা হিসেব-নিকেশ আছে? ধানের দামটা তোমার

হাণ্ডনোটের পিঠে উশুল দিতে তো হবে—না কি? বলুন চৌধুরী মশায়, মণ্ডল মশাইরাও তো রয়েছেন, বলুন না।

চৌধুরী বলল—শোন, চুপ কর একটু। শ্রীহরি, তুমি বাবা হাণ্ডনোটের পিঠে টাকাটা উশুল দিয়ে নিয়ো। আর অনিরুদ্ধ, তোমার একটা বাকীর ফর্দ তুলে হরিশ মণ্ডল মশায়কে দাও। এ নিয়ে মজলিসে গোল করাটা তো ভাল নয়। ওঁরাই সব আদায়-পত্র করে দেবেন। আর তোমরাও গাঁয়ে একটা করে পাট রাখ। যেমন কাজকর্ম করছিলে তেমনি কর।

মজলিস-সুদ্ধ সকলেই এ কথায় সায় দিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে-ভঙ্গিতেও সম্মতি বা অসম্মতির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

এতক্ষণে দেবনাথ মুখ খুলিল; প্রবাণ চৌধুরীর এ মীমাংসা তাহার ভাল লাগিয়াছে। অনিরুদ্ধ-গিরিশের পাওনা অনাদায়ের কথা সে জানিত বলিয়াই তাহার প্রথমে মনে হইয়াছিল—অনিরুদ্ধ এবং গিরিশের উপর মজলিস অবিচার করিতে বসিয়াছে। নতুবা গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার সে পক্ষপাতী। তাহার নিজের একটি নিয়ম শৃঙ্খলার ধারণা আছে। সে ধারণা অনুযায়ী আজ দেবু খুশী হইল; অনিরুদ্ধ ও গিরিশের এবার নত হওয়া উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বলিল—অনি ভাই, আর তো তোমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।

চৌধুরী প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ?

—আজ্ঞে!

—কি বলছ বল।

এবার হাত জোড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, আমাদিগে মাপ করুন আপনারা। আমরা আর এভাবে কাজ চালাতে পারছি না।

মজলিসে এবার অসন্তোষের কলরব উঠিয়া গেল।

—কেন?

—না পারবার কারণ?

—পারব না বললে হবে কেন?

—চালাকি নাকি?

—গাঁয়ে বাস কর না তুমি?

ইহার মধ্যে চৌধুরী নিজের দীর্ঘ হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিত প্রকাশ করিল—চুপ কর, থাম।

হরিশ বিরক্তিভরে বলিল—থাম্‌রে বাপু ছোঁড়ারা; আমরা এখনও মরি নাই।

হরেন্দ্র ঘোষাল অল্পবয়সী ছোকরা এবং ম্যাট্রিক পাস এবং ব্রাহ্মণ। সেই অধিকারে সে প্রচণ্ড একটা চীৎকার করিয়া উঠিল—এইও! সাইলেন্স—সাইলেন্স!

অবশেষে দ্বারকা চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার ফল হইল। চৌধুরী বলিল—চীৎকার করে গোলমাল বাধিয়ে তো ফল হবে না! বেশ তো, কর্মকার কেন পারবে না—বলুক। বলতে দাও ওকে।

সকলে এবার নীরব হইল। চৌধুরী আবার বসিয়া বলিল—কর্মকার, পারবে না বললে তো হবে না বাবা। কেন পারবে না, বল! তোমরা পুরুষানুক্রমে করে আসছ। আজ পারব না বললে গ্রামের ব্যবস্থাটা কি হবে?

দেবনাথ বলিল—অন্যায়। অনিরুদ্ধ ও গিরিশের এ মহা অন্যায়।

হরিশ বলিল—তোমার পূর্বপুরুষের বাস হল গিয়ে মহাগ্রামে; এ গ্রামে কামার ছিল না বলেই তোমার পিতামহকে এনে বাস করানো হয়েছিল। সে তো তুমিও শুনেছ হে বাপু। এখন না বললে চলবে কেন?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, মোড়ল জ্যাঠা, তা হলে শুনুন। চৌধুরী মশায় আপনি বিচার করুন। এ গাঁয়ে আগে কত হাল ছিল ভেবে দেখুন। কত ঘরে হাল উঠে গিয়েছে তাও দেখুন! এই ধরুন গদাই, শ্রীনিবাস, মহেন্দ্র—আমি হিসেব করে দেখেছি, আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কণার ভদ্রলোকদের ঘরে। কঙ্কণায় কামার আলাদা। আমাদের এগারোখানা হালের ধান কমে গিয়েছে। তারপর ধরুন—আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙ্গলের—গাড়ীর, অন্য সময়ে গাঁয়ের ঘর-দোর হত। আমরা পেরেক গজাল হাতা খুন্তি গড়ে দিতাম—বঁটি কোদাল কুড়ুল গড়তাম,—গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোকে সে সব কিনছেন বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—তাই কিনছেন। আমাদের গিরিশ গাড়ী গড়ত, দরজা তৈরী করত; ঘরের চালকাঠামো করতে গিরিশকেই লোকে ডাকত। এখন অন্য জায়গা থেকে সস্তায় মিস্ত্রী এনে কাজ হচ্ছে। তারপর—ধরুন—ধানের দর পাঁচ সিকে—দেড় টাকা, আর অন্য জিনিসপত্র আক্রা। এতে আমাদের এই নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকলে কি করে চলে, বলুন? ঘর-সংসার যখন করছি—তখন ঘরের লোকের মুখে তো দুটো দিতে হবে। তার ওপর ধরুন, আজকালকার হালচাল সে রকম নেই—

ছিরু এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে ফুসিতেছিল, সে সুযোগ পাইয়া বাধা দিয়া কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল—তা বটে, আজকাল বার্নিশ-করা জুতো চাই, লম্বা লম্বা জামা চাই, সিগারেট চাই—পরিবারের শেমিজ চাই, বডিস্ চাই—

—এই দেখ ছিরু মোড়ল, তুমি একটু হিসেব করে কথা বলবে। অনিরুদ্ধ এবার কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

ছিরু বারকতক হেলিয়া-দুলিয়া বলিয়া উঠিল, হিসেব আমার করাই আছে রে বাপ্। পঁচিশ টাকা ন আনা তিন পয়সা। আসল দশ টাকা, সুদ পনের টাকা ন আনা তিন পয়সা। তুই বরং কষে দেখতে পারিস। শুভঙ্করী জানিস তো?

হিসাবটা অনিরুদ্ধের নিকট পাওনা হ্যাণ্ডনোটের হিসাব। অনিরুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল—সমস্ত মজলিসের দিকে একবার সে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত মজলিসটাও এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অনিরুদ্ধ মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল।

ছিরু ধমক দিয়া উঠিল—যাবে কোথা তুমি?

অনিরুদ্ধ গ্রাহ্য করিল না, সে চলিয়া গেল।

চৌধুরী এতক্ষণে বলিল—শ্রীহরি।

ছিরু বলিল—আমাকে চোখ রাঙাবেন না চৌধুরী মশায়, দু-তিনবার আপনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন, আমি সহ্য করেছি। আর কিন্তু আমি সহ্য করব না।

চৌধুরী এবার চাদরখানি ঘাড়ে ফেলিয়া বাঁশের লাঠিটি লইয়া উঠিল; বলিল—চললাম গো তা হলে। ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম—আপনাদিগে নমস্কার।

এই সময়ে গ্রামের পাতুলাল মুচি জোড়হাত করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—চৌধুরী মহাশয়, আমার একটুকুন বিচার করে দিতে হবে।

চৌধুরী সন্তর্পণে মজলিস হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিয়া বলিল—বল বাবা, এরা সব রয়েছেন, বল!

—চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী এবার চাহিয়া দেখিল—অনিরুদ্ধ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

—একবার বসতে হবে চৌধুরী মশায়! ছিরু পালের টাকাটা আমি এনেছি—আপনারা থেকে কিন্তু আমার হ্যাণ্ডনোটটা ফেরতের ব্যবস্থা করে দিন।

মজলিস-সুদ্ধ লোক এতক্ষণে সচেতন হইয়া চৌধুরীকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু চৌধুরী কিছুতেই নিরস্ত হইল না, সবিনয়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অনিরুদ্ধ পঁচিশ টাকা দশ আনা মজলিসের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—এখনি হ্যাণ্ডনোটখানা নিয়ে এস ছিরু পাল!

পরে হ্যাণ্ডনোটখানি ফেরত লইয়া বলিল—ও একটা পয়সা আমাকে আর ফেরত দিতে হবে না। পান কিনে খেয়ো। এস হে গিরীশ, এস।

হরিশ বলিল—ওই, তোমরা চললে যে হে? যার জন্যে মজলিস বসল—

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আর ও কাজ করব না মশায়, জবাব দিলাম। যে মজলিস ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।

তাহারা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।

পরদিন প্রাতেই শোনা গেল, অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির আধ-পাকা ধান কে বা কাহারা নিঃশেষে কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছে।

দুই

অনিরুদ্ধ ফসলশূন্য ক্ষেত্রখানার আইলের উপর স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিল। নিষ্ফল আক্রোশে তাহার লোহা-পেটা হাত দু'খানা মুঠা বাঁধিয়া ডাইস-যন্ত্রের মত কঠোর করিয়া তুলিল। তাহার পর সে অত্যন্ত দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিয়া হাতকাটা জামাটা টানিয়া সেটার মধ্যে মাথা গলাইতে গলাইতে বাহির দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অনিরুদ্ধের স্ত্রীর নাম পদ্মমণি—দীর্ঘাঙ্গী পরিপূর্ণ-যৌবনা কালো মেয়েটি। টিকালো নাক, টানা-টানা ভাসা-ভাসা ডাগর দুটি চোখ। পদ্মের রূপ না থাক, শ্রী আছে। পদ্মের দেহে অদ্ভুত শক্তি, পরিশ্রম করে সে উদয়াস্ত। তেমনি তীক্ষ্ণ তাহার সাংসারিক বুদ্ধি। অনিরুদ্ধকে এইভাবে বাহির হইতে দেখিয়া সে স্বামী অপেক্ষাও দ্রুতপদে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—চললে কোথায়?

রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—ফিঙের মত পেছনে লাগলি কেন? যেখানেই যাই না, তোর সে খোঁজে কাজ কি?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—পেছনে লাগি নাই। তার জন্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর, খোঁজে আমার দরকার আছে বৈকি। মারামারি করতে যেতে পাবে না তুমি।

অনিরুদ্ধ বলিল—মারামারি করতে যাই নাই, থানা যাচ্ছি, পথ ছাড়!

—থানা? পদ্মর কণ্ঠস্বরের মধ্যে উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, থানা। শালা ছিরে চাষার নামে আমি ডাইরি করে আসব। রাগে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর রণ-রণ করিতেছিল।

পদ্ম স্থিরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। সত্যি হলেও ছিরু মোড়ল তোমার ধান চুরি করেছে—এ চাকলায় কে এ কথা বিশ্বাস করবে?

অনিরুদ্ধের কিন্তু তখন এ পরামর্শ শুনিবার মত অবস্থা নয়, সে ঠেলিয়া পদ্মকে সরাইয়া দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

অনিরুদ্ধের অনুমান অভ্রান্ত,—ধান শ্রীহরি পালই কাটিয়া লইয়াছে।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিয়াছে সে-ও নিষ্ঠুরভাবে সত্য, ধনীকে চোর প্রতিপন্ন করা বড় সহজ নয়। শ্রীহরি ধনী।

এ চাকলায় কাছাকাছি তিনখানা গ্রাম—কালীপুর, শিবপুর ও কঙ্কণা—এ তিনখানা গ্রামে ছিরু পাল বা শ্রীহরি পালের ধনের খ্যাতি যথেষ্ট। কালীপুর ও শিবপুর সরকারী সেরেস্তায় দু'খানা ভিন্ন গ্রাম হিসাবে জমিদারের অধীন স্বতন্ত্র মৌজা হইলেও কার্যত একখানাই গ্রাম। একটা দীঘির এপার-ওপার মাত্র। শ্রীহরির বাস এই কালীপুরে। এ দুখানা গ্রামের মধ্যে শ্রীহরির সমকক্ষ ব্যক্তি আর কেহ নাই। শিবপুরের হেলা চাটুজ্জেরও টাকা ও ধান যথেষ্ট ; তবে লোকে বলে—শ্রীহরির ঘরে সোনার ইট আছে, টাকা ধানও প্রচুর, তা হইলেও দুইজনের তুলনা হয় না। ক্রোশখানেক দূরবর্তী কঙ্কণা অবশ্য সমৃদ্ধ গ্রাম। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। সেখানকার মুখুজ্জেবাবুরা লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী,—এ অঞ্চলের প্রায় গ্রামই এখন তাহাদের কুক্ষিগত। মহাজন হইতে তাহারা প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার হইয়া উঠিয়াছে ; শিবপুর কালীপুর গ্রাম দুখানাও ধীরে ধীরে তাহাদের গ্রাসের আকর্ষণে সর্পিল জিহ্বার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেখানেও শ্রীহরি পালের নামডাক আছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে আধা শহর—রেলওয়ে জংশন ; সেখানে ধনী মারোয়াড়ীর গদী আছে—দশ-বারোটা চালের কল, গোটা কয়েক তেল কল, একটা আটার কল আছে—সেখানেও শ্রীহরি পালকে 'ঘোষ মশায়' বলিয়াই সম্বর্ধিত করা হয়। ওই জংশন-শহরেই এ অঞ্চলের থানা অবস্থিত।

সুতরাং পদ্মের অনুমানের ভিত্তি আছে। কঙ্কণায় অথবা জংশন-শহরে কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবে না ; কিন্তু শিবকালীপুরের কেহ এ কথা অবিশ্বাস করে না। ছিরু ভয়ঙ্কর ব্যক্তি—এ সংসারে তাহার অসাধ্য কিছু নাই। এ ধান কাটিয়া লওয়া তাহার অনিরুদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই নয়—চুরিও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কথাও শিবকালীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশ্বাস করে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস কাহারও নাই।

শ্রীহরির বিশাল দেহ—কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই। বাঁশের মত মোটা হাত-পায়ের হাড়—তাহাতে জড়ানো কঠিন মাংসপেশী। প্রকাণ্ড চওড়া দু'খানা হাতের পাঞ্জা, প্রকাণ্ড বড় মাথা, বড় বড় উগ্র চোখ, থ্যাবড়া নাক, আকর্ণবিস্তার মুখগহ্বর, তাহার উপর একমাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এত বড় দেহ লইয়া সে কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্রুত চলিতে পারে। পরের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সে রাতারাতি আনিয়া আপনার পুকুরে ফেলিয়া রাখে, শব্দ নিবারণের

জন্য সে হাত করাত দিয়া বাঁশ কাটে। খেপলা জাল ফেলিয়া রাত্রে সে পরের পুকুরের পোনামাছ আনিয়া নিজের পুকুর বোঝাই করে ; প্রতি বৎসর তাহার বাড়ির পাঁচিল সে নিজেই বর্ষার সময় কোদাল চালাইয়া ফেলিয়া দেয়, নতুন পাঁচিল দিবার সময় অপরের সীমানা অথবা রাস্তা খানিকটা চাপাইয়া লয়। কেহ বড় প্রতিবাদ করে না, কিন্তু ব্যক্তিগত সীমানা আত্মসাৎ করিলে প্রতিবাদ না করিয়া উপায় থাকে না। তখন ছিরু কোদাল হাতেই উঠিয়া দাঁড়ায় ; দন্তহীন মুখে কি বলে বুঝা যায় না। মনে হয় একটা পশু গর্জন করিতেছে। এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই সে দন্তহীন ; যৌনব্যাধির আক্রমণে তাহার দাঁতগুলো প্রায় সবই পড়িয়া গিয়াছে। হরিজন-পল্লীতে সন্ধ্যার পর যখন পুরুষেরা মদে বিভোর হইয়া থাকে, তখন ছিরু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিকার ধরিতে প্রবেশ করে। কতবার তাহারা উহাকে তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু ছিরু ছুটিয়া চলে অন্ধকারচারী হিংস্র চিতাবাঘের মত।

এই শ্রীহরি ঘোষ, ওরফে ছিরু পাল বা ছিরে মোড়ল !

শ্রীহরিকে ভাল করিয়া চিনিয়াও অনিরুদ্ধ স্ত্রীর কথা বিবেচনা করা দূরে থাক, তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। পদ্ম বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে রাগ অভিমান করিল না, আবার ডাকিল—ওগো, শোন—শোন, ফেরো।···তবু অনিরুদ্ধ ফিরিল না।

এবার একটু ক্ষীণ হাসিয়া পদ্ম ডাকিল—পেছন ডাকছি, যেও না, শোন !

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ লাঙ্গুলস্পৃষ্ট কেউটের মত সক্রোধে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একটু জল খেয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া পদ্মের গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ডাকবি আর পিছন থেকে ?

পদ্মের মাথাটা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া উঠিল, অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড় —নিদারুণ আঘাত। পদ্ম 'বাবা রে' বলিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ এবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও হইল। যেখানে-সেখানে চড় মারিলে নাকি মানুষ মরিয়া যায় ; সে ত্রস্ত হইয়া ডাকিল—পদ্ম ! পদ্ম ! বউ !

পদ্মের শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। অনিরুদ্ধ বলিল—এই নে বাপু, এই নে জামা খুললাম, থানায় যাব না। ওঠ্। কাঁদিস না, ও পদ্ম।···সে পদ্মের মুখ-ঢাকা হাতখানি ধরিয়া টানিল—ও পদ্ম !—

পদ্ম এবার মুখ হইতে হাত ছাড়িয়া দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ;

মুখ ঢাকা দিয়া পদ্ম কাঁদে নাই, নিঃশব্দে হাসিতেছিল। অদ্ভুত শক্তি পদ্মের ; আর অনিরুদ্ধের অনেক কিল চড় খাওয়া তাহার অভ্যাস আছে—এক চড়ে তাহার কি হইবে।

কিন্তু অনিরুদ্ধের পৌরুষে বোধ হয় ঘা লাগিল—সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। পদ্ম খানিকটা গুড় আর প্রকাণ্ড একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি ও টুক্‌নি-ঘটির এক ঘটি জল আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—তুমি ছিরু মোড়লকে স্থবে করে এজাহার করবে, গাঁয়ের লোক কে তোমার হয়ে সাক্ষী দেবে বল তো ? কাল থেকে তো গাঁয়ের লোক সবাই তোমার ওপর বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাল সন্ধ্যার পর আবার মজলিস বসিয়াছিল, অনিরুদ্ধের ওই 'মজলিসকে মানি না' কথাটা সকলকে বড় আঘাত দিয়েছে। সন্ধ্যার মজলিসে অনিরুদ্ধ এবং গিরিশের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে নালিশ জানানো স্থির হইয়া গিয়াছে।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে পড়িল, কিন্তু তবু তাহার মন মানিল না।

তিন

বেশ পরিপাটি করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ফিরাইয়া পদ্ম স্বামীর আহার-শেষের প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনিরুদ্ধের খাওয়া শেষ হইতেই হাতে জল তুলিয়া দিয়া হুঁকাটি তাহার হাতে দিয়া বলিল—খাও। অনিরুদ্ধ টানিয়া বেশ গল্ গল্ করিয়া নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়াছে, তখন পদ্ম বলিল—আমার কথাটা ভেবে দেখ। রাগ একটু পড়েছে তো ?

—রাগ ! অনিরুদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিল—ঠোঁট দুইটা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।—এ রাগ আমার তুষের আগুন, জনমে নিববে না। আমার দু'বিঘে বাকুড়ির ধান—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কারণ তাহার চোখের জলের ছোঁয়াচে পদ্মের ডাগর চোখ দুটিও অশ্রুজলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং অনিরুদ্ধের আগেই তাহার কোঁটা কয়েক জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ চোখ মুছিয়া বলিল—কাঁদছিলি কেন তুই ? দু'বিঘে জমির ধান গিয়েছে, যাকগে। আমি তো আছিরে বাপু ! আর দেখ না—কি করি আমি !

চোখ মুছিতে মুছিতে পদ্ম বলিল—কিন্তু থানা-পুলিশ কর না বাপু ! তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমি। ওরা সাপ হয়ে দংশায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে। আমার বাপের ঘরে ডাকাতি হল—বাবা চিনলে একজনকে কিন্তু পুলিশ তার গায়ে হাত দিল না। অথচ মুঠো-মুঠো টাকা খরচ হয়ে গেল বাবার। ছেলেমেয়ে গুষ্টি সমেত

নিয়ে টানাটানি ; একবার দারোগা আসে, একবার নেসপেকটার আসে, একবার সায়েব আসে—আর দাও এজাহার। তার পরে, ক'জনকে কোথা হতে ধরলে, তাদিগে সনাক্ত করতে জেলখানা পর্যন্ত মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি। তাছাড়া গালমন্দ আর ধমক ত আছেই।

—হুঁ। চিন্তিতভাবে হুঁকায় গোটা কয়েক টান দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কিন্তু এর একটা বিহিত করতে তো হবে। আজ না হয় দু-বিঘে জমির ধান গেল। কাল আবার পুকুরের মাছ ধরে নেবে—পরশু ঘরে—

বাধা পড়িল—আনি ভাই ঘরে রয়েছে নাকি ? অনিরুদ্ধের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাহির হইতে গিরিশ ডাকিয়া সাড়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম আধ-ঘোমটা টানিয়া, এঁটো বাসন কয়খানি তুলিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দু-বিঘে বাকুড়িয়া ধান একেবারে শেষ করে কেটে নিয়েছে, একটি শীষও পড়ে নাই।

গিরিশও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুনলাম।

—থানায় ডায়রি করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু বউ বারণ করছে। বলছে, ছিরু পাল চুরি করেছে—এ কথা বিশ্বাস করবে কেন ! আর গাঁয়ের লোকও আমার হয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না।

—হ্যাঁ ; কাল সন্ধ্যেতে আবার নাকি চণ্ডীমণ্ডপে জটলা হয়েছিল। আমরা নাকি অপমান করেছি গাঁয়ের লোকদের। জমিদারের কাছে নালিশ করবে শুনছি।

ঠোঁটের দিক বাঁকাইয়া অনিরুদ্ধ এবার বলিয়া উঠিল—যা যা ! জমিদার, জমিদার আমার কচু করবে।

কথাটা গিরিশের খুব মনঃপূত হইল না, সে বলিল—তাই বলারই বা আমাদের দরকার কি ? জমিদারেরও তো বিচার আছে, তিনি বিচার করুন না কেন !

অনিরুদ্ধ বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—উঁহু, ছাই বিচার করবে জমিদার। নিজেই আজ তিন বছর ধান দেয় নাই। জমিদার ঠিক ওদের রায়ে রায় দেবে ; তুমি জান না।

বিষণ্ণভাবে গিরিশ বলিল—আমিও পাই নাই চার বছর।

অনিরুদ্ধ বলিল—এই দেখ ভাই, যখন মুখ ফুটে বলেছি করব না তা তখন আমার মরা-বাবা এলেও আমাকে করাতে পারবে না ; তাতে আমার ভাগ্যে যাই থাক ! তুমি ভাই এখনও বুঝে দেখ।

গিরিশ বলিল—সে তুমি নিশ্চিন্দি থাক। তুমি না মিটোলে আমি মিটোব না।

অনিরুদ্ধ প্রীত হইয়া কল্কেটি তাহার হাতে দিল। গিরিশ হাতের ছাঁদের মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া কয়েক টান দিয়া বলিল—এদিকে গোলমালও তোমার চরম লেগে গিয়েছে। শুধু আমরা দু'জনা নই। জমিদার ক'জনার বিচার করবে, করুক না! নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ-আগলদার সবাই আমাদের ধূয়ো নিয়ে ধূয়ো ধরেছে—ওই অল্প ধান নিয়ে আমরা কাজ করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ীর দোরে অর্জুনতলায় খানকয়েক ইট পেতে বসেছে—বলে পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ কল্কেটি ঝাড়িয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—তাই বৈকি! পয়সা ফেল, মোওয়া খাও; আমি কি তোমার পর?

গিরিশের কথাবার্তার মধ্যে বেশ একটি বিজ্ঞতা-প্রচারের ভঙ্গি থাকে, ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; সে বলিল—এই কথা! আগেকার কাল তোমার এক আলাদা কথা ছিল। সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল—তখন ধান নিয়ে কাজ করে আমাদের পুষিয়েছে—আমরা করেছি; এখন যদি না পোষায়?

বাহিরে রাস্তায় ঠুন-ঠুন করিয়া বাইসাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—অনিরুদ্ধ!

ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ।

অনিরুদ্ধ ও গিরিশ দুজনেই বাহির হইয়া আসিল। মোটাসোটা খাটো লোকটি, মাথায় বাবরী চুল—জগন্নাথ ঘোষ বাইসাইকেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তার কোথাও পড়িয়া-শুনিয়া পাস করে নাই, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের তিন পুরুষের বংশগত বিদ্যা; পিতামহ ছিলেন কবিরাজ, বাপ জ্যেঠা ছিলেন কবিরাজ এবং ডাক্তার—একধারে দুই। জগন্নাথ কেবল ডাক্তার, তবে সঙ্গে দু-চারটি মুষ্টিযোগের ব্যবস্থাও দেয়—তাহাতে চট্ করিয়া ফলও হয় ভাল। গ্রামের সকল লোকই তাহাকে দেখায়, কিন্তু পয়সা বড় কেহ দেয় না। ডাক্তার তাহাতে খুব গররাজী নয়, ডাকিলেই যায়, বাকীর উপরে বাকীও দেয়। ভিন্ন গ্রামেও তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পসার আছে—সেখানকার রোজগারেই তাহার দিন চলে। কোন দিন শাক-ভাত, আর কোনদিন যাহাকে এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন, যেদিন যেমন রোজগার। এককালে ঘোষেরা সম্পত্তিশালী প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিল। ধনীর গ্রাম কঙ্কণায় পর্যন্ত যথেষ্ট সম্মান-মর্যাদা পাইত, কিন্তু ওই কঙ্কণার লক্ষপতি মুখুজ্জেদের এক হাজার টাকা ঋণ ক্রমে চারি হাজারে পরিণত হইয়া ঘোষেদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এই সম্পত্তি এবং সকলের

সম্মানিত প্রবীণগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই সম্মান-মর্যাদাও চলিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ অকাতরে চিকিৎসা এবং ঔষধ সাহায্য করিয়াও সে সম্মান আর ফিরিয়া পান নাই। তাহার জন্য তাহার ক্ষোভের অন্ত নাই। সেই ক্ষোভে কাহাকেও রেয়াত করে না, রূঢ়তম ভাষায় সে উচ্চকণ্ঠে বলে—'চোরের দল সব, জানোয়ার।' গোপনে নয়, সাক্ষাতেই বলে। ধনী দরিদ্র যেই হোক প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম অন্যায়েরও অতি কঠিন প্রতিবাদ সে করিয়া থাকে। তবে স্বাভাবিক ভাবে ধনীদের ওপর ক্রোধ তাহার বেশী।

অনিরুদ্ধ ও গিরিশ বাহির হইয়া আসিতেই ডাক্তার বিনা ভূমিকায় বলিল—থানায় ডায়রি করলি ?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে তাই—

—তাই আবার কিসের রে বাপু ? যা, ডায়রি করে আয়।

—আজ্ঞে বারণ করছে সব, বলছে—ছিরু পাল চুরি করেছে কে এ কথা বিশ্বাস করবে ?

—কেন ? ও বেটার টাকা আছে বলে ?

—তাই তো সাত-পাঁচ ভাবছি ডাক্তারবাবু।

বিদ্রূপতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া জগন্নাথ বলিল—তা হলে এ সংসারে যাদের টাকা আছে তারাই সাধু—আর গরীব মাত্রেই অসাধু, কেমন ? কে বলেছে এ কথা ?

অনিরুদ্ধ এবার চুপ করিয়া রহিল। বাড়ীর ভিতরে বাসনের টুংটাং শব্দ উঠিতেছে। পদ্ম ফিরিয়াছে, সব শুনিতেছে, তাহারই ইশারা দিতেছে। উত্তর দিল গিরিশ, বলিল—আজ্ঞে, ডায়রি করেই বা কি হবে ডাক্তারবাবু, ও এখুনি টাকা দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করবে। তা ছাড়া থানার জমাদারের সঙ্গে ছিরুর বেশ ভাবের কথা তো জানেন! একসঙ্গে মদ-ভাং খায়—তারপর—

ডাক্তার বলিল—জানি জানি। কিন্তু দারোগা টাকা খেলে—তারও উপায় আছে। তার উপরে কমিশনার আছে। তার ওপরে ছোট লাট, ছোট লাটের ওপর বড় লাট আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তা বুঝলাম ডাক্তারবাবু, কিন্তু মেয়েছেলেকে এজাহার ফেজাহার দিতে হবে, সেই কথা আমি ভাবছি।

—মেয়েছেলেদের এজাহার ? ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া গেল।—মাঠে ধান চুরি হয়েছে, তাতে মেয়েছেলেকে এজাহার দিতে হবে কেন ? কে বলল ? এ কি মগের মুলুক নাকি ?

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ উঠিয়া পড়িল।—তা হলে আমি আজ্ঞে এই এখুনি চললাম।

ডাক্তার বাইসাইকেলে উঠিয়া বলিল, যা, তুই নির্ভাবনায় চলে যা। আমি ওবেলা যাব। চুরি করার জন্যে ধান কেটে নিয়েছে—এ কথা বলবি না, বলবি, আক্রোশবশে আমার ক্ষতি করবার জন্যে করেছে।

অনিরুদ্ধ আর বাড়ির মধ্যে ঢুকিল না পর্যন্ত, রওনা হইয়া গেল, পাছে পদ্ম আবার বাধা দেয়। সে ডাক্তারের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিল; গিরিশকে বলিল—গিরিশ, কামারশালের চাবিটা নিয়ে এসো তো ভাই চেয়ে।

ওপারের জংশনের কামারশালের চাবি। গিরিশকে ভিতরে ঢুকিয়া চাহিতে হইল না, দরজার আড়াল হইতে ঝনাৎ করিয়া চাবিটা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। গিরিশ হেঁট হইয়া চাবিটা তুলিতেছিল—পদ্ম দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল—ডাক্তার ও অনিরুদ্ধ অনেকখানি চলিয়া গিয়াছে। সে এবার আধ ঘোমটা টানিয়া সামনে আসিয়া বলিল—একবার ডাক ওকে।

মুখ তুলিয়া একবার পদ্মের দিকে একবার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া গিরিশ বলিল—পেছনে ডাকলে ক্ষেপে যাবে।

—তা তো যাবে। কিন্তু ভাত? ভাত নিয়ে যাবে কে? আজ কি খেতেদেতে হবে না?

গিরিশ ও অনিরুদ্ধ সকালে উঠিয়া ওপারে যায়, তাহার পূর্বেই তাহাদের ভাত হইয়া থাকে—যাইবার সময় সেই ভাত তাহারা একটা বড় কৌটায় করিয়া লইয়া যায়। সেই খাইয়াই তাহাদের দিন কাটে। রাত্রের খাওয়াটা বাড়ীতে ফিরিয়া আরাম করিয়া খায়। গিরিশ বলিল—ভাতের কৌটা আমাকে দাও, আমিই নিয়ে যাই।

* * *

পদ্ম সংসারে একা মানুষ। বছর দুয়েক পূর্বে শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর হইতেই সমস্ত দিনটা তাহাকে একলাই কাটাইতে হয়। সে নিজে বন্ধ্যা, ছেলেপুলে নাই। পাড়াগাঁয়ে এমন অবস্থায় একটি মনোহর কর্মান্তর আছে—সে হইল পাড়া বেড়ানো। কিন্তু পদ্মের স্বভাব যেন উর্ণনাভ-গৃহিণীর মত। সমস্ত দিনই সে আপনার গৃহস্থালির জাল ক্রমাগত বুনিয়া চলিয়াছে। ধান-কলাই রৌদ্রে দিতেছে, সেগুলি তুলিতেছে, মাটি ও কুড়ানো ইট দিয়া গাঁথিয়া ঘরে বেদী বাঁধিতেছে; ছাই নিয়া মাজিয়া-তোলা বাসনের ময়লা তুলিতেছে—শীতের লেপ-কাঁথাগুলি পাড়িয়া নতুন পাট করিতেছে। ইহা ছাড়া নিয়মিত কাজ—গোয়াল পরিষ্কার করা, জাব কাটা, ঘুঁটে দেওয়া, তিন-চারবার বাড়ী ঝাঁট দেওয়া এসব তো আছেই।

আজ কিন্তু তাহার কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না। সে খিড়কির

ঘাটে গিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। অনিরুদ্ধকে থানায় যাইতে বারণ করিয়াছে, হাসিমুখে রহস্য করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে—সে কেবল ভবিষ্যৎ অশান্তি নিবারণের জন্য। অথচ ঐ দু-বিঘা বাকুড়ির ধানের জন্য তাহারও দুঃখের সীমা ছিল না। আপন মনেই সে মৃদুস্বরে ছিরু পালকে অভিসম্পাত দিতে শুরু করিল।

—কানা হবেন—কানা হবেন—অন্ধ হবেন; হাতে কুষ্ঠ হবে,—সর্বস্ব যাবে—ভিক্ষে করে খাবেন।

সহসা যেন কোথাও প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে বলিয়া মনে হইল। পদ্ম কান পাতিয়া শুনিল। গোলমালটা বায়েনপাড়ায় মনে হইতেছে। প্রচণ্ড রূঢ়কণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় কেউ তর্জন-গর্জন করিতেছে। ওই ছোঁয়াচটা যেন পদ্মকেও লাগিয়া গেল। সেও কণ্ঠ উচ্চে চড়াইয়া শাপ-শাপান্ত আরম্ভ করিল—

—জোড়া বেটা ধড়ফড় করে মরবে; এক বিছানায় একসঙ্গে। আমার জমির ধানের চালে কলেরা হবে। নিবংশ হবেন—নিবংশ হবেন; নিজে মরবেন না, কানা হবেন—দুটি চোখ যাবে, হাতে কুষ্ঠ হবে। যথাসর্বস্ব উড়ে যাবে—পুড়ে যাবে। পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াবেন।

বেশ হিসাব করিয়া—ছিরু পালের সহিত মিলাইয়া সে শাপ-শাপান্ত করিতেছিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল, খিড়কির পুকুরের ওপারে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিরু পাল তাহার গালিগালাজগুলি বেশ উপভোগ করিয়া হাসিতেছে। এইমাত্র ছিরু পাতু বায়েনকে মারপিট করিয়া ফিরিতেছিল, বায়েনপাড়ার কলরবটা তাহারই সেই বিক্রমোদ্ভূত। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের স্ত্রীর শাপ-শাপান্ত শুনিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে হাসির মধ্যে অন্য একটা ক্রূর প্রবৃত্তির প্রেরণা অথবা তাড়নাও ছিল। দেখিয়া পদ্ম উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ছিরু ভাবিতেছিল, লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে কিনা? কিন্তু দিবালোকে তাহার বড় ভয়, সে স্পন্দিতবক্ষে দ্বিধা করিতেছিল। সহসা পদ্মের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু কিসের একটা প্রতিবিম্বিত আলোচ্ছটা তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেই সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

—ধার পরীক্ষে করতে এক কোপে দুটো পাঁটা কেটে আমার কাজ বাড়িয়ে গেলেন বীরপুরুষ। রক্তের দাগ ধোয়া নাই—ঘরে ভরে রেখে দিয়েছেন। আমি ঘাটে বসে ঝামা ঘষি আর কি!

পদ্মের হাতে একখানা বগি দা; রোদ পড়িয়া দা'খানা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাহারই ছটা আসিয়া চোখে পড়িতেই ছিরু পাল চোখ ফিরাইয়া লইল।

পরক্ষণেই দুম্-দুম্ শব্দে পা ফেলিয়া আপনার বাড়ীর পথ ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মের মুখেও নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

চার

গ্রাম হইতে বাহির হইলেই বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল—প্রস্থে চার মাইল; কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের অবস্থিতি; এবং পাঁচখানা গ্রামের সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর ধার পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মাঠখানার দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ তিন দিকে ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরভূমি জুড়িয়া এই মাঠখানার উর্বরতা অদ্ভুত। অংশের নামই হইল 'অমরকুণ্ডার মাঠ' অর্থাৎ মাঠে ফসলের মৃত্যু নাই। শিবপুরের ইহার মধ্যে আবার শিবকালীপুরের সীমানার জমিই নাকি উৎকৃষ্ট। এইটুকু জমির পরিমাণ এদিকে অতি অল্প। শিবপুরের সমস্ত জমি উত্তর দিকে। কালীপুরের চাষের মাঠ অধিকাংশই গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অর্থাৎ এই দিকে। শিবকালীপুর নামেমাত্র দুইখানা গ্রাম, শিবপুর ও কালীপুর. দুই গ্রামের বসতির মধ্যে কেবল একটা দীঘির ব্যবধান। কালীপুর গ্রামখানাই বড়, ওই গ্রামেই লোকসংখ্যা বেশী; শ্রীহরি, দেবু প্রভৃতি সকলেরই বাস এখানে।

শিবপুর গ্রামখানি বহু পূর্বে ছিল—ছোট একটি পাড়াবিশেষ; তখন অর্থাৎ বর্তমান কাল হইতে প্রায় আশী-নব্বই বৎসর পূর্বে সেখানে একশ্রেণীর বিচিত্র সম্প্রদায় বাস করিত; তাহারা নিজেদের বলিত 'দেবল-চাষী'। তাহারা নিজ হাতে চাষ করিত না, শিবপুরের বুড়ো শিবের সেবাপূজার ভার লইয়া তাহারা মাতিয়া থাকিত। এখন এই দেবল সম্প্রদায়ের আর কেহই নাই। অধিকাংশই মরিয়া-হাজিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক ঘর এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ক্রোশ পাঁচেক দূরবর্তী রক্ষেশ্বর গ্রাম এবং ক্রোশ আষ্টেক দূরবর্তী জলেশ্বর গ্রাম—বাবা রক্ষেশ্বর ও বাবা জলেশ্বর এই নামীয় দুই শিবের আশ্রয় লইয়া পাণ্ডা হিসেবে তাহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাস করিতেছে। শিবভক্ত দেবলদের বাস ছিল বলিয়াই পল্লীটার নাম ছিল শিবপুর। দেবলেরা চলিয়া যাইবার পর কালীপুরের চৌধুরীরা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিয়া শিবপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জ্ঞাতি সদ্গোপ চাষীদের প্রত্যক্ষ সংস্রব এড়াইবার জন্যই তাহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। চৌধুরীরাই শিবপুরকে একটি স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার শিবপুর স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিমে যে গ্রামের মাঠ, সে গ্রামে নাকি লক্ষ্মী বসতি করেন না, গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে যে গ্রামের চাষের সীমানা—সেখানে নাকি লক্ষ্মীর অপার করুণা। অন্ততঃ প্রবীণেরা তাই বলে। মাঠ উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে দেখা যায়—গ্রাম অপেক্ষা মাঠ উঁচু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ক্রমনিম্নতার একটা একটানা প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয় গোটা পৃথিবী জুড়িয়া এইটাই এই ক্রমনিম্নতার জন্যই, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে কৃষিক্ষেত্র হইলে—গ্রামের সমস্ত জলই গিয়া মাঠে পড়ে ; গ্রাম-ধোয়া জলের উর্বরতা প্রচুর। ইহা ছাড়াও গ্রামের পুকুরগুলির জলের সুবিধা ষোল-আনা পাওয়া যায়। এই কারণে শিবপুর এবং কালীপুর পাশাপাশি গ্রাম হইলেও দুই গ্রামে জমির গুণ ও মূল্যে অনেক প্রভেদ। এজন্য কালীপুরের লোকের অনেক অহঙ্কার শিবপুরের লোককে সহ্য করিতে হয়। শিবপুরের চৌধুরীরা এককালে তাহাদের জমিদার ছিল, তখন কালীপুরকে শিবপুরের আধিপত্য সহ্য করিতে হইয়াছে ; কালীপুরের বর্তমান অহঙ্কারের উদ্ধত্য তাহারও একটা প্রতিক্রিয়া বটে।

দ্বারকা চৌধুরী সেই বংশোদ্ভূত। চৌধুরীদের সমৃদ্ধি অনেক দিনের কথা। দ্বারকা চৌধুরীর এক পুরুষ পূর্বে তাহাদের বংশের সম্মান-সমৃদ্ধির ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াছে। চৌধুরীরও আভিজাত্যের কোন ভান নাই ; পূর্বকালের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে সে সমানভাবেই মেলামেশা করে ; এক মজলিসে বসিয়া তামাক খায়—সুখ-দুঃখের গল্প করে। তবু চৌধুরীর কথাবার্তার ধরন ও সুরের মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। চৌধুরী কথা বলে খুব কম, যেটুকু বলে—তাহাও অতি ধীর এবং মৃদুস্বরে। কথার প্রতিবাদ করিলে চৌধুরী তাহার আর প্রতিবাদ করে না। কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীর কথা সংক্ষেপে স্বীকার করিয়া লয়, কোন ক্ষেত্রে চুপ করিয়া যায়, কোন ক্ষেত্রে সেদিনকার মত মজলিস হইতে উঠিয়া পড়ে। মোট কথা, চৌধুরী শান্তভাবেই অবস্থান্তরকে মানিয়া লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে।

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী সকালেই ছাতাটা মাথায়—বাঁশের লাঠিটা হাতে লইয়া কালীপুরের দক্ষিণ মাঠে নদীর ধারে রবি-ফসলের চাষের তদ্বিরে চলিয়াছিল। কালীপুরের জমিদারীর স্বত্ব চলিয়া গেলেও—সেখানে তাহাদের মোটা জোত এখনও আছে। কালীপুরের দক্ষিণেই 'অমরকুণ্ডার মাঠ' পূর্বেই বলিয়াছি, এখান-কার ফসল কখনও মরে না, এ মাঠে হাজা-সুখা নাই। মাঠটির মাথায় বেশ বিস্তৃত দুইটি ঝর্নার জল আছে ; প্রশস্ত একটি অগভীর জলা হইতে নালা বাহিয়া অবিরাম জল বহিয়া চলিয়াছে ; জলাটি কানায় কানায় অহরহই পরিপূর্ণ, জল কখনও শুকায় না। এই যুগ্ম-ধারাই অমরকুণ্ডার মাঠের উপর যেন ধরিত্রী-মাতার

বক্ষক্ষরিত ক্ষীরধারা। নালা বাহিয়া জলাভাবের সময় নালায় বাঁধ দিয়া, যাহার যে দিকে প্রয়োজন জলস্রোতকে ঘুরাইয়া লইয়া যায়।

অগ্রহায়ণ পড়িতেই হৈমন্তী ধান পাকিতে শুরু করিয়াছে, সবুজ রঙ হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অমরকুণ্ডার মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নদীর বাঁধের কোল পর্যন্ত সুপ্রচুর ধানের সবুজ ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে রচিত অপূর্ব এক বর্ণশোভা ঝলমল করিতেছে। ধানের প্রাচুর্যে মাঠের আল পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। কেবল ঝর্নার দুই পাশের বিসর্পিল বাঁধের উপরের তালগাছগুলি আঁকাবাঁকা সারিতে ঊর্ধ্বলোকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হেমন্তের পীতাভ রৌদ্রে মাঠখানা ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজও শরতের নীলের আমেজ রহিয়াছে; এখনও ধূলা উড়িতে আরম্ভ করে নাই। দূরে আবাদী মাঠের শেষপ্রান্তে নদীর বন্যারোধী বাঁধের উপর ঘন সবুজ শরবন একটা সবুজ রঙের দীর্ঘ প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। মাথায় চুনকাম করা আলিসার মত চাপ বাঁধিয়া সাদা ফুলের সমৃদ্ধ সমারোহ বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে।

কালীপুরের পশ্চিম দিকে—সম্ভ্রান্ত ধনীদের গ্রাম কঙ্কণা; গ্রামের চারি-পাশের গাছপালার উপর সাদা-লাল-হলুদ রঙের দালানগুলির মাথা দেখা যাইতেছে। একেবারে ফাঁকা প্রান্তরে স্কুল—হাসপাতাল—বাবুদের থিয়েটারের ঘর আগাগোড়া পরিষ্কার দেখা যায়। বাবুরা হালে টাকায় এক পয়সা ঈশ্বরবৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন; টাকা দিতে গেলেও দিতে হইবে—টাকা লইতে গেলেও দিতে হইবে। ঐ টাকায় পার্বণ উপলক্ষে ধুমধাম যাত্রা-থিয়েটার হয়। চৌধুরী নিঃশ্বাস ফেলিল—দীর্ঘনিঃশ্বাস। বৎসরে দেড় টাকা দুই টাকা করিয়া তাহাকে ঐ ঈশ্বরবৃত্তি দিতে হয়।

অমরকুণ্ডার ক্ষেতে এখনও জল রহিয়াছে, জলের মধ্যে প্রচুর মাছ জন্মায়; আল কাটিয়া দিয়া মুখে ঝুড়ি পাতিয়া হাড়ী বাউড়ী ডোম ও বায়েনদের মেয়েরা মাছ ধরিতেছে। ক্ষেতের মধ্যেও অনেকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের দেখা যায় না—কেবল ধানগাছগুলি চিরিয়া একটা চলন্ত রেখা দেখা যায়, যেমন অগভীর জলের ভিতর মাছ চলিয়া গেলে জলের উপর একটা রেখা জাগিয়া ওঠে ঠিক তেমনি। অনেকে ঘাস কাটিতেছে; কাহারও গরু আছে—কেহ ঘাস বেচিয়া দুই-চার পয়সা রোজগার করে। এই এখানকার জীবন।

অমরকুণ্ডার মাঠের ঠিক মাঝামাঝি একটি প্রশস্ত আলের উপর দিয়া যাওয়া-আসার পথ। প্রশস্ত অর্থে একজন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে চলিতে পারে, দুইজন হইলে গা ঘেঁষাঘেষি হয়। এই পথ ধরিয়া গ্রামের গরুবাছুর নদীর ধারে চরিতে

যায়। ধান খাইবে বলিয়া তখন তাহাদের মুখে একটি করিয়া দড়ির জাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রৌঢ় চৌধুরী একটু হতাশার হাসি হাসিল—গরুগুলির মুখের জাল খুলিবার মত গো-চরও আর রহিল না।

বন্যারোধী বাঁধের ওপারে নদীর চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষের একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চাষীদের অবশ্য আর উপায়ও ছিল না। অমরকুণ্ডার মাঠের অর্ধেকের উপর জমি কঙ্কণার বিভিন্ন ভদ্রলোকের মালিকানিতে চলিয়া গিয়াছে। অনেক চাষীর আর জমি বলিতে কিছুই নাই। এই তাহারাই প্রথম নদীর ধারে গো-চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। এখন দেখা-দেখি সবাই আরম্ভ করিয়াছে। কারণ চরের জমি খুবই উর্বর। সারা বর্ষাটাই নদীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া থাকে। সেই সোনা ফসলের কাণ্ড বাহিয়া শীষ ভরিয়া দানা হইয়া ফলিয়া উঠে। গম যব সরিষা প্রচুর হয়; সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা। ওই চরটার নামই 'ছোলা-কুড়ি' বা ছোলাকুণ্ড। এখন অবশ্য আলুর চাষেরই রেওয়াজ বেশী। আলু প্রচুর হয় এবং খুব মোটাও হয়। নদীর ওপারের জংশনে আলুর বাজারও ভাল। কলিকাতা হইতে মহাজনেরা ওখানে আলু কিনিতে আসে। এ কয় মাসের জন্য তাহাদের এক-একজন লোক আড়ত খুলিয়া বসিয়াই আছে—আলু লইয়া গেলেই নগদ টাকা। বড় চাষী যাহারা তাহারা বিশ-পঞ্চাশ টাকা দাদনও পায়।

সকলের টানে চৌধুরীকেও গো-চর ভাঙিয়া আলু-গম-ছোলার চাষ করিতে হইতেছে। চারিপাশে ফসলের মধ্যে তাহার গো-চরে গরু চরানো চলে না; অবুঝ অবোলা পশু কখন যে ছুটিয়া গিয়া অন্য লোকের ফসলের উপর পড়িবে—সে কি বলা যায়! তাহার উপর অমরকুণ্ডার মাঠে উৎকৃষ্ট দোয়েম জমিতে রবি ফসলের চাষও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্কণার ভদ্রলোকের জমি সব পড়িয়া থাকে, তাহারা রবি ফসলের হাঙ্গামা পোহাইতে চায় না, আর খইল-সারেও টাকা খরচ তাহারা করিবে না। কাজেই তাহাদের জমি ধান কাটার পর পড়িয়াই থাকে। অধিকাংশ জমি চাষ হইলে সেখানে কতকটা জমি পতিত রাখিয়া গরু চরানো যেমন অসম্ভব, আবার অধিকাংশ জমি পতিত থাকিলে সেখানে কতকটা জমি চাষ করাও তেমনি অসম্ভব। তবু ত গরু-ছাগলকে আগলাইয়া পারা যায়; কিন্তু মানুষ ও বানরকে পারা যায় না। তাহারা খাইয়াই শেষ করিয়া দিবে। কালীপুরের দোয়েম—সোনার দোয়েম!···

এদিকে যুদ্ধ লাগিয়া সব যেন উল্টাইয়া গেল (প্রথম মহাযুদ্ধ)। কি কাল-যুদ্ধই না ইংরেজরা করিল জার্মানের সঙ্গে? সমস্ত একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিল। দুঃখ-দুর্দশা সবকালেই আছে, কিন্তু যুদ্ধের পর এই কালটির মত দুর্দশা

আর কখনও হয় নাই। কাপড়ের জোড়া ছ-টাকা সাত-টাকা, ওষুধ অগ্নিমূল্য—যায় পেরেক ও সূচের দাম চারগুণ হইয়া গিয়াছে। ধানচালের দরও প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দর বাড়িয়াছে তিনগুণ। জমির দামও ডবল হইয়া গিয়াছে। দর পাইয়া হতভাগা মূর্খের দল জমিগুলা কঙ্কণার বাবুদের পেটে ভরিয়া দিল। ফলে এই অবস্থা, আজ আপসোস করিলে কি হইবে!

মরুক, হতভাগারা মরুক! আঃ, সেই তেরোশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পঁচিশ সালে; আজ তেরশো উনত্রিশ সাল—আজও বাজারের আগুন নিবিল না। কঙ্কণার বাবুরা ধূলামুঠা সোনার দরে বেচিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনিতেছে আর কালীপুরের জমি কিনিতেছে মোটা দামে। ধূলা বৈকি! মাটি কাটিয়া কয়লা ওঠে—সেই কয়লা বেচিয়া তো তাহাদের পয়সা। যে-কয়লার মণ ছিল তিন আনা, চোদ্দ পয়সা, আজ সেই কয়লার দর কিনা চোদ্দ আনা। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত—এই বাজারে আবার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতি ঘুচাইয়া ট্যাক্স বাড়াইয়া বসাইল ইউনিয়ন বোর্ড। বাবুরা সব বোর্ডের মেম্বর সাজিয়া দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইয়া বসিল—আর দাও তোমরা এখন ট্যাক্স! ট্যাক্স আদায়ের ধুম কি! চৌকিদার দফাদার সঙ্গে লইয়া বাঁধানো খাতা বগলে বোর্ডের কেরানী দুগাই মিশ্র যেন একটা লাটসাহেব!

সহসা চৌধুরী চকিত হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। কে কোথায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না? লাঠিটি বগলে পুরিয়া রৌদ্রনিবারণের ভঙ্গিতে ভ্রূর উপরে হাতের আড়াল দিয়া এপাশ ওপাশ দেখিয়া চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হ্যাঁ, পিছনেই বটে। ওই—গ্রাম হইতে কয়জন লোক আসিতেছে, উহাদের ভিতরেই কেহ কাঁদিতেছে; সে স্ত্রীলোক, তাহাকে দেখা যাইতেছে না, সামনের পুরুষটির আড়ালে সে ঢাকা পড়িয়াছে। আ-হা-হা! পুরুষটা—পুরুষটা কেউটে সাপের মত ফিরিয়া মেয়েটার চুলের মুঠি ধরিয়া দুম-দাম করিয়া প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। চৌধুরী এখান হইতেই চীৎকার করিয়া উঠে—এই, এই; আ-হা-হা! ওই!

তাহারা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি চীৎকার বন্ধ করিল; পুরুষটিও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। চৌধুরী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার রওনা হইল। ছোটলোক কি সাধে বলে! লজ্জা-শরম, রীত-করণ উহাদের কখনও হইবে না। জানে না স্ত্রীলোকের চুলে হাত দিলে শক্তি ক্ষয় হয়। রাবণ যে রাবণ, যাহার দশটা মুণ্ডু, কুড়িটা হাত, এক লক্ষ ছেলে, একশো লক্ষ নাতি, সে যে সে, সীতার চুলের মুঠি ধরিয়া সে একেবারে নির্বংশ হইয়া গেল।

বাঁধের কাছাকাছি চৌধুরী পৌঁছিয়াছে—এমন সময় পিছনে পদশব্দ শুনিয়া চৌধুরী ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পাতু বায়েন হন্ হন্ করিয়া বুনো শূকরের মত গোঁভরে চলিয়া আসিতেছে। পিছনে কিছুদূরে ধুপ্ ধুপ্ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে একটি স্ত্রীলোক। বোধ হয় পাতুর স্ত্রী। সে এখনও গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতেছে আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছিতেছে। চৌধুরী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল পাতু যে-গতিতে আসিতেছে, তাহাতে তাহাকে পথ ছাড়িয়া না দিলে উপায় কি! উহার আগে আগে চলিবার শক্তি চৌধুরীর নাই। পাতু কিন্তু নিজেই পথ করিয়া লইল, সে পাশের জমিতে নামিয়া পড়িয়া ধানের মধ্যে দিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌধুরীকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল—দ্যাখেন চৌধুরী মশায় দ্যাখেন!

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। কপালে একটা সদ্য আঘাতচিহ্ন হইতে রক্ত ঝরিয়া মুখখানাকে রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—ওগো, বাবুমশায় গো! খুন করলে গো!

—এ্যা-ও! পাতু গর্জন করিয়া উঠিল।—আবার চেঁচাতে লাগলি মাগী?

সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নামিয়া গেল; সে গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—গরীবেন কি দশা করেছে দেখেন গো, আপনারা বিচার করেন গো!

পাতু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিঠ দেখাইয়া বলিল—দেখেন পিঠ, দেখেন!

এবার চৌধুরী দেখিল পাতুর পিঠে লম্বা দড়ির মত নির্মম প্রহার-চিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাগ একটা-দুইটা নয়—দাগে দাগে পিঠটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত। চৌধুরী অকপট মমতা ও সহানুভূতিতে বিচলিত হইয়া উঠিল, আবেগ-বিগলিত স্বরেই বলিল—আ-হা-হা! কে এমন কল্লে রে পাতু?

—আজ্ঞে, ওই ছিরু পাল। রাগে গন গন করিতে করিতে প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই পাতু উত্তর দিল—কথা নাই, বার্তা নাই, এসেই এক গাছা দড়ির বাড়িতে দেখেন কি করে দিলে দেখেন! আবার সে পিছন ফিরিয়া ক্ষতবিক্ষত পিঠখানা চৌধুরীর চোখের সামনে ধরিল। তারপর আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দড়িখানা চেপে ধরলাম তো একগাছা বাঁখারির ঘায়ে কপালটাকে একেবারে দিল ফাটিয়ে।

ছিরু পাল—শ্রীহরি ঘোষ? অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। উঃ, নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে! চৌধুরীর চোখে অকস্মাৎ জল আসিয়া গেল। এক এক সময় অপরের দুঃখ-দুর্দশায় মানুষ এমন বিচলিত হয় যে, তখন নিজের সকল সুখ-

দুঃখকে অতিক্রম করিয়া নির্যাতিতের দুঃখ যেন আপন দেহমন দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে। চৌধুরী এমনই একটি অবস্থায় উপনীত হইয়া সজলচক্ষে পাতুর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার দন্তহীন মুখের শিথিল ঠোঁট অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাতু বলিল—মোড়লদের কি-জনার কাছে গেলাম। তা কেউ রা কাড়লে না মশায়। শক্তর সব দুয়োর মুক্ত।

পাতুর বউ অনুচ্চ কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলিতেছিল—সর্বনাশী কালামুখীর লেগে গো—

পাতু একটা ধমক কষিয়া বলিল—অ্যাই—অ্যাই, আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে!

চৌধুরী একটু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—কেন অমন করে মারলে? কি এমন দোষ করেছ তুমি যে—

অভিযোগ করিয়া পাতু কহিল—সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে বলতে গেলাম—তা তো আপনি শুনলেন না, চলে গেলেন। গোটা গেরামের লোকের 'আঙোটজুতি' আমাকে সারা বছর যোগাতে হয়, অথচ আমি কিছুই পাই না। তা কর্মকার যখন রব তুললে, তখন আমিও বলেছিলাম যে, আমি আর 'আঙোটজুতি' যোগাতে লার্‌ব। কাল সানঝোতে পালেরমুনিষ 'আঙোটজুতি' চাইতে এসেছিল—আমি বলেছিলাম—পয়সা আন গিয়ে। তা আমার বলা বটে—আজ সকালে উঠে এসেই কথা নাই বাত্তা নাই—আথালি-পাথালি দড়ি দিয়ে মার।

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল। পাতুর বউ বার বার ঘাড় নাড়িয়া মৃদু বিলাপের স্বরে সেই বলিয়াই চলিল—না গো বাবুমশায়—

পাতু তাহার কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল—আমার পেট চলে কি ক'রে—সেটা আপনারা বিচার করবেন না, আর এমনি করে মারবেন?

চৌধুরী কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—শ্রীহরি তোমাকে এমন করে মেরেছে—মহা অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে, হাজারবার লক্ষবার, সে কথা সত্যি। কিন্তু 'আঙোটজুতি'র কথাটা তুমি জান না বাবা পাতু! গাঁয়ের ভাগাড় তোমরা যে দখল কর—তার জন্যেই তোমাদিগে গাঁয়ের 'আঙোটজুতি' যোগাতে হয়। এই নিয়ম। ভাগাড়ে মড়ি পড়লে তোমরা চামড়া নাও, হাড় বিক্রি কর, তারই দরুণ তোমরা ওই 'আঙোটজুতি'—মাংস কাটিয়া লইয়া যাওয়ার কথাটা আর চৌধুরী ঘৃণাবশে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

পাতু অবাক হইয়া গেল; সে বলিল—ভাগাড়ের দরুণ!

—হ্যাঁ! তোমাদের প্রবীণেরা তো কেউ নাই, তারা সব জানত।

—শুধু তাই লয়, মশায়, ওই পোড়ামুখী কলঙ্কিনী গো! এই ফাঁকে পাতুর বউ আবার স্বর তুলিল।

পাতু এবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তো 'আঙোটজুতি'ও লয়; আপনারা ভদ্দরনোকরা যদি আমাদের ঘরের মেয়েদের পানে তাকান্—তবে আমরা যাই কোথা বলুন?

প্রৌঢ় প্রবীণ ধর্মপরায়ণ চৌধুরী বলিয়া উঠিল—রাম! রাম! রাম! রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!

পাতু বলিল—আজ্ঞে, রাম রাম লয়, চৌধুরী মশায়। আমার ভগ্নী দুর্গা একটু বজ্জাত বটে; বিয়ে দেলাম তো পালিয়ে এল শ্বশুরঘর থেকে। সেই তারই সঙ্গে মশায় ছিরু পাল ফষ্টিনষ্টি করবে। যখন তখন পাড়ায় এসে ছুতোনাতা নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে বসবে। আমার মা হারামজাদীকে তো জানেন? চিরকাল একভাবে গেল; ছিরু পালকে বসতে মোড়া দেবে—তার সঙ্গে ফুস-ফাস করবে। ঘরে মশায়, আমার বউ রয়েছে। তাকে, মাকে আর দুর্গাকে আমি ঘা-কতক করে দিয়েছিলাম। মোড়লকেও বলেছিলাম, ভাল করেই বলেছিলাম চৌধুরী মশাই,—আমাদের জাত-জ্ঞেতে নিন্দে করে—আর আপনি আসবেন না মশায়। এ আক্রোশটাও আছে মশাই।

লাঠি ও ছাতায় চৌধুরীর দুই হাতই ছিল আবদ্ধ, কানে আঙুল দিবার উপায় ছিল না; সে ঘৃণাভরে থুতু ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—রাধাকৃষ্ণ হে! থাক পাতু, থাক বাবা—সকালবেলা ওসব কথা আমাকে আর শুনিও না। এতে আর আমার কি হাত আছে বল! রাধাকৃষ্ণ!

পাতু কিন্তু ইহাতে তুষ্ট হইল না। সে কোন কথা না বলিয়া চৌধুরীকে পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার পিছন পিছন তাহার স্ত্রী আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল—স্বামীর নীরবতার সুযোগ পাইয়া সে আবার কান্নার সুরে স্বর করিল—হারামজাদী. আবার ঢং ক'রে ভাইয়ের দুঃখে ঘটা ক'রে কানতে বসেছে গো! ওগো আমি কি করব গো!

পাতু বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরিল; সঙ্গে সঙ্গে বউটি আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—আঁ্যা—

পাতু মুখ খিঁচাইয়া বলিল—চেল্লাস না বাপু। তোকে কিছু বলি নাই···তু থাম। ধাক্কা দিয়া স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া পশ্চাদগামী চৌধুরীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—আচ্ছা চৌধুরীমশায়, আলিপুরের রহমৎ স্যাখ যে কঙ্কনার রমন্দ চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড় দখল করেছে, তার কি করছেন?

আশ্চর্য হইয়া চৌধুরী বলিলেন—সে কি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়। ভাগাড়ের চামড়া তাদিগে ছাড়া আর কাউকে বেচতে পাব না আমরা। তারা বলে, ভাগাড় জমিদার আমাদিগে বন্দোবস্ত দিয়েছে। খাল ছাড়ানোর মজুরী আর নুনের দাম—তার ওপর দু-চার আনা ছাড়া আর কিছু দেয় না। অথচ চামড়ার দাম এখন আগুন। তাহলে?

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি কথা পাতু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মিছে যদি হয় পঞ্চাশ জুতো খাব, নাকে খৎ দোব।

—তা হলে, চৌধুরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা হলে হাজার বার তুমি বলতে পার ও-কথা, গাঁয়ের লোক পয়সা দিতে বাধ্য। কিন্তু জমিদারের গোমস্তা নন্দীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছ?

পাতু বলিল—গোমস্তা নন্দী কেন, জমিদারের কাছেই যাব আমি। ডাক্তার ঘোষ মশায় বললে, থানায় যা। তা থানা কেন—আগে জমিদারের কাছেই যাই, দুটো বিচারই হয়ে যাক। দেখি জমিদার কি বলে!

সে আবার ফিরিল এবং সোজা আল-পথটা ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকের একটা আল ধরিয়া কঙ্কণার দিকে মুখ করিল। বৃদ্ধ চৌধুরী ঠুক্ ঠুক্ করিয়া নদীর চরের দিকে অগ্রসর হইল। নদীর ওপারের জংশনের কলগুলার চিমনি এইবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর চৌধুরী চরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হতভম্ব হইয়া গিয়াছে বৃদ্ধ চৌধুরী; সব করিয়া সব হইল—শেষে চামড়া বেচিয়া রামেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে! ছিঃ ছিঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে!

পাঁচ

গল্পে শোনা যায়, যমজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে যমদূতেরা রামের বদলে শ্যামকে লইয়া যায়, শ্যামের বদলে আসিয়া ধরে রামকে। তাদের অনুকরণে হইলেও ক্ষেত বিস্তৃততর করিয়া লইয়া রাম অপরাধ করিলে মানুষ অতিবুদ্ধিবশতঃ প্রায়ই শ্যামকে লইয়া টানাটানি করে। পুলিশও মানুষ, সুতরাং এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। পরদিনই একটা পুলিশ তদন্ত হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ আক্রোশের কারণ দেখাইয়া ছিরু পালকে সন্দেহ করিলেও পুলিশ আসিয়া মাঠ-আগলদার সতীশ বাউড়ীর বাড়ীখানা তল্লাস করিয়া সব তছনছ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকটাকে জেরায় নাজেহাল করিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিল। অবশ্য অনিরুদ্ধের সন্দেহ অনুযায়ী একবার ছিরু পালের খামার বাড়ীটাও ঘুরিয়া দেখিল, কিন্তু সেখানে দুই বিঘা জমির আধ-পাকা ধানের একগাছি খড়ও কোথাও মিলিল না।

পুলিশ আসিয়া গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিল। গ্রামের মণ্ডল-মাতব্বরেরাও আসিয়া চন্দ্রমণ্ডলের নক্ষত্র সভাসদদের মত চারিপাশে জমকাইয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে ফিস ফিস করিয়া পরস্পরের মধ্যে কথা বলিতেছিল। ছিরু পাল বসিয়াছিল—পুলিশের অতি নিকটেই এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে। তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত মুখগহ্বরের পাশে চোয়ালের হাড় দুইটা কঠিন ভঙ্গিতে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধ সম্মুখেই উবু হইয়া বসিয়া মাটির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। তদন্ত-শেষে পুলিশ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধও উঠিল; সে চাহিয়া না দেখিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল যে, সমস্ত গ্রামের লোক কঠিন প্রতিহিংসা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়—নিরুপায় হইয়া মানুষকে সহ্যও করিতে হয়, কিন্তু যন্ত্রণারও ভাবী ইঙ্গিত বা নিষ্ঠুর কল্পনা মানুষের পক্ষে অসহ্য। সে পুলিশেরই পিছন পিছন উঠিয়া আসিল।

পুলিশ চলিয়া যাইতেই চণ্ডীমণ্ডপে প্রচণ্ড কলরব উঠিল। সমবেত জনতার প্রত্যেকে আপন আপন মন্তব্য ঘোষণা আরম্ভ করিল; কেহ কাহারও কথা শোনে না দেখিয়া প্রত্যেকেই আপন আপন কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে লইয়া গেল। সদ্গোপ সম্প্রদায়ের কেহই অবশ্য শ্রীহরি ঘোষকে সুনজরে দেখে না; কিন্তু অনিরুদ্ধ কর্মকার যখন পুলিশে খবর দিয়া তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করাইল, বাড়ীতে পুলিশ ঢুকাইয়া দিল, তখন অপমানটাকে তাহার সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া সেদিন অনিরুদ্ধের সমাজকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যজনিত অপরাধের ভিত্তির উপর আজিকার ঘটনাটা ঘটিবার ফলে বিষয়টা গুরুত্বে রীতিমত বড় হইয়া উঠিয়াছে।

দেবনাথ ঘোষের গলাটা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি উচ্চ, এ গ্রামে সকল কলরবের ঊর্ধ্বে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সে দুই অর্থেই। চাষীর ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম! তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিমান যুবক দেবনাথ। তাহার ছাত্র-জীবনে সে কৃতী ছাত্র ছিল। কিন্তু আর্থিক অসাচ্ছল্য এবং সাংসারিক বিপর্যয় হেতু ম্যাট্রিক ক্লাস হইতে তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইয়াছে। সে এখন এই গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। গ্রাম্যজীবনের ব্যবস্থা শৃঙ্খলার বহু তথ্য সে ব্যগ্র কৌতূহলে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে। সে বলিতেছিল—কামার, ছুতোর, নাপিত, কাজ করব না বললেই চলবে না। কাজ করতে তারা বাধ্য।

শ্রীহরি কেবল তেমনি গম্ভীরভাবে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসিয়াছিল, এতখানি যে হইবে—সে তাহা ভাবিতে পারে নাই। ওদিকে শ্রীহরির খামার বাড়ীতে শুকাইতে দেওয়া ধান পায়ে পায়ে ওলোট-পালোট করিয়া দিতে দিতে ছিরুর মা

অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ও নিষ্ঠুরতম আক্রোশে নির্মম অভিসম্পাত দিতেছিল অনিরুদ্ধকে।

*   *   *

অন্যদিকে অনিরুদ্ধের বাড়ীতে পদ্ম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া বাহির দরজাটিতেই দাঁড়াইয়া ছিল। থানা-পুলিশকে তাহার বড় ভয়। ছিরুর মায়ের অশ্লীল গালিগালাজ এবং নিষ্ঠুর অভিসম্পাতগুলি এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। ছিরু পালের বাড়ী এবং তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটা পুকুরের এপার ওপার। শব্দ তেরছা ভাসিয়া আসে। পথটা তিনপাড় বেড় দিয়া খানিকটা ঘুর পথ। গালাগালি শুনিয়া পদ্মের মুখখানা থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল। পদ্ম দুরন্ত মুখরা মেয়ে; গালিগালাজ অভিসম্পাত সে-ও অনেক জানে। সে কাহারও স্পষ্ট নামোল্লেখ না করিয়া তাহাদের অবস্থার সহিত মিলাইয়া এমনভাবে অভিসম্পাত দিতে পারে যে শব্দভেদী বাণের মত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির একেবারে বুকে গিয়া আমূল বিঁধিয়া যায়। কিন্তু আজ দারুণ উৎকণ্ঠায় কে যেন গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। এই সময় অনিরুদ্ধ আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। অনিরুদ্ধকে দেখিয়া গভীর আশ্বাসে সে স্বস্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। পরমুহূর্তেই চোখমুখ দীপ্ত করিয়া বলিল—শুনছ তো? আমিও এইবার গাল দোব কিন্তু!

অনিরুদ্ধের অবস্থাটা তখন ঠিক শীতের বরফের মত অনুতপ্ত, স্থির ও কঠিন। সে রুক্ষকণ্ঠে বলিল—না, গাল দিতে হবে না—ঘরে চল্।

পদ্ম ঘরের দিকে আসিতে আসিতে বলিল—না। শুধু-শুধু ঘরে যাব? কানের মাথা খেয়েছো? গালাগালগুলো শুনতে পাচ্ছ না?

—তবে যা, গাল দিগে; গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর্ গিয়ে! মর্ গিয়ে।

পদ্ম গজ গজ করিতে করিতে গিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে তেল বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—কি খোয়ারটা আমার করছে শুনতে পাচ্ছ না তুমি?

পদ্ম ও অনিরুদ্ধ নিঃসন্তান—তাই ছিরুর মা অনিরুদ্ধের নিষ্ঠুরতম মৃত্যু কামনা করিয়া পদ্মের জন্য কদর্যতম অশ্লীলতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার নির্দেশ দিয়া অভিসম্পাত দিতেছে। তেলের বাটি পাশে রাখিয়া সে স্বামীর একখানা হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে তেল মাখাইতে বসিল। কর্কশ ও কঠিন হাত; আগুনের আঁচে রোমগুলি পুড়িয়া কামানো দাড়ির মত করকরে হইয়া আছে। শুধু হাত নয়, হাত পা বুক—মোট কথা সম্মুখভাগের প্রায় অনাবৃত অংশটাই এমনি দগ্ধরোম। তেল দিতে দিতে পদ্ম বলিল—বাববা, হাত-পা নয় যেন উখো।

অনিরুদ্ধ সে কথায় কান না দিয়া বলিল—আমার গুপ্তিটা বার করে বেশ করে মেজে রাখবি তো।

পদ্ম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমারও দা আছে, কাল মেজে শান দিয়ে রেখেছি, নিজের গলায় মেরে একদিন দু-খানা হয়ে পড়ে থাকব কিন্তু।

—কেন ?

—তুমি খুনখারাপী করে ফাঁসী যাবে—আর আমি হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি ভোগ করে বেঁচে থাকব ?

অনিরুদ্ধ কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল বলিল—হুঁ-উ !—অর্থাৎ পদ্মের হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতির সম্ভাবনার কথাটা সে ভাবিয়া দেখে নাই, নতুবা ছিরেকে জখম করিয়া জেল খাটিতে বা হত্যা করিয়া ফাঁসী যাইতে বর্তমানে বিশেষ আপত্তি ছিল না।

পদ্ম বলিল,—বারণ করলাম থানা পুলিশ কর না। কথা কানেই তুললে না। কিন্তু কি হল ? পুলিশ কি করলে ? গাঁয়ের সঙ্গে কেবল ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে গেল। আর আমি গাল দোব বললেই—একেবারে বাঘের মত হাঁকিয়ে উঠছ—'না দিতে পাবি না।'

রুদ্ধক্রোধ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল ; কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না। বন্ধ্যা পদ্মকে লইয়া তাহাকে বড় সন্তর্পণে চলিতে হয় ; সামান্য কারণে নিতান্ত বালিকার মত সে অভিমান করিয়া মাথা খুঁড়িয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া তোলে ; আবার কখনও প্রবীণা প্রৌঢ়া যেমন দুরন্ত ছেলের আবদার-অত্যাচার সহ্য করে তেমনি করিয়া হাসিমুখে অনিরুদ্ধের অত্যাচার সহ্য করে—অনিরুদ্ধের হাতে মার খাইয়াও তখন সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসে। কখন্ কোন মুখে পদ্ম চলে—সে অনিরুদ্ধ অনেকটা বুঝিতে পারে। আজিকার কথার মধ্যে তাহার আবদারের সুর ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে ; সেইটুকু বুঝিয়াই সে দারুণ বিরক্তি সত্ত্বেও আত্মসংবরণ করিয়া রহিল। কোন কথা না বলিয়াই পদ্মর হাত হইতে সে আপনার পা-খানা টানিয়া লইয়া বলিল—কই, গামছা কই ?

পদ্ম কিন্তু এইটুকুতেই অভিমানে ফোঁস করিয়া উঠিল ; অনিরুদ্ধ ভুল করে নাই। পদ্ম আজ ছোট মেয়ের মতই আবদেরে হইয়া উঠিয়াছে। মুখে সে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বিদ্যুতের মত চমকাইয়া মুখ তুলিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল,—পরমুহূর্তেই তেলের বাটিটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বেলার পানে তাকিয়ে দেখেছিস ? ছায়া কোথা গিয়েছে দেখ্। এদিকে তিনটে বাজে।

গম্ভীরমুখে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ীর উঠানের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পদ্ম গামছাখানা আনিয়া অনিরুদ্ধের হাতে দিয়া বলিল—বস, আমি জল এনে দিই, বাড়ীতেই চান করে নাও।

গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তাতে দেরি হবে, পদ্ম। আমি এই যাব আর আসব। পানকৌড়ির মত ভুক করে ডুবব আর উঠব। ভাত তুই বেড়ে রাখ্। বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম ভাত বাড়িতে গিয়া রান্নাঘরের শিকলে হাত দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ডাল-তরকারি সব ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে। সেসব বাবুর মুখে রুচিবে কি? বাবু নয় নবাব। যত আয় তত ব্যয়। কামার, কুমোর, নাপিত, স্বর্ণকার—ইহাদের অবশ্য খরচে বলিয়া চিরকাল বদনাম; কিন্তু উহার মত খরচে পদ্ম আর কাহাকেও দেখে না। ওপারের শহরে কামারশালা করিয়া খরচের বাতিক তাহার আরো বাড়িয়া গিয়াছে। এক টাকা সেরের ইলিশমাছ এ গ্রামে কে খাইয়াছে? এখন গরম একটা কিছু না করিয়া দিলে নবাব কেবল ভাতে-হাত করিয়াই উঠিয়া পড়িবে! খিড়কির ডোবাটার পাড়ে পদ্ম প্রথম আশ্বিনেই কয়েক ঝাড় পেঁয়াজ লাগাইয়াছিল, সেগুলো বেশ ঝাড়ে-গোছে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পেঁয়াজের শাক আনিয়া ভাজিয়া দিলে কেমন হয়? পদ্ম খিড়কির দিকে অগ্রসর হইয়াই লক্ষ্য করিল—দুয়ারের পাশে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সাদা কাপড়ের খানিকটা মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল— গতকালের ছিরু পালের সেই বাভৎস হাসি! কয়েক পা পিছাইয়া আসিয়া সে প্রশ্ন করিল—কে? কে দাঁড়িয়ে গো?

সাড়া পাইয়া মানুষটি চকিত গতিতে ঘরে প্রবেশ করিল। পদ্ম আশ্বস্ত হইল—পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। পরমুহূর্তেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল—এ যেন ছিরু পালের বউ! বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হইবে না; এককালে সুন্দরী ছিল সে, কিন্তু এখন অকালবার্ধক্যে জীর্ণ এবং শীর্ণ। চোখে তাহার যত ক্লান্তি তত সকরুণ মিনতি। ছিরু পালের বউ বিনা ভূমিকায় দু'টি হাত জোড় করিয়া সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—ভাই, কামার বউ!

পদ্ম কোন কথা বলিতে পারিল না; ছিরু পালের বউকে সে ভাল করিয়াই জানে, এমন ভাল মেয়ে আর হয় না। কত বড় ভাল ঘরের মেয়ে সে তাও পদ্ম জানে। তাহার কতখানি দুঃখ তাও সে চোখে দেখিয়াছে—কানে শুনিয়াছে, ছিরু পালের প্রহার সে দূর হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে; তদুপরি ছিরুর মায়ের গালিগালাজ সে নিত্যই শুনিতেছে।

ছিরুর বউ তাহার সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া বলিল—তোমার পায়ে ধরতে এসেছি ভাই।

দুই পা পিছাইয়া গিয়া পদ্ম বলিল—না-না-না! সে কি!

—আমার ছেলে দুটিকে তোমার গাল দিয় না, ভাই; যে করেছে তাকে গাল দিও—কি বলব আমি তাতে!

ছিরু পালের সাতটি ছেলের মধ্যে দুইটি মাত্র অবশিষ্ট; তাও পৈত্রিক গুপ্ত-ব্যাধির বিষে জর্জরিত—একটি রুগ্ন, অপরটি প্রায় পঙ্গু।

সন্তানবতী নারীদের উপর বন্ধ্যা পদ্মের একটা অবচেতনগত হিংসা আছে। এই মুহূর্তে কিন্তু সে হিংসাও তাহার স্তব্ধ হইয়া গেল। সে আপনা-আপনি কেবলি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ছিরু পালের স্ত্রী বলিল—তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। চাষীর মেয়ে—আমি জানি। তুমি ভাই এই টাকা কটা রাখ—বলিয়া সে স্তম্ভিত পদ্মের হাতে দুখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া আবার বলিল—লুকিয়ে এসেছি, তাই জানতে পারলে আমার আর মাথা থাকবে না—বলিয়াই সে দ্রুতপদে ফিরিল। দরজার মুখে গিয়া আবার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল হাত দু'টি জোড় করিয়া বলিল—আমার ছেলে দুটির কোন দোষ নাই ভাই। আমি হাত জোড় করে যাচ্ছি।

পরমুহূর্তে সে খিড়কির দরজার ও-পাশে অদৃশ্য হইয়া গেল। পদ্ম যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

কিছুক্ষণ পরে তাহার এই স্তম্ভিত ভাব কাটিয়া গেল অদূরবর্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। আবার একটা কোথায় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে। সকল কোলাহলের ঊর্ধ্বে একজনের গলা শোনা যাইতেছে। পদ্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল;—অনিরুদ্ধ কি? না, সে নয়। তবে? ছিরু পাল? কান পাতিয়া শুনিয়া পদ্ম বুঝিল—না, এ ছিরু পালের কণ্ঠস্বরও নয়। তবে? সে দ্রুতপদে আসিয়া বাহির-দরজার সম্মুখে পথের উপর নামিয়া দাঁড়াইল। এবার সে স্পষ্ট চিনিতে পারিল এ কণ্ঠস্বর এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের। পদ্ম এবার নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত দুইই হইল। মুখে খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যও দেখা দিল। হরেন্দ্র ঘোষালের মাথায় বেশ খানিকটা ছিট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামের সকলকে টেক্কা দিয়া তাহার চলা চাই। ছিরু পাল সাইকেল কিনিলে, সে সাইকেল এবং কলের গান দুইই কিনিয়া ফেলিল, টাকা যোগাড় করিত জমি বন্ধক দিয়া। ছিরু পাল নাকি রহস্য করিয়া একবার রটনা করিয়াছিল—সে

এবার ঘোড়া কিনিবে। হরেন্দ্র মান রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিল—ছিরু পাল ঘোড়া কিনিলে সে একটা হাতী কিনিবে। আজ আবার বামুনের কি রোখ মাথায় চাপিয়াছে কে জানে ? পথে কোন একটা ছোট ছেলেও নাই যে জিজ্ঞাসা করে !

ঠিক এই সময়েই পদ্ম দেখিল অনিরুদ্ধ আসিতেছে। কাছে আসিয়া পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পদ্ম বলিল—মরণ—হাসছ কেন ?

অনিরুদ্ধ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।

যা গেল ! ব্যাপারটা ব'লে তবে তো মানুষে হাসে ! এত চেঁচামেচি কিসের ; হ'ল কি ? হরু ঠাকুর এমন চেঁচাচ্ছে কেন ?

—ঠাকুরকে ভারী জব্দ করেছে। আধখানা কামিয়ে দিয়ে। আবার হাসিতে সে ভাঙিয়া পড়িল।

বহুকষ্টে হাস্য-সংবরণ করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত মহা ধূর্ত !

কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়া এতক্ষণে অনিরুদ্ধ কোনমতে কথাটা শেষ করিল। সেটা এই—তারা নাপিতও তাহাদের দেখাদেখি বলিয়াছে, ধান লইয়া গোটা বৎসর সমস্ত গ্রামের লোকের ক্ষৌরির কাজ সে করিতে পারিবে না। যাহাদের জমি নাই—হাল নাই—তাহাদের কাছে ধান পাওয়া যায় না। যাহাদের আছে তাহারাও সকলে দেয় না। সুতরাং ধান লইয়া ক্ষৌরিক কারবার ছাড়িয়া সে নগদ কারবার শুরু করিয়াছে। হারুঠাকুর কামাইতে গিয়াছিল—তারা নাপিত পয়সা চাহিয়াছিল। খানিকটা বকাইয়া অবশেষে 'পয়সা দিব' বলিয়াই হারুঠাকুর কামাইতে বসে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত—একে নাপিত ধূর্ত, তায় তারা। আধখানা কামিয়ে বলে—কই, পয়সা দাও ঠাকুর ! হারু বলে—কাল দোব। তারাও অমনি ক্ষুর ভাঁড় গুটিয়ে ঘরে ঢুকে বলে দিয়েছে—তা হলে আজ থাক—কাল বাকীটা কামিয়ে দেব। এই চেঁচামেচি গালাগালি—হিন্দী ফার্সী ইংরেজী। গাঁয়ের লোকেরা সব আবার জটলা পাকাচ্ছে।

অনিরুদ্ধ আবার প্রবল কৌতুকে হাসিয়া উঠিল এবং সে হাসির তোড়ে তাহার মুখের ভাত ছিটাইয়া উটানময় হইয়া গেল।

পদ্মের খানিকটা শুচি-বাতিক আছে ; তাহার হাঁ হাঁ করিয়া উঠিবার কথা, কারণ সব উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আজ সে কিছুই বলিল না। অনিরুদ্ধের এত হাসিতেও সে এতক্ষণের মধ্যে একবার হাসে নাই। কথাটা অনিরুদ্ধের

অকস্মাৎ মনে হইল। সে গভীর বিস্ময়ে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তোর আজ কি হল বল্ দেখি ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পদ্ম বলিল—ছিরু পালের বউ লুকিয়ে এসেছিল।

—কে ? বিস্ময়ে অনিরুদ্ধ সচকিত হইয়া উঠিল।

ছিরু পালের বউ গো। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কথাগুলি বলিয়া পদ্ম কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা নোট দুখানি দেখাইল।

অনিরুদ্ধ নীরব হইয়া রহিল।

পদ্ম আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা, মায়ের প্রাণ।

অনিরুদ্ধ আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, যেন ঝাঁকি দিয়াই নিজেকে টানিয়া তুলিল ; বলিল—বাবাঃ ! রাজ্যের কাজ বাকী পড়ে গিয়েছে। এইবার খেয়ে দেয়ে দেড় ক্রোশ পথ ছুটতে হবে।

পদ্ম কোন কথা বলিল না। অনিরুদ্ধ হাতমুখ ধুইয়া মশলা মুখে দিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। এবং একমুখ হাসিয়া বলিল—একখানা নোট আমাকে দে দেখি।

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। অনিরুদ্ধ আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল—লোহা আর ইস্পাত কিনতে হবে পাঁচ টাকার। ছিরে শালাকে টাকা দিতে খদ্দেরের পাঁচ টাকা ভেঙেছি। আর—

পদ্ম কোন কথা না বলিয়া একখানা নোট অনিরুদ্ধের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ কুড়াইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—আমি নিজে একটি—। মাইরি বলছি—একটি টাকার এক পয়সা বেশী খরচ করব না। কতদিন খাই নাই তুই বল্ ?

অর্থাৎ মদ।

তবু পদ্ম কোন কথা বলিল না। অকস্মাৎ যেন অনিরুদ্ধের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ছয়

হারু ঘোষালের আধখানা দাড়ি কামাইয়া বাকীটা রাখিয়া দেওয়ায় তারা নাপিতের যতই পরিহাস-রসিকতা প্রকাশ পাইয়া থাকুক এবং গ্রামের লোকে প্রথমটা হারু ঘোষালের সেই অর্ধনারীশ্বরবৎ রূপ দেখিয়া হাসিয়া ব্যাপারটা যতই হাস্যকর করিয়া তুলুক,—প্রতিক্রিয়ার পাল্টা কিন্তু সহজ ও আদৌ হাস্যকর হইল না ; অত্যন্ত ঘোরালো এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল।

হরিশ মণ্ডল প্রবীণ মাতব্বর ব্যক্তি—লোকটির সূক্ষ্ম বোধশক্তিও আছে।

সে-ই প্রথম বলিল—হাসিস না তোরা, হাসির ব্যাপার এটা নয়। গাঁয়ের অবস্থাটা কি হল একবার ভেবে দেখেছিস ?

সকলেই হাসির বেগের প্রবলতা খানিকটা সংবরণ করিয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিল। হরিশ গম্ভীরভাবে বলিল—ঘোর অরাজক।

ভবেশ পাল—ছিরুর কাকা—স্থূল ব্যক্তি, তবুও বুদ্ধিমত্তার ভান তাহার আছে, সে-ও গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে !

দেবনাথ হাসি-তামাসায় যোগ দিবার মত লোক নয় ;—সে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—এ আপনারা আটকাবেন কি করে ? গাঁয়ের জোটান আছে আপনাদের ? ওই কামার-ছুতোরের পঞ্চাইতি আসরে ছিরু দ্বারিক চৌধুরীর অপমান করলে, চৌধুরী উঠে চলে গেল ; জগন ডাক্তার তো এলই না— উল্টে অনিরুদ্ধকে উস্কে দিলে।

ভবেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরিনাম সত্য হে ! 'কলিশেষে এক-বর্ণ হইবে যবন'—এ কি আর মিথ্যা কথা বাবা ? এমনি করেই ধর্ম্মকর্ম্ম জাত-জরম সব যাবে।

হরিশ বলিল—ওদিকে লুটনী দাই কি বলছে জান ? আমার বউমায়ের ন'মাস চলছে তো ! তাই বলে পাঠিয়েছিলাম যে, রাত-বিরেতে কোথাও যদি যাস তবে আগে খবর দিয়ে যাস যেন ! তা বলেছে—আমাকে কিন্তু নগদ বিদেয় করতে হবে।

গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া ভবেশ বলিল—হু।

হরিশ বলিল—রাজা বিনে রাজ্যনাশ যে বলে—কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের জমিদার যে হয়েছে সে থেকেও না থাকা !

দেবনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলিল—জমিদারের কথা বাদ দেন। জমিদার আমাদের খারাপ কিসের ? এ কাজ তো জমিদারের নয়—আপনাদের। আপনারা কই শক্ত হয়ে বসে ডাকুন দেখি মজলিস। ঘাড় হেঁট করে সবাইকে আসতে হবে। আসবে না—চালাকি নাকি ? বিপদ-আপদ কি নাই তাদের ? লোহাতে মুড় বাঁধিয়ে ঘর করে সব ? চৌধুরীকে ডাকুন—জগন ডাক্তারকে ডাকুন—ডেকে আগে ঘর বুঝান। তারপর কামার, ছুতোর, বায়েন, দাই, ধোপা; নাপিত এদের ডাকুন ; আর ন্যায্য বিচার করুন। তাদের পাওনাটা কড়ায়গণ্ডায় পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হরিশ মাতব্বরদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এ দেবনাথ কিন্তু বলেছে ভাল। কি বলেন গো সব ?

ভবেশ বলিল—উত্তম কথা।

নটবর বলিল—হ্যাঁ, তাই করুন তা হলে।

দেবনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না, সে বলিল—আজই বসুন সব সন্ধ্যের সময়। আমি আসর ক'রে দিচ্ছি ; স্কুলের চল্লিশ বাতির আলো দিচ্ছি ; খবরও দিচ্ছি সকলকে। কি বলছেন সব ?

হরিশ আবার সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি গো ?

—তা বেশ। খানিকটা তামাক আর আগুনের যোগাড় রেখো বাপু।

*　　　*　　　*

বহুকাল পর চণ্ডীমণ্ডপের আটচালাটা আবার আলোকোজ্জ্বল হইয়া গ্রাম্য-মজলিসে জমিয়া উঠিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ এমনি ভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য-বিচার হইত, সংকীর্তন হইত, পাশা-দাবাও চলিত ; গ্রামখানির সলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা। গ্রামে কাহারও কোন কুটুম্ব সজ্জন আসিলে—এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়া-কর্ম—অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সবই এইখানে অনুষ্ঠিত হইত। কালগতিকে ধূলার অবলেপনে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না। জগন ডাক্তারের পূর্বপুরুষ—জগনের পিতামহই কবিরাজ হইয়া বাহিরের ঘর বা বৈঠকখানার পত্তন করিয়াছিল। প্রথমে সে অবশ্য এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াই রোগী দেখিত। তারপর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যও বটে এবং জমিদারের গোমস্তার সঙ্গে কি কয়েকটা কথান্তরের জন্যও বটে--কবিরাজ, ঔষধালয় ও বৈঠকখানা তৈয়ারী করিয়া ঔষধালয় খুলিল এবং সেখানে পান ও তামাকের সাচ্ছল্যে মজলিস জমাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে ভাঙন ধরাইয়া দিল। তারপর ক্রমে ক্রমে অনেকের বাড়িতেই একটি করিয়া বাহিরের ঘরের পত্তন হইয়াছে। সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র গ্রাম জুড়িয়া এখন অনেকগুলি ছোট ছোট মজলিস বসে। কেহ কেহ বা একাই একটি আলো জ্বালিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তবে এখনও জগন ডাক্তারের ওখানেই মজলিসটি বড় হয়। জগনের রূঢ় দাম্ভিকতা সত্ত্বেও রোগীর বাড়ীর লোকজন সেখানে যায় ; আরও কয়েকজন যায়—ডাক্তারের অর্ধ-সাপ্তাহিক খবরের কাগজের সংবাদের প্রত্যাশায়। দেবনাথ ঘোষ এত বিরূপতা সত্ত্বেও যায়। সে-ই চীৎকার করিয়া কাগজ পড়ে, অন্য সকলে শোনে। অসহযোগ আন্দোলন তখন শেষ হইয়াছে, স্বরাজপার্টির উগ্র বক্তৃতায় এবং সমালোচনায় কাগজের স্তম্ভগুলি পরিপূর্ণ। শ্রোতাদের মনে চমক লাগে—স্তিমিতগতি পল্লীবাসীর রক্তে যেন একটা উষ্ণ শিহরণ অনুভূত হয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে দেবনাথই সকলকে সম্ভাষণ জানাইতেছিল, সে-ই উদ্যোক্তা ; মজলিস আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই আসর সে বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুলগাছটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা, একটি বাস্থদেব-মূর্তি সেখানে গাছের শিকড়ের বন্ধনে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া আছে ; সেইটিই ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পূজিত হয়। সেখানে একটা মোটা শুকনা ডাল জালিয়া আগুন করা হইয়াছে। আগুনের চারিপাশে গ্রামের জনকতক হরিজন আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। ভদ্র সজ্জনেরা প্রায় সকলেই আসিয়াছে। কেবল দ্বারকা চৌধুরী, জগন ডাক্তার, ছিরু পাল এবং আরও ছু-একজন এখনও আসে নাই।

চল্লিশ বাতির আলোয় আলোকিত চণ্ডীমণ্ডপটির উপরের দিকে চাহিয়া ভবেশ বলিল—দেখতে বেশ লাগছে বাপু।

হরিশও একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—এইবার কিন্তু একবার মেরামত করতে হবে চণ্ডীমণ্ডপটিকে। বলিয়া সে সপ্রশংস কণ্ঠে বলিল—কি কাঠামো দেখ দেখি! ওঃ—কি কাঠ!

দেবনাথ বলিল—ষড়দলে কি লেখা আছে জানেন ?—যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী। মানে চন্দ্র-স্থর্য-পৃথিবী যতদিন থকেবে, এও ততদিন থাকবে।

—তা থাকবে বাপু। বলিহারি বলিহারি! ভবেশ পাল অকারণে উচ্ছ্বসিত এবং পুলকিত হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়েই দ্বারকা চৌধুরী লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করিয়া আসিয়া বলিলেন—ওঃ, তলব যে বড় জোর গো!

দেবনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল ; জগন ডাক্তার ও ছিরুর জন্য আবার সে ছু'টি ছেলেকে ছু'জনের কাছে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু জগন ডাক্তার আসিল না, সে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে—তাহার সময় নাই। চোখে চশমা লাগাইয়া সে নাকি খবরের কাগজ পড়িতেছে। ছিরুও আসে নাই ; তাহার জর হইয়াছে, তবে সে বলিয়াছে—'পাঁচ জনে যা করবেন তাই আমার মত।'

ছিরুর এই অযাচিত বিনয়ে দেবনাথ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল।

* * *

ছিরুর কথাটা অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট ; বিনয়ের ধার ছিরু পাল ধারে না। জর তাহার হয়ই নাই। সে নির্মম আক্রোশে গর্তের ভিতরকার আহত অজগরের মত মনে মনে পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া সে প্রকাণ্ড বড় হুঁকাটায় ক্রমাগত একঘেয়ে টান টানিয়া

যাইতেছিল ও প্রখর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে উঠানের একটা বিন্দুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিল। নানা চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে।

—'ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলে কি হয়!' মনটা আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে। পরক্ষণেই মনে হয়, না। সন্ত সন্ত আক্রোশের বশে একটা কিছু করিয়া বসিলে আবার হয়ত এমনি ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে। আজই পঞ্চাশ টাকা জমাদার বন্ধুকে দিতে হইয়াছে। তাই লইয়া তাহার মা এখনও গজ গজ করিয়া তাহাকে গালি পাড়িতেছে।

—মর্, তুই মর্ রে! এমন রাগ তোর! একটু সবুর নাই! হাঁদা—গাড়োল গোঁয়ার কোথাকার, পঞ্চাশ টাকা আমার খল্ খল্ করে বেরিয়ে গেল! আমার বুকে বাঁশ চাপিয়ে দে তুই—আমার হাড় জুড়োক।

শ্রীহরি সেদিকে কানই দিতেছে না। অন্য সময় হইলে এতক্ষণে সে বুড়ীর চুলের মুঠো ধরিয়া উঠানে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া নির্মম প্রহার আরম্ভ করিত। কিন্তু আজ সে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

—অনিরুদ্ধ ওপার হইতে রাত্রি ন'টা দশটার সময় ফেরে। অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণে—না। সঙ্গে গিরিশ ছুতোর থাকে। থাকিলেই বা, দুজনকে ঘায়েল করিয়া দেওয়াই বা এমন কি কঠিন? শ্রীহরিরও মিতে আছে। মিতে গড়াঞী সানন্দে তাহাকে সাহায্য করিবে।

পরক্ষণেই সে চমকিয়া উঠিল। ধরা পড়িলে ফাঁসী হইয়া যাইবে। তাহার সে চমক এত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট যে তাহার ক্ষীণদৃষ্টি বুড়ী মা পর্যন্ত দেখিয়া ফেলিল। অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সে বলিল—মর্ মুখপোড়া! ছোট ছেলের মত চমকে উঠে যেন দেয়ালা করছে!

শ্রীহরি অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া হুঁকা হইতে কল্কেটা নামাইয়া দিয়া বলিল—এই! শুনচিস্? কল্কেটা পাল্টে দিয়ে যা।

কথাটা বলা হইল তাহার স্ত্রীকে। ছিরুর স্ত্রী রন্ধনশালে ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। পাশেই ল্যাম্পের আলোয় ছিরুর বড় ছেলেটা বই খুলিয়া একদৃষ্টে বাপের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। শীর্ণ, রুগ্ন, বছর দশেকের ছেলেটা—গলায় এক বোঝা মাদুলী—বড় বড় চোখে অদ্ভুত স্থির মূঢ় দৃষ্টি। চিন্তাগ্রস্ত বাপের প্রতিটি ভঙ্গিমা সে লক্ষ্য করিতেছে। শ্রীহরির ছোট ছেলেটা প্রায় পঙ্গু এবং বোবা, সেটাও একপাশে বসিয়া আছে—মুখের লালায় সমস্ত বুকটা অনবরত ভিজিতেছে। বড় ছেলেটি উঠিয়া আসিয়া কল্কেটা লইয়া গেল। শ্রীহরি ছেলেটার দিকে একবার চাহিল। ছেলেটা অদ্ভুত, শ্রীহরির মার খাইয়াও

কাঁদে না, স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। ছেলেটার জন্য এখন তাহার মাকে প্রহার করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মাকে যেন আগলাইয়া ফেরে। মারিলে পশুর মত হিংস্র হইয়া উঠে। সেদিন সে প্রহাররত শ্রীহরির পিঠে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিয়াছিল। ছেলেটার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্রীহরি স্ত্রীর দিকে চাহিল—বিশীর্ণ গৌরবর্ণ মুখখানা উনানের আগুনের আভায় লাল হইয়া উঠিয়াছে—চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালসার মুখ! শ্রীহরি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

—'হ্যাঁ, আর এক উপায় আছে! অনিরুদ্ধের অনুপস্থিতিতে পাঁচিল ডিঙাইয়া পদ্ম কামারনীকে বাঘের মত মুখে করিয়া—'। শ্রীহরির বুকখানা ধ্বক ধ্বক করিয়া লাফাইতে লাগিল। দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহা কামারনীর সেই দা-খানা কিন্তু বড় শাণিত! চোখের দৃষ্টি তাহার শীতল এবং ক্রুর। সেদিন দা-খানার রৌদ্র প্রতিফলিত ছটায় ছিরুর চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল।

বায়েনদের দুর্গা—কামারনীর চেয়ে দেখিতে অনেক শ্রী। যৌবন তাহার উচ্ছ্বসিত ; দেহবর্ণে সে গৌরী ; রঙ্গরসে, লীলা-লাস্যে সে অপরূপা। কিন্তু সে বহুভোগ্যা, সেই কারণেই তাহার আকর্ষণ শ্রীহরিকে আর তেমন বিচলিত করে না। দুর্গার দাদা পাতু আবার তাহার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করিয়াছে। স্পর্ধা দেখ বায়েনের! শ্রীহরির মুখে তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। জমিদারের ছেলের সোনার নিমফলের গোট তাহার কাছে বন্ধক আছে। অকস্মাৎ শ্রীহরি উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীহরির স্ত্রী কল্কেতে নতুন তামাক সাজিয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। কিন্তু তামাক শ্রীহরিকে আর আকর্ষণ করিল না। দেওয়ালে-পোঁতা পেরেক ঝুলানো জামাটা হইতে বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। অন্ধকার গলি-পথে-পথে ঘুরিয়া সে হরিজন-পল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে। পল্লীর প্রান্তে বহুকালের বৃদ্ধ বকুলগাছ, গ্রামের ধর্মরাজতলা—সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় উহাদের মজলিস বসে। গান-বাজনা হয়, ভাসান, বোলান, ঘেঁটু-গানের মহলা চলে—আবার এক-একদিনে দুর্নিবার কলহও বাধিয়া উঠে। আজ কলহ বাধিয়াছে। শ্রীহরি একটা গাছের অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে আরম্ভ করিল।

পাতু বাইনই আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিতেছে।

দুর্গারও তীক্ষ্ণকণ্ঠের আওয়াজ উঠিতেছে—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারার গোঁসাই দাদা সাজছে, দা-দা! মারবি ক্যানে তু! আমার যা খুশি আমি তাই করব। হাজার নোক আসবে আমার ঘরে, তোর কি? তোর ভাত আমি খাই?

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার মা-ও চীৎকার করিতেছে। শ্রীহরি হাসিল,—ওঃ! এ যে তাহাকে লইয়াই আন্দোলন চলিতেছে।

সহসা একটা মতলব তাহার মাথায় খেলিয়া গেল। গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল দুর্গাদের বাড়ীর দিকে। বকুল গাছটার ওপাশে পল্লীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। মেয়ে পুরুষ সব গিয়া জুটিয়াছে ওই গাছ-তলায়। শ্রীহরি সন্তর্পণে ঢুকিয়া পড়িল দুর্গাদের বাড়ীতে। বাড়ী অর্থে প্রাচীর-বেষ্টনহীন এক টুকরো উঠানের দুই দিকে দু'খানা ঘর; একখানা দুর্গা ও দুর্গার মায়ের, অপরখানা পাতুর। শ্রীহরির তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাতুর ঘরখানার দিকে। শ্রীহরি হতাশ হইল। দরজাটা বন্ধ—দাওয়াটাও শূন্য।

একটা কুকুর অকস্মাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল। বোধ হয় চুরি করিয়া কাঁচা চামড়ার টুকরা খাইতে আসিয়াছিল। শ্রীহরি হাসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, সুকৌশলে হাতের মধ্যে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে লুকাইয়া টানিতে টানিতে বাহির হইল। দুর্গার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে কে জানে? আবার সে গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে কিন্তু ঝগড়াটা ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি আবার একটা বিড়ি ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে সে গাছতলা হইতে বাহির হইয়া জ্বলন্ত বিড়িটা পাতুর চালের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুত লঘুপদে আপন বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপেও ভদ্র সজ্জনদের প্রবল আলোচনা চলিতেছে।

শ্রীহরি হাসিল।

কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের উর্ধ্বলোকে অন্ধকার আকাশ রক্তাভ আলোয় ভয়াল হইয়া উঠিল। আকাশের নক্ষত্র মিলাইয়া গিয়াছে। উৎক্ষিপ্ত খড়ের জ্বলন্ত অঙ্গার আকাশে উঠিয়া ফুলঝুরির মত নিবিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে হাউই-এর মত প্রজ্বলিত বাখারিগুলি সশব্দে বাগানের মাথায় ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল! আগুন! আগুন! ভয়ার্ত চীৎকার—শিশু ও নারীর উচ্চ কান্নার রোলে শূন্য-লোকের বায়ুতরঙ্গ মুখর, ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

নিমেষে বটতলার জটলা এবং তাহার পরই চণ্ডীমণ্ডপের মজলিস ভাঙিয়া গেল।

সাত

একা পাতুর ঘর নয়, পাতুর ঘরের আগুন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমস্ত হরিজন পল্লীটাকেই পোড়াইয়া দিল। বড় বড় গাছের আড়াল পাইয়া খান-দুই-তিন ঘর কোন রকমে বাঁচিয়াছে। বাকী ঘরগুলি অতি অল্প সময়েই মধ্যেই পুড়িয়া

গিয়াছে। সামান্য কুটীরের মত নিচু-নিচু ছোট-ছোট ঘর—বাঁশের হালকা কাঠামোর উপর অল্প খড়ের পাতলা ছাউনি ; কার্তিকের প্রথম হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় রোদে শুকাইয়া বারুদের মত দাহ্যবস্তু হইয়াই ছিল ; আগুন তাহাতে স্পর্শ করিবামাত্র বিস্ফোরণের মতই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গেল। গ্রামের লোক অনেকেই ছুটিয়া আসিয়াছিল—বিশেষ করিয়া অল্পবয়সী ছেলের দল। তাহারা চেষ্টাও অনেক করিয়াছিল, কিন্তু জল তুলিবার পাত্রের অভাব এবং বহ্নিমান সঙ্কীর্ণ চালাগুলিতে দাঁড়াইবার স্থানের অভাবে তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। তাহাদের মুখপাত্র ছিল জগন ডাক্তার। অগ্নিদাহের সমস্ত সময়টা চীৎকার করিয়া সেনাপতির মত আদেশ দিয়া ও উপদেশ বাতলাইয়া এমন গলা ফাটাইয়া ফেলিল যে, আগুন নিবিতে নিবিতে তাহার গলায় আওয়াজও বসিয়া গেল।

রাত্রে উহাদের সকলকে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শুইতে অনুমতি দেওয়া হইল ; কিন্তু আশ্চর্য মানুষ উহারা—কিছুতেই ওই পোড়া ভিটার মায়া ছাড়িয়া আসিল না। সমস্ত রাত্রি পোড়া ঘরের আশেপাশে কোনরূপে স্থান করিয়া লইয়া হেমন্তের এই শীতজর্জর রাত্রিটা কাটাইয়া দিল। ছেলেগুলা অবশ্য ঘুমাইল ; মেয়েগুলো গানের মত সুর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিল, আর পুরুষেরা পরস্পরকে দোষ দিয়া নিজের কৃতিত্বের আস্ফালন করিল এবং দগ্ধগৃহের আগুন তুলিয়া ক্রমাগত তামাক খাইল।

প্রায় ঘরেই দু-একটা গরু দুই-চারিটা ছাগল আছে ; আগুনের সময় সেগুলাকে তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল। সেগুলা এদিকে-ওদিকে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—রাত্রে সন্ধানের উপায় নাই। হাঁস-মুরগীও প্রত্যেকের ছিল ; তাহার কতকগুলি পুড়িয়াছে, চোখে দেখা না গেলেও গন্ধে তাহা অনুমান করা যায়। যেগুলা পালাইয়া বাঁচিয়াছে—সেগুলা ইতিমধ্যেই আসিয়া আপন আপন গৃহস্থের জটলার পাশে পালক ফুলাইয়া যথাসম্ভব দেহ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া গেল। অন্য সম্পদের মধ্যে কতকগুলা মাটির হাঁড়ি, দুই-চারিটা পিতল-কাঁসার বাসন, ছেঁড়া-কাপড়ে তৈয়ারী জীর্ণমলিন দুর্গন্ধযুক্ত কয়েকখানা কাঁথা ও বালিশ, মাদুর চ্যাটাই, মাছ ধরিবার পলুই, দু-চারখানা কাপড়—তাহার কতক পুড়িয়াছে বা পোড়াচালের ছাইয়ের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। যে যাহা বাহির করিয়াছে—সে সেগুলি আপনার পরিবার বেষ্টনীর মাঝখানে—যেন সকলে মিলিয়া বুক দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শেষরাত্রে হিমের তীক্ষ্ণতায় কুণ্ডলী পাকাইয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্য কাতর ক্লান্তির নীরবতার মধ্যে কখন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

সকাল হইতেই জাগিয়া উঠিয়া মেয়েরা আর এক দফা কাঁদিয়া শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে বসিল। একটু রোদ উঠিতেই কোমর বাঁধিয়া মেয়ে-পুরুষে পোড়া খড়ের ছাইগুলা ঝুড়িতে করিয়া আপন আপন সারগাদায় ফেলিয়া ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। পাকা কাঠগুলি একদিকে গাদা করিয়া রাখা হইল; পরে জ্বালানির কাজে লাগিবে। ছাইয়ের গাদার ভিতর হইতে চাপা-পড়া বাসন যাহার যাহা ছিল—সেদিন স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল। এ সমস্ত কাজ ইহাদের মুখস্থ। গৃহের উপর দিয়া এমন বিপর্যয় ইহাদের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। প্রবল বর্ষা হইলেও ঘরগুলির জীর্ণ আচ্ছাদন থুবড়াইয়া ভাঙিয়া পড়ে, নদীর বাঁধ ভাঙিলে বন্যার জল আসিয়া পাড়াটা ডুবাইয়া দেয়, ফলে দেওয়ালসুদ্ধ ঘরগুলি ধ্বসিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে জ্বালানির জন্য সংগৃহীত শুকনা পাতায় তামাকের আগুন ও জ্বলন্ত বিড়ির টুকরা ফেলিয়া মদ্যবিভোর নিশীথে নিজেরাই ঘরে আগুন লাগাইয়া ফেলে। সব বিপর্যয়ের পর সংসার গুছাইবার শিক্ষা এমনি করিয়া পুরুষানুক্রমেই ইহাদের হইয়া আসিতেছে। ঘর দুয়ার পরিষ্কারের পর আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত সন্ধ্যার বাসি ভাতই ইহাদের সকালের খাদ্য, ছোট ছেলেদের মুড়ি দেওয়া হয়; কিন্তু ভাত বা মুড়ি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছোট বাচ্চাগুলা ইহারই মধ্যে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—কিন্তু তাহার আর উপায় নাই। দুই-একজন মা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলার পিঠে দুম-দাম করিয়া কিল-চড় বসাইয়া দিল।—রাক্ষসদের প্যাটে যেন আগুন লেগেছে। মর মর তোরা, মর।

ঘরদুয়ার পরিষ্কার হইয়া গেলে মনিব-বাড়ী যাইতে হইবে—তবে আহার্যের ব্যবস্থা হইবে। মনিবেরা এসব ক্ষেত্রে চিরকালই তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ পাড়ার প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে খাটে, বাঁধা বাৎসরিক বেতন বা উৎপন্ন ভাগের চুক্তিতে শ্রমিকের কাজ করে। কেহ কেহ পেট-ভাতায় বা মাসে ভাতের হিসাবমত ধান লইয়া থাকে এবং ছোটগুলা পেট-ভাতায় বৎসরে চারখানা সাত হাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মাসে আট আনা হইতে এক টাকা পর্যন্ত মাহিনা পায়—ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানদের অধিকাংশই উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষে শ্রমিকের কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয়—ফসল উঠিলে ভাগের সময় সুদ সমেত ধান কাটিয়া লয়। সুদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ পর্যন্ত। অজন্মার বৎসরের এই ঋণ শোধ না হইলে আসল এবং সুদ এক করিয়া তাহার উপর আবার ঐ হারে সুদ টানা হয়। এই প্রথার মধ্যে অন্যায়

কিছু ইহারা বোধ করে না—বরং সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের ভাবই অন্তরে ইহার জন্য পোষণ করে। দায়-দৈবে মনিবেরা যে সাহায্য করেন—সেইটাই অতিরিক্ত করুণা। সেই করুণার ভরসাতেই আহার্যের চিন্তায় এখন তাহারা খুব ব্যাকুল নয়। মেয়েরাও অবস্থাপন্ন চাষী-গৃহস্থের সকালে-বিকালে বাসন মাজে, আবর্জনা ফেলিয়া পাট-কাম করে। মেয়েরাও সেখান হইতে কিছু কিছু পাইবে। এ ছাড়া দুধের দাম কিছু কিছু পাওনা আছে। সে পাওনা কিন্তু গ্রামে নয়। চাষীর গ্রামে চাষীদের ঘরের দুধ হয়। হরিজনেরা তাদের গরুর দুধ পাশের বড়লোকের গ্রাম কঙ্কণায় গিয়া বেচিয়া আসে। ঘুঁটেও সেখানে বিক্রয় হয়। কেহ কেহ জংশনে যায়।

পাতুর কিন্তু এসব ভরসা নাই। সে জাতিতে বায়েন বা বাদ্যকর অর্থাৎ মুচি। তাহার কিছু চাকরান জমি আছে। গ্রামের সরকারী শিবতলা, কালীতলা এবং পাশের গ্রামে চণ্ডীতলায় নিত্য ঢাক বাজায়। সেই হেতু বৎসরে দেবোত্তর সম্পত্তির কিছু ধান সে পিতামহদের আমল হইতে পাইয়া আসিতেছে। নিজের দুইটা হেলে বলদ আছে—তাই দিয়া সে নিজের জমির সঙ্গে ঐ কঙ্কণার ভদ্র-লোকের কিছু জমিও ভাগে চাষ করিয়া থাকে। এ ছাড়া ভাগাড়ের মরা গরু-মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া পূর্বে সে চামড়া-ব্যবসায়ী শেখদের বিক্রয় করিত। আপদে-বিপদে তাহারাই দু'চারি টাকা দাদন-স্বরূপ দিত। কিন্তু সম্প্রতি জমিদার ভাগাড় বন্দোবস্ত করায় এ দিকের আয় তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। নেহাৎ পারিশ্রমিক অর্থাৎ তিন-চার আনা মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা লইয়া চামড়াওয়ালার সঙ্গে মনান্তরও হইয়াছে। সে কি আর এ সময় সাহায্য করিবে? যে ভদ্রলোকের জমি ভাগে চাষ করে, সে কিছু দিলেও দিতে পারে; কিন্তু ভদ্রলোক খৎ না লেখাইয়া কিছু দিবে না। সেও অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। খৎকে পাতুর বড় ভয়। শেষ পর্যন্ত নালিশ করিয়া বাড়িটা লইয়া বসিলে সে যাইবে কোথায়? পৃথিবীর মধ্যে তাহার সম্পত্তি এই বাড়ীটুকু।

আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে পাতু দ্রুতগতিতে ছাই জড় করিয়া চলিয়াছিল। ছিরু পালের কাছে সেদিন মার খাইয়া তাহার মনে যে উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়া-ছিল—সে উত্তেজনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে উত্তেজনাবশেই সেদিন অমরকুণ্ডার মাঠে দ্বারকা চৌধুরীর কাছে ছিরু পাল সম্পর্কে আপনার সহোদরা দুর্গার যে কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া নালিশ করিয়াছিল তাই লইয়াই গত সন্ধ্যায় স্বজাতির মধ্যে তাহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা হইয়াছে। স্বজাতিরা কথাটা লইয়া ঘোঁট পাকাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—তুমি তো আপন মুখেই এই কেলে-

স্কারির কথা চৌধুরী মশায়ের কাছে বলেছ, জমিদারের কাছারীতে বলেছ। বলেছ কি না?

—হঁ্যা, বলেছি!

—তবে? তুমি পতিত হবে না কেন, তা বল?

কথাটা পাতুর ইহার পূর্বে ঠিক খেয়াল হয় নাই। সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হন হন করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়া দুর্গার চুলের মুঠি ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে মজলিসের সম্মুখে হাজির করিয়াছিল। ধাক্কা দিয়া দুর্গাকে মাটির উপরে ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—'সে কথা এই হারামজাদী ছেনাল্‌কে শুধাও। ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী; আমি ওর সঙ্গে পেথকান্ন।'

দুর্গার পেছনে পেছনে তাহার মা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়াছিল; সকলের পিছনে পাতুর বিড়ালীর মত বউটাও গুন গুন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল। তারপর সে এক চরম অশ্লীল বাক-বিতণ্ডা। স্বৈরিণী দুর্গা উচ্চকণ্ঠে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ের কুকীর্তির গুপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া পাতুর মুখের ওপর সদম্ভে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল—'ঘর আমার, আমি নিজের রোজগারে করেছি, আমার খুশী যার ওপর হবে—সে-ই আমার বাড়ী আসবে। তোর কি? তাতে তোর কি? তু আমাকে খেতে দিস, না, দিবি? আপন পরিবারকে সামলাস তু।'

পাতু আরও ঘা-কতক লাগাইয়া দিয়াছিল। পাতুর বউটি ঘোমটার ভিতর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ননদকে গাল দিতে শুরু করিয়াছিল। মজলিসের উত্তাপের মধ্যে উত্তেজিত কলরব হাতাহাতির সীমানায় বোধ করি গিয়া পৌঁছিয়াছিল—ঠিক এই সময়েই আগুন জ্বলিয়া উঠে।

এই দুই দিনের উত্তেজনা, তাহার উপর এই অগ্নিদাহের ফলে গৃহহীনতার অপরিমেয় দুঃখ তাহাকে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত করিয়া তুলিয়াছিল। সে নীরবেই কাজ করিয়া চলিতেছিল, এমন সময় তাহার বউ-এর ছিচকান্না তাহার কানে গেল। সে এতক্ষণে ছাগল-গরুগুলিকে অদূরবর্তী খেজুরগাছগুলার গোড়ায় খোঁটা পুঁতিয়া দিল। তাহার পর হাঁসগুলিকে নিকটবর্তী পুকুরের জলে নামাইয়া দিয়া, স্বামীর কাজে সাহায্য করিতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই গুনগুনানির কান্নার রেশও টানিয়া চলিল। পাতু হিংস্র জানোয়ারের মত দাঁত বাহির করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাই দেখ, মিহি গলায় আর ঢং করে কাঁদিস না বলছি। মেরে হাড় ভেঙে দোব—হঁ্যা।

ঘর পুড়িয়া যাওয়ার দুঃখে এবং সমস্ত রাত্রি কষ্টভোগের ফলে পাতুর

বউয়ের মেজাজও খুব ভাল ছিল না, সে বন্যবিড়ালীর মত হিংস্র ভঙ্গিতে ফ্যাঁস করিয়া উঠিল—ক্যানে, ক্যানে আমার হাড় ভেঙে দিবি শুনি ? বলে—'দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধরে'—সেই বিত্তান্ত। নিজের ছেনাল বোনকে কিছু বলবার ক্ষোমতা নাই—

পাতুর আর সহ্য হইল না, সে বাঘের মত লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান তখন লোপ পাইয়া গিয়াছে।

পাতুর ঘরের সম্মুখেই—একই উঠানের ওপাশে দুর্গা ও তাহার মায়ের ঘর। তাহারও ঘরের ছাই পরিষ্কার করিতেছিল। বউয়ের কথা শুনিয়া দুর্গা দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; পাতুর নির্যাতন-ব্যবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞভাবে ভাইকেই বলিল—হ্যাঁ, বউকে একটুকুন শাসন কর, মাথায় তুলিস না।

সেই মুহূর্তেই জগন ডাক্তারের ধরা-গলা শোনা গেল, সে হাঁ হাঁ করিয়া বলিল—ছাড়্ ছাড়্ হারামজাদা বায়েন, মরে যাবে যে !

কথা বলিতে বলিতে ডাক্তার আসিয়া পাতুর চুলের মুঠি ধরিয়া আকর্ষণ করিল। পাতু বউকে ছাড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দেখেন দেখি হারামজাদীর আস্পদ্দা, ঘরে আগুন-টাগুন লাগিয়ে—

—জল আন্, জল। জলদি, হারামজাদা গোঁয়ার—বলিয়া জগন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। বউটা অচেতন হইয়া অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া নাড়ী ধরিল।

পাতু এবার শঙ্কিত হইয়া ঝুঁকিয়া বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ এক মুহূর্তে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো, আমি বউকে মেরে ফেললাম গো।

পাতুর মা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠল—ওরে বাবা, কি করলি রে ?

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওরে জল,—শীগগির জল আন্।

দুর্গা ছুটিয়া জল লইয়া আসিল। সে বউয়ের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল ; ডাক্তার ছপাছপ জলের ছিটা দিয়া বলিল—কই, মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দে দেখি দুগ্‌গা।

কিন্তু ফুঁ আর দিতে হইল না, বউ আপনিই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—আমাকে আর কারুর মেমতা করতে হবে না রে, সংসারে আমার কেউ লাই রে।

গলা তাহার ধরিয়া গিয়াছে, আওয়াজ বাহির হয় না ; তবু সে প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিল।

*   *   *

জগন ডাক্তার কতগুলি ঘর পুড়িয়াছে গণনা করিয়া নোটবুকে লিখিয়া লইল ; কতগুলি মানুষ বিপন্ন তাহাও লিখিয়া লইল। খবরের কাগজে পাঠাইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা আবেদনের খসড়া সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় চার-পাঁচখানা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া খড়, বাঁশ, চাল, পুরানো কাপড়, অর্থ সংগ্রহের জন্য একটা সাহায্য-সমিতি গঠনের কল্পনাও মনে মনে ছকিয়া ফেলিয়াছে।

এ পাড়ার সকলকে ডাকিয়া ডাক্তার বলিল—সব আপন আপন মনিবের কাছে যা, গিয়ে বল- দুটো করে বাঁশ, দশ গণ্ডা করে খড়, পাঁচ-সাত দিনের মত খোরাকি আমাদের দিতে হবে। আর যা লাগবে—চেয়ে-চিন্তে আমি যোগাড় করছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দিতে হবে—আমি লিখে রাখছি, ও বেলায় গিয়ে সব টিপসই দিয়ে আসবি।

সকলে চুপ করিয়া রহিল, ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তাহারা ভড়কাইয়া গিয়াছে। সাহেব-সুবাকে ইহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলিয়াই জানে, কনেস্টবল দারোগার উপরওয়ালা হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তাহাদের আতঙ্ক বহুগুণ বাড়িয়া যায়। তাহার কাছে দরখাস্ত পাঠাইয়া আবার কোন্ ফ্যাসাদ বাধিবে কে জানে!

জগন বলিল—বুঝলি আমার কথা? চুপ করে রইলি যে সব!

এবার সতীশ বলিল—আজ্ঞে সায়েবের কাছে—

—হ্যাঁ, সায়েবের কাছে।

—শেষে, আবার কি-না-কি ফ্যাসাদ হবে মশায়!

—ফ্যাসাদ কিসের রে? জেলার কর্তা, প্রজার সুখ-দুঃখের ভার তাঁর ওপর। দুঃখের কথা জানালেই তাকে সাহায্য করতে হবে।

—আজ্ঞে, উ মশায়—

—উ আবার কি?

—আজ্ঞে, কনেস্টবল-দারোগা-থানা-পুলিশ টানা-হ্যাঁচড়া-কৈফেত—সে মশায় হাজার হাঙ্গামা!

ডাক্তার এবার ভীষণ চটিয়া গেল। তাহার কথায় প্রতিবাদ করিলে সে চটিয়াই যায়! তাহার উপর এই লোক-হিতৈষণা উপলক্ষ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত পরিচিত হওয়ার একটা প্রবল বাসনা তাহার ছিল। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার অনেক দিনের ; কেবলমাত্র

মান-মর্যাদা লাভের জন্যই নয়, দেশের কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার আছে। কিন্তু কঙ্কণার বাবুরাই ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত সভ্যপদগুলি দখল করিয়া রহিয়াছে। ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামগুলিই কঙ্কণার বিভিন্ন বাবুদের জমিদার। গতবার জগন ঘোষ বোর্ডের ইলেকশনে নামিয়া মাত্র তিনটি ভোট পাইয়াছিল। সরকার তরফ হইতে মনোনীত সভ্যপদগুলিও কঙ্কণার বাবুদের একচেটিয়া। সাহেব-সুবোরা উহাদিগকেই চেনে, কঙ্কণাতেই তাহারা আসে যায়, সভ্য মনোনয়নের সময়ও এই দরখাস্তগুলিই মঞ্জুর হইয়া যায়। এই কারণে এমন একটি পরহিত-ব্রতের ছুতা লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্পটি ডাক্তারের বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং পরম কাম্য। সেই সঙ্কল্প পূরণের পথে বাধা পাইয়া ডাক্তার ভীষণ চটিয়া উঠিল। বলিল—তবে মর্ গে তোরা, পচে মর্ গে। হারামজাদা মুখ্যর দল সব।

—কি, হ'ল কি ডাক্তার—বলিয়া ঠিক এই মুহূর্তটিতেই বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী পিছনের গাছপালার আড়াল অতিক্রম করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী ইহাদের এই আকস্মিক বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। এ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত কর্তব্য! সে কর্তব্য আজও তিনি যথাসাধ্য পালন করেন। ব্যবস্থাটার মধ্যে দয়ারই প্রাধান্য, কিন্তু প্রেমও খানিকটা আছে।

ডাক্তার চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—দেখুন না, বেটাদের মুখ্যমি। বলছি, ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে একটা দরখাস্ত কর্। তা, বলছে কি জানেন? বলছে,—থানা-পুলিশ-দারোগা সায়েব-সুবো—বেজায় হাঙ্গামা।

চৌধুরী বলিল, তা মিছে বলে নাই—এর জন্যে আর সায়েব-সুবো কেন ভাই? গাঁয়ের পাঁচ জনের কাছ থেকেই তো ওদের কাজ হয়ে যাবে! ধর, আমি ওদের প্রত্যেককে দু'গণ্ডা ক'রে খড় দোব, পাঁচটা বাঁশ দোব; এমনি ক'রে—

ডাক্তার আর শুনিল না, হন্ হন্ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—যাস্ বেটারা এর পর আমার কাছে। আরও কিছুদূর আসিয়া আবার দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল রে? কাল রাত্রে? চৌধুরীর কথায় সে বেজায় চটিয়া গিয়াছে।

চৌধুরী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তা দরখাস্ত করতেই বা দোষ কি বাবা সতীশ? ডাক্তার যখন বলছে। আর সায়েবের যদি দয়াই হয়—সে তো তোমাদেরই মঙ্গল! তাই বরং তোমরা যেও ডাক্তারের কাছে।

সতীশ বলিল—হাঙ্গামা কিছু হবে না তো চৌধুরী মশায়? আমাদের সেই ভয়টাই বেশী লাগছে কিনা।

—ভয় কি ? হাঙ্গামাও কিছু হবে বলে তো মনে নেয় না বাবা ! না—না—হাঙ্গামা কিছু হবে না—

অপরাহ্ণে সকলে দল বাঁধিয়া ডাক্তারের কাছে হাজির হইল। আসিল না কেবল পাতু।

ও বেলার ক্রুদ্ধ ডাক্তার এ বেলায় তাহাদের আসিতে দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিয়াছিল ; বেশ করিয়া সকলকে দেখিয়া লইয়া বলিল—পাতু কই, পাতু ?

সতীশ বলিল—পাতু আজ্ঞে আসবে না। সে মশাই গাঁয়েই থাকবে না বলছে।

—গাঁয়েই থাকবে না ? কেন, এত রাগ কেন রে ?

—সে মশায় সে-ই জানে। সে আপনার,—উ-পারে জংশনে গিয়ে থাকবে। বলে যেখানে খাটবে সেখানেই ভাত।

—দেবোত্তরের জমি ভোগ করে যে !

—জমি ছেড়ে দেবে মশায়। বলে ওতে পেটই ভরে না, তা উ কি হবে। উ-সব বড়নোকের কথা ছেড়ে দেন। পাতু বায়েন আমাদের বউনোক উকিল ব্যালেস্টারের সামিল।

—আহা তাই হোক। সে বড়নোকই হোক। তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক। দলের পিছনে ছিল দুর্গা, সে কোঁস করিয়া উঠিল। তারপর বলিল—সে যদি উঠেই যায় গাঁ থেকে, তাতে লোকের কি শুনি ? উকিল ব্যালেস্টার—সাত-সতেরো বলা ক্যানে শুনি ? সে যদি চলেই যায়—তাতে তো ভাল হবে তোদেরই। ভিক্ষের ভাগ তোদের মোটা হবে।

জগন ডাক্তার ধমক দিয়া উঠিল—থাম, থাম দুর্গা।

—ক্যানে, থামব ক্যানে ? কিসের লেগে ? এত কথা কিসের ?—বলিয়াই সে মুখ ফিরিয়াই আপনার পাড়ার দিকে পথ ধরিল।

—ওই ! এই দুর্গা, টিপ-সই দিয়ে যা !

—না—।

—ত হলে কিন্তু সরকারী টাকার কিছুই পাবি না তুই।

এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল মুখ মুচকাইয়া দুর্গা বলিল—আমি টিপ-সই দিতে আসি নাই গো। তোমার তালগাছ বিক্রি আছে শুনে এসেছিলাম কিনতে। গতর থাকতে ভিখ মাঙ্‌ব ক্যানে ? গলায় দড়ি ! সে আবার মুহূর্তে ঘুরিয়া আপন মনেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

পথে বাঁশ-জঙ্গলে ঘেরা পাল-পুকুরের কোণে আসিয়া দুর্গা দেখিল বাঁশবনের আড়ালে শ্রীহরি পাল দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গা হাসিয়া দুই হাত জড়ো করিয়া

একটা পরিমাণ ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল—টাকা চাই! এই এতগুলি! ঘর করব। বুঝেছ?

শ্রীহরি কথাটা গাহ্য করিল না, প্রশ্ন করিল—কিসের দরখাস্ত হচ্ছে রে?

—ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে। ঘর পুড়ে গিয়েছে—তাই।

শ্রীহরি শুনিবামাত্র অকারণে চমকাইয়া উঠিল, পরক্ষণেই মুখখানা ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়া চাপা গলায় বলিল,—তাই আমাকে সুবে করে দরখাস্ত করছে বুঝি শালা ডাক্তার? শালাকে—

দুর্গার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে শ্রীহরিকে চেনে। ছিরু পাল ছোট খোকার মত দেয়ালা করিয়া অকারণে চমকিয়া উঠে না। স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছিরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই অপরাধীকে চিনিয়া ফেলিল এবং বলিল,— হ্যাঁ গো, তুমিই যে দিয়েছ আগুন!

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল,—কে বললে দিয়েছি। তুই দেখেছিস? সে আর কথাটা দুর্গার কাছে গোপন করিতে চাহিল না।

দুর্গা বলিল,—ঠাকুর ঘরে কে রে? না, আমি তো কলা খাই নাই। সেই বৃত্তান্ত। হ্যাঁ দেখেছি বৈকি আমি।

—চুপ কর, এতগুলো টাকাই দেব আমি।

দুর্গা আর উত্তর করিল না। ঠোঁট বাঁকাইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে শ্রীহরির দিকে মুহূর্তের জন্য চাহিয়া আপন পথে চলিয়া গেল। দন্তহীন মুখে হাসিয়া ছিরু তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আট

দুর্গা বেশ সুশ্রী সুগঠন মেয়ে। তাহার দেহবর্ণ পর্যন্ত গৌর, যাহা তাহাদের স্বজাতির পক্ষে যেমন দুর্লভ তেমনি আকস্মিক। ইহার উপর দুর্গার রূপের মধ্যেও এমন একটা বিস্ময়কর মাদকতা আছে, যাহা সাধারণ মানুষের মনকে মুগ্ধ করে মত্ত করে—দুর্নিবার দুর্ভাবে কাছে টানে।

পাতু নিজেই দ্বারকা চৌধুরীকে বলিয়াছিল—আমার মা-হারামজাদীকে তো জানেন? হারামজাদীর স্বভাব আর গেল না।

দুর্গার রূপের আকস্মিকতা পাতুর মায়ের সেই-স্বভাবের জীবন্ত প্রমাণ।

এই স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই! অল্পস্বল্প উচ্ছৃঙ্খলতা স্বামীরা পর্যন্ত দেখিয়াও দেখে না। বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের সচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে তাহা হইলে তো তাহারা বোবা হইয়া যায়। কিন্তু

দুর্গার উচ্ছৃঙ্খলতা সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে! সে দুরন্ত স্বেচ্ছাচারিণী; ঊর্ধ্বে বা অধঃলোকের কোন সীমাকেই অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিধা নাই। নিশীথ রাত্রে সে কঙ্কণার জমিদারের প্রমোদভবনে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে সে জানে; লোকে বলে দারোগা, হাকিম পর্যন্ত তাহার অপরিচিত নয়। সেদিন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মুখার্জী সাহেবের সহিত সে গভীর রাত্রে পরিচয় করিয়া আসিয়াছে, দফাদার শরীর রক্ষীর মত সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। দুর্গা ইহাতে অহঙ্কার বোধ করে, নিজেকে স্বজাতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে; নিজের কলঙ্ক সে গোপন করে না। এ স্বভাবের জন্য লোকে দায়ী করে তাহার মা নাকি কন্যাকে স্বামী পরিত্যাগ করাইয়া এই পথ দেখাইয়া দিয়েছে! কিন্তু দায়ী তাহার মা নয়। তাহার বিবাহ হইয়াছিল কঙ্কণায়। দুর্গার শাশুড়ী কঙ্কণার এক বাবুর বাড়ীতে ঝাড়ুদারণীর কাজ করিত। একদিন শাশুড়ীর অসুখ করিয়াছিল—দুর্গা গিয়াছিল শাশুড়ীর কাজে। বাবুর বাড়ীর চাকরটা সকল কাজের শেষে তাহাকে ধমক দিয়া বাবুর বাগান-ঝাঁট দিবার জন্য একটা নির্জন ঘরে ঢুকাইয়া দিয়াছিল। ঘরটা কিন্তু নির্জন ছিল না। জনের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং গৃহস্বামী বাজু। সন্ত্রস্ত হইয়া দুর্গা ঘোমটা টানিয়া দরজার দিকে ফিরিল, কিন্তু এ কি? এ যে বাহির হইতে দরজা কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ঘণ্টাখানেক পরে সে কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা পাঁচ টাকার একখানি নোট লইয়া বাড়ী ফিরিল। আতঙ্কে, অশান্তিতে ও গ্লানিতে এবং সেই সঙ্গে বাবুর দুর্লভ অনুগ্রহ ও এই অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে—পথ ভুল করিয়া, সেই পথে পথেই সে পলাইয়া আসিয়াছিল আপন মায়ের কাছে। কারণ সে বাবুর কাছে শুনিয়াছিল এই যোগসাজশটি তাহার শাশুড়ীর। সব শুনিয়া মায়ের চোখেই বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; একটা উজ্জ্বল আলোকিত পথ সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সেই পথই সে কন্যাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, যাক, আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সেই পথেই আলাপ হইয়াছে ছিরু পালের সঙ্গে।

ছিরু পালের সহিত দুর্গার আলাপ অনেক দিনের, কিন্তু সম্বন্ধটা একান্তভাবে দেওয়া নেওয়ার সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহার প্রতি এতটুকু কোমলতা কোনদিন তাহার ছিল না। আজ এই নূতন আবিষ্কারে তাহার প্রতি দুর্গার দারুণ ঘৃণা ও আক্রোশ জন্মিয়া গেল। পাতুর সহিত তাহার যতই বিরোধ থাক, জাতিজ্ঞাতিদের যতই সে হীন ভাবুক—আজ তাহাদের জন্য সে মমতাই অনুভব

করিল। সারাপথ সে কেবলি ভাবিতে লাগিল—ছিরু পালের মদের সঙ্গে গরুমারা-বিষ মিশাইয়া দিলে কেমন হয় ?

—ডাক্তার কি বললে, গাছ বেচবে ?—প্রশ্নটা করিল দুর্গার মা। চিন্তা করিতে করিতে দুর্গা কখন যে আসিয়া বাড়ী পৌছিয়াছে—খেয়াল ছিল না।

সচকিত হইয়া দুর্গা উত্তর দিল—না।

—বেচবে না ?

—জিজ্ঞাসা করি নাই।

—মরণ! গেলি ক্যানে তবে ঢং করে ?

দুর্গা একবার কেবল তির্যক তীব্র দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল, কথার কোন জবাব দিল না। হয়তো কোন প্রয়োজন বোধ করিল না।

কন্যার দেহবিক্রয়ের অর্থে যে মা বাঁচিয়া থাকে তাহার কাছে এ তীব্র দৃষ্টির শাসন অলঙ্ঘনীয়! দুর্গার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া মা সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া গেল ; কিছুক্ষণ পর আবার বলিল—হাম্‌দু স্যাখ পাইকার এসেছিল।

দুর্গা এবারও কথার উত্তর দিল না।

মা আবার বলিল—আবার আসবে, ধর্মরাজতলায় পাড়ার লোকের সঙ্গে কথা কইছে।

দুর্গা এবার বলিল—ক্যানে ? কি দরকার তার ? আমি বেচব না গরু ছাগল। দুর্গার একপাল ছাগল আছে, কয়েকটা গাই এবং একটা বলদ-বাছুরও আছে!

হামদু সেখ পাইকার গরু-বাছুর কেনা-বেচা করিয়া থাকে। সুতরাং অগ্নি-কাণ্ডের খবর পাইয়া সেখ নিজেই ছুটিয়া এ-পাড়ায় আসিয়াছে। এখন এই পাড়ায় অনেকে ছাগল-গরু বেচিবে। এ পাড়ায় সে ছাগল-গরু কেনে ; প্রয়োজন হইলে চার আনা আট আনা হইতে দু'চার টাকা পর্যন্ত অগ্রিমও দেয়। পরে ছাগল-গরু লইয়া টাকাটা সুদ সমেত শোধ লইয়া থাকে। আজও সে আসিয়াছে ছাগল-গরু কিনিতে, দু'একজনকে অগ্রিমও দিবে, এত বড় বিপদে এই দারুন প্রয়োজনের সময় ইহাদের জন্য হাম্‌দু কর্জ করিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছে। দুর্গার পালিত বলদী-বাছুরটার জন্য হাম্‌দু অনেকদিন হইতে তোষামোদ করিতেছে কিন্তু দুর্গা বেচে নাই। আজ সে আবার আসিয়াছে এবং দুর্গার মাকে গোপনে চার আনা পয়সাও দিয়াছে। সওদা হইলে, পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া আরও চার আনা দিবার প্রতিশ্রুতিও হাম্‌দু দিয়াছে। মেয়ের কথাটা মায়ের মোটেই ভাল লাগিল না—খানিকটা ঝাঁজ দিয়া বলিল—বেচবি না তো, ঘর কিসে হবে শুনি ?

—তোর বাবা টাকা দেবে বুঝলি হারামজাদী। আমি আমার শাখাবাঁধা

বেচব। দুর্গা দুই চারিখানা সোনার গহনাও গড়াইয়াছে; অত্যন্ত সামান্য অবশ্য কিন্তু তাহাই ইহাদের পক্ষে স্বপ্ন সাফল্যের কথা।

দুর্গার মা এবার বিস্ফোরক বস্তুর মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু দুর্গা তাহাতে দমিবার মেয়ে নয়, সে জিজ্ঞাসা করিল—ক'আনা নিয়েছিস হাম্‌দু স্যাখের কাছে? আমি কিছু বুঝি না মনে করেছিস! ধান-চালের ভাত আমি খাই না, লয়?

বিস্ফোরণের মুখেই দুর্গার মা প্রচণ্ড বর্ষণে যেন ভিজিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল, প্যাটের মেয়ে হয়ে তু এত বড় কথাটা আমাকে বললি!

দুর্গা গ্রাহ্য করিল না, বলিল—থাক, ঢের হয়েছে। এখন দাদা কোথায় গেল বলতে পারিস? বউটাই বা গেল কোথায়?

মা আপন মনেই বিলাপ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, দুর্গার প্রশ্নের উত্তর তাহারই মধ্যে ছিল—গভ্যে আমার আগুন ধরে দিতে হয় রে! নেকনে আমার পাথর মারতে হয় রে! জ্যান্তে আমায় দগ্ধে দগ্ধে মারলে রে! যেমন বেটা তেমনি বিটী রে। বেটী বলছে চোর। আর বেটা হল দ্যাশের বার! দ্যাশের লোক তালপাতা কেটে আপন আপন ঘর ঢাকলে, আর আমার বেটা গাঁ ছেড়ে চললো। মরুক, মরুক ড্যাকরা—এই আম্রাণের শীতে সান্নিপাতিকে মরুক!

এবার অত্যন্ত রূঢ়স্বরে দুর্গা বলিল—বলি, রান্না-বান্না করবি, না, প্যান-প্যান করে কাঁদবি? পিণ্ডি গিলতে হবে না?

—না, মা রে; আর পিণ্ডি গিলবি না, মা রে; তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দোব রে। দুর্গার মা বিনাইয়া বিনাইয়া জবাব দিল।

দুর্গা মুখে কিছু বলিল না, উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে একগাছা গরুবাঁধ দড়ি লইয়া মায়ের কোলের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, লে, তাই দেগা গলায়. যা! তারপর সে পাড়ার মধ্যে চলিয়া গেল আগুনের সন্ধানে।

হরিজন-পল্লীর মজলিসের স্থান—ওই ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুলগাছতলা। বহু-দিনের প্রাচীন বকুলগাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল; কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে. কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের আশ্চর্য মহিমা! এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন্ গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া; মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়; বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন। আশপাশের ছায়াবৃত স্থানটি বারোমাস পরিচ্ছন্নতায় তক্-তক্ করে।

পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায় ; মাড়ুলীগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া—গোটা স্থানটাই নিকানো হয়। হাম্‌দু সেখ সেইখানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরু-ছাগল সওদার দরদস্তুর করিতেছিল। পাঁচ-সাতটা ছাগল, দুইটা গরু অদূরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ; সেগুলি কেনা হইয়া গিয়াছে।

পুরুষেরা সকলেই গিয়াছে জগন ডাক্তারের ওখানে। হাম্‌দুর কারবার চলিতেছে মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা কেহ মাসী, কেহ পিসী, কেহ দিদি, কেহ চাচী, কেহ বা ভাবী! হাম্‌দু একটা খাসা লইয়া এক বাউড়ী ভাবীর সঙ্গে দর করিতেছিল—ইয়ার গায়ে কি আছে, তুই বল ভাবী, ছেরেফ খালটা আর হাড় ক'খানা। পাঁচ স্যার গোস্তও হবে না ইয়াতে। জোর স্যার তিনেক হবে। ইয়ার দাম পাঁচ সিকা বলেছি—কি অন্যায় বলেছি বল ? পাঁচজনা তো রয়েছে—বলুক পাঁচজনায়। আর এই অসময়ে লিবেই বা কে বল ? গরজ এখন তুর, না, গরজ পরের, তু বুঝ কেনে!—বলিতে বলিতেই সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—ও দুগ্‌গা দিদি, শুন্ গো শুন্। তোর বাড়ী পাঁচবার গেলাম। শুন্—শুন্!

দুর্গা আগুনের সন্ধানেই পাড়ায় বাহির হইয়াছিল, সে দূর হইতেই বলিল—বেচব না আমি।

—আরে না বেচিস, শুন্—শুন্। তুকে বেচতে আমি বলি নাই।

—কি বলছ বল ?—দুর্গা আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

—আরে বাপ রে! দিদি যে একেরারে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আলি গো।

—তাই বটে। ফিরে গিয়ে আমাকে রাঁধতে হবে। কি বলছ, বলছ, বল ?

—ভাল কথাই বলছি ভাই ; বলছি ঘরে টিন দিবি ? সন্ধানে আমার সস্তায় টিন আছে!

—টিন ?

—হ্যাঁ গো! একেবারে লতুন। কলওয়ালারা বেচবে, কিনবি ? একেবারে নিশ্চিন্তি! দেখ্। গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।

দুর্গা কয়েক মুহূর্ত ভাবিল। মনশ্চক্ষে দেখিল—তাহার ঘরের উপর টিনের আচ্ছাদন—রোদের ছটায় রূপার পাতের মত ঝকমক করিতেছে। কিন্তু পর-মুহূর্তে সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—উঁহু! না।

—তুর টাকা না থাকে আমাকে ইয়ার পরে দিস। ছ'মাস, এক বছর পরে দিস।

দুর্গা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু! ও বলদের নামে তুমি হাত ধোও,

হামৃহ ভাই। ও আমি এখন দু'বছর বেচব না।—বলিয়া দেহের একটা দোলা দিয়া চলিয়া গেল।

আগুন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া দুর্গা দেখিল—দড়িগাছাটা সেইখানেই পড়িয়া আছে, মা সেটা স্পর্শ করে নাই। উনানে আগুন দিয়া এখন সে পাতুর সঙ্গে বচসায় নিযুক্ত। বড় বড় দুই বোঝা তালপাতা উঠানে ফেলিয়া পাতু হাঁপাইতেছে এবং মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ বাঘের মত চাহিয়া আছে। পাতুর বউ কাঠকুটা কুড়াইয়া জড় করিতেছে, রান্না চড়াইবে।

দুর্গা বিনা ভূমিকায় বলিল,—বউ, রান্না আর করতে হবে না। আমিই রাঁধছি, একসঙ্গেই খাব সব।

পাতু দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ দুগ্‌গা দেখ! মায়ের মুখ দেখ! যা মন চায় তাই বলছে! ভাল হবে না কিন্তুক!

—তা আমিই বা কি করব বল্? এতক্ষণ তো আমার সঙ্গেই লেগেছিল। মা যে! গভ্যে ধরেছে মাথা কিনেছে! তাড়িয়ে দিতেও নাই, খুন করতেও নাই—মারধর করলেও পাপ।

—একশো বার। তোর কথার কাটান নাই, কিন্তুক ই গাঁয়ে থাকব কি সুখে—তুই বল দেখি?

—সত্যিই তু উঠে যাবি নাকি? হ্যাঁ দাদা? ভিটে ছেড়ে উঠে যাবি? পাতু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—তাতেই তো আবার এই অবেলাতে তালপাতা কেটে আনলাম দুগ্‌গা! নইলে জংশনে কলে কাম-কাজ, থাকবার ঘর সব ঠিক করে এসেছিলাম দুপুর বেলাতে।—

দু'হাত ছাঁদাছাঁদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পাতু মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল, ওঠ্। ওই দেখ্ ক'খানা লম্বা বাঁশ রয়েছে আমার, ওই ক'খানা চাপিয়ে তালপাতা দিয়ে ঘরখানা ঢাক। পিতি-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ কখনও যায় নাকি? তুই চালে উঠ, আমি আর বউ দু'জনাতে তুলে দিচ্ছি সব।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাতু উঠিল। দুর্গা কাপড়ের আঁচল কোমরে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিয়া বলিল, ওই গাঁদা সতীশ। সতীশ বাউড়ী রে! মিনসে জগন ডাক্তারকে বলছে—পাতু বায়েন বড় নোক, ব্যালেস্টার, উকীল! তা আমি বললাম,—আহা, তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক! বলে—বড় নোক; গাঁ ছেড়ে উঠে চলে যাবে। ওরা যায় তো, তোদিগে ভিটে দানপত্তর নিখে দিয়ে যাবে! তোরা ভোগ করবি!

বিড়ালীর মত হৃষ্টপুষ্ট পাতুর বউটা খুব খাটিতে পারে, খাটো পায়ে দ্রুতগতিতে

লাটিমের মত পাক দিয়া ফেরে। সে ইহারই মধ্যে বাঁশগুলাকে টানিয়া আনিয়া উঠানে ফেলিয়াছে।

নয়

গোটা পাড়াটা পোড়াইয়া দিবার অভিপ্রায় শ্রীহরির ছিল না। কিন্তু যখন পুড়িয়া গেলই, তখন তাহাতেও বিশেষ আফসোস তাহার হইল না। পুড়িয়াছে বেশ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে এমন ধারায় বিপর্যয় ঘটিলে তবে ছোটলোকের দল সায়েস্তা থাকে ; ক্রমশঃ বেটাদের আস্পর্ধা বাড়িয়া চলিতেছিল। তাহার উপর দেবু ঘোষ ও জগন ডাক্তারের উস্কানিতে তাহারা লাই পাইতেছিল। হাতের মারে কিছু হয় না, ভাতের মার—অর্থাৎ ভাতে বঞ্চিত করিতে পারিলেই মানুষ জব্দ হয়। বাঘ যে বাঘ তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া অনাহারে রাখিয়া মানুষ তাহাকে পোষ মানায়।

এ সব বিষয়ে তাহার গুরু ছিল দুর্গাপুরের স্বনামধন্য ত্রিপুরা সিং। দুর্গাপুর এখান হইতে ক্রোশ দশেক দূর। শ্রীহরির মাতামহের বাড়ী ওই দুর্গাপুর। তাহার মাতামহ ত্রিপুরা সিংয়ের চাষবাসের তদ্বিরকারক ছিল। বাল্যকালে শ্রীহরি মাতামহের ওখানে যখন যাইত, তখন সে ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়াছে। লম্বা চওড়া দশাশয়ী চেহারা। জাতিতে রাজপুত! প্রথম বয়সে ত্রিপুরা সিং সামান্য ব্যক্তি ছিল, সম্পত্তি ছিল মাত্র কয়েক বিঘা জমি। সেই জমিতে সে পরিশ্রম করিত অসুরের মত। আর স্থানীয় জমিদারের বাড়ীতে লগদীর কাজ করিত। আরও করিত তামাকের ব্যবসা। হাতে লাঠি ও মাথায় তামাকের বোঝা লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ফেরি করিয়া বেড়াইত ; ক্রমে শুরু করে মহাজনী। সেই মহাজনী হইতে প্রথমত বিশিষ্ট জোতদার, অবশেষে তাহার মনিব জমিদারের জমিদারির খানিকটা কিনিয়া ছোটখাটো জমিদার পর্যন্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা সিংয়ের দাড়ি ছিল, বড় শখের দাড়ি. সেই দাড়িতে গালপাট্টা বাঁধিয়া গোঁফে পাক দিতে দিতে সে বলিত, শ্রীহরি নিজের কানে শুনিয়াছে,—সেই ছেলেবেলায়—'এহি গাঁও হমি তিন-তিনবার পুড়াইয়েসি, তব না ই বেটালোক হমাকে আমল দিল!'

হা-হা করিয়া হাসিয়া সিং বলিত—'এক এক দফে ঘর পুড়ল আর বেটা লোক টাকা ধার নিল। যে বেটা প্রথম দফে কায়দা হইল নাই—সে দু' দফে হইল, দু' দফেও যারা আইল না তারা আইল তিন দফের দফে। পাঁওয়ের পর গড়িয়ে পড়ল।' এই সব কথা বলিতে তাহার এতটুকু দ্বিধা হইত না। বলিত —বড় বড় জমিদারের কুষ্ঠী ঠিকুজী নিয়ে এস, দেখবে সবাই ওই করেছে। আমার ঠাকুরদা ছিল রত্নগড়ের জমিদার বাড়ীর পোষা ডাকাত। বাবুদের

ডাকাতি ছিল ব্যবসা। সীতানগরের চাটুজ্জে বাবুরা সেদিন পর্যন্ত ডাকাতির বামাল সামাল দিয়েছে।

সিং নিজে যে কথাগুলি বলে নাই অথবা সিংয়ের মুখ হইতে ইতিহাসের যে অংশ শুনিবার শ্রীহরির সুযোগ-সৌভাগ্য ঘটে নাই, সে অংশ শ্রীহরিকে শুনাইয়াছে তাহার মাতামহ। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ নিজের নাতিকে সেই সব অতীতের কথা বলিত। ত্রিপুরা সিংয়ের শক্তির কাহিনী, সে একেবারে রূপকথার মত ;—ত্রিপুরা সিংয়ের জমির পাশেই ছিল সে গ্রামের বহুবল্লভ পালের একখানা আউয়ল জমি—মাত্র কাঠাদশেক তাহার পরিমাণ। সিং ওই জমিটুকুর জন্য একশো টাকা পর্যন্ত দাম দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বহুবল্লভের দুর্মতি ও অতিরিক্ত মায়া। সে কিছুতেই নেয় নাই! শেষ বর্ষার সময় একদিন রাত্রে সিং নিজে একা কোদাল চালাইয়া দুইখানা জমিকে কাটিয়া আকারে-প্রকারে এমন এক অখণ্ড বস্তু করিয়া তুলিল যে, পরদিন বহুবল্লভ নিজেই ধরিতে পারিল না, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কোথায় কোন্‌খানে ছিল তাহার জমির সীমানার চারিটি কোণ। বহুবল্লভ মামলা করিয়াছিল। কিন্তু মামলাতে বহুবল্লভ তো পরাজিত হইলই, উপরন্তু কয়েকদিন পর বহুবল্লভের তরুণী-পত্নী ঘাটে জল আনিতে গিয়া আর ফিরিল না। ঘাটের পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে কে বা কাহারা তাহাকে মুখে কাপড় বাঁধিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃদ্ধ চুপি চুপি বলিত—মেয়েটা এখন বুড়ো হয়েছে, সিংজীর বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। একটা নয়, এমন মেয়ে সিংজীর বাড়ীতে পাঁচ-সাতটা।

ত্রিপুরা সিংয়ের বিষয়বুদ্ধি, দূরদৃষ্টির বিষয়েও শ্রীহরির মাতামহের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। বলিত—সিংজী লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, কি বিষয়বুদ্ধি! জমিদারের বাড়ীতে লগ্দীগিরি করতে করতেই বুঝেছিল—এ বাড়ীর আর প্রতুল নাই। লাটের খাজনা মহল থেকে আসে ; কিন্তু খাজনা দাখিলের সময় আর টাকা থাকে না। সিংজী তখন নিজে টাকা ধার দিতে লাগল। যখন যা দরকার হয়েছে, 'না' বলে নাই, দিয়েছে। তারপর সুদে-আসলে ধার হাণ্ডনোট পালটে পালটে শেষ-মেশ নিজের কাছে না থাকলে আট আনা সুদে কর্জ করে এনে এক টাকা সুদে বাবুদিগে চেপে ধরলে টাকার লেগে, তখন বাবুদের জমিদারিই ঘরে ঢুকল। ক্ষ্যাণজন্মা লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ! বলিয়া সে তাহার মনিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত।

শ্রীহরির বাপ ছিল কৃতী-চাষী। দৈহিক পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পতিত জমি ভাঙিয়া উৎকৃষ্ট জমি তৈয়ারী করিয়াছিল। শ্রম ও সঞ্চয় করিয়া বাড়ীর উঠানটি ধানের মরাইয়ে মরাইয়ে একটি মনোরম শ্রীভবনে পরিণত করিয়া

তুলিয়াছিল। বাপের মৃত্যুর পর শ্রীহরি যখন এই সম্পদ হাতে পাইল তখন তাহার মনে পড়িল মাতামহের স্বনামধন্য মনিব ত্রিপুরা সিংকে। মনে মনে তাহাকেই আদর্শ করিয়া সে জীবন-পথে যাত্রা শুরু করিল।

পরিশ্রমে তাহার এতটুকু কার্পণ্য নাই; তাহার বিনিময়ে ফসলও হয় প্রচুর। সেই ফসল সে বাপের মত কেবল বাঁধিয়াই রাখে না, সুদে ধার দেয়। শতকরা পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ পর্যন্ত সুদে ধানের কারবার। এক মণ ধান ধার দিলে বৎসরান্তে এক মণ দশ সের বা দেড় মণ হইয়া সে ধান ফিরিয়া আসে। অবশ্য এটা শ্রীহরির জুলুম নয়। সুদের এই হারই দেশ-প্রচলিত। প্রচলনের অভ্যাসে খাতকও এ সুদকে অতিরিক্ত মনে করে না বরং অসময়ে অন্ন দেয় বলিয়া মহাজন তাহার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র!

শ্রীহরিকেও লোকে খাতির করে না এমন নয়; কিন্তু শ্রীহরি তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না। সে অনুভব করে, লোকে ওই মৌখিক শ্রদ্ধার অন্তরালে তাহাকে ঈর্ষা করে, তাহার ধ্বংস কামনা করে। তাই এক এক সময় তাহার মনে হয়, সমস্ত গ্রামখানাতেই সে আগুন লাগাইয়া লোকগুলাকে সর্বহারা করিয়া দেয়।

পথ চলিতে চলিতে জগন ডাক্তারের মত এবং অনিরুদ্ধের মত শত্রুর ঘর নজর আসিলেই বিদ্যুচ্চমকের মত তাহার ওই দুরন্ত অবাধ্য ইচ্ছাটা অন্তরে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ত্রিপুরা সিংহের মত দুর্দান্ত সাহস তাহার নাই। সে আমলও যে আর নাই! ত্রিপুরা সিং যে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারিত, আমলের চাপে শ্রীহরিকে সে ইচ্ছা দমন করিতে হয়। তাছাড়া শ্রীহরির অন্যায়-বোধ—কালের পার্থক্যে ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে কিছু বেশী।

এই অন্যায় বোধ ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে তাহার বেশী বলিয়াই সে বার বার আপনার মনেই গতরাত্রের কাণ্ডটার জন্য নানা সাফাই গাহিতেছিল। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে অকস্মাৎ উঠিল। ওই ভস্মীভূত পাড়াটার দিকেই সে চলিল। যাইতে যাইতেও বার কয়েক সে ফিরিল। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। অবশেষে সে নিজের রাখালটার বাড়ীটাকেই একমাত্র গন্তব্যস্থল স্থির করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার বাড়ীর রাখাল, সে তাহার চাকর, এ বিপদে তাহার তল্লাস করা যে অবশ্য কর্তব্য। কার সাধ্য তাহাকে কিছু বলে, আপনার মনেই সে প্রকাশ্যভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাও!

বোধ করি যে তাহাকে কিছু বলিবে—তাহাকে সে পূর্ব হইতেই ধমকটা দিয়া রাখিল। আসলে সে তাহার মনেই ওই অবাধ্য স্মৃতি উদ্ভূত সঙ্কোচকে একটা ধমক দিল।

রাখালটা মনিবকে যমের মত ভয় করে। ছিরু আসিয়া দাঁড়াইতেই সে ভাবিল আজিকার গরহাজিরের জন্যই পাল তাহার ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। ছেলেটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ঘর পুড়ে গেইছে মশাই—তাতেই—

পুড়িয়া যাওয়ার পর এই গরীব পাড়াটার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রীহরি মনে মনে খানিকটা লজ্জাবোধ না করিয়া পরিল না। সে সস্নেহে ছেলেটাকে বলিল—তা কাঁদিস কেনে? দৈবের ওপর তো হাত নাই। কি কর্‌বি বল? কেউ তো আর লাগিয়ে দেয় নাই।

রাখালটার বাপ বলিল—তা কে আর দেবে মশাই? কেনেই বা দেবে? আমরা কার কি করেছি বলেন যে ঘরে আগুন দেবে!

শ্রীহরি চুপ করিয়াই পোড়া ঘরগুলার দিকেই চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের তলার মাটি যেন সরিয়া যাইতেছে।

রাখালটার বাপ আবার বলিল—ছোটনোকদের কাণ্ড, শুকনো পাতাতে আগুন ধরে গেইছে আর কি! আর তা ছাড়া মশাই, বিধেতাই আমাদের কপালে আগুন লাগিয়ে রেখেছে।

শুষ্ককণ্ঠে শ্রীহরি বলিল, এক কাজ কর। যা খড় লাগে আমার বাড়ী থেকে নিয়ে আয়। বাঁশ কাঠ যা লাগে নিবি আমার কাছে; ঘর তুলে ফেল।—তারপর রাখালটার দিকে চাহিয়া বলিল—বাড়ীতে গিয়ে চাল নিয়ে আয় দশ সের। কাল বরং ধান নিবি, বুঝলি!

রাখালটার বাপ এবার শ্রীহরির পায়ে একরকম গড়াইয়া পড়িল।

ইহারই মধ্যে আরও জন দুয়েক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একজন হাত জোড় করিয়া বলিল—আমাদিগে যদি কিছু করে ধান দিতেন ঘোষ মশায়।

—ধান?

—আজ্ঞে, তা না হলে তো উপোস করে মরতে হবে মশায়।

—আচ্ছা, পাঁচ সের ক'রে চাল আজ ঘর-পিছু আমি দেব। সে আর শোধ দিতে হবে না। আর ধানও অল্প অল্প দোব কাল! কাল বার আছে ধানের! আর—

—আজ্ঞে—

—দশ গণ্ডা করে খড়ও আমি দোব প্রত্যেককে। বলে দিস পাড়াতে।

—জয় হবে মশায়, আপনার জয়জয়কার হবে। ধান-পুতে লক্ষীলাভ হবে আপনার।

শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া লোকটা ছুটিয়া চলিয়া গেল পাড়ার

ভিতর। সংবাদটা সে প্রত্যেকের ঘরে প্রচার করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলি যেমন শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া গেল। শ্রীহরিও তেমনি অভিভূত হইয়া গেল ইহাদের কৃতজ্ঞতার সরল অকপট গদগদ প্রকাশে। এক মুহূর্তে ও সামান্য দানের ভারে মানুষগুলি পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া শ্রীহরির মনে হইল—যে-অপরাধ সে গতরাত্রে করিয়াছে, সে অপরাধ যেন উহাদেরই ওই কৃতজ্ঞতায় সজল চোখের অশ্রু-প্রবাহে উহারা ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিতেছে। ভাবাবেগে শ্রীহরিরও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল ; সে বলিল,—যাস, সব যাস। চাল-খড়-ধান নিয়ে আসবি।

অনেকখানি লঘু পবিত্র চিত্ত লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে অনেক কল্পনা করিল।

গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে লোকের কষ্টের আর অবধি থাকে না। পানীয় জলের জন্য মেয়েদের ওই নদীর ঘাট পর্যন্ত যাইতে হয়। যাহারা ইজ্জতের জন্য যায় না তাহারা খায় পচা পুকুরের দুর্গন্ধময় কাদা-ঘোলা জল। এবার একটা কুয়া সে কাটাইয়া দিবে।

গ্রামের পাঠশালায় আসবাবের জন্য সেবার লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাতে পাঁচটা টাকাও সংগৃহীত হয় নাই ; সে পঞ্চাশ টাকা পাঠশালার আসবাবের জন্য দান করিবে।

আরও অনেক কিছু। গ্রামের পথটা কাঁকর ঢালিয়া পাকা করিয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপটার মাটির মেঝেটা বাঁধাইয়া দিবে : সিমেন্ট-করা মেঝের উপর খুদিয়া লিখিয়া দিবে—শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীহরি ঘোষ। যেমন কঙ্কণার চণ্ডীতলায় মার্বেল-বাঁধানো বারান্দার মেঝের উপর সাদা মার্বেলের মধ্যে কালো হরফে লেখা আছে কঙ্কণার বাবুদের নাম।

সে কল্পনা করে, অতঃপর গ্রামের লোক সসম্ভ্রমে সকৃতজ্ঞচিত্তে মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া নমস্কার করিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

আজ নূতন একটা অভিজ্ঞতা লাভের ফলে শ্রীহরির অন্তরে এক নূতন মন কোন্ অজ্ঞাত-নিক্ষিপ্ত বীজের অঙ্কুর-শীর্ষের মত মাথা ঠেলিয়া জাগিয়া উঠিল। কল্পনা করিতে করিতে সে গ্রামের মাঠে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। যখন বাড়ী ফিরিল তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই দেখিল, বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে ওই দরিদ্রের দলটি নিতান্ত অপরাধীর মত। আর তাহার মা নির্মম কটু ভাষায় গালিগালাজ করিতেছে। শুধু ওই হতভাগ্যদিগকেই নয়—শ্রীহরির উপরেও গালিগালাজ বর্ষণ করিতে মায়ের কার্পণ্য ছিল না। ক্রুদ্ধচিত্তেই

সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। মা তাহাকে দেখিয়া দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল—'ওরে ও হতচ্ছাড়া বাঁশবুকো, বলি দাতাকর্ণ-সেন হলি কবে থেকে? ওই যে পঙ্গপাল এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে তুই ডেকে এনেছিস—'

শ্রীহরির নগ্ন-প্রকৃতির একটা অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গি আছে; তখন সে চীৎকার করে না, নীরবে ভয়াবহ মুখভঙ্গি লইয়া অতি স্থিরভাবে মানুষকে বা পশুকে নির্যাতন করে—যেমন শীতের স্বচ্ছ জল মানুষের হাত-পা হিম করিয়া জমাইয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে! সেই ভঙ্গিতে সে অগ্রসর হইয়া আসিতেই তাহার মা দ্রুতপদে খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া গেল।

শ্রীহরি নিজেই নীরবে প্রত্যেককে চাল দিয়া বলিল—খড় আর ধান কাল নিবি সব। সর্বশেষে বলিল—মায়ের কথায় তোরা কিছু মনে করিস না যেন, বুঝলি?

তাহার পায়ের ধুলা লইয়া একজন বলিল,—আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই কি পারি? তারপর রহস্য করিয়া ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই সাধ্যমত বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বলিল,—মা আমাদের ক্ষ্যাপা মা গো! রাগলে আর রক্ষে নাই।

শ্রীহরি উত্তর দিল না। সে আপন মনে চিন্তা করিতেছিলে, ওই মা হারামজাদীই কিছু করিতে দিবে না। তাহার আজিকার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে এত টাকা খরচ করিলে ওই হারামজাদী নিশ্চয়ই একটা বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিবে। আজ পর্যন্ত বড় কাঠের সিন্দুকটার চাবী ওই বেটী বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। টাকা বাহির করিতে গেলেই বিপদ বাধিবে। টাকার জন্য অবশ্য কোন ভাবনা নাই; কয়েকটা বড় খাতকের কাছে সুদ আদায় করিলেই ওই কাজ কয়টা হইয়া যাইবে।

হ্যাঁ, তাই সে করিবে।

আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি যেন বটবৃক্ষের অতিক্ষুদ্র একটি বীজকণার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেই এক কণার মধ্যেই লুকাইয়া আছে এক বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার প্রারম্ভেই শ্রীহরি যেন তাহার এতকালের বদ্ধ-অন্ধকার দুর্গন্ধময় জীবন-সৌধের প্রতিটি কক্ষে—দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে—প্রতিটি সন্ধিতে এক বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করিতেছে। সৌধখানি বোধ হয় ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে।

দশ

ভূপাল চৌকিদার ইউনিয়ন বোর্ডের মোহর-দেওয়া একখানা নোটিশ হাতে করিয়া চলিয়াছিল, আগে আগে ডুগ ডুগ শব্দে ঢোল বাজাইয়া চলিতেছিল পাতু।

'এক সপ্তাহের মধ্যে আষাঢ় আশ্বিন—দুই কিস্তির বাকী ট্যাক্স আদায় না দিলে জরিমানা সমেত দেড়গুণ ট্যাক্স অস্থাবর ক্রোক করিয়া আদায় করা হইবেক।'

জগন ডাক্তার একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

—কি? কি? 'কি করা হইবেক'?

ভূপাল সভয়ে হাতের নোটিশখানি আগাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে, এই দেখেন কেনে।

জগন কঠিন দৃষ্টিতে ভূপালের দিকে চাহিয়া বলিল,—সরকারী উর্দি গায়ে দিয়ে মাথা নোয়াতেও ভুলে গেলি যে।

অপ্রস্তুত হইয়া ভূপাল তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পায়ের ধুলা কপালে মুখে লইয়া বলিল, আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই ভোলে! আপনকারাই আমাদের মা-বাপ।

পাতু বলিল—লিচ্চয়!

জগন নোটিশখানা দেখিয়া একেবারে গর্জন করিয়া উঠিল—এরা কি নাকি? এ সব কি পৈত্রিক জমিদারী পেয়েছে সব! লোকের মাঠের ধান মাঠে রইল, বাবুরা একেবারে অস্থাবরের নোটিশ বার করে দিলেন! মানুষকে উৎখাত করে ট্যাক্স আদায় করতে বলেছে গবর্ণমেণ্ট? আজই দরখাস্ত করব আমি।

ভূপাল হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা চাকর, আমাদিগে যেমন বলেছে তেমনি—

—তোদের দোষ কি? তোরা কি করবি? তোরা ঢোল দিয়ে যা।

পাতু ঢোলটায় গোটাকয়েক কাটির আঘাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে ডাক্তার-বাবু, 'লবান্ন' হবে বাইশে তারিখ।

—নবান্ন? বাইশে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর সব লোককে বল গিয়ে! গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি নবান্ন করব—আমার যেদিন খুশী।

পাতু আর কোন উত্তর না দিয়া পথে অগ্রসর হইল। ডাক্তার ক্রুদ্ধ গাম্ভীর্যে থমথমে মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—এই পেতো শোন!

—আজ্ঞে? পাতু ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

জগন বলিল—চলে যাচ্ছিস যে?

পাতু আবার বলিল—আজ্ঞে?

ডাক্তার এবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল- সেদিন দরখাস্তে টিপ-সই দিতে না এলি যে বড়? খুব বড়লোক হয়েছিস, না? শহরে গিয়ে বাড়ী করবি, এ গাঁয়েই আর থাকবি না শুনছি!

বিরক্তিতে পাতুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া দরখাস্তখানা বাহির করিয়া আনিয়া সস্নেহ শাসনের সুরে বলিল— দে, টিপছাপ দে। তোর জন্যেই আমি ছাড়ি নাই দরখাস্ত।

পাতু এবার বিনা আপত্তিতেই টিপছাপ দিল। সেদিন যে সে আসে নাই, সমস্ত দিনটাই গ্রামত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া জংশন শহর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে —সে সমস্তই সাময়িক একটা উত্তেজনার বশে। আজও যে সে মুহূর্ত-পূর্বে ডাক্তারের কথায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছে—সেও ডাক্তারের কথার কটুত্বের জন্য। নতুবা সাহায্য বা ভিক্ষা লইতে তাহার আপত্তি নাই। গভীর কৃতজ্ঞতার সহিতই সে টিপছাপ দিল। টিপছাপ দিয়া বুড়ো আঙুলের কালি মাথায় মুছিতে মুছিতে কৃতজ্ঞভাবে আবার হাসিয়া বলিল,—ডাক্তারবাবুর মতন গরীবগুর্বোর উপকার কেউ করে না।

ডাক্তারের জুতার ধুলা আঙুলের ডগায় লইয়া তাহা ঠোঁটে ও মাথায় বুলাইয়া লইল। ভূপাল চৌকিদারও তাহার অনুসরণ করিল।

ডাক্তার ইহার মধ্যে কিছু চিন্তা করিতেছিল, চিন্তা-শেষে বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—দাঁড়া। আরও একটা টিপছাপ দিয়ে যা।

আজ্ঞে? পাতু সভয়ে প্রশ্ন করিল। অর্থাৎ, আবার কেন? টিপছাপকে ইহাদের বড় ভয়!

—এই ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত দোব। তোদের ঘর পুড়ে গিয়েছে, চাষীদের ধান এখনও মাঠে, এই অসময় অস্থাবরের নোটিশ, এ কি মগের মুল্লুক নাকি?

এবার ভয়ে পাতুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইউনিয়ন বোর্ডের হাকিমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত! সে ভূপাল চৌকিদারের দিকে চাহিল—ভূপালও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার তাগিদ দিয়া বলিল—দে, টিপছাপ দে!

—আজ্ঞে না মশায়। উ আমি দিতে লারব! পাতু এবার হন হন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে ভূপাল পলাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভূপাল ভাবিতেছিল—খবরটা আবার 'পেসিডেন' বাবুকে গিয়া দিতে হইবে। নহিলে হয়ত সন্দেহ আসিবে—তাহারও ইহার সহিত যোগসাজশ আছে।

ডাক্তার ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়নপর পাতু ও ভূপালের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল্। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে ফাটিয়া পড়িল—হারামজাদার জাত, তোদের উপকার যে করে সে গাধা! বলিয়াই সে দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

—ছিঁড়ো না, ডাক্তার ছিঁড়ো না—বাধা দিল পাঠশালার পণ্ডিত দেবু ঘোষ। সে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবই দেখিয়াছিল। এ-সব ব্যাপারে তাহারও আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

দেবু ঘোষ একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ। এ গ্রামের পাঁচজনের একজন হইয়াও সে যেন সকল হইতে একটু পৃথক। তাহার মতামতগুলিও সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক। আপনাদের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করিতে চায় না। অনিরুদ্ধকে, ছিরুকে শাসন করিতে জমিদারের দ্বারস্থ হইতে সে নারাজ। কিন্তু পঞ্চায়েতী মজলিসের আয়োজনে সেই প্রধান উদ্যোক্তা। তবু আজ সে জগন ডাক্তারকে দরখাস্ত ছিঁড়িতে বাধা দিল।

ডাক্তার দেবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ছিঁড়তে বারণ করছ? ওই বেটাদের উপকার করতে বলছ? দেখলে তো সব!

দেবু হাসিয়া বলিল—তা দেখলাম! ওদের ওপর রাগ করে কি করবে বল! দাও তোমার ট্যাক্সের দরখাস্ত, আমি সই করছি, আর দশজনার সইও যোগাড় করে দিচ্ছি।

ডাক্তার একটা বিড়ি ও দেশলাই পণ্ডিতকে দিয়া বলিল—ব'স। তারপর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মিনু, দু কাপ চা!

মিনু ডাক্তারের মেয়ে।

ডাক্তার আবার আরম্ভ করিল—লোকে ভাবে কি জান, পণ্ডিত? ভাবে এ সবের মধ্যে আমার বুঝি কোন স্বার্থ আছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকাল হলে বাঁচবে সবাই, কিন্তু রাজা হয়ে যাব আমি!

দেবু বিড়ি ধরাইয়া দেশলাইটা ডাক্তারের হাতে দিয়া একটু হাসিয়া বলিল, —তা স্বার্থ আছে বৈ কি ডাক্তার।

—স্বার্থ! ডাক্তার রুক্ষ অথচ বিস্মিত দৃষ্টিতে পণ্ডিতের দিকে চাহিল।

পণ্ডিত হাতের বিড়িটার আগুনের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতেই সহ ভাবেই বলিল—স্বার্থ আছে বৈ কি! দশজনের কাছে গণ্যমান্য হবে তুমি, দু'দিন বাদে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারও হতে পার। স্বার্থ নেই? আমার মনে হয় সংসারে স্বার্থ-চিন্তা ছাড়া মানুষ টিকতেই পারে না।

ডাক্তারের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল—ওটাও যদি স্বার্থ হয়, তবে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের ভগবানের তপস্যা করার মধ্যেও স্বার্থ আছে হে। তাহ'লে বশিষ্ঠ-বুদ্ধদেবও স্বার্থপর!

—স্বার্থ কথাকে ছোট করে না দেখলে ও কথা নিশ্চয় সত্য। পরমার্থও তো অর্থ ছাড়া নয়। দেবু তেমনি হাসিয়াই বলিল।

ডাক্তার বলিল,—ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হতে আমি চাই, আলবৎ হতে চাই। সে হতে চাই দশজনের সেবা করবার জন্যে। পরলোক-ফরলোক জপতপ ও-সবে আমার বিশ্বাস নাই। ওই ছিরু পাল—চুরি করবে—ব্যাভিচার করবে, আর ঘরে বসে জপতপ করবে—ঘটা করে কালীপূজো, অন্নপূর্ণা পূজো করবে, ও-রকম ধর্মের মাথায় মারি আমি পাঁচ ঝাড়ু।

অতঃপর ডাক্তার আরম্ভ করিল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা। মনুষ্য-জীবন ধন্য করিতে কে না চায় এ সংসারে! কেহ মানুষের সেবা করিয়া ধন্য হইতে চায়, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বক্তৃতার উত্তরে দেবু ঘোষও বক্তৃতা দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা দিল না, কেবল বলিল—দশজনের ভাল করতে চাও, খুব ভাল কথা, ডাক্তার। কিন্তু গাঁয়ের লোককে কেন ছোট ভাব তুমি? আজ বললে, গাঁয়ে লোকের সঙ্গে নবান্ন করবে না তুমি! কদিন আগে দু-দুটো মজলিস হল গাঁয়ে, তুমি তো গেলেই না, উলটে কামারকে তুমি উস্কে দিলে।

—কখনও না। গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে আমি কাউকে উস্কে দিই নাই। অনিরুদ্ধের জমির ধান কেটে নিলে—আমি তাকে ছিরের নামে ডাইরি করতে বলেছি এই পর্যন্ত।

—বেশ কথা! মজলিসে গেলে না কেনে?

—মজলিস? যে মজলিসে ছিরু পাল টাকার জোরে মাতাব্বর—সেখানে আমি যাই না।

—তার মতব্বরি ভেঙে দাও তুমি। মজলিসে গিয়ে আপনার জোরে ভাঙ। ঘরে বসে থাকলে তার মতব্বরি আরও বেড়ে যাবে!

জগন এবার চুপ করিয়া রহিল।

—ভাল। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান্ন করবে না কেন তুমি?

এবার ডাক্তার কাবু হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—করব না এমন প্রতিজ্ঞা আমি করি নাই।

দেবু ঘোষ এবার খুশী হইয়া বলিল—হ্যাঁ! 'দশে মিলে করি কাজ হারি-জিতি নাহি লাজ।' যা করবে দশজনে এক হয়ে করে। দেখ না, তিন দিনে সব ঢিট হয়ে যাবে। অনিরুদ্ধ কামার, গিরিশ ছুতোর, তারা নাপিত, পেতো মুচি—এমন কি তোমার ছিরুকেও নাকে-কানে খৎ দিয়েই ছাড়ব। তা না ক'রে হাজারখানা দরখাস্ত ক'রেও কিছু হবে না ডাক্তার। সংসারে একলা থাকে বাঘ সিংহ। মানুষে নয়।

ডাক্তার বলিল—বেশ। কোনও আপত্তি নাই আমার। তবে এক হতে

হলে সব কাজেই এক হতে হবে। গাঁয়ের পরবের সময় জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত ; আর ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটের সময় কঙ্কণার বাবুরা, ছিরে পাল—

বাধা দিয়ে দেবু ঘোষ বলিল—এবার তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুমি আর আমি দাঁড়াব। তা হলে হবে তো?

দেবনাথ ঘোষ—দেবু পণ্ডিত একটু স্বতন্ত্র মানুষ। আপনার বুদ্ধি-বিদ্যার উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাহার এই বুদ্ধি সম্বন্ধে চেতনার সহিত খানিকটা কল্পনা—খানিকটা স্বার্থপরতা আছে। বিদ্যা অবশ্য বেশী নয়, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই লইয়া অহরহ চর্চা করে। খুঁজিয়া পাতিয়া বই যোগাড় করিয়া পড়ে; খবরের কাগজের খবরগুলো রাখে; এ ছাড়াও মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথ এম-এ ক্লাসের ছাত্র, সে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাহাকে সে অনেক বই আনিয়া দেয়! এবং মুখে-মুখেও অনেক কিছু দেবু তাহার কাছে শিখিয়াছে। এই সব কারণে সে বেশ একটু অহঙ্কৃতও বটে। এ গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি কাহাকেও দেখিতে পায় না। জগন ডাক্তার পর্যন্ত তাহার তুলনায় কম শিক্ষিত। কঙ্কণার হাই স্কুলে জগন ফোর ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়াছে; বাপের কাছে ডাক্তারি শিখিয়াছে। দেবু পড়িয়াছে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত। পড়াশুনাতে সে ভালই ছিল, পড়িলে সে যে ম্যাট্রিক পাস করিত—ভাল ভাবেই পাস করিত এ-কথা আজও কঙ্কণার মাস্টারেরা স্বীকার করে। দেবু নিজে জানে—পড়িতে পাইলেই সে বৃত্তি লইয়া পাস করিত। তাহার পর আই-এ বি-এ—দেবনাথের সে কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারিত সে। অন্তত তাই মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য।

হঠাৎ তার বাপ মারা গেল। চাষবাস, সংসার দেখিবার দ্বিতীয় পুরুষ বাড়ীতে ছিল না। তাহার মা অন্য গ্রাম্য মেয়েদের মত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া পাঁচ-জনের সঙ্গে পুরুষের মত ঝগড়া করিয়া ফিরিবে—এও দেবুর কল্পনায় অসহ্য মনে হইয়াছিল। এবং বাবা যখন মারা গেল তখন সংসার একেবারে ভরাডুবির মুখে। এক পয়সার সঞ্চয় নাই, ধান নাই। ধারও কিছু হইয়াছে। অগত্যা সে পড়াশুনা ছাড়িয়া চাষ ও সংসারের কাছে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু সন্তুষ্টচিত্তে নয়। একটা অসন্তোষ অহরহই তাহার জাগিয়া থাকিত, তাহা আজও আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে, স্বায়ত্তশাসন আইনে গ্রাম্য পাঠশালার ভার ডিষ্ট্রিক বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করিবার পর হইতে চাষবাস ছাড়িয়া ঐ স্কুলে পণ্ডিত হইয়া বসিয়াছে। বেতন মাসে বারো টাকা; চাষ-বাস ভাগে ঠিকায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। লোকে এইবার তাহাকে বলিল—পণ্ডিত; খানিকটা সম্মানও করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি হইল না।

তাহার ধারণা, গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইল সে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্মান তাহারই প্রাপ্য। অরণ্যানীর শিশু-শাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা অখণ্ড আলোক ভোগের জন্যেই ঊর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না; নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহারই সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে আকাশলোকে চলুক —এই আকাঙ্ক্ষা ছিরু পালের অর্থসম্পদ এবং বর্বর পশুত্বকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। জাগনের নকল দেশপ্রীতি ও আভিজাত্যের আস্ফালন তাহার নিকট যেমন হাস্যকর তেমনি অসহ্য। বংশানুক্রমিক দাবিতে হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব-দাবিকে সে স্বীকার করতে চায় না। ভবেশ ও মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার ভানে কথা কয়,—তাহাও সে সহ্য করিতে পারে না।

দেবুর উপেক্ষা অবশ্য অহেতুক নয় অথবা একমাত্র আত্মপ্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত নয়। আপনার গ্রামখানিকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সে যে চোখের উপর গ্রামখানিকে দিন দিন অবনতির পথে গড়াইয়া যাইতে দেখিতেছে! অর্থবলে এবং দৈহিক শক্তিতে ছিরু যথেচ্ছাচার করিতেছে। শুধু ছিরু কেন—গ্রামের কেহই কাহাকেও মানে না, সামাজিক আচার-ব্যবহার সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষ মরিলে সহজে মড়া বাহির হয় না, সামাজিক ভোজনে—একই পঙ্‌ক্তিতে ধনী-দরিদ্রের ভেদ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কামার ছুতার বায়েন কাজ ছাড়িল; দাই, নাপিত চিরকেলে বিধান লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। যাহার মাসে পাঁচ টাকা আয়—সে দশ টাকা খরচ করিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়াছে। ঋণের দায়ে জমি বিকাইয়া যাইতেছে, ঘটি-বাটি বেচিতেছে,— তবু জামা চাই, শৌখীন-পাড় কাপড় চাই, ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন চাই। ছোকরাদের পকেটে বিড়ি-দেশলাই ঢুকিয়াছে, জংশন-শহরে গেলেই সবাই দু-এক পয়সার সিগারেট না কিনিয়া ছাড়ে না,—তামাক-চকমকি একেবারে বাতিল হইয়া গেল। এ-সবের প্রতিকার করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহারা প্রধান হইতে চায় কেন? কিসের জোরে? এ প্রশ্ন যাহাদের অকারণে মাথা ধরাইয়া তোলে দেবু পণ্ডিত সেই তাহাদেরই একজন।

দেবু পণ্ডিত পাঠাশালার ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে এই সব ভাবনার অনেক কিছু ভাবে। গ্রামের সকল জন হইতে নিজেকে কতকটা পৃথক রাখিয়া আপনার চিন্তাকে বিকীর্ণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বকেও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া যায়—অক্লান্ত ভাবে, সামান্য সুযোগও সে কখনও ছাড়িয়া দেয় না।

তাই জগন ডাক্তার যখন ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—তখন ডাক্তারের আভিজাত্যের আস্ফালনের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও তাহার সহিত মিলিত হইতে সে দ্বিধাবোধ করিল না।

দেবনাথও জগন ডাক্তার দুইজনে মিলিত উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দরখাস্ত পাঠানো হইয়া গিয়াছে। নবান্নের দিনে দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল। সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে মনসার ভাসান গান হইবে। ভাসান গানের দলকে এখানে 'বেহুলার দল' বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে; সেই দলের গান হইবে। চাঁদা করিয়া চাল তুলিয়া উহাদের মদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহাতেই দলের লোকের মহা আনন্দ। এই ভাসান গানের ব্যবস্থার মধ্যে আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। নবান্নের দিন ছিরু পালের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় গ্রামের সমস্ত লোকই গিয়া জমায়েত হয় ছিরুর বাড়ীতে। তামাক খায়, গালগল্প করে, খোল বাজাইয়া অল্প অল্প কীর্তন গানও হয়। এবার আবার ছিরু নাকি বিশেষ সমারোহের আয়োজন করিয়াছে। রাত্রে লোকজন খাওয়াইবে এবং একদল কৃষ্ণযাত্রাও নাকি বায়না করিয়াছে। শ্রীহরির মায়ের নিত্যকার গালিগালাজ ও আস্ফালনের মধ্যে হইতে অন্তত ওই দুইটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক যাহাতে ছিরুর বাড়ী না যায়—জগন ডাক্তার এবং দেবনাথ তাহার জন্য ব্যবস্থাগুলি করিয়াছে। গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় জগন ও দেবনাথের এইটি প্রথম আয়োজন বা ভূমিকা।

চাষীর গ্রামে নবান্নের সমারোহ কিন্তু বেশী, এইটিই সত্যকারের সার্বজনীন উৎসব। চাষের প্রধান শস্য হৈমন্তী ধান মাঠে পাকিয়া উঠিয়াছে; এইবার সে ধান কাটিয়া ঘরে তোলা হইবে। কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা ধান কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে। এই বার আজ লঘু ধানের চাল হইতে নানা উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে ঘরে ঘরে হইবে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা। ছেলেমেয়েরা সকালবেলাতেই সব স্নান সারিয়া ফেলিয়াছে। অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহে শীতও পড়িয়াছে; তবুও নবান্নের উৎসাহে ছেলেরা পুকুরে জল ঘোলা করিয়া তবে উঠিয়াছে। তাহারা সব এখনও চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় রোদে দাঁড়াইয়া পুরোহিতের কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে লইয়া কলরব করিতেছে। বুড়ো শিব এবং ভাঙা কালীর মন্দিরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজা চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া নতুন বাটিতে নতুন ধানের আতপ চাল, চিনি, মণ্ডা, দুধ, কলা, আখের টিকলি, আদাকুচি, মূলাকুচি সাজাইয়া দক্ষিণাসহ

মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে। অধিকাংশই চার পয়সা, কেহ দু পয়সা, কেহ এক পয়সা, দু-চারজনে দিয়াছে দু আনা। যাহাদের বাড়ীতে কুমারী মেয়ে নাই, তাদের ভোগসামগ্রী প্রবীণারা লইয়া আসিতেছে। গ্রামের পুরোহিত খোঁড়া চক্রবর্তী বসিয়া সামগ্রীগুলি লইয়া দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণাগুলি ট্যাকে পুরিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ধমক দিতেছে ওই ছেলেগুলিকে—এ্যাই এ্যাই! এ্যাই ছেলেগুলো ত ভারী বদ! যাস না কাছে, চাঁচ ছোঁড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে।

অর্থাৎ ওই ঘোড়াটা। ঘোড়াটা পিছনের পা ছুঁড়িলে প্লীহা ফাটিয়া যাইবে। খোঁড়া চক্রবর্তী গ্রাম-গ্রামান্তরে ওই ঘোড়ার সওয়ার হইয়া যজমান সাধিয়া ফেরে। ফিরিবার সময় ঘোড়ার উপর থাকে সে—তাহার মাথায় থাকে চাল-কলা ইত্যাদির বোঝা। ঘোড়া খুব শিক্ষিত, চক্রবর্তী প্রায়ই লাগাম না ধরিয়া দুই হাতে বোঝা ধরিয়া অনায়াসে চলে, অবশ্য ইচ্ছা করিলে চক্রবর্তী মাটিতে পা নামাইয়া দিতে পারে। মাটি হইতে বড় জোর ফুটখানেক উপরে তাহার পা দুইটা ঝুলিতে ঝুলিতে যায়।

ছেলেদের কতকগুলা দূর হইতে ঢেলা ছুঁড়িয়া ঘোড়াটাকে ক্রমাগত মারিতেছিল। কতকগুলা অতিসাহসী গাছের ডাল লইয়া পিছন দিক হইতে পিটিতেছিল। পুরোহিত ভয়ানক চটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ছেলেগুলা যেন তাহার কথা কানে তুলিবে না বলিয়াই একজোট হইয়াছে। একটি প্রৌঢ়া বিধবা ভোগের সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিল—সে-ই পুরোহিতের উপায় করিয়া দিল; সে বলিল—এ্যা, তোরা ওই ঘোড়াটাকে ছুঁলি? বলি—ওরে ও মেলেচ্ছোর দল। যা, আবার সব চানকরগে যা।

পুরোহিত বলিল,—দেখ বাছা দেখ, বজ্জাত ছেলেদের কাণ্ড দেখ। চাঁট ছোঁড়ে তো পিলে ফাঠিয়ে দেবে। তখন নাম-দোষ হবে আমার!

বিধবা কিন্তু এ কথাটা মানিল না, সে বলিল—ও-কথা আর ব'লো না ঠাকুর। ওই ছাগলের মত ঘোড়া—ও নাকি পিলে ফাটিয়ে দেবে? তুমিও যেমন। ছেলেদের বলছি কেন, তোমারও তো বাপু আচার-বিচার কিছু নাই। সামনের দুটো পায়ে বেঁধে ছেড়ে দাও, রাজ্যের আস্তাকুড়, পাতা, ময়লা মাড়িয়ে চলে বেড়ায়। সেদিন আমাদের গাঁয়ে এসে নতুন পুকুরের পাড়ে—মা-গোঃ, মনে করলেও বমি আসে—চান করতে হয়—সেইখানে দেখি ঘাস খাচ্ছে। আর তুমি ওই ঘোড়াতে চেপে এসে দেবতার পূজো কর?

পুরোহিত বলিল,—গঙ্গাজল দি মোড়ল পিসী, রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরলে গঙ্গাজল দিয়ে তবে ওরে ঘরে বাঁধি। আমি তো গঙ্গাজল-স্পর্শ করিই।

—ও সব মিছে কথা।

—ঈশ্বরের দিব্যি। পৈতে ছুঁয়ে বলছি আমি। গঙ্গাজল না দিলে ও বাড়ী ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকবে আর চিঁহি চিঁহি করে চেঁচাবে।

মোড়ল পিসী কি বলিতে গিয়া শশব্যস্ত হইয়া সম্মুখের দিকে খানিকটা সরিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—কে লা? হন হন করে আসছে দেখ।—পিছন দিক হইতে কোন আগন্তুকের দীর্ঘচ্ছায়া মাথাটা তাহার পায়ের উপর পড়িতেই মোড়ল পিসী সংস্পর্শের ভয়ে সরিয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

একটি বধূ—দীর্ঘাঙ্গী, অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ; সে উত্তর করিল না, নীরবে ভোগ-সামগ্রীর পাত্রখানি পুরোহিতের হাতের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

—অ! কামার-বউ! আমি বলি কে-না-কে!

এই মুহূর্তেই ডাক্তার ও পণ্ডিত আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিল। দেবনাথ বিনা ভূমিকায় বলিল—ঠাকুর, কামারের পুজো গাঁয়ের শামিলে আপনি করবেন না, সে হতে আমরা দেব না।

জগন ও দেবু এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষা করিয়া নিকটেই কোথাও দাঁড়াইয়া ছিল, পদ্মকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আসিয়া হাজির হইয়াছে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—সে আবার কি রকম? গাঁ-শামিলে পুজো না হলে কি করে পুজো হবে?

—সে আমরা জানি না, কর্মকার বুঝে করবে। সে যখন গাঁয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, তখন আমরাই বা গাঁয়ের শামিলে ক্রিয়াকর্মে নোব কেন?

পদ্ম তেমনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবে বলিল—তাহলে আর আমি কি করব মা!

দেবনাথ পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—পুজো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বল গে কর্মকারকে, পুজো দিতে দিলে না গাঁয়ের লোক।

পদ্ম এবার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, কিন্তু পুজোর পাত্র তুলিয়া লইয়া গেল না, সেটা এবং দক্ষিণার পয়সা সেখানেই পড়িয়া রহিল।

পুরোহিত বিব্রত হইয়া বলিল—ওগো ও বাছা, পুজোর ঠাঁইটা নিয়ে যাও! ও বাছা, ও কামার-বউ!

দেবু আবার বলিল—থাক না। কামার এখুনি তো আসবেই। যা হোক একটা মীমাংসা আজ হবেই। দেবু ঘোষের গোপনতম অন্তরে কর্মকারের উপর একটু সহানুভূতি এখনও আছে; অনিরুদ্ধ তাহার সহপাঠী, তা ছাড়া অন্যায়

অনিরুদ্ধেরই একার নয় এবং অনিরুদ্ধই প্রথমে অন্যায় করে নাই। গ্রামের লোকই অন্যায় করিয়াছে প্রথম। সে কথাটাও তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

পুরোহিত ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার ব্যগ্রতাও তাহার ছিল না। উপস্থিত এক বাড়ীর আতপতণ্ডুল দুধ-মণ্ডা প্রভৃতি পূজার সামগ্রী বাদ পড়িয়া যাইতেছে—সেই চিন্তাটাই তাহার বড়। ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল—বলি ওহে ডাক্তার, ও পণ্ডিত—

জগন বাধা দিয়া দৃঢ় আদেশের ভঙ্গীতে তাহাকে বলিল—গিরিশ ছুতোর তারা নাপিত এদের পুজোও হবে না ঠাকুর, বলে রাখছি আপনাকে। আমরা অবিশ্যি একজন না একজন শেষ পর্যন্ত থাকব, তবে যদি না থাকি—সেজন্যে আগে থেকে বলে রাখছি আপনাকে।

ঠিক এই সময়ে ছিরু পাল আসিয়া ডাকিল,—ঠাকুর!—ছিরুর পরনে আজ গরদের কাপড়, গায়ে একখানি রেশমী চাদর; ভাবে-ভঙ্গিতে ছিরু পাল আজ একটি স্বতন্ত্র মানুষ!

পুরোহিত চক্রবর্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যাই বাবা। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। ও পণ্ডিত, ও ডাক্তার, কই হে সব আসছে না কেন?

গম্ভীর ভাবে জগন ডাক্তার বলিল—এত তাড়াতাড়ি করলে তো হবে না ঠাকুর। আসছে সব, একে একে আসছে। একঘর যজমানের জন্য দশজনকে ব্যতিব্যস্ত করতে গেলে চলবে না।

ছিরু বলিল,—বেশ—বিশ! দশের কাজ সেরেই আসুন। ঠাকুর! আমি একবার তাগাদা দিয়ে গেলাম।—তারপর ছিরু তাহার প্রকাণ্ড বিশ্রী মুখখানাকে যথাসাধ্য কোমল এবং বিনীত করিয়া বলিল,—ডাক্তার, একবার যাবেন গো দয়া করে। দেবু খুড়ো দেখেশুনে দিয়ে এস বাবা—

কথাটা তাহার শেষ হইল না, অনিরুদ্ধের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকারে চণ্ডীমণ্ডপটা যেন অতর্কিতে চমকিয়া উঠিল।

—কে? কে? কার ঘাড়ে দশটা মাথা? কোন্ নবাব-বাদশা আমার পুজো বন্ধ করেছে শুনি?

অনিরুদ্ধের সে মূর্তি যেন রুদ্র-মূর্তি!

চক্রবর্তী হতভম্ব হইয়া গেল, দেবনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইল, জগন ডাক্তার বিজ্ঞ সান্ত্বনাদাতার মত একটু আগাইয়া আসিল; ছিরু পাল যথাস্থানে অচঞ্চল স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—থাম, থাম, চীৎকার করিস না অনিরুদ্ধ!

ব্যঙ্গভরা ঘৃণিত দৃষ্টিতে চকিতে একবার ছিরু পাল হইতে ডাক্তার পর্যন্ত

সকলের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ মন্দিরের দাওয়া হইতে পদ্মের পরিত্যক্ত পূজার পাত্রটা তুলিয়া লইল। পাত্রটা দুই হাতে খানিকটা উপরে তুলিয়া যেন দেবতাকে দেখাইয়া বলিল,—হে বাবা শিব, হে মা কালী—খাও বাবা, খাও মা, খাও! আর বিচার কর, তোমরা বিচার কর, তোমরা বিচার কর।—বলিয়াই সে ফিরিল।

ডাক্তারের চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল, কিন্তু অনিরুদ্ধকে ধরিয়া নির্যাতন করিবার কোন উপায় ছিল না।

অনিরুদ্ধ খানিকটা গিয়াই কিন্তু ফিরিল, এবং দক্ষিণার পয়সা কয়টা ট্যাঁকে গুঁজিয়া দেখিল দেবু ঘোষ ও জগন ডাক্তারের অল্প দূরে তখনও দাঁড়াইয়া আছে ছিরু পাল। তাহার ক্রোধ মুহূর্তে যেন উন্মত্ততায় পরিণত হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—বড় লোকের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, বিদ্বেনের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, আমি কোন শালাকে মানি না, গ্রাহ্য করি না। দেখি—কোন্ শালা আমার কি করতে পারে!

মুহূর্তের জন্যে সে ছিরুর দিকে ফিরিয়া যেন তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

খোঁড়া পুরোহিত ও মোড়ল পিসী একটা বিপর্যয় আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইহার পরই অনিরুদ্ধের উপর ছিরু পালের বাঘের মত লাফাইয়া পড়ার কথা; কিন্তু আশ্চর্য, ছিরু পাল আজ হাসিয়া অনিরুদ্ধকে বলিল—আমাকে মিছিমিছি জড়াচ্ছ কর্মকার, আমি এ-সবের মধ্যে নাই। আমি এসেছিলাম পূরুত ডাকতে।

অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াইল না, যেমন হন হন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি হন হন করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতেও সে বলিতেছিল—সব শালাকে আমি জানি। ধার্মিক—রাতারাতি সব ধার্মিক হয়ে উঠেছে।

ছিরু অবিচলিত ধৈর্যে স্থির প্রশান্ত ভাবেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। ছিরুর চরিত্রের এই একটি বৈশিষ্ট্য। যখন সে ইষ্ট স্মরণ করে, কোন ধর্ম-কর্ম বা পূজা-পার্বণে রত থাকে—সে তখন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায়। সেদিন সে কাহারও সহিত বিরোধ করে না, কাহারও অনিষ্ট করে না, পৃথিবী ও বস্তু-বিষয়ক সমস্ত কিছুর সহিত সংস্রবহীন হইয়া এক ভিন্ন জগতের মানুষ হইয়া উঠে। অবশ্য সমগ্র হিন্দুসমাজের জীবনই আজ এমনি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; কর্মজীবন এবং ধর্মজীবন একেবারে স্বতন্ত্র—দুইটার মধ্যে যেন কোন সম্বন্ধ নাই! ইষ্ট স্মরণ করিতে করিতে যাহার চোখে অকপট অশ্রু উদ্গত হয়, সেই মানুষই ইষ্ট-স্মরণ-শেষে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিষয়ের আসনে বসিয়া জাল-

জালিয়াতি শুরু করে। শুধু হিন্দু সমাজই বা কেন ? পৃথিবীর সকল দেশে—সকল সমাজেই জীবন-ধারা অল্পবিস্তর এমনিই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কথা থাকুক, ছিরুর জীবনে এই বিভাগটা বড় প্রকট—অতি মাত্রায় পরিস্ফুট। আজিকার ছিরু স্বতন্ত্র, এই ছিরু যে কেমন করিয়া ব্যভিচারী পাষণ্ড ছিরুর প্রচণ্ড ভার ঠেলিয়া দেবপূজাকে উপলক্ষ করিয়া বাহির হইয়া আসে—সে অতি বিচিত্র সংঘটন। পাষণ্ড ছিরুর অন্যায় বা পাপে কোন ভয় নাই, দেবসেবক ছিরুরও সে পাপ খণ্ডনের জন্য কোন ব্যগ্রতা নাই। আছে কেবল পরমলোক-প্রাপ্তির জন্য একটি নিষ্ঠাভরা তপস্যা এবং অকপট বিশ্বাস। দিন ও রাত্রির মত পরস্পরের সঙ্গে এই দুই বিরোধী ছিরুর কখনও মুখোমুখি দেখা হয় না, কিন্তু কোন বিরোধও নাই। তবে ছিরুর দিবাভাগগুলি অর্থাৎ জীবনের আলোকিত অংশটুকু শীতমণ্ডলের শীতের দিনের মত—অতি সংক্ষিপ্ত তাহার আয়ু।

আজ কিন্তু আরও একটু নূতনত্ব ছিল ছিরুর ব্যবহারে। আজিকার কথাগুলি শুধু মিষ্টই নয়—খানিকটা অভিজাতজনোচিত, ভদ্র এবং সাধু। বিগত কালের দেবসেবক ছিরু হইতেও আজিকার দেবসেবক ছিরু আরো স্বতন্ত্র, আরো নূতন। উত্তেজনার মুখে সেটা কেহ লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরই চণ্ডীমণ্ডপের সামনের রাস্তা দিয়া বাউড়ী, ডোম, মুচীদের একপাল ছেলেমেয়েরা সারি বাঁধিয়া কোথাও যাইতেছিল। কাহারও হাতে থালা, কাহারও হাতে গেলাস, কাহারও হাতে কোন রকমের একটা পাত্র। জগন ডাক্তার প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবি রে সব দল বেঁধে ?

—আজ্ঞে, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী গো, অন্নপুন্নোর পেসাদ নিতে ডেকেছেন।

—কে ? ঘোষটা আবার কে ? ছিরু ? ছিরে পাল সে আবার ঘোষ হল কবে থেকে ?

অশালীন ভাষায় ছিরুকে কয়টা গাল দিয়া ডাক্তার বলিল—ওঃ, বেজায় সাধু মাতব্বর হয়ে উঠল দেখছি !

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল।

এগারো

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল অনেক কথা। ওই নবান্নের ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর।

চণ্ডীমণ্ডপেই গ্রাম্য পাঠশালা বসে; পাঠশালার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতেই চণ্ডীমণ্ডপই পাঠশালার নির্দিষ্ট স্থান। সে বহুকাল আগের কথা। তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ছিল না, ইউনিয়ন বোর্ড ছিল না। পাঠশালা ছিল গ্রামের লোকের।

লোকেরা পণ্ডিতকে মাসে একটা করিয়া সিধা দিত এবং ছেলে পড়াইত। চণ্ডীমণ্ডপে সেকালে কালী ও শিবের নিত্যপূজার ব্যবস্থা ছিল এবং ওই পূজক ব্রাহ্মণই তখন ছিল পাঠশালার পণ্ডিত। পরবর্তীকালে পূজকের দেবোত্তর জমি কেমন করিয়া কোথায় উবিয়া গেল কে জানে। লোকে বলে—জমিদারের পূর্ববর্তী এক গোমস্তা দেবোত্তর জমিকে নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া নিজের জোতের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। এমন কৌশলে লইয়াছে যে, সে আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই। এমন কি চিহ্নিত জমিগুলাকে কাটিয়া এমনি রূপান্তরিত করিয়াছে যে, সে জমি পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। তাহার পরও গ্রাম্য-পৌরোহিত্য, দেব-সেবা এবং পাঠশালাকে অবলম্বন করিয়া এক ব্রাহ্মণ অনেকদিন এখানে ছিল ; আজ বৎসর কয়েক আগে সে-ও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের নূতন নিয়মানুযায়ী অযোগ্যতা হেতু তাহাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বছর তিনেক পাঠশালার ভার পড়িয়াছে দেবুর হাতে।

এককালে দেবুও এই পাঠশালায় সেই পুরোহিত-পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়িয়াছে। পণ্ডিত একদিকে পূজা করিত 'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী'—অকস্মাৎ মন্ত্র বন্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত—এ্যাই—এ্যাই চণ্ডে, পাঁচ তেরম পঁচাত্তর নয়, পাঁচ তেরম পঁয়ষট্টি। ছয় তেরম আটাত্তর। হ্যাঁ—

ওই অনিরুদ্ধও তখন তাহার সঙ্গে পড়িত। পণ্ডিত তাহাকে বলিত—এ দেশের লোহাতে চেকন কাজ হয় না বাবা, কর্মকার, তুমি বিলাত যাও। বিলাতে কল-কারখানার কারবার, আলপিন-সূচ তৈরী হয় লোহা থেকে। বিলাতী পণ্ডিত না হলে তোমাকে পড়ানো আমার কর্ম নয় ;—

ছিরু দেবুর জ্ঞাতি, সম্বন্ধে ভাইপো, কিন্তু বয়সে অনেক বড়। সে প্রথমে তাহার কয়েক ক্লাস উপরে পড়িত ; শেষে এক এক ক্লাসে দুই-তিন বৎসর করিয়া বিশ্রাম লইতে লইতে যেদিন দেবুকে সহপাঠীরূপে দেখিতে পাইল, সেইদিনই সে পাঠশালার মোহ জন্মের মত বিসর্জন দিল। তারপরই সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে—ক্রমে বিষয়-বুদ্ধিতে পাঁচখানা গ্রামের লোককে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। সে আজ গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রামের মাতব্বর।

অনিরুদ্ধ এবং এই ছিরু পাল—এই দুইজনেই গ্রামখানার সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিল। ওই সঙ্গে গিরিশ ছুতার, তারা নাপিতও আছে। দেবু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিল—অনিরুদ্ধ ওই যে দম্ভভরে সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ভোগ উঠাইয়া লইয়া গেল, অথচ সমাজের কেহ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? এ কয়েকদিন সে নিজেই

লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে, গ্রামের লোক তাহাকে ভালবাসে, অনেকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এক্ষেত্রে সকলেই বলিয়াছে এক কথা—এর আর করবে কি দেবু? উপায় কি বল? যদি থাকে তাহলে তুমি কর! তবে বুঝচ কি না—উ হবে না! কি সমাজ সমাজ করছ? সমাজ কই?

নাই! দেবু নিজেই বুঝিয়াছে, নাই! সেকালে যে-সব মানুষ এই সমাজ গড়িয়াছিল, এই সমাজ শাসন করিত, এ সমাজকে ভাল করিয়া জানিত, বুঝিত—সে সব মানুষই আর নাই। সে শিক্ষাও নাই, সে দীক্ষাও নাই, সে দৃষ্টি নাই। এ-সব মানুষ আর এক জাতের মানুষ। আর এক ধাতের মানুষ। মানুষের নামে অমানুষ।

জগন ডাক্তার সেদিন বলিয়াছিল—ধ'রে এনে বেটাচ্ছেলে কামারকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাগাও ঘা-কতক।

জগনের ও-প্রস্তাবে দেবু সায় দিতে পারে নাই। ছি! মানুষকে শিক্ষা দিবার অধিকার আছে, ক্ষেত্র বিশেষে মনুষ্যোচিত শাসন করিবার অধিকারও সে স্বীকার করে; কিন্তু অত্যাচারই একমাত্র শাসন নয়। জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য হীন কৌশল, অত্যাচার ও অন্যায়কে অবলম্বন করিতে সে চায় না। জীবনে তাঁহার একটি আদর্শবোধও আছে। পাঠ্যাবস্থায় আপনার ভাবী জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনায় সযত্নে সেই বোধটিকে দেবু গড়িয়া তুলিয়াছিল। মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত সেই আদর্শবোধ। বাল্য-জীবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে কয়েকটি ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইয়া আছে। বারংবার নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধিশাণিত যুক্তির আঘাত দিয়াও সে-ধারণাগুলি আজও তাহার খণ্ডিত হয় নাই।

জমিদারকে, ধনী মহাজনকে সে ঘৃণা করে। তাহাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান করা যেন তাহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের অতি-উদার দান-ধ্যান ধর্ম-কর্মকেও সে মনে করে কোন গুপ্ত গো-বধের স্বেচ্ছাকৃতচান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া। তাহার অবশ্য কারণ আছে।

তাহার বাল্যকালে একবার জমিদারবাবুরা বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাহার বাবাকে সমস্ত দিন কাছারিতে আটক রাগিয়াছিল। আতঙ্কিত দেবু তিনবার বাবুদের কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিয়াছিল; দুইবার চাপরাসীর ধমক খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। শেষবার বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—এবার যদি আসবি ছোঁড়া, তবে কয়েদখানায় বন্ধ করে রেখে দেব। চাপরাসীটা তাহাকে টানিয়া আনিয়া একটা অন্ধকার ঘরও দেখাইয়া দিয়াছিল।

বাবুদের অবশ্য কয়েদখানার জন্য স্বর্গধাম কি বৈকুণ্ঠজাতীয় কোন মহল বা ঘর কোনদিনই ছিল না। নিতান্তই ছোট জমিদার তাহারা, দেবুকে নিছক ভয় দেখাইবার জন্য ও-কথাটা বলা হইয়াছিল—সেটা দেবু আজ বোঝে। কিন্তু জমিদার অত্যাচারী—এ ধারণা তাহাতে একবিন্দু ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

জমিদারের ওই বাকী খাজনা শোধের জন্য তাহার বাপ কঙ্কণার মুখুজ্যে বাবুদের কাছে ঋণ করিয়াছিল। তাহারা তিন বৎসর অন্তে হ্যাণ্ডনোটের নালিশ করিয়া অস্থাবর ক্রোকী পরোয়না আনিয়া, গাই-বাছুর-থালা-গেলাস ও অন্যান্য জিনিসপত্র টানিয়া রাস্তায় যেদিন বাহির করিয়াছিল সেদিনের সেই লাঞ্ছনা-বিভীষিকা দেবু কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তাহার পর অবশ্য ডিক্রীর টাকা আসল করিয়া তমস্থক লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে বাবুরা অস্থাবর ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে-টাকা তাহার বাবার মৃত্যুর পর সে শোধ করিয়াছে। এই বাবুরা অবশ্য বে-আইনী কখনও কিছু করে, হিসাবের বাহিরে একটি পয়সা অতিরিক্ত লয় না। লোকে বলে—মুখুজ্জে বাবুদের মত মহাজন বিরল। টাকা আদায়ের জন্য জোরজুলুম নাই, অপমান নাই, স্থদ শোধ করিয়া গেলে নালিশ কখনও করিবে না; লোকের সম্পত্তির উপর তাহাদের প্রলোভন নাই। নীলাম করিয়া লওয়ার পরও টাকা দিলেই বাবুরা সম্পত্তি ফেরত দেয়। ইহার একবিন্দু অতিরঞ্জন নয়। তবু দেবু মহাজনকে ক্ষমা করিতে পারে না।

এ-সবের উপর আরও একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার মনে অক্ষয় হইয়া আছে। স্কুলে সে ছিল সর্বাপেক্ষা দুইটি ভাল ছেলের একটি। তাহার নিচের ক্লাসে পড়িতে মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ,—সে ছিল দ্বিতীয় জন। শিক্ষকেরা প্রত্যাশা করিতেন—এই ছেলে দুইটি স্কুলের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু দেবু আজও ভুলিতে পারে না যে, সে ছিল শিক্ষকদের সস্নেহ করুণার পাত্র: ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ পাইত স্নেহের সহিত শ্রদ্ধা আর কঙ্কণার বাবুদের মধ্যম মেধার কয়েকটি ছাত্র পাইত স্নেহের সহিত সম্মান। এমন কি এই ছিরুকেও স্কুলের হেডপণ্ডিত তোষামোদ করিতেন,—কারণ প্রয়োজন-মত ছিরুর বাপের কাছে তিনি কখনও তালগাছ, কখনও জামগাছ, ক্রিয়াকর্মে দশ-পনেরো সের মাছ চাহিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া ঘি, চাল, ডাল, গুড় প্রভৃতি তো নিয়মিত উপহার পাইতেন।

ওই পণ্ডিতটির নির্লজ্জ লোভের কথা মনে করিলে দেবুর সর্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠে! বিশ বৎসর বয়সে ছিরু স্কুলের ফিফথ্ ক্লাস হইতে বিদায় লইলে পণ্ডিত ছিরুর বাপকে বলিয়াছিল—ছেলেকে সংস্কৃত পড়াও মোড়ল।

ছিরুর বাপ ব্রজবল্লভ ছিল শক্তিশালী চাষী—নিজের পরিশ্রমের সাধনায় সে

ঘরে লক্ষ্মীর কৃপা আয়ত্ত করিয়াছিল, কিন্তু নিজে ছিল মূর্খ। তাই বড় সাধ ছিল ছেলেটি তাহার পণ্ডিত হয়। ছিরু বিশ বৎসর বয়সে পশু-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠায় বেচারার মনস্তাপের সীমা ছিল না। পণ্ডিতের কথায় সে ছেলেকে পণ্ডিতের ছাত্র করিয়া দিল। ছিরু প্রথমটা আপত্তি করে নাই। পণ্ডিত পড়াইতে আসিয়া গল্প করিতেন। বিশেষ করিয়া বয়স্ক বিবাহিত ছাত্রের কাছে তিনি আদিরসাশ্রিত সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া এবং ঐ ধরনের গল্প বলিয়া বৎসর চারেক নিয়মিত ভাবেই বেশ প্রসন্ন গৌরবের সঙ্গে গ্লানিহীন চিত্তে বেতন লইয়াছিলেন। অবশ্য বেতন বেশী নয়, মাসিক দুই টাকা। চারি বৎসর পর ছিরু আবার বিদ্রোহ করিল। ছিরুর বাপ কিন্তু নাছোড়বান্দা। ছিরু তখন পণ্ডিতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বুলি ধরিল—সংস্কৃত পড়িয়া কি হইবে? পড়িতে হইলে সে ইংরাজীই পড়িবে।

ইংরাজী পড়াইবার গৃহশিক্ষক কিন্তু পণ্ডিতের ডবল বেতন দাবী করিল। ছিরু তখন ধরিল—সে স্কুলেই পড়িবে। চব্বিশ বৎসর বয়সে সে আবার আসিয়া ফিফ্‌থ ক্লাসে বসিল। দেবুও তখন ফিফ্‌থ ক্লাসে উঠিয়াছে। হঠাৎ ছিরুর নজর পড়িল দেবুর উপর। দেবুর পাশে অনি-কামার। স্কুলে পড়িবার কথা যখন বলিয়াছিল—তখন এই কথাটা ছিরুর মনে হয় নাই। তাহার কল্পনা ছিল অন্যরকম। স্কুলে পড়িবার নাম করিয়া সে কঙ্কণার অথবা স্বগ্রামের নীচ জাতীয়দের পল্লীতে দিনটা কাটাইয়া আসিবে। কিন্তু দেবুকে এবং অনিরুদ্ধকে ক্লাসে দেখিয়া সে আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গেই সে বই-খাতা লইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল। বাড়ী চলিয়া আসিল না। সেই পথে-পথেই সে গিয়া উঠিল তাহার মাতামহের বাড়ী। সেখানে গিয়াই সে তাহার জীবনের আদর্শ গুরু ত্রিপুরা সিংকে পাইয়াছিল। তাহার জীবনে পথ দেখায় যে—সে-ই মানুষের গুরু মাতামহের মনিব ত্রিপুরা সিংহকে দেখিয়া ছিরু তাহাকেই মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজের কর্ম-জীবন-যাত্রা শুরু করিল। কিন্তু চব্বিশ বৎসর বয়সে ছিরু যেদিন ক্লাসে আসিয়া বসিয়াছিল—সেদিনও পণ্ডিত আসিয়া বলিয়াছিলেন—খবরদার, ছিরুকে দেখে কেউ হেসো না। তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল না—খাতির।—সে কথা দেবুর আজও মনে আছে।

স্কুলের মধ্যে সকলের চেয়ে সম্মানের পাত্র ছিল কঙ্কণার মুখুজ্জেদের মূর্খ ছেলেটা। তিন-তিনজন গৃহশিক্ষক সত্ত্বেও কোন বিষয়ে তাহার পরীক্ষার নম্বর চল্লিশের কোঠায়ও পৌঁছিত না। একবার সে সঙ্গীদের মধ্যে রহস্য করিয়া বলিয়াছিল—গাধা পিটে কখনও ঘোড়া হয় না। কথাটা ছেলেটার কানে উঠিতেই সে শোরগোল তুলিয়া ফেলিল। সেই শোরগোলে একেবারে শিক্ষক-

মণ্ডলী পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিলেন। আপিসে ডাকাইয়া আনিয়া হেড্‌মাস্টার তাহাকে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। একজন শিক্ষক বলিয়াছিলেন— গাধা নয় রে গাধা নয়, হাতী—হাতীর বাচ্চা। গজেন্দ্রগমন একটু, একটু ধীরই বটে। আজ বুঝবি না, বড় হ'লে বুঝবি।...

সে-কথা এখন সে মর্মে মর্মে বুঝিতেছে। বাবুদের সেই ছেলেটি বার-দু'য়েক ফেল করার পর শেষে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করিয়া আজ লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। প্রতি মাসে দেবুকে ইউনিয়ন বোর্ডে গিয়া পাঠশালার সাহায্যের জন্য তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ছিরু পালও সম্প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে-ও আসিয়া জিজ্ঞাসা করে— কি গো, পাঠশালা চলছে কেমন ?

দেবুর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

সেদিন একখানা ছেলেদের বইয়ে একটা ছড়া দেখিল—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'। দেবু সে লাইনটি বার বার কলম চালাইয়া কাটিয়া দিল। তারপর বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিয়া দিল—লেখাপড়া করে যেই— মহামানী হয় সেই।

তারপর আরম্ভ করিল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প।

*　　　*　　　*

মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, সে যদি ইউনিয়ন বোর্ডের ওই প্রেসিডেন্টের আসনে বসিতে পারিত, তবে সে দেখাইয়া দিত ওই আসনের মর্যাদা কত। কত —কত—কত কাজ সে করিত! সে কল্পনা করিত অসংখ্য পাকা রাস্তা! প্রতি গ্রাম হইতে লাল কাঁকরের সোজা রাস্তা বাহির হইয়া মিলিত হইয়াছে এই ইউনিয়নের প্রধান গ্রামের একটি কেন্দ্রে; সেখান হইতে একটি প্রশস্ত রাজপথ চলিয়া গিয়াছে জংশন শহরে। ওই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে সারি সারি ধান-চালে বোঝাই গাড়ী, লোকে ফিরিতেছে পণ্য-বিক্রয়ের টাকা লইয়া, ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে ওই পথ ধরিয়া। সমস্ত গ্রামের জঙ্গল সাফ হইয়া—ডোবা বন্ধ হইয়া একটি পরিচ্ছন্নতায় চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত স্থানগুলিতে ছড়াইয়া দিয়াছে দোপাটি ফুলের বীজ; দোপাটি শেষ হইলে গাঁদার বীজ। ফুলে ফুলে গ্রামগুলি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি গ্রামের প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া ইঁদারা খোঁড়া হইয়াছে। কোনো পুকুরে এক কণা আবর্জনা নাই, কালো জল টলটল করিতেছে—পাশে পাশে ফুটিয়া আছে শালুক ও পানাড়ীর ফুল। কোর্ট বেঞ্চের সুবিচারে সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান হইয়াছে—কঠিন

হস্তে সে মুছিয়া দিতেছে উৎপীড়ন ও অবিচার।—এই সমস্তই সে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে, সুযোগ পাইলে সে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে যে স্থূলকায় মন্থরগতি চতুষ্পদ হইলেই সে হাতী নয়, সোনার খুর-বাঁধানো হৃষ্টপুষ্ট হইলেও গর্দভ চিরদিনই গর্দভই।

ঈর্ষার উত্তেজনায়, কর্মের প্রেরণায় সে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, দ্রুতপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, মধ্যে মধ্যে হাতখানা ভাঁজিয়া অতি দৃঢ় মুঠা বাঁধিয়া পেশী ফুলাইয়া কঠিন কঠোর করিয়া তোলে। সকল দেহমন ভরিয়া সে যেন শক্তির আলোড়ন অনুভব করে!

তার স্ত্রীটি বড় ভাল মেয়ে। ধবধবে রঙ, খ্যাঁদা নাক, মুখখানি কোমল—অতি মিষ্ট তাহার চোখের দৃষ্টি। আকারে ছোটখাটো, মাথায় একপিঠ চুল—সরল সুন্দর তাহার মন। তাহার উপরে দেবুর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া আপনাকে সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দেবুর এই মূর্তি দেখিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ওকি হচ্ছে গো? আপনার মনে—

দেবু হাসিয়া বলে—ভাবছি আমি যদি রাজা হতাম।

রাজা হতে! সে কি গো?

—হ্যাঁ। তা হ'লে তুমি হতে রানী।

—হ্যাঁ—! তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিন্তু কথাগুলি ভারী মজার কথা।

তাই তো—পণ্ডিত রাজা হইলে সে রানী হইত ইহা তো খাঁটি সত্য কথা।

দেবু আরও খানিকটা গোল পাকাইয়া বলিল—কিন্তু রানী হলেও তোমার গয়না থাকত না।

অভিভূতা হইয়া গেল দেবুর বউ—সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

দেবু হাসিয়া বলে—এ রাজার রাজ্য আছে, কিন্তু রাজা তো প্রজার কাছে খাজনা পায় না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বুঝেছো? লোকের কাছে ট্যাক্স নিয়ে গ্রামের কাজ করতে হয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়।

অন্তরে শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ কল্পনা থাকিলেই সংসারে তাহা পূর্ণ হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই পৃথিবীতে বড় শক্তি। বার বার চেষ্টা করিয়া দেবু সেটা উপলব্ধি করিয়াছে। শীতকালে বর্ষা নামিলেও ধানের চাষ অসম্ভব। বর্ষার সময় খুব উঁচু জমি দেখিয়া দেবু একবার আলুর চাষ করিয়াছিল; কিন্তু আলুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই জলের স্যাঁতস্যাঁতানিতে মরিয়া গিয়াছিল। যে দুই-চারটি গাছ বাঁচিয়াছিল—তাহাতে যে আলু ধরিয়াছিল, তাহার আকার মটর-কলাইয়ের মত বলিলে বাড়াইয়া বলা হইবে না। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে

রুদ্ধ রাখিয়া সে নীরবে পাঠশালার কাজ করিয়া যায়। এবং নিজের গ্রামখানির একটি ভবিষ্যৎ রূপকে মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মত বিধাতার কল্পনায় লালন করিয়াও যায় মনে মনে। গ্রামের ছোটখাটো সকল অন্দোলন হইতে সে নিজে যথাসাধ্য পৃথকই থাকিতে চায়। সে জানে ইহাতে তাহার মত অবস্থার লোকের ক্ষতিই হয়। পাঠশালার বাঞ্ছিত দলাদলিতে তাহার না থাকাই উচিত—তবু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা কল্পনা এমনি ধারায় আন্দোলন উত্তেজনার স্পর্শ পাইবামাত্র নাচিয়া বাহির হইয়া আসে।

গ্রামখানির যাবতীয় অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিশৃঙ্খলা তাহার নখদর্পণে। গ্রামের সামাজিক ইতিহাস যে আবিষ্কারের মত খুঁজিয়া খুঁজিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। গ্রামের কামার, ছুতার, নাপিত, পুরোহিত, দাই, চৌকিদার, ধোপা প্রভৃতির কাহার কি কাজ, কি বৃত্তি, কোথায় ছিল তাহাদের চাকরাণ জমি, সমস্তই সে যেমন জানিয়াছে এমনটি আর কেহ জানে না। বিগত পাঁচ পুরুষের কালের মধ্যে গ্রামের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর কীর্তি-অপকীর্তির ইতিহাসও আমূল তাহার কণ্ঠস্থ।

* * *

চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় বসিয়া পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে দেবু ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপটির কথা ভাবে। এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনী শক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজাপার্বণ, আনন্দ-উৎসব, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। অন্যায়-অবিচার-উৎপীড়ন, বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার-পাপ গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েৎ। এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত, শাসন করিয়া সে সমস্ত দূর করা হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর হইতে সে ডাক শোনা যায়,—সে ডাক উপেক্ষা করিবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। আরও তাহার মনে আছে, চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া সেকালে যে যতবার যাইত প্রণাম করিয়া যাইত। আজকাল আর মানুষ প্রণামও করে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, দেবতাকে—ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে। দেবু নিত্য নিয়মিত তিন সন্ধ্যা এখানে প্রণাম করে। 'আপনি আচরি ধর্ম' নীরবে সে পরকে শিখাইতে চায়।

নাস্তিকতার পরিণাম সম্পর্কে এক ঘটনার কাহিনী তাহার অন্তরে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার অবশ্য শোনা কথা, তাহার জীবনকালে ঘটিলেও সে তখন ছিল নিতান্তই শিশু। তাহার বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথ মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র। বিশ্বনাথের পিতা পণ্ডিত

শশীশেখরের কাহিনী সেটি। পণ্ডিত শশীশেখর তাঁহার পিতা ওই ঋষিতুল্য ন্যায়রত্নের অমতে ইংরেজী শিখিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ দেশে ব্রাহ্মণসভা ডাকিয়া পুরাতন কালের কুসংস্কার বর্জনের একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিবেশনটার তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। সেই অধিবেশনে তিনি সর্বাগ্রে নারায়ণশিলা স্থাপন করিয়া অর্চনা না করার জন্য ন্যায়রত্ন শিহরিয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করেন। নাস্তিক শশীশেখর নাস্তিকতাবাদের যুক্তিতে পিতার সহিত তর্ক করেন! সভা পণ্ড হয়। শুধু তাই নয়, উদ্‌ভ্রান্ত শশীশেখরের মৃত্যু হয় অপঘাতে, রেল এঞ্জিনের তলায় তিনি স্বেচ্ছায় কাটা পড়েন। ঘটনার সংঘটন তাই বটে, কিন্তু দেবু ঘোষ তাহার মধ্যে দেখিতে পায় কর্মফলের অলঙ্ঘ্য বিধান। দেবুর সব চেয়ে বড় দুঃখ—এই পরিণতি জানিয়াও ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথও নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে। সে এখন কলিকাতায় এম-এ পড়ে। যখন আসে তখন দেবুর সঙ্গে দেখা করে। এম-এ ক্লাসের ছাত্র হইয়াও কিন্তু বিশ্বনাথ এখনও তাহার বন্ধুই আছে। বয়সে সে দেবুর পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট হইলেও দেবুর বন্ধু সে; স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন বিশ্বনাথ তাহাকে দেবু-দা বলিত। বয়সের সঙ্গে দেবু আপনার ও বিশ্বনাথের সামাজিক পার্থক্য বুঝিয়া বলিয়াছিল—তুমি আমাকে দাদা ব'লো না কিন্তু ভাই; আমার ওতে অপরাধ হয়। বিশু তখন হইতে দেবুকে বলে দেবু-ভাই। এখন তাহার বন্ধু—সত্যকারের বন্ধু। কখনও শ্রেষ্ঠত্বের এতটুকু তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক-স্পর্শ সে তাহার সান্নিধ্যে অনুভব করে না। এই বিশ্বনাথও সন্ধ্যাহ্নিক করে না, এই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়াও কখনও দেবতাকে প্রণাম করে না।

দেবু কিছুদিন আগে এই চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে তাহার চিন্তার কথা বিশ্বনাথকে বলিয়াছিল; কি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপটির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়, সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল—সে আর হবে না, দেবু-ভাই। চণ্ডীমণ্ডপটা বুড়ো হয়েছে, ও মরবে এইবার।

—বুড়ো হয়েছে? মরবে মানে?

—মানে, বয়স হলেই মানুষ যেমন বুড়ো হয়, তেমনি চণ্ডীমণ্ডপটা কত কালের বল তো? বুড়ো হয় নি?

চাল-কাঠামোর দিকে চাহিয়া দেবু বলিয়াছিল—ভেঙে নতুন করে করতে বলছ?

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল; বলিয়াছিল—রঙিন পেনীফ্রক পরলেই বুড়ো খোকা হয় না, দেবু-ভাই! এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চলবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

করতে পার? কর না ওই ঘরটাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, দেখবে দিনরাত লোক আসবে এইখানে। ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে।

তারপর সে অনেক যুক্তিতর্ক দিয়া দেবুকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল—টাকাই সব। সেকালের ধর্মমত সামাজিক ব্যবস্থার ভিতরেও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে নাকি ওই টাকাটাই ছিল ধর্ম, কর্ম, স্বর্গ, মর্ত্য, নরক সমস্ত কিছুর ভিত্তি। ভিত্তির সেই টাকার মশলাটা শূন্য হইয়া যাওয়াতেই এই অবস্থা!

দেবু বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল—না—না—না।

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল।

দেবু প্রতিবাদ করিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল—ছি—ছি—ছি, বিশু-ভাই। তুমি ঠাকুর মশায়ের নাতি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

বিশ্বনাথ আরও কিছুক্ষণ হাসিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—আমি কতকগুলো বই পাঠিয়ে দেব, দেবু-ভাই, তুমি পড়ে দেখ।

—না। ওই সব বই ছুঁলে পাপ হয়। ও-সব বই তুমি পাঠিয়ো না।

সে প্রাণপণে আপন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহাকে সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। তাই নবান্নের দিনে অনিরুদ্ধকে এই চণ্ডীমণ্ডপে পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে সামাজিক শাস্তি দিবার জন্য জগনের সহিত মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সারা গ্রামটার আর একজনও কেহ তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না। অনিরুদ্ধও বিনা দ্বিধায় অবলীলাক্রমে ভোগপূজার থালা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধের পিতৃ-পিতামহের কিন্তু এ সাধ্য ছিল না।

দেবু দিশাহারা হইয়া কয়েকদিন ধরিয়াই এইসব ভাবিতেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় হয়তো দেবতা একদিন আপন মহিমায় জাগ্রত হইবেন—অন্যায়ের ধ্বংস করিবেন, ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। শাস্ত্রের বাণীগুলি সে স্মরণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কিছুক্ষণ পরেই সে হতাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পাতু মুচী সেই একটি দিনের দিকে চাহিয়াই বাঁচিয়া আছে। সেই ভরসায় সে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বোঝা মাথায় লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেবু যে তাহাদের মত কোনমতেই ওই ভরসায় এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

*　　　*　　　*

পাঠশালার ছুটি দিয়াও দেবু একা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। পথ হইতে কে ডাকিল—পণ্ডিতমশায় গো!

—কে?

—ওরে বাস্ রে! বসে বসে কি এত ভাবছ গো?—মুচীদের দুর্গা দুধ বেচিতে যাইতেছিল, পথ হইতে দেবুকে ডাকিয়া সে-ই কথা বলিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—সে খবরে তোর দরকার কি রে?

মেয়েটাকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না; সে স্বৈরিণী—সে ভ্রষ্টা—সে পাপিনী; বিশেষ করিয়া সে ওই ছিরুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাহাকে সে ঘৃণা করে।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—খবরে আমার দরকার নাই, দরকার তোমার বউয়ের। পথের পানে চোখ চেয়ে বিলু দিদি বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই তো!—দেবুর এতক্ষণে চমক ভাঙিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঃ, এ যে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে! চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া সে হন্ হন্ করিয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। ভাল মানুষ বউটি সত্যই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল—রান্না হয়ে গিয়েছে, চান কর!

দেবুর জীবনে এই এক পরম সম্পদ। ঘরে তাহার কোন দ্বন্দ্ব নাই, অশান্তি নাই। তাই বোধ হয় বাহিরে বাহিরে সমগ্র গ্রামখানি জুড়িয়া দ্বন্দ্ব অশান্তি সন্ধান করিয়া ফিরিয়াও তাহার ক্লান্তি আসে না।

দেবু চলিয়া গেলেও দুর্গা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, দেবু যে পথে গেল, সেই পথ-পানে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। পণ্ডিতকে তাহার ভালো লাগে—খুব ভাল লাগে। ছিরুকে সে এখন ঘৃণা করে; সেই আগুন লাগানোর সংবাদ সে কাহাকেও বলে না; ঘৃণায় তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ছিরুর সহিত যখন তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল—তখনও তাহার পণ্ডিতকে ভাল লাগিত; ছিরু অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল লাগিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই দুই ভাল লাগার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। আজ পণ্ডিতকে পূর্বাপেক্ষা যেন আরও বেশী ভাল লাগিল।

পণ্ডিতের সহিত তাহার একটা সম্বন্ধও আছে। রক্তের সম্বন্ধ নয়, পাতানো সম্বন্ধ। দেবুর বউ বিলুকে তাহার মা এককালে কোলেপিঠে করিত। সেই কারণে সে বিলুকে দিদি বলে। দেবু পণ্ডিত তাহার বিলু দিদির বর।

বারো

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে 'ইতুলক্ষ্মী'-পর্ব আসিয়া গেল।

অন্যান্য প্রদেশে—বাংলাদেশে বিশেষ অঞ্চলে কার্তিক-সংক্রান্তি হইতে ইতু বা মিত্র-ব্রত আরম্ভ হয়, শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবিশস্যের কল্যাণকামনা করিয়া সূর্য-দেবতার উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব।

দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া সূর্য-দেবতার আরাধনার প্রচলন নাই। এদেশে রবিশস্যের চাষের বিশেষ প্রসার নাই; ধান-চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকর্ম। ইতু-পর্বকে এখানে ইতুলক্ষ্মী বা ইতু-সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়! হৈমন্তীধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ প্রারম্ভের পর্ব এটি এবং রবিবার অবান্তরও বটে। চাষীদের আপন খামারে ইহার অনুষ্ঠান হয়। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত একটি বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া সেই খুঁটির তলায় আল্পনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মীর পূজা ভোগ হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় ওই খুঁটিটির চার-দিকেই ধানসুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু মহিষগুলি ওই খুঁটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে পোয়ালের উপর পাক দিয়া ফিরিবে। তাহাদের পায়ের খুরের মাড়াইয়ে খড় হইতে ধান ঝাড়াই হইয়া যাইবে।

এ পর্বের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের সম্বন্ধ বিশেষ নাই। তবে মেয়েরা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করিয়া লক্ষ্মী পাতিবে না। পূর্বকালে আরও খানিকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দেবুর মনে আছে, পনেরো বৎসর পূর্বেও লক্ষ্মীপূজার শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা আসিয়া এইখানে সমবেত হইয়া সুপারি হাতে ব্রত-কথা শুনিতে বসিত। গ্রামের প্রবীণা কেহ ব্রত-কথা বলিতেন। অপর সকলে শুনিত। আজকাল সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। এখন দুই তিন বাড়ীর মেয়ের কোন এক বাড়ীতে একত্রিত হইয়া ব্রতকথা শুনিয়া লয়। দেবুর বাড়ীতেও এই ব্রতকথার আসর বসে। আজ দেবু পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে সেদিন হইতে সমস্ত প্রেরণা ও শক্তি ক্ষুব্ধ ও আহত হইয়া অহরহ তাহাকে পীড়িত করিতেছে। যে কোন সুযোগ পাইলেই তাহা অবলম্বন করিয়া আবার সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে চায়। জগন ডাক্তারের সহিত যোগাযোগ আবার স্বাভাবিক নিয়মের বশে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। জগন ডাক্তারের ওই দরখাস্ত করার পন্থাটাকে সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। দরখাস্তের কথায় তাহার হাসি আসে। অন্তর জলিয়া উঠে।

সে সাহিত্য পড়াইতেছিল—

"অট্টালিকা নাহি মোর নাহি দাস-দাসী
ক্ষতি নাই, নহি আমি সে সুখ-প্রয়াসী।
আমি যাই ছোট ঘরে বড় মন লয়ে,
নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে!
পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান,
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান?"

সহসা তাহার নজরে পড়িল—একটি দীর্ঘাঙ্গী অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে পথের ধার হইতেই চণ্ডীমণ্ডপের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। চণ্ডীমণ্ডপে সে বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই উঠিল না; কারণ তাহার পদক্ষেপে কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। দেবু তাহাকে চিনিল—অনিরুদ্ধের স্ত্রী। বুঝিল নবান্নের দিনের সেই ঘটনার জন্যই অনিরুদ্ধের স্ত্রী চণ্ডীমণ্ডপের উপরে উঠিল না। মুহূর্তে দেবুর মন খারাপ হইয়া গেল। অনিরুদ্ধের স্ত্রী ওই যে নীরবে পথের উপর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, তাহার প্রতিটি ভঙ্গি যেন রুদ্ধ-বেদনায় ব্যথিত বিষণ্ণ বলিয়া তাহার মনে হইল। একা আসিয়া একা চলিয়া গেল, যেন বলিয়া গেল —একা আমিই কি দোষী? দেবু অনিরুদ্ধের স্ত্রীর গমন-পথের দিকেই চাহিয়া রহিল, মেয়েটির ধীর পদক্ষেপ যেন ক্লান্ত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। কাজটা সত্যই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তটিতে তাহার বিচারবুদ্ধির ত্রুটি স্বীকার না করিয়া পারিল না? অনিরুদ্ধের অন্যায়ের চেয়ে গ্রামের লোক যে অনিরুদ্ধের প্রতি অন্যায় করিয়াছে বেশী! ধান না দেওয়ার জন্যই অনিরুদ্ধ কাজ বন্ধ করিয়াছে। মজলিসে ছিরু আগে অপমান করিয়াছে, তবে অনিরুদ্ধ উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধের চার বিঘা বাকুড়ির ধান কাটিয়া লওয়ার প্রতিকার যখন কেহ করিতে পারে নাই, তখন অনিরুদ্ধকে শাস্তি দিবার অধিকারই বা কাহার আছে? অকস্মাৎ সে বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল, মনের চিন্তাধারায় একটা ছেদ পড়িয়া গেল—একি! অনিরুদ্ধের স্ত্রী তাহার বাড়ীর দিকেই যাইতেছে কেন?—

পাঠশালার ছেলেগুলা পণ্ডিতের স্তব্ধতার অবকাশ পাইয়া উশখুশ করিতে শুরু করিয়াছিল। একটি ছেলে বলিল—আজ ইতুলক্ষ্মী, মাস্টার মহাশয় আজ আমাদের হাপ-ইস্কুল হয়। ন'টা বেজে গিয়েছে ঘড়িতে।

দেবুর সম্মুখেই থাকে একটা টাইমপিস্। দেবু ঘড়িটার দিকে চাহিয়া আবার পড়াইতে শুরু করিল—

"শৈশব না যেতে ক্ষেতে শিখিয়াছি কাজ',
সেই তো গৌরব মোর তা'তে কিবা লাজ?"

ধীরে ধীরে সমস্ত কবিতাটি শেষ করিয়া দেবু বলিল—কালকে এই পদ্যটির মানে লিখে আনবে সবাই। মানে বলতে কথার মানে নয়, কে কি বুঝেছে লিখে আনবে।

পাঠশালার ছুটি দিয়া সে আজ সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বাড়ীর উঠানে তখন তাহার স্ত্রীর সম্মুখে বসিয়া আছে পদ্ম, অদূরে বসিয়া আছে দুর্গা; তাহার স্ত্রী ইতুলক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতেছে। দেবুর স্ত্রী বড় ভাল উপকথা বলিতে

পারে, এ পাড়ায় ব্রতকথার আসর তাহার ঘরেই বসে। সে আসর শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বোধ হয় দ্বিতীয় দফা। দেবুর শিশু-পুত্রটিকে কোলে লইয়া পদ্ম বসিয়াছিল, দেবুকে দেখিয়া সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। দেবুর স্ত্রীও ঘোমটা অল্প একটু টানিয়া হাসিল। দুর্গা কাপড়চোপড় সামলাইয়া গুছাইয়া বেশ একটু বিন্যাস করিয়া বসিল। তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল মৃদু হাসি। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা দেবুর ছিল না। ব্রতকথা তাহার স্ত্রী ভাল বলে—চমৎকার বলে, তাহাদের পাড়ার সকলেই প্রায় ব্রতকথা শুনিতে তাহার বাড়ীতে আসে। কিন্তু আজ কামার-বউয়ের তাহার বাড়ীতে আসাটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি বিস্ময়কর।

নবান্নের দিন দেবু ওই বধূটিকে কঠোরভাবে ভোগ ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিল। আজও কিছুক্ষণ আগেই পদ্ম পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপে উঠে নাই অথচ তাহারই বাড়ীতে ব্রত-কথা শুনিতে আসিয়াছে,—এ ব্যাপারটা সত্যই তাহার কাছে বিস্ময়কর মনে হইল। দেবু থমকিয়া দাঁড়াইল, পদ্মকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল দুর্গাকে—কি রে দুর্গা ?

দুর্গার মুখে মৃদু হাসি বিকশিত হইয়া উঠিল, হাসিয়া সে বলিল—কথা শুনতে এসেছি দিদির কাছে। এমন কথা কেউ বলতে পারে না, বাপু। হাজার হোক পণ্ডিত-গিন্নী তো ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—দিদি ? কথাটা তাহাকে পীড়া দিয়াছিল।

—হ্যাঁ গো। দিদি ! তোমার গিন্নী যে আমার বিলু দিদি, তুমি যে আমার জামাইবাবু।

দেবুর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল ; কঠোর স্বরেই বলিল—মানে ? ও দিদি কি করে হল তোর ?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—হেই মা ! আমার মামার বাড়ী যে তোমার শ্বশুরদের গাঁয়ে গো ! আমার মামারা যে দিদিদের বাপের বাড়ীর খেয়ে মানুষ—পুরানো চাকর ! দিদি যে আমার মামাকে কাকা বলে ; তা হলে আমার দিদি নয় ?

ভাল না লাগিলেও প্রসঙ্গটা সম্পর্কে তাহাকে নীরব হইতে হইল। শুধু বলিল—হুঁ। তারপর স্ত্রীকে বলিল—উটি আমাদের কর্মকারের, মানে অনিরুদ্ধের স্ত্রী নয় ?

দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল—কামার-বউয়ের কথা শোনা হয় নাই। ওদের বাড়ী গেলাম তো দেখলাম—ভাম হয়ে বসে ভাবছে। উ পাড়ায় কথা

হয় ওই পালের বাড়ীতে—ছিরু পালের বাড়ীতে! ওদের বাড়ী যায় না কামার-বউ; তাতেই বললাম—এসো, আমার দিদির বাড়ীতে এস।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—কামার-বউ ভয় করছিল, পণ্ডিতমশায় যদি কিছু বলে! সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে তুমি নাকি বলেছিলে—

মধ্যপথেই বাধা দিয়া দেবু বলিল—অনিরুদ্ধ যে মহা অন্যায় করেছে।

অকুণ্ঠিত স্বরে অভিযোগ করিয়া বলিল—তোমার মত লোকের যুগ্যি কথা হল না, পণ্ডিতমশায়। অন্যায় কি একা কর্মকারের? বল তুমি?

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা বটে! বুঝতে আমার ভুল খানিকটা হয়েছিল। সুযোগ পাইয়া বিনা দ্বিধায় সে ওই দুর্গার মারফতে কামার-বউয়ের কাছে কথাটা স্বীকার করিয়া ভারমুক্ত হইতে চাহিল।

দেবুর স্ত্রী চাপা গলাতেই ব্যস্ত হইয়া বলিল—কেঁদ না কামার-বউ, কেঁদ না!

পদ্ম ঘোমটার আঁচল দিয়া বার বার চোখ মুছিতেছিল; সেটা লক্ষ্য করিয়াছিল।

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—না, তুমি কেঁদ না। অনিরুদ্ধ আমার ছেলেবেলার বন্ধু; একসঙ্গে পাঠশালায় পড়েছি। তাকে বল, আমি যাব—আমি নিজেই যাব তার কাছে।

দুর্গা পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তোমাকে বলেছিলাম তো কামার-বউ, ওই জগন ডাক্তারের মোড়লির পাল্লায় পড়ে জামাই আমাদের এ কাজ করেছে।

—না, না, মিছে পরকে দোষ দিসনে দুর্গা। ভুল—আমারই বুঝবার ভুল

এমন আন্তরিকতা-মাখা কণ্ঠে অকপট স্বীকারোক্তি সে করিল যে দুর্গা পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল।

দেবুই আবার বলিল—ওগো অনিরুদ্ধের বউকে জল খাইয়ে তবে ছেড়ে দিও।

—আর আমি? দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।—ওঃ, আমি বুঝি বাদ যাব? বেশ জামাইদাদা যা হোক।

স্বৈরিণী মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গি, আত্মীয়তার সুর এমন মিষ্ট এবং মনকাড়া যে, কিছুতেই রাগ করা যায় না তাহার উপর। তাহার কথায় দেবুর বউ হাসিল, পদ্ম হাসিল; দেবুও না হাসিয়া পারিল না। হাসিয়া দেবু বলিল—তোর জন্য ভাবনা তো আমার নয়, সে ভাবনা ভাববে তোর দিদি। আপনার জন থাকতে কি পরের আদর ভাল লাগে রে?

দেহটাকে পাকাইয়া তুলিয়াছে ; দুই পোয়াটাক তেল সে সর্বাঙ্গে মাখে, মধ্যে মধ্যে আবার হলুদ মাখে। সে বলে—তোরা সাবাং মাখিস—আমি হলুদ মাখব না ? রোজ স্নানের পূর্বে চণ্ডীমণ্ডপে ঝাঁট বুলাইয়া পরিষ্কার করিয়া যায়। এটি তাহার নিত্যকর্ম।

—ইতুলক্ষ্মীতে হাপ স্কুল বুঝি ? তা বেশ করেছিস। বুড়ী অবিলম্বে ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—কত গান শুনেছি এখানে ভাই নাতি—নীলকণ্ঠ, নটবর, যোগীন্দ ; মতিরায়ও একবার এসেছিল। বড় যাত্রার দল। কেত্তন, পাঁচালী কত হত ভাই! তোরা আর কি দেখলি বল ? সে রামও নাই—সে অযুধ্যেও নাই। চণ্ডীমণ্ডপ নিকুবার জন্যে তখন মাইনে করা লোক ছিল, দিনরাত তক্‌-তক্‌ ঝক্‌-ঝক্‌ করত। সিঁদুর পড়লে তোলা যেত।

বুড়ী আপন মনেই বকিয়া যায়। জীবনের যত সমারোহের সুখস্মৃতি—সে সমস্তই সে আহরণ করিয়াছে এই স্থানটি হইতে। এখানে আসিয়া তাহার সব কথা মনে পড়িয়া যায়। রোজ সে এই কথাগুলি বলে।—কত বড় বড় মজলিস ভাই, গাঁয়ের মাতব্বররা এসে বসত, বিচার হত ; ভালমন্দতে পরামর্শ হত। তখন কিন্তুক মেয়েদের পা বাড়াবার যো থাকত না। ওরে বাস রে, মোড়লের সে হাঁকাড়ি কি ?

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি মলেই দিদি চণ্ডীমণ্ডপে আর ঝাঁট পড়বে না।

বুড়ীর ঝাঁটা মুহূর্তে থামিয়া গেল, উদাসকণ্ঠে বলিল—মা কালী—বুড়ো বাবা আপনার কাজের ব্যবস্থা করে নেবে রে ভাই।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বুড়ী বলিল—মরবার সময় যেন তোরা ধরাধরি করে এইখানে এনে বুড়ীকে শুইয়ে দিস, ভাই!

দেবু বলিল—তা দোব! তুমি কিন্তু তোমার কিছু পোঁতা টাকা আমাদের দিয়ে যেও—চণ্ডীমণ্ডপটা মেরামত করাব।

অন্য কেহ এ কথা বলিলে বুড়ী আর বাকী রাখিত না, তাহাকে গালি-দিতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে কাঁদিতে বসিত। কিন্তু দেবু যেন এ গ্রামের অন্য সকল হইতে পৃথক মানুষ। বুড়ী তাহাকে গালিগালাজ না দিয়া বলিল—হ্যাঁ, নাতি, তুইও শেষে এই কথা বললি ভাই ? গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে, দুধ বেচে, একটা পেট খেয়ে টাকা জমানো যায় ? তুইই বল ক্যানে!

বুড়ী এবার খস্‌ খস্‌ করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে ঝাঁটা চালাইতে আরম্ভ করিল। টাকার কথাটা সে আর বাড়াইতে চায় না। টাকার কথা হইলেই বুড়ীর ভয় হয়—হয়তো কেহ কোনদিন রাত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া সর্বস্ব

লইয়া পালাইবে। বুড়ীর কিছু টাকা আছে সত্য,—দুই-তিন জায়গায় মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। বেশী নয়, সর্বসমেত দশ কুড়ি পাঁচ টাকা।

*　　　*　　　*

মন্থরগতি—উত্তেজনাহীন পল্লীজীবন। ইহারই মধ্যে রাস্তায় মানুষ চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল দুই-একখানা গরুর গাড়ীতে মাঠ হইতে ধান আসিতেছে। কাঁচ-কোঁচ-ক্যোঁ—একঘেয়ে করুণ শব্দ উঠিতেছে। কর্মহীন দেবুও অলসভাবে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিল। পৌষ মাস গেলে—মাঠের ধান ঘরে আসিলে, এ গাড়ী কয়খানাও আর যাওয়া-আসা করিবে না। সেবার বিশু-ভাই একটা কথা বলিয়াছিল—'আমাদের গ্রামের সেই গরুর গাড়ী চ'ড়ে জীবন-যাত্রা আর বদলাল না। গ্রামগুলো গরুর গাড়ী চড়ে বলেই এমন পিছিয়ে আছে, জীবনটাই হয়ে গেছে 'ঢিমে তেতালা'। অন্য দেশে চাষের কাজে এখন চলছে কলের লাঙল, মোটর-ট্রাকটর। তাদের গ্রাম চলে লরীতে ট্রাকে।

দেবু অবশ্য বিশ্বনাথের কথা স্বীকার করে না। কিন্তু গরুর গাড়ী চড়িয়া এখানে যে জীবন চলিয়াছে সে কথা মিথ্যা নয়। ঢিমা ঢিলা চালে কোনমতে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে—ওই চাকার ক্যোঁ-ক্যোঁ শব্দের মত কাতরাইতে কাতরাইতে।

ভূপাল বাগ্দী চৌকিদারি আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—পেনাম পণ্ডিত-মশায়! ভূপালের পিছনে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে, হাতে একটি হাঁড়ি।

দেবু অন্যমনস্কভাবেই হাসিয়া বলিল—ভূপাল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার নিকিয়ে-চুকিয়ে দিয়ে যাই চণ্ডীমণ্ডপটি। লে গো লে, সেই উ-পাশ থেকে আরম্ভ কর।

মেয়েটার হাতের হাঁড়িতে ছিল গোবর-মাটির গোলা, সে নিকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভূপাল—সরকারী চৌকিদার আবার জমিদারের লগ্দীও বটে; আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র—এই তিন কিস্তির প্রারম্ভে তিনবার চণ্ডীমণ্ডপ তাহাকে গোলা দিয়া নিকাইতে হয়। লগ্দীর পাঁচটা কর্তব্যের মধ্যে এটাও একটা।

দেবু এবার সচেতন হইয়া হাসিয়া বলিল—এ যে হরিঠাকুরের পুজো করা হ'চ্ছে ভূপাল। চক্রবর্তী ঠাকুরের পুজো করার মত কাণ্ড হচ্ছে ভূপাল। পাঁচখানা গাঁয়ে চক্রবর্তী ঠাকুর পুজো করে। একদিন এক গাঁয়ে গিয়ে একেবারে পাঁচদিনের পুজো ক'রে দিয়ে আসে। আবার পাঁচদিন পরে যায়। পৌষ-কিস্তির যে এখনও অনেক দেরি হে!

পণ্ডিতের কথায় ভূপাল না হাসিয়া পারিল না, বলিল—আজ্ঞে আমাদের যুধিষ্ঠির থানাদারও (চৌকিদার) তাই করে; সন্ঝে-বেলায় বার হয়, রাত্রে

তিনবার হাঁক দেবার কথা—ও একবারেই তিনবার হাঁক দিয়ে ঘরে এসে শোয়।

দেবু সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ভূপাল বলিল—আমি সেটা করি না,—পণ্ডিতমশায়। গোমস্তামশায় এসে গিয়েছেন আজ।

—এসে গিয়েছেন? এত সকালে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার সকাল-সকালই বটে। সেটেল্‌মেণ্টার এসেছে কিনা।

—সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্প?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ধুমধাম কত, তাঁবুটাবু নিয়ে সে বিশ-পঁচিশখানা গাড়ী। শুনেছি 'খানাপুরী' আরম্ভ হবে ৭ই পৌষ হ'তে। আজই সন্‌ঝেতে বোধ হয় ঢোল শহরত হবে। খেয়েই আমাকে কঙ্কণা যেতে হবে।

সেটেল্‌মেণ্টের খানাপুরী? সমস্ত মাঠ জুড়িয়া পাকাধান—সেই ধানের উপর শেকল টানিয়া—বুটজুতায় ধান মাড়াইয়া—খানাপুরী?

ভূপাল বলিল—ধান এবার মাঠেই ঝাড়াই হবে পণ্ডিতমশায়।

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে অন্যায়! এ যে অবিচার!

তেরো

"যিনি করেন 'ইতুলক্ষ্মী' তাঁর ভাগ্যি হয় ব্রতকথার 'ঈশনে'—মানে 'ঈশানী'র মত। ধান, কলাই, ছোলা, মুগ, যব, সরষে, তিসি, নানান, ফসলে থৈ থৈ করে ক্ষেত, গাড়ীতে গাড়ীতে তুলে ফুরোয় না। খামার জুড়ে মরাই বেঁধে কুলোয় না। একমুঠো তুলতে দু-মুঠো হয়। তার ক্ষেত-খামার ভাঁড়ার ভরে মা-লক্ষ্মী অচল হয়ে বাস করেন। ঘর ভরে যায় সন্তান-সন্ততিতে, গোয়াল ভরে ওঠে গরুতে-বাছুরে; গাছ-ভরা ফল, পুকুর-ভরা মাছ, লক্ষ্মীর হাঁড়িতে কড়ি, আট অঙ্গ সোনারূপোয় ঝল্‌-ঝল্‌ করে। বউ বেটা আসে, নাতি-নাতনী পাশে শুয়ে স্বামী কোলে মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে।"

ব্রতকথা শেষ করিয়া 'উলু' 'উলু' হুলুধ্বনি দিয়া দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা শেষ করিয়া প্রণাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা এবং পদ্মও হুলুধ্বনি দিয়া প্রণাম করিল। দুর্গার কণ্ঠস্বর যেমন তীক্ষ্ণ, তাহার জিভখানিও তেমনি লঘু চাপল্যে চঞ্চল,—তাহার হুলুধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীটা মুখরিত। প্রণাম করিয়া সুপারিটি দেবুর স্ত্রীর সম্মুখে রাখিয়া সে সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বিলু দিদি, ভাই কামার বউ, মরণকালে তোমরা কেউ আমাকে স্বামী ধার দিয়ো ভাই কিন্তুক!

দেবুর স্ত্রীর নাম বিল্ববাসিনী—ডাক নাম বিলু। বিলু হাসিল। তাহার

স্বামীকে সে জানে, সে রাগ করিল না। অন্য কেহ হইলে এই কথা লইয়া একটা ঝগড়া বাধাইয়া দিত। এই স্বরূপা স্বৈরিণী মেয়েটা যখন মৃদু বাঁকা হাসি হাসিতে হাসিতে পথে বাহির হয়, তখন এই অঞ্চলের প্রতিটি বধূই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। লজ্জা নাই—ভয় নাই—পুরুষ দেখিলেই তাহার সহিত দুই-চারিটা রসিকতা করিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যায়।

পদ্মও রাগ করিল না। কয়েকদিন হইতেই দুর্গা তাহার বাড়ী আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছে। অনিরুদ্ধকে সে একখানা দা গড়িতে দিয়াছে, সেই তাগাদায় সে এখন দুই বেলা যায় আসে—অনিরুদ্ধের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করে—হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু খরিদ্দারকে কিছু বলা চলে না। তাহা ছাড়াও, ইদানীং পদ্ম যেন অকস্মাৎ পাল্টাইয়া অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ যেন তাহার জীবনে একটা সকরুণ উদাসীনতা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া সারা জীবনটাকে জুড়িয়া বসিয়াছে; এই শীতকালের ভোলবেলায় কুয়াশার মত। ঘর ভাল লাগে না, অনিরুদ্ধ সম্পর্কেও তাহার সেই সর্বগ্রাসী আসক্তিও যেন হতচেতন মানুষের বাহুবন্ধনের মত ক্রমশ এলাইয়া পড়িয়াছে। অনিরুদ্ধ-দুর্গার রহস্যলীলা সে চোখে দেখিয়াও কিছু বলে না, দেবুর শিশুপুত্রকে আপনার কোল হইতে বিলুর কোলে তুলিয়া দিয়া বলিল—আমার তো ভাই ওইটুকুই পুঁজি! বাদবাকী গরু-বাছুর-বউ-বেটা—বলে 'শির নেই তার শিরঃপীড়া'! —নাতি-নাতনী! বলিয়া সে একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল—চলি ভাই, পণ্ডিতগিন্নী।

বিলু তাহার হাত ধরিয়া বলিল—জলখাবার নেমতন্ন দিয়ে গিয়েছে—তোমার বরের বন্ধু। দাঁড়াও একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও!

বিলুর কোলের শিশুটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বার বার চুমা খাইয়া পদ্ম বলিল—খোকামণির 'হামি' খেয়ে পেট ভরে গিয়েছে। এর চেয়ে মিষ্টি আর কিছু হয় নাকি?

—না, তা হবে না।

—তবে দাও ভাই খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাই। ইতুর পেসাদ মুখে দিয়ে খাই কি করে বল? পণ্ডিত না হয় এ সব জানে না পণ্ডিতগিন্নীকে তো আর বলে দিতে হবে না!

পথে বাহির হইয়া দুর্গা বলিল—বিলুদিদি আমার ভারী ভাল মানুষ। যেমন পণ্ডিত তেমনি বিলুদিদি! তবে পণ্ডিত একটুকুন কাঠ-কাঠ, রস কম।

পদ্ম কিন্তু দুর্গার কথা যেন শুনিলই না।—আমাকে ভাই ছিরু পালের বাড়ীর সামনেটা পার করে দাও।

—মরণ! এত ভয় কিসের? দিনের বেলায় ধরে খেয়ে নেবে নাকি? দুর্গা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। কথাটা বলিয়াও দুর্গা কিন্তু পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

পদ্ম বলিল, ওকেই বলি ভাগ্যিমানী। বড়লোক না হোক 'ছচল-বচল' সংসার, তেমনি স্বামী আর ছেলেটি—! আহা, যেন পদ্মফুল! যেমন নরম তেমনি কি গা ঠাণ্ডা। কোলে নিলাম—তা শরীর আমার যেন জুড়িয়ে গেল।

—মা সোন্দার, তার ওপর বাপ কেমন সোন্দার, ছেলে সোন্দার হবে না!

পদ্ম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—কোন কথা সে বলিল না। পথে একটা বছর ছয়-সাতের ছোট ছেলে আদিম কালের বর্বর আনন্দে পথের ধূলার উপর বসিয়া মুঠা-মুঠা ময়দার মত ধূলা আপন মাথায় চাপাইয়া পরমানন্দে হাসিতেছিল। দুর্গা বলিল—এই দেখ, যেমন কপাল—তেমনি গোপাল। যেমন লক্ষ্মীছাড়া বাপ-মা—তেমনি ছেলের রীতিকরণ।

ছেলেটি সদ্‌গোপবংশীয় তারিণীচরণের। তারিণীচরণ একজন সর্বস্বান্ত চাষী, যথাসর্বস্ব তাহার বাকী খাজনার দায়ে নীলাম হইয়া গিয়াছে। সে এখন বাউড়ী, ডোম প্রভৃতি শ্রমিকদের মত দিনমজুর খাটিয়া খায়। তারিণীর স্ত্রীও উপযুক্ত সহধর্মিণী, প্রায় সমস্ত দিনটাই ও বাউড়ী-ডোমের মেয়েদের মত ঝুড়ি লইয়া বনে-বাদাড়ে কাঠ সংগ্রহ করে, শাক খুঁটিয়া আনে, ডোবার পাঁক ঘাঁটিয়া মাছ ধরে। ওগুলো কিন্তু তারিণীর স্ত্রীর বাহ্যাড়ম্বর, ওই অজুহাতে সে চুরি করিবার বেশ একটি সুযোগ করিয়া লয়। আম-কাঁঠাল শসা-কলা-লাউ-কুমড়া কোথায় কাহার ঘরে আছে—সে সব নখদর্পণে। শাক-কাঠ সংগ্রহের অছিলায় সে আশে-পাশেই ঘুরিয়া বেড়ায়। আর সুযোগ পাইলেই পটাপট ছিঁড়িয়া ঝুড়ির তলায় ভরিয়া লইয়া পালাইয়া আসে। আর ওই শিশুটা এমনি করিয়া পথে বসিয়া ধূলা মাখে—কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া আপনিই ঘুমাইয়া পড়ে—হয়তো আপনাদের ঘরের অনাচ্ছাদিত দাওয়ায় অথবা কোন গাছের তলায়, ঠাঁই বাছাবাছি নাই। কোন কোন দিন দূর-দূরান্তেও গিয়া পড়ে; বাপ-মায়ে খোঁজে না, চিন্তিত হয় না। ছেলেটা আপনি আবার ফিরিয়া আসে।

—সর রে, ছেলেটা সর। ধূলো দিস না বাপু, কাল ধোয়া কাপড় পরেছি। —দুর্গা রূঢ় তিরস্কারে সাবধান করিয়া দিল।

—ইঃ! বলিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া ছেলেটা একমুঠা ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দোব ছেলের কষা নিঙ্‌ড়ে। দুর্গা কঠোরস্বরে শাসাইয়া দিল। ধোয়া কাপড়ে ধূলোর ছিটা তাহার কোনমতেই সহ্য হইবে না।

—মিষ্টি দোব, বাবা? মিষ্টি খাবে? পদ্ম ছেলেটিকে তাহার বঞ্চিত জীবনের সকল আকূতি জড়াইয়া সাদরে সম্ভাষণ করিল।

ধূলার মুঠাটা নামাইয়াও ছেলেটা বলিল—মিছে কথা। উ! ভারী চালাক তুই।

আপনার খুঁট খুলিয়া পদ্ম বিলুর দেওয়া মিষ্টিটি বাহির করিয়া বলিল—এইবার ধূলো ফেলে দাও! নক্ষীটি!

—উঁহু। তু আগে ওইখানে ফেলে দে!

—ছি, ধূলো লাগবে। হাতে হাতে নাও।

—হিঃ! তাহ'লে তু ধরে মারবি।

—না, তু ফেলে দে ক্যানে।

—দাও হে, তাই ফেলে দাও। ধুলো! বলে—আঁস্তাকুড়ের পাতা কুড়িয়ে খায়। ধুলো! দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহার রাগ হইতেছিল। সেও বন্ধ্যা কিন্তু তাহার ছেলে ছেলে করিয়া আকূতি নাই।

পদ্ম কিন্তু মিষ্টিটি ফেলিয়া দিতে পারিল না, একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর নীরবেই পথে অগ্রসর হইল।

—কামার-বউ! সকৌতুকে দুর্গা তাহাকে ডাকিল।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া মাটির উপর চোখ রাখিয়া পদ্মর পথে চলা অভ্যাস; সে তেমনি ভাবেই চলিতেছিল। মুখ না তুলিয়াই সে উত্তর দিল—কি?

—ওই দেখ।

—কি? কোথা? কে!

—ওই যে ছামুতে হে!

দুর্গা খুক খুক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাথার ঘোমটা খানিকটা সরাইয়া মাথা তুলিয়া চারিদিক চাহিয়াই সে আবার তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। সম্মুখেই ছিরু পাল খামার বাড়ীর দরজার মুখে মোড়া পাতিয়া বসিয়া আছে। একা নয়, পাশেই বসিয়া আছে আরও একটা লোক; লোকটার চোখ দুইটা ভাঁটার মত গোল-গোল এবং লালচে। নাকটা থ্যাবড়া এবং নাকের পাশে প্রকাণ্ড একজোড়া বাহারের গোঁফ লোকটাকে বেশ একটা চেহারা দিয়াছে। যে চেহারা দেখিয়া মেয়েরা অস্বস্তি বোধ করে। তাহারা দু'জনেই তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। ও-লোকটাকেও

পদ্ম চেনে—লোকটা জমিদারের গোমস্তা! দ্রুতপদে পদ্ম স্থানটা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গার কিন্তু সেই মন্থর গতি-ভঙ্গিমা।

গোমস্তা একবার দুর্গার দিকে চাহিল—তারপর ফিরিয়া তাকাইল শ্রীহরির দিকে। তারপর প্রশ্ন করিল—দুর্গার সঙ্গে কে হে পাল?

—অনিরুদ্ধের পরিবার!

—হুঁ! দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে জোট বেঁধে বেড়াচ্ছে ক্যান হে?

—পরচিত্ত অন্ধকার, কি করে জানব বলুন!

—দুর্গা কি বলে? খায়?

শ্রীহরি গম্ভীরভাবে বলিল—আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি, দাশ মশায়; দুর্গার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলি না।

সবিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাশ বলিল—বল কি হে? সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিকারী গোঁফ জোড়াটা নাচিয়া উঠিল। ওইটা দাশের মুদ্রাদোষ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হঠাৎ? ব্যাপার কি?

—নাঃ। ও নীচ-সংসর্গ ভাল নয় দাশজী! সমাজে ঘেন্না করে, ছোটলোকে হাসে! নিজের মান-মর্যাদাও থাকে না!

ঘরে আগুন দিবার ব্যাপারটা লইয়া দুর্গার সঙ্গে শুধু তাহার কলহই হয় নাই, মনে মনে সে একটা প্রবল অস্বস্তি বোধ করিতেছে। মনে হইতেছে শুইবার ঘরে সে সাপ লইয়া বাস করিতেছে। সাপ নয়, সাপিনী। সে দুর্গা!

হাসিয়া দাশ বলিল—বেশ তো, কামারণী তো আর নীচ-সংসর্গ নয়। বেটাকে যখন জব্দই করবে—তখন ঘরের হাঁড়িসুদ্ধ এঁটো করে দাও না।

শ্রীহরি চুপ করিয়া রহিল। এ কামনাটা তাহার বুকে আগ্নেয়গিরির অগ্নি-প্রবাহের মতোই রুদ্ধমুখ চাপা হইয়া আছে। নাড়া খাইয়া সেই প্রচ্ছন্ন অগ্নিশিখা ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া উঠে।

ওদিকে দাশ ফ্যা-ফ্যা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরির উগ্র চোখ দুইটি সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলিয়া উঠিল। ওই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী বধূটির প্রতি তাহার অন্তরের নগ্ন কামনার একটি প্রগাঢ় আসক্তি আছে। তাহার মনে পড়ে, ডোবার ঘাটে দণ্ডায়মানা পদ্মের অবগুণ্ঠিত মুখ;—বড় বড় চোখ, ছোট কপাল ঘিরিয়া ঘন কালো একরাশি চুল, ঈষৎ বাঁকা নাক, গালের পাশে বড় একটি তিল,—তাহার হাতে শাণিত দা, নিষ্ঠুর কৌতুকের মৃদু হাসিতে বিকশিত ছোট ছোট সুন্দর দাঁতের সারিটি পর্যন্ত তাহার মনোমধ্যে ঝলমল করিয়া উঠে।

দাশ হাসি থামাইয়া বলিল—তোমার টাকা আছে, ভাগ্যিমান লোক তুমি, তুমি যদি ভোগ না কর তো ভোগ করবে কি রামা শ্যামা ?

বহুক্ষণ পরে অজগরের মত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীহরি বলিল—ছাড়ান দেন, দাশজী, ওসব কথা। এখন আমি যা বললাম তার কি করছেন বলুন।

—তার আর কি, 'পাল' কেটে 'ঘোষ' করতে আর কতক্ষণ ? তবে—জমিদারী সেরেস্তার নিয়ম জান তো—'ফেল কড়ি মাখ তেল', জমিদারকে কিছু নগদ ছাড়, দস্তুরী দাও ! আর তা ছাড়া একটা খাওয়াও। শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দাশ বলিল—হ্যাঁ হে, মদও ছেড়েছ নাকি ? যে রকম গতিক তোমার ? দাশ একটু বাঁকা হাসি হাসিল।

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—না, না, সে হবে বৈকি ! তবে কথা হচ্ছে ওসব আর ঢাক পিটিয়ে হৈ-হৈ করে কিছু করব না। গোপনে আপনার ঘরে বসে বসে যা হয় একটু—মাঝে মাঝে—!

—নিশ্চয় ! ভদ্রলোকের মত ! দাশজী বার বার ঘাড় নাড়িয়া শ্রীহরির যুক্তি স্বীকার করিয়া বলিল—একশোবার, আমি আগে কতবার তোমাকে বারণ করিচি মনে আছে ? বলেছি 'পাল, ঐ রকম ধারা-ধরন তোমাকে শোভা পায় না'। যাক, শেষ পর্যন্ত তুমি যে বুঝে সামলেছ—এও ভাল।

দাশজীর কথা শ্রীহরিও স্বীকার করিয়া বলিল—হ্যাঁ, সে আমি বুঝে দেখলাম দাশজী, মান-সম্মান আপনার ও-রকম করে হয় না, সে-কাল এখন আর নাই।

জমিদারী সেরেস্তার বহুদর্শী বিচক্ষণ কর্মচারী দাশজী, সে হাসিয়া বলিল—কোনকালেই হয় না বাবা, কোনকালেই হয় না। ত্রিপুরা সিংয়ের কথা বল তুমি—তাকে লোকে আজও বলে ডাকাত। সেইটা কি মানসম্মান নাকি ? এই দেখ, এই কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবুদের কথা দেখ। বড়লোক হল—তাতেও লোকে বাবু বলত না। তারপর ইস্কুল দিলে, হাসপাতাল দিলে, ঠাকুর পিতিষ্ঠে করলে—অমনি লোকে ধন্যি-ধন্যি করলে, বাবু তো বাবু একেবারে বড়বাবু—বড়বাড়ীর বড়বাবু খেতাব হয়ে গেল।

—এবার চণ্ডীমণ্ডপটা আমিও বাঁধিয়ে পাকা করে দেব, দাশজী ! আর চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একটা কুয়ো !

—ব্যস, ব্যস, পাকা করে খুদে লিখে দাও কুয়োর গায়ে, চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে—সেবক শ্রী শ্রীহরি ঘোষেণ প্রতিষ্ঠিতং ; তারপর তোমার ঘোষ খেতাব মারে কে ? একেবারে পাকা হয়ে যাবে।

—আপনি কিন্তু ওটা করে দেন, সেটেলমেন্টের পরচাতেও ঘোষ লেখাব আমি।

—কাল—কাল—কালই করে নাও না তুমি।

শ্রীহরিদের বংশ-প্রচলিত উপাধি পাল। শ্রীহরি পাল উপাধিটা পাল্টাইতে চায়। অনেকদিন হইতেই সে নিজেকে লেখে ঘোষ; কিন্তু আদালতে ঘোষ চলে না। তাই জমিদারী সেরেস্তায় তাহার নামের জমাগুলিতে পাল কাটাইয়া ঘোষ করিতে চায়। ওদিকে গভর্নমেণ্ট হইতে নূতন সার্ভে হইতেছে; রেকর্ড অব রাইট্সের দপ্তরেও ঘোষ উপাধি তাহার পাকা হইয়া যাইবে। পাল উপাধিটা অসম্মানজনক; যাহারা নিজের হাতে চাষ করে, তাহাদের—অর্থাৎ চাষীদের ঐ উপাধি।

দাশজী আবার বলিল—আর সে-কথাটার কি করছ?

—কোন্ কথা, কামার-বউয়ের কথা?

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—সে তো হবেই হে। সে কথা আবার শুধোয় নাকি? আমি বলছিলাম গোমস্তাগিরির কথাটা।

শ্রীহরি লজ্জিত হইয়া পড়িল। অতর্কিতে সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অপ্রস্তুতের মতই বলিল—আচ্ছা ভেবে দেখি!

ঠিক এই মুহূর্তেই ক্ষুর-ভাঁড় বগলে করিয়া আসিয়া হাজির হইল তারাচরণ পরামাণিক। গভীর ভক্তির সহিত একটি নমস্কার করিয়া মোলায়েম হাসি হাসিয়া সম্ভাষণ জানাইল—পেনাম আজ্ঞে।

কপালের উপরে দৃষ্টি টানিয়া তুলিয়া তারাচরণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাশজী বলিল—এস বাপধন এস। কি সংবাদ?

মাথা চুলকাইয়া তারাচরণ বলিল—গিয়েছিলাম কঙ্কণায়। বাড়ী এসেই শুনলাম, মা বললে···গোমস্তামশাই এসেছেন,—শুনেই জোর-পায়ে আজ্ঞে আসছি—সে অকারণে হাসিতে লাগিল।

তারাচরণের এই হাসিটি তাহার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। যাহার ডাকে সে সর্বাগ্রে না যায়—সে-ই চটিয়া উঠে। তাই তারাচরণ মনস্তুষ্টির জন্য এই মিষ্টি হাসিটি হাসে, শ্লেষে তিরস্কারেও সে এমনি করিয়া হাসে। আরও একটি সত্য সে আবিষ্কার করিয়াছে—সেটিকেও সে কাজে লাগায়। প্রতিবেশীর গোপন তথ্য জানিবার জন্য মানুষের অতি ব্যগ্র কৌতূহল। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সে গ্রামে-গ্রামান্তরে নানাজনের বাড়ীতে যায়। রামের বাড়ীর খবর সে শ্যামকে বলে, শ্যামের সংবাদ যদুকে দেয়; আবার যদুর কথা মধুকে নিবেদন করিতে করিতে তাহার বিরক্তি অপনোদন করিয়া তাহাকে খুসী করিয়া তোলে। সেই অবসরে আবার তাহাদের বাড়ীরও দুই-চারিটি গোপন সংবাদ জানিয়া লয়।

গাড়ু হইতে বাটিতে জল ঢালিয়া লইয়া সে আরম্ভ করিল—কঙ্কনাতে হৈ হৈ কাণ্ড। আজ্ঞে বুঝলেন কিনা! তাঁবু পড়েছে আট-দশটা,—গাড়ী গাড়ী কাগজ জড়ো হয়েছে!

—হুঁ—সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্প বসেছে।

কৌশলী তারাচরণ বুঝিল—এ সংবাদে গোমস্তার চিত্ত সরস হইবে না। চকিত দৃষ্টিতে শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—শ্রীহরির মুখও গম্ভীর। মুহূর্তে সে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া বলিল—এবার পোয়া বারো হল দুর্গা-টুর্গার। দু'হাতে টাকা লুটবে। টেরিকাটা আমিনের দল যা দেখলাম! বুঝলে ভাই পাল।

গোমস্তা ধমক দিল—পাল কি রে, ভাই কি রে? ভাই পাল বলিস কেন? ওকে তুই 'ভাই পাল' বলবার যুগ্যি? 'বুঝলেন' বলতে পারিস না?

—আজ্ঞে?

—ঘোষমশায় বলবি। পাল হল যারা নিজের হাতে চাষ করে। এ গাঁয়ের মাথার ব্যক্তি হলেন শ্রীহরি।

তারাচরণ নীরবে সব শুনিতে আরম্ভ করিল। অনেক কথাই শুনিল—মায় এ গ্রামের গোমস্তাগিরিও যে শ্রীহরি ঘোষ মহাশয় লইতেছেন, সে কথাটা আভাসে সে অনুমান করিয়া লইল। তৎক্ষণাৎ বলিল—একশোবার হাজারবার, ঘোষ মহাশয়ের তুল্য ব্যক্তি এ ক'খানা গাঁয়ে কে আছে বলুন? গোমস্তার গালের উপর ক্ষুরের একটা টান দিয়া সে চাপা গলায় বলিল—উনি ইচ্ছে করলে দুর্গার মত বিশটা বাঁদী রাখতে পারেন!

হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে ক্ষুর চালাইতে নিষেধ করিয়া দাশজী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ কামারের বউরা দুর্গার সঙ্গে জোট বেঁধে বেঁধে বেড়ায় কেন রে? ব্যাপার কি বল তো!

—তাই নাকি? আজই খোঁজ নিচ্ছি দাঁড়ান! তবে কর্মকারের সঙ্গে দুর্গার আজকাল একটুকু—তারাচরণ হসিল।

—নাকি?

—হ্যাঁ!

শ্রীহরি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পদ্মকে লইয়া এমনভাবে আলোচনা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। ওই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির প্রতি তাহার আসক্তি প্রচণ্ড—কামনা প্রগাঢ়, যে আসক্তি ও যে কামনাতে মানুষ মানুষকে, পুরুষ নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্তভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায়, এক জনশূন্য লোকে—সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মতো; অন্ধকার গুহার

নিস্তব্ধতম আবেষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিণীর মতো—শতপাকের নাগপাশের বন্ধনের মধ্যে।

*　　　*　　　*　　　*

পদ্মের বাড়ী আসিয়া দুর্গা দেখিল—পদ্ম আবার স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। পদ্ম দ্রুতপদে চলিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পর দুর্গা কিছুক্ষণ একটা গলির আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোমস্তাটিকে সে ভাল করিয়াই জানে। শ্রীহরির তো নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত তাহার নখদর্পণে। তাহাদের কথাবার্তা শুনিবার জন্যই সে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোমস্তার কথা শুনিয়া সে হাসিল; শ্রীহরির কথাবার্তার ধরনে সে অনুভব করিল বিস্ময়! তারাচরণ আসিতেই সে চলিয়া আসিয়াছে। গামছা কাঁধে ফেলিয়া পদ্ম তখন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল। দুর্গা প্রশ্ন করিল—এ কি? আবার চান?

—হ্যাঁ।

—ছোঁয়াচ পড়লো বুঝি? যে পাঁচ হাত 'সান' তোমার! কিছু ছোঁয়াটা আর আশ্চয্যি কি!

অপ্রস্তুতের মত হাসিয়া পদ্ম বলিল—না—মাড়াই নাই কিছু।

—তবে?

—ছেলেতে ময়লা করে দিলে কাপড়।

—তোমার ওই এক বাতিক, ছেলে দেখলেই কোলে নেবে। নিজের নাই, পরের নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট বাড়াও ক্যানে বল তো? এর মধ্যে আবার কার ছেলে নিতে গেলে।

পদ্ম এবার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিল,—ছিরু পালের ছেলে।

দুর্গা অবাক হইয়া গেল।

পদ্ম বলিল—গলির মুখে বউটি দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কোলে ছোটটা ঘ্যান্‌-ঘ্যান্ করছে, পায়ের কাছে বড়টা কোলে চাপবার জন্যে মায়ের কাপড় ধরে টেনে ছিঁড়ে একাকার করছে আর চেঁচাচ্ছে; বাড়ীর ভেতরে শাশুড়ী গাল পাড়ছে—বিয়েনখাগী, সব খেয়েছিস, আর ও দু'টো ক্যানে? ও দু'টোকেও খা, খেয়ে তুইও যা, আমি বাঁচি। তাই ছোটটাকে একবার নিলাম—মা তখন বড়টাকে নিয়ে চুপ করালে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—পালের বউটি কিন্তুক বড় ভাল মেয়ে, বড় ভাল।

তাহার মনে পড়িয়া গেল সেই সেদিনের কথা।

শ্রীহরির স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্গার কোন অভিযোগ নাই, বরং তাহার কাছে তাহার নিজেরই একটি গোপন অপরাধ-বোধ আছে। এ গ্রামের বধূদের

সকলেই তাহাকে অভিসম্পাত দেয়, কটু কথা বলে—সে-কথা সে জানে। কেবল দু'টি বউয়ের বিরুদ্ধে সে এ অভিযোগ করিতে পারে না ; একজন বিলু দিদি—পণ্ডিতের স্ত্রী, অপরজন শ্রীহরির স্ত্রী। পণ্ডিতের স্ত্রীর না করিবারই কথা—পণ্ডিত সম্বন্ধে তো তাহার আশঙ্কার কিছুই নাই, সে সাধু লোক ; কিন্তু ছিরুর সহিত তার প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও শ্রীহরির স্ত্রী কোনদিন তাহাকে কটু কথা বলে নাই—অভিসম্পাত দেয় নাই। পালের স্ত্রীর সঙ্গে চোখে চোখ রাখিতে তাহার সত্যই লজ্জা-বোধ হয়।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া, অকস্মাৎ বোধ হয়, শ্রীহরির স্ত্রীর প্রসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই সে প্রসাঙ্গন্তরের অবতারণা করিল ; বলিল—কে জানে ভাই, কচি-কাঁচা দেখলে আমার তো গা ঘিন্-ঘিন্ করে ! মা গো !

পদ্ম অত্যন্ত রূঢ়দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

দুর্গা তাহা লক্ষ্যই করিল না, অবশ্য লক্ষ্য করিলেও সে গ্রাহ্য করিত না। তাচ্ছিল্যের একটা বাঁকা হাসির শাণিত ছুরিতে উহাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ধূলায় লুটাইয়া দিত। তেমনি উপেক্ষার ভঙ্গিতে সে বলিয়া গেল—আমাদের বউটার আবার এই বুড়ো বয়সে ছেলেপিলে হবে ! আমি ভাই এখন থেকে ভাবছি—সেই ট্যা-ট্যা করে কাঁদবে, পাখীর বাচ্চার মতো ক্ষণে ক্ষণে কাঁথা কাপড় ময়লা করবে,—মা গোঃ !—মুহূর্তে পদ্মের বিচিত্র রূপান্তর লইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল—কোন্ দেবতার দোর ধরেছিল তোমাদের বউ ?

—দেবতা ? দেবতা তো অনেককেই দয়া করেছে। তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—শেষ ওই ঘোষালের—

—ঘোষালেরা কবচ দেয় নাকি ?

—মরণ তোমার ! ওই হরেন ঘোষালের সঙ্গে বউ-এর এতকালে আশনাই হয়েছে। বউ তো আর বাঁজা নয়, তাই সন্তান হবে।

পদ্ম স্থিরদৃষ্টিতে দুর্গার দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—শুধু তো মেয়েই বাঁজা হয় না, পুরুষেরও দোষ থাকে। তা জান না বুঝি ? সে দৃষ্টান্ত দিতে আরম্ভ করিল ; আশ-পাশ গ্রামের বহু দৃষ্টান্তই সে জানে। এই জীবনের—এই পথের পথিকদের প্রতিটি সংবাদ সে জানে, প্রতিটি জনকে চেনে। তাহারা হয়তো আড়াল দিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চলিতে চায়—কিন্তু সে যে অহরহ পথের উপর অনবগুণ্ঠিত মুখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে পথের যাযাবরীর মত ; ওই পথেই যে সে বাসা বাঁধিয়াছে।

শীতের দিন—জলের হিম মানুষের দেহে যেন স্ঁচ ফুটাইয়া দেয়। সকাল বেলাতেই দুইবার স্নান করিয়া পদ্মের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। সমস্ত দিনেও বেচারী সে অসুস্থতা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। রান্নাশালায় আগুনের আঁচেও সে আরাম পাইল না। রান্নাবান্না শেষ করিয়াও সে কিছু খাইল না, সমস্ত অনিরুদ্ধের ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। কর্মকার সকালেই খাবার বাঁধিয়া লইয়া ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন তাহার নূতন কামারশালায় গিয়াছে।

অপরাহ্ণে সে ফিরিল। পদ্ম চুপ করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিল, অসুস্থ উদাসীনতা তাহার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। অনিরুদ্ধ একে ক্লান্ত, তাহার উপর পথে দুর্গার বাড়ীতে খানিকটা মদ খাইয়া আসিয়াছে। পদ্মের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নির্বাক পদ্মের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া উঠিল—বলি, তোর হল কি ?

পদ্ম এতক্ষণে অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল।

অনিরুদ্ধ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—হল কি তোর ?

শান্তস্বরে পদ্ম জবাব দিল—কি হবে ? কিছুই হয় নাই। শরীরের অসুস্থতার কথা অনিরুদ্ধকে বলিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না, ভালও লাগিল না। পাথরকে দুঃখের কথা বলিয়া কি হইবে ? অরণ্য-রোদনে ফল কি ? কথার শেষে একটি বিষণ্ণ মৃদু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তবে ? তবে উদাসিনী রাই-এর মত বসে রয়েছিস—চালকাঠের দিকে চেয়ে ?

মুহূর্তে পদ্ম যেন দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল—তাহার অলস শিথিল দেহের সর্বাঙ্গে চকিতের জন্য একটি অধীর চাঞ্চল্য যেন খেলিয়া গেল, ডাগর চোখ দু'টি ক্রোধে রক্তাভ, উগ্র ভঙ্গিতে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধের মনে হইল—টুকরা লোহা যেন কামারশালার জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে আগুনের চেয়েও দীপ্তিময় এবং উত্তপ্ত হইয়া গলিবার উপক্রম করিতেছে। পদ্মের দেহখানা পর্যন্ত জলন্ত অঙ্গারের মত দুঃসহ উত্তাপ ছড়াইতেছে। এ মূর্তি পদ্মের নূতন। অনিরুদ্ধ ভয় পাইয়া গেল। এইবার পদ্ম কি বলিবে, কি করিবে—সেই আশঙ্কায় সে অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। পদ্ম কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। তাহার ক্রোধ পাত্রে-আবদ্ধ জলন্ত ধাতুর মতোই তাহার দৃষ্টি ও দেহভঙ্গির মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়া রহিল ;—কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনিরুদ্ধ দেখিল—পদ্ম যেন কাঁপিতেছে ; সে শঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—কি হল পদ্ম ? পদ্ম !

সর্বদেহ সঙ্কুচিত করিয়া পদ্ম বোধ হয় অনিরুদ্ধের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না—কাঁপিতে কাঁপিতে সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

অনিরুদ্ধ ছুটিয়া জগন ডাক্তারের কাছে চলিয়াছিল।

পথে চণ্ডীমণ্ডপের উপরে ডাক্তারের আস্ফালন শুনিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ডাক্তার কেবল আস্ফালন করিতেছে—দরখাস্ত করব। কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম করব।

উর্দি-পরা একজন সরকারী পিওন চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে একটা নোটিশ লট্‌কাইয়া দিতেছে—"আগামী ৭ই পৌষ হইতে এই গ্রামে সার্ভে-সেটেলমেন্টের খানাপুরী আরম্ভ হইবেক। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন-আপন জমির নিকট উপস্থিত থাকিয়া সীমানা সহরদ্দ দেখাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য করা যাইবেক।"

গ্রামের লোকগুলি চিন্তিতমুখে গুঞ্জন করিতেছে।

শ্রীহরি ও গোমস্তা কথা বলিতেছে সেটেল্‌মেন্ট হাকিমের পেশ্‌কারের সঙ্গে। —মাছ—একটা বড় মাছ!

দেবু নীরবে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। অনিরুদ্ধ তাহারই কাছে ছুটিয়া গেল। জংশন হইতে ফিরিবার পথে দুর্গার বাড়ীতে সে সকালবেলার কথা সব শুনিয়াছে। দেবুকে সে বরাবরই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে; সেদিন সে তাহার উপর রাগ ঠিক করে নাই—অভিমানই করিয়াছিল। আজও দুর্গার কাছে সব শুনিয়া; দেবুর উপর তাহার অভিমান দূর হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে।

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল—দেবু ভাই!

—কি, অনি ভাই, কি হল?

অনিরুদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল।

* * *

দেবুই জগন ডাক্তারকে ডাকিল,—শীগ্‌গির চল, অনিরুদ্ধের স্ত্রীর মূর্ছা হয়েছে।

জগন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অনিরুদ্ধের দিকে একবার চাহিল, তারপর নিজেই অগ্রসর হইয়া ডাকিল—এস তাহলে।

সেটেল্‌মেন্ট সংক্রান্ত বক্তৃতা আপাততঃ মুলতবী থাকিল, চলিতে চলিতে

সে আরম্ভ করিল গ্রাম্য লোকের অকৃতজ্ঞতার উপর এক বক্তৃতা।—তবু আমার কর্তব্য করে যাব আমি। চিকিৎসক যখন হয়েছি তখন ডাকবামাত্র যেতে হবে আমাকে, যাব আমি। তিন পুরুষ ধরে গাঁয়ে ফি দেয়নি, আমিও নেব না ফি! ফি? ডাক্তার হাসিল—ওষুধের দামই কেউ দেয় না তো ফি!

দেবু পকেট হইতে বিড়ি বড়ি বাহির করিয়া বলিল—বিড়ি খাও ডাক্তার।

—দাও। বিডিটা দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ডাক্তার বলিল—তোমায় খাতা দেখাব পণ্ডিত—দশ হাজার টাকা! আমাদের দশ হাজার টাকা ডুবিয়ে দিলে লোকে, অথচ খাতিরের লোক হল মহাজন—যারা সুদ নেয়; কঙ্কণার বাবুরা ···ছিরে পাল—এরাই।

জগনের ডাক্তারখানার সম্মুখেই সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারখানা হইতে একটা শিশি লইয়া ডাক্তার বলিল—চল। এক মিনিট—এক মিনিটেই চেতন হয়ে যাবে, ভয় নেই।

চৌদ্দ

আকাশের ভোরের আলো ভাল করিয়া তখনও ফোটে না,—দেবু বিছানা ছাড়িয়া উঠে। শৈশব হইতেই তাহার এই অভ্যাস। একা দেবুর নয়—পল্লীর অধিকাংশ লোকই, দিন শুরু হইবার পূর্ব হইতেই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে। মেয়েরা উঠিয়া দুয়ারে জল দেয়, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে, নিকায়, পুরুষেরা গরু বাছুরকে খাইতে দেয়। ইহা ছাড়াও যাহার বাড়ীতে যখন ধানভানার কাজ থাকে, তখন তাহার বাড়ীতে জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠে রাত্রির শেষ-প্রহর হইতে। রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ-প্রহরে ঢেঁকির শব্দ উঠে দুম-দুম-দুম করিয়া একটি নির্দিষ্ট তালে; মৃদু কথাবার্তার সাড়া পাওয়া যায়, কেরাসিনের ডিবের আলোর আভাস জাগে। পল্লীর এই সময় এই নূতন ধানের সময় অনেক বাড়ী হইতে ঢেঁকির সাড়া উঠেই। আজ কোন বাড়ীতেই সাড়া উঠে নাই। 'ইতুলক্ষ্মী'র পর্ব, শস্যের উপর ঢেঁকির আঘাত দিতে নাই; আজ সঞ্চয়ের দিন!

বিলুকে দেবু বলিল—দেখ আজ বাইরের উঠানটাও নিকুতে হবে। গোমস্তা এসেছে—এখন কিছুদিন বাড়ীতেই পাঠশালা বসবে।

গোমস্তা আসিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপে এখন গোমস্তার কাছারি বসিবে। গ্রাম্য দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত হিসাবে চণ্ডীমণ্ডপের মালিক জমিদার; তবে সাধারণের ব্যবহার্য স্থান—সাধারণের ব্যবহারের অধিকার আছে। সেই অধিকারেই গ্রামের লোক ব্যবহার করে—সেই দায়িত্বে চণ্ডীমণ্ডপটির রক্ষণা-

বেক্ষণও তাহারাই করে। চাঁদা করিয়া খড় তুলিয়া তাহারাই ছাওয়ায়, প্রয়োজন হইলে ভাঙা-ফুঠো তাহারাই মেরামত করায়, এমন কি চণ্ডীমণ্ডপটি তাহারাই একদা নিজেরা চাঁদা তুলিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। সে অনেক পূর্বের কথা,— তখনকার জমিদার মালিক হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন মাত্র। তাহার অধিক দিয়াছিলেন গোটা দুই তাল গাছ—চাল কাঠের জন্য।

চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিয়া দেবু মাঠের দিকে বাহির হইয়া গেল; গ্রামের প্রবীণারা তখন বাবা-শিব ও মা-কালীর দুয়ারে জল ছিটাইয়া প্রণাম করিতেছে। জলে-জলে দেবতার ঘরের চৌকাটের নিচের কাঠ একেবারে পচিয়া খসিয়া গিয়াছে, কপাটের নিচের খানিকটাও ক্ষয়িষ্ণু হইয়াছে। এবার মেরামত না করাইলে পূজার সময় ভোগের সামগ্রীর গন্ধে বিড়াল তো ঢুকিবেই—কুকুর প্রবেশ করিলেও আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না।

খোঁড়া পুরোহিত বলে—এত করে জল দিও না, মা-সকল, জল একটুকুন কম করেই দিও; তোমাদেরই পরলোকের পথে কাদা হবে, পেছল হবে—তাতেই বলছি। শেষে রথের চাকা গেড়ে গিয়ে আর উঠবে না।

মোড়ল-পিসি মুখের মত জবাব দেয়, বলে—রথের ঘোড়া তো আর তোমার ওই তে-ঠেঙে বেতো ঘোড়া নয়, ঠাকুর; তার লেগে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

পুরোহিত হাসিয়া বলে—আমার ঘোড়া সেই রথের ঘোড়ারই বাচ্চা মোড়ল-পিসি। আমার ঘোড়ার তো তিনটে ঠ্যাং ওর মা-বাবার মাত্তর দুটো, শোন নাই, 'ডান ঠ্যাঙটা লটর-পটর, বা ঠ্যাঙটা খোঁড়া, বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া।'

জগন ডাক্তার বলে আরো কর্কশ কঠোর কথা, বলে—কেউ চোর, কেউ ছ্যাঁচড়া, কেউ ছেনাল; হিংসুটে-বদমাশ—কুঁদুলি তো সবাই; সকালে আসেন সব পুণ্যি করতে! নিয়ম করে দাও, দেবতার দোরে জল দিতে হলে সবাইকে রোজ একটি করে পয়সা দিতে হবে; দেখবে একজনাও আর আসবে না। দেখ না পুকুরের জল সব ঘড়া-ঘড়া আনছে আর ঢালছে।

দেবু কোন কথাই বলে না। জগনের কথা অবশ্য মিথ্যা নয়; যে অপবাদ সে দেয়, তাহা অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু নিত্য-নিয়মিত প্রথম প্রভাতে দেবু যখন ইহাদের দেখে, তখন ওই পরিচয়গুলির কোন চিহ্নই তাহাদের চোখেমুখে ভাবে-ভঙ্গিতে সে দেখিতে পায় না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একদল মানুষকে সে দেখে। তখন ইহারা প্রত্যেকেই যেন এক এক কল্পলোকের যাত্রী! ইহারা যদি সদাসর্বদা এমনই মানুষ থাকিত! কিন্তু এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া

বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই প্রতিটি জনই আবার নিজমূর্তি ধারণ করে। কেহ আপনার দুঃখ-কষ্টের জন্য ভগবানকে শতমুখে গালি পাড়ে; কেহ হয়তো ঘাট হইতে অন্যের বাসন তুলিয়া লয়, কেহ হয়তো রাস্তায় প্রতীক্ষা করে 'পাইকারে'র অর্থাৎ গরুবাছুরের দালালের,—বুড়ো গাইটাকে বেচিয়া দিবে; দালালেরা বুড়ো গাই লইয়া কি করে সে সকলেই জানে। কিন্তু কয়েকটা টাকার লোভও সম্বরণ করা তখন ইহাদের সাধ্যের অতীত। মানুষেরা আশ্চর্য, মানুষেরা বিচিত্র—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবু চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল।

কৃষাণেরা মাঠে চলিয়াছে; বাউড়ী, ডোম, মুচী প্রভৃতি শ্রমিক চাষীর দল। পরনে খাটো কাপড়, মাথায় গামছাগানা পাগড়ী করিয়া বাঁধা। তাহার সঙ্গে একখানা পরনের কাপড়ই—গায়ে র‍্যাপারের মত জড়াইয়া হুঁকা টানিতে টানিতে চলিয়াছে; অন্য হাতে কাস্তে ধান-কাটার পালা এখন। গ্রামের চাষী গৃহস্থেরাও অধিকাংশই নিজ হাতে কৃষাণদের সঙ্গেই চাষ করে, তাহারাও কাস্তে হাতে চলিয়াছে। 'খাটে খাটায় দুনো পায়'—অর্থাৎ চাষে যাহারা নিজেরাও সঙ্গে খাটিয়া চাষী মজুরদের খাটায়, তাহাদের চাষে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়—এই প্রবাদ-বাক্যটা ইহারা আজও মানিয়া চলে। এ গ্রামে কেবল দুই-চারিজন নিজেরা চাষে খাটে না। হরেন্দ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণ, জগন ঘোষ একে কায়স্থ তায় আবার ডাক্তার, দেবু ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত, শ্রীহরি সম্প্রতি কুলীন সদ্‌গোপ এবং বহু ধন-সম্পত্তির মালিক; এই কয়জনই চাষে খাটে না।

সতীশ বাউড়ী তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতব্বর গোছের লোক। লোকটির নিজের হাল-গরু আছে। জমি অবশ্য তাহার নিজের নয়—পরের জমি ভাগে চাষ করে। বেশ বিজ্ঞ-ধরনে কথা কয়। দেবুকে দেখিয়া হেঁট হইয়া সে প্রণাম করিল, বলিল—পেনাম হই, পণ্ডিত মশায়!...সঙ্গে সঙ্গে দলের সকলেই প্রণাম করিল।

দেবু প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—মাঠে যাচ্ছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।...সতীশ নিজের সঙ্গীদের বলিল—পণ্ডিতমশায়ের মতো মানুষটি আর দ্যাখলাম না। পেনাম করলে অনেক মণ্ডল মশাইরা তো রা পর্যন্ত কাড়ে না। পণ্ডিতমশায় কিন্তুক কপালে হাতটি ঠেকাবেই। কখনও তুই-তুকারি শুনলাম না উয়ার মুখে।

দেবু কথা বলিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সতীশ বলিল—হ্যাঁ গো, পণ্ডিতমশায়—এ কি হবে বলেন দেখি?

—কিসের? কি হল তোমাদের?

—আজ্ঞে, একা আমাদের লয়, গোটা গাঁয়ের নোকেরই বটে। এই সেটেল্‌মেণ্টারের কথা বলছি। সাত দিন পরেই বলছে আরম্ভ হবে। দিনরাত হাজির থাকতে হবে, নোয়ার শেকল টেনে মাপ হবে ; তা' হলে ধানকাটাই বা কি করে হয় আর পাকা ধানের ওপর শেকল টানলে ধানই বা থাকে কি করে ?

—গোমস্তা কি বললেন ? পালই বা কি বললো ?

—আজ্ঞে ঘোষমশাই বলুন !

ঘোষ মশায় ?

—আজ্ঞে, উনি এখন ছিহরি ঘোষ মশাই গো ! ঘোষ বলতে হুকুম হয়েছে। জমিদারের কাগজ-পত্তরে, মায় আদালতে পর্যন্ত ঘোষ করে লিয়েছেন পাল কাটিয়ে।

—তাই নাকি ? ওঁরা কি বললেন ? কাল তো তোমরা গিয়েছিলে সব।

– আজ্ঞে ডাক হয়েছিল, গিয়েছিলাম। তা ওঁরা বললেন—দিনরাত খেটে ধান কেটে ফেল সব সাত দিনের মধ্যে। তাই কি হয় গো ? আপনিই বলেন ক্যানে পণ্ডিতমশায় ?

দেবু চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কাল সমস্ত রাত্রি সে এই কথাটাই ভাবিয়াছে। কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে পারে নাই।

সতীশ বলিল—হোথা থেকে এলাম তো দেখি, ডাক্তোর বাবু পাড়ায় এয়েছেন, বলছেন—টিপছাপ দিতে হবে, দরখাস্ত পাঠাবেন। তা হ্যাঁ মশায়, দরখাস্তে কি হবে গো ? এই তো ঘর-পোড়ার লেগে দরখাস্ত করলাম—কি হল ? তা ছাড়া দরখাস্ত করলে সেটেল্‌মেণ্টোর হাকিম যদি রেগে যায়।

* * * *

বাংলাদেশে ইংরাজী ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোন জরিপ-বন্দী হয় নাই। তখনকার দিনে সীমানা-সহরদ্দ লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মকদ্দমার আর অন্ত ছিল না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জরিপ করিয়া মাত্র গ্রামগুলির সীমানা নিধারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জরীপ আইন পাস হইবার পর বাংলা দেশে নূতন জরীপের এক পরিকল্পনা হয়। প্রতিটি টুকরা জমি, তাহার বিবরণ এবং তাহার স্বত্ব-স্বামিত্ব নির্ধারণ করিবার জন্যই এ জরিপের আয়োজন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জের এই গ্রামাঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য লোকগুলি বিভীষিকায় একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জরিপের সময়ে এতটুকু ত্রুটিতে হাকিম নাকি বেত লাগায়, হাতকড়ি দিয়া

জেলে পাঠাইয়া দেয়। এই ধরনের নানা গুজবে অঞ্চলটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আরও আছে, জরিপের পর প্রজাদের জরিপের খরচের অংশ দিতে হইবে। না দিলে অস্থাবর ক্রোক হইবে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।

তাহার পর জমিদার দাবী করিবে খজনা-বৃদ্ধি; প্রতি টাকায় চার আনা, আট আনা, এমন কি—টাকায় টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিও হইতে পারে, হাইকোর্টের নাকি নজির আছে। নাখরাজ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। বজায় থাকিলে সেস লাগিবে, সে সেসের পরিমাণ নাকি খাজনারই সমান—কম নয়; এমনি আরো অনেক কিছু হইবে।

ফিরিবার পথে দেবু দেখিল—জনকয়েক মাতব্বর ইতিমধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়াছে; সকলের তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবু চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। হরিশ প্রশ্ন করিল—হয়েছে?

রাত্রে তাহার একখানা দরখাস্ত লিখিয়া রাখিবার কথা ছিল। কিন্তু দেবুর দরখাস্ত লেখা হইয়া উঠে নাই। দরখাস্তে তাহার আস্থা নাই। দরখাস্তের প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গিয়াছিল কয়েকটি তিক্ত ঘটনার স্মৃতি। নিজে সে এককালে কয়েকবার দরখাস্ত করিয়াছিল; সেই দরখাস্তের ফলের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন বাপের মৃত্যুর পর সদ্য সে স্কুল ছাড়িয়া নিজের হাতের চাষ করিত। সেদিন মাঠে সে হাল চালাইতেছিল। খাকী পোশাক-পরা টুপী মাথায় পুলিশের এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টার মাঠের পথে যাইতে যাইতে তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—এই শোন্!

দেবু এই অভদ্রজনোচিত সম্ভাষণে অসন্তুষ্ট হইয়াই উত্তর দেয় নাই।

—এই উল্লুক!

দেবু এবারও উত্তর দেয় নাই। দেবুর সেই প্রথম দরখাস্ত। দরখাস্ত করিয়াছিল পুলিশ সাহেবের কাছে। তদন্ত হইল মাস কয়েক পর। তদন্তে আসিলেন ইন্সপেক্টার।

দেবুর অভিযোগ শুনিয়া তিনি মিষ্ট কথায় ব্যাপারটা মিটাইয়া দিলেন, বলিলেন—দেখ বাপু, জমাদার বাবু তোমার বাপের বয়সী। 'তুই' বললেও তোমার রাগ করা উচিত নয়। 'উল্লুক' বলাটা অন্যায় হয়েছে, যদি উনি বলে থাকেন।

দেবু বলিল—উনি বলেছেন!

—বুঝলাম, কিন্তু সাক্ষী কে বল?

সাক্ষী ছিল না। ইন্সপেক্টার বলিলেন—যাক, তুমি বাড়ী যাও। কিছু মনে করো না।

দেবুর ক্ষোভ কিন্তু মেটে না।

দ্বিতীয় দরখাস্তের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। জমিদার বৈশাখ মাসে খাসপুকুর হইতে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেইটিই একমাত্র পানীয় জলের পুকুর। জল অল্পই ছিল, সেই জল আরও খানিকটা বাহির করিয়া দিয়া মাছ ধরিবার কথা হইল। গ্রামের লোকে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—ওইটুকু জল, কেটে বের করে দিলে থাকবে কতটুকু ? তার উপর মাছ ধরলে যে কাদা ছাড়া কিছু থাকবে না। আমরা খাবো কি ?

গোমস্তা বলিল—জমিদারের বাড়ীতে কাজ, তিনিই বা মাছ কোথায় পাবেন বল ?

প্রজারা খোদ জমিদারের কাছে গেলে ; জমিদার বলিলেন—তোমরা মাছ দাও, নয় মাছের দাম দাও।

তরুণ দেবু এক দরখাস্ত করিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। কিন্তু কিছুই হইল না। জমিদারের চাপরাসীরা শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া মাছ ধরাইয়া পুকুরটাকে পঙ্কপল্বলে পরিণত করিয়া দিয়া গেল। দেবুর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। হঠাৎ সাতদিন পর, অকস্মাৎ দারোগা-কনস্টেবল-চৌকিদারের আগমনে গ্রামখানা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে একজন সাহেবী পোশাকপরা অল্পবয়সী ভদ্রলোক। দারোগা আসিয়া দেবুকে ডাকিল। বলিল—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর ডাকছেন তোমাকে।

দেবু অবাক হইয়া গেল। সাহেব নিজে আসিয়াছেন। কিন্তু এখন আসিয়া ফল কি ? সাহেবকে সে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব প্রতিনমস্কার করিলেন। সে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল সাহেবের কথায়।

—আপনি দেবনাথ ঘোষ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা বলিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ হজুর' বলতে হয়।

সাহেব বলিলেন—থাক। তারপর সমস্ত শুনিলেন—পুকুর নিজে দেখিলেন। পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া জলের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দেবুর আজও মনে আছে ভদ্রলোকের চোখ হইতে ফোঁটাকয়েক জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। রুমালে চোখ মুছিয়া সাহেব বলিলেন—তাই তো দেবুবাবু, এসে তো কিছু করতে পারলাম না আমি !

দেবু বলিল—আমি দরখাস্ত করেছিলাম পাঁচ দিন আগে হুজুর !

—ডাকে যেতে একদিন লেগেছে। দরখাস্ত যথানিয়মে পেশ হতেও কোন কারণে দেরি হয়েছে। সে কারণ আমি এন্‌কোয়ারী করব। তারপর সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—দেবনাথবাবু এসব ক্ষেত্রে দরখাস্ত করবেন না। নিজে যাবেন, একেবারে আমাদের কাছে সরাসরি গিয়ে জানাবেন। দরখাস্ত ?—শব্দটা উচ্চারণ করিতে তিনি হাসিয়াছিলেন।

সাহেব গ্রামের জন্য একটা ইঁদারা মঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও শেষ পর্যন্ত হয় নাই। কারণ সাহেব এ জেলা হইতে চলিয়া যাওয়ার সুযোগে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কঙ্কণার বাবু সেটা অন্য গ্রামে মঞ্জুর করিয়া দিয়াছে। এ গ্রামের মেম্বার হিসাবে শ্রীহরিও তাহাতে সম্মতি ভোট দিয়াছে। দেবনাথ জমিদারের মাছ ধরার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। সাজাটা তাহারই জন্য গোটা গ্রামের লোক ভোগ করিল।

দরখাস্ত! একটা গল্প তাহার মনে পড়ে। কোন রাজার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল; রাজা ছিলেন দার্জিলিঙে। আগুন নিভাইবার হাঁড়ি বালতি কিনিবার জন্য বরাদ্দ না থাকায় রাজার নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। হুকুম টেলিগ্রামে আসিলেও আসিল চব্বিশ ঘণ্টার পর। ততক্ষণে সব কিছুকে ভস্মসাৎ করিয়া আগুন আপনা-আপনি নিভিয়া গিয়াছে। দরখাস্তের কথায় ওই গল্প তাহার মনে পড়ে, মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই সাহেবকে। মিঃ এস. কে. হাজরা, আই-সি-এস। দেবু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে।

দেবু উত্তর দিল—না হরিশ-কাকা, লেখা হয় নাই।

লেখা হয় নাই শুনিয়া হরিশ, ভবেশ প্রভৃতি প্রবীণগণ সকলেই অসন্তুষ্ট হইল। হরিশ বলিল—তুমি বললে লিখে রাখবে, ভার নিলে! জলখাওয়ার পর গাঁয়ের লোক সব আসবে, দস্তখৎ করবে। এখন বলছ হয় নাই! এ কি রকম কথা হে? পারবে না বললে ডাক্তারই লিখে রাখত।

ভবেশ বলিল—এ্যাই কথা। স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। বললেই তো অন্য ব্যবস্থা হত।

দেবু হাসিল, বলিল—দরখাস্ত না হয় আমি এখনি লিখে দিচ্ছি ভবেশদাদা; কিন্তু দরখাস্ত করে হবে কি বলতে পার?

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিশ বলিল—তা হলে কি করব বল? কিছু করতে তো হবে; এমন করে—ধর—আপনাকেই বা 'পেবোধ' দিই কি বলে?

—এক কাজ করবেন?

—কি, বল?

—পাঁচখানা গাঁয়ের লোক ডাকুন, তারপর চলুন সকলে মিলে সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

—তাতে ফল হবে বলছ ?

—দরখাস্তের চেয়ে বেশী হবে নিশ্চয় !

সকলে আপনাদের মধ্যেই আবার গুঞ্জন শুরু করিল।

পাঠশালার ছেলেরা ইতিমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ; দেবু তাহাদের বলিল—এইখানেই এসেছ সব ? আচ্ছা আজ এইখানেই ওই পাশে বসে সব পড়তে আরম্ভ কর। কালকে যে পণ্যের নাম লিখতে দিয়েছিলাম সবাই লিখেছো তো ? খাতা আন সব—রাখ এইখানে।

হরিশ ডাকল—দেবু !

—বলুন !

—তবে না হয় তাই চল। না কি গো ? তোমাদের মত কি ? হরিশ জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলের দিকে চাহিল।

ভবেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলিল—হরির নাম নিয়ে তাই চল সব। ধরে তো আর খেয়ে ফেলবে না সায়েব ! আমি রাজী। বল হে সব বল, আপন আপন কথা বল সব !

মনে মনে সকলেই একটা উত্তেজনার উচ্ছ্বাস অনুভব করিল। হরেন ঘোষাল সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বুকে হাত রাখিয়া বলিল—আই য়্যাম রেডি ! এস্পার কি ওস্পার, যা হয় হয়ে যাক।

—ব্যস, তাই চল, কাল সকালেই !

—হ্যাঁ ! হ্যাঁ হ্যাঁ !—

এবার একটা সমবেত সম্মতি প্রায় ঐক্যতানের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

—কিন্তু— ! ভবেশের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

—কিন্তু কি ? হরিশ বলিল—আবার কিন্তু করছ কেনে ?

—পাজিটা একবার দেখবে না ? দিন-খ্যান কেমন— ?

—তা বটে। ঠিক কথা।

সকলেই মুহূর্তে সায় দিয়া উঠিল।

দেবু তিক্ত স্বরে বলিল—আপনারা মানেন···কিন্তু রাজার কাজ তো পাঁজি মানে না। দশ দিন যদি ভাল দিন-ক্ষণ না থাকে ?

ঘোষাল উত্তেজিত স্বরে বলিল—ড্যাম ইওর পাঁজি ! বোগাস্ ওসব।

দেবু বলিল—মামলার দিন থাকলে যে মঘাতেও যেতে হয়।

হরিশ একটু ভাবিয়া বলিল—তা ঠিক। রাজদ্বারে পাঁজি-পুথি নাই।

দেবু বলিল—ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লে দশটা নাগাদ ঠিক কোর্টের সময়েই গিয়ে পৌছানো যাবে! আপন আপন খাবার সকলে সঙ্গে নেবেন; চিঁড়ে গুড় যে যা পারেন। একটা দিন বৈ তো নয়।

ঠিক এই সময় চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল—গোমস্তা দাশজী, শ্রীহরি ঘোষ, ভূপাল নগদী এবং আরও কয়েকজন; তাহার মধ্যে একজন থোকন বৈরাগী—লোকটি এ অঞ্চলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করিয়া থাকে।

দাশজী হাসিয়া বলিল—কি গো, দেবু মাস্টারের পাঠশালায় সব আবার নতুন করে নাম লেখালেন নাকি? ব্যাপার কি সব?

কে কি উত্তর দিত কে জানে, কিন্তু সে দায় হইতে সকলকে নিষ্কৃতি দিয়া হরেন ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—উই আর গোয়িং টু দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট—কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাচ্ছি সব ধানকাটা না হওয়া পর্যন্ত খানাপুরী স্টপ ড—বন্ধ রাখতে হবে।

ভ্রূ নাচাইয়া দাশজী প্রশ্ন করিল—ঘোষাল মশায়ের হাত ক'টা? দুটো না চারটে?

এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে, ঘোষাল কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া গেল। তারপর সে-ই চীৎকার করিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণকে তুমি এত বড় কথা বল?

দাশজী সে কথার উত্তর দিল না, শ্রীহরির হাতে একখানা খবরের কাগজ ছিল, সেখানা টানিয়া লইয়া বলিল—এই দেখ। বেশী লাফিয়ো না। 'জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। সেটেল্‌মেন্টের কার্যে বাধা দেওয়ার অপরাধে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।' এই নাও, পড়ে দেখ। সে কাগজখানা মজলিসের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ঘোষালই কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া হেড লাইনে চোখ বুলাইয়া বলিয়া উঠিল—মাই গড্! পাংশু বিবর্ণ মুখে কাগজখানা দেবুর দিকে বাড়াইয়া দিল। দেবু কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি বলিল আমাকে তো আপনারা বাদ দিয়েই সব করছেন, তা করুন। আমি কিন্তু আপনাদের কথা না ভেবে পারি না। ও সব করতে যাবেন না। পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়। তার চেয়ে চলুন বিকাল-বেলা সেটেল্‌মেন্ট হাকিমের সঙ্গে দেখা করে আসি। দাশজী যাবেন, আমি যাব, মাতব্বর জন-কয়েক আপনারাও চলুন। ভাল রকমের ডালিও একটা নিয়ে যাই। মাছ একটা ভালই পড়েছে, বুঝলেন হরিশখুড়ো, পাকি বারো সের।

বলিতে বলিতেই বোধ করি তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। দাশজাকে বলিল—হ্যাঁ গো, সেই ইয়ে, মানে মুরগীর জন্য লোক পাঠানো হয়েছে তো? সবাই মিলে ধরে-পেড়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আর, ওই না-রাজী দরখাস্ত করা, কি একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরবার করতে যাওয়া—ও এরকম সরকারের হুকুমের বিরোধিতা করা। তাতে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। না কি গো? —শ্রীহরি কথাটা জিজ্ঞাসা করিল গোমস্তা দাশজীকে।

দেবু কাগজখানা দাশজীর হাতেই ফেরত দিল, তারপর মজলিসের দিকে পিছন ফিরিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে ছেলেদের পড়াইতে আরম্ভ করিল। সে ইহাদের জানে। ইহারই মধ্যে সব সঙ্কল্প তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে উঠিয়া গিয়া ব্ল্যাক বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিল, মুখে বলিতে লাগিল, এক মণ দুধের দাম যদি পাঁচ টাকা দশ আনা হয়—।

ওদিকে মজলিসে আবার পরামর্শের গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। হরেন ঘোষালেরই চাপা-গলা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল—ভেরি নাইস হবে। ভেরি গুড পরামর্শ।

দাশজী এবার খোকন মিস্ত্রীকে বলিল—ধর্ দড়ি ধর্। ভূপাল তুই ধর্ একদিকে।

খোকন বৈরাগী খানিকটা বাবুই ঘাসের দড়ি হাতে অগ্রসর হইয়া আসিল, সর্বাগ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবদেবীকে প্রণাম করিল—তারপর জোড় হাতে বলিল—আরম্ভ করি তাহলে?

দাশজী বলিল—দুগ্‌গা বলে, তার আর কথা কি? শুনছেন গো—হরিশ মণ্ডল মশায়, ভবেশ পাল! চণ্ডীমণ্ডপ পাকা করে বাঁধানো হচ্ছে। আপনারাও একটা অনুমতি দেন।

—বাঁধানো হচ্ছে? পাকা করে? সমস্ত মজলিস সুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল।

—হ্যাঁ। একটা কুয়োও হচ্ছে—ওই ষষ্ঠীতলায়। ঘোষমশায়, মানে, আমাদের শ্রীহরি ঘোষ গ্রামের উপকারের জন্য এই সব করে দিচ্ছেন।

শ্রীহরি নিজে হাতজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—অনুমতি দেন আপনারা সবাই।

হরিশ বলিল—দীর্ঘজীবী হও বাবা। এই তো চাই। তা মা-ষষ্ঠীকে আর ধুলোয় মাটিতে রাখছ ক্যানে? ষষ্ঠীতলাটিও বাঁধিয়ে দাও।

শ্রীহরি বলিল—বেশ তো, তাও হোক। ষষ্ঠীতলা বলে খেয়ালই হয় নাই আমার।

হরিশ মজলিসের দিকে চাহিয়া বলিল—তা হ'লে সেটেল্‌মেণ্টারের সম্বন্ধে দাশজী যা বলেছেন তাই ঠিক হল ; বুঝলেন গো সব ? দরখাস্ত-টরখাস্ত নয়।

শ্রীহরির খুড়া ভবেশ অকস্মাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের গৌরবে ভাবাবেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, উঠিয়া আসিয়া শ্রীহরির মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল—মঙ্গল হবে, তোমার মঙ্গল হবে বাবা।

শ্রীহরি খুড়াকে প্রণাম করিল।

ঘোষাল চুপি চুপি বলিল, হি উইল ডাই—ছিরু এইবার নিশ্চয় মরবে। হঠাৎ এত বড় সাধু? এ তো ভাল লক্ষণ নয়! মতিভ্রম—দিস ইজ্‌ মতিভ্রম!

মজলিস ভাঙিয়া গিয়াছে। সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ওদিকে জল-খাবারের বেলা হইয়াছে। রোদ মন্দিরের চূড়া হইতে গা বাহিয়া আটচালার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়াছে। দেবু ছেলেদের ছুটি দিয়া বলিল—কাল থেকে আমার বাড়ীতে পাঠশালা বসবে, বুঝেছ? সেইখানে যাবে সবাই।

—বাঁধানো হয়ে গেলে আবার এইখানেই বসবে তো পণ্ডিত মশায়?

—পাকা হলে বসবে বৈকি! যাও আজ ছুটি!

সে উঠিল, উঠিতে গিয়া তাহার নজরে পড়িল—বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী এতক্ষণে ঠুক ঠুক করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপরে উঠিতেছে। দেবু সম্ভাষণ করিয়া বলিল—চৌধুরী মশায় এত বেলায়?

—হ্যাঁ একটু বেলা হয়ে গেল। সকালে আসতে পারলাম না। দরখাস্তে সই করবার ডাক ছিল!

দেবু হাসিয়া বলিল—কষ্টই সার হল আপনার, দরখাস্ত করা হল না।

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—পথে আসতে তা সব শুনলাম। সদরে যাবার পরামর্শ হয়েছিল তা-ও শুনলাম। আবার নতুন হুকুম শুনলাম, বিকেলে আসতে হবে। তাই চলুন, বিকেলে দেখা যাক কি হয়।

—আমি যাব না চৌধুরী মশায়।

বৃদ্ধ দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—যা পাঁচজনে ভাল বোঝে করুক, পণ্ডিত, আপনি মন খারাপ করবেন না।

দেবু জোর করিয়া একটু হাসিল।

—চলুন পণ্ডিত, আপনার ওখানে একটু জল খাব।

—আসুন, আসুন। দেবু ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইল।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলিল—ও কিছু হবে না, পণ্ডিত। একদিন আমারও ভাল দিন ছিল—আর তখন ডালি দেওয়া তো হরির লুটের সামিল ছিল গো। আজকাল বরং একটু কম হয়েছে। তা দেখেছি—বিশেষ কিছু হয় না। তার

চেয়ে বরং সবাই মিলে গিয়ে পড়লে—। 'কিছু হইত' এ কথাও ভরসা করিয়া বলিতে পারিল না।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এতটুকু সাহস নাই, মতিস্থির নাই; এরা মানুষ নয়; চৌধুরীমশায়! সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। চোখ মুছিয়া হাসিয়া সে আবার বলিল—জানেন, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক যদি সদরে যেতো, আমি বলতে পারি চৌধুরী মশায়, কাজ নিশ্চয় হত। সাহেব নিশ্চয় কথা শুনত। প্রজার দুঃখ শুনবে না কেন? হাজরা সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সেবার বলেছিলেন। আমার মনে আছে।

বৃদ্ধ হাসিল—আপনি মিছে দুঃখু করছেন পণ্ডিত!

—দুঃখ একটু হয় বৈ কি।

—একটা গল্প বলব চলুন।

জল খাইয়া কলার পেটোয় তামাক খাইতে খাইতে চৌধুরী বলিল—অনেক দিন আগে মহাগ্রামের ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম প্রয়াগে কুম্ভস্নান করতে। হরেক রকমের সন্ন্যাসী দেখে অবাক হয়ে গেলাম। নাগা সন্ন্যাসী দেখলাম—উলঙ্গ বসে রয়েছে সব। কেউ বুক পর্যন্ত বালিতে পুঁতে রয়েছে, কেউ উর্ধ্ববাহু, কেউ বসে আছে লোহার কাঁটার আসনে, কেউ চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জেলে বসে রয়েছে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—স্বর্গ এদের হাতের মুঠোয়। আঃ! শুনে ঠাকুরমশায় বললে—চৌধুরী, একটা গল্প বলি শোন।

তখন সত্যযুগের আরম্ভ। সবে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সবাই তখন সাধু; সত্যযুগ তো! বনে কুটীর বেঁধে সব থাকেন—ফলমূলে জীবন ধারণ চলে, ভগবানের নাম করেন, আর পরমানন্দে দিন কাটে। মা-লক্ষ্মী তখন বৈকুণ্ঠে, অন্নপূর্ণা কৈলাসে, মানে সোনা-রুপো, এমন কি—অন্নেরও পর্যন্ত প্রচলন হয় নাই সংসারে। যাক্, এইভাবে একপুরুষ কেটে গেল। তখন অকাল মৃত্যু ছিল না, কাজেই হাজার বছর পরে একসঙ্গে একপুরুষের মৃত্যুর সময় হয়ে এল। মানুষেরা ঠিক করলেন—চল, আমরা সশরীরে স্বর্গে যাব। যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ। বেরিয়ে পড়ল সব।

বদরিকাশ্রম পার হয়ে হিমালয়ের পথে পিঁপড়ের সারির মত মানুষ চলতে লাগল। ওদিকে স্বর্গ-দ্বারে যে দ্বারী ছিল, সে দেখতে পেলে, কোটী কোটী মানুষ কলরব করতে করতে সেই দিকেই চলে আসছে। সে ভয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে—'দেবরাজ, মহা বিপদ উপস্থিত।'

'—কিসের বিপদ হে?'

'—কোটী কোটী কারা স্বর্গের দিকে চলে আসছে পিঁপড়ের সারির মত। বোধ হয় দৈত্য-সৈন্য ?

—'দৈত্য-সৈন্য ? বল কি ?'

সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এমন সময় এলেন দেবর্ষি নারদ। বললেন—'দৈত্য নয় দেবরাজ, মানুষ।'

'—মানুষ ?'

'—হ্যাঁ, মানুষ। তোমাদের অস্ত্রে তাদের কিছুই হবে না ; কারণ পাপ তো তাদের দেহে নাই, সুতরাং দেব-অস্ত্র অচল। দিব্যাস্ত্র ফুলের মালা হয়ে যাবে তাদের গায়ে ঠেকে।'

'—তবে উপায় ? এত মানুষ যদি সশরীরে এখানে আসে তবে—?' ইন্দ্র আর কথা বলতে পারলেন না। সবাই হয়তো দাবি করবে এই সিংহাসন !

'শেষে বললেল—চল নারায়ণের কাছে চল সব।'

নারায়ণ শুনে হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, চল দেখি। বলে প্রথমেই তিনি পাঠালেন মা অন্নপূর্ণাকে।

অন্নপূর্ণা এসে পথে পুরী নির্মাণ করে ফেললেন—ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে রাখলেন এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনে। তারপর মানুষের সেই দল সেখানে আসবা-মাত্র তাদের বললেন—'পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত তোমরা, আজকের মতো তোমরা আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।'

মানুষেরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল রান্নার সুগন্ধে সকলেই মোহিত হয়ে গেল। দলের কতক লোক কিন্তু মোহ কাটিয়ে বললে—'স্বর্গের পথে বিশ্রাম করতে নাই!' তারা চলে গেল। যারা থাকল তারা অন্ন-ব্যঞ্জন খেয়ে পেট ফুলিয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়ল। বললে—'মা, আমরা এইখানেই যদি থাকি, রোজ এমনি খেতে দেবে তো ?'

মা বললে—'নিশ্চয়।'

থেকে গেল তারা সেইখানেই।

'যারা থামে নি, তারা চলল এগিয়ে। নারায়ণ তখন পাঠিয়ে দিলেন লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মীর পুরী—সোনার পুরী ! সোনার পথ, সোনার ঘাট ; সোনার ধুলো পুরীতে। দেখে মানুষের চোখ ধেঁধে গেল।

মা বললেন—'এসব তোমাদের জন্যে বাবা। এস—এস ; পুরীতে প্রবেশ কর। এক দল প্রবেশ করলে।

পথে আরও এক পুরী তখন নির্মাণ হয়ে আছে। ফুলের বাগান চারিদিকে, কোকিল ডাকছে, ভুবন-ভুলানো গান শোনা যাচ্ছে—আর এক অপূর্ব সুগন্ধ

ভেসে আসছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অপ্সরার দল, এক হাতে তাদের অপরূপ ফুলের মালা আর এক হাতে সোনার পানপাত্র। তারা ডাকছে—'আসুন, বিশ্রাম করুন ; আমরা আপনাদের দাসী, সেবা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা তৃষ্ণার্ত—এই পানীয় পান করুন!'

সে পানীয় হচ্ছে স্বর্গীয় সুরা। দলে দলে লোকে সেখানে ঢুকে পড়ল।

নারায়ণ বললেন—'দেখ তো ইন্দ্র আর কেউ আসছে কিনা ?'

ইন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'না।'

'—ভাল করে দেখ।'

'—একটা কি নড়ছে; বোধ হয় একজন মানুষ।

নারায়ণ বললেন—'স্বর্গদ্বার খুলে রাখ, তুমি নিজে পারিজাতের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাক। আমার মত সম্মান করে স্বর্গে নিয়ে এস। ওর পায়ের ধুলোয় স্বর্গ পবিত্র হোক।'

হাসিয়া চৌধুরী বলিল—জানলেন পণ্ডিত, গল্পটি শেষ করে ঠাকুরমশায় বলেছিলেন—চৌধুরী, এরপর কেউ গুরু হয়ে ভক্তের রসাল খাদ্যদ্রব্যে ভুলবে, কেউ মোহন্ত হয়ে সোনা-রুপো সম্পত্তি নিয়ে ভুলবে, কেউ সেবাদাসীর দল নিয়ে স্ত্রীলোকে আসক্ত হবে। স্বর্গে যাবে কোটী-কোটীর মধ্যে একজন। দুঃখ করবেন না পণ্ডিত! মানুষের ভুল-ভ্রান্তি-মতিভ্রম পদে পদে। এরা মানুষ নয় বলে দুঃখ করছেন ? মানুষ হওয়া কি সোজা কথা ? আচ্ছা আমি উঠি তা হলে। ওই ডাক্তার আসছেন—উনি এসে পড়লে আবার খানিকক্ষণ দেরি হয়ে যাবে। আমি চলি।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

গল্পটি দেবুর বড় ভাল লাগিল। বিলুকে আজ গল্পটি বলিতে হইবে। আশ্চর্য বিলুর ক্ষমতা, একবার শুনলেই সে গল্পটি শিখিয়া লয়।

ডাক্তার আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিল—শুনলাম সব।

দেবু হাসিল, বলিল—তুমি সকাল থেকে কোথায় ছিলে হে ?

—অনিরুদ্ধের বাড়ী। কামার-বউয়ের আজ আবার ফিট হয়েছিল।

—আবার ?

—হ্যাঁ। সে সাংঘাতিক ফিট্, ঘরে মেয়ে নাই, ছেলে নাই, সে এক বিপদ। তবু দুর্গা মুচিনী ছিল, তাই খানিক সাহায্য হল। বউটার বোধ হয় মৃগীরোগে দাঁড়িয়ে গেল। অনিরুদ্ধ তো বলছে অন্য রকম। মানুষে নাকি তুক করেছে!

—মানুষে তুক করেছে ?

—হ্যাঁ, ছিরে পালের নাম করছে। যাক গে! এ দিকের এ যা হয়েছে

ভাল হয়েছে দেবু। পরে সব ঝুঁকি পড়তো তোমার আর আমার ঘাড়ে। জে. এল. ব্যানার্জীর এ্যারেস্টের খবর জান তো? হয় তো আমাদেরও এ্যারেস্ট করতো। আর সব শালা সুড়-সুড় করে ঘরে ঢুকতো। আচ্ছা আমি চলি। সকাল থেকে রোগী বসে আছে, ওযুধ দিতে হবে।

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল। দেবু একটু হাসিল। ডাক্তারের এই ব্যস্ততার অর্ধেকটা সত্য বাকীটা কৃত্রিম। রোগীদের জন্য জগনের দরদ অকৃত্রিম; চিকিৎসকের কর্তব্য সম্বন্ধে সে সত্যই সজাগ। শত্রু হোক মিত্র হোক—সময় অসময় যখনই হোক—ডাকিলে সে বাহির হইয়া আসিবে, যত্ন করিয়া নিজে ঔযধ তৈয়ারী করিয়া দিবে। কিন্তু আজিকার ব্যস্ততাটা কিছু বেশী, একটু অস্বাভাবিক। জে. এল. ব্যানার্জীর গ্রেপ্তারের সংবাদে ডাক্তার বেশ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছে, আসলে সে আলোচনাটা এড়াইতে চাহিল।

—পণ্ডিত মশাই গো! বাড়ীর ভিতর থেকে কে ডাকিল।

পণ্ডিত পিছন ফিরিয়া দেখিল—বিলু দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, সে-ই ডাকিয়াছে।

রাগের ভান করিয়া দেবু বলিল—দুষ্টু বালিকে, হাসিতেছ কেন? পড়া করিয়াছ?

বিলু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; দেবু উঠিয়া আসিয়া বলিল—আজ ভারী সুন্দর একটা গল্প শুনেছি, তোমাকে বলব, একবার শুনেই শিখতে হবে।

বিলু বলিল—খোকার কাছে একবার বোস তুমি! কামার-বউকে একবার আমি দেখে আসি।

পনেরো

পদ্মের মূর্ছা রীতিমত মূর্ছা-রোগে দাঁড়াইয়া গেল। এবং মাসখানেক ধরিয়া নিত্যই সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

ফলে মাসখানেকের মধ্যে বন্ধ্যা মেয়েটির সবল পরিপুষ্ট দেহখানি হইয়া গেল দুর্বল এবং শীর্ণ। ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সে; এই শীর্ণতায় এখন তাহাকে অধিকতর দীর্ঘাঙ্গী বলিয়া মনে হয়; দুর্বলতাও বড় বেশী চোখে পড়ে। চলিতে ফিরিতে দুর্বলতাবশত সে যখন কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আত্মসম্বরণ করে, তখন মনে হয় দীর্ঘাঙ্গী পদ্ম যেন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সেই বলিষ্ঠ ক্ষিপ্রচারিণী পদ্মের প্রতি পদক্ষেপে এখন ক্লান্তি ফুটিয়া উঠে, ধীরে মন্দগতিতে চলিতেও তাহার পা যেন টলে। কেবল তাহার চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে অস্বাভাবিক প্রখর। দুর্বল পাণ্ডুর মুখের মধ্যে পদ্মের ডাগর চোখ

দুইটা অনিরুদ্ধের শখের শাণিত বগি দা'খানায় আঁকা পিতলের চোখ দুইটার মতই ঝক্‌ঝক্‌ করে। স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ শিহরিয়া উঠে।

অনটনের দুঃখের উপর এই দারুণ দুশ্চিন্তায় অনিরুদ্ধ বোধ করি পাগলা হইয়া যাইবে। জগন ডাক্তারের পরামর্শে সেদিন সে কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল।

জগন বলিয়াছিল—মৃগী রোগ।

হাসপাতালের ডাক্তার বলিল—এ একরকম মূর্ছা-রোগ। বন্ধ্যা মেয়েদেরই—মানে যাদের ছেলেপুলে হয় না তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। হিস্‌টিরিয়া।

পাড়া-পড়শীরা কিন্তু প্রায় সকলেই বলিল—দেবরোগ! কারণও খুঁজিয়া পাইতে দেরি হইল না। বাবা বুড়োশিব ভাঙাকালীকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোন কালে পার পায় নাই। নবান্নের ভোগ দেবস্থলে আনিয়া সে বস্তু তুলিয়া লওয়ার অপরাধ তো সামান্য নয়! অনিরুদ্ধের পাপে তাহার স্ত্রীর এই রোগ হইয়াছে। কিন্তু অনিরুদ্ধ ও কথা গ্রাহ্য করিল না। তাহার মত কাহারও সহিত মেলে না। তাহার ধারণা, দুষ্ট লোকে তুক করিয়া এমন করিয়াছে। ডাইনী-ডাকিনী বিদ্যার অভাব দেশে এখনও হয় নাই। ছিরুর বন্ধু চন্দ গড়াঞী এ বিদ্যায় ওস্তাদ। সে বাণ মারিয়া মানুষকে পাথরের মত পঙ্গু করিয়া দিতে পারে। পদ্মের একটা কথা যে তাহার মনে অহরহ জাগিতেছে!

প্রথম দিন পদ্মের মূর্ছা জগন ডাক্তার ভাঙাইয়া দেওয়ার পর সেই রাত্রেই ভোরের দিকে সে ঘুমের ঘোরে একটা বিকট চীৎকার করিয়া আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নিশুতি রাত্রে অনিরুদ্ধ আর জগনকে ডাকিতে পারে নাই এবং সেই রাত্রে মূর্ছিতা পদ্মাকে ফেলিয়া যাওয়ারও উপায় তাহার ছিল না। বহু কষ্টে পদ্মের চেতনা সঞ্চার হইলে নিতান্ত অসহায়ের মত পদ্ম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আমার বড় ভয় লাগছে গো!

—ভয়? ভয় কি? কিসের ভয়?

—আমি স্বপ্ন দেখলাম—

—কি? কি স্বপ্ন দেখলি? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি ক্যানে?

—স্বপ্ন দেখলাম—মস্ত বড় একটা কালো কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

—সাপ?

—হ্যাঁ, সাপ! আর—

—আর?

—সাপটা ছেড়ে দিয়েছে ওই মুখপোড়া—

—কে? কোন মুখপোড়া?

—ওই শত্তুর—ছিরে মোড়ল। সাপ ছেড়ে দিয়ে আমাদের সদর দুয়োরের চালাতে দাঁড়িয়ে হাসছে।

পদ্ম আবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে আছে। পদ্মের অসুখের কথা মনে হইলেই ওই কথাটাই তাহার মনে পড়িয়া যায়। ডাক্তারেরা যখন চিকিৎসা করিতেছিল, তখন মনে হইলেও কথাটাকে সে আমল দেয় নাই, কিন্তু দিন দিন ধারণাটা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এখন সে রোজার কথা ভাবিতেছে, অথবা কোন দেবস্থল বা ভূতস্থল!

তাহার এই ধারণার কথা কেহ জানে না, পদ্মকেও সে বলে নাই। বলিয়াছে কেবল মিতা গিরিশ ছুতারকে। জংশনের দোকানে যখন দু'জন যায়, তখন পথে অনেক সুখদুঃখের কথা হয়। দু'জনে ভালমন্দ অনেক মন্ত্রণা করিয়া থাকে। সমস্ত গ্রামই প্রায় একদিকে, তাহাদিগকে জব্দ করিবার একটা সংঘবদ্ধ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। অনিরুদ্ধ ও গিরিশের সঙ্গে আর একজন আছে, পাতু মুচি। ছিরু পালকে এখন শ্রীহরি ঘোষ নামে গ্রামের প্রধানরূপে খাড়া করিয়া গোমস্তা দাশজী বসিয়া বসিয়া কল টিপিতেছে; গ্রামের দলের মধ্যে নাই কেবল দেবু পণ্ডিত, জগন ঘোষ এবং তারা নাপিত। দেবু নিরপেক্ষ, তাহার প্রীতি-স্নেহের উপর অনিরুদ্ধের অনেক ভরসা; কিন্তু এ সকল কথা লইয়া অহরহ তাহাকে বিরক্ত করিতেও অনিরুদ্ধের সঙ্কোচ হয়। জগন ডাক্তার দিবারাত্র ছিরুকে গালাগালি করে, কিন্তু ওই পর্যন্ত—তাহার কাছে অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করা ভুল। তারাচরণকে বিশ্বাস করা যায় না। তারাচরণ নাপিতের সঙ্গে গ্রামের লোকের হাঙ্গামাটা মিটিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকই মিটাইতে বাধ্য হইয়াছে, কারণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নাপিতের প্রয়োজন বড় বেশী। জাতকর্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই নাপিতকেই চাই। তারাচরণ এখন নগদ পয়সা লইয়াই কাজ করিতেছে, রেট অবশ্য বাজারের রেটের অর্ধেক। দাঁড়ি-গোঁফ কামাইতে এক পয়সা, চুল কাটতে দু পয়সা, চুলকাটা এবং কামানো একসঙ্গে তিন পয়সা।

অন্যদিকে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে নাপিতের প্রাপ্যও কমিয়া গিয়াছে। নগদ বিদায় ছাড়া—চাল, কাপড় ইত্যাদি যে-সব পাওনা নাপিতের ছিল, তাহার দাবি নাপিত পরিত্যাগ করিয়াছে। তারাচরণ নাপিত ঠিক কোনো পক্ষভুক্ত নয়, অনেকটা নিরপেক্ষ ব্যক্তি। অনিরুদ্ধ বা গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলে চুপি চুপি সে গ্রামের লোকের অনেক পরামর্শের কথাই বলিয়া যায়। আবার অনিরুদ্ধ ও গিরিশের সংবাদ গ্রামের লোক জিজ্ঞাসা করিলে তা-ও হ্যাঁ-না করিয়া দুইচারিটা

বলে। তবে তারাচরণের আকর্ষণ অনিরুদ্ধ গিরিশের দিকেই বেশী। পাতুর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাদেরই সে দুই-চারিটি বেশী খবর দেয়, কিন্তু অযাচিতভাবে সকল খবর দিয়া যায় দেবুকে। দেবুকে সে ভালবাসে। আর কিছু কিছু খবর বলে জগন ডাক্তারকে। বাছিয়া বাছিয়া উত্তেজিত করিবার মতো সংবাদ সে ডাক্তারকে বলে। ডাক্তার চীৎকার করিয়া গালিগালাজ দেয়; তারাচরণ তাহাতে খুশী হয়, দাঁত বাহির করিয়া হাসে। কৌশলী তারাচরণ কিন্তু কোনদিন প্রকাশ্যে অনিরুদ্ধ-গিরিশের সঙ্গে হৃদ্যতা দেখায় না। কথাবার্তা যাহা কিছু হয় সে-সব ওপারের জংশন শহরে বটতলায়। সেও আজকাল গিয়া ক্ষুর ভাঁড় লইয়া হাটের পাশেই একটা গাছতলায় বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিবকালী, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর, মহুগ্রাম, কঙ্কণা—এই পাঁচখানা গ্রামে তাহার যজমান আছে, তাহার দুইখানার কাজ সে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। বাকী তিনখানার একখানি নিজের গ্রাম—অপর দুইখানি মহুগ্রাম ও কঙ্কণা। মহুগ্রামের ঠাকুরমশায় বলেন মহাগ্রাম। এই ঠাকুরমশায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন জীবিত থাকিতে ও গ্রামের কাজ ছাড়া অসম্ভব। ন্যায়রত্ন সাক্ষাৎ দেবতা। এই দুইখানা গ্রামে দু দিন বাদে—সপ্তাহের পাঁচ দিন সে অনিরুদ্ধ-গিরিশের মতো সকালে উঠিয়া জংশনে যায়। হাটতলায় অনিরুদ্ধের কামারশালার পাশেই বটগাছের ছায়ায় কয়েকখানা ইট পাতিয়া সে বসে। সেই তাহার হেয়ার কাটিং সেলুন। দস্তুরমত সেলুনের কল্পনাও তাহার আছে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে কথাবার্তা হয় সেইখানে। কঙ্কণা তাহাকে বড়ো একটা যাইতে হয় না, বাবুরা সবাই ক্ষুর কিনিয়াছে। যাইতে হয় ক্রিয়াকর্মে, পূজাপার্বণে। সেগুলো লাভের ব্যাপার

পদ্মের অসুখ সম্বন্ধে নিজের ধারণার কথা অনিরুদ্ধ গিরিশকে বলিলেও তারাকে বলে নাই—তারাচরণকে তাহারা ঠিক বিশ্বাস করে না।

কিন্তু তারাচরণ অনেক সন্ধান রাখে, ভাল রোজা, জাগ্রত দেবতার অথবা প্রেতদানার স্থান; যেখানে ভর হয়—এ সবের সন্ধান তারা নাপিত দিতে পারে। অনিরুদ্ধ ভাবিয়াছিল—তারা নাপিতকে কথাটা বলিবে কি না।

সেদিন মনের আবেগে অনিরুদ্ধ কথাটা তারাচরণের পরিবর্তে বলিয়া ফেলিল জগন ডাক্তারকে। দ্বিপ্রহরে জংশনের কামারশালা হইতে ফিরিয়া অনিরুদ্ধ দেখিল, পদ্ম মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইদানীং পদ্মর মূর্ছা-রোগের পর সে দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া আসে। সেদিন ফিরিয়া পদ্মকে মূর্ছিত দেখিয়া বার কয়েক নাড়া দিয়া ডাকিল, কিন্তু সাড়া পাইল না। কখন যে মূর্ছা হইয়াছে—কে জানে! মুখে-চোখে জল দিয়াও চেতনা হইল না। কামারশালায় তাতিয়া পুড়িয়া এতটা আসিয়া অনিরুদ্ধের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তিতে ক্রোধে

সে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। জলের ঘটিটা ফেলিয়া দিয়া, পদ্মের চুলের মুঠি ধরিয়া সে নিষ্ঠুরভাবে আকর্ষণ করিল! কিন্তু পদ্ম অসাড়! চুল ছাড়িয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অনিরুদ্ধের বুকের ভিতরটা কান্নার আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পাগলের মতো ছুটিয়া আসিল। জগনের তেজী ওষুধের ঝাঁজে পদ্ম অচেতন অবস্থাতেই বারকয়েক মুখ সরাইয়া লইয়া শেষে গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল।

ডাক্তার বলিল—এই তো চেতন হয়েছে! কাঁদছিস কেন তুই?

অনিরুদ্ধের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতেছিল। সে ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠেই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখুন দেখি, ডাক্তার! আগুন-তাতে পুড়ে এই এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ রাস্তা এসে আমার ভোগান্তি দেখুন দেখি একবার।

ডাক্তার বলিল—কি করবি বল্? রোগের উপর তো হাত নাই। এ তো আর মানুষে করে দেয় নাই।

অনিরুদ্ধ আজ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল—মানুষ, মানুষেই করে দিয়েছে ডাক্তার; তাতে আমার এতটুকুন সন্দেহ নাই। রোগ হলে এত ওষুধপত্র পড়ছে তাতেও একটুকু বারণ শুনছে না রোগ! এ রোগ নয়—এ মানুষের কীর্তি।

জগন ডাক্তার হইলেও প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারে না। রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেকৃশন দিয়াও সে দেবতার পাদোদকের উপর ভরসা রাখে। অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—তা সে না হতে পারে তা নয়। ডাইনী-ডাকিনী দেশ থেকে একেবারে যায় নাই! আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে তো বিশ্বাস করে না। ওরা বলছে—

বাধা দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বলুক, এ কীর্তি ওই হারামজাদা ছিরের। ক্রোধে ফুলিয়া সে এতখানি হইয়া উঠিল।

সবিস্ময়ে জগন প্রশ্ন করিল—ছিরের?

—হ্যাঁ, ছিরের। ক্রুদ্ধ আবেগে অনিরুদ্ধ পদ্মের সেই স্বপ্নর কথাটা আনুপূর্বিক ডাক্তারকে বলিয়া বলিল—ওই যে চন্দর গড়াই, ছিরে শালার প্রাণের বন্ধু—ও শালা ডাকিনী-বিদ্যে জানে! যোগী গড়াইয়ের বিধবা মেয়েটাকে কেমন বশীকরণ করে বের করে নিলে—দেখলেন তো? ওকে দিয়েই এই কীর্তি করেছে! এ একেবারে নিশ্চয় করে বলতে পারি আমি।

জগন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পর বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হুঁ।

ক্রোধে অনিরুদ্ধের ঠোঁট থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। পদ্ম এই কথাবার্তার

মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছিল; দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া সে হাঁপাইতেছিল। অনিরুদ্ধের ধারণার কথাটা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল।

জগন বলিল—তাই তুই দেখ অনিরুদ্ধ; একটা মাদুলি কি তাবিজ হলেই ভাল হয়। তারপর বলিল—দেখ, একটা কথা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে; দেখিস তুই—এ ঠিক ফলে যাবে; নিজের বাণে বেটা নিজেই মরবে।

অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে জগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জগন বলিল—সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয় জানিস তো?

কি হয়?

—বংশবৃদ্ধি হয়, ছেলে হয়, তোদের কপালে ছেলে নাই, কিন্তু ছিরে নিজে যখন সাপ ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে ম'রে তোর ঘরে এসে জন্মাবে। তোর হয় তো নাই, কিন্তু ও নিজে থেকে দিয়েছে।

জগনের এই বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া অনিরুদ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল; তাহার চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে জগনের মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পদ্মের মাথার ঘোমটা অল্প সরিয়া গিয়াছে, সে-ও স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল সম্মুখের দিকে। তাহার মনে পড়িয়া গেল—ছিরুর শীর্ণ গৌরবর্ণা স্ত্রীর কথা। তাহার চোখ-মুখের মিনতি, তাহার সেই কথা—'আমার ছেলে দু'টিকে যেন গাল দিয়ো না ভাই! তোমার পায়ে ধরতে এসেছি আমি!'

জগন ও অনিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। জগন বলিল—চিকিৎসা এর তেমন কিছু নাই। তবে মাথাটা যাতে একটু ঠাণ্ডা থাকে, এমনি কিছু চলুক। আর তুই বরং একবার সাওগ্রামের শিবনাথতলাটাই না হয় ঘুরে আয়! শিবনাথতলার নামডাক তো খুব আছে!

শিবতলার ব্যাপারটা ভৌতিক ব্যাপার। কোন পুত্রহারা শোকার্ত মায়ের অবিরাম কান্নায় বিচলিত হইয়া নাকি তাহার মৃত পুত্রের প্রেতাত্মা নিত্য সন্ধ্যায় মায়ের কাছে আসিয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার মা খাবার রাখিয়া দেয়, আসন পাতিয়া রাখে; প্রেতাত্মা আসিয়া সেই ঘরে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সেই অবসরে নানা স্থান হইতে লোকজন আসিয়া আপন আপন রোগ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ প্রেতাত্মার কাছে নিবেদন করে; প্রেতাত্মা সে-সবের প্রতিকারের উপায় করিয়া দেয়। কাহাকেও দেয় মাদুলি, কাহাকেও তাবিজ, কাহাকেও জড়ি, কাহাকেও বুটি. কাহাকেও আর কিছু!

অনিরুদ্ধ বলিল—তাই দেখি।

—দেখি নয়, শিবনাথতলাতেই যা তুই। দেখ না, কি বলে।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অনিরুদ্ধ একটু হাসিল—অত্যন্ত ম্লান হাসি। বলিল—এদিকে যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, এগিয়ে যাই কি করে!

ডাক্তার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল, অনিরুদ্ধ বলিল—পুঁজি ফাঁক হয়ে গেল ডাক্তারবাবু, বর্ষাতে হয়তো ভাত জুটবে না। বাকুড়ির ধান মূলে-চুলে গিয়েছে, গাঁয়ের লোকে ধান দেয় নাই, আমিও চাইতে যাই নাই। তার ওপর মাগীর এই রোগে কি খরচটা হচ্ছে, তা তো আপনি সবই জানেন গো! শিবনাথের শুনেছি বেজায় খাঁই।

প্রেত-দেবতা শিবনাথ রোগে-দুঃখের প্রতিকার করিয়া দেয়, কিন্তু বিনিময়ে তাহার মাকে মূল্য দিতে হয়। সেটা লাগে প্রথমেই।

জগন বলিল—পাঁচ-সাত টাকা হলে আমি না-হয় কোন রকমে দেখতাম অনিরুদ্ধ, কিন্তু বেশী হলে তো—

অনিরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—ডাক্তারের অসমাপ্ত কথার উত্তরে সে বলিয়া উঠিল, তাতেই হবে ডাক্তারবাবু, তাতেই হবে, আরও কিছু আমি ধার-ধোর করে চালিয়ে নোব। দেবুর কাছে কিছু, আপনার আর দুগ্‌গার কাছে যদি—

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—দুগ্‌গা?

অনিরুদ্ধ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর মাথা চুলকাইয়া একটু লজ্জিত ভাবেই বলিল—পেতো মুচির বোন্ দুগ্‌গা গো!

চোখ দুইটা বড় করিয়া ডাক্তারও একটু হাসিল—ও! তারপর আবার প্রশ্ন করিল—ছুঁড়ির হাতে টাকাকড়ি আছে, নয়?

—তা আছে বৈকি। শালা ছিরের অনেক টাকা ও বাগিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া কঙ্কণার বাবুদের কাছেও বেশ পায়। পাঁচ টাকার কমে হাঁটেই না।

—ছিরের সঙ্গে নাকি এখন একবারেই ছাড়াছাড়ি শুনলাম?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আমার কাছে একখানা বগি-দা করিয়ে নিয়েছে, বলে—ক্ষ্যাপা কুকুরকে বিশ্বাস নাই। রাত্রে সেখানা হাতের কাছে নিয়ে ঘুমোয়।

—বলিস্ কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কিন্তু তোর সঙ্গে এত মাখামাখি কিসে? আশনাই নাকি?

মাথা চুলকাইয়া অনিরুদ্ধ বলিল—না—তা নয়, দুগ্‌গা লোক ভাল, যাই-আসি গল্পসল্প করি।

—মদ-টদ চলে তো?

—তা—এক-আধ দিন মধ্যে-মাঝে—

অনিরুদ্ধ লজ্জিত হইয়া হাসিল।

*   *   *

পথের উপরে দাঁড়াইয়া ডাক্তারকে অকপটে সে সব কথাই খুলিয়া বলিল।

দুর্গার সঙ্গে সত্যই অনিরুদ্ধের ঘনিষ্ঠতা হৃদ্য হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল দুর্গা শ্রীহরির সহিত সকল সংস্রব ছাড়িয়া নূতনভাবে জীবনের ছক কাটিবার চেষ্টা করিতেছে।

আজকাল দুর্গা জংশনে যায় নিত্যই, দুধের যোগান দিতে। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের কামারশালায় একটি বিড়ি বা সিগারেট খাইয়া, সরস হাস্য-পরিহাসে খানিকটা সময় কাটাইয়া তবে বাড়ী ফেরে। অনিরুদ্ধও সকালে দুপুরে বিকালে জংশনে যাওয়া আসার পথে দুর্গার বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই যায়; দুর্গাও একটি করিয়া বিড়ি দেয়, বিড়ি টানিতে টানিতে দাঁড়াইয়াই দুই-চারিটা কথাবার্তা হয়। দা'খানাকে উপলক্ষ করিয়া হৃদ্যতাটুকু স্বল্পদিনের মধ্যেই বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে; মধ্যে একদিন লোহা কিনিবার একটা গুরুতর প্রয়োজনে—টাকার অভাবে বিব্রত হইয়া অনিরুদ্ধ চিন্তিতমুখেই কামারশালায় বসিয়াছিল, সেদিন দুর্গা আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—এমন করে গুম মেরে বসে কেন হে?

দুর্গাকে বিড়ি দিয়া নিজেও বিড়ি ধরাইয়া অনিরুদ্ধ কথায় কথায় অভাবের কথাটা খুলিয়া বলিয়াছিল। দুর্গা তৎক্ষণাৎ আঁচলের খুঁট খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া বলিয়াছিল—চারদিন পরেই কিন্তুক শোধ দিতে হবে ভাই।—

অনিরুদ্ধ সে টাকাটা ঠিক চারদিন পরেই দিয়াছিল। দুর্গা সেদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—সোনার চাঁদ খাতক আমার!

অনিরুদ্ধকে দুর্গার বড় ভাল লাগে। ভারী তেজী লোক, কাহারও সে তোয়াক্কা রাখে না। অথচ কি মিষ্ট স্বভাব! সব চেয়ে ভাল লাগে কামারের চেহারাখানি। লম্বা মানুষটি। দেহখানিও যেন পাথর কাটিয়া গড়া! প্রকাণ্ড লোহার হাতুড়িটা লইয়া সে যখন অবলীলাক্রমে লোহার উপর আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকে তখন ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে; কিন্তু তবুও ভাল লাগে, একটি আঘাতও বেঠিক পড়ে না!

*   *   *

ডাক্তারকে বিদায় করিয়া অনিরুদ্ধ বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া দেখিল পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছে, রান্নাবান্নার নামগন্ধ নাই! পদ্মকে সে আর কিছু বলিল না, কতকগুলো কাঠ-কুটা উনানের মুখে আনিয়া উনান ধরাইতে বসিল। রান্না

করিতে হইবে; তাহার পর আবার ছুটিতে হইবে জংশনে। রাজ্যের কাজ বাকী পড়িয়া গিয়াছে।

পদ্ম কাহাকে ধমক দিল—যা!

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কেহ কোথাও নাই। কাক কি কুকুর, কি বিড়াল, তাও কোথাও নাই। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি?

পদ্ম উত্তরে প্রশ্ন করিল কি?

অনিরুদ্ধ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল, বলল— ক্ষেপেছিস নাকি তুই? কিছু কোথাও নাই, ধমক দিচ্ছিস কাকে?

পদ্ম এইবার লজ্জিত হইয়া পড়িল, শুধু লজ্জিতই নয়, একটু অধিক মাত্রায় সচেতন হইয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া উনানশালে আসিয়া বলিল—সর। আমি পারব। তুমি যাও।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল। আর সে পারিতেছে না।

কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে যদি পদ্মের রোগ উঠিয়া পড়ে! সে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইল। পড়ে পড়ুক, সে আর পারে না। সে বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম রান্না চাপাইল। ভাতের সঙ্গে কতকগুলা আলু, একটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কতকগুলি মুসুরির ডাল ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ বাহিরে গিয়াছে। বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই। নির্জন নিঃসহ অবস্থায় আজ অহরহ মনে হইতেছে তাহার সেই স্বপ্নের কথাগুলি, সেদিন ডাক্তারের কথাগুলি। ছিরু পালের বড় ছেলেটা তাহার মাকে কি ভালই না বাসে!

ওই—ওই কি আসিবে?

ধক্‌ধক্ করিয়া তাহার হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ছেলেটির শীর্ণ গৌরাঙ্গী মা ওই খিড়কীর দরজার মুখেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে পদ্মের দিকে মিনতিভরা চোখে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে একটা সকাতর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বার বার আপন মনেই বলিল—না-না-না, তোমার বুকের ধন কেড়ে নিতে আমি চাই না। আমি চাই না। আমি চাই না।

উনানের মধ্যে কাঠগুলা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, হাঁড়ি-কড়া সম্মুখেই—এইবার রান্না চড়াইয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু সে তাহার কিছুই করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্তরের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ চকিতের মত অধীর অতৃপ্ত কেহ অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিতেছে—মরুক, মরুক! মনশ্চক্ষে

ভাসিয়া উঠিতেছে পাল-বধূর সন্তান। সভয়ে চাঞ্চল্যে শিহরিয়া উঠিয়া নীরবেই পদ্ম বলিতেছিল—না-না-না।

পাল-বধূর আটটি সন্তান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি অবশিষ্ট আছে; আবারও নাকি সে সন্তানসম্ভবা। তাহার গেলে সে আবার পায়। যাক, তাহার আর একটা যাক। ক্ষতি কি!

উনানের আগুণ বেশ প্রখরভাবেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তবুও সে কাঠ-গুলোকে অকারণে ভিতরে ঠেলিয়া দিল, অকারণেই স্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ, ছি-ছি-ছি! ছি-ছিকার করিল সে আপন মনের ভাবনাকে।

তারপরই সে ডাকিল পোষা বিড়ালটাকে—মেনী মেনী, আয় আয়, পুষি আয়!

ছেলে না হইলে কিসের জন্য মেয়েমানুষের জীবন! শিশু না থাকিলে ঘর-সংসার! শিশু রাজ্যের জঞ্জাল আনিয়া ছড়াইবে,—পাতা কাগজ, কাঠি, ধূলা, মাটি, ঢেলা, পাথর কত কি! কি তিরস্কার করিবে, আবার পরিষ্কার করিবে, রূঢ় তিরস্কারে শিশু কাঁদিবে, পদ্ম তখন তাহাকে বুকে লইয়া আদর করিবে। তাহার আবদারে নিজের ধূলার মুঠা মুখের কাছে লইয়া খাওয়ার অভিনয় করিবে—হাম-হাম-হাম! শিশু কাঁদিবে হাসিবে, বক্ বক্ করিয়া বকিবে, কত বায়না ধরিবে, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মও আবোল-তাবোল বকিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষে তাহাকে একটা চড় কষাইয়া দিবে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কোলে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া, দুটি গালে দুটি চুমা খাইয়া তাহাকে লইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইবে আর চাঁদকে ডাকিবে—আয় চাঁদ, আয়, আয়, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা!

এইসব কল্পনা করিতে করিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

তাহার নিজের নাই, কেহ যদি তাহাকে একটি শিশু পালন করিতেও দেয়! একটি মাতৃহীন শিশু! শিশুসন্তানের জননী কেহ মরে না! ওই পালবধূ মরে না! পণ্ডিতের স্ত্রী মরে না! না হয় তো তাহার নিজের মরণ হয় না কেন? সে মরিলে তো সকল জ্বালা জুড়ায়।

বাহিরে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। ওখানে আর যাচ্ছি না। আমার পৌষ-আগলানো আমার নিজের বাড়ীর দরজায় হবে।

পদ্মের মনের মধ্যে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল একটা দুরন্ত ক্রোধ। ইচ্ছা হইল—উনানের জ্বলন্ত আগুন লইয়া এই ঘরের চারিদিকে লাগাইয়া দেয়। যাক,

সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক। অনিরুদ্ধ পর্যন্ত পুড়িয়া মরুক। পরমুহূর্তেই সে জলন্ত উনানের উপর হাঁড়িটা চাপাইয়া দিল, তাহাতে জল ঢালিয়া চাল ধুইতে আরম্ভ করিল।

কাল আবার লক্ষ্মীপূজা, পৌষ-সংক্রান্তিতে পৌষ-লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী! তাহার আবার লক্ষ্মী। কার জন্য লক্ষ্মী? কিসের লক্ষ্মী?

ষোল

পৌষ-সংক্রান্তির পৌষ-লক্ষ্মী অর্থাৎ পৌষ-পার্বণ। নবান্নের দিন হইতে মাস দেড়েক পর পল্লীবাসীর জীবনে আর একটি সার্বজনীন উৎসব আসিল। যে জীবনে উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্যন্ত বারো ঘণ্টা সময়ের অর্ধেকটা চলে হল-আকর্ষণকারী কুব্জপৃষ্ঠ বলদের অতি-মন্থর পদক্ষেপের পিছনে পিছনে, অথবা ঘরের সমান উঁচু ধান ও খড়-বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকা ঠেলিয়া অথবা শ্বাসরোগীর মত দুঃসহ কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে, বোঝা মাথায় করিয়া আনিতে আনিতে কাটিয়া যায় টানিয়া টানিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস, সেখানে দেড়মাস সময় পরিমাপে নগর-জীবনের তুলনায় নিশ্চয়ই দীর্ঘ। একটানা একঘেয়ে জীবন।

মধ্যে ইতুলক্ষ্মী গিয়াছে; কিন্তু ইতুলক্ষ্মীতে নিয়ম আছে, পালন আছে, পার্বণের সমারোহ নাই। পৌষ-পার্বণে ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা-পরব। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পাতিয়া চিড়া, মুড়কী, মুড়ী, মুড়ীর নাড়ু কলাই-ভাজা ইত্যাদিতে পূজা হইয়াছিল। পৌষ সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধান-কড়ি সাজাইয়া সিংহাসনের দুইপাশে দুইটি পেঁচা রাখিয়া লক্ষ্মীপূজা হইবে। এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর সঙ্গে নানা দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে। রাশীকৃত চাল ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া প্রস্তুত হইয়াছে—পিঠা তৈয়ারী হইবে হরেক রকমের। রস প্রস্তুত হইয়াছে, রসে সিদ্ধ পিঠা হইবে। তাহা ছাড়া গুড়ে-নারিকেলে, গুড়ে-তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে, পাতলা ক্ষীর হইয়াছে, চাঁচি বা খোয়া ক্ষীর হইয়াছে—লোকে আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ পাইবে।

অনিরুদ্ধের এসবের আয়োজন কিছুই হয় নাই। একে পদ্মের দেহ অসুস্থ, তার উপর একটি পয়সাও তাহার হাতে নাই। গোটা পৌষটাই অনিরুদ্ধের কামারশালা একরকম বন্ধ গিয়াছে বলিলেই হয়। লোহার কাজ এ সময়ে বেশী না হইলেও কিছু হয়; ধান-কাটার কাস্তে পাঁজানো এবং গরুর গাড়ীর চাকার খুলিয়া-পড়া লোহার বেড় লাগানো কাজ না করাইয়া চাষীদের উপায় নাই। কিন্তু অবসরের অভাবে অনিরুদ্ধ তাহাও করিতে পারে নাই। অবসর পাইবে

কোথায়? পদ্মের অসুখ লইয়াই মাথা খারাপ করিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে। আজ এখানে গিয়াছে, কাল ওখানে গিয়াছে। শিবনাথতলা, কোন্ এক মুসলমান ওস্তাদের বাড়ী—যাইতে সে কোথাও বাকী রাখে নাই। সব করিয়াছে ধার করিয়া, খরিদ্দারের টাকা ভাঙিয়া। এদিকে পাঁচ বিঘা বাকুড়ির ধান তাহার গিয়াছে। বাকি জমির ধান ভাগে জোতদারের সঙ্গে নিজে লাগিয়া কাটিতেছে ও ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ঘরে তুলিতেছে।

আবার সরকারের সেটেল্‌মেণ্ট আসিয়াছে, নোটিশ হইয়াছে—'আপন আপন জমিতে স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রমাণাদিসহ উপস্থিত থাকিতে হইবে। অন্যথায় সেটেল্‌মেণ্ট কার্যবিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেক।'

এক টুকরা জমির জন্য কানুনগো ও আমিন বাবুদের সঙ্গে সেই ভোর হইতে বেলা তিন প্রহর কাটিয়া যায়, পাকা ধানের উপর দিয়া শিকল টানিতে টানিতে সেই জমিটুকুতে আসিতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে। সে টুকরাটা হইয়া গেলে দুই-তিন দিন কি চার-পাঁচ দিন নিশ্চিন্ত, তাহার পর হয়তো আবার এক টুকরা। শুধু অনিরুদ্ধ নয়, সমস্ত গ্রামের লোকেরই এইভাবে লাঞ্ছনা-দুর্বিপাকের আর শেষ নাই। পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর সিংহাসন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে; কিন্তু এবার লক্ষ্মী এখনও মাঠে। গোটা গাঁয়ের মধ্যে একটি গৃহস্থেরও 'দাওন' আসে নাই। ওই আবার একটা হাঙ্গামা রহিয়া গেল। ধান তোলার শেষ দিনে 'দাওন' আসিবে—অনিরুদ্ধের নিজেকেই শেষ ধানগুচ্ছটি কাটিতে হইবে—কাটা ধানের গোড়ায় জল দিয়া ধানগুচ্ছটি লইয়া আসিতে হইবে মাথায় করিয়া। অনিরুদ্ধের কৃষাণ নাই, ভাগ-জোতদারকে পায়েস রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইবে। অন্যান্যবার এই লক্ষ্মীর সঙ্গেই ও পর্বটি সারা হইয়া যায়—এবার সেটেল্‌মেণ্টের দায়ে বাকী পড়িয়া রহিল।

* * *

ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া পদ্ম ফেন গালিয়া ফেলিল। খুঁজিয়া বাছিয়া ভাতের ভিতর হইতে একটা ছোট পুঁটলি টানিয়া বাহির করিল, পুঁটলিটার মধ্যে আছে খানিকটা মসুর কলাই, গোটাচারেক বড় আলু এবং একটুকরা কুমড়ার ফালি। এগুলা মাখিয়া ফেলিয়া আবার মাছ দেখিতে হইবে; মাছ নহিলে অনিরুদ্ধের ভাত উঠিবে না। এইজন্য খিড়কীর ডোবার জলের কিনারায় কতকগুলা 'আপা' অর্থাৎ গর্ত করা আছে—পাকাল মাছগুলা তাহার মধ্যে ঢুকিয়া থাকে; সতর্ক ও ক্ষিপ্রভাবে হাত চালাইয়া দিলেই ধরা যায়। পদ্ম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাহিরের দরজার দিকে চাহিল। এ কাজটুকুও তো সে করিলে পারিত! কোথায় গেলেন নবাব? সেই একবার বাহির-দরজায়

সাড়া শোনা গিয়াছিল—চণ্ডীমণ্ডপ না ছাঁটিবার সঙ্কল্পের আস্ফালন হইতেছিল, তারপর আর সাড়া নাই। 'চণ্ডীমণ্ডপ ছাঁটিব না'। তবে তো মা কালী ও বাবা শিবের বেগুন ক্ষেত জলপ্লাবিত হইয়া গাছগুলা পচিয়া নিদারুণ ক্ষতি হইয়া গেল। ওইরূপ মতি না হইলে এই দুর্গতি হইবে কেন?

—কম্মকার রইছ নাকি হে? কম্মকার! অ কম্মকার! কম্মকার হে!

কে লোকটা? উত্তর না পাইয়াও এক নাগাড়ে ডাকিয়াই চলিয়াছে।

—অ অম্মকার! এই তোমার দুগ্‌গা বললে—বাড়ী গেল কম্মকার, আর সাড়া দিচ্ছ না। ওহে ও কম্মকার!

অনিরুদ্ধ তাহা হইলে দুর্গার বাড়ী গিয়াছিল। রূপ আছে বলিয়াই ওই মুচিনীর বাড়ী? ছি-ছি-ছি!···লক্ষ্মী? এই লোকের বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকে? না—এই লোকের বংশ থাকে? পদ্ম যেন পাগল হইয়া উঠিল—সে উনান হইতে জ্বলন্ত কাঠ একখানা টানিয়া বাহির করিল। আগুন ধরাইয়া দিবে—ঘর-সংসারে সে আগুন ধরাইয়া দিবে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল ভূপাল চৌকিদার।

—বলি কম্মকার, তুমি কি রকম মানুষ হে? ডেকে ডেকে গলা আমার ফেটে গেল! কই, কম্মকার কই?

বাড়ীর মধ্যে অনিরুদ্ধকে না পাইয়া ভূপাল খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া গেল, অবশেষে পদ্মকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুমি বাপু কম্মকারকে ব'ল—আমি এসেছিলাম। আমার হয়েছে এক মরণ! ডাকলে লোকে যাবে না, আর গোমস্তা বলবে—শালা, বসে বসে ভাত খাবার জন্য তোকে মাইনে দিই!

—কে রে! কে কি বলবে কম্মকারকে? কম্মকার কার কি ধার ধারে? বাহির দরজা হইতেই কথা বলিতে বলিতে অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকিল।

—এই যে কম্মকার! ভূপাল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।—তুমি বাপু একবার চল, গোমস্তা তো আমার মুণ্ডুপাত করছে!

অনিরুদ্ধ খপ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এই! বাড়ীর ভেতর ঢুকলি ক্যানে তুই?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভূপাল এবার রুষ্টস্বরে বলিল—হাত ছাড় কম্মকার!

—বাড়ী ঢুক্‌লি ক্যানে তুই? খাজনার তাগাদা আছে, গাড়ীর বাইরে থেকে করবি। জমিরারের নগ্দী—বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে!

হাতটা মোচড় দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া ভূপাল এবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল—এ্যাও! মুখ সামলে, কম্মকার, মুখ সামলে বল। দু বছর খাজনা বাকী, খাজনা

দাও নাই ক্যানে ? আলবৎ বাড়ী ঢুকব ! ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স—তাও আজ পর্যন্তও দাও নাই ! ভূপালও বাগ্দীর ছেলে ; সেও এবার বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

খাজনা, ইউনিয়ান বোর্ডের ট্যাক্স ! অনিরুদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ও-সব কথা আমলে না আনিয়া সে তাহার নিজের অভিযোগটাই আবার জাহির করিল—আমি যদি বাড়ীতে থাকতাম, তা হলে নয় ঢুকতিস—ঢুকতিস। বাড়ীতে বেটাছেলে নাই —আমার বাড়ী ঢুকবি ক্যানে তুই ?

ভূপাল বলিল—চল তুমি, গোমস্তা ডাকছে।

—যা যা, বল গে, কারুর ডাকে আমি যাই না !

—খাজনার কি বলছ বল ?

—যা, বল গে, খাজনা আমি দোব না।

—বেশ ! ভূপাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধও সাফ-জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আস্ফালন আরম্ভ করিয়া দিল—আদালত আছে, উকিল আছে, আইন আছে, নালিশ কর গিয়ে। বাড়ীর ভেতর ঢুকবে, বাড়ীর ভেতর ! ওঃ আস্পদ্ধা দেখ !

অকস্মাৎ সে কাঁদো-কাঁদো স্বরে আবার বলিল—গরীব বলে আমাদের যেন মান ইজ্জৎ নাই ! আমরা মানুষ নই !

পদ্ম একটি কথাও বলে নাই, নীরবেই সিদ্ধ সামগ্রীগুলি নুন-তেল দিয়া মাখিতেছিল। এতক্ষণে বলিল—হ্যাঁগা, মাছের কি হবে ?

—মাছ ? মাছ চাই না। কিছু খাব না, যা। পিণ্ডিতে আমার অরুচি ধরেছে।

পদ্ম আর কোন কথা না বলিয়া ভাত বাড়িতে আরম্ভ করিল।

অনিরুদ্ধ অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—তুই আমার লক্ষ্মী ছাড়ালি।

—আমি ?

—হ্যাঁ, তুই। রোগ হয়ে দিনরাত পড়ে আছিস, ঘরে সন্ধ্যে নাই, ধূপ নাই। এ ঘরে লক্ষ্মী থাকে ? বলি কাল যে লক্ষ্মীপুজো—তার কি কুটোগাছটা ভেঙে আয়োজন করেছিস ? অনিরুদ্ধ রাগে ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের ক্ষোভের উন্মত্ততা ইতিমধ্যে অদ্ভুতভাবে প্রশান্ত উদাসীনতায় পরিণত হইয়া আসিয়াছে। অনিরুদ্ধের এই অপমানে ক্ষোভে তাহার তৃপ্তি হইয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার নিজের

ক্ষোভের উন্মত্ততা—যে উন্মত্ততাবশে কিছুক্ষণ পূর্বে সে আগুন ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল—সে উন্মত্ততা বিচিত্রভাবে শান্ত হইয়া গিয়াছে। আঁচল বিছাইয়া সেইখানেই সে শুইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর যেন একরাশ কান্না উথলাইয়া পড়িতেছে।

* * *

পদ্ম নীরবে কাঁদিতেছিল ; দর্-দর্ ধারে তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া গাল ভিজাইয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। কাঁদিলে তাহার বুকের ভিতরে গভীর যন্ত্রণাদায়ক আবেগটা কমিয়া যায়। কাঁদিলে কাঁদিতে সে কিছুক্ষণ পর তৃপ্তি অনুভব করে, তাহার পর একটা আনন্দ পায়।

—কই হে? কামার-বউ কই হে?

কে ডাকিতেছে? পদ্ম নিঃশব্দে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। মুছিয়া ফেলিয়াও কিন্তু সাড়া দিল না, সাড়া দিতে ইচ্ছা হইল না।

—কামার-বউ! ওমা এই বিকেলবেলা উনোনের মুখে শুয়ে ক্যানে হে?

তাহাকে দেখিয়া পদ্মের সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। যে ডাকিতেছিল সে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে। সে দুর্গা।

কি আস্পর্ধা মুচিনীর! ডাকিবার ধরন দেখ না। অত্যন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠেই সে বলিল—ক্যানে? কি দরকার?

হাসিয়া দুর্গা বলিল—একটা কথা আছে ভাই তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? কি কথা? কিসের কথা শুনি?

—বলব, তা উঠেই বস।

—আমার শরীরটা ভাল নাই।

দুর্গা শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—অসুখ করেছে? দাওয়ার ওপর উঠব?

তড়িৎস্পৃষ্টের মত পদ্ম উঠিয়া বসিল, বলিল—না।

দুর্গা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ওমা, কাঁদছিলে বুঝি? কি হল? কর্মকারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

সে হি-হি করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

—সে খবরে তোমার দরকার কি? কি বলছ বল না? খোঁজ দেখ না, যেন আমার কত আপনার জন!

—আপনার জন তো বটে, ভাই। 'লই' কি না—তুমিই বল।

—তুই আমার আপনার জন? পদ্ম ক্রোধে এবার 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিল।

দুর্গা কিন্তু তাহাতেও রাগ করিল না, হাসিল। হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হে

হ্যাঁ। যদি বলি আমি তোমার সতীন! তোমার কর্তা তো আমাকে ভালবাসে হে!

পদ্ম এবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দুরন্ত ক্রোধে রান্নাশালার ঝাঁটাগাছটা কুড়াইয়া লইল।

দুর্গা হাসিয়া খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল—ছোঁয়া পড়লে অবেলায় চান করতে হবে। আমার কথাটাই আগে শোন ভাই, তারপর না হয় ঝাঁটাটা ছুঁড়েই মেরো।

পদ্ম অবাক হইয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দাঁড়াও ভাই, বার-দরজাটা আগে বন্ধ করে দি। কে কখন এসে পড়বে!

পদ্ম তখনও শান্ত হয় নাই, সে ঝাঁঝালো স্বরে বলিল—দরজা দিয়ে কি হবে? গণ্ডায় গণ্ডায় আমার তো নাগর নাই!

দুর্গা আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল—আমার তো আছে ভাই। তারা যদি গন্ধে গন্ধে এসে পড়ে!

—আমার বাড়ী এলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না!

দুর্গা ততক্ষণে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফিরিয়া সে সংস্পর্শ বাঁচাইয়া খানিকটা দূর হইতে বলিল—পরকে না হয় পার। কিন্তু তোমার আপন কত্তাটিকে? সেও যে আমার তুমি যা বললে তাই! যাক্ শোন ভাই, ঠাট্টা নয়, এইগুলো ঘরে তুলে রাখ দেখি। সে ততক্ষণে কাঁকাল হইতে কাপড়-ঢাকা একটা চুপড়ি নামাইল। তাহার মধ্য হইতে নামাইয়া দিল—এক ঘটি দুধ, এক ভাঁড় গুড়, গোটাদুয়েক ছাড়ানো নারিকেল, সেরখানেক তিল, একটা ,পাত্রে আধসেরটা তেল—আরও কতকগুলি মশলাপত্র। বলিল—যাও, লক্ষ্মীপুজোর উয্যুগ করে ফেল। আতপ চাল তো আমার নাই, আর আমাদের চালগুঁড়োতে তো হবে না। আমি শুনলাম তোমার কর্তার কাছে।

পদ্মর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া জিনিসগুলাকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। তাহাই সে দিত। কিন্তু ঠিক তখনই বাহির দরজায় ধাক্কা দিল। হয়তো অনিরুদ্ধ। ভাল, সে-ই আসুক—তারপর সামনেই সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে।

দ্রুতপদে সে নিজেই গিয়া খুলিয়া দিল। কিন্তু সে অনিরুদ্ধ নয়—বুড়ী রাঙাদিদি। পদ্ম শান্তভাবে সম্ভাষণ করিল—কে, রাঙাদিদি?

—হ্যাঁ। তা হ্যাঁ লো নাতবউ!—বলিতে বলিতে বৃদ্ধার দৃষ্টি পড়িল দুর্গার উপর।—ওমা, ও কে বসে? ওটা কে?

—আমি। কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া দুর্গা বলিল—রাঙাদিদি, আমি দুগ্‌গা, বায়েনদের দুগ্‌গা।

—দুগ্‌গা! তোর কি আ-ছাটা 'মিত্তিকে' নাই লা? এই হেথা, ওই হোথা, একেবারে হুই মুলুকে! কঙ্কণা, জংশন, কোথায় বা না-যাস! তা হেথা কি করছিস, লা? ওগুলো কি বটে?

—এই, কামার-বউ টাকা দিয়েছিল জংশন থেকে জিনিস কিনতে, তাই এনে দিলাম, রাঙাদিদি।

— তা আমাকে বলতে নাই? গাঁয়ে বসে চার আনার বাজার করলাম আজ, চাল বেচলাম এক টাকার। জংশনে চার আনার বাজারেও একটা পয়সাও বাঁচত, চালের দরেও দুটো পয়সা বেশী পেতাম। আমার তো শক্তসোমথ সোয়ানী নাই, আবাগী আমি—আমার 'উব্‌গার' করবি ক্যানে বল?

হাসিয়া দুর্গা বলিল—এইবার একদিন দিও দিদি, এনে দোব।

—তা দিস। তুই মানুষ তো ভাল, তবে বড় নচ্ছার। তা তুই যা করবি করগে, আমার কি?

দুর্গা সশব্দে হাসিয়া উঠিল—তা বই কি, দিদার তো আর বুড়ো নাই। ভয়-ভাবনা কিসের? তা বাজার তোমার করে দোব দিদি।

বৃদ্ধা বলিল—মরণ! তার আবার হাসি কিসের লা?

—বেশ, আর হাসব না। এখন কি বলছ বল?

—মর! তোকে কে বলছে? বলছি নাতবউকে। হ্যাঁ লা নাতবউ, এবার যে বড় আমার বাড়ীতে চাল কুটতে গেলি না?

রাঙাদিদির বাড়ীতে ঢেঁকি আছে, পদ্ম বরাবরই রাঙাদিদির ঢেঁকিতে পিঠার চাল কুটিয়া আনে। এবার যায় নাই, তাই বৃদ্ধা আসিয়াছে।

—বলি হ্যাঁ লা, তোকে আমি কখনও কিছু বলেছি নাকি? বল্ কিছু বলেছি কি না? মনে তো পড়ছে না ভাই!

কাহাকে কখন যে বুড়ী কি বলে সে আর পরে তাহার মনে থাকে না।

ম্লান হাসি হাসিয়া পদ্ম বলিল—তার জন্য নয়; এবার চাল কোটাই হয় নাই রাঙাদিদি।

—চাল কোটাই হয় নাই? বলিস কি?

—না।

—আ-মরণ! তা আর করে চাল কুটবি? রাত পোহালেই তো লক্ষ্মী—

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল। দুর্গা মাঝখান হইতে বলিল—নাত-বউয়ের অসুখ তো জান, রাঙাদিদি। অসুখ শরীরে কি করবে বল?

—তবে ? লক্ষী হবে কি করে ? তোর সেই 'হাদামুহন' মিলে কোথা ? সেই অনিরুদ্ধ ? সে পারে না ?

দুর্গাই বলিল—হবে কোন রকম করে। কম্মকার আসুক, দোকান থেকে কিনে আনবে।

—কিনে আনবে ? না না। কলে কোটা খঁড়োয় কি লক্ষী হয় ? ও সাত-বউ, এক কাজ কর, আমার ঘর থেকে নিয়ে আয় চাট্টি খঁড়ো। তা দু'সের আড়াই সের দিতে পারব। আচ্ছা, আমিই না হয় দিয়ে যাব। ওমা, তা বলতে হয় ! আমি এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছি !

যাইতে যাইতে দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা বলিল—ইছু শেখ পাইকারের করণটা দেখ দেখি দুগ্‌গা, বুড়ো গাইটার দাম বলছে চার টাকা। শেষমেষ বলে, পাঁচ টাকা। তোদের পাড়ায় আর কেউ পাইকার এলে পাঠিয়ে দিস্‌ তো বুন্‌।

দুর্গাও ঝুড়িটা লইয়া উঠিল, বলিল—বাটি-ঘটি কাল এসে নিয়ে যাব ভাই। আজ চললাম।

—এইখানে কাল খাবে।

—বেশ। দুর্গা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অকস্মাৎ কোথায় দিয়া কি হইয়া গেল। রাঙাদিদির সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কেমন করিয়া তাহার অন্তরের ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল। আবার সব ভাল লাগিতেছে। দুর্গার জিনিসগুলো সে প্রত্যাখ্যান করিল না ; লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল না। দুর্গার এই মিথ্যা কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে ; রাঙা-দিদিকে সে বলিল—কামার-বউ তাহাকে জংশন শহর হইতে বাজার করিয়া আনিতে টাকা দিয়াছিল—এ সেই জিনিস !

সে রাঙাদিদির চাল-খঁড়োর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বাড়ীতে আতপ চাল নাই। চাল খঁড়াইয়া একবার বাঁকিয়া লইয়া আল্‌পনার গোলা তৈয়ারি করিতে হইবে। আল্‌পনা আঁকিতে হইবে—বাহির দরজা হইতে ঘরের ভিতর পর্যন্ত খামারে ; মরাইয়ের নিচে গোয়াল ঘর পর্যন্ত। চণ্ডীমণ্ডপে আবার পৌষ আগলানোর আল্‌পনা আছে। মনে পড়িল, 'আউরী-বাঁউরী' চাই ! কার্তিক সংক্রান্তি 'মুঠ লক্ষীর' ধানের খড় পাকাইয়া সেই দড়িতে বাঁধিতে হইবে বাড়ির প্রতিটি জিনিস। ঘরের বাক্স-পেটরা তৈজস-পত্র সবেতেই পড়িবে মা-লক্ষীর বন্ধন। ঘরের চালে পর্যন্ত আউরী-বাঁউরীর বন্ধন পড়িবে। তাহা হইলেই বৈশাখের ঝড়ে আর চাল উড়িবে না।

* * *

সেই পুরাকালে ছিল এক রাখাল ছেলে। বনের ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে আপনার গরুগুলিকে লইয়া চরাইয়া ফিরিত। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের বাতাস তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে দুঃখ-কষ্ট হইলে সে চোখের জল ফেলিত, আর ঊর্ধ্বমুখে দেবতাকে ডাকিত—ভগবান্, আর পারি না, এ কষ্ট তুমি দূর কর, আমাকে বাঁচাও।

একদিন লক্ষ্মী-নারায়ণ চলিয়াছেন আকাশ-পথে। রাখালের কাতর কান্না আসিয়া পৌঁছিল তাঁহাদের কানে। মা-লক্ষ্মীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। দূর কর ঠাকুর, রাখালের দুঃখ দূর কর।

নারায়ণ হাসিলেন। বলিলেন—এ দুঃখ দূর করিবার শক্তি তো আমার নাই লক্ষ্মী, সে শক্তি তোমার!

লক্ষ্মী বললেন—তুমি অনুমতি দাও।

নারায়ণের অনুমতি পাইয়া লক্ষ্মী আসিলেন মর্ত্যে। চারিদিক হাসিয়া উঠিল—সোনার বর্ণচ্ছটায়, বাতাস ভরিয়া উঠিল দেবীর দিব্যাঙ্গের অপরূপ সৌরভে! রাখাল অবাক হইয়া গেল। দেবী রাখালের কাছে আসিয়া বলিলেন—দুঃখ তোমার দূর হইবে, তুমি আমার কথামত কাজ কর। এই লও ধানের বীজ; বর্ষার সময় মাঠে এইগুলি ছড়াইয়া দাও, বীজ হইতে গাছ হইবে। সেই গাছের বর্ণ যখন হইবে আমার দেহ-বর্ণের মতো, আমার গাত্র-গন্ধের মতো, গন্ধে যখন ভরিয়া উঠিবে তাহার সর্বাঙ্গ, তখন সেগুলি কাটিয়া ঘরে তুলিবে।

রাখাল লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বর্ষায় প্রান্তরের বুকে ছড়াইয়া দিল ধানের বীজ; দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ ভরিয়া গেল সবুজ ধানের গাছে। ক্রমে ক্রমে বর্ষা গেল—সবুজ ধানের ডগায় দেখা গেল দিল শীষ। রাখাল নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল, কিন্তু এখনও সেই ঠাকরুনের মতো বর্ণ হয় না, সে গন্ধও উঠিতেছে না। রাখাল অপেক্ষা করিয়া রহিল। হেমন্তের শেষ অগ্রহায়ণে একদিন রাত্রে ঘরে শুইয়াই রাখাল পাইল সেই গন্ধ। সকালে উঠিয়াই সে ছুটিয়া গেল মাঠে। অবাক হইয়া গেল সোনার বর্ণে গোটা মাঠটা আলো হইয়া উঠিয়াছে, দিব্য-গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। সোনার বর্ণে, দিব্য গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আকাশে নানাবিধ কীট-পতঙ্গ-পাখী উড়িতেছে—পশুরা আসিয়া জুটিয়াছে চারিপাশে, সেই ঠাকরুন যেন তাহার দুঃখে বিগলিত হইয়া মাঠ জুড়িয়া অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ধান কাটিয়া ভারে ভারে ঘরে তুলিল।

দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া আসিয়া সোনা দিয়া কিনিতে চাহিলেন সমস্ত

ধান। রাজার ভাণ্ডারের সোনা ফুরাইয়া গেল—কিন্তু রাখালের ধান অফুরন্ত। রাজার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তখন রাজা আপনার কন্যাকে আনিয়া দান করিলেন রাখালের হাতে। সম্মুখেই পৌষ-সংক্রান্তিতে রাখাল লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিল। ওই ধানকেই স্থাপিত করিল সিংহাসনে, সিন্দুরকজ্জলে বসনে-ভূষণে তাহাকে বিচিত্র শোভায় সাজাইল, সম্মুখে স্থাপন করিল জলপূর্ণ ঘট, ঘটের মাথায় দিল ডাব—আমের পল্লব। রাজকন্যা ঐ ধান ভানিয়া চাল করিলেন, চাল হইতে প্রস্তুত হইল সেই নানাবিধ সুখাদ্য,—ঘৃতে-অন্নে-ঘৃতান্ন, দুধে-অন্নে মিষ্টান্ন-পায়সান্ন-পরমান্ন, হরেক রকমের পিঠা সরুচাকলি, তাহার সঙ্গে পঞ্চপুষ্পে ধূপে-দীপে চন্দনে গন্ধে দেবীর পূজা করিয়া রাখাল ও রাজকন্যা দেবীর ভোগ দিয়া সর্বাগ্রে দিলেন কৃষাণকে, রাখালকে—নিজের স্বামীকে, ঘরের জনকে—তাহার পর বিলাইলেন পাড়া-প্রতিবেশীকে, হেলে বলদ, গাই-গরু-ছাগল-ভেড়া—এমন কি বাড়ীর উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরটা পর্যন্ত প্রসাদ পাইল।

লক্ষ্মীদেবী মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিলেন, আপন পরিচয় দিলেন, বর দিলেন, তোমার মতো এই পৌষ-সংক্রান্তিতে যে আমার পূজার্চনা করিবে—তাহার ঘরে আমি অচলা হইয়া বাস করিব। পৃথিবীতে তাহার কোন অভাব বা কোন দুঃখ থাকিবে না। পরলোকে সে করিবে বৈকুণ্ঠে বাস।

* * *

ব্রত-কথাটি মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক বাঁধিয়া পরিতুষ্ট মনেই পদ্ম লক্ষ্মীর আয়োজন আরম্ভ করিল। ঘর-দুয়ার, খামার হইতে গোয়াল পর্যন্ত আলপনা আঁকিয়া এবার সে যেন একটু বেশী বিচিত্রিত করিয়া তুলিল। দুয়ার হইতে আঙিনার মধ্যস্থল পর্যন্ত আলপনায় আঁকিল চরণ-চিহ্ন। ওই চরণ-চিহ্ন। ওই চরণ-চিহ্নে পা ফেলিয়া লক্ষ্মী ঘরে আসিলেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখ আঁকিল প্রকাণ্ড এক পদ্ম। অপরূপ তাহার কারু-কার্য। মা আসিয়া বিশ্রাম করিবেন। শাঁখ ধুইল, ধূপ বাহির করিল, প্রদীপ মার্জনা করিল, সিন্দুর রাখিল, কাজল পাড়িল। এদিকের আয়োজন শেষ করিয়া গুড়ে-নারিকেলে, গুড়ে-তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবে, দুধ জ্বাল দিয়া ক্ষীর হইবে। কত কাজ, কত কাজ! কাজের কি অন্ত আছে। আজ যদি তাহার একটা ছোট মেয়ে থাকিত, তবে সে-ই জিনিসপত্রগুলি হাতে হাতে আগাইয়া দিতে পারিত। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—আলপনার কাজে তাহার একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে পৌষ-আগলানোর আলপনা চাই—সেটা দেওয়া হয় নাই।

এক মুহূর্ত সে দাঁড়াইয়া ভাবিয়া লইল। মানে অনিরুদ্ধ তখন বলিতেছিল,

চণ্ডীমণ্ডপে তাহার কেহ যাইবে না, তাহার পৌষ-আগলানো পর্ব হইবে তাহার বাড়ির দুয়ারে !

না, সে হইবে না। পদ্ম তাহা করিবে না, করিতে দিবে না। 'মা কালী, বাবা বুড়ো শিবের চরণতল ওই চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া.—না, সে হইবে না।' পদ্ম আলপনা গোলার বাটি হাতে চণ্ডীমণ্ডপ অভিমুখেই বাহির হইয়া গেল।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াইয়া পদ্মের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এ কি সেই চণ্ডীমণ্ডপ ? কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তাহা আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়া এমন অপরূপ শোভায় হাসিতেছে ! এ যে সব পাকা হইয়া গিয়াছে। পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিবার পাকা সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি হাতীর শুঁড় সিঁড়িগুলিকে বেষ্টন করিয়া যেন ধরিয়া রাখিয়াছে। ষষ্ঠীতলার বকুল গাছটির চারিপাশ পাকা গোল বেদী করিয়া বাঁধানো। চণ্ডীমণ্ডপের মেঝে পাকা হইয়াছে, মসৃণ সিমেণ্টের পালিশ ঝক্‌মক্ করিতেছে। থামগুলিতে পলেস্তারা করা হইয়াছে। তাহাতে দুধবরণ কলি-চুন দেওয়া হইয়াছে। ওপাশে নূতন একটা কূয়া। পদ্মের মনে পড়িয়া গেল—এসব শ্রীহরি ঘোষের কীর্তি ! সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আলপনা আঁকিতে বসিল। 'পৌষ পৌষ পৌষ, বড় ঘরের মেঝোয় এসে বস—' একটা ঘর আঁকিতে হইবে। মরাই আঁকিতে হইবে। 'এস পৌষ বস তুমি, না যেয়ো ছাড়িয়া।' পৌষ মাস তো শ্রীহরির, তাহাদের আবার পৌষ মাস কিসের ?

—কে গা ? কে তুমি, একরাশ আলপনা যেন দিয়ো না, বাছা। মুঠো মুঠো খরচ করে একজনা বাঁধিয়ে দিলে—আর তোমরা তো আপনার কল্যাণ করে চাল গোলা ঢালছ। এর পর ধোবে মুছবে কে ?

পদ্ম মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শ্রীহরির মা পথের উপর হইতে চীৎকার করিতেছে। পদ্ম প্রতিবাদ করিতে পারিল না। শ্রীহরির মায়ের এ-কথা বলিবার অধিকার আছে বইকি। সে কোনমতে আলপনা শেষ করিয়া চলিয়া আসিল।

বাড়ী ঢুকিতে গিয়া দেখিল, দেবু তাহাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। ঘোমটা টানিয়া সে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দেবুর পিছনে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়াছিল অনিরুদ্ধ। দেবু হাসিয়া পদ্মকেই বলিল—কাল তাহলে পণ্ডিতগিন্নীর কাছে লক্ষীর কথা শুনতে যেয়ো মিতেনী। সে বলে দিয়েছে।

পদ্ম অবগুণ্ঠিত মস্তকে সায় দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, সে যাইবে।

দেবু চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ বলিল—পণ্ডিত এসেছিল ; কার কাছে শুনেছে, লক্ষ্মীর উয্যুগ হয় নাই আমার, তাই দুটো টাকা দিয়ে গেল। এমন মানুষ আর হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, কিন্তু সংসারে বাড়-বাড়ন্ত তো ওর হবে না, হবে ছিরের।

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল। সে-ও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল

অনিরুদ্ধ আবার প্রশ্ন করিল, আর কিছু আনতে হয় তো বল ?

—না।

—তবে নে, কাজগুলো সেরে নে। আগে একবার তামুক সেজে দে দেখি।

অনিরুদ্ধকে তামাক সাজিয়া দিয়া সে উনানে কড়া চড়াইয়া আরম্ভ করিল গুড়-নারিকেলের পাক। তাহার অন্তর আবার দুঃখের আক্ষেপের আবেগে ভরিয়া উঠিয়াছে। দেবু পণ্ডিতের কথা ছাড়িয়াই দিতে হইবে—পণ্ডিত সত্যই দেবতার মত মানুষ। কিন্তু ওই দুর্গা, তাহারও দয়াধর্ম আছে, ভালবাসা আছে, রাঙাদিদির মত কৃপণ, সেও পুণ্যকর্ম করে। শ্রীহরি ঘোষের কীর্তি—তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া সে তো অবাক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জীবনে কি হইল !

দুঃখ তাহার নিজের জন্য, কিন্তু আজ সে হিংসা কাহাকেও করিল না। বরং সকলকেই সে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। আর বার বার কামনা করিল, মাগো ! দুঃখ আমার দূর কর। সন্তানে সম্পদে আমার ঘর ভরিয়া দাও, আমি যোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব, আঙুল কাটিয়া প্রদীপের সলিতা করিব, চুল কাটিয়া চামর বাঁধিয়া সে চামরে তোমায় বাতাস করিব, বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া সেই রক্তে তোমার পায়ে আলতা পরাইব। তোমার পূজায় পঞ্চ-শঙ্খের বাজনা করিব, পট্টবস্ত্রের চাঁদোয়া টানাইব। রূপার সিংহাসনে সোনার ছাতার তলায় তোমাকে বসাইব ; আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী, দিন-দুঃখী, পশু-পক্ষীকে বিতরণ করিব তোমার প্রসাদ—এক-অন্ন, পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন !

* * * *

অনিরুদ্ধ বাড়ীর বাহির হইতেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—পদ্ম ! ও পদ্ম !

পদ্ম চমকিয়া উঠিল। কি হইল আবার ?

অনিরদ্ধ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল—কড়াইটা নামিয়ে রেখে আমার সঙ্গে আয় দেখি।

—কে ?

—পণ্ডিতকে ধরে নিয়ে গেল। পণ্ডিতের বাড়ী যাব।

—ধরে নিয়ে গেল ? কে ?

—সেটেলমেণ্টের হাকিম পরোয়ানা বার করেছিল ; থানা থেকে লোক এসে ধরে নিয়ে গেল।

—সেটেল্‌মেণ্ট ! সেটেল্‌মেণ্ট ! উঃ—কোথা হইতে ইহারা আসিয়া গ্রাম-খানার ঝুঁটি ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া সর্ব অঙ্গ-স্নায়ু-তন্ত্রী-মন এমন করিয়া অস্থির অবশ করিয়া দিল ! নিত্য নূতন নোটিশ, নূতন হুকুম ! তক্‌মা-আঁটা পিওনগুলোর যাওয়া-আসার বিরাম নাই। পথে-ঘাটে সাইকেলের পর সাইকেল চলিয়াছে। কিন্তু হায় হায়, একি কাণ্ড ! দেবু পণ্ডিতের মত লোককে তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল !

সতেরো

দেবু ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি নয়। সরকারী জরিপের কাজে বাধা-দেওয়া ও সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারী আমিনকে প্রহার করার অপরাধে সে অভিযুক্ত হইয়াছে। স্থানীয় সেটেল্‌মেণ্টে-অফিসারের নির্দেশ মতো এখানকার থানার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টার একজন কনস্টেবল লইয়া আসিয়াছে। গ্রাম্য চৌকিদার ভূপালও তাহাদের সঙ্গে আছে। তাহারা চণ্ডীমণ্ডপে অপেক্ষা করিতেছিল। দেবু অনিরুদ্ধের বাড়ী হইতে আসিবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখন হাতে হাতকড়ি দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আজ রাত্রিতে থাকিবে হাজতে, কাল সকালে সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের নিকট হাজির করা হইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে জামিন দিবেন কিংবা বিচারাধীন আসামী হিসাবে তাহাকে সদর জেলে পাঠাইবেন। আবার ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিচারের দিন ধার্য করিয়া নিজে বিচার করিবেন। দেবুকে লইয়া তাহারা চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া আছে।

দেবুও চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল। মাথার ভিতরটাই কেমন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে ; কিসে কি হইয়া গেল তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত নাই। শুধু সে ভাবিতে পারিল যে, যাহা সে করিয়াছে—ভালই করিয়াছে ; এখন যাহা হইবার হইয়া যাক্ !

দেখিতে দেখিতে গ্রামের প্রায় সকল লোকই জমিয়া গেল। শ্রীহরি ও দাশজী গোমস্তা, ছোট দারোগা সাহেবের পাশেই বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে তিনজনে কথাও হইতেছে। হরিশ আসিয়াছে, ভবেশ আসিয়াছে, হরেন ঘোষাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল ও গ্রামের দোকানী বৃন্দাবন,

রামনারায়ণ ঘোষ, এমন কি এই শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জগন ডাক্তার দেবুর পাশে বসিয়া আছে। প্রগলভ জগনও আজ স্তব্ধ, বিষণ্ণ—এমন আকস্মিক অভাবনীয় পরিণতিতে সে-ও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। একপাশে গ্রামের হরিজনেরা দাঁড়াইয়া আছে। সতীশ, পাতু, সকলেই আসিয়াছে। দুর্গা বসিয়া আছে ষষ্ঠিতলার একপাশে—একা নীরবে, মাটির পুতুলের মত।

চীৎকার করিতেছে কেবল বুড়ী রাঙাদিদি। চণ্ডীমণ্ডপের ও-পাশে গ্রামের প্রবীণারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাঙাদিদি বলিতেছিল—এ একেবারে হাতে করে মাথা কাটা! দারোগা! দারোগা হয়েছে তো সাপের পাঁচ পা দেখেছে! বলি—হ্যাঁ গো দারোগা, চুরি না জোচ্চুরি না ডাকাতি, কি করেছে বাছা যে, এই তিন সন্ধ্যাবেলা—রাত পোয়ালে লক্ষী—তুমি বাছার হাতে দড়ি দিতে এলে?

হরিশ বলিল—ওগো রাঙা পিসি, তুমি থাম।

—ক্যানে? থামব ক্যানে? দেখব একবার কত বড় ওই দারোগা মিন্সে।

একবার ধমক দিয়া শ্রীহরি বলিল—রাঙাদিদি, তুমি থাম। যা হয় আমরা করছি, তুমি একটু চুপ কর। তোমরা মেয়ে-লোক—

—মেয়ে-লোক? আমার সাড়ে-তিনকুড়ি বয়স হল—আমি আবার মেয়ে-লোক কি রে? একশোবার বলব, হাজারবার বলব; আমাকে কি করবে? বাঁধবি তো বাঁধ ক্যানে, দেখি। পণ্ডিতের মতন লোককে দড়ি দিয়ে বাঁধছিস—আমাকেও বাঁধ। লে বাঁধ! আহা, পণ্ডিতের মতন মানুষ, দেবুর মতন ছেলে—! বুড়ী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবু এবার নিজে উঠিয়া আসিয়া বলিল—একটু চুপ কর, রাঙাদিদি, আমি তোমার কাছে হাত জোড় করছি।

বৃদ্ধা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—আমি তোকে আশীর্বাদ করছি ভাই, সায়েব তোকে দেখবামাত্তর ছেড়ে দেবে, চেয়ারে বসিয়ে বলবে—পণ্ডিত লোক, তোমাকে কি জেহেল দিতে পারি বাপ।

দেবু হাসিল।

ওদিকে ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া কৌশলে মুক্তিলাভ করাইবার কথাবার্তা হইতেছিল। শ্রীহরি ঘোষ তাহার অগ্রণী, সঙ্গে জমিদারের গোমস্তা দাশজী আছে। ছোট দারোগা শ্রীহরি ঘোষের বন্ধু লোক, শ্রীহরি তাহাকেই ধরিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে দেবু শ্রীহরির বিরোধীপক্ষ; অন্তরে অন্তরে দেবু তাহাকে ঘৃণা করে—তাহা শ্রীহরি জানে। কিন্তু গ্রামের প্রধান ব্যক্তি

হিসাবে শ্রীহরি আজ দেবুর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া পারে না। সে থাকিতে তাহার গ্রামবাসী—বিশেষ ক রয়া তাহার জ্ঞাতি একজনকে হাতে দড়ি দিয়া লইয়া গেলে লোকে কি বলিবে? সে ছোট দারোগাকে খুশী করিয়া একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছে।

ছোট দারোগা বলিল—পেশকারের কাছে যাও, ধরে-পেড়ে হয়ে যাবে একরকম করে। যে আমিন-কানুন্‌গোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—তাদেরই খুশী কর. বিনয় করে মাফ নিয়ে নিক দেবু ঘোষ, ব্যস—মিটে যাবে। এ তো আকছার হচ্ছে!

শ্রীহরি বলিল—খুড়োর যে আমার বেজায় মাথা গরম গো আমি প্রথম দিন শুনেই বলে পাঠিয়েছিলাম,—খুড়ো, একবার কানুন্‌গো বাবুর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে এস। রাজকর্মচারী—তুই-তুকারি করলে তো হল কি?

ভবেশ অমনি বলিয়া উঠিল—এ্যই, গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ে নাই।

শ্রীহরি বলিল—যখন ঘটনা ঘটল, তখুনি তখুনি জানতে পারলে তো সে ঢেউ আমিই তখুনি মেরে দিতাম—ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতাম। আমি যে অনেক পরে শুনলাম।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটিয়া গিয়াছিল। এও সেই তুই-তুকারি লইয়া ঘটনা।

দেবু আপনার দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তখন বেলা প্রায় বারোটা। সাইকেলে চড়িয়া সম্মুখের পথ দিয়া যাইতেছিল একজন কানুন্‌গো। বোধ হয় বহুদূর হইতে আসিতেছিল—শীতের দিনে এক গা ঘামিয়া ধূলোয় ও ঘামে আচ্ছন্ন এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ভদ্রলোক; দেবুকে দেখিয়া সাইকেল হইতে নামিয়াই সম্ভাষণ করিল—এই! ওরে! এই! শোন্।

এই সম্ভাষণ শুনিলেই দেবু ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠে; তাহার তিক্ত কটু অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তবু লোকটির মাথায় টুপি, সাদা শার্ট, খাকি হাফপ্যান্ট ও সাইকেল দেখিয়া সরকারী কর্মচারী অনুমান করিয়া সে চুপ করিয়াই রহিল।

—এই ইডিয়েট, শুনতে পাচ্ছিস?

এবার দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লোকটির দিকে চাহিল—ইচ্ছা ছিল কোন উত্তর না দিয়াই সে উঠিয়া গিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিবে, উত্তর দিবে না, ওই লোকটার কোন কথাই শুনিবে না। কিন্তু উঠিতে-উঠিতেও একবার সে লোকটির দিকে না চাহিয়া পারিল না।

চোখোচোখি হইতেই কানুন্‌গো বলিল—যা, এক গ্লাস জল আন দেখি। বেশ ঠাণ্ডা জল। পরিষ্কার গ্লাসে বুঝলি?

দেবু বিপদে পড়িয়া গেল। তৃষ্ণার জলের জন্য এই আবেদন অভদ্র হইলেও —সে 'না' বলিতে পারিল না। তবুও সে মুখে কোন কথা বলিল না, ঘরের ভিতর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দাওয়ায় রাখিল; পিচবোর্ডে তৈয়ারী একখানা পাখা আনিয়া দিল। ঐগুলির মারফতেই নীরব আমন্ত্রণ জানাইয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই এক হাতে ঝকঝকে মাজা একখানি থালায় একটি বড় কদমা ও এক গ্লাস জল এবং অন্য হাতে একটি বড় ঘটির এক ঘটি জল ও পরিষ্কার একখানি গামছা আনিয়া হাজির করিল।

লোকটি হাত-মুখ ধুইল, গামছা আগাইয়া দিলে, বাঁ হাত দিয়া কানুনগো গামছাখানা সরাইয়া দিল। হাত-মুখ মুছিয়া ফেলিল সে আপনার রুমালে; তারপর কদমাটার খানিকটা ভাঙিয়া মুখে দিয়া বোধ হয় চাখিয়া দেখিল। কদমাটা টাটকা কদমা, বেশ ভালই লাগিবার কথা! লাগিলও বোধ হয় ভাল; কারণ গোটা কদমাটা নিঃশেষ করিয়া জল খাইয়া কানুনগো পরিতৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—আঃ!

দেবু ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়াছিল। পান বা মশলা আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল। বিলুকে বলিল—সুপারি লবঙ্গ আর দুটো পান দাও দেখি! শীগগির।

পান সাজাই ছিল। এক টুকরা পরিষ্কার কলাপাতার উপর দুইটি পান ও সুপারি, লবঙ্গ সাজাইয়া সে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

ঠিক এই সময়েই বাহির হইতে ডাক আসিল—ওরে! এই ছোক্‌রা!

দেবু আর সহ্য করিতে পারিল না। পানের পাতাটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া আসিয়া সে বলিল—কিরে, কি বলছিস?

এমন অতর্কিত রূঢ় প্রত্যুত্তরের জন্য কানুনগো প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে ক্রোধে প্রথমে সে কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া রহিল, তারপর বলিল—হোয়াট! আমায় তুই-তুকারি করিস?

নির্ভয়ে দেবু উত্তর দিল—সে তো তুই-ই আগে করলি।

—কি নাম তোর শুনি? তারপর দেখছি তোকে!

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর নির্ভয়ে বলিল—আমার নাম শ্রীদেবনাথ ঘোষ। তাহার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল—কি করবি কর!

কানুনগো বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গিয়াছিল।

ওদিকে জরিপ স্থগিত রাখিবার জন্য শ্রীহরিদের দরবারে বিশেষ ফল হয় নাই, ধান কাটিবার জন্য মাত্র আর সাত দিন সময় মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু পৌষের চৌদ্দ দিনের মধ্যে বিস্তীর্ণ মাঠের ধান কাটা ও তোলা অসম্ভব ব্যাপার। অসম্ভব

কোনমতেই সম্ভব হয় নাই। হইয়াছে কেবল শ্রীহরির এবং আর জন দুই-তিনের—হরিশ দোকানী বৃন্দাবন দত্ত এবং কৃপণ হেলারাম চাটুয্যের। তাহাদের পয়সা আছে, বহু নগদ মজুর নিযুক্ত করিয়া তাহারা কাজ শেষ করিয়াছে। বাকী লোকের পাকাধানের উপর দিয়াই জরিপ চলিতে আরম্ভ করিল। সরকার হইতে অবশ্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ধান বাঁচাইয়া আইলের উপর দিয়া কাজ করিতে নির্দেশ রহিল।

দেবু প্রথম দিন মাঠে গিয়ে দেখিল—সার্ভে-টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে সেই কানুন্‌গো লোকটি। কানুন্‌গোও দেবুকে দেখিল। দুজনের চিত্তই তিক্ত হইয়া উঠিল। কানুন্‌গো লোকটি ডিস্‌পেপটিক, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক, লোকজনের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা তাহার স্বভাব। দেবু সাবধানে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েকটা ক্ষুদ্র ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া কানুন্‌গো তাহাকে ক্যাম্পে হাজির হইতে নোটিশ দিল।

তিক্তচিত্তে দেবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল—যাহা হয় হউক, সে কিছুতেই ওই কানুন্‌গোর সম্মুখে হাজির হইয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইবে না।

কানুন্‌গো সুযোগ পাইয়া এই অনুপস্থিতির কথা সেটেল্‌মেন্ট-ডেপুটিকে রিপোর্ট করিল। ডেপুটি সাহেব নোটিশগুলি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। এই তুচ্ছ কারণে নোটিশ করা হইয়াছে? তাহার উপর তিনি এই কানুন্‌গোটির স্বভাবও জানিতেন। তবুও আইনানুযায়ী দেবুকে নোটিশ করিলেন। দেবু এ নোটিশও অমান্য করিল। তারপরই ওয়ারেন্ট হওয়ার নিয়ম। এদিকে ঠিক এই সময়েই এক চরম ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

দেবুরই একটা জমি পরিমাপের সময় কানুন্‌গোর সঙ্গে তাহার বচসা আরম্ভ হইল। দেবু জমির রসিদ আনে নাই। বচসার উপলক্ষ তাই। কথার উত্তর দিতে দিতেই দেবুর নজর পড়িল,—তাহার জমির ঠিক মাঝখানে পাকা ধানের উপর জরিপের শিকল টানা হইতেছে। সে ভাবিল—এটাও কানুন্‌গোর ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। কিন্তু সত্য বলিতে কি এটা কানুন্‌গোর ইচ্ছাকৃত ছিল না, দেবুর জমিটার আকারই এমন অসমান যে, মাঝখানে প্রস্থের একটা মাপ না লইয়া উপায় ছিল না। রাগের মাথায় ভুল বুঝিয়া দেবু চরম কাণ্ড করিয়া বসিল। জরিপের চেন টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিল। কানুন্‌গো সঙ্গে সঙ্গে টেবিল শিকল লইয়া মাঠ হইতে উঠিয়া একেবারে ডেপুটির ক্যাম্পে হাজির হইয়া রিপোর্ট করিল।

ডেপুটিবাবু সত্যকারের ভদ্রলোক, তিনি বাংলার চাষীর নিরীহ প্রকৃতির

কথা জানেন, তিনিও এই দেশেরই মানুষ ; তিনি অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু কানুন্‌গোর বন্ধু পেশকারটি ধুরন্ধর লোক, সে তাঁহাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল —লোকটা ওই জে. এল. ব্যানার্জীর শিষ্য।

ডেপুটি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

তারপরই এই পরিণতি। একেবারে ওয়ারেণ্ট অব য়্যারেস্ট !

শ্রীহরি সত্যই বলিয়াছে—সে কয়েকবারই অনুরোধ করিয়াছে—খুড়ো, চল তুমি, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, কানুন্‌গোকে আমি নরম করে এনেছি ; তুমি একবারটি গেলেই সব মিটে যাবে।

—দেবু বলিয়াছে—না।

জগন বলিয়াছে—পণ্ডিত, তুমিও একটা দরখাস্ত কর, সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দাও সি. ও,-কে ; ডি. এল. আর.-কেও একটা দরখাস্ত কর।

দেবু বলিয়াছে—না, থাক।

বিলু শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিয়াছে—হ্যাঁ গো, কি হবে ?

দেবু হাসিয়াছে—যা হয় হবে।

যাহা হইবার হইয়া গেল।

* * *

শ্রীহরি দেবুর কাছে আসিয়া বলিল—ছোট দারোগাকে রাজী করিয়েছি, খুড়ো। প্রথমে কানুন্‌গোর ক্যাম্পে যাবে, সেখানে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে, কানুন্‌গোর চিঠি নিয়ে যাবে সার্কেল ডেপুটির কাছে। কেস খারিজ হয়ে যাবে, আমরা বাড়ী চলে আসব।

দেবু বলিল—না।

—না কি গো ?

– না, সে আমি যাব না, ছিরু।

—ফল কি হবে, ভাবছ তা !

—যা হয় হবে। দেবু এবারও হাসিল।

শ্রীহরি গভীর দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াও বিরক্তি সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—কাজটা কিন্তু ভাল করছ না, খুড়ো।

দাশজী বলিল—তা হলে আমরা আর কি বলব বল ?

মজলিস-সুদ্ধ লোকই সমস্বরে বলিল—আমরা আর কি বলব বল ?

কেবল মজলিসের সঙ্গে সায় দিল না তিনজন—জগন ডাক্তার, অনিরুদ্ধ আর হরেন ঘোষাল। হরেন ঘোষালের অভ্যাস সকলের আগে কথা বলা, কিন্তু সে আজ কিছু না বলিয়াই দ্রুতপদে উঠিয়া চলিয়া গেল।

জগন বলিল—ভেবো না দেবু ভাই! কাল যদি কেস না করে হাজতী আসামী করে জেলে পাঠায়, তবে সদরে গিয়ে মোক্তার এনে মামলা লড়ব। আর যদি কালই বিচার করে জেল দেয়, তবে সদরে আপীল করব। জামিন সঙ্গে সঙ্গে হবে।

দেবু বলিল—শতখানেক টাকা আমার পোস্ট অফিসে আছে, বিলুর কাছে ফরম সই করে দিয়েছি। দরকারমত টাকা বার করে নিয়ো। মামলা করে কিছু হবে না জানি, কিন্তু জেরা করে আমি সব একবার ফাঁস করে দিতে চাই।

অনিরুদ্ধ অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিল—দেবু ভাই, তার চেয়ে মামলা মিটিয়ে ফেল।

হাসিয়া দেবু বলিল—তুমি একটু সাবধানে থেকো, অনি-ভাই। ডাক্তার, ওকে তুমি একটু দেখো;

ছোট দারোগা বলিল—সন্ধ্যে হয়ে গেল। কি ঠিক হল আপনাদের?

দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল—চলুন, আমি তৈরী।

ছোট দারোগা ডাকিল—ভূপাল! রামকিষণ!

একটুকুন দাঁড়ান, দারোগাবাবু! কোথা হইতে আসিয়া হাত-জোড় করিয়া দাঁড়াইল দুর্গা। দেবুকে বলিল—আর একবার বিলুদিদির সঙ্গে দেখা করে যাও পণ্ডিত।

দারোগা বলিল—যান, দেখা করে আসুন।

মুখরা দুর্গা আজ নীরব হইয়া দেবুর আগে আগে পথ চলিতেছিল।

দেবু বলিল—দুর্গা, তুই কিন্তু ওদের একটু দেখিস, একটু খোঁজখবর নিস্।

অগ্রগামিনী শুধু নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বিলু কাঁদিতেছিল। দেবু চোখ মুছাইয়া দিল। তারপর শুধু কয়টা কাজের কথাই বলিল—পোস্ট অফিসের টাকাগুলো তুলে এনে নিজের কাছে রেখো। ডাক্তার চাইলে দিয়ো মামলার জন্যে। সাবধানে থেকো। ধান-পান হিসেব করে নিয়ো। নিজেই তুমি হিসেব করে নিয়ো। তুমি তো হিসেব জানো। মন খারাপ কর না। খোকার ভার তোমার ওপর রইল—ঘর-দোর সব। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি চঞ্চল হলে তো চলবে না; তোমায় থাকতে হবে অচলা হয়ে।

বিলু একটি কথাও বলিতে পারিল না।

দেবু হাসিয়া সব শেষে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রগাঢ় আবেগে একটি চুম্বন দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে ছিল পদ্ম ও দুর্গা। দেবু বলিল—মিতেনী, তুমি রইলে, দুর্গা রইল; বিলুকে তোমরা একটু দেখো।

সে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিল—চলুন।

—ওয়েট! চণ্ডীমণ্ডপে নাটকীয় ভাবে প্রবেশ করিল হরেন ঘোষাল। তাহার হাতে একটি অতি সুন্দর গাঁদা ফুলের মালা। মালাখনি সে দেবুর গলায় পরাইয়া দিয়া উত্তেজিত আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয়, দেবু ঘোষের জয়!

মুহূর্তে ব্যাপারটার চেহারা পাল্টাইয়া গেল।

দারোগা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ফুলের মালা ও জয়ধ্বনিতে দেবুর পা হইতে মাথা পর্যন্ত একটা অদ্ভুত শিহরণ বহিয়া গেল। বুকের মধ্যে যে ক্ষীণতম দুর্বলতার আবেগটুকু স্পন্দিত হইতেছিল—সেটুকুও আর রহিল না, তাহার পরিবর্তে ভাঁটার নদীর বুকে জোয়ারের মত একটা বিপরীতমুখী উচ্ছ্বসিত আবেগ আসিয়া তাহাকে স্ফীত প্রশস্ত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা দারোগা কনস্টেবল উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকিয়াও প্রতিধ্বনি তুলিল—জয়, দেবু ঘোষের জয়। দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে দেবু সম্মুখে অগ্রসর হইল।

* * *

লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিতে বিলুর হাত উঠিতেছিল না। এক-অন্ন, পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর পূজা। এই বেদনা বুকে লইয়া সে-আয়োজন কেমন করিয়া কি করিবে সে; কাহার জন্য লক্ষ্মী পাতিবে! পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই নারীর বাস, নারায়ণের পাশে লক্ষ্মীর আসন। দেবুই যখন আজ এই আয়োজনের মধ্যস্থলে উপস্থিত নাই, তখন—! বার বার তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

কিন্তু রাঙাদিদি আসিয়া বলিল—ভাবিস না ভাই, পণ্ডিত ভাই আজই ফিরে আসবে। আর আমার পানে তাকিয়ে দেখ, তিনকুলে কেউ নাই, তবু তো পূজো করছি। তোর কোলে সোনার চাঁদ, দেবু আমার ফিরে আসছে—তোর পূজো না করলে চলে? দে, আমি বরং তোর লক্ষ্মী পেতে দিয়ে যাই। ওই চারিদিকে শাঁখ বাজছে—লক্ষ্মী পাতা হয়ে গেল সব।

রাঙাদিদি কত বাহার করিয়া নিপুণ হাতে সাজাইয়া লক্ষ্মী পাতিয়া দিয়াছে। লাল রেশমী কাপড়ে এমন করিয়া ধান ও কড়িগুলি ঢালিয়া দিয়াছে যে মনে হয় যেন ছোট্ট একটি বধূ সিংহাসনের উপর বসিয়া আছে।

পদ্ম দুই-তিনবার আসিয়াছিল। দুর্গা তো সকাল হইতে বসিয়াই আছে, নড়ে নাই। শ্রীহরির মা-বউও আসিয়াছিল।

মা মৌখিক তত্ত্ব করিয়া গিয়াছে ; বউটি আনিয়াছিল একছড়া মর্তমান কলা, একটা থোড়, একটা মোচা—শ্রীহরির নূতন কাটানো পুকুরের পাড়ের ফসল। আর কতকগুলি মটর শুঁটি, একটা কপি,—বাড়ীতে লক্ষ্মী-পূজা উপলক্ষে শ্রীহরি শহর হইতে আনাইয়াছে। বউটি বলিয়া গিয়াছে—তুমি ভেবোনা, শাশুড়ী! তোমার ভাশুর-পো সকালেই গিয়েছে হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে। খুড়শ্বশুরকে সঙ্গে নিয়ে সে আজই ফিরে আসবে।

প্রায় প্রতি ঘরের মেয়েরা আসিয়া বিলুর তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে। জগন ডাক্তারের স্ত্রী পাঁচবার আসিয়াছে। হরিজনেরা জনে জনে আসিয়াছে। খেজুর-গুড়ের মহলাদারটি খেজুরগুড় দিয়া গিয়াছে। সতীশ হইতে প্রত্যেকেই ছোট ছোট ঘটিতে কাঁচা দুধ আনিয়া দিয়া গিয়াছে। আর প্রয়োজন নাই বলিলে শুনে নাই, বুঝে নাই ; উত্তরে বিষণ্ণ মুখে বলিয়াছে—অপরাধ করলাম, মা ?

দুর্গা বলিল—বিলু দিদি, ক্ষীর করে রাখ।

বিলু বলিল—কি হবে বল দেখি ? পচে যাবে তো।

পচবে কেন ? দেখ না, জামাই ঠিক ঘুরে আসছে।

কয়েকটি বাড়ীর গুটিকয়েক কুমারী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘড়া দাও, বউদিদি, জল এনে দি।

বিলুর ইহারা সম্পর্কে ননদ। বিলু মিষ্ট-হাসি হাসিয়া বলিল—জল আমি এনেছি ভাই।

বিলু বলিল—বস, জল খাও।

—না আমরা কাজ করতে এসেছি।

ইহাদের এই অকপট আত্মীয়তা বিলুর বড় ভাল লাগিল। এত আপনার জন তাহার আছে! মানুষ এত ভাল!

চণ্ডীমণ্ডপে তিলকূট ভোগের ঢাক বাজিল তবে মেয়ে কয়টি গেল। চণ্ডী-মণ্ডপে আজ তিলকূট সন্দেশে বাবা-শিব ও মা-কালীর ভোগ হইবে। ওখানে ভোগ হইলে, তবে বাড়ীতে লক্ষ্মীর ভোগ হইবে। বাউড়ী-ডোম-মুচীদের ছেলেরা চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে এক টুকরা তিলকূটের জন্য। ইহার পর আবার বাড়ী বাড়ী পিঠা সাধিতে যাইবে।

বয়স্কেরা অনেকেই দেবুর জন্য সেটেল্‌মেণ্ট ক্যাম্পে গিয়াছিল। ফিরিল প্রায় একটার সময়। সকলেই গম্ভীর, চিন্তান্বিত। বিচার এখনও হয় নাই। তবে সবই বুঝা গিয়াছে। কিন্তু কি করিবে তাহারা ? সকলের চেয়ে গম্ভীর শ্রীহরি। আমিন শ্রীহরিকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিয়াছে—দেবুর পক্ষ লইয়া যে সাক্ষী দিবে,

তাহার সহিত বুঝাপড়া হইবে পরে। কারণ দেবু কিছুতেই ক্ষমা চাহিতে রাজী হয় নাই।

মুরুব্বীরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছে—তাহার চেয়ে কোন পক্ষেই সাক্ষ্য তাহারা দিবে না।

বাড়ী আসে নাই কেবল জনকয়েক,—জগন ডাক্তার, অনিরুদ্ধ, হরেন ঘোষাল, দ্বারকা চৌধুরী, তারা নাপিত। তাহারা বাড়ী ফিরিল প্রায় সন্ধ্যার সময়—বিষন্ন মুখে, মন্থর পদে। দুর্গা পথে দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রশ্ন করিল—কি হল ডাক্তারবাবু, চৌধুরী মশায় ?

জগন বলিল—সমস্ত দিন বসিয়ে রেখে, সন্ধ্যেবেলায় দিন ফেলে সদরে চালান দিলে! বদমায়েশী আর কি!

—চালান দিলে ?

—হ্যাঁ। কালই যাব আমি সদরে, জামিনে পণ্ডিতকে খালাস করে আনব।

কথাটা মিথ্যা। দেবুর এক বৎসর তিন মাস—পনেরো মাসের মেয়াদে জেল হইয়াছে। কাল জগন সদরে যাইবে আপীল করিবার জন্ত। দেবু কিন্তু আপীল করিতে বারণ করিয়াছে। সাক্ষীর অবস্থা দেখিয়া সে আপীলের ফলও আন্দাজ করিয়া লইয়াছে।

জগন গালিগালাজ করিয়াছিল গ্রামের লোককে। দ্বারকা চৌধুরী পর্যন্ত আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে কম্পিত স্বরে বলিয়াছিল—ভগবান এর বিচার করবেন।

দেবু হাসিয়া বলিয়াছে—আপনি সেদিন যে গল্পটা বললেন—সেটা ভুলে গেলেন চৌধুরীমশাই মানুষের ভুল-চুক পদে পদে, আর একটা কথা চৌধুরীমশায়, এরা আমার পক্ষে সাক্ষী না দিক, বিপক্ষেও তো দেয় নাই!

অনিরুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—দিলে মাথায় বজ্রাঘাত হত না ?

জেলের কথাটা তাহারা চাপিয়া গেল; দেবুর স্ত্রীর কথা বিবেচনা করিয়াই প্রকাশ করিল না।

দুর্গা আসিয়া বিলুকে সংবাদ দিয়া বলিল—তোমার কাছে আমার মা শোবে, বিলু দিদি।

বিলু বলিল—তুই থাক্ না দুগগা; বেশ দুজনে গল্প করব। আমি ঘরে শোব, তুই বারান্দার দোরটিতে শুবি।

দুর্গা বলিল—না, বিলু-দিদি!

—কেন দুর্গা ?

—আমার ভাই, নিজের বিছেনা নইলে ঘুম হয় না!

বিলু আর অনুরোধ করিল না। ব্যাপারটা সে বঝিল; একটু কেবল হাসিল, কিন্তু রাগ করিল না। মরিলেও নাকি মানুষের স্বভাব যায় না।

সমস্ত দিনটা কাটিল, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে সময় আর কাটিতে চায় না। বিলু চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। 'সে' জেলে। সন্ধ্যায় গোটা গ্রামটায় শাঁখ বাজিয়া উঠিতে তাহার চমক ভাঙিল—ঘরে মা-লক্ষ্মী রহিয়াছেন, ধূপ-দীপ দিতে হইবে। মায়ের শীতল-ভোগের আয়োজন এখনও করা হয় নাই। দুর্গা যাইবার সময় বাড়ীর রাখালটাকে ডাকিয়া গিয়াছিল, ছোঁড়াটা প্রচুর পরিমাণে পিঠা খাইয়া কাপড় মুড়ি দিয়া একপাশে অঘোরে ঘুমাইতেছিল। বেচারীর পেটটা ফুলিয়া বুকের চেয়েও উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—হাঁসফাস করিতেছে। ছোঁড়াটাও আশপাশের বাড়ীর শাঁখের শব্দে উঠিয়া বসিল, বলিল—সাঁজ লেগে গেইচে—লাগছে মনিব্যান, সাঁজ জ্বাল গো, শাঁখ বাজাও, ধূপ-পিদিম দাও।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিলু উঠিল। ছোঁড়াটা বসিয়া বসিয়া আপন মনেই কথা বলিতেছিল—সবই মনিবের অর্থাৎ দেবুর কথা।

—মনিব এতক্ষণ বসে বসে আমাদের কথাই ভাবছে, লয় মনিব্যান?

বিলু চোখ মুছিল।

—আচ্ছা, মনিব্যান্! জেহেলে কি লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়? মনিব তা হলে কি ক'রে শোবে?

আর্তস্বরে বিলু বলিল—ওরে তুই আর বকিস্ না, থাম্।

ছোঁড়াটা অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

সন্ধ্যা-প্রদীপ, ধূপ, শীতল-ভোগ সাজাইয়া বিলু বলিল—আমার সঙ্গে আয় বাবা খামারে গোয়ালে যাব—বলিতে বলিতেই মনে পড়িল—ঘুমন্ত শিশুর কথা; তাহার কাছে কে থাকিবে? অন্যদিন এই সময়টিতে থাকিত 'সে'। বিলু একাই খামারে গোয়ালে, মরাইয়ের তলে জল দিয়া সন্ধ্যা দেখাইয়া আসিত। আজ সে নাই বলিয়া অকারণে তাহার ভয় করিতেছে, তাহার আকস্মিক সকরুণ অসহায় অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ছোঁড়াটা উঠিয়া বলিল—চল।

—কিন্তু খোকার কাছে থাকবে কে?

—আমি থাকছি। বলিয়া সে শুইয়া পড়িয়া বলিল—এত ভয় কিসের গো, মনিব্যান্? যাও ক্যানে 'কিবৃষেণরা' রইছে সব খামারে।

—কিষাণরা রয়েছে?

—নাই? আমি যে হেথা রইছি, তারাই তো গরু ঢোকালে গোয়ালে। রেতে

একজন থাকবে বাড়ীতে শুয়ে। পালা করে রোজ একজনা করে থাকবে। মনিব নাই, থাকবে না? আমিও থাকব মনিব্যান্, একটি করে কাহিনী কিন্তুক বলতে হবে।

বিলু সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিয়া আসিল—সঙ্গে সঙ্গে কৃষাণ দুইজন।

লক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে ধূপ-দীপ, শীতল-ভোগ রাখিয়া প্রণাম করিয়া বিলু কামনা করিল—ওঁকে মানে-মানে খালাস করে দাও, মা। ওঁর মঙ্গল কর। ঘরে আমার অচলা হয়ে বাস কর।

ছোঁড়াটা বলিল—মনিব্যান্, সেই ক্ষীরের পিঠে আর আছে নাকি?

বিলু মৃদু হাসিয়া বলিল—আছে।

—তবে তাই গণ্ডা দুয়েক দাও, আর কিছু খাব না রেতে।

—হ্যাঁ বাবা, তোমরা? বিলু প্রশ্ন করিল কৃষাণ দুইজনাকে।

—দেন অল্প করে চারডি।

দুপুরবেলায় এক-একজন ভীমের আহার করিয়াছে। ইহাদের খাওয়াইতে বিলুর এত ভাল লাগে। দেবু নিজে ইহাদের খাওয়াইত। বিলু যোগাইয়া দিত; পরিবেশন করিত সে নিজে।

আবার 'আঁউরি-বাঁউরি' দিয়া সব বাঁধিতে হইবে। মুঠ-লক্ষ্মীর ধানের খড়ের দড়িতে সমস্ত সামগ্রীতে বন্ধন দিতে হইবে।—আজিকার ধন থাক, কালিকার ধন আসুক, পুরানে-নূতনে সঞ্চয় বাড়ুক। লক্ষ্মীর প্রসাদে পুরাতন অন্নে নূতন বস্ত্রে জীবন কাটিয়া যাক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। অচলা হইয়া থাক মা, অচলা হইয়া থাক।

শেষ রাত্রে আর এক পর্ব। পৌষ-আগলানো পর্ব—এই পৌষসংক্রান্তির রাত্রির শেষ প্রহরে। পৌষ মাস যখন বিদায় লইয়া অন্ধকারের আবরণে পশ্চিম দিগন্তের মুখে পা বাড়ায়, পূর্ব দিগন্তে আলোক-আভাসের পশ্চাতে মকর রাশিস্থ সূর্যের রথের সঙ্গে উদয় হয় মাঘের প্রথম দিন—তখন কৃষক-বণিতারা পৌষকে বন্দনা করিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ করে—পৌষ, তুমি যাইও না। চিরদিন তুমি থাক।

চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় পৌষ-আগলানো হইয়া থাকে।

ভোর রাত্রে ঘরে-ঘরে লোক জাগিয়া উঠিয়াছে, গ্রামময় মানুষের সাড়া। শাঁখও বাজিতেছে।

বিলুও উঠিল। ছেলেটিও জাগিয়াছিল—তাহাকে কাপড় জড়াইয়া রাখাল-ছেলেটার কোলে দিয়া বিলু পূজার আয়োজন করিতে বসিল।

—ও ভাই, পণ্ডিত-বউ! সব হল তোমার? এস!

ডাকিতেছিল পদ্ম।

বিলু দুয়ার খুলিয়া দিল—এই হয়েছে। ধূপের আগুন হলেই হয়, চল যাই।

উনানের কাঠ জ্বলিতেছিল; পদ্ম দাঁড়াইয়া রহিল, ধূপদানীতে আগুন তুলিয়া লইয়া বিলু বলিল—চল।

রাখাল-ছেলেটা লইল হ্যারিকেন। বাড়ীতে কৃষাণেরা রহিল। দুর্গার মা শুইয়াই রহিল—সে উঠে নাই। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই রাখালটা চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল—কে?

—কে রে? পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল।

ছোঁড়াটা আলো তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দুগ্‌গা দিদি বটে!

লণ্ঠনের আলোটা দুর্গার উপর পড়িল পরিপূর্ণভাবে, পরনে পাটভাঙা খয়ের-রঙের তাঁতের শাড়ী, চুলের পারিপাট্যও চমৎকার, কপালে টিপ; কিন্তু সমস্তই বিশৃঙ্খল—বিপর্যস্ত। সে যেন হাঁপাইতেছিল—চোখের দৃষ্টি যেন উদ্‌ভ্রান্ত।

আলোর দিকে পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। এতটুকু লজ্জা করিল না, সে বলিল—মিছে কথা বিলু-দিদি, মিছে কথা। পণ্ডিত-জামাইয়ের পনেরো মাসের মেয়াদ হয়ে গিয়েছে! বলিতে বলিতে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিলু হতবাক হইয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দুর্গা গিয়াছিল নৈশ অভিসারে। কঙ্কণায় সেটেল্‌মেণ্ট ক্যাম্পে। আমিন, পিওন, এমন কি কানুন্‌গোদের মধ্যেও দুই একজন, স্থানীয় দুর্গা-শ্রেণীর নারী-দের উপর গোপনে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। পেশ্‌কারটি আবার এ বিষয়ে সকলের সেরা, দুর্গার কাছে কয়েকদিনই সে অনুগ্রহের আহ্বান পাঠাইয়াছিল, কিন্তু দুর্গা যায় নাই। আজ সে গিয়াছিল নিজে। বলিয়াছিল—পণ্ডিতকে কিন্তু হাকিমকে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে!

পেশ্‌কার বলিয়াছিল—আচ্ছা; কাল সকালে।

ভোরবেলায় আসিবার সময় দুর্গার ভুল ভাঙিয়া দিয়াছে—তাহার অনুগ্রহ-প্রার্থী পেশ্‌কারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ একজন পিওন।

দুর্গা আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল—আপনার সগোত্রাদের মধ্যে একটি বাহ্যশ্রীময়ী অথচ ব্যাধিযুক্তা সখি।

ওদিকে তখন চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের সমস্বরে ধ্বনি উঠিতেছিল—পৌষ-বন্দনা, পৌষ-বন্দনের।

পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ
এস পৌষ যেয়ো না—জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে,
স্বামী-পুত্র ভাত খাবে কটোরা ভরিয়ে।
পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ,
বড় ঘরের মেঝেয় বোস,
বড় ঘরের মেঝে ভরে—বাহান্ন পৌটি বসে !
সোনার পৌষ।···

পদ্ম তাহার কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল—এস ভাই !

বিলু স্বপ্নোত্থিতের মত বলিল—চল।

কি করিবে ? উপায় কি ? যাইবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে—খোকার ভার তোমার উপর রহিল, আরও রহিল ঘর-দুয়ার-মরাই-গরু-বাছুর-ধান-জমি—সবের ভার। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি চঞ্চল হইলে চলিবে না। সর্ব-অবস্থায় অচলা হইয়া থাকিতে হইবে তোমাকে !

তাই থাকিবে সে, তাই থাকিবে। তাহার ঘরের সোনার পৌষ চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে পূজা করিয়া বাঁধিতে হইবে। 'না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে !'—পনেরো মাস পরে তো সে ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহাকে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া কটোরা ভরিয়া অন্ন সাজাইয়া দিতে হইবে !

আঠারো

দেখিতে দেখিতে এক বৎসরেরও বেশী সময় চলিয়া গেল। এক পৌষ-সংক্রান্তি হইতে আর এক পৌষ-সংক্রান্তিতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া মাঘ-ফাল্গুন আরও দুইটি মাস কাটিয়া গেল। সেদিন চৈত্রের পাঁচ তারিখ। দেবু ঘোষ জংশন স্টেশনে নামিল। চৈত্র মাসের শীর্ণ-ময়ূরাক্ষী পার হইয়া শিবকালীপুরের ঘাটে উঠিয়া সে একবার দাঁড়াইল। দীর্ঘ এক বৎসর তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ শেষ করিয়া সে আজ বাড়ী ফিরিতেছে। পনেরো মাসের মধ্যে কয়েকদিন সে মকুব পাইয়াছে। এতক্ষণে আপনার গ্রামখানির সীমানায় পদার্পণ করিয়া যেন পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ সে অনুভব করিল।

ওই তাহার গ্রাম শিবকালীপুর, তাহার পরই মহাগ্রাম। পশ্চিমে সেখপাড়া কুসুমপুর, তাহার পশ্চিমে ওই দালান-কোঠায় ভরা কঙ্কণা, একেবারে পূর্বে ওই দেখুড়িয়া। আর দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন। সেখপাড়া কুসুমপুরের মসজিদের উঁচু সাদা থামগুলি সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে।

শিবকালীপুরের পূর্বে—ওই মহাগ্রামে—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ী। মহাগ্রামের পূর্বে ওই দেখুড়িয়া। দেখুড়িয়ার খানিকটা পূর্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ফিরিয়াছে। ওই বাঁকের উপর ঘন সবুজ ছপালার মধ্যে বন্যায় নিশ্চিহ্ন ঘোষপাড়া মহিষডহর।

ঘাট হইতে সে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর উঠিল। চৈত্র মাসের বেলা দশটা পার হইয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে বেশ 'খরা' উঠিয়াছে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এখন প্রায় রিক্ত। গম, কলাই, যব, সরিষা, রবিফসল প্রায়ই ঘরে উঠিয়াছে। মাঠে এখন কেবল কিছু তিল, কিছু আলু এবং কিছু কিছু রবি ফসলও রহিয়াছে। তিলই এ সময়ের মোটা ফসল, গাঢ় সবুজ সতেজ গাছগুলি পরিপূর্ণরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার ফুল ধরিবে। চৈত্র লক্ষ্মীর কথা দেবুর মনে পড়িল—এই তিলফুল তুলিয়া কর্ণাভরণ করিয়া পরিয়াছিলেন মা-লক্ষ্মী, তাই চাষী ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। তিলফুলের ঋণ শোধ দিতে। বেগুনি রঙের তিলফুলগুলির অপূর্ব গঠন। মতে পড়িল 'তিলফুল জিনি নাসা'।

আজ এক বৎসরেরও অধিক কাল সে জেলখানায় ছিল—সেখানে ভাগ্যক্রমে জনকয়েক রাজবন্দীর সাহচর্য সে কিছুদিনের জন্য লাভ করিয়াছিল। ঐ লাভের সম্পদ-কল্যাণেই তাহার বন্দীজীবন পরম সুখে না হোক প্রচুর আনন্দের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। দেহ তাহার ক্ষীণ হইয়াছে, ওজনে সে প্রায় সাত সের কমিয়া গিয়াছে কিন্তু মন ভাঙে নাই। মুক্তি পাইয়া আপনার গ্রামের সম্মুখে আসিয়াও সাধারণ মানুষের মত অধীর আনন্দে ছুটিয়া বা দ্রুতপদে চলিতেছিল না। সে একবার দাঁড়াইল। চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। শিবকালীপুর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আম, কাঁঠাল, জাম, তেঁতুল গাছগুলির উঁচু মাথা নীল আকাশ-পটে আঁকা ছবির মত মনে হইতেছে। দুলিতেছে কেবল বাঁশের ডগাগুলি। ওই মৃদু দোল-খাওয়া বাঁশগুলির পিছনে তাদের ঘর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কতক-গুলি ঘর দেখা যাইতেছে।

এদিকে বাউড়ী-পাড়া বায়েন-পাড়া; ওই বড়গাছটি ধর্মরাজতলার বকুল-গাছ। ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলির মধ্যে ওই বড় ঘরখানা দুর্গার কোঠা-ঘর। দুর্গা! আহা, দুর্গা বড় ভাল মেয়ে। পূর্বে সে মেয়েটাকে ঘৃণা করিত, মেয়েটার গায়েপড়া ভাব দেখিয়া বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিত। অনেকবার রূঢ় কথাও বলিয়াছে সে দুর্গাকে। কিন্তু তাহার অসময়ে, বিপদের দিনে দুর্গা দেখা দিল এক নূতন রূপে। জেলে আসিবার দিন সে তাহার আভাস মাত্র পাইয়াছিল। তারপর বিলুর পত্রে জানিয়াছে অনেক কথা। অহরহ—উদয়াস্ত দুর্গা বিলুর কাছে থাকে, দাসীর মত সেবা করে, সাধ্যমত সে বিলুকে কাজ করিতে দেয়

না, ছেলেটাকে বুকে করিয়া রাখে। স্বৈরিণী বিলাসিনীর মধ্যে এ রূপ কোথায় ছিল—কেমন করিয়া লুকাইয়া ছিল?

ওই যে বড় ঘরের মাথাটা দেখা যাইতেছে—ওটা হরিশ-খুড়ার ঘর; তার-পরেই ভবেশ-দাদার বাড়ী, সেটা দেখা যায় না! ওই যে ওধারের টিনের ঘরের মাথা রৌদ্রে ঝকমক করিতেছে—ওটা শ্রীহরির ঘর। শ্রীহরির ঘরের পরেই সর্বস্বান্ত তারিণীর ভাঙা ঘর। তারপর পথের একপাশে গ্রামের মধ্যস্থলে চণ্ডীমণ্ডপ। তারপর হরেন ঘোষালের বাড়ী। ঠিক বাড়ী নয়, হরেন ঘোষাল বলে—'ঘোষাল হাউস'। ঘোষাল বিচিত্রচরিত্র! তাহার বাহিরের ঘরের দরজায় লেখা আছে 'পার্লার', একটা ঘরে লেখা আছে 'স্টাডি'। দেবু ঘোষালের সেই গাঁদা মালার কথা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। ঘোষালের সম্পূর্ণ পরিচয় সে জানে। ম্যাট্রিক পাস করিলেও মূর্খ ছাড়া সে কিছু নয়; ভীরু, কাপুরুষ সে; ব্রাহ্মণ হইয়াও সে পাতু বায়েনের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত। কিন্তু সেদিন ঘোষালকে তাহার মনে হইয়াছিল যেন সত্যকালের ব্রাহ্মণ। তাহার মালাকে সে পবিত্র আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, ওই আশীর্বাদই তাহাকে সেই যাবার মুহূর্তে অদ্ভুত বল দিয়াছিল। জেলের মধ্যেও বোধ হয় ওই আশীর্বাদের বলেই রাজবন্দী বন্ধুদিগকে পাইয়াছিল।

বন্ধু কে নয়? বিলুর পত্রে সে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাদের গ্রামের মানুষ-গুলির প্রতিটি জনই যেন দেবতা। তাহার মনে পড়িল একটি প্রবাদ—গাঁয়ে মায়ে সমান কথা। হ্যাঁ—মা! এই পল্লীই তাহার মা! সে নত হইয়া পথের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া নজরে পড়িল—পলাশ গাছে ফুল ধরিয়াছে, লাল টকটকে ফুল। একটি বাড়ীর চালের মাথায় অজস্র সজিনার ডাঁটা ঝুলিয়া আছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে দীঘির পাড়ের রিক্তপত্র শিমূল গাছটিতেও লাল রঙের সমারোহ। তাহারই পাশে একটা উঁচু তালগাছের মাথায় বসিয়া আছে একটা শকুন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—জগন ডাক্তারের খিড়কির বাঁশঝাড়ের একটা নুইয়া-পড়া বাঁশের উপর সারবন্দী একদল হরিয়াল বসিয়া আছে; সবুজ ও হলুদের সংমিশ্রণে পাখীগুলির রংও যেমন অপূর্ব, ডাকও তেমনি মধুর;—জলতরঙ্গ বাজনার ধ্বনির মত। বাতাসে এইবার গ্রামের নাবি আমগাছগুলির মুকুলরে গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। চৈত্র মাসে সকল আমগাছেই আম ধরিয়া গিয়াছে; শুধু চৌধুরীদের পুরানো খাস আম-বাগানের গাছে চৈত্র মাসে মুকুল ধরে; এ গন্ধ চৌধুরী-বাগানের মুকুলের গন্ধ।

—পণ্ডিত মশায়!

কিশোর কণ্ঠের সবিস্ময় আনন্দ-ধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেবু দেখিল—অদূরবর্তী পাশের আলপথ ধরিয়া আসিতেছে কালীপুরের সুধীর, দ্বারকা চৌধুরীর নাতি; বড়ছেলের ছেলে। পাঠশালায় তাহার ছাত্র ছিল।

দেবু হাসিয়া সস্নেহে বলিল—সুধীর? ভাল আছিস?

সুধীর ছুটিয়া কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।—আপনি ভাল ছিলেন স্যার? এই আসছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। এই। তুমি স্কুলে যাচ্ছ বুঝি কঙ্কণায়?

—হ্যাঁ। আপনার বাড়ীর সকলে ভাল আছে, পণ্ডিতমশায়। খোকা খুব কথা বলে এখন। আমরা যাই কিনা প্রায়ই বিকেলে, খোকাকে নিয়ে খেলা করি।

দেবু গভীর আনন্দে যেন অভিভূত হইয়া গেল। ছেলেরা তাহাকে এত ভালবাসে?

—পাঠশালায় নূতন বাড়ী হয়েছে স্যার।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ বেশ ঘর, তিনখানা কুঠরী। নতুন পালিশ-করা চেয়ার-টেবিল হয়েছে স্যার। ইহার পর সে ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল—আর তো আপনি স্কুলে পড়াবেন না স্যার?

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—না সুধীর, আমি আর পড়াব না। নতুন মাস্টার এখন কে হয়েছেন?

—কঙ্কণার বাবুদের নায়েবের ছেলে। ম্যাট্রিক পাস, গুরু-ট্রেনিংও পাস করেছেন। কিন্তু আপনি কেন—?

সুধীরের কথা শেষ হবার পূর্বেই ওদিক হইতে আগন্তুক একজন খুব অল্পবয়সী ভদ্রলোক সুধীরকে ডাকিয়া বলিল—খোকা বুঝি ইস্কুলে যাচ্ছ? দেখি, তোমার খাতা আর পেন্সিলটা একবার দেখি।

সুধীর খাতা-পেন্সিল বাহির করিয়া দিল। এ ছেলেটি—হ্যাঁ—ভদ্রলোক অপেক্ষা ইহাকে ছেলে বলিলেই বেশী মানায়। কে এ ছেলেটি। বয়স বোধ হয় আঠার-উনিশ বৎসর। চোখে চশমা—গায়ে একটা ফর্সা পাঞ্জাবি; এখানকার লোক নিশ্চয়ই নয়। সুন্দর ধারাল চেহারা। সুধীর অবশ্য ভদ্রলোকটিকে চেনে। কিন্তু ভদ্রলোকের সামনে দেবু তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্য প্রসঙ্গই উত্থাপন করিল—চৌধুরীমশায়—তোমার ঠাকুরদা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। তিনি কত আপনার নাম করেন!

দেবু হাসিল। চৌধুরীকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করে; চমৎকার মানুষ।

তিনি তাহার নাম করেন ? দেবুর আনন্দ হইল। সে আবার প্রশ্ন করিল— বাড়ীর আর সকলে ?

—সবাই ভাল আছেন। কেবল আমার একটি ছোট বোন মারা গিয়েছে।

—মারা গিয়েছে ?

—হ্যাঁ। বেশী বড় নয়, এই এক মাসের হয়ে মারা গিয়েছে।

ভদ্রলোকটি এইবার খাতা ও পেন্সিল সুধীরকে ফেরত দিল, হাসিয়া বলিল —বল তো সংখ্যা কত ?

সুধীর সংখ্যাটার দিকে চাহিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। দেবুও দেখিল— বিরাট একটা সংখ্যা। কয়েক লক্ষ বা হাজার কোটি।

ভদ্রলোকই হাসিয়া সুধীরকে বলিল—পারলে না ? বাইশ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই কোটি, চৌষট্টি লক্ষ, উননব্বই হাজার।

সবিস্ময়ে সুধীর প্রশ্ন করিল—কি ?

—টাকা।

—টাকা!

—হ্যাঁ। ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকার খনি থেকে আর কলকারখানা থেকে এক বছরের উৎপন্ন জিনিসের দাম।

সুধীর হতবাক হইয়া গেল। বিমূঢ় হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবুও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, কে এই অদ্ভুত ছেলেটি !

ভদ্রলোকটি সুধীরের পিঠের উপর সস্নেহে কয়েক চাপড় মারিয়া বলিল— আচ্ছা যাও, স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তারপর দেবুর দিকে চাহিয়া বলিল— আপনি বুঝি এদের বাড়ী যাবেন ? চৌধুরীমশায়ের বাড়ী ?

দেবু আরও বিস্মিত হইয়া গেল—ভদ্রলোক চৌধুরীকেও চেনেন দেখিতেছি ! বলিল—না। আমি যাব শিবপুর।

—কার বাড়ী যাবেন বলুন তো ?

—আপনি কি সকলকে চেনেন ? দেবু ঘোষকে জানেন ?

বেশ সম্ভ্রমের সহিত যুবকটি বলিল—তাঁর বাড়ী চিনি, তাঁর ছোট খোকাটিকেও চিনি, কিন্তু তাঁকে এখনও দেখি নি। আমি আসবার আগেই তিনি জেলে গিয়েছেন। শীগ্‌গির তিনি আসবেন বেরিয়ে।

সুধীর বলিল—উনিই আমাদের পণ্ডিতমশায়।

—আপনি ! ছেলেটির চোখ দুটি আনন্দের উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; দুই হাত মেলিয়া সাগ্রহে দেবুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল—উঃ, আপনি দেবুবাবু ! আসুন আসুন—বাড়ী আসুন।

দেবু প্রশ্ন করিল—আপনি ? আপনার পরিচয় তো—

চোখ বড় করিয়া সম্ভ্রমের সহিত সুধীর বলিল—উনি এখানে নজরবন্দী হয়ে আছেন স্যার।

—এখানে রেখেছে আমাকে। অনিরুদ্ধ কর্মকার মশায়ের বাড়ীর বাইরের ঘরটায় থাকি। সুধীর. তুমি দৌড়ে যাও ; ওঁর বাড়ীতে খবর দাও, গ্রামে খবর দাও। ওয়ান-টু থ্রি। পু—ভস্-ভস্ ঝিক-ঝিক—! ধর মেল ট্রেন—তুফান মেলে চলেছ তুমি !

মুহূর্তে সুধীর তীরের মত ছুটিল।

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিল—বুঝতে পারছেন বোধ হয়, এখানে ডেটিনিউ হয়ে আছি আমি।

গ্রামে ঢুকিবার মুখেই ক্ষুদ্র একটি জনতার সঙ্গে দেখা হইল। জগন, হরেন, অনিরুদ্ধ, তারিণী, গণেশ আরও কয়েকজন। চণ্ডীমণ্ডপে ছিল অনেকেই—শ্রীহরি, ভবেশ প্রমুখ প্রবীণগণ। সকলেই তাহাকে সাদরে সস্নেহে আহ্বান করিল—'এস, এস বাবা এস, বস !' দেবু চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিল, সমস্ত গুরুজনদিগকে প্রণাম করিল ; শ্রীহরি পর্যন্ত আজ তাহাকে খাতির করিল। দেবু সম্বন্ধে খুড়া হইলেও শ্রীহরি বয়সে অনেক বড়। তাহার উপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হিসাবে শ্রীহরি প্রণামের খাতির বড় একটা কাহাকেও দেয় না। সেই শ্রীহরিও আজ তাহাকে প্রণাম করিল।

চণ্ডীমণ্ডপের খানিকটা দূরে ওই যে তাহার বাড়ী। দাওয়ার সম্মুখেই ওই যে শিউলি ফুলের গাছটি। ওই যে সব ভিড় করিয়া কাহারা দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল গ্রামের মেয়েরা। দুইটি কুমারী মেয়ের কাঁখে দুটি পূর্ণ ঘট। দেবু অভিভূত হইয়া গেল। তাহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য গ্রামবাসীর এ কি গভীর আগ্রহ—এ কি পরমাদরের আয়োজন ! সহসা শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া দেখিল, একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে শাঁখ বাজাইতেছে। দেবু তাহাকে চিনিল, সে পদ্ম।

বাড়ীতে ঢুকিতেই তাহার পায়ের কাছে খোকাকে নামাইয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল দুর্গা।

আবক্ষ ঘোমটা দুয়ারের বাজুতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল বিলু। খোকাকে কোলে লইয়া দেবু বিলুর দিকে চাহিল। বুড়ী রাঙাদিদি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ছোঁড়ার কোন আক্কেল নাই। পণ্ডিত না মুণ্ডু। আগে ই দিকে আয় ! বদরসিক কোথাকার !

—ছাড়, রাঙাদিদি, পেণাম করি।

—পেণাম করতে হবে না রে ছোঁড়া। বৃদ্ধা তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তারপর বিলুকে টানিয়া আনিয়া বলিল—এই লে।

তারপর সমবেত মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল—চল গো সব, এখন বাড়ী চল। চল চল! নইলে গাল দোব কিন্তু!

সকলে হাসিতে হাসিতেই চলিয়া গেল। বিলুর হাত ধরিয়া সস্নেহে সে ডাকিল—বিলু-রাণী!

বিলুর মুখে চোখে জলের দাগ, চোখ দুটি ভারী। চোখ মুছিয়া সে হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও পেণাম করি।

—মনিবমশায়! আকর্ণ-বিস্তার হাসি হাসিয়া সেই মুহূর্তে রাখাল-ছোঁড়াটা আসিয়া দাঁড়াইল। ছোঁড়াটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাঠে শোনলাম। এক দৌড়ে চলে আইচি।

সে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

—পণ্ডিতমশাই কই গো! এবারে আসিল সতীশ বাউড়ী, তাহার সঙ্গে তাহার পাড়ার লোকেরা সবাই।

আবার ডাক আসিল,—কোথা গো পণ্ডিতমশায়!

এ ডাক শুনিয়া দেবু ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর গলা।

দেবুর জীবনে এ দিনটি অভূতপূর্ব। এই দুঃখ-দারিদ্র্যে জীর্ণ নীচতায়-দীনতায় ভরা গ্রামখানির কোন্ অস্থিপঞ্জরের আবরণের অন্তরালে লুকানো ছিল এত মধুর, এত উদার স্নেহ-মমতা! বিলুকে সে বলিল—আসি বাইরে থেকে। চৌধুরীমশায় এসেছেন। সুখের মধ্যে মানুষকে চিনতে পারা যায় না, বিলু! দুঃখের দিনেই মানুষকে ঠিক বোঝা যায়। আগে মনে হত এমন স্বার্থপর নীচ গ্রাম আর নাই!

বিলু হাসিয়া বলিল—কতবড় লোক তুমি, ভালবাসবে না লোকে? জান, তুমি জেলে যাওয়ার পর জরিপের আমিন, কানুন্‌গো, হাকিম কেউ আর লোককে কড়া কথা বলে নাই, 'আপনি' ছাড়া কথা ছিল না। পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তোমার নাম করেছে। দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে।

* * *

এক বৎসরের মধ্যে অনেক-কিছু ঘটিয়া গিয়াছে; গ্রামের প্রতি জনে আসিয়া একে একে একবেলার মধ্যেই সব জানাইয়া দিল। জগন খবর দিল, সঙ্গে সঙ্গে হরেন ঘোষাল সায় দিল—কিছু কিছু সংশোধনও করিয়া দিল।

গ্রামে প্রজা সমিতি হইয়াছে, ঐ সঙ্গে একটি কংগ্রেস কমিটিও স্থাপিত হইয়াছে। জগন প্রেসিডেন্ট, হরেন সেক্রেটারী।

হরেন বলিল—কথা আছে তুমি এলেই—তুমি হবে একটার প্রেসিডেন্ট, যেটার খুশি। আমি বলি, তুমি হও কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। ডেটিনিউ যতীনবাবু বলেন—না, দেবুবাবু হবেন প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট।

—ছিরে পাল এখন গণ্যমান্য লোক। একটা গুড়গুড়ি কিনেছে, চণ্ডীমণ্ডপে শতরঞ্জি পেতে একটা তাকিয়া নিয়ে বসে। বেটা আবার গোমস্তা হয়েছে, গাঁয়ের গোমস্তাগিরি নিয়েছে। একে মহাজন, তার পর হল গোমস্তা, সর্বনাশ করে দিলে গাঁয়ের!

জমিদারের এখন অবস্থা খারাপ, শ্রীহরির টাকা আছে, আদায় হোক না হোক, সমস্ত টাকা শ্রীহরি দিবে—এই শর্তে জমিদার শ্রীহরিকে গোমস্তাগিরি দিয়াছে। শ্রীহরি এখন এক ঢিলে দুই পাখী মারিতেছে। বাকী খাজনার নালিশের সুযোগে লোকের জমি নীলামে তুলিয়া আপন প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতেছে সুদে-আসলে। সুদ-আসল আদায় হইয়াও আরও একটা মোটা লাভ থাকে।

গণেশ পালের জোত নীলাম হইয়া গিয়াছে, কিনিয়াছে শ্রীহরি; এখন গণেশের অবশিষ্ট শুধু কয়েক বিঘা কোর্ফা জমি।

সর্বস্বান্ত তারিণীর ভিটাটুকুও শ্রীহরি কিনিয়াছে; এখন সেটা উহার গোয়ালবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত। তারিণীর স্ত্রী-টা সেটেল্‌মেণ্টের একজন পিওনের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছে। তারিণী মজুর খাটে, ছেলেটা থাকে জংশনে, স্টেশনে ভিক্ষা করে।

পাতু মুচীর দেবোত্তর চাকরান জমি উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নালিশ-দরবার করিতে হয় নাই, সেটেল্‌মেণ্টেই সে জমি জমিদারের খাস খতিয়ানে উঠিয়া গিয়াছে। পাতু নিজেই স্বীকার করিয়াছিল, সে এখন আর বাজায় না, বাজাইতেও চায় না।

অনিরুদ্ধের জমি নীলামে চড়িয়াছে। অনিরুদ্ধ এখন মদ খাইয়া ভবঘুরের মত বেড়ায়—দুর্গার ঘরেও মধ্যে মধ্যে যায়। তাহার স্ত্রীও পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। এখন অনেকটা সুস্থ। দুর্গার যোগাযোগেই দারোগা ডেটিনিউ রাখিবার জন্য অনিরুদ্ধের ঘরখানা ভাড়া লইয়াছে। ওই ভাড়ার টাকা হইতেই এখন তাহাদের সংসার চলে।

দেবু বলিল—কামার-বউকে আজ দেখলাম শাঁখ বাজাচ্ছিল।

জগন বলিল—হ্যাঁ, এখন একটু ভাল আছে। একটু কেন, যতীনবাবু

আসার পর থেকেই বেশ একটু ভাল আছে। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল।

হরেন চাপা গলায় বলিল—মেনি মেন সে—বুঝলে কিনা—যতীনবাবু এ্যাণ্ড কামার-বউ—

দেবু বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে তিরস্কার করিয়া উঠিল—ছিঃ হরেন! কি যা তা বলছ!

—ইয়েস; আমিও তাই বলি, এ হতে পারে না। যতীনবাবু কামার-বউকে 'মা' বলে।

তারপর আবার সে বলিল—যতীনবাবু কিন্তু বড্ড চাপা লোক। বোমার ফরমূলা কিছুতেই আদায় করতে পারলাম না।

হরিশ এবং ভবেশ আসায় তাদের আলোচনা বন্ধ হইল, কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া গেল।

হরিশ বলিল—বাবা দেবু, সন্ধ্যেবেলায় একবার চণ্ডীমণ্ডপে যেয়ো। ওখানেই এখন আমরা আসি তো। শ্রীহরি বসে পাঁচজনকে নিয়ে। আলো, পান, তামাক সব ব্যবস্থাই আছে। শ্রীহরি এখন নতুন মানুষ। বুঝলে কিনা!

ভবেশ বলিল, হ্যাঁ, দুবেলা চায়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছে আমাদের শ্রীহরি, বুঝেছ কিনা?

দেবু তাদের নিকট হইতে আরো অনেক খবর শুনিল।

গ্রামের পাঁচজনকে লইয়া উঠিবার-বসিবার স্থবিধার জন্যই শ্রীহরি পৃথক পাঠশালা-ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। জমিদার তরফ হইতে জায়গার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে সে-ই। ইউনিয়ান বোর্ডের মেম্বার সে, সে-ই দেওয়ালের খরচ মঞ্জুর করাইয়াছে; নিজে দিয়াছে পঁচিশ টাকা। তা ছাড়া চালের কাঠ, খড়, দরজা-জানলার কাঠও দিয়াছে শ্রীহরি।

দুই বেলা এখন চণ্ডীমণ্ডপে মজলিস বসে দেখিয়া শ্রীহরির বিপক্ষ দলের লক্ষ্মী-ছাড়ারা হিংসায় পাট্-পাট্ হইয়া গেল। তাহারা নানা নিন্দা রটনা করে। কিন্তু তাহাতে শ্রীহরির কিছু আসে যায় না। তাহার গোমস্তাগিরির অসুবিধা করিবার জন্যই তাহারা প্রজা-সমিতি গড়িয়াছে, কংগ্রেস-কমিটি খাড়া করিয়াছে। দেবু যেন ও সবের মধ্যে না যায়।

তারা নাপিত আরও গূঢ় সংবাদ দিল। জমিদার এ গ্রামখানা পত্তনি বিলি করিবে কিনা ভাবিতেছে। শ্রীহরি গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে। পত্তনি কায়েম হইলে শ্রীহরি বাবা বুড়োশিবের অর্ধসমাপ্ত মন্দিরটা পাকা করিয়া দিবে,

চণ্ডীমণ্ডপের আটচালার উপর তুলিবে পাকা নাটমন্দির। শ্রীহরির বাড়ীতে এখন একজন রাঁধুনী, একজন ছেলে পালন করিবার লোক।

তারাচরণ পরিশেষে বলিল—ওই যে হরিহরের দুই কন্যে—যারা কলকাতায় ঝি-গিরি করিতে গিয়াছিল—তারাই। বুঝলেন তার মানে—রীতিমতো বড়-লোকের ব্যাপার, দুজনকেই এখন ছিরু রেখেছে। বুঝলেন, একেবারে আমীরী মেজাজ। হরিহরের ছোট মেয়েটা যখন এল—এ-ই রোগা, শন্‌ফুলের মত রঙ। ক্রমে শোনা গেল—কলকাতায়—বুঝলেন ?

অর্থাৎ মাতৃত্ব-সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিয়াছিল মেয়েটি। তাই গ্রাম্য-সমাজ তাহাদিগকে পতিত করিল। কিন্তু শ্রীহরি দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে ; তাহারই অনুরোধে সমাজ তাহাদের ত্রুটি মার্জনা করিয়াছে ; তারা বলিল—দু-দুটো মেয়ের ভাত-কাপড়, শখ-সামগ্রী তো সোজা কথা নয়, দেবু ভাই।

বৃদ্ধ চৌধুরী শুধু আপন সংসারের সংবাদ দিলেন, দেবুর জেলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইলেন। পরিশেষে আশীর্বাদ করিলেন—পণ্ডিত, তুমি দীর্ঘজীবী হও। দেখ যদি পার বাবা—তবে শ্রীহরির সঙ্গে ডাক্তারের, আর বিশেষ করে কর্ম-কারের মিটমাট করিয়ে দাও। অনিরুদ্ধ লোকটা নষ্ট হয়ে গেল। এরপর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কথাটার অর্থ ব্যাপক।

রামনারায়ণ আসিয়া বলিল—ভাল আছ দেবু ভাই ? আমার মা-টি মারা গিয়েছেন !

বৃন্দাবন দোকানী বলিল—চালের ব্যবসায় অনেক টাকা লোকসান দিলাম দেবু ভাই। যারা চালের ব্যবসা করেছিল তারা সবাই দিয়েছে। জংশনের রামলাল ভকত তো লালবাতি জেলে দিল।

বৃদ্ধ মুকুন্দ একটি খোকাকে কোলে করিয়া দেখাইতে আসিয়াছিল, আমাদের সুরেন্দ্রর ছেলে, দেখ বাবা দেবু।

মুকুন্দের পুত্র গোবিন্দ, গোবিন্দের পুত্র সুরেন্দ্র, সুতরাং সুরেন্দ্রের ছেলে তাহার প্রপৌত্র।

সন্ধ্যার মুখে নিজে আসিল শ্রীহরি। শ্রীহরি এখন সম্ভ্রান্ত লোক। লম্বা-চওড়া পেশী-সবল যে জোয়ান চাষী নগ্নদেহে কোদাল হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত, দুর্দান্ত বিক্রমে দৈহিক শক্তির আস্ফালন করিয়া ফিরিত, সামান্য কথায় শক্তি-প্রয়োগ করিত, জোর করিয়া পরের সীমানা খানিকটা আত্মসাৎ করিয়া লইত, কর্কশ উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করিত—সে-ই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, তাহার অপেক্ষা

বড় কেহ নাই, সেই ছিরু পালের সঙ্গে এই শ্রীহরির কোন সাদৃশ্য নাই। শ্রীহরি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ! তাহার পায়ে ভাল চটি, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর, গম্ভীর সংযত মূর্তি, সে এখন গ্রামের গোমস্তা—মহাজন। বলিতে গেলে সে এখন গ্রামের অধিপতি।

দেবু-খুড়ো রয়েছ না কি হে? হাসিমুখে শ্রীহরি আসিয়া দাঁড়াইল।

—এসো ভাইপো এস। দেবুও তাহাকে সম্ভ্রম করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। দেবু বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। অনিরুদ্ধের ওখানে যাইবার ইচ্ছা ছিল। ডেটিনিউ যতীনবাবু সেই তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধও সেই চলিয়া গিয়াছে। সে নাকি এখন মাতাল, দুর্গার ঘরে রাত্রি যাপন করে, তাহার অন্ন-গ্রহণেও অরুচি নাই তাহার, জমি-জমা নীলামে উঠিয়াছে।

অনি ভাইয়ের জন্য দুঃখ হয়। কি হইয়া গেল সে! তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, চৌধুরীই বলিয়াছেন—পণ্ডিত! মা-লক্ষ্মীর নাম শ্রী। শ্রী যার আছে—তারই শ্রী আছে; সে মনে বল, চেহারায় বল, প্রকৃতিতে বল। শ্রীহরির পরির্তন হবে বৈকি! আবার অভাবেই ওই দেখ, আনি ভাইয়ের এমন দশা। তার ওপর কামার-বউ—অসুখ করে আরও এমনটি হয়ে গেল।

শ্রীহরি তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তোমাকে ডাকতে এসেছি। চল খুড়ো, চণ্ডীমণ্ডপে চল। ওখানেই এখন বসছি। চা হয়ে গিয়েছে, চল।

দেবু 'না' বলিতে পারিল না। চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া শ্রীহরি বলিয়া গেল অনেক কথা।

এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিবার জন্যই গ্রামে স্কুল-ঘর করা হইয়াছে। স্কুল-ঘরের মেঝে-বারান্দা সব পাকা করিয়া দিবার ইচ্ছা আছে। একজন ডাক্তারের সঙ্গেও তাহার কথা হইয়াছে। তাহাকে আনিয়া সে গ্রামে বসাইতে চায়। শ্রীহরিই তাহাকে থাকিবার ঘর দিবে, খাইতেও দিবে। জগনকে দিয়া আর চলে না। উহার ওষুধ নাই, সব জল, সব ফাঁকি।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

সেটেল্‌মেণ্টের 'খানাপুরী' 'বুঝারত' দুইটা শেষ হইয়া গিয়াছে। আর কোন গণ্ডগোল হয় নাই। এই সমস্তই দেবুর জন্য, তাহা শ্রীহরি অস্বীকার করিল না। বলিল—বুঝলে খুড়ো, শেষটা আমিন, কানুন্‌গো—'আপনি' ছাড়া কথা বলত না। আমরা তোমার নাম করতাম। এইবার হবে তিনধারা, তারপর পাঁচধারা।

শ্রীহরি আরো জানাইল দেবুর জমা-জমি সমস্তই সে নির্ভুল করিয়া সেটেল-

মেণ্টে রেকর্ড করাইয়াছে। এমন কি, কঙ্কণার বাবুদের কর্মচারী যে জমির টুকরাটি আত্মসাৎ করিয়াছিল—সেটি পর্যন্ত উদ্ধার করিয়াছে।

—তাও উদ্ধার হইয়াছে? দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

—হবে না! জমিদারীর সেরেস্তার তালাম কাগজপত্র আমাদের হাতে, তার ওপর দাশজীর পাকা মাথা। আমি দাশজীকে বললাম—দেবু খুড়ো উপকার করলে দেশের লোকের, বাঘের দাঁত ভেঙে দিয়ে গেল; আর তার জমি কুকুরে খাবে তা হবে না। আমাদের এ উপকারটি না করলে চলবে না; আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া, শ্রীহরি আকাশের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে প্রণাম করিল—ভগবান যখন জন্ম দিয়েছেন, তখন উপকার ছাড়া অপকার কারুর করব না খুড়ো। এই দেখ না হরিহরের কন্যে দু'টিকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড! কলকাতায় তো খাতায় নাম লিখিয়েছিল। শেষে বিশ্রী কাণ্ড করে দেশে এল। গাঁয়ের লোক পতিত করলে। আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্ষান্ত করে আমার বাড়ীতেই রেখেছি। লোক বলে নানা কথা! তা আমি মিথ্যা বলব না খুড়ো, তুমি তো শুধু খুড়ো নও, বন্ধুলোক, একসঙ্গে পড়েছি। বাজারের-খাতাতেই যারা নাম লিখিয়েছিল, তাদের যদি আমি ঐ জন্যে ঘরের একপাশে রেখে থাকি তো কি এমন দোষ করেছি, বল?

গড়গড়ার নলটা দেবুর হাতে দিয়া শ্রীহরি বলিল—খাও খুড়ো।

—না। জেলখানায় গিয়ে বিড়ি তামাক ছেড়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছ।

শ্রীহরির কথা ফুরাইতেই চায় না; কাহার বিপদের সময় তাহার উপকারের জন্য কত টাকা সে ধার দিয়াছে, আর সে এখন দিবার নাম করিতেছে না—সেই ইতিহাস আরম্ভ করিল।

শ্রীহরিকে দোষ দেওয়া যায় না। টাকা থাকা পাপ নয়, বে-আইনী নয়। কাহারও বিপদে টাকা ধার দিলে, খাতক সে সময়ে উপকৃতই হয়। কিন্তু সুদে-আসলে আদায়ের সময় তাহার যে কদর্য রূপটা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা দেখিয়া খাতক আতঙ্কিত হয়, মহাজন ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্কুচিত হইলেও সর্বক্ষেত্রে হয় না কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে তাহা বলা শক্ত। সুদের জন্য মহাজনকে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স দিতে হয়, এ পাওনা আদায়ের জন্য আদালতে কোর্ট-ফি লাগে; ইউনিয়নকে দিতে হত চৌকিদারি ট্যাক্স। সুদ শ্রীহরি ছাড়ে কি করিয়া?

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল; শ্রীহরির দিকটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার

মনে পড়িয়া গেল—বাল্যকালের স্মৃতি। ঋণের দায়ে কঙ্কণার বাবুদের দ্বারা তাহাদের অস্থাবর-ক্রোকের কথা। সে শিহরিয়া উঠিল। থাতকের দিকটা দেবুর চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। জমি-জমা যায়, পুকুর-বাগান যায়, ক্ষেতখামার যায়, তাহার পর গরু-বাছুর যায়; তাহার পর থালা-কাঁসা যায়, তাহার পর যায় বাস্তভিটা। মানুষ পথের উপর গিয়া দাঁড়ায়। তিন বছর অন্তর অন্তর হ্যাণ্ডনোট পাল্টাইয়া একশো টাকা কয়েক বছরে অনায়াসে হাজার টাকায় গিয়া দাঁড়ায়, ইহাও আইনসম্মত। যখন আইনসম্মত তখন ইহাই ন্যায়। ইহাই যদি ন্যায় তবে সংসারে অন্যায়টা কি?

তাহার চিন্তাকে বিঘ্নিত করিয়া শ্রীহরি বলিল, এই দেখ, সেটেল্‌মেন্টের তিনধারা আসছে, পাঁচ ধারার কোর্ট আসছে! এদিকে প্রজা সমিতি করে ডাক্তার ধুয়ো তুলেছে—এ গাঁয়ের সব জমি মোকররী জমা। এ মৌজায় নাকি কখনও বৃদ্ধি হয় না। তোমাকে আমি কাগজে দেখাব; বারোশো সত্তর সালের কাগজ; তামাম জমায় বৃদ্ধি করা আছে; একটি জমাও মোকররী দাঁড়াবে না। জমিদার বৃদ্ধি দাবি করবে। হয়তো হাঙ্গামা বাধাবে ওরা। মামলা হবে। আইনে জমিদারের প্রাপ্য—সে পাবেই। আর যখন আইনসম্মত তখন আর তার অপরাধটা কোথায় বল? পঞ্চাশ বছরে ফসলের দাম অন্তত তিনগুণ বেড়েছে! জমিদার পাবে না?

দেবু এ কথারও কোন উত্তর দিতে পারিল না। ফসলের দাম সত্যই বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রজাদের আয় বাড়িয়াও বাড়ে নাই, বাজার দরে সব খাইয়া গেল। মানুষের অভাব বাড়িয়াছে, ইহার উপরে খাজনা বৃদ্ধি।

শ্রীহরি বলিল—শোন খুড়ো! দৈবের বিপাকে অনেক কষ্ট পেলে। আর বাবা, আর ওসব পথে যেন যেও না তুমি; খাও-দাও, কাজকর্ম কর, উপকার কর। তোমার উপরে লোকেও আশা করে—আমরাও করি। সেই কথাই আজ দারোগা বললেন, পণ্ডিতকে বারণ করে দিও, ঘোষ, ওসব যেন না করে। তা একটা বণ্ড লিখে দাও তুমি ওরা তোমাকে নিষ্কৃতি করে দেবে। স্কুলের চাকরি—ও তোমারই আছে, একটা বণ্ড লিখে দিলেই তুমি পাবে। আর—ওই নজরবন্দী ছোকরার সঙ্গে তুমি যেন মিশো-টিশো না বাপু, বুঝলে?

এবার দেবু হাসিয়া বলিল—বুঝলাম সব।

—তা হলে কালই চল আমার সঙ্গে।

—না, তা পারবো না, ছিরু। আমি তো অন্যায় কিছু করিনি।

—কাজ ভালো করছো না খুড়ো। আচ্ছা, দু'দিন ভেবে দেখ তুমি।

—আচ্ছা। হাসিয়া দেবু উঠিয়া চলিয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পথের

উপর নামিতে নামিতেই কাহারা জন ছ'য়েক তাহাকে হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

—কে, সতীশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার ?

—আজ্ঞে, আমাদের পাড়ায় একবার পদার্পন করতে হবে আপনাকে।

—কেন ? কি হল ? ও ঘেঁটু-গান ? আজ থাক সতীশ—অন্য একদিন হবে।

—আজ্ঞে, আপনাকে শোনাবার জন্যে আসর পেতেছি আমরা। তারপর ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল নজরবন্দী বাবুও আইচেন ; তিনি বসে রইচেন ; ডাক্তারবাবু রইচেন।

—নজরবন্দী বাবুটি আছেন ? আচ্ছা, চল তবে।

* * *

চৈত্র মাসে ঘণ্টাকর্ণের পূজা। ঘেঁটু পূজা,—পঞ্জিকার 'ঘণ্টাকর্ণ' নয়। পঞ্জিকার 'ঘণ্টাকর্ণ'—বসন্ত রোগ-নিবারক মহাবল ঘণ্টাকর্ণের পূজা। এই 'ঘণ্টাকর্ণ'—ঘেঁটু গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণু-বিরোধী শিবভক্ত ঘণ্টাকর্ণ ছিল পিশাচ। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রুদ্র দেবতার এবং বিষ্ণু দেবতার উভয়েরই প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। এই একাধারে ভক্ত ও পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার নিম্ন জাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুড়িয়া বেড়ায়। চাল-ডাল সিধা মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে।

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। ধর্মরাজের স্থানে বকুলগাছ-তলায় আসর পড়িয়াছে। বকুলের গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভুরভুর করিতেছে। আকাশে চাঁদ ছিল—শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর রাত্রি। একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে পুরুষদের আসর। দুই আসরের মাঝখানে বসিল—নজরবন্দী বাবুটি, পণ্ডিতমশায়, ডাক্তারবাবু ও হরেন ঘোষাল। চারিটি মোড়াও তাহারা যোগাড় করিয়াছে। বাসন্তী সন্ধ্যার জ্যোৎস্না—আকাশ হইতে মাটির বুক পর্যন্ত যেন এক স্বপ্নকুহেলিকাময় আলোর জাল বিছাইয়া দিয়াছিল।

দেবুর মনে পড়িয়া গেল—বাল্যকালে তাহারা ঘেঁটু-গান শুনিতে এখানে আসিত। এমনই জ্যোৎস্নার আলোতে আসর বসিত। যাইবার সময় আঁচল ভরিয়া কুড়াইয়া লইয়া যাইত বকুল ফুল। তখন সতীশেরা সদ্য জোয়ান, উহারাই গাহিত গান—আর তাহাদের বয়সীরা ধুয়া গাহিত, নাচিত। তখন কিন্তু ঘেঁটুর আসর ছিল জমজমাট। সে কত লোক ! সে তুলনায় এ আসর অনেক ছোট।

বিশেষ করিয়া পুরুষের দলই যেন অল্প। দেবু বলিল—সে আমলের মত কিন্তু আসর নাই তোমাদের, সতীশ।

সতীশ বলিল—পাড়ার সিকি মরদই এখনো আসে নাই, পণ্ডিতমশাই।

—কেন? কোথায় গিয়েছে?

—আজ্ঞে প্যাটের দায়ে। গাঁয়ে চাকরি মেলে না; গেরস্তরা ফেরার হয়ে গেল, মুনিষ-জন রাখতে পারে না। আমাদেরও ছেলে-পিলে বেড়েছে। এখন ভিন্‌গাঁয়ে চাকরি করতে হয়। চাকরি সেরে ফিরতে একপহর রাত হয়ে যায়। তা ঘেঁটু-গান করবে কখন—শুনবে কখন, বলেন?

জগন বলিল—পেটেই তোদের আগুন লেগেছে রে, পেট আর কিছুতেই ভরছে না!

সতীশ হাত-জোড় করিয়া বলিল—তা আজ্ঞে আপনি ঠিক বলেছেন ডাক্তার বাবু, প্যাটে আগুনই লেগেছে বটে। মেয়েরা পর্যন্ত 'রোজ' খাটতে যাচ্ছে। কি করব বলুন? পঞ্চায়েত করে বারণ করলাম। তা কে শুনছে? সব ছুটছে তো ছুটছে। আর অভাবও যা হয়েছে, বুঝলেন!

বাধা দিয়া যতীন বলিল—নাও, গান আরম্ভ কর।

গায়ক ও বাদকের দল অপেক্ষা করিয়াই ছিল, তাহারা আরম্ভ করিয়া দিল। ঢোলকের বাজনার সঙ্গে মন্দিরার ধ্বনি; গায়কের দল আরম্ভ করিল—

শিব-শিব-রাম-রাম।

ছোট ছেলের দল নাচিতে নাচিতে হাতে তালি দিয়া ধুয়া ধরিল—

শিব-শিব-রাম-রাম।

গায়কেরা গান গাহিল—

'এক ঘেঁটু তার সাত বেটা।
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত।
মহান্ত ভাই রে,
ফুল তুলতে যাই রে,
যত ফুল পাই রে,
আমার ঘেঁটুকে সাজাই রে!

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক লাইনের পর ছেলেরা তালি দিয়া গান গাহিয়া গেল—শিব-শিব-রাম-রাম।

এই গান শেষ হইবার পর আরম্ভ হইল অন্য গান। স্থানীয় বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহাদের গান আছে—

হায় এ জল কোথায় ছিল।
জলে জলে বাংলা মুলুক ভে-সে গেল।

বহুদিন আগে যখন রেলওয়ে-লাইন পড়িয়াছিল, সে গান আজও ইহারা গায়—

সাহেব রাস্তা বাঁধালে।
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে।

অজন্মার বৎসরের গান—

ঈশাণ কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা করলে শুকো।
এক ছিলম তামুক দাও গো সঙ্গে আছে হুঁকো ॥

আজ তাহারা আরম্ভ করিল—

দেশে আসিল জরীপ।
রাজা-পেজা ছেলে-বুড়োর বুক ঢিপ ঢিপ

ছেলেরা ধুয়া ধরিল—

হায় বাবা, কি করি উপায় ?
প্রাণ যায় তাকে পারি—মান রাখা দা-য় !

গায়কেরা গাহিয়া চলিল—

পিওন এল, আমিন এল, এল কানুন্‌গো,
বুড়োশিবের দরবারে মানত মানুন্ গো।
বুঝি আর মান থাকে না ॥

ছেলেরা গাহিল,

হায় বাবা, কি করি উপায় ?
হাকিম এল ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গেতে পেশকার,
আত্মারাম্ খাঁচা-ছাড়া হল দেশটার।
বুঝি আর মান থাকে না ॥
তাঁবু এল, চেয়ার এল, কাগজ গাড়ী গাড়ী,
নোয়ারই ছেকল এল চল্লিশ মণ ভারী।
ক্ষেতে বুঝি ধান থাকে না ॥
তে-ঠেঙে টেবিল পেতে লাগিয়ে দুরবীন,
এখানে ওখানে পোঁতে চিনেমাটির পিন।
কুলীদের প্রাণ থাকে না।
কুঁচবরণ রাঙা চোখ তারার মতন ঘোরে,

দস্তকড়মড়ি হাঁকে—এই উল্লুক ওরে।
হায় কলিতে মাটি ফাটে না॥
পণ্ডিতমশায় দেবু ঘোষ তেজিয়ান বিদ্বান্,
জানেন চেয়ে তার কাছে বেশী হল মান।
ও সে আর সইতে পারে না॥
কাহুন্‌গো কহিল 'তুই', সে করে 'তুকারি'
আমার কাছে খাটবে না তোর কোন জুরি-জারি
দেবু কারুর ধার ধারে না॥
দেবু ঘোষের পাকা ধানে শেকল চল্লিশ মণ,
টেনে নিয়ে চলে আমিন ঝন্-ঝন্-ঝন্।
ও সে কারুর মানা মানে না॥

দেবু হাসিল! বলিল—এ সব করেছ কি সতীশ?

যতীন মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। গায়কেরা তাহার পরের ঘটনাও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিল। শেষে গাহিল—

দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পুলিশ দারোগা,
বলে, কাহুন্‌গোর কাছে হাত জোড় করগা।
দেবু ঘোষ হেসে বলে 'না'॥
থাকিল পিছনে পড়ে সোনার বরণ নারী,
ননীর পুতলী শিশু ধূলায় গড়াগড়ি।
তবু ঘোষের মন টলে না॥

চোখ মুছিতে মুছিতে দুর্গা বলিল—তা তুমি পাষাণই বটে জামাই। মাগো, সে কি দিন! শুধু দুর্গা নয়, সমবেত মেয়েগুলি সকলেই আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল। সেদিনের কথা তাহাদের মনে আছে।

গায়কেরা গাহিল—

ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে,
অধম সতীশ লুটায় এসে তাঁরই চরণ-তলে
দেবতা নইলে হায় এ কাজ কেউ পারে না॥

গান শেষ হইল। সতীশ আসিয়া দেবু ঘোষকে প্রণাম করিল। দেবুর বুকেও একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না, সতীশকে সস্নেহে ধরিয়া তুলিল।

জগন বলিল—তোকে আমি একটা মেডেল দেব সতীশ!

হরেন বলিল—আচ্ছা সতীশ, মালাটা যে আমিই দিয়েছিলাম সে কথাটা বাদ গিয়েছে কেন? মালা আছে, গলা আছে, আমি নাই। বাঃ!

যতীন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত অনুষ্ঠানটাই তাহার কাছে অদ্ভুত ভাল লাগিয়াছে। সতীশকে মনে মনে নমস্কার করিল। বলিল—তোমাদের গানগুলো আমাদের লিখে দেবে সতীশ?

—আজ্ঞে। সতীশ অপ্রস্তুতের মত হাসিতে লাগিল।—আপনি নিকে নেবেন?

—হ্যাঁ।

—সত্যি বলছেন, বাবু!

—হ্যাঁ হে।

নিঃশব্দে আকর্ণবিস্তার হাসিতে সতীশের মুখ ভরিয়া গেল। সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

দেবু বলিল, আজ তো আপনার সঙ্গে আলাপ হল না, কাল—

যতীন বলিল—আলাপ তো হয়ে গেছে। আলোচনা বাকি আছে। কাল আমিই আপনার বাড়ী যাব।

উনিশ

এই একটি দিন। শুধু একটি দিনের জন্যই দেবু, কেবল দেবুই দেখিল—শিবকালীপুরের অদ্ভুত এক রূপ। শুধু রূপ নয়, তাহার স্পর্শ তাহার স্বাদ—সবই একটি দিনের জন্য দেবুর কাছে মধুময় হইয়া দেখা দিল। পরের দিন হইতে কিন্তু আবার সেই পুরানো শিবকালীপুর। সেই দীনতা-হীনতা, হিংসায় জর্জর মানুষ, দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগপ্রপীড়িত গ্রাম। কালও গ্রামখানির গাছ-পালা-পাতা-ফল-ফুলের মধ্যে যে অভিনব মাধুর্য দেবুর চোখে পড়িয়াছিল, নাবি আমের মুকুলের গন্ধে সে যে তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল, আজ তাহার কিছুই সে অনুভব করিল না।

আপনার দাওয়ায় বসিয়া সে ভাবিতেছিল অনেক কথা—এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ধারায়। প্রথমেই মনে হইল গ্রামখানার সর্বাঙ্গে যেন ধূলা লাগিয়াছে! পথ কয়টার এক-পা গভীর হইয়া ধূলা জমিয়াছে। ডোবার পুকুরের জল মরিয়া আসিয়াছে, অল্প জলে পানাগুলা পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামে জলের অভাব দেখা দিল। গরু বাছুর গাছপালা লইয়া জলের জন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আর কষ্টের সীমাপরিসীমা থাকিবে না। বাড়ীতে অনেকগুলি গাছ হইয়াছে, দৈনিক জলের প্রয়োজন হইবে।

আর গাছ লাগাইয়াই বা ফল কি? তাহার বাড়ীর যে কুমড়ার লতাটি প্রাচীর ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই গাছটার কয়টা কুমড়া ধরিয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনটা কুমড়া কাল রাত্রে কে ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার বাড়ীর রাখাল-ছোঁড়াটা গাছটা পুঁতিয়াছিল—সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া গালি দিতেছে অজ্ঞাতনামা চোরকে।

ছোঁড়া আবার মাহিনা-কাপড়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিলুরও কাপড় ছিঁড়িয়াছে। নিজেরও চাই। 'যেমন করে পর কাপড় চৈতে হবে কানি'—কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু কি করিবে? পোস্ট আপিসে সঞ্চয়ের টাকাগুলির আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

চিন্তাটা ছিন্ন হইয়া গেল। কোথায় যেন একঘেয়ে চীৎকার উঠিতেছে। কোথায় কাহারা উচ্চ কর্কশকণ্ঠে যেন গালিগালাজ করিতেছে, কাহাদেরও ঝগড়া বাধিয়াছে; সম্ভবতঃ একটা কণ্ঠস্বর রাঙাদিদি কার সঙ্গে লাগল বল তো?

বিলু হাসিয়া বলিল—লাগেনি কারু সঙ্গে। বুড়ী গাল দিচ্ছে নিজের বাপকে আর দেবতাকে। আজকাল রোজ সকালে উঠে দেয়। বুড়ো হয়েছে, একা কাজকর্ম করতে কষ্ট হয়, সকালে উঠে তাই রোজ ওই গাল দেবে। বাপকে গাল দেয়—বাঁশ-বুকো রাক্কোস, জমি-জেরাতগুলো সব নিজে পেটে পুরে দিয়েছে; আর দেবতাকে গাল দেয়—চোখ-খেগো, কানা হও তুমি।

দেবু হাসিল; তারপর বলিল—কিন্তু আরও একজন যে গাল দিচ্ছে। কাঁসার আওয়াজের মত অল্পবয়সী গলা!

—ও পদ্ম, কামার-বউ।

—অনিরুদ্ধের বউ?

—হ্যাঁ। বোধ হয় আমাদের ভাশুরপো—মানে শ্রীহরিকে গাল দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে অমন দেয়। আজও দিচ্ছে বোধ হয়। মাঝখানে তো পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। এখন একটুকু ভাল। ওদিকে কর্মকার তো একরকম কাজের বার হয়ে গেল। এক-একদিন মদ খেয়ে যা করে! একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে করে বেড়ায় আর চেঁচায়—খুন করেঙ্গা! যার-তার বাড়ীতে থায়।

—মানে দুর্গার বাড়ীতে তো?

—হ্যাঁ।

—ছি! ছি! ছি! দুর্গার ওই দোষটা গেল না। ওই এক দোষেই ওর সব গুণ নষ্ট হয়েছে।

বিলু বলিল—মদ খেয়ে মাতাল হয়ে 'খেতে দে' খেতে দে' করে হাঙ্গামা করলে দুর্গা আর কি করবে বল? অবিশ্যি কিছুদিন দুর্গার ঘরে রাত কাটাত

কর্মকার। কিন্তু আজকাল দুর্গা তো রাত্রে ঘরে ঢুকতে দেয় না। কামার তবু পড়ে থাকে ওদের উঠানে, কোনদিন বাগানে, কোনদিন রাস্তায়। কোনদিন অন্য কোথাও।

—হ্যাঁ, আজকাল অনিরুদ্ধের তো পয়সা-কড়ি নাই। দুর্গা আর—

না—না—না, তা বলো না। দুর্গা কোনদিনই পয়সা নেয় নাই কর্মকারের কাছে। ও-ই বরং দু-টাকা চার-টাকা করে দিয়েছে মধ্যে মধ্যে। আমার হাতে দিয়ে বলেছে—বিলু-দিদি, তুমি কামার-বউকে দিয়ো, আমি দিলে তো নেবে না।

—ছিঃ! তুমি ওই সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে গিয়েছিলে!

বিলু কিছুক্ষণ নতমুখে থাকিয়া বলিল—কি করব বল, কামার-বউ তখন ক্ষ্যাপার মত—হাঁড়ি চড়ে না। খেতে পায় না। পদ্মও না, কর্মকারও না। আমার হাতেও কিছুই ছিল না যে দোব। একদিন দুর্গা এসে অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললে। কি করব বল!

—হুঁ। দেবুর একটা কথা মনে পড়িল।—নজরবন্দীর জন্য অনিরুদ্ধের ঘর দুর্গাই তো দারোগাকে বলে ভাড়া করিয়ে দিয়েছে শুনলাম।

তা সে অনেক পরের কথা। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হ্যাঁ, নজরবন্দী ছেলেটি বড় ভাল বাপু! কামার-বউকে মা বলে। গাঁয়ের ছেলেরাও ওর কাছে ভিড় জমিয়ে বসে থাকে।

—বস তুমি। আমি আসি একবার যতীনবাবুর সঙ্গেই দেখা করে।

পথে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ডাকিল শ্রীহরি। সেখানেও চারপাশে একটি ছোট-খাটো ভিড় জমিয়া রহিয়াছে। দেবু অনুমানে বুঝিল, খাজনা আদায়ের পর্ব চলিতেছে। চৈত্র মাসের বারোই-তেরোই, ইংরেজী আটাশে মার্চ সরকার-দপ্তরে রাজস্ব দাখিলের শেষদিন। তা ছাড়া চৈত্র-কিস্তি, আখেরী।

দেবু বলিল—ওবেলা আসব ভাইপো।

শ্রীহরি বলিল—পাঁচ মিনিট। গ্রামের ব্যাপারটা দেখে যাও। যেন অরাজক হয়েছে।

দেবু উঠিয়া আসিল। দেখিল—বৈরাগীদের 'নেলো'—অর্থাৎ নলিন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ও-পাশে তাহার মা কাঁদিতেছে।

শ্রীহরি বলিল—ওই দেখ, ছোঁড়ার কাণ্ড দেখ। আঙুল দিয়া সে দেখাইয়া দিল চণ্ডীমণ্ডপের চুনকাম-করা একটি থাম। সেই চুনকাম-করা থামের সাদা জমির উপর কয়লা দিয়া আঁকা এক বিচিত্র ছবি। মা-কালীর এক মূর্তি।

দেবু নেলোকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ রে, তুই এঁকেছিস?

নেলো ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—চুনকাম-করা চণ্ডীমণ্ডপের ওপর কি করেছে একবার দেখ দেখি? পট এঁকেছেন!

ইহার পর নেলোকেই সে বলিল—চুনকামের খরচা দে, দিয়ে উঠে যা।

দেবু তখনও ছবিখানি দেখিতেছিল—বেশ আঁকিয়াছে নেলো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কার কাছে আঁকতে শিখলি তুই?

নেলো রুদ্ধস্বরে কোনমতে উত্তর দিলে—আপুনি-আপুনি, আজ্ঞে।

—নিজে নিজে শিখেছিস?

শ্রীহরি এই প্রশ্নের উত্তর দিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছোঁড়ার ওই কাজ হয়েছে, বুঝলে কি না! লোকের দেওয়ালে, সিমেণ্টের উঠানে, এমন কি বড় বড় গাছের গায়ে পর্যন্ত কয়লা দিয়ে ছবি আঁকবে। তারপর ওই নজরবন্দী ছোকরা ওর মাথা খেল! অনিরুদ্ধের বাইরের ঘরে ছোকরা থাকে, দেখো না একবার তার দেওয়ালটা—একেবারে চিত্রি-বিচিত্রে ভর্তি। এখন চণ্ডীমণ্ডপের ওপর লেগেছে। কাল দুপুর বেলায় কাজটি করেছে।

দেবু হাসিয়া বলিল—নেলো অন্যায় করেছে বটে, কিন্তু এঁকেছে ভাল, কালীমূর্তিটি খাসা হয়েছে।

—নমস্কার, ঘোষ মহাশয়; ও'দিকের সিঁড়ি দিয়া পথ হইতে উঠিয়া আসিল ডেটিনিউ যতীন। দেবুকে দেখিয়া সে বলিল—এই যে আপনিও রয়েছেন দেখছি। আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

—আমিও যাচ্ছিলাম আপনার কাছেই।

—দাঁড়ান, কাজটা সেরে নি। ঘোষ, ওই থামটায় কলি ফেরাতে কত খরচ হবে?

শ্রীহরি বলিল—খরচ সামান্য কিছু হবে বৈকি। কিন্তু কথা তো তা নয়, কথা হচ্ছে নেলোকে শাসন করা।

হাসিয়া যতীন বলিল—আমি দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা বললেন—চুন চার আনা, একটা রাজমিস্ত্রীর আধ রোজের মজুরি চার আনা, একটা মজুরের আধ রোজ দুআনা। মোট এই দশ আনা, কেমন?

—হ্যাঁ। তবে পাটও কিছু লাগবে পোঁচড়ার জন্যে।

—বেশ, সেও ধরুন দুআনা। এই বারো আনা। একটি টাকা বাহির করিয়া যতীন শ্রীহরির সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বাকীটা আমায় পাঠিয়ে দেবেন।

সে উঠিয়া পড়িল। দেবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। যতীন হাসিয়া বলিল—আমার ওখানেই আসুন, দেবুবাবু। নলিনের আঁকা অনেক ছবি আছে, দেখবেন। এস নলিন—এস।

—শ্রীহরি ডাকিল—খুড়ো, একটা কথা।

দেবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বল।

—একটু এধারে এস বাবা। সব কথা কি সবার সামনে বলা চলে ?

শ্রীহরি হাসিল। ষষ্ঠীতলার কাছে নির্জনে আসিয়া শ্রীহরি বলিল—গতবার চোত কিস্তি থেকেই তোমার খাজনা বাকী রয়েছে, খুড়ো। এবার সমবৎসর। কিস্তির আগেই একটা ব্যবস্থা করো বাবা।

দেবুর মুখ মুহূর্তে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। গতকালের কথা তাহার মনে পড়িল। বোধ হইল, শ্রীহরি তাহাকে শাসাইতেছে। সে সংযত স্বরে বলিল—আচ্ছা, দেবো। কিস্তির মধ্যেই দোব।

* * *

উনিশশো চব্বিশ খৃষ্টাব্দে বিশেষ ক্ষমতাবলে ইংরেজ সরকারের প্রণয়ন করা আইন—আটক-আইন। নানা গণ্ডীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বিশেষ থানার নিকটবর্তী পল্লীতে রাজনৈতিক অপরাধ-সন্দেহে বাঙালী তরুণদের আটক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাংলা সরকারের সেই আটক-আইনের বন্দী যতীন। যতীনের বয়স বেশী নয়, সতেরো-আটারো বৎসরের কিশোর, যৌবনে সবে পদার্পণ করিয়াছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, রুক্ষ বড় বড় চুল, ছিপছিপে লম্বা, সর্বাঙ্গে একটি কমনীয় লাবণ্য ; চোখ দুটি ঝক্‌ঝকে, চশমার আবরণের মধ্যে সে দুটিকে আরও আশ্চর্য দেখায়।

অনিরুদ্ধের বাহিরের ঘরের বারান্দায় একখানা তক্তাপোশ পাতিয়া সেইখানে যতীন আসর করিয়া বসে। গ্রামের ছেলের দল তো সেইখানেই পড়িয়া থাকে। বয়স্কেরাও সকলেই আসে—তারা নাপিত, গিরিশ ছুতার, গাঁজাখোর গদাই পাল, বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীও আসেন। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করিয়া বৃন্দাবন দত্তও আসে ; মজুর খাটিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে তারিণী পাল—সেও আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোন কোন দিন শ্রীহরিও পথে যাইতে আসিতে এক-আধবার বসে। বাউড়ী-পাড়া বায়েন-পাড়ার লোকেরাও আসে। গ্রাম্যবধূ ও ঝিউড়ি মেয়েগুলি দূর হইতে তাহাকে দেখে। বুড়ী রাঙাদিদি মধ্যে মধ্যে যতীনের সঙ্গে কথা বলে। কোনদিন নাড়ু, কোনদিন কলা, কোনদিন অন্য কিছু দিয়া সে যতীনকে দেখিয়া আপন মনেই পাঁচালীর একটি কলি আবৃত্তি করে—

> “অক্রুর পাষাণ হিয়া, সোনার গোপালে নিয়া
> শূন্য কৈল যশোদার কোল।”

যতীনও মধ্যে মধ্যে আপনার মনে গুন-গুন করিয়া আবৃত্তি করে—রবীন্দ্রনাথের কবিতা। দুইটা লাইন এই পল্লীর মধ্যে তাহার অন্তরীণ জীবনে অহরহ গুঞ্জন করিয়া ফেরে—

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে···
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়···

সমগ্র বাংলা দেশ যেন এই পল্লীটির ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে রূপায়িত হইয়া ধরা দিয়াছে তাহার কাছে। এখানে পদার্পণমাত্র গ্রামখানি এক মুহূর্তে তাহার আপন ঘরে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রতিটি মানুষ তাহার ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জন, পরমাত্মীয়া কেমন যে এমন হইল—এ সত্য তাহার কাছে এক পরমাশ্চর্য। শহরের ছেলে সে, কলিকাতায় তাহার বাড়ী। জীবনে পল্লীগ্রাম এমন করিয়া কখনও দেখে নাই। আটক-আইনে গ্রেপ্তার হইয়া প্রথমে কিছুদিন ছিল জেলে। তারপর কিছুদিন ছিল বিভিন্ন জেলার সদরে মহকুমা শহরে। এই মহকুমা শহরগুলি অদ্ভুত। সেখানে পল্লীর আভাস কিছু কিছু মাঠঘাট আছে, কৃষি এখনও সেখানকার জীবিকার একটা মুখ্য বা গৌণ অংশ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজও আছে। ঠিক সমাজ নয়—দল। সমাজ ভাঙিয়া শিক্ষা, সম্মান ও অর্থবলের পার্থক্য লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সেখানে পল্লীর আভাস তৈলচিত্রের রঙের প্রলেপ অবলুপ্ত কাপড়ের আভাসের মতই—অস্পষ্ট ইঙ্গিতে আছে। স্পষ্ট প্রভাব নাই—প্রকাশ নাই।

তাই একেবারে খাঁটি পল্লীগ্রামে অন্তরীণ হইবার আদেশে সে অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভে সে আশ্বস্ত হইয়াছে। সর্বত্র একটি পরমাশ্চর্য স্নেহস্পর্শ অনুভব করিয়াছে। অবশ্য এখানকার দীনতা, হীনতা, কদর্যতাও তাহার চোখ এড়ায় নাই। অশিক্ষা তো প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। কিন্তু তবু ভাল লাগিয়াছে। এখানে মানুষ অশিক্ষিত অথচ শিক্ষার প্রভাবশূন্য অমানুষ নয়। অশিক্ষার দৈন্যে ইহারা সঙ্কুচিত, কুশিক্ষা বা অশিক্ষার ব্যর্থতার দম্ভে দাম্ভিক নয়। শিক্ষা এখানকার লোকের না থাক, একটা প্রাচীন জীর্ণ সংস্কৃতি আজও আছে,—অবশ্য মুমূর্ষুর মতই কোনমতে টিকিয়া আছে। কিন্তু তাহারও একটা আন্তরিকতা আছে।

শহরকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ওইখানেই তো চলিয়াছে মানুষের জয়যাত্রা। কিন্তু সে—মফস্বলের ওই উকিল-মোক্তার-আমলাসর্বস্ব, কতকগুলা পান-বিড়ি-মণিহারী দোকানদার, ক্ষুদ্র চালের কলওয়ালা, তামাকের আড়ত-ওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাদের দলপ্রধান ছোট শহর নয়। সে শহরের ঊর্ধ্বলোকে

শত শত কলকারখানার চিমনি উদ্যত হইয়া আছে তপস্বীর ঊর্ধ্ববাহুর মত। অবিশ্রান্ত অপরিমেয় তাহাদের শক্তি। বন্দী দানবের মত যন্ত্রশক্তির মধ্য দিয়া সে শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। উৎপাদন করিতেছে বিপুল সম্পদ-সম্ভার। কিন্তু তবু মরণোন্মুখ পল্লীকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। বিগত যুগের মুমূর্ষু প্রাচীন, যাহার সঙ্গে নব যুগের পার্থক্য অনেক,—সেই মুমূর্ষু প্রাচীনের সকরুণ বিদায় সম্ভাষণ যেমন নবীনকে অভিভূত করে, তেমনি এই মরণোন্মুখ প্রাচীন সংস্কৃতির আপ্যায়নও তাহার কাছে বড় সকরুণ ও মধুর বলিয়া মনে হইতেছে।

অনিরুদ্ধের বারান্দায় পাতা তক্তাপোশের উপর যতীন দেবুকে বসাইল—বসুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি।

দেবু হাসিয়া বলিল—কাল তো বললেন আলাপ হয়ে গিয়েছে।

—তা সত্যি। এইবার আলোচনা হবে। দাঁড়ান, তার আগে একটু চা হোক। বলিয়া সে অনিরুদ্ধের বাড়ীর ভিতরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—মা-মণি!

মা-মণি তাহার পদ্ম। মা-মণিটি তাহার জীবনে বিষামৃতের সংমিশ্রণে গড়া এক অপূর্ব সম্পদ। তাহার বিষের জ্বালা—অমৃতের মাধুর্য এত তীব্র যে, তাহা সহ্য করিতে যতীন হাঁপাইয়া উঠে। তাহার সঙ্গে পদ্মের বয়সের পার্থক্যও বেশী নয়, বোধ হয় পাঁচ-সাত বৎসরের। তবু সে তার মা-মণি। এক এক সময়ে যতীনের মনে পড়ে তাহার ছেলেবেলার কথা। খেলাঘরে তাহার দিদি সাজিত মা, সে সাজিত ছেলে। প্রাপ্তবয়সে সেই খেলার যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সে যখন এখানে আসে তখন পদ্ম প্রায় অর্ধোন্মাদ। মধ্যে মধ্যে মূর্ছারোগে চেতনা হারাইয়া উঠানে, মূলামাটিতে অসংবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অনিরুদ্ধ তাহার পূর্ব হইতেই বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে, বাড়ীতে থাকিত না। যতীনকেই অধিকাংশ সময় চোখেমুখে জল দিতে হইত। তখন হইতেই যতীন ডাকে মা বলিয়া। মা ছাড়া আর কোন সম্বোধন সে খুঁজিয়া পায় নাই। সেই মা সম্বোধনের উত্তরেই পদ্ম একদিন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে ডাকিল ছেলে বলিয়া। সেই হইতেই এই খেলাঘর পাতা হইয়াছে। পদ্ম এখন অনেকটা সুস্থ, অহরহ ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত। অনিরুদ্ধের ভাবনা সে যেন ভাবেই না। ক্বচিৎ কখনও আসিলে তাহাকে যত্নও বিশেষ করে না।

বাড়ির ভিতর তখন কলরব চলিতেছে। একপাল ছেলে হুটোপাটি ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। পদ্ম একজনের চোখ গামছায় বাঁধিয়া বলিতেছিল—ভাত করে কি?

—টগ্‌-বগ্‌! ছেলেটি উত্তর দিল।

—মাছ করে কি ?

—ছ্যাক-ছ্যাক।

—হাটে বিকোয় কি ?

—আদা।

—তবে ধরে আন্ তোর রাঙা রাঙা দাদা।

কানামাছি খেলা চলিতেছে। যতীনের কাছে ছেলের দল আসে। যতীন না থাকিলে—তাহারা পদ্মকে লইয়া পড়ে। পদ্মও যতীনের অনুপস্থিতেতে ছেলেদের খেলার মধ্যে বুড়ী সাজিয়া বসে।

যতীন আবার ডাকিল—মা মণি !

পদ্ম উঠিয়া পড়িল,—কি ? চাঁদ-চাওয়া ছেলের আমার আবার কি হুকুম শুনি ?

—চায়ের জল গরম আর একবার।

—হবে না। মানুষ কতবার চা খায় ?

—দেবু ঘোষ মশায় এসেছেন। চা খাওয়াতে হবে না ?

—পণ্ডিত ?

—হ্যাঁ।

পদ্ম এক হাতে ঘোমটা টানিয়া দিল—চাপা গলায় বলিল—দি।

যতীন হাসিয়া বলিল—পণ্ডিত বাইরে। ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে ?

—ওই দেখ, তাই তো।

ঘোমটা সরাইয়া দিয়া পদ্ম অপ্রস্তুতের মত একটু হাসিল।

বাহিরে আসিয়া যতীন দেবুকে বলিল—আপনার নামে একটা ভি-পি আনতে দেব আমি।

দেবু একটু বিব্রত বোধ করিল।—বেনামীতে ভি-পি,—কিসের ভি-পি ?

—হ্যাঁ, খানকয়েক ছবির বই, একটা রঙ-তুলির বাক্স। আমাদের নলিনের জন্য। পুলিসের মারফৎ আনানোর অনেক হাঙ্গামা। নলিন ছবি আঁকতে শিখুক। ওর হাত ভাল।

—তা বেশ। কিন্তু তার চেয়ে, নলিন, তুই পটুয়াদের কাছে শেখো না কেন ? প্রতিমা গড়তে শেখো, রং করতে শেখো।

নলিন ছেলেটা অদ্ভুত লাজুক, দুই চারিটি অতি সংক্ষিপ্ত কথায় কথা শেষ করে সে। সে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—পটুয়ারা শেখায় না। বলে পয়সা লাগবে।

যতীন বলিল—পয়সা আমি দেব, তুমি শেখো।

—দু টাকা ফি-মাসে লাগবে।

দেবু বলিল—আচ্ছা, সে আমি বলে দেব দ্বিজপদ পটুয়াকে। পরশু যাব আমি মহাগ্রামে। আমার সঙ্গে যাবি।

নলিন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—বেশ।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পয়সা দেবেন বলেছিলেন!

যতীন একটি সিকি তাহার হাতে দিয়া বলিল—তা হলে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে যাবে তুমি, বুঝলে?

নলিন আবার ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া নীরবেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—এইবার আপনার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করব। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ উত্তর দিতে পারেনি। অন্ততঃ সন্তোষজনক মনে হয়নি আমার।

—কি বলুন?

—আপনাদের ওই চণ্ডীমণ্ডপটি। ওটি কার?

—সাধারণের।

—তবে যে বলে জমিদার মালিক?

—মালিক নয়। জমিদার দেবোত্তরের সেবাইত বলে তিনিই চণ্ডীমণ্ডপের রক্ষণাবেক্ষণ করেন

—রক্ষণাবেক্ষণও তো, আমি যতদূর শুনেছি, গ্রামের লোকেই করে।

—হ্যাঁ, তা করে। কিন্তু তবু ওই রকম হয়ে আসছে আর কি! ওটা জমিদারের সম্মান। তা ছাড়া শূদ্রের গ্রাম, জমিদার ব্রাহ্মণ, তিনিই সেবায়েত হয়ে আছেন। আর ধরুন, গ্রামের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়, দলাদলি হয়। এই কারণেই জমিদারকেই দেবোত্তরের মালিক স্বীকার করে আসা হয়েছে। কিন্তু অধিকার গ্রামের লোকেরই।

—তবে প্রজা সমিতির মিটিং করতে বাধা দিলে কেন জমিদার-পক্ষ?

—বাধা দিয়েছে?

—হ্যাঁ মিটিং করতে দেয়নি।

দেবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—বোধ হয় 'প্রজা সমিতি' জমিদারের বিরোধী বলে দেয় নাই। তা ছাড়া ওটা তো আর ধর্মকর্ম নয়।

—প্রজা সমিতি প্রজার মঙ্গলের জন্য। প্রজার মঙ্গল মানে জমিদারের সঙ্গে বিরোধ নয়। কোন কোন বিষয়ে বিরোধ আসে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নয়। আর চণ্ডীমণ্ডপ তো প্রজারাই করেছে, জমিদার করে দেয়নি। জায়গাটা শুধু জমিদারের। সে তো পথের জায়গাও জমিদারের। তা বলে প্রজা সমিতির

শোভাযাত্রা চলতে পাবে না সে পথে? আর ধর্মকর্ম ছাড়া যদি অধিকার না থাকে, তবে জমিদারের খাজনা আদায়ই বা হয় কি করে ওখানে? দারোগা-হাকিম এলেই বা মজলিশ হয় কেন?

দেবু আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহার মধ্যে ছেলেটি এত সংবাদ লইয়াছে!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটা সংশয় জাগিয়া উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপের স্বত্বাধিকার সত্যই সমস্যার বিষয়! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—আজ কথাটার উত্তর দিতে পারলাম না আপনাকে।

ভিতরে খুট খুট করিয়া কড়া নাড়ার শব্দ হইল। যতীন বুঝিল—মা-মণি ডাকিতেছে। সে বলিল—আমি আর উঠতে পারছি না; তুমিই দিয়ে যাও মা-মণি।

পদ্মের বিরক্তির আর সীমা রহিল না। ছেলেটা যেন কি!

দেবু হাসিয়া কহিল—আমাকে লজ্জা করছে না কি, মিতেনী?

ইহার পর আর বাহির না হইয়া উপায় রহিল না। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবৃত করিয়া পদ্ম দুই কাপ চা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—তা ছাড়া লোকজন যাঁরাই ওখানে যান, গোমস্তা শ্রীহরিবাবু তাঁদেরই সাবধান করেন—এ করবে না, ও করবে না! লোকে মেনে নেয়। দুর্বল নিরীহ মানুষ তারা বোঝে না। টাকা দিয়ে শ্রীহরি ঘোষ মেঝে বাঁধিয়ে দিয়েছেন বলে সাধারণের অধিকার নিশ্চয়ই বিক্রি হয়ে যায়নি!

দেবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—উপায় কি বলুন? শ্রীহরি ধনী। সে এখন সমস্ত গ্রামেরই শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমিদার পর্যন্ত তার হাতে গোমস্তাগিরি ছেড়ে দিয়েছেন—পত্তন-বিলির মত শর্ত! করবেন কি বলুন?

যতীন হাসিয়া বলিল—আমি তো কিছু করব না, আমার করবার কথাও নয়। করতে হবে আপনাকে, দেবুবাবু! নইলে উদ্গ্রীব হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম কেন?

দেবু স্থিরদৃষ্টিতে যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীনও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সম্মুখের দিকে চাহিয়া।

সহসা কে ডাকিল—বাবু!

—কে? যতীন ও দেবু দু'জনেই ফিরিয়া দেখিল—ভিতরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে দুর্গা।

দেবু হাসিয়া বলিল—দুর্গা?

—হ্যাঁ।

—কি খবর?

—কামার-বউ জিজ্ঞেস করছে, উনান ধরিয়ে দেবে কিনা। রান্নাবান্না—?

যতীন বলিল—হ্যাঁ। তা উনান ধরাতে বল না কেন!

—কি রান্না করবেন?

—যা হয় করতে বল।

সবিস্ময়ে দুর্গা বলিল—করতে বলব কাকে?

—মা-মণিকে বল। না হয় তুমিই দুটো চড়িয়ে দাও।

দুর্গা মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল, আপনি একটুকুন ক্ষ্যাপা বটেন বাবু!

—কেন দোষ কি? যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, সে যে জাতই হোক তার হাতে খেতে দোষ নাই। জিগ্যেস কর পণ্ডিতমহাশয়কে।

হ্যাঁ পণ্ডিতমশায়?

দেবু হাসিয়া বলিল—জেলখানায় আমাদের যে রান্না করত সে ছিল হাড়ি। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—নামটি ছিল বিচিত্র—গান্ধারী হাড়ি।

যতীন বলিল—দ্রৌপদী হলেই ভাল হত। চলুন, চান করতে যাব নদীতে। সে জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া গামছা টানিয়া লইল।

* * *

দেবু মনে মনে স্থির করিয়াছিল—আর সে পাঁচের হাঙ্গামায় যাইবে না। জেল হইতেই সেই সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু যতীন ছেলেটি তাহার সব সঙ্কল্প ওলোট-পালট করিয়া দিতে বসিয়াছে।

বাড়ী হইতে তেল মাখিয়া গামছা লইয়া যতীনের সহিত নীরবে সে পথ চলিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে আসিয়াই দেখা হইল বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর সঙ্গে। লাঠি হাতে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপ হইতেই নামিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ যতীনের দিকে চহিয়া বলিলেন—চানে চলেছেন বুঝি?

যতীন হাসিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—আপনি তো তেল মাখেন না শুনি?

—আজ্ঞে না।

—তবে পেনাম। ঈষৎ হেঁট হইয়া বৃদ্ধ নমস্কার করিলেন।

যতীন একেবারে শশব্যস্ত হইয়া বলিল—না-না। ও কি? আপনাকে কতবার বারণ করেছি আমি আপনার চেয়ে—

কথার মাঝখানেই চৌধুরী মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন—শালগ্রামের ছোট বড় নাই বাবা! আপনি ব্রাহ্মণ।

—না-না। ওসব আপনাদের সেকালে চলত, সেকাল চলে গেছে।

হাসিটি চৌধুরীর ঠোঁটের ডগায় লাগিয়াই থাকে। হাসিয়া তিনি বললেন—

এখনকার কাল নতুন বটে বাবা। সেকালের কিছু আর রইল না। কিন্তু আমরা জনকতক যে সেকালের মানুষ অকালের মতন পড়ে রয়েছি একালে, বিপদ যে সেইখানে!

বৃদ্ধের কথা কয়টি যতীনের বড় ভাল লাগিল ; বলিল—সেকালের গল্প বলুন আপনাদের!

—গল্প? হ্যাঁ, তা সেকালের কথা একালে গল্প বৈকি। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্তাদের সঙ্গে দেখা হবে, তখন একালে যা দেখে যাচ্ছি বললে সেও তাঁদের কাছে গল্পের মত মনে হবে। সেকালে আমরা গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, মাছ ধরালে মাছ বিলোতাম, ফল পাড়লে ফল বিলোতাম, ক্রিয়াকর্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, সরোবর-দীঘি কাটাতাম, গরু-ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতাম, দেবতা প্রতিষ্ঠে করতাম, মহাপুরুষেরা ঈশ্বর দর্শন করতেন--সে আজ আপনাদের কাছে গল্প গো! আর আজকে আকাশে উড়োজাহাজ, জলের তলায় ডুবোজাহাজ, বেতারে খবর আসা, টাকায় আট সের চাল, হরেক রকম নতুন ব্যামো, দেব-কীর্তি-লোপ,—এও সেকালের লোকের কাছে গল্প।

—আপনি দীঘি কাটিয়েছেন চৌধুরীমশায়?

—আমার কপাল, ভাঙা ভাগ্যি, বাবা। তবে আমার আমলে বাবা কাটিয়েছেন—তখন আমি ছোট, মনে আছে। এক এক ঝুড়ি গুনে কড়ি দিত ; বিকেলে সেই কড়ি নিয়ে পয়সা দিত।

—আধ পয়সা বুঝতে পারেন গো, আমরা যে আপনাদের কথা বুঝতেই পারি না! আচ্ছা বাবা এই যে সব স্বদেশী হাঙ্গামা, বোমা-পিস্তল করছেন—এ সব কেন করছেন? ইংরেজ রাজত্বকে তো আমরা চিরকাল রামরাজত্ব বলে এসেছি।

এক মুহূর্তে যতীনের চোখ দুটো টর্চের আলোকের মত জ্বলিয়া উঠিল এক প্রদীপ্ত দীপ্তিতে। পরমুহূর্তেই কিন্তু সে দীপ্তি নিভিয়া গেল। হাসিয়া বলিল—বোমা-পিস্তল আমি দেখিনি। তবে হাঙ্গামা হচ্ছে কেন জানেন? হাঙ্গামা হচ্ছে ওই দীঘি-সরোবর কাটানো আপনাদের কালকে ওরা নষ্ট করেছে বলে!

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বুঝতে ঠিক পারলাম না। হ্যাঁ গো পণ্ডিত, আপনি এমন চুপচাপ যে?

চিন্তাকুলভাবেই হাসিয়া দেবু বলিল—এমনি।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ দেবুকে বলিল—আপনার কাছে আসব একবার ও-বেলায়!

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ, কথা আছে। আপনি ছাড়া আর বলবই বা কাকে ?

—অসুবিধে না হয় তো এখুনি বলুন না। আবার আসবেন কষ্ট করে ? দেবু উৎকণ্ঠিত হইয়াই প্রশ্ন করিল।

যতীন বলিল—আমি বরং একটু এগিয়ে চলি।

—না-না-না। বৃদ্ধ বলিলেন—বেলা হয়েছে বলেই বলছিলাম। বুড়ো বয়সে আমার আবার লুকোবার কথা আছে নাকি ? চৌধুরী হাসিয়া উঠিলেন—আপনি বোধ হয় শুনেছেন, পণ্ডিত ?

—কি বলুন তো ?

—গাজনের কথা !

—না, কিছু শুনিনি তো ?

—গাজনের ভক্তরা বলছে এবার তারা শিব তুলবে না।

—শিব তুলবে না ! কেন ?

—ও, আপনি তো গতবার ছিলেন না ! গতবার থেকেই সূত্রপাত। গেলবার ঠিক এই গাজনের সময়েই সেটেল্‌মেণ্টের খানাপুরীতে শিবের জমি হারিয়ে গেল।

—হারিয়ে গেল ?

—জমিদারের নায়েব-গোমস্তা বের করতে পারলে না। বের করবে কি, পুরোহিতের জমি নিজেরাই বন্দোবস্ত করেছে মাল বলে। তা ছাড়া শিবের পূজোর খরচা জিম্মা ছিল মুকুন্দ মণ্ডলের কাছে। শিবোত্তর জমি ভোগ করত ওরা। এখন মুকুন্দের বাবা সে জমি কখন বেচে দিয়ে গিয়েছে মাল-বলে। জমিদারও খাজনাখারিজ ফি গুনে নিয়ে দেবোত্তরকে মাল স্বীকার করেছে। মুকুন্দ এত সব জানত না, সে বরাবর শিবের খরচ যুগিয়েই আসছিল। এখন গতবার জরীপের সময় যখন দেখলে শিবোত্তর জমিই নাই, তখন সে বললে—জমিই যখন নাই, তখন খরচও আমি দেব না। গতবার কোনও রকমে চাঁদা করে পূজো হয়েছে। এবার ভক্তরা বলছে, ও-রকম যেচেমেগে পূজোতে আমরা নাই। তাই একবার শ্রীহরির কাছে এসেছিলাম—পূজোর কি হবে তাই জানতে। এখনও বেঁচে আছি—বেঁচে থাকতেই গাজন বন্ধ হবে বাবা !

—শ্রীহরি কি বললে ?

—জমিদারের পত্র দেখালেন, তিনি খরচ দেবেন না। পূজো বন্ধ হয় হোক।

—হুঁ।

চৌধুরী বলিলেন—গতবার থেকে পাতু ঢাক বাজায় নাই, পাতু জমি ছেড়ে

দিয়েছে। বায়েন অবশ্য হবে! অনিরুদ্ধ বলি করে নাই। বলে পাঁঠার ঠ্যাং নিয়ে ও আমি করতে পারব না। শেষে ও-ই খোঁড়াঠাকুর বলি করলে। এবার সে বলেছে বলি করতে হলে দক্ষিণে চাই। নানান রকমের গোল লেগেছে পণ্ডিত। এসবের মীমাংসা তো পথে হয় না। তাই বলছিলাম—ও-বেলায় আসব।

দেবু হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, সে বলিল—এর আর আমি কি করব চৌধুরী মশায়?

—এ কথা আপনার উপযুক্ত হল না, পণ্ডিত। আপনার মত লোক যদি না করে, তবে কে করবে?

দেবু স্তব্ধ হইয়া গেল।

চৌধুরী কালীপুরের পথে বিদায় লইল। দেবু ও যতীন মাঠ অতিক্রম করিয়া গিয়া নামিল ময়ূরাক্ষীর গর্ভে। দেবু নীরবেই স্নান করিল, নীরবেই গ্রাম পর্যন্ত ফিরিল। যতীন দুই-চারটা কথা বলিয়া উত্তর না পাইয়া গুন-গুন করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিল।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণদলে······

*　　　*　　　*

বাসায় ফিরিয়া যতীনের সে এক বিপদ। পদ্ম মূর্ছিত হইয়া জলে-কাদায় উঠানের উপর পড়িয়া আছে। মাথার কাছে বসিয়া কেবল দুর্গা বাতাস করিতেছে। তাহারও সর্বাঙ্গে জল-কাদা লাগিয়াছে। ও-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে মাতাল অনিরুদ্ধ। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া সে বকিতেছে। রান্নাবান্নার কোন চিহ্নই নাই।

দুর্গা বলিল,—আপনারা চলে গেলেন, কামার-বউ একেবারে ক্ষ্যাপার মতন হয়ে আমাকে বললে—বেরো, বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে, বেরো। আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। আমি মশায়, বাড়ী যাব বলে যেই এখান থেকে বেরিয়েছি, আর শব্দ হল দড়াম্ করে! পিছন ফিরে দেখি এই অবস্থা। ছুটে এসে জল দিয়ে বাতাস করে কিছুই হল না। খানিক পরে হঠাৎ কর্মকার এল। এসে, ওই দেখুন না, খানিকটা চেঁচামেচি করে ওই বসেছে—এইবার মুখ গুঁজড়ে পড়বে।

দেবু অনিরুদ্ধকে ঠেলা দিয়া ডাকিল—অনিরুদ্ধ!

একটা গর্জন করিয়া অনিরুদ্ধ চোখ মেলিয়া চাহিল—এ্যাও!

কিন্তু দেবুকে চিনিয়া সে সবিনয়ে বলিল—ও, পণ্ডিত!

—হ্যাঁ, শুনছ?

—আলবৎ, একশবার শুনব, হাজারবার শুনব!

পরক্ষণেই সে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমার অদেষ্ট দেখ পণ্ডিত! তুমি বন্ধুনোক, ভাল নোক, গাঁয়ের সেরা নোক, পাতঃস্মরণীয় নোক তুমি—দেখ আমার শাস্তি। পথের ফকির আমি। আর ওই দেখ পদ্মর অবস্থা।

—জগনকে ডেকে আন অনিরুদ্ধ। ডাক্তার ডাক।

অতি কাতর-স্বরে অনিরুদ্ধ বলিল—ডাক্তার কি করবে, ভাই? এ ওই ছিরে শালার কাজ। আমার গুপ্তি কই? আমার গুপ্তি? খুন করব শালাকে। আর ওই দুগ্‌গাকে। ওই পদ্মকে। দুগ্‌গা আমাকে বাড়ী ঢুকতে দেয় না পণ্ডিত। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না।

তারপর সে আরম্ভ করিল অশ্লীল গালিগালাজ। দুর্গা নতশির হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

দেবু বলিল—যতীনবাবু আসুন, আমার ওখানেই দু'টো খাবেন। আমরা গিয়ে বরং জগনকে ডেকে দেব'খন।

দেবু ও যতীন চলিয়া যাইতেই অনিরুদ্ধ আবার আরম্ভ করিল—আর ওই নজরবন্দী ছোঁড়াকে কাটব। ওকেই আগে কাটব! ও-ব্যাটাই আমার ঘরের—

দুর্গা এবার ফোঁস করিয়া উঠিল—দেখ কম্মকার, ভাল হবে না বলছি!

অনিরুদ্ধ চৌকাঠের উপর নিষ্ঠুরভাবে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিল—ওই নে, ওই নে!

দুর্গা বারণ পর্যন্ত করিল না।

কুড়ি

'ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট
সেই তিল দায়ে কাট।'

ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তিল ফসল পাকিলে সেবার চূড়ান্ত ফসল হয়। সে তিল ফসল দা' ভিন্ন কাস্তেতে কাটা যায় না। এবার তিল নাবি, সবে এই ফুল ধরিতেছে, পাকিতে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ। কাজেই ফসল ভাল হইবে না।

ভোরবেলায় মাঠ ঘুরিয়া চাষের জমির তদারক করিয়া দেবু ফিরিতেছিল। এ বৎসর মাঘ মাস হইতে আর বৃষ্টি হয় নাই। বৃষ্টির অভাবে এখনও কেহ আখ

লাগাইতে পারে নাই। ময়ূরাক্ষীর জল একেবারে শীর্ণ ধারায় ওপারে জংশন শহরের কোল ঘেঁষিয়া বহিতেছে; বাঁধ দিয়া জল এপারে আনিতে পারিলে সিচ্‌ করিয়া চাষের কাজ চলিত। কিন্তু এ বাঁধ বাঁধা বড় কষ্টসাধ্য। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত ময়ূরাক্ষীর গর্ভে বাঁধ দিতে হইবে; অন্তত চার-পাঁচ হাত উঁচু না করিলে চলিবে না। সে করিবে কে? চার-পাঁচখানা গ্রামের লোক একজোট হইয়া না লাগিলে তাহা সম্ভবপর নয়। এখন আখ লাগাইলে সে আখের বিনাশ থাকিত না; বর্ষা পড়িবার পূর্বেই হাত দু'য়েক না হোক অন্তত দেড় হাত উঁচু হইয়া উঠিত। পটোল লাগানোও হইল না। 'পটোল রুইলে ফাল্গুনে ফল বাড়ে দ্বিগুণে।' শ্রীহরি কিন্তু সব লাগাইয়া ফেলিয়াছে। আপনার জমিতে দুই-তিনটা কাঁচা কুয়া কাটাইয়া, 'ঢেড়া'য় জল তুলিয়া সিচনের ব্যবস্থা করিয়াছে। শ্রীহরির কুয়া হইতে জল লইয়া ভবেশ-হরিশও কাজ করিয়া লইয়াছে।

দেবু ভাবতেছিল একটা কুয়া কাটাইবার কথা। পটল যাক, কিন্তু আখ না লাগাইলে কি করিয়া চলিবে? বাড়ীতে গুড় না থাকিলে চলে? ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে অল্প খুঁড়িলেই জল অতি সহজেই পাওয়া যাইবে; আট-দশ হাত গর্ত করিলেই চলিবে। টাকা পনেরো খরচ। কিন্তু এদিকে যে বিলুর হাতের মজুত টাকা সব শেষ হইয়া আছে। শ্রীহরির স্ত্রী গোপনে ধার দিয়াছে। দুর্গার মারফতে দোকানেও কিছু ধার হইয়া আছে। ধান এবার ভাল হয় নাই। মজুত যাহা আছে বিক্রি করিতে ভরসা হয় না। সম্মুখে বর্ষা আসছে, চাষের খরচ—সংসার খরচ—অনেক দায়িত্ব। গম-যব—তাও ভাল হয় নাই। গম দেড় মণ, যব মাত্র তিরিশ সের। কলাই যাহা হইয়াছে সে সংসারেই লাগিবে। আর স্কুলের চাকরি নাই, মাস-মাস নগদ আয়ের সংস্থান গিয়াছে। এখন সে কি করিবে? অথচ এই অবস্থায় গোটা গ্রামটাই যেন তাহাকে টানিতেছে সহস্র সমস্যা লইয়া। যতীনের কথা মনে হইল; দ্বারকা চৌধুরীর কথা মনে হইল।

গ্রামে ঢুকিতেই দেখা হইল ভূপালের সঙ্গে। চৌকিদারী পেটিটা কাঁধে ফেলিয়া সে সকালেই বাহির হইয়াছে। ভূপাল প্রণাম করিল—পেনাম।

প্রতি-নমস্কার করিয়া দেবু চলিয়া যাইতেছিল, ভূপাল সবিনয়ে বলিল—পণ্ডিতমশায়!

—আমাকে কিছু বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বাড়ীতে, ফিরে আসছি।

—কি, বল?

—আজ্ঞে, খাজনা আর ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স।

—আচ্ছা, পাবে।

ভূপাল খুশী হইয়া বলিল—এই তো মশায় মানুষের মতন কথা। তা না—ডাক্তোরবাবু তো মারতে এলেন। ঘোষালমশাই বলে দিলে—নেহি দেঙ্গা। আর সবাই তো ঘরে লুকিয়ে বসে থাকছে। মেয়েছেলেতে বলছে—বাড়ীতে নাই। এদিকে আমি গাল খাচ্ছি।

হাসিয়া দেবু বলিল—না থাকলেই মানুষকে চোর সাজতে হয় ভূপাল।

—ই আপনি ঠিক বলেছেন।

ভূপাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কার ঘরে কি আছে বলুন? গোটা মাঠটার ধানই তো ঘোষমশাইয়ের ঘরে এসে উঠল গো। বর্ষার ধান শোধ দিতেই তো সব ফাঁক হয়। সত্যি, লোকে দেয় কি করে? কিন্তু আমিই বা করি কি বলুন? আমারই এ হইছে মরণের চাকরি!

বাড়ীতে আসিয়া দেবু দেখিল বিলু তাহার জন্য চা করিয়া বসিয়া আছে। সে আশ্চর্য হইয়া গেল—এ কি!

বিলু লজ্জিত ভাবেই বলিল—দেখ দেখি হয়েছে কিনা! কামার-বউকে শুধিয়ে এলাম, নজরবন্দীর চা কামার-বউ করে কি না!

—তা না হয় হল, কিন্তু করতে বললে কে?

—তুমি যে বললে জেলে রোজ নজরবন্দীদের কাছে চা খেতে।

—হ্যাঁ তা খেতাম; কিন্তু তাই বলে এখনও খেতে হবে তার মানে কি? না, আর খরচ বাড়িয়ো না, বিলু।

—বেশ। এক কৌটো চা আনিয়েছি, সেটা ফুরিয়ে যাক, তারপর আর খেয়ো না।

—এক কৌটো চা আনিয়েছ?

—দুর্গা এনে দিয়েছে কাল সন্ধ্যেবেলা।

দেবুর ইচ্ছা হইল চায়ের বাটিটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু বিলু ব্যথা পাইবে বলিয়া সে তাহা করিল না। বলিল—আজ করেছ কিন্তু কাল থেকে আর করো না। চায়ের কৌটোটা থাক, ভাল করে মুড়ে রেখে দাও। ভদ্রলোকজন এলে, কি বর্ষায়-বাদলায় সর্দি-টর্দি করলে খাওয়া যাবে।

—না।

দেবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—মানে?

—তোমার কষ্ট হবে।

—হবে না।

—হবে, আমি জানি।

—কি আশ্চর্য!

বিরক্তিতে বিস্ময়ে দেবু বলিল—আমার কষ্ট হবে কি না আমি জানব না, তুমি জানবে?

—বেশ! করব না চা।

মুহূর্তে বিলুর চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া সে চলিয়া গেল।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এই বোধ হয় তাহাদের জীবনে প্রথম দ্বন্দ্ব। বিলুকে আঘাত দেওয়ার দুঃখ বড় মর্মান্তিক হইয়া দেবুর অন্তরে বাজিল।

—মুনিবমশায়! দেবুর কৃষাণ আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি রে?

—আজ্ঞে, এবার তো একখানা কোদাল না হলে চলবে না।

—নতুন চাই? লোহা চাপিয়ে হবে না?

—না, আজ্ঞে। গেলবারই লাগত, আপুনি ছিলেন না। লোহা দিয়ে কোন রকমে চালিয়েছি; ক্ষয়ে এই এতটুকুন হয়ে গিয়েছে। সার কেটে পালটানোই যাচ্ছে না।

—সার কাটছ নাকি? জল দিচ্ছ তো? চল দেখি!

চৈত্র মাসে 'সার' প্রস্তুতের গর্তে সঞ্চিত আবর্জনাগুলিকে কোদাল দিয়া উপরের নূতন না-পচা আবর্জনা নিচে ফেলিয়া, নিচের পচা আবর্জনা যাহা 'সারে পরিণত হইয়াছে—সেগুলিকে ওপরে দেওয়ার বিধি। সঙ্গে সঙ্গে ভারে ভারে জল। দেবুর বাড়ীর সার কোনমতে কাটিয়া পাল্‌টানো হইয়াছে। কৃষাণটি কোদালটা দেখাইল। সত্যই সেটা ক্ষয় পাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে, উহাতে চাষের কাজ চলিবে না। চাষের কাজে ভারী কোদাল চাই। সেকালে শক্তিমান চাষীরা যে কোদাল চালাইত, তাহার ওজন পাঁচসেরের কম হইত না, সাত-আট সের ওজনের কোদাল চালাইবার মত মত সক্ষম চাষীও অনেক ছিল।

দেবু বলিল—বেশ, কোদাল একখানা—কি করবে, বরাত দিয়ে করাবে, না কিনবে?

—কেনা জিনিস ভাল হয় না, তবে সস্তা বটে।

—কিন্তু কামার কোথা? অনিরুদ্ধ তো কাজের বার হয়েছে। অন্য কামার যাকেই দেবে—কাল দোব বলে দু-মাসের আগে দেবে না।

—তবে তাই কিনেই দেন। আর শন্ চাই। হালের 'জুতি' চাই। রাখালটা বলছিল—গরুর দড়িও ছিঁড়েছে।

দেবু একটা কাজ পাইয়া খুশী হইল। শন্ পাকাইয়া দড়ি করার কাজ—

পল্লীগ্রামে নিষ্কর্মার কর্ম—বুড়োর কাজ। সে তখনই ঢেঁড়া-শন্ লইয়া আসিল। দড়ি পাকাইতে পাকাইতে সে ভাবিতেছিল—কি করিবে সে ?

কৃষাণ কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া দাঁড়াইল।

—আর একটা কথা বলছিলাম যে মুনিবমশায় !

—কি, বল ?

—পাড়ার লোকে সবাই আসবে আপনার কাছে। তা আমাকে বলেছে, তু বলে রাখিস্ পণ্ডিতমশায়কে।

—কি, ব্যাপার কি ?

—আজ্ঞে চণ্ডীমণ্ডপে আটচালা ছাওয়াতে আমরা বেগার দি। তা এবার ডাক্তোরবাবু, ঘোষাল—সব কমিটি করেছেন, ওঁরা বলছেন—পয়সা নিবি তোরা। বেগার ক্যানে দিবি ? চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের, জমিদারকে খরচ দিতে হবে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। আপনার গৃহকর্মে মন দিয়া দড়ি পাকাইতে বসিয়া সে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল—একটা দোকান করিবে সে। এবং তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া চাষ। প্রয়োজনমত সে নিজে লাঙল ধরিবে। এখন কিছু না করিলে সংসার চলিবে কিসে ?

কৃষাণটা আবার বলিল—আমরা তাই ভাবছি। ডাক্তোরবাবু কথাটি মন্দ বলেন নাই। চণ্ডীমণ্ডপে জমিদারের কাছারি হয়, ভদ্দোনোকের মজলিস হয়, তোদের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের 'লেপ্‌চ' (সংস্রব) কি ? বিনি পয়সায় ক্যানে খাটবি ! আবার ওদিকে ঘোষমশায় লোক পাঠাচ্ছেন– কবে ব্যাগার দিবি ? ঘোষমশায় গাঁয়ের মাথার নোক ; আবার গোমস্তা হয়েছেন। ওঁর কথাই বা ঠেলি কি করে ? তার ওপর গ্রাম-দেবতাও বটে। তাই সব বলছে পণ্ডিতমশায়ের কাছে যাব। উনি যেমনটি বলবেন, তেমনটি শিরোধার্য আমাদের।

দেবুর মন-প্রাণ ঠিক গত কল্যকার মত হাঁপাইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কৃষাণটি ডাকিল—মুনিবমশায় ?

—আমি এখন কিছু বলতে পারলাম না, নোটন !

—আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব। সে আমাদের ঠিক হয়ে রইচে।

সে উঠিয়া গেল। দেবুর হাতের শন্-ঢেঁড়া নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল—সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

চণ্ডীমণ্ডপে লোকজনের সাড়া উঠিতেছে। সেখানে খাজনা আদায় চলিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে খাতকদের কাছে শ্রীহরির পাওনার হিসাবও চলিতেছে। আখেরি

কিস্তি, বৎসরের শেষ। তামাদি যাহাদের, তাহাদের উপর নালিশ হইবে। শ্রীহরির ধানের পাওনা হিসাব করিয়া উশুল বাদে যাহা থাকিবে, আগামী বৎসরে তাহার জের চলিবে ; যাহার উশুল নাই, তাহার আসল-স্থদ এক হইয়া আগামী বৎসরের জন্যে আসল হইবে।

শ্রীহরির গোয়াল ঘরগুলি ছাওয়ানো হইতেছে। চালের উপর ঘরামিরা কাজ করিতেছে। চাষীদের ঘর ছাওয়ানোর কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলে নিজেরাই বাড়ীর কৃষাণ-রাখাল লইয়া ঘর ছাওয়াইয়া লয়। দেবুরও অবশ্য ছাওয়ানোর কাজ না-জানা নয়। কিন্তু পণ্ডিতি গ্রহণ করিয়া আর সে এ কাজ করে না, এবার করিতে হইবে। তাহার ঘর এখনো ছাওয়ানো হয় নাই। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

—সালাম পণ্ডিতজী!

ইছু সেখ পাইকার আরও দুই-তিনজনের সঙ্গে পথ দিয়া যাইতেছিল, দেবুকে দেখিয়া সে সম্ভাষণ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও সম্ভাষণ করিল —সালাম।

—সেলাম। ভাল আছ ইছু-ভাই ? তোমরা ভাল আছ সব ?

—হ্যাঁ। আপনি সরীফ ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—তা আপনাকে আমরা হাজারবার সালাম করছি। হ্যা—মরদের বাচ্চা মরদ বটে। মছজেদে আমাদের হামেশাই কথা হয় আপনকার। মন্থ মিঞা, খালেক সায়েব, গোলাম মেজ্জা আসবে একদিন আপনকার সাথে মোলাকাত করতে।

দেবু প্রসঙ্গটা পাল্টাইয়া দিল—কোথায় এসেছিলে ?

—এই গাঁয়েই বটে। কিস্তির সময়—ছাগল, গরু দু'চারটে বেচবে তো। তা ধরেন—এ হল আমার কেনাবেচার গাঁও—তাই টাকাকড়ি নিয়ে এসেছিলাম। আর কেনা তো উঠেই গিয়েছে। কিন্‌নেওয়ালা হয়ে গেল। আপনার তো একটা বলদ বুড়ো হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আপনি ল্যান ক্যানে একটা বলদ !

—এবার আর হয় না, ইছু-ভাই।

—আপনি ল্যান, বুড়ো বলদটা ছান আমাকে, বাকী যা থাকবে—দিবেন আমাকে ইহার পরে। না হয় কিছু ধান ছেড়ে ছান, ধানের পাইকার আমার সাথে।

দেবু হাসিল।—না ভাই, থাক্।

—আচ্ছা, তবে থাক্।

ইছুর দল সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পাকা ব্যবসাদার ইছু, মানুষের টাকার প্রয়োজনের সময় সে টাকা লইয়া উপস্থিত হইবেই। কাহার বাড়ীতে কোন্ জন্তুটি মূল্যবান সে তাহার নখাগ্রে। কিন্তু মন্থ মিঞা, খালেক সাহেব, গোলাম মির্জা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে কেন! সে মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিল। ইহারা সম্ভ্রান্ত লোক, বড় চাষী, ব্যবসায়ী।

রাখাল-ছোঁড়া আসিয়া দেবুর শিশুটিকে নামাইয়া দিয়া বলিল—আপনি একবার ল্যান, মুনিবমশায়। আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না! গরু চরাইতে যাবে আমার সাথে।

ছোঁড়াটা হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে খোকাকে বলিল—নেকা-পড়া কর বাবার কাছে। গরু চরাতে যেতে নাই, ছি!

দেবু সাগ্রহে খোকাকে বুকে তুলিয়া লইল।

ছেলেটাও তেমনি, বিলু তাহাকে বেশ তালিম দিয়াছে, সে গম্ভীরমুখে আরম্ভ করিল—ক—ল কলো, ক—ল কলো!

* * *

—কি হচ্ছে পণ্ডিত!

বলিয়া এই সময় অনিরুদ্ধ আসিয়া বসিল। এখন সে প্রকৃতস্থ। মুখে মদের সামান্য গন্ধ উঠিতেছে, কিন্তু মাতাল নয়। হাতে একটা লোহার টাঙ্গি।

হাসিয়া দেবু বলিল—চেতন হয়েছে, অনি-ভাই?

কোন লজ্জা বোধ না করিয়া অনিরুদ্ধ হাসিয়া বলিল—কাল একটুকু বেশী হয়েছিল বটে।

দেবু বলিল—ছি, অনি-ভাই! ছি!

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর অকস্মাৎ খানিকটা হাসিয়া বলিল—ও তুমি জান না, দেবু-ভাই। রস তুমি পাও নাই—তুমি বুঝবে না।

তিরস্কার করিয়া দেবু বলিল—তোমার জমি নীলামে উঠেছে, কি নীলাম হয়েছে, ঘরে পরিবারের অসুখ, আর তুমি মদ খেয়ে বেড়াও—পয়সা নষ্ট কর?

—পয়সা আর বেশী খরচ আমি করি না, এখন পচাই মদ খাই। এখন জমি নীলামের কথাই তোমাকে বলতে এসেছি। আর পরিবারের অসুখ তো—আমি কত ভুগবো বল?

—তুমি তো এমন ছিলে না অনি-ভাই?

কে জানে? মদ তো আমি বরাবরই একটু-আধটু খাই। আমি তো অন্যায় কিছু বুঝতে পারি না।

—বুঝতে পার না! পৈতৃক ব্যবসা তুলে দিলে। ছোটলোকের মত পচাই ধরেছ। যেখানে সেখানে খাও—শোও।

—কি করব? অনি কামারের দা, ক্ষুর, গুপ্তি—কিনবে কে? কোদাল-কুড়ুল-ফাল—তাও এখন বাজারে মেলে—সস্তা। গাঁয়ে কাজ করলে শালারা ধান দেয় না। কি করব? আর পচাই! পয়সায় কুলোয় না—কি করব?

—কি করবে? তোমার বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে, অনি-ভাই?

—কে জানে!

—দুর্গার ঘরে খাও অনি-ভাই? তার ঘরে তুমি রাত কাটাও?

—দুর্গার নাম করো না পণ্ডিত। নেমকহারাম, পাজি, শয়তানের একশেষ আমাকে আর ঘরে ঢুকতে দেয় না।

অনিরুদ্ধের এই নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিতে দেবু চুপ করিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ বলিয়া গেল—জান পণ্ডিত, দুর্গার জন্যে আমি জান দিতে পারতাম; এখনও পারি। দুর্গাই আমাকে নিজে থেকে ডেকেছিল। তখন আমার পরিবার পাগল। মিছে কথা বলব না, সে সময় দুর্গা আমার পরিবারের সেবা পর্যন্ত করেছে, টাকাও দিয়েছে। দারোগা ওর এক কালের আশনাইয়ের লোক—দারোগাকে বলে নজরবন্দীর জন্যে আমার ঘরখানা ভাড়া করিয়ে দিয়েছে। মাসে দশ টাকা ভাড়া। কিন্তু ওর সব চোখের নেশা। যাকে যখন ভালবাসে। এখন ওই নজরবন্দীর উপর নজর পড়েছে।

—ছি, অনিরুদ্ধ! ছি!

—যতীনবাবুর দোষ আমি দিই না। ভাল লোক, উঁচু ঘরের ছেলে। পদ্মকে 'মা' বলে। আমি পরখ করে দেখেছি। যাক গে ও কথা। মরুক গে দুর্গা। এখন যা বলতে এসেছি, শোন। বাকী খাজনার ডিক্রি জারি হয়ে গিয়েছে। জমি এইবার নীলামে চড়বে। ও ঝঞ্ঝাট আমি রাখব না। এখন বিক্রি করে দিয়ে যা পাই। তোমাকে ভাই দেখেশুনে আমার জোতটি বেচে দিতে হবে।

—বেচে দেবে? দেবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—সে যা হয় করব। ছিরে গোমস্তাকে আমি খাজনা দেব না।

—পাগলামি? তবে যাক, এমনি ন'কড়া-ছ'কড়ায় নিলেম হয়ে যাক। আমার-দ্বারা কিছু হবে না। বাকী খাজনার টাকাটা যোগাড় করা হয় খাজনার পরিমাণ দামের মত জমি বেচে দাও, নয় ধার পাও তো দেখ।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাই, বাপুড়ি সম্পত্তি

ছেড়ে দোব মনে করলে বুক ফেটে যায়। জান পণ্ডিত, ওই চার বিঘে বাকুড়ি, আগে ঠাকুরদাদার আমলে সাতখানা টুকরো টুকরো জমি ছিল। কেটেকুটে সাতখানাকে ঠাকুরদাদা করেছিল তিনখানা। বাবা তিনখানাকে কেটে করে-দু'খানা। সাড়ে-তিন বিঘা বাকুড়ি—আর দশ কাঠা ফালি। দু'খানাকে কেটে আমি করেছি একখানা চারবিঘে বাকুড়ি।

টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় কয় কোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

দেবু তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—কেঁদো না, অনি-ভাই। তুমি সক্ষম বেটা-ছেলে, তুমি মন দিয়ে কাজ করলে তোমার কিছুর অভাব হতে পারে না।

বিচিত্র হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—হাজার মন পাতিয়ে কাজ করলেও কামারের কাজ করে আর অভাব ঘুচবে না, পণ্ডিত। উপায় এক—কলে কাজ। তাই দেখব এবার। দুর্গা আমাকে বলেছিল একবার—আমি গা করি নাই। কেশব কামারের ছেলে, হিতু কামারের নাতি—আমি কলের কুলি হব? ওই সব কি-না-কি জাতের মিস্ত্রীদের তাঁবেদার হয়ে থাকব? জান দেবু, এমন দা আমি গড়তে পারি যে এক কোপে শেলেদা বাঘের গলা নেমে যাবে।

অনিরুদ্ধকে শান্ত করিবার জন্যই রহস্য করিয়া দেবু বলিল—সেই তোমার ভুল, অনি-ভাই। ও দা নিয়ে লোকে করবে কি বল? বাঘ কাটতে যাবে কে?

অনিরুদ্ধ এবার হাসিয়া ফেলিল।

দেবু বলিল—টাকা যদি ধার পাও তো দেখ, অনি-ভাই। জমি রাখতেই হবে। তারপর মন দিয়ে কাজ-কর্ম কর। কলে—কলেই কাজ কর আপাতত। ক্ষতি কি?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তুমি বলছ? আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তাই দেখি!

পথে বাহির হইয়া অনিরুদ্ধ বাড়ী গেল না। বাড়ী তাহার ভাল লাগে না। পদ্ম তাহাকে চায় না, সেও পদ্মকে চায় না। নিক্তির ওজনে চরিত্রবান সে কোনদিনই নয়; কিন্তু পদ্মের প্রতি ভালবাসার অভাব তাহার কোনদিন ছিল না। চরিত্রহীনতার ব্যভিচার ছিল তাহার খেয়াল পরিতৃপ্তির গোপন পন্থা; উন্মত্ত দেহলালসার দাহ নিবৃত্তির জন্য পঙ্কস্নান।

অকস্মাৎ কোথা হইতে জীবনে একটা দুর্যোগ আসিয়া সব বিপর্যস্ত করিয়া দিল। সেই দুর্যোগের মধ্যে দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল মোহিনীর বেশে; শুধু মোহিনীর রূপ লইয়াই নয়—অফুরন্ত ভালবাসাও দিয়াছিল দুর্গা। সেবা-যত্ন—

এমন কি নিজের পার্থিব সম্পদও সে তখন অনিরুদ্ধের জন্য ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিছু দিয়াছেও।

তা ছাড়া দুর্গার সঙ্গ তাহাকে যে তৃপ্তি দিয়াছে, পদ্ম তাহার সুস্থ সবল যৌবন—পরিপূর্ণ দেহ লইয়াও সেরূপ তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাহার বুকে আছে এক বোঝা মাদুলি; চিরদিন সে তাহাতে বেদনা অনুভব করিয়াছে। আচার-বিচার ব্রত-বার পালনের আগ্রহে, শুচিতা-বোধের উগ্রতায় পদ্ম তাহাকে অস্পৃশ্যের মত দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার ভালবাসায় যত্নের আধিক্য, মমতার আতিশয্য অনিরুদ্ধকে পীড়া দিয়াছে। সঙ্কোচশূন্য অধীরতায় দুর্গার মত বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সে কোনদিনই পারে নাই। সমস্ত দিন আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া তাহারই সম্মুখে বসিয়া সর্বাঙ্গ ঝলসাইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া একটু করিয়া মদ খাইত। কিন্তু ওই দেহ-মন লইয়া পদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইলেই তাহার নেশার আগ্রহ সব যেন হিম হইয়া যাইত।

দুর্গার মধ্যে আগুন ও জল—দুই-ই আছে, একধারে জ্বলিবার ও জুড়াইবার উপাদান। তাহার যৌবনে আছে আবেগময়ী মানবীর ঈষদুষ্ণ স্বাদ;—তাহা অনিরুদ্ধকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ভালবাসায় আছে সর্বস্ব ঢালিয়া দিবার আকুতি। কামারশালা অচল হইলে কর্মহীন অনিরুদ্ধ বিশ্বগ্রাসী অবসাদ হইতে বাঁচিবার জন্য সস্তা মদ ধরিবার সময়টিতেই দুর্গা আক্রোশবশে ছিরুকে ছাড়িয়া তাহাকে সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সেই চরম আত্মসমর্পণের মধ্যে দুর্গার নিকট সেও আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু দুর্গা সহসা একদিন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—নূতনের মোহে। দুর্গা তুষানল ও মরীচিকা দুই-ই। সে পাষাণী, বিশ্বাসঘাতিনী, মায়াবিনী!

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। এ কি? এ যে অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে একেবারে বায়েন-পাড়াতেই দুর্গার ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দুর্গা উঠানে দুধ মাপিতেছে, রোজের দুধ দিতে যাইবে।

সে ফিরিল তাড়াতাড়ি। পাড়াটা পার হইয়া সে মাঠের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে-ই বা দুর্গার পিছনে ঘুরিবে কেন? সে-ও পরিত্যাগ করিবে। দেবু তাহাকে ঠিক কথাই বলিয়াছে। এখন সে বুঝিতে পারিতেছে—তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে। ছি ছি! কেশব কর্মকারের ছেলে—হিতু কর্মকারের নাতি—সে মুচির মেয়ের ঘরে পড়িয়া থাকে তাহার উচ্ছিষ্ট দেহখানার লোভে—তাহার দুই-চারিটি টাকাপয়সার প্রত্যাশায়। ছি! সে না সক্ষম বেটাছেলে—একজন নামকরা লোহার কারিগর?

পরক্ষণেই সে হাসিল। লোহার কারিগরের আর মান নাই—নাম নাই।

চার আনার বিলাতি চাকু-ছুরিতেই নামের গলা দু-ফাঁক হইয়া গিয়াছে। সে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যাক—নাম যাক—মানও যাক, জানটাই থাকুক, চাল-কলে তেল-কলে নাটবল্টু কষিয়া হাতুড়ি ঠুকিয়া মিস্ত্রী হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে সে। জোতটাকেও বাঁচাইতে হইবে। ঠাকুরদাদার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজের হাতে কাটা জমি, বাবার কাটা জমি, তাহার নিজের হাতে কাটা ওই বাকুড়ি—তাহার সোনার বাকুড়ি—'লক্ষ্মী-জোল', তাহার মা অন্নপুন্না!

আপনা হইতেই তাহার দৃষ্টি সম্মুখের শস্যশূন্য মাঠের উপর দিয়া প্রসারিত হইয়া নিবদ্ধ হইল চার বিঘার বাকুড়ির উপর। সে চলিতে আরম্ভ করিল; বাকুড়ির আইলের উপর বসিল। আইলের মাথায় একটা কয়েৎবেলের গাছ। গাছটা লাগাইয়াছিল তাহার পিতামহ। বাল্যকালে তাহার বাপ চাষ করিত—সে আসিত বাপের ও কৃষাণের খাবার লইয়া, আসিয়া ওই গাছতলায় বসিত। জ্বর-জ্বালার পর কতদিন এখানে আসিয়া নুন দিয়া কয়েৎবেল খাইয়াছে। লক্ষ্মী-পূজোতে, পর্বে-পার্বণে এই ধানের চালে হইয়াছে অন্ন, ওই কয়েৎবেল গুড়-নুন দিয়া মাখিয়া হইয়াছে চাটনী!

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ সঙ্কল্প লইয়া উঠিল—এ জোত তাহাকে রাখিতেই হইবে।

সে চলিল 'আকুলিয়া' গ্রামের কাবুলী চৌধুরীর কাছে। ফ্যালারাম চৌধুরী, কঙ্কণা ইস্কুলের মাস্টার, তাহার সুদি কারবার আছে। খুব চড়া সুদ ও ভয়ঙ্কর তাগাদার জন্যে অনেক লোকে বলে 'কাবুলী'। অনেকে বলে 'অজগর'—তাহার গ্রাসে পড়িলে নাকি আর বাহির হওয়া যায় না। অনেকে বলে 'খুনে'। একবার একটা চোর ধরিয়া চৌধুরী চোরটাকে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল।

চৌধুরীর জমির ক্ষুধা বড় প্রবল। ভাল সম্পত্তি হইলে চৌধুরী টাকা দিবেই। সে আকুলিয়া গ্রামের পথই ধরিল।

চৌধুরী লেখাপড়া জানা লোক, বি-এ পাস. এদিকে আবার সংস্কৃতেও কি একটা পরীক্ষা দিয়াছে, ইস্কুলে সে হেড পণ্ডিত। কিন্তু আসলে সে একজন প্রথম শ্রেণীর আঙ্কিক। সুদ কষিতে তাহার কাগজ-কলম দরকার হয় না। চক্রবৃদ্ধিহারে দশ-বিশ বৎসরের সুদ মুখে মুখে হিসাব করিয়া দেয়। তবে সুদকে আসলে পরিণত করিয়া সেটা উশুলের হিসাব আলোচনার সময় দুই-চারিটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া অঙ্কগুলাকে রসায়িত অথবা পরমার্থিক তত্ত্বমণ্ডিত করিয়া দেয়।

অনিরুদ্ধ বলিল—আমি ঠিক সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করব, চৌধুরী মশাই

—আমি ফাঁকিবাজ নই। আর পালিয়ে বেড়িয়ে দেখা করব না, সে স্বভাবও আমার নয়।

চৌধুরী হাসিল—ফাঁকি দেবার উপায় নাই, বাবা। আর পালিয়েই বা যাবি কোথায়?

বলিয়া সে একটা শ্লোক আওড়াইয়া দিল—'গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো, লক্ষান্তরেহর্ক সলিলে চ পদ্মম্'। বুঝলি অনিরুদ্ধ, মেঘ থাকে আকাশে আর ময়ুর থাকে পাহাড়ে, দূর অনেক। কিন্তু মেঘ উঠলেই ময়ূরকে বেরিয়ে এসে পেখম মেলতেই হবে। আর স্থযি থাকে আকাশে; জলে পদ্মের কুঁড়ি। কিন্তু স্থযি উঠলেই পদ্মকে বাপ বাপ বলে পাপড়ি খুলতেই হবে। খাতক-মহাজন সম্বন্ধ হলে যেখানে থাকিস না কেন, হাজির তোকে হতেই হবে—পালাবি কোথা?

অনিরুদ্ধ কথাগুলো ভালো করিয়া বুঝিল না, দাঁত মেলিয়া শুধু নিঃশব্দে হাসিল। কথাগুলোয় রসের গন্ধ আছে।

চৌধুরী মুখে-মুখেই হিসাব করিল—বিঘেতে চল্লিশ টাকা দিলে, তিন বছরে চল্লিশ তো ষাটে গিয়ে দাঁড়াবে। এতে নালিশের খরচা চাপালে মহাজনের থাকবে কি বল্? তার ওপর খাতক আবার যদি বাকী খাজনা ফেলে যায়, তবে তো আমাকে রঘু রাজার মত ভাঁড়ে জল খেতে হবে।

অনিরুদ্ধ তাহার পায়ে ধরিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, এক বছরের মধ্যেই সব টাকা শোধ করব আমি।

পা টানিয়া লইয়া চৌধুরী বলিল—পায়ে ধরিস না অনিরুদ্ধ, পায়ের ফাটে হাত-মুখ ছিঁড়ে যাবে তোর। ছাড়্।

মিথ্যা বলে নাই, চৌধুরীর কালো কর্কশ চামড়ায়, কোন ব্যাধির জন্যই হউক বা শরীরে কোন উপাদানের অভাব হেতুই হউক, বারো-মাস ফাট ধরিয়া থাকে। শীতকালে সাদা ফাটগুলো রক্তাভ হইয়া উঠে। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর, চৌধুরীর পায়ের তলাকার ফাট, শুষ্ক কঠিন চামড়া, ছুরির মত ধারালো।

পা'টা ছাড়াইয়া লইয়া চৌধুরী তারপর সান্ত্বনা দিয়া বলিল—এক বছরেই যখন শোধ করবি, তখন ছ'বিঘে কেন দশ বিঘে বন্ধক দিতেই বা আপত্তি কিসের তোর? কাগজে লেখা থাকবে বই তো নয়?

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া রহিল, সে ভাবিতেছিল দেহের গতিকের কথা, দেবতার গতিকের অর্থাৎ বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কথা।

—কিছু ভয় করিস না।

চৌধুরী তার মনের ভাব ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এক বছরেই শোধ করিস আর পাঁচ বছরে করিস—তোকে মরতে আমি দোব না। সুদ আমি বাকী রাখি

না, রাখবও না। বাকী থাকলে আসলই থাকবে; তাতে বেইমানি করিস, তাহলে ব্রাহ্মণের গণ্ডূষ। চৌধুরী হাসিতে লাগিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—সুদ আপনি মাসে মাসে পাবেন।

—ঠিক তো?

—তিন সত্য করছি আপনার চরণ ছুঁয়ে।

—তবে দিন তিনেক পরে আসিস্। আমি সব খোঁজখবর করে দেখি।

—খোঁজ করবেন? কি খোঁজ করবেন?

—আর কোথাও বন্ধক-টন্ধক দিয়েছিস কিনা

—আপনার চরণ ছুঁয়ে বলছি—

চৌধুরী বলিল—এইবার চরণ দু'টিকে আমাকে সিকেয় তুলতে হবে বাবা। তাতে তোরই খারাপ হবে। রেজেষ্ট্রি অফিসে যাওয়া হবে না, তুইও টাকা পাবি না। খোঁজ না করে আমি টাকা কাউকে দিই না, দোবও না।

অনিরুদ্ধ তবু উঠিল না। শ্রান্ত ক্লান্ত দেশান্তরী উদাসীনের অকস্মাৎ প্রিয়জনকে মনে পড়িয়া যেমন বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ জাগে, অনিরুদ্ধের আজ তেমনি ব্যাকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে আবার সেই পূর্বের সংযত সচ্ছল জীবনে ফিরিবার জন্য। সেই ফিরিবার পথের পাথেয় চাই তাহার। চার বছরের বাকী খাজনা সালিয়ানা পঁচিশ টাকা দশ আনা হিসাবে একশত আড়াই টাকা; সিকি সুদ পাঁচশো টাকা দশ আনা—একুনে একশো আটাশ দু'আনা, খরচা লইয়া একশো চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ, দেড়শো টাকাই ধরিয়া রাখা ভাল। আরও একশো চাই। সে বলদ এক জোড়া কিনিবে। জমি ভাগে না দিয়া, একটি কৃষাণ রাখিয়া সে বাপ-ঠাকুরদার মতই ঘরে চাষ করিবে। তাহার নিজের জমি তের বিঘা। তাহার সঙ্গে অন্য কারও বিঘাপাঁচেক জমি সে ভাগে লইতেও পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে জংশন শহরের ধানকলে বা তেলকলে একটা চাকরিও লইবে। রাত্রি থাকিতে সে উঠিবে, গরু দুটাকে আপন হাতে খাইতে দিবে। কৃষাণ হাল লইয়া যাইবে, সেই সঙ্গে সে-ও বাহির হইবে—একেবারে সারাদিনের মত সাজিয়া গুছাইয়া। জমিগুলি দেখিয়া-শুনিয়া ওই পথেই চলিয়া যাইবে সে জংশনে কলের কাজে। ফিরিবার পথে আবার একবার মাঠ ঘুরিয়া বাড়ী আসিবে! মদ খাইতে হয়—একটু না খাইলে সে বাঁচিবে না—বোতল কিনিয়া আনিয়া বাড়ীতে রাখিবে, পদ্ম মাপিয়া ঢালিয়া দিবে—ব্যাস! কলের মাইনে দৈনিক আট আনা হিসাবে চারিটা রবিবার বাদ দিয়া তের টাকা,—বৎসরে একশো ছাপ্পান্ন টাকা নগদ আয়। ধান, কলাই, গুড়, গম, যব, তিসি, সরিষা হইবে চাষে। নজরবন্দীর বাড়ীভাড়া আছে মাসিক

দশ টাকা। ওটা অবশ্য স্থায়ী আয় নয়। এ ছাড়াও সে বাড়ীতে আবার কামারশাল, খুলিবে। রাত্রে যাহা পারে, যতটুকু পারে করিবে; দৈনিক দু'গণ্ডা পয়সা রোজগার হইলেও তাহাতেই তাহার দৈনিক নুন-তেলের খরচা তো চলিয়া যাইবে। ঋণ শোধ দিতে তাহার কয় দিন! ঋণ শোধ দিয়া সে আরম্ভ করিবে সঞ্চয়; সঞ্চয় হইতে সুদি কারবার। খৎ-তমস্থকে নয়, জিনিস-বন্ধকী কারবার। ঘাটতি নাই পড়তি নাই, বৎসরে একটি টাকা দু'টাকায় পরিণত হইবে। ইহার উপর তাহার বাকুড়ির আরো আধ হাত মাটি তুলিয়া সে যদি গর্ত করিতে পারে —তবে বাকুড়িতে হাজাশুকা থাকিবে না। মাটি তুলিয়া গাড়ি-গাড়ি সার এবং মরা পুকুরের পাঁক ঢালিয়া দিবে। উনো ফসল দুনো হইবে।

চৌধুরী বলিল—বসে থাকলে তো টাকা মিলবে না, অনিরুদ্ধ। আমি খোঁজ-খবর করি, তারপর এদিকে বেলাও যে দশটা হল। আমার আবার ইস্কুল আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল, আজই চলুন কঙ্কণা, রেজেস্টারী আপিসে খোঁছ করুন।

হাসিয়া চৌধুরী বলিল—আজই? তোর অশ্বতর যে পক্ষীরাজের চেয়েও জিন্দে দেখছি, থামতে চায় না। বেশ বস্ তুই। আমি চান করে দুটো খেয়ে নি। চল আমার সঙ্গে। টিফিনের সময় খোঁজ করব।

টিফিনেও খোঁজ শেষ হইল না। চৌধুরী বলিল—আবার সেই শেষ ঘণ্টা, তিনটে-দশের পর আবার অবসর। তুই তা হলে বস্।

শেষ ঘণ্টায় হেড্ পণ্ডিত চৌধুরীর ধর্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতার ক্লাস। এ ক্লাসটার সময় চৌধুরী প্রায়ই ছেলেদের স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অবকাশ দিয়া রেজেষ্ট্রি আপিসের কাজগুলি সারিয়া থাকে। দলিল-দস্তাবেজ বাহির করে, কোথায় কি নিল, কি বেচিল, কে কি বন্দক দিল ইত্যাদি সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখে।

অনিরুদ্ধ সেই অপেক্ষা করিয়া রহিল। সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। সে খানকয়েক বাতাসা কি দুই টুকরা পাটালীর প্রত্যাশায় পরাণ ময়রার দোকানে বসিয়া পরাণের তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। পাটালী-বাতাসা মিলিল না, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা সে ভুলিয়া গেল; পরাণের বিধবা ভাগ্নী দোকান করে, তাহার সঙ্গে বেশ আলাপ জমাইয়া ফেলিল। একটা হইতে তিনটা—দুই ঘণ্টা সময় যেন মেয়েটার হাসির ফুঁয়ে উড়িয়া গেল!

চৌধুরী আসিয়া বলিল—দেখা আমার হয়ে গেল অনিরুদ্ধ, বুঝলি?

—হয়ে গেল আজ্ঞে?

—হ্যাঁ, তোকে আর ডাকি নাই। দেখলাম গল্পেতে খুব জমে গিয়েছিস রসভঙ্গ করা পাপ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ! বলিয়া চৌধুরী হাসিল।

অনিরুদ্ধ একটু লজ্জিত হইল।

—টাকা আমি দোব।

—দেবেন ? উৎসাহে অনিরুদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তোর তো আজ সারাদিন খাওয়া হল না রে !

—তা এই বাড়ী গিয়ে—এই তো কোশখানেক পথ আজ্ঞে।

আনন্দের আবেগে অনিরুদ্ধ কোন কথাই শেষ করিতে পারিল না।

—আচ্ছা, পরশু আসিস্। তাহলে শীগ্‌গির বাড়ী যা। মেঘ উঠেছে। ঝড় জল হবে মনে হচ্ছে। চৌধুরী চলিয়া গেল।

মেয়েটি বলিল—তুমি খাও নাই এখনো ?

—তা হোক। এই কতক্ষণ ! বোঁ বোঁ করে চলে যাব।

—এই বাতাসা ক'খানা ভিজিয়ে জল খাও। খাও নাই—বলতে হয় !

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া অনিরুদ্ধ যেন বাঁচিল। টাঙিটা হাতে করিয়া সে নামিয়া হন্‌হন্ করিয়া বাড়ী চলিল। কিন্তু কঙ্কণার প্রান্তে আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতে ঝড় উঠিয়া পড়িল। পৌষের পর হইতে বৃষ্টি হয় নাই। চারিদিক রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। চৈত্র মাসের মাঝামাঝিতেই যেন বৈশাখের চেহারা দেখা দিয়াছে। অকালেই উঠিয়া পড়িয়াছে কালবৈশাখীর ঝড়। দেখিতে দেখিতে চারদিক অন্ধকার হইয়া গেল ; দুর্দান্ত ঝড়ের তাড়নায় পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত পিঙ্গল ধূলায় ধূসর হইয়া উঠিল, তাহার উপর ঘনাইয়া আসিল—দ্রুত আবর্তনে আবর্তিত পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের ঘন ছায়া। দু'য়ে মিলিয়ে সে এক বিচিত্র পিঙ্গলাভ অন্ধকার। গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ঝড়ের সে কি দুর্দান্তপনা !

অনিরুদ্ধ আশ্রয় লইল একটা গাছতলায়। শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতও হইতে পারে। কিন্তু উপায় কি ? আবার কে এখন এই দুর্যোগে গ্রামের মধ্যে ছুটিয়া যায় ! আর মরণ তো একবার !

সোঁ-সোঁ শব্দে প্রবল ঝড়। ঝড়ে চালের খড় উড়িতেছে, গাছের ডাল ভাঙিতেছে। বিকট শব্দে ওই কার টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই নামিল ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি, দেখিতে দেখিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বর্ষণ। আঃ, পৃথিবী যেন বাঁচিল ! ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ভিজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠিতে লাগিল।

বৈশাখের আগে এ অকাল-বৈশাখী ভাল নয়। 'চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর, জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।' ভাগ্য ভাল শিল পড়িল না। তবে একটা উপকার হইল, জমিতে চাষ চলিবে। এ সময়ে একটা চাষ পাঁচ গাড়ি সারের সমান। কাটা ধানের গোড়াগুলি উল্টাইয়া দিবে, সেগুলি

মাটির ভিতর পচিতে পাইবে। রোদে বাতাসে মাটি কোঁপরা নরম হইবে। হাতে তুলিয়া ধরিলেই এলাইয়া পড়িবে আদরিণী মেয়ের মত।

*　　*　　*

ঝড়-জল থামিতে সন্ধ্যা ঘুরিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি, ক্রোশখানেক দীর্ঘ মেঠো পথ, মাঠে কাদা কাদা হইয়া উঠিয়াছে, গর্তে জল জমিয়াছে। জায়গায় জায়গায় জলের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়া জমিয়াছে খড়কুটাপাতা—নানা আবর্জনা। চারিদিক ব্যাঙগুলার জলের সাড়ায় ও স্বাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিষধর সরীসৃপের সাড়া পাওয়া যাইতেছে,—সুদীর্ঘ দেহ লইয়া সর্‌সর্ শব্দে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু অনিরুদ্ধের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। টাঙিটা হাতে করিয়া সে নির্ভয়ে চলিতে চলেতে গান ধরিল। সাপ! সাপের প্রাণের ভয় নাই? উচ্চকণ্ঠে গান শুধু তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি নয়, সরীসৃপদের প্রতি সরিয়া যাইবার নোটিশ। সে নোটিশ সত্ত্বেও যদি কাহারও দুর্মতি হয়—মাথা তুলিয়া গর্জন করে, তবে তাহার হাতে আছে এই টাঙি। সাপ—! সে হাসিল। যেবার সে দুইখানা জমি কাটিয়া একখানা বাকুড়িতে পরিণত করে, সেবারে একটা পুরানো পগার কাটিবার সময় কালকেউটে মারিয়াছিল বারোটা। তাহার মধ্যে পাঁচটা ছিল চার হাত করিয়া লম্বা। সাপ কি অপর জানোয়ারকে সে ভয় করে না। ভয় তাহার মানুষকে। ছিরুকে আগে গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু শ্রীহরি এখন আসল কালকেউটে। চৌধুরীও ভীষণ জীব।

ঝড়ে গ্রামটা তছনছ করিয়া দিয়াছে।

গাছের ডাল ভাঙিয়াছে, পাতায় খড়ে পথঘাটে আর চলা যায় না। চণ্ডী-মণ্ডপের ষষ্ঠীতলায় বকুলগাছটার বড় ডালটাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চালের খড় সকলেরই কিছু-না কিছু উড়িয়াছে। হরেন্দ্র ঘোষাল একখানা ঘর করিয়াছিল গম্বুজের মত, উঁচুতে প্রায় মাঝারি তালগাছের সমান। সেইখানার চালটাকে একেবারে উপড়াইয়া হরিশ মোড়লের পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছে। বায়েন-পাড়া, বাউড়ীপাড়ার দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। আলপাতা এবং খড়ে ছাওয়ানো ঘরগুলির আচ্ছাদন বলিতে কিছু রাখে নাই। তাহার উপর বর্ষণে দেওয়াল গলিয়া মেঝে ভিজিয়া কাদা সপ-সপ করিতেছে।

যাক, দেবু-ভায়ের কিছু যায় নাই। আহা, বড় ভাল লোক দেবু-ভাই। জগনের ডাক্তারখানার কেবল বারান্দার চালটা আধখানা উল্টাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য, শ্রীহরি বেটার কোন ক্ষতি হয় নাই! টিনের ঘরে বেটা লোহার দড়ির

টানা দিয়াছে। এই রাত্রেই রাঙাদিদি ঘরের খড়কুটা পরিষ্কার করিতে করিতে দেবতাকে গাল পাড়িতেছে।

আপনার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অনিরুদ্ধ দাঁড়াইল।

দাওয়ায় বসিয়াছিল যতীন, সে বই পড়িতেছিল, প্রশ্ন করিল—কে?

—আজ্ঞে, আমি। অনিরুদ্ধ।

—কোথায় ছিলেন সমস্ত দিন?

—কাজে গিয়েছিলাম বাবু।

কথাটা বলিয়া অনিরুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যেও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চালের দিকে চাহিয়া দেখিল।

যতীন একটু আশ্চর্য হইয়া গেল—অনিরুদ্ধ আজ সুস্থ কথাবার্তা বলিতেছে। এ অবস্থাটা যেন অনিরুদ্ধের পক্ষে অস্বাভাবিক। সে আবার প্রশ্ন করিল—শরীর ভাল আছে তো? কি দেখছেন?

—দেখছি চালের অবস্থা।

নাঃ, উড়ে নাই কিছু। কেবল কোঠাঘরের পশ্চিমদিকের চালের খড়গুলা আতঙ্কিত সজারুর কাঁটার মত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

—আসছি বাবু, অনেক কথা আছে।

সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। কিছু খাইতে হইবে। পেট হু-হু করিয়া জলিতেছে।

পদ্ম বাড়ীর উঠান হইতে পথঘাট পর্যন্ত সব ইহারই মধ্যে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। ওই যে ওপাশের দাওয়ায় বসিয়া রহিয়াছে, ওটা কে? একটা ছেলে! কে? ও, বাইণ্ডুলে তারিণীর সেই ছেলেটা! জংশনে ভিক্ষা করিতে করিতে এখানে আসিয়া জুটিল কি করিয়া? পদ্মের কাছে আসিয়া বলিল—ওটা কোথা থেকে এল?

অনিরুদ্ধকে সুস্থ দেখিয়া পদ্মও অবাক হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ এবার ছেলেটাকে বলিল—এখানে কোথা থেকে এসে জুটলি?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—নজরবন্দী নিয়ে এসেছে আজ জংশন থেকে, বাবুর চাকর হবে।

—হুঁ, যত মড়া গাঙের ঘাটের জড়ো! দে, এখন খেতে দে দেখি। ঘরে কি আছে?

শুনিবামাত্র পদ্ম সঙ্গে সঙ্গেই উঠিল। যাইতে যাইতে বলিল—জংশন ইষ্টিশানে কার কি চুরি করেছিল, লোকে ধরে মারছিল—নজরবন্দী ছেলে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

অনিরুদ্ধ বিরক্ত হইয়া উঠিল। কোন্‌দিন আবার তাহার বাড়ীর কিছু কিংবা ওই নজরবন্দীর কিছু চুরি করিয়া না পালায় ছেলেটা। সে রূঢ়স্বরে বলিল—এই ছোঁড়া, কোথায় চুরি করিয়াছিলি? কি চুরি করেছিলি?

ছোঁড়া ভীত অথচ ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত মাথা হেঁট করিয়া আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

পদ্ম বলিল—কি ধারার মানুষ গো তুমি? নিয়ে এসেছে অন্য একজনা, তোমার বাড়ীতে তো আসে নাই ও। তুমি বকছ কেন বল তো? তা ছাড়া ছেলেমানুষ, অনাথ,—ওর দোষ কি? যা রে বাবা, তুই উঠে তোর মুনিবের ওই দিকে যা।

ছোঁড়াটা কিন্তু তেমনি ভঙ্গিতে সেইখানে বসিয়াই রহিল, নড়িল না।

একুশ

'চাষ আর বাস' পল্লীর জীবনে দুইটা ভাগ। মাঠ আর ঘর—এই দুইটি ক্ষেত্রেই এখানে জীবনের সকল আয়োজন—সকল সাধনা। আষাঢ় হইতে ভাদ্র—এই তিন মাস পল্লীবাসীর দিন কাটে মাঠে—কৃষির লালন-পালনে। আশ্বিন হইতে পৌষ সেই ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে—সঙ্গে সঙ্গে করে রবি ফসলের চাষ। এ সময়টাও পল্লীজীবনের বারো আনা অতিবাহিত হয় মাঠে। মাঘ হইতে চৈত্র পর্যন্ত তাহার ঘরের জীবন। ফসল ঝাড়িয়া, দেনা-পাওনা মিটাইয়া সঞ্চয় করে, আগামী চাষের আয়োজন করে; ঘরের ভিতর-বাহির গুছাইয়া লয়। প্রয়োজন থাকিলে নূতন ঘর তৈয়ারী করে, পুরানো ঘর ছাওয়ায়, মেরামত করে; সার কাটিয়া জল দেয়, শন পাকাইয়া দড়ি করে। গল্প-গান-মজলিস করে, চোখ বুজিয়া হরদম তামাক পোড়ায়, বর্ষার জন্য তামাক কাটিয়া গুড় মাখাইয়া হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া জলের ভিতর পুঁতিয়া পচাইতে দেয়। চাষীর পরিবারের যত বিবাহ সব এই সময়ে—মাঘ ও ফাল্গুনে। জের বড় জোর বৈশাখ পর্যন্ত যায়। হরিজনদের চৈত্র মাসেও বাধা নাই, পৌষ হইতে চৈত্রের মধ্যেই বিবাহ তাহারা শেষ করিয়া ফেলে।

অকালে—চৈত্র মাসের মাঝামাঝি এই অকাল—কালবৈশাখীর ঝড়জলে সেই বাঁধাধরা জীবনে একটা ধাক্কা দিয়া গেল। ভোরবেলায় শনের দড়ি পাকানো ছাড়িয়া সবাই মাঠে গিয়া পড়িল। প্রবীণদের সকলের হাতেই হুঁকা। অল্পবয়সীদের কোঁচড়ে অথবা পকেটে বিড়ি-দেশলাই, কানে আধপোড়া বিড়ি। সকলে আপন আপন জমির চারিপাশের আইলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উঁচু ডাঙা জমিতে দুই-চারিজন আজই লাঙলের চাষ দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নিম্নভূমি—জোলান্ জমিগুলিতে এখনও জল জমিয়া আছে, দুই-চারিদিন গিয়া খানিকটা না শুকাইলে এ সব জমিতে চাষ চলিবে না। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে তরি-তরকারির চারাগুলি মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুর মত এতদিন কোনমতে বাঁচিয়া ছিল। এইবার মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত দশ দিনে দশ-মূর্তি হইয়া উঠিবে। তিলের ফুল সবে ধরিতেছে, জলটায় তিলের খানিকটা উপকার হইবে। তবে অপকারও কিছু হইয়া গেল,—যে ফুলগুলি সদ্য ফুটিয়াছিল, এই বর্ষণে তাহার মধু ধুইয়া যাওয়ায় তাহাতে আর ফল ধরিবে না। এইবার আখ লাগানো চলিবে। জলটায় উপকার হইয়াছে অনেক। তবে গ্রামে ঘর-বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর। তাহার আর কি করা যাইবে?

গ্রামের মেয়েরা ঝড়ে বিপর্যস্ত বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। কোমরে কাপড় বাঁধিয়া খড়-কুটা জড়ো করিতেছে,—সমস্ত সারে ফেলিতে হইবে। ছেলের দল আমবাগানে ছুটিয়া সেই ভোরবেলায় কোঁচড় ভরিয়া আমের গুটি কুড়াইতেছে। হরিজনদের মেয়েরা ঝুড়ি কাঁখে পথে-ঘাটে-বাগানে পাতা-খড়-কাঠি শুকনা ডাল-পাতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড বোঝা বাঁধিয়া ঘরে আনিয়া ফেলিতেছে; জ্বালানি হইবে। তাহাদের নিজেদের ঘর-দুয়ার এখনও সাফ হয় নাই। পুরুষেরা যে-যার কাজে গিয়াছে। কেহ চাষী-গৃহস্থবাড়ীর বাঁধা-কাজে, কেহ জংশনে কলের কাজে, কেহ ভিন-গাঁয়ে দিন-মজুরিতে।

দুর্গা আপনার ঘরে বসিয়াছিল। তাহার কাজ বাঁধা-ধরা। তাহার বাহিরে সে যায় না। সে এই সব পাতা-কুটা কুড়াইয়া কখনও জ্বালানি করে না। জ্বালানি সে কেনে। ভোরবেলায় একদফা দুধ দোহাইয়া সে নজরবন্দীবাবুকে দিয়া আসিয়াছে; পথে বিলু-দিদিকেও খানিকটা দিয়া, সেইখানেই চা খাইয়া, বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে। আগে আগে কিছুদিন সে চা খাইত কামার-বউয়ের বাড়ীতে; কামার-বউ নজরবন্দীবাবুর চা করিত, নজরবন্দীকে চা দিয়া বাকিটা পদ্ম এবং দুর্গা খাইত। কিন্তু সেদিন পদ্মের সেই রূঢ় কথার পর আর সে কামার-বউয়ের বাড়ীর ভিতর যায় না। বাহিরে-বাহিরেই নজরবন্দীবাবুর দুধের যোগান দিয়া, দুই-চারটা কাজ-কর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া আসে। নজরবন্দীও আজ কয়েক দিন তাহাকে কোন কথা বলে নাই। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, কাল হইতে সে আর নিজে দুধ দিতে যাইবে না; মাকে দিয়া পাঠাইয়া দিবে। যে মানুষ কথা কয় না, তাহাকে যাচিয়া কথা বলা তাহার অভ্যাস নাই।

দুর্গার মা উঠান সাফ করিতেছিল; বউটা ডাল-পাতা-খড়-কুটা কুড়াইতে গিয়াছে। পাতু আপনার ছেলেটাকে লইয়া বসিয়া আছে দাওয়ার উপর। লোকে বলে ছেলেটা নাকি দেখিতে অনেকটা হরেন ঘোষালের মত হইয়াছে, কিন্তু তবু

পাতু ছেলেটাকে বড় ভালবাসে। বছর খানেকের মধ্যে পাতুর অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অবস্থা এবং প্রকৃতি দুয়েরই। পূর্বে পাতু বায়েন বেশ মাতব্বর লোক ছিল। আচারে-ব্যবহারে বেশ একটু ভারিক্কী চাল দেখাইয়া চলিত। তখন পাতুর চালচল্‌তি দেখিয়া লোকে হিংসা করিত। ভাগাড়ের চামড়া হইতে তাহাদের ছিল মোটা আয়। চামড়া বেচিত, কতক চামড়া নিজে পরিষ্কার করিয়া ঢোল, তবলা, বাঁয়া, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছাইয়া দিত। পাতুর ছাওয়া খোল তবলার শব্দের মধ্যে কাঁসার আওয়াজের মিঠা রেশ বাজিত। এই ভাগাড় হইতেই আসিত তাহার আয়ের বারো আনা। বাকি সিকি আয় ছিল চাকরান-জমির চাষ এবং এখানে-ওখানে ঢাকের বাজনা হইতে। ভাগাড়টা এখন হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে। জমিদার টাকা লইয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে। বন্দোবস্ত লইয়াছে আলেপুরের রহমৎ শেখ এবং কঙ্কণার রমেন্দ্র চাটুজ্জে।

চাকরান-জমিও পাতুর গিয়াছে, সে-জমি এখন জমিদারের খাসখতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। জমিটা পাতু নিজেই ছাড়িয়া দিয়াছে। না দিয়াই বা উপায় কি ছিল? তিন বিঘা জমি লইয়া বারোমাস পাসে-পার্বণে ঢাক বাজাইয়া কি হইবে? যেদিন বাজাইতে হইবে সেই দিনটাই মাটি। তার চেয়ে সে বরং নগদ মজুরিতে এখানে-ওখানে বাজনা বাজাইয়া আসে—সে ভাল। বায়না থাকিলে পরিষ্কার কাপড়ের উপর চাদর বাঁধিয়া ঢাক কাঁধে লইয়া পাতু বাহির হয়, ফিরিয়া আসে দুই-একটি টাকা লইয়া; উপরন্তু দুই-একটা পুরানো জামা-কাপড়ও লাভ হয়। প্রায় বারোটা মাসই সে এখন বেকার। জন-মজুর খাটিতেও পারে না। বাদ্যকর-বায়েন বলিয়া তাহার একটি সম্ভ্রম আছে, সে জন-মজুর খাটিবে কেমন করিয়া? বসিয়া বসিয়া সে ভাগাড় বন্দোবস্ত লওয়ার কথাটাই ভাবে। তাহার চেয়েও ভাল হয় যদি চামড়ার বাবসায় করিতে পারে। তাহাদেরই স্বজাতি নীলু বায়েন—এখন অবশ্য নীলু দাস—চামড়ার ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি ধনী হইয়াছে। এখন সে কলিকাতায় থাকে, মস্ত বড় চামড়ার ব্যবসা। মস্ত বাড়ী করিয়াছে, বাড়িতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে সব দেখিবার জন্য এম-এ, বি-এল পাস করা একজন সরকারী হাকিম—সরকারী চাকরি ছাড়িয়া তাহার ম্যানেজারি করিতেছে। প্রকাণ্ড বসতবাড়ী, হাওয়া-গাড়ী, ঠাকুর-বাড়ী আছে। দেশে আপনার গ্রামে কঙ্কণার বাবুদের মত ইস্কুল ও হাসপাতাল করিয়া দিয়াছে। তাহার ছেলে নাকি লাটসাহেবের মেম্বার। পাতু চামড়া ব্যবসায় ও ভাগাড় বন্দোবস্ত লইবার কল্পনা করে, সঙ্গে সঙ্গে এমনি ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখে!

বারোমাস জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে তাহার স্ত্রী এবং দুর্গা। যে পাতু একদা দুর্গাকে কঠিন ক্রোধে লাঞ্ছিত করিয়াছিল—ছিরু পালের প্রতি প্রীতির জন্য,

সেই পাতু হরেন ঘোষালের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ছেলেটাকে ভালবাসে—দিনরাত আদর করে। মধ্যে মধ্যে ঘোষালের কাছে যায়, আবদার করিয়া বলে—আজ চার আনা পয়সা কিন্তু দিতে হবে, ঘোষালমশায়!

দুর্গা নৈশ-অভিসারে যায় কঙ্কণায়, জংশনে। প্রতীক্ষমান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে—সঙ্গে কে ও? অন্ধকারে অস্পষ্ট মূর্তিটি সরিয়া যায়, দুর্গা বলে—ও আমার সঙ্গে এসেছে।

—কে?

—আমার দাদা!

অস্পষ্ট মূর্তি হেঁট হইয়া নীরবে নমস্কার করে।

দুর্গা বলে—একটা সিগারেট দেন, ও ততক্ষণে বসে বসে থাক।

বাবুদের বাগান-বাড়ীর কোন গাছতলায় অথবা বারান্দায় সিগারেটের আগুনের আভায় পাতুকে তখন চেনা যায়। আসিবার সময় সে একটা মজুরি পায়—চার আনা হইতে আট আনা; দুর্গা আদায় করিয়া দেয়।

সেদিন পাতু মন স্থির করিয়া বার বার দুর্গাকে বলিল—পঁচিশ টাকা বই তো লয়! দে না দুগ্‌গা, ভাগাড়টা জমা নিয়ে লি।

দুর্গা বলিল—সে হবে। আজ এখনই দু'টো গাছের তালপাতা কেটে আনগা দিকি, ঘরটা তো ঢাকতে হবে।

এই তাহাদের চিরকালের ব্যবস্থা। উড়িলে কি পুড়িলে ঘরের জন্য ইহারা ভাবে না। পুড়িলে কাঠ-বাঁশের জন্য তবু ভাবনা আছে; উড়িলে সেটা ইহারা গ্রাহ্য করে না। মাঠে খাস-খামারের পুকুরের পাড়ের অথবা নদীর বাঁধের উপরের তালগাছ কাটিয়া আনিয়া ঘর ছাইয়া ফেলে। শুধু পুরুষদের ফিরিবার অপেক্ষা—কাজ হইতে ফিরিয়া তাহারা গাছে উঠিয়া পাতা কাটিবে মেয়েরা মাথায় তুলিয়া ঘরে আনিবে। দু-চারিজন মেয়েও গাছে চড়িয়া পাতা কাটে। দুর্গাও এককালে তালগাছে চড়িতে পারিত; কিন্তু এখন আর গাছে চড়ে না। প্রয়োজনও নাই, তাহার কোঠাঘরের চালে বেশ পুরু খড়ের ছাউনি—মজবুত বাঁধনে বাঁধা। তাহার চালের খড় কিছু বিপর্যস্ত হইয়াছে বিশৃঙ্খল হইয়াছে এইমাত্র, উড়িয়া যায় নাই। ও-গুলাকে আবার সমান করিয়া বসাইতে অবশ্য গোটা দু'য়েক মজুর লাগিবে। এ কাজ পাতুকে দিয়াই হইবে, তাহাকেই বরং দুই দিনের মজুরি দিবে।

দুর্গার কথার উত্তরে পাতু বলিল—হুঁ!

—হুঁ তো ওঠ।

—বউটো আসুগ আগে।

—বউ এলে পাঠিয়ে দোব, বউকে—যাকে; তুই এখন যা দিকি। পাতা কেটে ফেল গা যা।

দুর্গার মা উঠান পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল—মা লারবে বাছা। তুমি খেতে দিচ্ছ—তোমার 'তিলশুনো' খাটছি, উপায় নাই, আবার বেটার খাটুনি খাটতে লারব আমি। ক্যানে, কিসের লেগে? কখনো মা বলে দু-গণ্ডা পয়সা দেয়, না এক টুকরা ট্যানা দেয় যে ওর লেগে আমি খাটব?

পাতু হুঙ্কার দিয়া উঠিল—আমরা দিই না তোর কোন্ বাবা দেয় শুনি?

—শুনলি দুগ্‌গা, বচন শুন্‌লি 'খাল্‌ভরার'?

দুর্গা বাধা দিয়া বলিল—থাম্‌বাপু তোরা। তোর গিয়েও কাজ নাই, চেঁচিয়েও কাজ নাই। বউ আস্থক—আমরা দু-জনায় যাব। দাদা তু এগিয়ে চল।

কোমরে কাটারি গুঁজিয়া পাতু আসিয়া উঠিল নদীর ধারে। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধটা নদীর সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া পূর্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। বাঁধের গায়ে সারিবন্দী অসংখ্য তালগাছ এবং শরগাছ। পাতু বাছিয়া বাছিয়া ঢলকো পাতা দেখিয়া একটা গাছে চড়িয়া বসিল।

ওই খানিক দূরে গাছের উপর 'আখনা' অর্থাৎ রাখহরি বাউড়ি পাতা কাটিতেছে। তার ওধারের গাছটায়—ও কে? পুরুষ নয়, মেয়ে। আখনার বউ পরী। এ পাশে ওই গাছটায়ও ওটা কে? পাতু ঠাহর করিতে না পারিয়া ডাকিল—কে রে উখানে?

—আমি গণা অর্থাৎ গণপতি।

—আর কে বটে?

—আমার পাশে বাঁকা, হুই রয়েছে ছিদাম। হুই মতিলাল।

গাছে চড়িয়াই সব আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। সহসা এদিকে আখনা চীৎকার করিয়া উঠিল—হুই! হুস হুই ধা! উঃ! হুস ধা, উঃ! বাবা রে, মেরে ফেলাবে লাগচে! হিশ, ঠোঁটের ঢাড় কি রে বাবা!

আখনার জিহ্বার একটু জড়তা আছে, স্পষ্ট কথা বাহির হয় না।

আখনাকে দুইটা কাক আক্রমণ করিয়াছে। মাথার উপর কা-কা করিয়া উড়িতেছে, আর ঠোঁট দিয়া ঠোকর মারিতেছে। গাছটায় কাকের বাসা আছে। ও-পাশে পরী, স্বামীকে গাল পাড়িতেছে—ড্যাকরা বাঁশবুকোকে দশবার যে মানা করলাম, কাগের বাসা আছে, উঠিস্ না! কেমন হইছে—বলিতে বলিতে আপনার বিব্রত অবস্থা দেখিয়া সে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

দূরে ভুম্ করিয়া একটা শব্দ উঠিল। সর্বনাশ! কে পড়িয়া গেল? ওঃ, ভাদ্রমাসের পাকা তালের মত পড়িয়াছে। ফাটিয়া গেল না তো? না, মরে নাই, নড়িতেছে। যাক—উঠিয়া বসিয়াছে। বাপ রে! আচ্ছা শক্ত জান্! নদীর ধারের ভিজা মাটি—তাই রক্ষা! কিন্তু লোকটা কে?

—কে বটিস রে?

লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল—সাপ!

সাপ?

—খরিশ। যেমন ইদিকের পাতায় উঠতে যাব—অমনি শালা—ফোঁশ করে ফণা নিয়ে উঠেছে উদিকের পাতায়। কি করব, লাফিয়ে পড়লাম।

ফড়িং বাউড়ী। ছোঁড়া খুব শক্ত। খুব বাঁচিয়াছে আজ। সাপটা পাখীর ডিমের সন্ধানে খেঙো বাহিয়া গাছে উঠিয়াছে।

—ও রে বাবা! পাতুর জ্বালাও কম নয়; একটা পাতা কাটিতেই অসংখ্য পিঁপড়ে বাহির হইয়া তাহার সর্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। পাতু গামছাটা খুলিয়া গামছার আছাড়ে সেগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল।—দূর শালা, দূর! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ!

* * *

দুর্গা আয়না দেখিয়া নরুণ দিয়া দাঁত চাঁচিতেছিল। পরিষ্কার-পরিষ্কার দুর্গার একটা বাতিক। তাহার দাঁতগুলি শাঁখের মত ঝক-ঝক করা চাই। মধ্যে মধ্যে দাঁতে একটু আধটু পানের ছোপ পড়ে, খুব ভাল করিয়া দাঁত মাজিলেও যায় না। তখন সে নরুণ দিয়া ছোপের দাগ চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলে। বউ ফিরিলেই সে বউকে লইয়া পাতা বহিয়া আনিতে যাইবে। হাঙ্গামা অনেক; মাথায় চুলে ময়লা লাগিবে, সর্বাঙ্গ ধুলায় ভরিয়া যাইবে, কাপড়খানা আর পরা চলিবে না। কিন্তু তবু উপায় কি? মায়ের পেটের ভাই।

মা বলিল—বউ রেজেগার করছে, কখুনো একটা পয়সা দেয় আমাকে; শাশুড়ী বলে ছেদ্দা করে?

দুর্গা হাসিয়া বলিল—থাক মা, আর বলিস না; ওই পয়সা ছুঁতে হয়?

মা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ও-লো, সীতের বেটি সাবিত্তিরি আমার। তারপর সে আরম্ভ করিল তিন কালের কথা, তাহার নিজের মা-শাশুড়ীর আমলের শ্রুতিকথা, নিজেদের কালের স্মৃতি-কথা, বর্তমান যুগের প্রত্যক্ষ বধূ-কন্যার বিবরণ-কাহিনী। অবশেষে বলিল—বউ হারামজাদী সাবিত্তির, তখন ফণা কত? কত বলেছিলাম, তা নাক ঘুরিয়ে তখন বলত—ছি! এখন তো সেই 'ছি' তপ্তভাতে ঘি হইছে। সেই রোজগারে প্যাট চলছে, পরন চলছে!

পাড়ার ভিতর হইতে কে গালি দিতে দিতে আসিতেছিল। দুর্গা বলিল—থাম মা, থাম, আর কেলেঙ্কারি করিস না। নোক আসছে।

চীৎকার করিয়া গালি দিতেছিল রাঙাদিদি।

—হবে না, দুগ্‌গতি হবে না. আরও হবে। এর পর বিনি ঝড়ে উড়ে যাবে, বিনি আগুনে পুড়ে যাবে। ধানের ভেতর চাল থাকবে না, শুধু 'আগরা' হবে।

দুর্গা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি হল রাঙাদিদি ?

রাঙাদিদি সেই স্বরের ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ধম্মকে সব পুড়িয়ে খেলে মা। পিরথিমিতে ধম্ম বলে আর রইল না কিছু।

চীৎকার করিয়া দুর্গা বলিল—কি হল কি ? কে কি করলে ?

—ওই গাঁদা মিনসে গোবিন্দে ! এতকাল দিয়ে এসে আজ বলছে—না।

—কি দিচ্ছে না ?

—কি ? ক্যানে তুই আবার বেলাত থেকে এলি নাকি ? পাড়ার নোক জানে, গাঁয়ের নোক জানে, তুই জানিস না ? বলি তুই কে লা ছুঁড়ি ? একে তো চোখে দেখতে পাই না, তার ওপর মুখপোড়া স্থয্যির রোদের ছটা দেখ ক্যানে ? চিনতে লারছি, তুই কে ?

—আমি—দুগ্‌গা গো।

—দুগ্‌গা ? মরণ। আপন ঠেকারেই আছিস। পরের কথা মনে থাকে না—ক্যানে ? গোবিন্দের বাবা আমার কাছে দু-টাকা ধার নিয়েছিল—জানিস না ? বুড়ো ফি মাসে দু-আনা স্থদ আমাকে দিয়ে আসতো। তা ছাড়া—যখন ডেকেছি, তখনি এসেছে। ঘরে গোঁজা দিয়েছে, বর্ষায় নালা ছাড়িয়ে দিয়েছে। সে ম'ল, তারপর গোবিন্দ দশ-বারো বছর মাসে মাসে স্থদ দিয়েছে, ডাকলে এসেছে। আজ ডাকতে এলাম, তা বলে কি না—মোল্লান, অনেক দিয়েছি, আর স্থদও দোব না, আসলও দোব না, বেগারও দোব না।—আমি চললাম দেবুর কাছে। চার পো কলি, মা। এখন যদি সবাই এই বলে তো—আমার কি দুগ্‌গতি হবে !

এমন খাতক বৃদ্ধার অনেকগুলি আছে, অন্ততঃ দশ-বারো জন, দুই কুড়ির উপর টাকা পড়িয়া আছে। পুরুষানুক্রমে তাহারা স্থদ গণিয়া যাইতেছে, বৃদ্ধা মরিলে আর আসল লাগিবে না। তবে এমন মহাজন গ্রামে আরও কয়েকজন আছে। সকলেই প্রায় স্ত্রীলোক এবং তাহাদের ওয়ারিশ আছে। আসলে ইহাদের ঋণ-আইনের ধারাই এমনি।

বৃদ্ধা যাইতে যাইতে আবার দাঁড়াইল—বলি দুগ্‌গা শোন !

—কি বল ?

—এক জোড়া 'মাকুড়ি' আছে, লিবি ? সোনার মাকুড়ি।

—মাকুড়ি ? কার মাকুড়ি ? কার জিনিস বটে ?

—আয় আমার সঙ্গে। খুব ভাল জিনিস। জিনিস একজনার বটে, কিন্তু সে লেবে না। তা মাকুড়ি কি করব আমি ? তু লিস তো দেখ।

—না দিদি, আজ হবে না। আজ এখন তালপাতা আনতে যাব।

—মরণ, তুই আবার তালপাতা নিয়ে কি করবি।

—আমার নয়, দাদার লেগে।

—ও-রে দাদা-সোহাগী আমার। দাদার লেগে ভেবে ভেবে তো মরে গেলি।

বুড়ী আপন মনেই বক বক করিতে করিতে পথ ধরিল। কিছু দূর গিয়া এক গর্তের কাদায় পড়িয়া বৃদ্ধা মেঘকে গাল দিল, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়কারীকে গাল দিল, কয়েকটা ছেলে কাদা লইয়া খেলিতেছিল—তাহাদের চতুর্দশ পিতৃপুরুষকে গাল দিল। তারপর জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানার সম্মুখে ওষুধের গন্ধে নাকে কাপড় দিয়া ওষুধকে গাল দিল, ডাক্তারকে গাল দিল, রোগকে গাল দিল, রোগীকে গাল দিল। টাকা মারা যাইবার আশঙ্কায় বৃদ্ধা আজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর বাড়ীর কাছে আসিয়া ডাকিল—দেবু পণ্ডিত!

কেহ সাড়া দিল না। বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধা বাড়ী ঢুকিল—বলি কানের মাথা খেয়েছিস নাকি তোরা ? অ দেবু!

বিলু বাহির হইয়া আসিল—কে, রাঙাদিদি!

—আমার মতন কানের মাথা খেয়েছিস ; চোখের মাথা খেয়েছিস ? শুনতে পাস না ? দেখতে পাস না ?

বিলু ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসিল ; এ কথার কোন উত্তর দিল না। বুঝিল রাঙাদিদি বেজায় চটিয়াছে।

—সেই ছোঁড়া কই ? দেবা ?

—বাড়ীতে নেই, রাঙাদিদি!

—কি বল্লি—চেঁচিয়ে বল। গাড়ী কোথা গেল আবার ?

—গাড়ীতে নয়। বাড়ীতে নেই। চণ্ডীমণ্ডপে গেল।

—চণ্ডীমণ্ডপে ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা। সেখানে যাচ্ছি আমি। বিচার হয় কিনা দেখি। ভালই হল,

দেবুও আছে—ছিরুও আছে। কান ধরে নিয়ে আসুক হারামজাদাকে। এত বড় বাড় হয়েছে। ধম্ম নাই, বিচার নাই ?

বুড়ী বকিতে বকিতে চলিল চণ্ডীমণ্ডপের দিকে।

চণ্ডীমণ্ডপে তখন জমজমাট মজলিস।

ভূপাল বাগ্দী লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। ষষ্ঠীতলায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে—পাতু, রাখহরি, পরী, বাঁকা, ছিদাম, ফড়িং আরও জনকয়েক। পাশে পড়িয়া আছে কয়েক আঁটি তালপাতার বোঝা। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ জমিদারের সম্পত্তি ; সেখানকার তালগাছও জমিদারের। সেই গাছ হইতে পাতা কাটার অপরাধে ভূপাল সকলকে ধরিয়া আনিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীর মুখে গড়গড়া টানিতেছে। দেবু একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে পাতুদের দল। হরেন ঘোষাল নিজেই আসিয়াছে ; সে প্রজা-সমিতির সেক্রেটারী। চীৎকার করিতেছে সে-ই।

—ওরা চিরকাল পাতা কেটে আসছে, বাপ-পিতামহের আমল থেকে। ওদের স্বত্ব জন্মিয়ে গেছে।

ঘোষালের কথায় শ্রীহরি জবাবই দিল না। পাতু—সে বহুদিন হইতেই শ্রীহরির সঙ্গে মনে মনে একটি বিরোধ পোষণ করিয়া আসিতেছে—সে একটু উষ্ণভাবেই বলিল—পাতা তো চিরকাল কেটে আসা যায়, মাশায়। এ তো আজ লতুন নয় !

—চিরকাল অন্যায় করে আসছিলি বলে, আজও অন্যায় করবি গায়ের জোরে ? কাটিস, সেটা চুরি করে কাটিস।

দেবু এতক্ষণে বলিল—চুরি একে বলা চলে না শ্রীহরি ! আগে জমিদার আপত্তি করত না, ওরা কাটত। এখন তুমি গোমস্তা হিসাবে আপত্তি করছ—বেশ, আর কাটবে না। এর পর যদি না বলে কাটে, তখন চুরি বলতে পারবে !

ঘোষাল বলিল—নো, নেভার। ও তুমি ভুল বলছ, দেবু। গাছের পাতা কাটবার স্বত্ব ওদের আছে। তিন পুরুষ ধরে কেটে আসছে। তিন বছর ঘাট সরলে, পারে কেউ সে ঘাট বন্ধ করতে—না পথ বন্ধ করতে ?

হাসিয়া শ্রীহরি বলিল—গাছ ওটা, পুকুর নয় ঘোষাল, পথও নয়।

—ইয়েস, গাছ ইজ্ গাছ য়্যাণ্ড্ পথ ইজ্ পথ ; বাট্ ম্যান্ ইজ ম্যান্ আফ-টর অল্।

—কাল যদি জমিদার গাছগুলি বেচে দেয়, ঘোষাল, কি কেটে নেয়, তখন পাতার অধিকার থাকবে কোথা ? বাজে বকো না। শুধু খাসখামারের গাছ নয়,

মাল জমির ওপরের গাছ পর্যন্ত জমিদারের ; প্রজা ফল ভোগ করতে পারে, কিন্তু কাটতে পারে না।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার বুকের মধ্যে মুহূর্তে জাগিয়া উঠিল একটা বিস্মৃত ক্ষোভ। তাহাদের খিড়কির ঘাটে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল, কাঁঠাল অবশ্য পাকিত না, কিন্তু ইচড় হইত প্রচুর। তাহার আবছা মনে পড়ে, আসবাব তৈয়ারী করিবার জন্য জমিদার ঐ গাছটি কাটিয়াছিল। কিছু দাম নাকি দিয়াছিল, কিন্তু প্রথমে তাহার বাপ আপত্তি করায় ওই আইন-বলে জোর করিয়া কাটিয়াছিল। কত দিন তাহার বাবা আক্ষেপ করিত—আঃ, ইচড় হল গাছ-পাঁঠা। আর স্বাদ কি ইচড়ের !

দেবু বলিল—তা হলে তাই কর, শ্রীহরি, গাছগুলো সব কেটে নাও। প্রজারা ফল খাবে না।

শ্রীহরি হাসিল—তুমি মিছে রাগ করছ, দেবু খুড়ো। ওটা আমি, আইনের কথা, কথায় কথায় বললাম। জমিদার তা করবেন কেন ? তবে প্রজা যদি রাজার সঙ্গে বিরোধ করে, তখন আইনমত চলতে রাজারই বা দোষ কি ? বে-আইনী বা অন্যায় তো হবে না।

—কিন্তু এ গরীব প্রজারা কি বিরোধ করলে শুনি ? হঠাৎ এদের এ রকম ধরে আনার মানে ?

—ওদের জিজ্ঞেস কর। ওই প্রজা-সমিতির সেক্রেটারী বাবুকে জিজ্ঞেস কর।

তারপর হরিজনদের দিকে চাহিয়া শ্রীহরি বলিল—কি রে ? চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়াতে পয়সা নিবি না তোরা ?

কথাটা এতক্ষণে স্পষ্ট হইল। সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সকলেই অন্তরে অন্তরে একটা জ্বালা অনুভব করিল। সর্বাপেক্ষা সেটা বেশী অনুভব করিল দেবু। তালপাতার মূল্য এবং চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়ানোর মজুরির অসঙ্গতি তাহার হেতু নয়; তাহার হেতু সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে শ্রীহরির ভঙ্গি।

রাঙাদিদি খানিকক্ষণ আগে এখানে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; কানে ভাল শুনিতে পায় না, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা সে বুঝিল। তারপর বলিল—হঁ্যা ড্যাক্‌রা, তোরা চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়াবি না ? আস্পদ্দা দেখ, মাগো কোথা যাব !

হরেন ঘোষাল সুযোগ পাইয়া রাঙাদিকে ধমক দিল—যা বুঝ না, তা নিয়ে কথা বলো না রাঙাদিদি। চণ্ডীমণ্ডপ এখন কার ? চণ্ডীমণ্ডপ থাকল না থাকল তা ওদের কি ? ওদের তো ওদের—গাঁয়ের লোকেরই বা কি অধিকার আছে ? চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের। চণ্ডীমণ্ডপ নয়, এটা এখন জমিদারের কাছারি !

—তা রাজারও যা পেজারও তাই। রাজার হলেই পেজার।

দেবু হাসিয়া বেশ জোর গলাতেই বলিল—সে তো ওই তালপাতাতেই দেখছ, রাঙাদিদি।

—কে? দেবু?

—হ্যাঁ।

—তা বটে ভাই। তা—হ্যাঁ ছি-হরি তালপাতা বই তো লয়! তা যদি ওরা রাজার না লেবে তো পাবে কোথা?

শ্রীহরি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ধমক দিল—যাও, যাও, তুমি বাড়ী যাও। এসব কথায় তোমার কথা বলতে কেউ ডাকে নাই। বাড়ী যাও।

রাঙাদিদি আর সাহস করিল না। গ্রামের কাহাকেও সে ভয় করে না, কিন্তু শ্রীহরিকে সে সম্প্রতি ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধা ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ডাকিল,—দেবু বাড়ী আয়। ছেলেটা কাঁদছে তোর।

মিথ্যা বলিয়া সে দেবুকে ডাকিল। যে মানুষ দেবু! আবার কোথায় শ্রীহরির সঙ্গে কি হাঙ্গামা করিয়া বসিবে! আর ছেলেটা যত হাঙ্গামা করিতেছে তত সে যেন তাহাকে দিন দিন বেশী করিয়া ভালবাসিতেছে।

দেবু কিন্তু রাঙাদির ডাক শুনিল না। সে শ্রীহরিকে বলিল—ভাল শ্রীহরি, তুমি এখন কি করতে চাও শুনি?

—মানে?

—মানে, এদের যদি চুরি করেছে বলে চালান দিতে চাও, দাও। আর যদি তালপাতার দাম নিতে চাও, নাও! দশখানা তালপাতায় ডোমেরা একখানা তালপাতার চ্যাটাই দেয়। দাম তার দু-পয়সা। সেই এক আনা কুড়ি হিসাবে দাম দেবে ওরা।

—তা হলে ঝগড়াই করতে চাস তোরা? কি রে? শ্রীহরি প্রশ্ন করিল হরিজনদের।

—আজ্ঞে?

দেবু বলিল,—গুণে ফেল, কার কত তালপাতা আছে, গুণে ফেল।

সকলে তালপাতা গুণিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে শ্রীহরি ভীষণ হইয়া উঠিল। হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জনে সে এক হাঁক মারিয়া উঠিল—বস্। রাখ তালপাতা।

তাহার আকস্মিক দুর্দান্ত ক্রোধের এই সশব্দ প্রকাশের প্রচণ্ডতায় সকলে চমকিয়া উঠিল। হরিজনেরা তালপাতা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কেবল পাতু

তালপাতা ছাড়িয়াও সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ভবেশ, হরিশ শ্রীহরির পাশেই বসিয়াছিল, তাহারা চমকিয়া উঠিল। হরেন ঘোষাল প্রায় আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। সে কয়েক পা সরিয়া গিয়া বিস্ফারিত চোখে শ্রীহরির দিকে চাহিয়া রহিল। দেবু চমকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাউড়া ও বায়েনদের কাছে আসিয়া সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—থাক্ তালপাতা পড়ে, উঠে আয় তোরা এখান থেকে। আমি বলছি, ওঠ!

সকলে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার শীর্ণ মুখখানির সে এক অদ্ভুত তেজোদীপ্ত রূপ। সে দীপ্তির মধ্যে বোধ করি তাহারা অভয় খুঁজিয়া পাইল। তাহারা সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইল!

শ্রীহরি ডাকিল—ভূপাল! আটক কর বেটাদের।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল, তারপর পাতুদের বলিল—যে-যার এখান থেকে চলে যা। আমার গায়ে হাত না দিয়ে কেউ তোদের ছুঁতে পারবে না।

হরেন ঘোষাল দ্রুতপদে সকলের অগ্রগামী হইয়া পথ ধরিয়া বলিল—চলে আয়।

সকলের শেষে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল দেবু।

শ্রীহরির পিঙ্গল চোখ দুইটি ক্রুর শনিগ্রহের মত হিংস্র হইয়া উঠিল।

ঠিক ওই মুহূর্তেই রাস্তার উপর হইতে কে উচ্চকণ্ঠে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বলিয়া উঠিল—হরি-হরি বল ভাই, হরি-হরি বল! বলিয়াই হো হো করিয়া এক প্রচণ্ড উচ্চহাস্যে সব যেন ভাসাইয়া দিল।

সে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ হাততালি দিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া যেন নাচিতে লাগিল। শ্রীহরির এই অপমানে তাহার আর আনন্দের সীমা ছিল না।

শ্রীহরি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভবেশ, হরিশ প্রভৃতি প্রবীণ মাতব্বর—যাহারা তাহার অনুগত তাহারাও এ ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ভবেশই প্রথম কথা বলিল—ঘোর কলি, বুঝলে হরিশখুড়ো!

শ্রীহরি এবার বলিল—আমাকে কিন্তু আর আপনারা দোষ দেবেন না।

হরিশ বলিল—দোষ আর কি করে দিই ভাই; স্বচক্ষে তো সব দেখলাম।

—ভূপাল! শ্রীহরি ভূপালকে ডাকিল।

—আজ্ঞে।

—তোমার দ্বারা কাজ চলবে না, বাবা!

—আজ্ঞে! ভূপাল মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

ভবেশ বলিল—এতগুলো লোকের কাছে ভূপাল কি করত, বাবা ছি-হরি, ও বেচারার দোষ কি ?

—আজ্ঞে তার ওপর আমি চৌকিদার, ফৌজদারী আমি কি করে করি ? আপনি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার। আপনিই বলুন হুজুর।

শ্রীহরি বলিল—তুই একবার কঙ্কণায় যা। বাঁড়ুয্যে বাবুদের বুড়ো চাপরাসী নাদের শেখের কাছে যাবি। তাকে বলবি—তোমার ছেলে কালু সেখকে ঘোষ মশায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও ; ঘোষমহাশয় রাখবেন।

—কালু সেখ ? সভয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল ভবেশ।

—হ্যাঁ, কালু সেখ।

নাদের সেখ এককালের বিখ্যাত লাঠিয়াল। কালু তাহার উপযুক্ত পুত্র। তরুণ জোয়ান, শক্তিশালী, দুর্দান্ত সাহসী। দাঙ্গা করিয়া সে একবার কিছুকাল জেল খাটিয়াছে ; তারপর ডাকাতি অপরাধের সন্দেহে চালান গিয়াছিল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পাইয়াছে। কালু সেখ ভয়ঙ্কর জীব।

শ্রীহরি বলিল—অন্যায় আমি করব না, হরিশ-দাদা। কারু অনিষ্টও আমি করতে চাই না। কিন্তু আমার মাথায় যে পা দেবে, তাকে আমি শেষ করব, সে অন্যায়ই হোক আর অধর্মই হোক।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এই ছোটলোকের দল—বর্ষায় আমি ধান দিই তবে খায়—আজ আমাকে অমান্য করে উঠে গেল।

—ওই দেবু ঘোষ, সেটেল্‌মেন্টের সময় আমি ওর জমি-জমা সমস্ত নিভুর্ল করে লিখিয়েছি। দু-বেলা খোঁজ করেছি ওর ছেলের, পরিবারের। জান, হরিশদাদা—ফের যাতে ওর ইস্কুলের কাজটি হয়—তার জন্যেও চেষ্টা করেছিলাম। প্রেসিডেণ্টকেও বলেছি।

ভবেশ বলিল—কলিতে কারু ভাল করতে নাই, বাবা !

—কাল হয়েছে ওই নজরবন্দী ছোঁড়া। ও-ই এই সব করছে। কামার-বউটাকে নিয়ে ঢলাঢলি করছে। আর ঐ শালা কর্মকার—। কথা বলতে বলতে শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল।—নেমকহারামের গ্রাম। এক এক সময় মনে হয়—এ গাঁয়ের সর্বনাশ করে দিই।

হরিশ বলিল—তা বললে চলবে ক্যানে ভাই ! ভগবান তোমাকে বড় করেছেন, ভাণ্ডার দিয়েছেন, তোমাকে করতে হবে বৈ কি। এ-কথা তোমাকে সাজে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীহরি সহজ স্বরেই বলিল—হরিশ-দাদা, ষষ্ঠী-কাকাকে বলুন, এইবার কাজ আরম্ভ করে দিক। ইট তো তোমার পুড়ে

রয়েছে। ইস্কুলের মেঝে না হয় দশ দিন পরে হবে, জল পড়ুক ভাল করে ;—নইলে ফেটে যাবে মেঝে। কিন্তু সাঁকোটা এখন না করালে কখন করবে ? তার ওপর ওটা আমার কাজ নয়, আমি অবিশ্যি দশ টাকা দিয়েছি। কিন্তু সে ইউনিয়ন বোর্ডকে দিয়েছি—সাঁকো করবার জন্য। ইউনিয়ন বোর্ডকে আমি বলব কি ?

হরিশের ছেলে ষষ্ঠী শ্রীহরির পৃষ্ঠপোষকতায় আজকাল ঠিকাদারির কাজ করিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে শিবকালীপুরের রাস্তায় একটা সাঁকো হইবে, শ্রীহরি নিজে ইস্কুলের মেঝে বাঁধাইয়া দিবে। এ সবেরই ঠিকাদার ষষ্ঠীচরণ।

হরিশ বলিল—তোমার কাজেই সে এখন ব্যস্ত, ভাই। খাতাপত্র নিয়ে সকালে বসে, ওঠে সেই রাত্রে। তামাদির হিসেব তো কম নয় !

ষষ্ঠীচরণ শ্রীহরির গোমস্তাগিরির কাগজপত্র সারিয়া দেয়। চৈত্র মাসে বাকি-বকেয়ার হিসাব হইতেছে ; যাহাদের চার বৎসরের বাকি, তাহাদের নামে নালিশ হইবে। শ্রীহরির নিজের ধানের টাকার হিসাব আছে, তাহার তামাদি তিন বৎসরের। সে সবের হিসাবও হইতেছে।

ভূপাল চলিয়া গিয়াছিল ; বরাত খাটিবার উপযুক্ত অন্য কেহও ছিল না। নিরুপায়ে ভবেশ নিজেই তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। ষষ্ঠীতলার ধারে কাঠের ধুনি জ্বলে,—সেখানে বসিয়া কল্কেতে আগুন তুলিতে তুলিতে ভবেশ কাহাকে ডাকিল—কে রে ? ও—ছেলে !

একটি ছেলে একগুচ্ছ লালফুল হাতে করিয়া যাইতেছিল, ডাকিতে সে দাঁড়াইল।

—কে রে ? কি ফুল হাতে ? অশোক নাকি ?

ছেলেটি বৈরাগীদের নলিন, সে গিয়াছিল মহাগ্রামে পটুয়াদের বাড়ী। ঠাকুরদের বাগানে অশোক ফুল ফুটিয়াছিল, সেখান হইতে অশোক ফুলের একটি তোড়া বাঁধিয়া আনিয়াছে—নজরবন্দীকে দিবে। আরও কতকগুলি কলি সে আনিয়াছে, পণ্ডিতের বাড়ীতে—প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বিলাইবে। দুই দিন পরেই অশোকষষ্ঠী। অশোকের কলি চাই। নলিন অভ্যাসমত কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, অশোকের কলি।

—দিয়ে যা তো, বাবা। একটা ডাল দিয়ে যা তো।

নলিন অশোকের কয়েকটি ফুল নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীহরি বলিল—আমার পুকুরপাড়ের বাগানেও অশোকের চারা লাগিয়েছি।

সে একটা পুকুর কাটাইয়াছে। তাহার পাড়ে শখ করিয়া নানা জাতীয় গাছ লাগাইয়াছে। সবই প্রায় ভাল ভাল কলমের চারা।

বাইশ

অশোক ষষ্ঠীর দিন। এই ষষ্ঠী যাহারা করে, তাহাদের সংসারে নাকি কখনও শোক প্রবেশ করে না। "হারালে পায়, মলে জীয়োয়"। অর্থাৎ কোনও কিছু হারাইয়াও হারায় না, হারাইলে ফিরিয়া পায়—মরিলেও মরে না, পুনরায় জাবিত হয়, অশোক ষষ্ঠীর কল্যাণে। মেয়েরা সকাল হইতে উপবাস করিয়া আছে। ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া ব্রতকথা শুনিবে, অশোক ফুলের ছয়টি কলি খাইবে। প্রসাদী দই-হলুদ মিশাইয়া—তাহারই ফোঁটা দিবে ছেলেদের কপালে। তারপর খাওয়া-নাওয়া ; সে সামান্যই। অন্নগ্রহণ নিষেধ।

বারো মাসে তেরো ষষ্ঠী! মাসে মাসে স্বর্গ হইতে আসে ষষ্ঠীদেবীর নৌকা, বারো মাসে তেরো রূপে তিনি মর্ত্যলোকে আসেন—পৃথিবীর সন্তানদের কল্যাণের জন্য। সিঁথিতে ডগ্‌ডগ্ করে সিঁদুর, হাতে শাখা, সর্বাঙ্গে হলুদের প্রসাধন, ডাগর চোখে কাজল। পরের সাতপুতকে কোলে রাখেন, নিজের সাত-পুত থাকে পিঠে। বৈশাখ মাসে চন্দন-ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যে-ষষ্ঠী. আষাঢ়ে বাঁশ-ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন বা লোটন-ষষ্ঠী, ভাদ্রে চর্পটা বা চাপড়-ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা-ষষ্ঠী, কার্তিকে কালী-ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে অখণ্ড-ষষ্ঠী—সংসারকে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যান। পৌষে মূলা-ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা-ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোবিন্দ-ষষ্ঠী, চৈত্রে অশোক তরু যখন ফুলভারে ভরিয়া উঠে, তখন শোক-দুঃখ মুছিতে আসেন মা অশোকষষ্ঠী। তারই কল্যাণ-স্পর্শে আনন্দে সুখে ওই ফুলভরা অশোক গাছের মতই সংসার হাসিয়া উঠে। অশোকের পর আছে নীল-ষষ্ঠী। গাজন-সংক্রান্তির পূর্ব-দিন। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও—ওই দিন হয় নীল-ষষ্ঠী।

পদ্ম সকালবেলা হইতে গৃহকর্ম সারিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত। কাজ সারিয়া স্নান করিবে, ষষ্ঠীর পূজা আছে, ব্রতকথা শুনিতে যাইবে বিলুর বাড়ী। তারপর অশোকের কলি খাইতে হইবে। তাহার আবার মন্ত্র আছে। এ হেন দিনে আবার অনিরুদ্ধ কাজের ঝঞ্ঝাট বাড়াইয়া দিয়াছে। কামারশালা মেরামতে লাগিয়াছে। হাপর, নেয়াই হাতুড়ি, সাঁড়াশী ইত্যাদি লইয়া টানাটানি শুরু করিয়াছে। কামারশালার বহুকালের পুরানো ঝুল-কালি-ময়লা সাফ করা একদণ্ডের কাজ নয়। ইহার উপর কয়লার সঙ্গে মিশিয়া আছে লোহার টুকরা —ছুতারের রেদায় চাঁচিয়া তোলা কাঠের আঁশের মত পাতলা কোঁকড়ানো লোহাগুলি সাংঘাতিক জিনিস, বিঁধিলে বড়শির মত বিঁধিয়া যাইবে। ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া আবার গোবর-মাটি প্রলেপে নিকাইতে হইবে!

পদ্মের সঙ্গে তারিণীর সেই ছেলেটাও কাজ করিতেছিল। ছেলেটাকে যতীন খাইতে দেয়। দুই-একটা কাজ-কর্ম অবশ্য ছেলেটা করে, কিন্তু অহরহই পদ্মের কাছে থাকে। অনিরুদ্ধ দুই-একটা ধমক দিলেও ছেলেটা আর বিশেষ কিছু বলে না। বিপদ হয় ছোঁড়াটা বাহিরে গেলেই। বাহিরে গেলে আর সহজে ফেরে না। যতীন উহাকে দিয়া দেবুকে কোন খবর পাঠাইলে দেবু আসে, কথাবার্তা কহিয়া চলিয়া যায় কিন্তু ছেলেটার পাত্তা আর পাওয়া যায় না। অবশেষে একবেলা পার করিয়া খাইবার সময় ফেরে। কোন-কোনদিন হরিজন-পাড়া, কি কোন বনজঙ্গল খোঁজ করিয়া ধরিয়া আনিতে হয়। সে পদ্মই আনে।

অনিরুদ্ধ নূতন করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ করিতে চায়।

কাবুলী চৌধুরীর কাছে টাকা সে পাইয়াছে। আড়াইশো টাকার জন্য চৌধুরী গোটা জোতটাই বন্ধক না লইয়া ছাড়ে নাই। অনিরুদ্ধ তাহাই দিয়াছে। তাহার মন খানিকটা খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিল;—কিন্তু টাকা পাইয়া সে সব আফসোস ছাড়িয়া, মহা উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাকী খাজনার টাকাটা আদালতে দাখিল করিতে হইবে, আপোসে দিয়া বিশ্বাস নাই। আর আপোসেই বা সে দিবে কেন? পাচুন্দীর গরু-মহিষের হাট হইতে এক-জোড়া গরু কিনিবে। ইহার মধ্যে সে কৃষাণ বাহাল করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গার ভাই পাতুকেই তাহার পছন্দ। তাহাকে সে কামারশালে চাকরও রাখিয়াছে। পাতুকে সে ভালও বাসে। দুর্গার কাছে পাতু অনেক ওকালতি করিয়াছিল অনিরুদ্ধের জন্য।

সেদিন অনিরুদ্ধের সঙ্গে কামারশালায়ও পাতু কাজ করিতেছিল। মোটা মোটা লোহার জিনিসগুলি তাহারা দু'জনে বহিয়া বাহির করিয়া আনিয়া রাখিতেছিল। কাজের ফাঁকে চাষের সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছিল। হইতেছিল গরুর কথা। কেমন গরু কেনা হইবে—তাই লইয়া আলোচনা।

পাতুর মতে দুর্গার নিকট হইতে বলদ-বাছুরটা কেনা হউক এবং হাট হইতে দেখিয়া-শুনিয়া তাহার একটা জোড়া কিনিয়া আনিলে—বড় চমৎকার হাল হইবে!

অনিরুদ্ধ হাসিয়া বলিল—দুর্গার বাছুরটা দাম যে বেজায়!

—পাইকেরা একশো টাকা পর্যন্ত বলেছে। দুর্গা ধরে রয়েছে,—আরও পঁচিশ টাকা। তো তোমাকে সস্তা করে দেবে। আমি সুদ্ধ যখন আছি।

হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—মোটে একশো টাকা আমার পুঁজি। ও হবে না পাতু। ছোটখাটো গিঁট গিঁট বাছুর কিনব। জমিও বেশী নয়—বেশ চলে যাবে।

—কিন্তু দধি-মুখো গরু কিনো বাপু। দধি-মুখো গরু ভারী ভালো লক্ষণ-মান।

—চল না, হাটে তো দু'জনেই যাব।

পদ্ম বলিল তারিণীর ছেলেটাকে—হ্যাঁ রে, আবার লোহার টুকরো কুড়োতে লাগলি? এই বুঝি তোর কাজ করা হচ্ছে?

ছোঁড়াটা উত্তর দিল না।

পাতু বলিল—এ্যাই এ্যাই, ই তো আচ্ছা ছেলে রে, বাপু! এই ছেলে!

ছেলেটা দাঁত বাহির করিয়া পাতুকে একটা ভেঙচি কাটিয়া দিল।

—ও বাবা ই যে ভেঙচি কাটে লাগছে! বলিহারির ছেলে রে বাবা!

অনিরুদ্ধ বলিল—ধরে আন। কান ধরে নিয়ে আয় তো, পাতু!

পদ্ম হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল,—ধরো না, কামড়ে দেবে কামড়ে দেবে!

ছোঁড়াটার ওই এক বদ অভ্যাস। কেহ ধরিলেই সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসাইয়া দেয়। আর দাঁতগুলিতে যেন ক্ষুরের ধার। অতর্কিত কামড়ে আক্রমণকারীকে বিব্রত করিয়া মুহূর্তে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। ওই তাহার রণ-কৌশল। আজ কিন্তু পাতু ধরিবার আগেই ছোঁড়াটা উঠিয়া ভোঁ দৌড় দিল।

পদ্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—'উচ্চিঙ্গে', 'উচ্চিঙ্গে', 'ওরে ও উচ্চিঙ্গে'! 'যাস না কোথাও যেন, শুন্‌ছিস্?'

ছেলেটার ডাক নাম 'উচ্চিংড়ে'; ভাল নাম মা-বাপে শখ করিয়া একটা রাখিয়াছিল। কিন্তু সে তার বাপ-মাই জানে, ছেলেটা নিজেও জানে না। উচ্চিংড়ে কিন্তু পদ্মের ডাক কানেই তুলিল না। তবে বাড়ীর দিকেই গেল—এই ভরসা। পদ্মও বাড়ির দিকে চলিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—চল্‌লি কোথায়?

—দেখি, কোথায় গেল!

—যাক গে, মরুগ গে। তোর কি? আপনার কাজ কর তুই!

—ষাট। আজ ষষ্ঠীর দিন! তোমার মুখের আগল নাই? বড় বড় চোখে প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া পদ্ম অনিরুদ্ধকে নীরবে তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

দাঁতে দাঁত টিপিয়া অনিরুদ্ধও ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পদ্মের দিকে চাহিয়া রহিল। পদ্ম কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না; বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। কথায় আছে—'না বিয়াইয়া কানুর মা', এ দেখিতেছি তাই! অনিরুদ্ধেরই মরণ।

যাক, উচ্চিংড়ে অন্য কোথাও পালায় নাই। যতীনের মজলিসে গিয়া

বসিয়াছে। যতীনের কথার সাড়া হইতে দূর হইতেই পদ্ম উচ্চিংড়ের অস্তিত্ব অনুমান করিল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—মা-মণি কোথায় রে?

—হুই কামারশালায়।

এই যে—তাহারই খোঁজ হইতেছে। পদ্ম হাসিল। কেন! মা-মণির খোঁজ কেন? ওই এক চাঁদ-চাওয়া ছেলে! এখন কি হুকুম হইবে কে জানে! সে ভিতরের দরজার শেকল নাড়িয়া সঙ্কেত জানাইল—মা-মণি মরে নাই বাঁচিয়া আছে। ওপাশে যতীনের ঘরের বাহিরের বারান্দায় ভরপুর মজলিস চলিতেছে। দেবু, জগন, হরেন, গিরিশ, গদাই অনেকে আসিয়া জমিয়াছে। শিকল নাড়ার শব্দ পাইয়া, হাসিয়া, যতীন বারান্দা হইতে ঘরে আসিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজায় দাঁড়াইল। কালি-ঝুলি মাখা আপনার সর্বাঙ্গ এবং কালো ছেঁড়া কাপড়খানার দিকে চাহিয়া পদ্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল—না ভেতরে এস না।

—আসব না?

—না, আমি ভূত সেজে দাঁড়িয়ে আছি।

হাসিয়া যতীন বলিল—ভূত সেজে?

—হ্যাঁ। এই দেখ। দরজার ফাঁক দিয়া সে আপনার কালি-মাখা হাত দুখানা বাড়াইয়া দেখাইল। এস না, জুজুবুড়ী! ভয় পাবে! সে একটি নূতন পুলকে অধীর হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

যতীনও হাসিয়া বলিল—কিন্তু জুজু-মা, এখুনি যে চায়ের জল চাই। হাতটা কিন্তু ধুয়ে ফেলো।

পদ্ম এবার গজ গজ করিতে আরম্ভ করিল! চা দিনের মধ্যে লোকে কতবার খায়! তাহার যেমন কপাল! অনিরুদ্ধ মাতাল—যতীন চাতাল, ওই উচ্চিংড়েটা জুটিল তো সেটা হইল দাঁতাল।

যতীন ফিরিয়া গিয়া মজলিসে বসিল। চা তাহার মজলিসের অন্যতম আকর্ষণ। হরেন ইহারই মধ্যে বার দুয়েক তাগাদা দিয়েছে।

চা কই মশাই? এ যে জমছে না।

মজলিসে আজ জগন বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বক্তৃতা দিতেছে। উপস্থিত আলোচনা চলিতেছে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন সম্ভাবনা সম্বন্ধে। বাংলা প্রদেশের আইন সভায় প্রজাস্বত্ব আইন লইয়া জোর আলোচনা চলিতেছে। কথাটা উঠিয়াছে শ্রীহরি পালের সেদিনের সেই শাসন-বাক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে। মাল জমি অর্থাৎ প্রজাস্বত্ববিশিষ্ট জমির উপর মূল্যবান বৃক্ষে প্রজার শুধু ফল ভোগের অধিকার ছাড়া আর কোন স্বত্ব নাই। গাছ জমিদারের।

জগন বলিতেছে—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনে সে স্বত্ব হবে প্রজার। জমিদারের বিষ-দাঁত এইবার ভাঙল। সেদিন কাগজে সব বেরিয়েছিল—কি রকম সংশোধন হবে। আমি কেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ও আইন পাশ হবেই। ওঃ, স্বরাজ্য পার্টির কি সব বক্তৃতা! একেবারে আগুন ছুটিয়ে দিয়েছে।

গদাই জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম কি সব হবে, ডাক্তার?

হরেন খবরের কাগজের কেবল হেড লাইনগুলি পড়ে আর পড়ে আইন-আদালতের কথা। বিস্তৃত বিবরণ পড়িবার মত ধৈর্য তাহার নাই। তবুও সে বলিল—অনেক। সে অনেক ব্যাপার। এই এত বড় একখানা বই হবে। বলিয়া দুই হাত দিয়া বইয়ের আকারটা দেখাইল। তারপর বলিল, বোকার মত মুখে মুখেই জিজ্ঞাসা করছি কি রকম হবে ডাক্তার!

জগনেরও সব মনে নাই—সব সে বুঝিতে পারে নাই, তবুও সে কিছু কিছু বলিল।

প্রথমেই বলিল—গাছের উপর প্রজার স্বত্ব কায়েম হইবে।

হস্তান্তর আইনে জমিদারের উচ্ছেদ-ক্ষমতা উঠিয়া যাইবে।

খারিজ-ফিস্ নির্দিষ্ট হইবে, এবং সে ফিস্ প্রজা রেজিষ্ট্রি আপিসে দাখিল করিবে।

মাল জমির উপরেও পাকা ঘর করিতে পাইবে।

মোট কথা জমি প্রজার।

গদাই বলিল—কোর্ফার নাকি স্বত্ব হবে? ঠিকে ভাগেরও নাকি—

জগন বলিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কোর্ফার স্বত্ব সাব্যস্ত হলে মানুষের আর থাকবে কি? নাকে তেল দিয়ে ঘুমো গিয়ে। ভাগে ঠিকের জমি সব তোর হয়ে যাবে।

দেবু আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কয়েক দিন হইতেই তাহার মনে অশান্তির শেষ নাই। সে ভাবিতেছে, সেদিনের সেই পাতু প্রমুখ বাউড়ী-বায়েনগুলির কথা। তাহার কথা শুনিয়া তাহারা শ্রীহরিকে অমান্য করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। অচিরে শ্রীহরির শাসনদণ্ড কোন না কোন একটা দিক হইতে আকস্মিক ভাবে আঘাতে তাহাদের মাথার উপর আসিয়া পড়িবেই। তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে; এবং তাহাকেই বাঁচাইতে হইবে। বাঁচাইতে সে ন্যায়ধর্ম-অনুসারে বাধ্য। কিন্তু—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বিলু, খোকো, সংসার, জমিজমা সম্বন্ধে তাহার চিন্তা করিবার অবসর নাই। মধ্যে মধ্যে এমনি ভাবে ক্ষণিক দুশ্চিন্তার মত সমসাময়িকভাবে তাহাদিগকে মনে পড়িয়া যায়।

জগন বক্তৃতা দিয়াই চলিয়াছিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা হলে আর দেখতে হত না।

ওই নামটিতে আসরের সমস্ত লোকগুলির শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেশবন্ধুর নাম, তাঁহার পরিচয় সকলেই জানে, তাঁহার ছবিও তাহারা দেখিয়াছে।

দেবুর চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—তাঁহার মূর্তি। দেশবন্ধুর শেষশয্যার একখানা ছবি বাঁধাইয়া ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ছবির তলায় লিখিয়া দিয়াছেন—

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥'

যতীন বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিল—উচ্চিংড়ে!

সে চায়ের খোঁজে বাড়ীর ভিতরে গিয়াছিল।

মজলিসের মধ্যে বসিয়া উচ্চিংড়ের খেয়াল খুশীমত চাঞ্চল্য প্রকাশের সুবিধা হইতেছিল না। কিছুক্ষণ ধরিয়া পথের ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে একটা গিরগিটির শিকার দেখিতেছিল; দেখিতে দেখিতে যেই একটু সুস্থির শান্ত হইয়াছে, অমনি সেইখানেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বেচারা!

হরেন তাহাকে ধমক দিয়া ডাকিল—এই ছোড়া, এই!

দেবু বলিল—ডেকো না। ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে।

বলিয়াই সে নিজেই ভিতরে উঠিয়া গিয়া যতীনকে বলিল—কি করতে হবে বলুন।

যতীন বলিল—চায়ের বাটিগুলো নিয়ে সকলকে দিয়ে দিন।

দেবুই সকলকে চা পরিবেশন করিয়া দিল। চা খাইতে খাইতে জগন আরম্ভ করিল—মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহরু, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্রের কথা।

চা খাইয়া সকলে চলিয়া গেল। সকলের শেষে গেল দেবু। যাইবার জন্য উঠিয়াছিল সর্বাগ্রে সে-ই। কিন্তু যতীন বলিল—গোটাকয়েক কথা ছিল যে দেবুবাবু।

দেবু বসিল। সকলে চলিয়া গেলে যতীন বলিল—আর দেরি করবেন না, দেবুবাবু। সমিতির কাজটা নিয়ে ফেলুন।

সমিতি—প্রজা-সমিতি। যতান বলিতেছে, দেবুকে সমিতির ভার লইতে হইবে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

—আপনি না হলে হবে না, চলবে না। সকলেই আপনাকে চায়। হয়তো ডাক্তার মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হবে। তা হোক সে ক্ষুন্ন, কিন্তু একটা জিনিস গড়ে উঠেছে—সেটাকে ভাঙতে দেওয়া উচিত হবে না।

দেবু বলিল—আচ্ছা. কাল বলব আপনাকে।

যতীন হাসল, বলিল—বলবার কিছু নাই। ভার আপনাকে নিতেই হবে।

দেবু চলিয়া গেল, যতীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বাংলার পল্লীর দুর্দশার কথা সে ছাত্র-জীবনে অনেক পড়িয়াছে, অনেক শুনিয়াছে। অনেক সরকারী স্ট্যাটিষ্টিক্স এবং নানা পত্র-পত্রিকায় এর বর্ণনাও পড়িয়াছে, কিন্তু এমন বাস্তবরূপে সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সবে এই চৈত্র মাস, কৃষিজাত শস্যসম্পদ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে নাই, ইহারই মধ্যে মানুষের ভাণ্ডার রিক্ত হইয়া গিয়াছে। ধান শ্রীহরির ঘরে গিয়াছে, জংশনের কলে গিয়াছে। গম, যব, কলাই, আলু—তাহাও লোকে বেচিয়াছে। তিল এখনও মাঠে, কিন্তু তাহার উপরেও পাইকার দাদন দিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে একদিন শ্রীহরির খামারে একটি জনতা জমিয়াছিল, শ্রীহরি ধান-ঋণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই গ্রামের মাঠে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় সব জমিই নাকি মহাজনের কাছে আবদ্ধ। মহাজনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহাজন শ্রীহরি।

পল্লীর প্রতিটি ঘর জীর্ণ, শ্রীহীন, মানুষগুলি দুর্বল। চারিপাশে কেবল জঙ্গল, খানায়-খন্দে পল্লীপথ দুর্গম। সেদিনের বৃষ্টিতে সমস্ত পথটাই কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। স্নানের ও পানের জলের পুকুর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। প্রকাণ্ড বড় দীঘি, কিন্তু জল আছে সামান্য খানিকটা স্থানে, গভীরতা মাত্র হাত-খানেক কি হাত-দেড়েক। সেদিন একটা লোককে সে পলুই চাপিয়া ও-দীঘিতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছিল। পাঁকে-জলে ভাল করিয়া লোকটার কোমরও ডোবে নাই।

আশ্চর্য! ইহার মধ্যেই মানুষ বাঁচিয়া আছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন—এ বাঁচা প্রেতের বাঁচা। অথবা ক্ষয়রোগাক্রান্ত রোগীর দিন গণনা করিয়া বাঁচা। তিল-তিল করিয়া ইহারা চলিয়াছে মৃত্যুর দিকে—একান্ত নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

এখানে প্রজা-সমিতি কি বাঁচিবে? সঞ্চয়-সম্বলহীন চাষী গৃহস্থের সম্মুখে চাষের সময়—কঠিন গ্রীষ্ম, দুর্যোগ-ভরা বর্ষা! চোখের উপর শ্রীহরির খামারে রাশি রাশি ধান্য-সম্পদ। সেইখানে প্রজা-সমিতি কি বাঁচিবে—না, কাহাকেও

বাঁচাইতে পারিবে? সমিতির প্রত্যক্ষ এবং প্রথম সংঘর্ষ হইবে যে শ্রীহরির সঙ্গে। হইবে কেন, আরম্ভ তো হইয়াই গিয়াছে!

সম্মুখের দাওয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে উচ্চিংড়ে।

ওই পল্লীর ভাবী পুরুষ! নিঃস্ব, রিক্ত, গৃহহীন, স্বজনহীন, আত্মসর্বস্ব। যে-নীড়ের মমতায় মানুষ শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর তপস্যা করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে চায়—সে-নীড় তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে।

অকস্মাৎ পদ্মের উচ্চকণ্ঠ তাহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম তাহাকে শাসন করিতেছে। সেই শাসন-বাক্যের ঝঙ্কারে তাহার চিন্তার একাগ্রতা ভাঙিয়া গেল। ষষ্ঠী-পূজোর থালা হাতে পদ্ম ঝঙ্কার দিতে দিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহার স্নান হইয়া গিয়াছে; পরনে 'পুরানো একখানি শুদ্ধ কাপড়। সে বলিল—কি ছেলে বাবা তুমি? পঞ্চাশবার শেকল নেড়ে ডাকছি, তা শুনতে পাও না? যাক, ভাগ্যি আমার, সাঙ্গপাঙ্গের দল সব গিয়েছে! নাও—কোঁটা নাও উঠে দাঁড়াও।

যতীন হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শুচিস্মিতা পদ্ম কপালে তাহার দই-হলুদের কোঁটা দিয়া বলিল—তোমার মা আজ দরজার বাজুতে তোমাকে কোঁটা দেবে।

যতীনকে কোঁটা দিয়া এবার সে ডাকিল—উচ্চিঙ্গে! অ উচ্চিঙ্গে! ও রে—! দেখ তো, ছেলের ঘুম দেখ তো অসময়ে! এই উচ্চিঙ্গে—!

ইতিমধ্যেই উচ্চিংড়ের বেশ এক দফা ঘুম হইয়াছিল, ক্ষুধার বেলাও হইয়াছিল, সুতরাং তিনবার ডাকিতেই সে উঠিয়া বসিল।

—ওঠ, উঠে দাঁড়া, কোঁটা দি! ওঠ বাবা ওঠ!

উচ্চিংড়ে দাঁড়াইয়া প্রথমেই হাত পাতিল—পেসাদ! পেসাদ দাও।

পদ্ম হাসিয়া ফেলিল, দাঁড়া আগে কোঁটা দি!

উচ্চিংড়ে খুব ভালো ছেলেটির মত কপাল পাতিয়া দাঁড়াইল; পদ্ম কোঁটা পরাইয়া দিল।

যতীন বলিল, প্রণাম কর, উচ্চিংড়ে। প্রণাম করতে হয়। দাঁড়াও মা-মণি আমি একটা—।

—বাবা রে বাবা রে! আমাকে তুমি নরকে না পাঠিয়ে ছাড়বে না।

পদ্ম মুহূর্তে উচ্চিংড়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া একপ্রকার ছুটিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল।

* * *

চৈত্রের দ্বিপ্রহর। অলস বিশ্রামে যতীন দাওয়ার তক্তপোশখানির উপর শুইয়াছিল। চারিদিক বেশ রৌদ্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তপ্ত বাতাস

এলোমেলো গতিতে বেশ জোরেই বহিতেছে। বড় বড় বট, অশ্বত্থ, শিরীষ গাছগুলি কচি পাতায় ভরা ; উত্তাপে কচি পাতাগুলি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সেদিনের বৃষ্টির পর মাঠে এখনও হাল চলিতেছে, চাষীরা এতক্ষণে হাল-গরু লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ধর্মসিক্ত কালো চামড়া রৌদ্রের আভায় চক্-চক্ করিতেছে তৈলাক্ত লোহার পাতের মত ; বাউড়ী-বায়েনদের মেয়েরা গোবর, কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। সম্মুখেই রাস্তার ওপাশে একটা শিরীষ গাছের সর্বাঙ্গ ভরিয়া কি একটা লতা—লতাটির সর্বাঙ্গ ভরিয়া ফুল। চারিধারে মৌমাছি ও ভ্রমরের গুনগুনানিতে যেন এক মৃদুতম ঐক্যতান-সঙ্গীতের একটা সূক্ষ্ম জাল বিছাইয়া দিয়াছে। গোটাকয়েক বুলবুলি পাখী নাচিয়া নাচিয়া এ-ডাল ও-ডাল করিয়া ফিরিতেছে। দূরে কোথাও পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে দুইটা কোকিল। 'চোখ গেল' পাখীটার আজ সাড়া নাই। কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—কে জানে! আকাশে উড়িতেছে—কয়েকটা ছোট ঝাঁকে—একদল বন-টিয়া ; মাঠের তিল-ফসলে তাহাদের প্রত্যাশা। অসংখ্য বিচিত্র রঙিন প্রজাপতি ফড়িং ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিতেছে দেবলোকের বায়ুতাড়িত পুষ্পের মত।

গন্ধে, গানে, বর্ণচ্ছটায় পল্লীর এই এক অনিন্দ্য রূপ কবির কাব্যের মতই এই গন্ধে গানে বর্ণচ্ছটায় যেন একটা মাদকতা আছে, কেমন একটা হাতছানির ইশারা আছে।

হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সেই ইশারার ডাকেই যেন মোহগ্রস্তের মত যতীন বাহির হইয়া পড়িল। কাছেই কোন গাছের মধ্যে ডাকিতেছে একটা পাখী। অতি সুন্দর ডাক। শুধু স্বরই সুন্দর নয়, ডাকের মধ্যে সঙ্গীতের একটা সমগ্রতা আছে। পাখীটি যেন কোন গানের গোটা একটা কলি গাহিতেছে। ওই পাখীটার খোঁজেই যতীন সন্তর্পণে জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। খানিকটা ভিতরে গিয়া পাইল সে গাঢ় মদির গন্ধ। ধ্বনি এবং গন্ধের উৎসমূল আবিষ্কার করিবার জন্য সে অগ্রসর হইয়া চলিল। আশ্চর্য! পাখীটা এবং ফুলগুলি তাহার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলিতেছে! শব্দ এবং গন্ধ অনুসরণ করিয়া যত সে আগাইয়া আসিতেছে তাহারাও যেন তত সরিয়া চলিতেছে। মনে হয় ঠিক ওই গাছটা। কিন্তু সেখানে আসিলেই পাখী চুপ করে—ফুল লুকাইয়া পড়ে। আবার আরও দূরে পাখী ডাকিয়া উঠে! গন্ধ মনে হয় ক্ষীণ ; উৎসস্থান মনে হয় আরও দূরে ; মোহগ্রস্তের মত যতীন আবার চলিল।

—বাবু!

কে ডাকিল? নারী কণ্ঠ যেন।

যতীন পাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—একটা গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া রহিয়াছে দুর্গা। সে কি করিতেছে!

—দুর্গা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

আঁট-সাঁট করিয়া গাছ কোমর বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া দুর্গা বসিয়া কি যেন কুড়াইতেছে।

—ওগুলো কি? কি কুড়োচ্ছ?

এক অঞ্জলি ভরিয়া দুর্গা বাড়াইয়া তাহার সামনে ধরিল। টোপা-টোপা স্ফটিকের মত সাদা এগুলি কি? এই তো সে মদির গন্ধ। ইহারই একছড়া মালা গাঁথিয়া দুর্গা গলায় পরিয়াছে। বিলাসিনী মেয়েটির দিকে যতীন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গঠন-ভঙ্গিতে, চোখ-মুখের লাবণ্যে, রুক্ষ চুলে মেয়েটার সর্বাঙ্গ-ভরা একটা অদ্ভুত রূপ—নূতন করিয়া আজ তাহার চোখে পড়িল।

দুর্গা মৃদু হাসিয়া বলিল—মউ-ফুল!

—মউ-ফুল?

—মহুয়া ফুল, বাবু; আমরা বলি মউ-ফুল।

যতীন ফুলগুলি তুলিয়া নাকের কাছে ধরিল। সে এক উগ্র মদির গন্ধ—মাথার ভিতরটা যেন কেমন হইয়া যায়; সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

—কুড়িয়ে রাখছি বাবু গরুতে খাবে,—দুধ বাড়বে। আবার—দুর্গা হাসিল।

—আর কি করবে?

—আর সে—সে আপনাকে শুনতে হবে না।

—কেন, আপত্তি কি?

—আর আমরা মদ তৈরী করি।

—মদ?

—হ্যাঁ। পিছন ফিরিয়া দুর্গা হাসিতে লাগিল; তারপর বলিল—কাঁচাও খাই, ভারী মিষ্টি।

যতীনও টপ করিয়া একটা মুখে ফেলিয়া দিল। সত্যই, চমৎকার মিষ্টি, কিন্তু সে মিষ্টতার মধ্যেও ওই মাদকতা। আবার একটা সে খাইল। আবার একটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার কানের ভিতরটা যেন গরম হইয়া উঠিল; নাকের ভিতর নিঃশ্বাস—উগ্র উত্তপ্ত। কিন্তু অপূর্ব এই মধু-রস।

দুর্গা সহসা চকিত হইয়া বলিল—পাড়ার ভেতরে গোল উঠতে লাগছে!

—হ্যাঁ, তাই তো!

সে তাড়াতাড়ি ঝুড়িটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া বলিল—আমি চললাম, বাবু! পাড়াতে কি হল দেখি গিয়ে।

যাইতে যাইতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—মউ আর খাবেন না বাবু, মাদ্‌কে যাবেন।

—কি হবে?

—মাদ্‌কে। নেশা—নেশা। দুর্গা চলিয়া গেল।

নেশা। তাই তো তাহার মাথার ভিতরটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। সর্বশরীরে একটা দাহ, দেহের উত্তাপও যেন বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

বাবু! বাবু!

আবার কে ডাকিতেছে?—কে?

জঙ্গলের ভিতর আসিয়া ঢুকিল উচ্চিংড়ে?

—গাঁয়ে খুব গোল লেগে যেয়েছে বাবু! কালু স্যাখ বাউড়ী-মুচিদের গরু সব ধরে নিয়ে গ্যালো।

—গরু ধরে নিয়ে গেল? কালু সেখ কে? নিল কেন?

—কালু স্যাখ—ছিরু ঘোষের প্যায়দা। দেখ না এসে—তোমাকে সব ডাকছে!

যতীন দ্রুতপদে ফিরিল। উচ্চিংড়ে চড়িয়া বসিল মহুয়া গাছে। একেবারে মগ ডালে উঠিয়া পাকা ফুল পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

* * *

শ্রীহরি অপমানের কথা ভুলিয়া যায় নাই, অপমান ভুলিবার তাহার কথাও নয়। এ গ্রামের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য লোকত ধর্মত সে-ই দায়ী। প্রতিটি মুহূর্তে সে দায়িত্ব শ্রীহরি অনুভব করে, উপলব্ধি করে—বিপদে-বিপর্যয়ে সে তাহাদের রক্ষা করিবে, আর শৃঙ্খলা ভাঙিলে সে তাহাদের শাস্তি দিবে—বিদ্রোহকে কঠিন হস্তে দমন করিবে। এ তাহার অধিকার। এ তাহার দায়িত্ব। যখন যে অত্যাচারী ছিল, তখন তাহার অধিকার ছিল না—এ কথা সে স্বীকার করে। কিন্তু আজ সে কোন অন্যায় করে না—আজ সমস্ত গ্রামখানাতেই তাহার কর্তব্যপরায়ণতার, ধর্মপরায়ণতার পরিচয় শ্রীহরির মহিমাময় উজ্জ্বল হইয়াছে। ষষ্ঠীতলা, কুয়া, স্কুলঘর—সর্বত্র তাহার নাম ঝলমল করিতেছে। রাস্তার ঐ নালাটা আবহমান কাল হইতে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন; সে নিজে হইতেই সে বিঘ্ন দূর করিবার আয়োজন করিতেছে। শিবকালীপুরের সকল ব্যবস্থাকে সে-ই পরম যত্নে সুষ্ঠু করিয়াছে। সেই সুব্যবস্থাকে অব্যবস্থায় পরিণত করিতে যে-

বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমন করা কেবল তাহার অধিকার নয়, কর্তব্য। তবে প্রথমেই সে কঠিন শাস্তি দিতে চায় না। চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়ানোর জন্য যাহারা মজুরি চায়, বলে—জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপ—তাহারা বিনা মজুরিতে খাটিবে কেন, তাহাদের সে বুঝাইয়া দিতে চায়—বিনা বিনিময়ে জমিদারের কতখানি তাহারা ভোগ করে। মাত্র ওই কয়খানা তালপাতাই লয় না। জমিদারের খাস-পতিত ভূমি তাহাদের গরু-বাছুরের একমাত্র চারণ-ভূমি। জমিদারের খাস-পতিত পুকুরের ঘাটে তাহারা নামে, স্নান করে, জল খায়; জমিদারের খাস-পতিত জমির উপর দিয়াই তাহাদের যাতায়াতের পথ। চণ্ডীমণ্ডপ সেই জমিদারের অধিকারে বলিয়া বিনা পয়সায় ছাওয়াইবে না!

তাই সে নব-নিযুক্ত কালু সেখ চাপরাসীকে হুকুম দিয়াছে—জমিদার-সরকারের বাঁধে কিংবা পতিত-জমিতে বাউড়ী-বায়েনদের গরু অনধিকার প্রবেশ করিলেই গরুগুলিকে আগল করিয়া কঙ্কণার ইউনিয়ন বোর্ডের খোঁয়াড়ে দিয়া আসিবে। নব-নিযুক্ত কালু মনিবকে কাজ দেখাইতে উদ্‌গ্রীব, তাহার উপর এ কাজটা লাভের কাজ। খোঁয়াড়ওয়ালা এক্ষেত্রে গরু-পিছু কিছু কিছু প্রকাশ্য-চলিত ঘুষ দিয়া থাকে। সে আভূমি-নত এক সেলাম ঠুকিয়া তৎক্ষণাৎ মনিবের হুকুম প্রতিপালন করিতে চলিল। ভূপাল তাহাকে দেখাইয়া দিল—কোন্‌গুলি শ্রীহরির অনুগত লোকের গরু। সেগুলি বাদ দিয়া, বাকী গরুগুলি সে ধরিয়া লইয়া গেল খোঁয়াড়ে।

শ্রীহরির গ্রাম-শাসনের এই দ্বিতীয়-পর্যায়। ইহাতেও যদি লোকে না বুঝে, তবে আরও আছে। একেবারেই সে কঠিনতম দণ্ড দিবে না। অধর্ম সে করিবে না। লক্ষ্মী তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, সে তাহার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল, সে উহার অপব্যবহার করিবে না। দানের তুল্য পুণ্য নাই—দয়ার তুল্য ধর্ম নাই—শাস্তিবিধানের সময়েও সে কথা সে বিস্মৃত হইবে না। তাহার ইচ্ছা ছিল, গরুগুলোকে আটক করিয়া তাহার বাড়ীতেই রাখিবে, বাউড়ী-বায়েনদের দল আসিয়া কান্নাকাটি করিলে তাহাদের অন্যায়টা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। তাহা হইলে গরীবদের আর খোঁয়াড়ের মাশুলটা লাগিত না। মাশুলও বড় কম নয়, গরু-পিছু চারি আনা হিসাবে চল্লিশ-পঞ্চাশটা গরুতে দশ-বারো টাকা লাগিবে। আবার সামান্য বিলম্ব হইলেই খোঁয়াড়-ভেণ্ডার এক আনা হিসাবে খোরাকি দাবী করিবে। অথচ খোরাকি এক কুটা খড়ও দেয় না—গরুগুলোকে অনাহারেই রাখে। খোরাকি হিসাবেও টাকা আড়াই-তিন লাগিবে। কিন্তু সে কি করিবে? আইন তাই। বেআইনী করিতে গেলেই দেবু জগন হয়তো তাহাকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য মামলা বা দরখাস্ত করিয়া বসিবে।

চণ্ডীমণ্ডপে অর্ধশায়িত অবস্থায় গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সে অলস দৃষ্টিতে গ্রাম-হিতৈষীদের ব্যর্থ বিক্রম লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু এত শীঘ্র খবরটা আনিল কে?

খবরটা আনিয়াছিল তারাচরণ নাপিত। কালু সেখ গরুগুলোকে আটক করিলে, রাখাল ছেলেরা মিনতি করিয়া কাঁদিয়া কালু সেখের পায়ে গড়াইয়া পড়িল।—ওগো স্যাখজী গো! তোমার পায়ে পড়ি, মশাই ছেড়ে ছ্যান আজকের মতন ছেড়ে ছ্যান!

সেখের ক্রোধ হয় নাই, ক্রোধ হইবার হেতুও ছিল না, তবু ছোঁড়াগুলোর ওই হাতে-পায়ে ধরা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কৃত্রিম ক্রোধে একটা ভয়ঙ্কর রকমের হাঁক মারিয়া উঠিল—ভাগো হিঁয়াসে।

ঠিক সেই সময়ই ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর দিয়া আসিতেছিল তারাচরণ ভাণ্ডারী। সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। ছেলেগুলা সেখজীর হাঁকে ভয় পাইয়া খানিকটা পিছাইয়া গেলেও গরুগুলির সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছিল না। জন-দুয়েক রাখাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল—ভাষাহীন হাউ হাউ করিয়া কান্না।

কালু বলিল—ওরে উল্লুক, বেকুব, ছুচোরা সব, বাড়ীতে বুল্ গা যা। হাউ মাউ করে চিল্লাস না।

ছেলেগুলা সে কথা বুঝিল না, তাহারা ওই গরুগুলির মমতার আকর্ষণেই গরুর পালের পিছনে পিছনে চলিল। কান্নার বিরাম নাই। ওগো, কি করব গো! কি হবে গো?

সে-ই আবার পিছনে তাড়া করিল—ভাগ্ বলছি!

ছেলেগুলা খানিকটা পিছাইয়া আসিল; কিন্তু সেখ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারাও আবার ফিরিল।

তারাচরণ ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। কাল সে শ্রীহরির পায়ের নখের কোণ তুলিতে তুলিতে ইহার খানিকটা আভাসও পাইয়াছিল। তারাচরণ দ্রুতপদে গ্রামে ফিরিয়া দেবুর খিড়কির দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাকে সন্তর্পণে ডাকিয়া সংবাদটা দিয়া চলিয়া গেল। বলিল—শীগ্‌গির ব্যবস্থা কর ভাই, নইলে এক আনা করে ফাজিল লেগে যাবে। সে-ও আড়াই টাকা, তিন টাকা। ছ'টা বাজলে আজ আর গরু দেবেই না। কাল দু আনা করে বেশী লাগবে গরুতে।

খিড়কীর দরজা দিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। শ্রীহরি ঘোষ যে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। পণ্ডিতের বাড়ী হইতে

বাহির হইতে দেখিলেই ঘোষ ঠিক তাহাকে সন্দেহ করিয়া বসিবে। জঙ্গলের আড়াল হইতে তারাচরণ এক ফাঁক দিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার অনুমান অভ্রান্ত। এক ঝিলিক সকৌতুক হাসি তারাচরণের মুখে খেলিয়া গেল।

* * *

দেবু কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ কয়েকদিন হইতেই যে আঘাত সে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিল সে আঘাতটা আজ আসিয়াছে। ইহার দায়িত্ব সমস্তটাই তো প্রায় তাহার। এ কথা সে কোনো দিন মুহূর্তের জন্য আপনার কাছে অস্বীকার করে নাই। আঘাতটা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আপন মাথা পাতিয়া দিয়া নির্দোষ গরীবদের রক্ষা করিবার জন্য অহরহ সচেতন হইয়াই সে প্রতীক্ষা করিতেছে।

গরীবেরা পয়সাই বা পাইবে কোথা ? তারাচরণ বলিয়া গেল, এক আনা হিসাবে বেশী লাগিবে—আড়াই টাকা, তিন টাকা বেশী লাগিবে। তাহা হইলে গরু অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশটি। মনে মনে সে হিসাব করিয়া দেখিল—দশ টাকা হইতে পনের টাকা দণ্ড লাগিবে। এ দণ্ড উহারা কোথা হইতে দিবে ? জমি নাই, জেরাত নাই,—সম্বলের মধ্যে ভাঙা বাড়ী আর ওই গরু-ছাগল। গাইগরুর দুধ বিক্রি করে, গোবর হইতে ঘুঁটে বিক্রি করে, গরু-বাছুর-ছাগল বিক্রি করে, ওই পশুগুলিই তাহাদের একমাত্র সম্পদ। ইছু সেখ এ সময়ে টাকা দিতে পারে, কিন্তু তাহার এক টাকার মূল্য হিসাবে অন্তত সে দুই টাকা আদায় করিয়া লইবে। তা'ছাড়া উহাদের এই বিপদের জন্য দায়ী একমাত্র সে-ই। সে বেশ জানে, সে দিন ওই তালপাতা উপলক্ষ করিয়াই একটা মিটমাট হইয়া যাইত, উহারা শ্রীহরির বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া বাঁচিত। কিন্তু সে-ই তাহাদিগকে উঠিয়া আসিতে বলিয়াছিল। অন্যায়কে অস্বীকার করিতে সে-ই প্রেরণা দিয়াছিল। আজ নিজের বেলায় ন্যায়কে ধর্মকে মাথায় তুলিয়া না লইলে চলিবে কেন ?

আরও কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল—বিলু !

তারাচরণ ডাকিতেই বিলুও আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। সংবাদটা দিয়া তারাচরণ চলিয়া গেলেও বিলু দেবুর সম্মুখে না আসিয়া সেই আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিল। সেও ওই গরীবদের কথাই ভাবিতেছিল ; আহা, গরীব ! উহাদের উপর নাকি এই অত্যাচার করে ! এই স্তব্ধ দুপুরে বাউড়ী-বায়েন পাড়ায় মেয়েদের সকরুণ কান্না শোনা যাইতেছে। শুনিয়া বিলুরও কান্না পাইল,

সে কাঁদিতেছিল। দেবুর ডাক শুনিয়া, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দেবু বিলুর সর্বাঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। কোথাও এক টুকরা সোনা নাই। চাষীর ঘরে সোনার অলঙ্কারের বড় প্রচলন নাই। খুব জোর নাকে নাকছাবি, কানে ফুল, গলায় বিছাহার, হাতে শাঁখাবাঁধা ; বিলুর সে-সব গিয়াছে।

বিলু বলিল—কি বলছ ?

—কিছু নাই আর ?

—কি ?

—বাঁধা দিয়ে গোটা পনের টাকা পাওয়া যায়—এমন কিছু ?

বিলু কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বোধ করি তাহার সকল ভাণ্ডার মনে মনে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। তারপর সে ঘরের ভিতর গিয়া দুই গাছি ছোট বালা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

দেবু দুই-পা পিছাইয়া গেল—খোকার বালা ?

—হ্যাঁ।

এই বালা দুইগাছি দিয়াছিল বিলুর বাপ। দেবুর অনুপস্থিতিতে শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বিলু এ দু'টিকে হস্তান্তর করিতে পারে নাই।

বিলু বলিল—নাও।

—খোকার বালা নেব ?

—হ্যাঁ নেবে। আবার যখন হবে তোমার, তুমি গড়িয়ে দেবে।

—যদি খালাস না হয়, আর গড়াতে না পারি !

—পরবে না খোকা।

দেবু আর দ্বিধা করিল না। বালা দুইগাছা লইয়া জামাটা গায়ে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

গরুগুলিকে খালাস করিয়া ফিরিল সে সন্ধ্যার সময়। অর্ধেকদিন রৌদ্রে ঘুরিয়া জামা-কাপড় ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার উপর একপাল গরুর পায়ের ধূলায় সর্বাঙ্গ কাদায় আচ্ছন্ন। যতীনের দুয়ারে তখন বেশ একটা মজলিস বসিয়া গিয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া সকলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—কি হল দেবু ?

—ছাড়ানো হয়েছে গরু।

দেবু তৃপ্তির হাসি হাসিল।

—কত লাগল ?

সে কথার উত্তর না দিয়া দেবু বলিল—যতীনবাবু!

—বলুন!

—একটা কথা বলব আপনাকে।

—দাঁড়ান; আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে একটু চা করি আপনার জন্য।

—না। এখনি বাড়ী যাব আমি। কথাটা বলে যাই।

যতীন দেবুকে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

দেবু মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল—প্রজা সমিতির ভার আমিই নেব।

—দাঁড়ান, চা খেয়ে তবে যেতে পাবেন।

সে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকিল—মা-মণি! মা-মণি!

কেহ সাড়া দিল না।

পদ্ম বাড়ীতে নাই, সে গিয়াছে উচ্চিংড়ের সন্ধানে। উচ্চিংড়ে এখনও ফিরে নাই, তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

যতীন নিজেই চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

তেইশ

হরেন ঘোষালের উত্তেজনা—সে এক ভীষণ ব্যাপার! সে গোটা গ্রামটার পথে পথে ঘোষণা করিয়া দিল—প্রজা সমিতির মিটিং! প্রজা সমিতির মিটিং! স্থানটার উল্লেখ করিতে সে ভুলিয়াই গেল। ঠিক ছিল মিটিং হইবে ওই বাউড়ী পাড়ার ধর্মরাজতলায়। কিন্তু ঘোষাল সে-কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাওয়ায় লোকজন আসিয়া জমিল নজরবন্দীরবাবুর বাসার সম্মুখে। কারণ প্রজা সমিতির সকল উৎস যে ওখানেই।

হরেন বলিল—তবে এইখানেই হোক। আবার এখান থেকে ওখানে। তা ছাড়া এখানে চা করা যাবে দরকার হলে। চেয়ার টেবিল রয়েছে এখানে। এখানেই হোক।

সঙ্গে সঙ্গে সে যতীনের টেবিল-চেয়ার টানিয়া বাহিরে আনিয়া রীতিমত সভার আসার সাজাইয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে দুই গাছা মালাও সে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। ওটাতে তাহার ভুল হয় না।

লোকজন অনেক জমিয়াছে। বাউড়ী-বায়েনরা প্রায় সকলেই আসিয়াছে। গ্রামের চাষীরাও আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া আজিকার গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার জন্য সকলেই বেশ একটু উত্তেজিতও হইয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ জমিদারের খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ওই বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে

তো প্রজারাই। সেখানে চিরকাল লোক গরু চরাইয়া থাকে। গ্রামের পতিত জমিও আবহমানকাল গোচারণ-ভূমি হিসাবে লোকে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সেখানে গোচারণ করিবার অধিকার নাই—এই কথায় সকলকেই উত্তেজিত করিয়াছে। আজ ওই অন্যায় আইন বাউড়ী-বায়েনদের পক্ষে প্রযুক্ত হইল—কাল যে সকলের পক্ষেই তা প্রযোজ্য হইবে না তাহা কে বলিল? বাউড়ীরা অবশ্য এত বুঝে নাই। তাহারা শুনিয়াছে—পণ্ডিত মশায় কমিটির কর্তা হইবেন। তাই শুনিয়াই তাহারা সকৃতজ্ঞ চিত্তে আসিয়াছে। নির্ভয়ে আসিয়াছে।

তাহাদের পাড়ায় আজ ঘরে ঘরে পণ্ডিতের কথা। দুর্গার মা পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিতেছে। মাথার চুলের মত পেরমাই হবে, সোনার দোত কলম হবে, বেটার কোলে বেটা হবে, লক্ষ্মী উথলে উঠবে। সোনার মানুষ, পণ্ডিত জামাই আমার সোনার মানুষ!—

সন্ধ্যার সময় আপনার ঘরে বালিশে বুক রাখিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিয়া দুর্গাও ওই কথা ভাবিতেছিল—সোনার মানুষ, পণ্ডিত সোনার মানুষ! বিলু-দিদি তাহার ভাগ্যবতী! আজ ওই সুকুমার নজরবন্দীবাবুটিও পণ্ডিতের তুলনায় হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা—একবার মজলিসে যায়, দশের মধ্যে পণ্ডিত উঁচু মাথা করিয়া বসিয়া আছে, সেই দৃশ্যটি আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একবার দেখিয়া আসে। আবার ভাবিল—না, মজলিস ভাঙুক, সে বিলু-দিদির বাড়ী যাইবে, গিয়া পণ্ডিত জামাইয়ের সঙ্গে দুইটা রসিকতা করিয়া উত্তরে কয়েকটা ধমক খাইয়া আসিবে। সে ভাবিতেছিল—কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে!

আবার ওদিকে নজরবন্দীকে বলিবার মত অনেক কথা তাহার মনে ঘুরিতেছে।

—মউ-ফুলের মধু কেমন লাগল বাবু?

আপন মনে দুর্গা হাসিল। বাবুর চোখের কোণে লালচে আমেজ সে স্পষ্ট দেখিয়াছে।—

কিন্তু পণ্ডিতকে সে কি বলবে?

দুর্গার কোঠার সম্মুখে অমরকুণ্ডার মাঠ, তারপর নদীর বাঁধ। বাঁধের উপর দিয়া একটা আলো আসিতেছে। আলোটা মাঠে নামিল।

পণ্ডিত বড় গম্ভীর লোক।—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর সহসা সে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কথা সে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

—জামাই পণ্ডিত, তুমি ভাই আবার পাঠশালা খোল !

– কে পড়বে ?

—কেউ না পড়ে আমি পড়ব। নেকাপড়া শিখব আমি—

ওঃ, আলোটা তাহাদের গ্রামেই আসিতেছে। হাতে ঝুলানো লণ্ঠনের আলোয় চলন্ত মানুষের গতিশীল পা দুখানা বেশ দেখা যাইতেছে। কে? কাহারা? একজন লণ্ঠন হাতে আসিতেছে, পিছনে একজন—একজন নয়, দুইজন; বায়েন পাড়ার প্রান্ত দিয়াই ঢুকিবার সোজা পথ। সেই পথে আগন্তুকরা কাছে আসিয়া পড়িল।

দুর্গা চমকিয়া উঠিল। এ কি! এ যে আলো হাতে ভূপাল থানাদার, তাহার পিছনে ও যে জমাদারবাবু। জমাদারের পিছনে সেই হিন্দুস্থানী সিপাহীটা! ছিরু পালের বাড়ীতে চলিয়াছে নিশ্চয়।

ছিরু পালের নিমন্ত্রণে রাত্রে জমাদারের আগমন এমন কিছু নূতন কথা নয়। পূর্বে এমন আসরে দুর্গারও নিয়মিত নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু পালের নিমন্ত্রণে জমাদারের সঙ্গে তো সিপাহী থাকার কথা নয়! জমাদারবাবুর আজ এমন পোষাকই বা কেন? সে যে একেবারে খাঁটি জমাদারের পোশাক আঁটিয়া আসরে আসিতেছে। সিপাহীরা মাথায় পাগড়ী, তা ছাড়া শ্রীহরির নিমন্ত্রণের আসর তো প্রথম রাত্রে বসে না। সে আসর বসে মধ্যরাত্রে বারোটা নাগাত।

দুর্গা হঠাৎ একটু চকিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল নজরবন্দীকে, জামাই পণ্ডিতকে। কেন সে তাহা জানে না। কিন্তু তাহাদের দু'জনকেই মনে হইল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শুক্ল ষষ্ঠীর চাঁদ তখন অস্ত গিয়াছে। অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া পথের পাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া সে তাহাদের অনুসরণ করিল।

চণ্ডীমণ্ডপ আজ অন্ধকার। ছিরু পাল আজ চণ্ডীমণ্ডপে বসে নাই। পালের—পাল নয়, আজকাল ঘোষ মশায়!—ঘোষ মহাশয়ের খামার বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ভূপালের আলো গিয়া ওইখানেই প্রবেশ করিল। নিমন্ত্রণই বটে। চণ্ডীমণ্ডপ দেবস্থল, সেখানে এ আসর চলে না। কিন্তু শ্রীহরি আজকাল নাকি—। কথাটা মনে পড়িতেই দুর্গা না হাসিয়া পারিল না।

এক-একটা গরু রাত্রে দড়ি ছিঁড়িয়া মাঠে যাইয়া ফসল খাইয়া ফিরে। যে গরু এ আস্বাদ একবার পাইয়াছে সে আর ভুলিতে পারে না। শিকল দিয়া বাঁধিলেও সে খুঁটা উপড়াইয়া রাত্রে মাঠে যায়। ছিরু পাল নাকি সাধু হইয়াছে। তাই সে হাসিল। কিন্তু নূতন নারীটি কে? একজন কেহ আছেই।

কিন্তু সে কে? দুর্গা কৌতুক সম্বরণ করিতে পারিল না। শ্রীহরির বাড়ীর গোপনতম পথের সন্ধান পর্যন্ত তাহার সুবিদিত, কত রাত্রে সে আসিয়াছে। চুড়িগুলি হাতের উপর তুলিয়া নিঃশব্দে আসিয়া সে শ্রীহরির ঘরের পিছনে দাঁড়াইল। ঘরের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

সে কান পাতিল।

জমাদার বলিতেছিল—নির্ঘাৎ দু-বছর ঠুকে দোব।

শ্রীহরি বলিল—চলুন তা হলে—জোর কমিটি বসেছে। জগন ডাক্তার, শালা হরেন ঘোষাল, গিরশে ছুতোর—অনে কামার তো আছে। দেবু আর নজরবন্দীকেই সব ঘিরে বসেছে। উঠুন তা হলে।

জমাদার বলিল—চা-টা নিয়ে এস জলদি! চা খাওয়া হয়নি আমার।

শ্রীহরি খবর পাঠাইয়াছিল। নজরবন্দীর বাড়ীতে প্রজা সমিতির কামটি বসিয়াছে। জমাদার সাহেবের কাছে সেলাম পাঠানো হইয়াছিল, সেলামির ইঙ্গিতও ছিল। জমাদারের নিজেরও একটা প্রত্যাশা আছে। ডেটিনিউটিকে হাতে-নাতে ধরিয়া ষড়যন্ত্র বা আইনভঙ্গ—যে কোন মামলায় ফেলিতে পারিলে চাকরিতে পদোন্নতি বা পুরস্কার—নিদেনপক্ষে বিভাগীয় একটা সদয়-মন্তব্য লাভ অনিবার্য। সেলামিটা ফাউ। সেলামিটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

দুর্গা শিহরিয়া উঠিল। নিঃশব্দে দ্রুতপদে সে ঘরের পিছন হইতে চলিয়া আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইল। তাহার পর বেশ করিয়া চুড়ি বাজাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক পরমুহূর্তে প্রশ্ন ভাসিয়া আসিল—কে? কে যায়?

—আমি।

—কে আমি?

—আমি বায়েনদের দুর্গা দাসী।

—দুর্গা! আরে—আরে—শোন্—শোন্!

—না।

ভূপাল আসিয়া এবার বলিল—জমাদারবাবু ডাকছে।

একমুখ হাসি লইয়া দুর্গা ভিতরে আসিয়া বলিল—আ মরণ আমার! তাই বলি চেনা গলা মনে হচ্ছে—তবু চিনতে পারছি? জমাদারবাবু! কি ভাগ্যি আমার! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আমি!

জমাদার হাসিয়া বলিল—ব্যাপার কি বল দেখি? আজকাল নাকি পিরীতে পড়েছিস? প্রথম অনে কামার, তারপর শুনছি নজরবন্দীবাবু!

দুর্গা হাসিয়া বলিল—বলছে তো আপনার মিতে পাল মশাই!

পরক্ষণেই সে বলিল—আজকাল আবার গোমস্তা মশাই বলতে হবে বুঝি? ও গোমস্তা মশাই মিছে বলেছে, মনের রাগে বলেছে।

বাধা দিয়া জমাদার বলিল—মনের রাগে? তা রাগ তো হতেই পারে। পুরানো বন্ধুলোককে ছাড়লি কেন তুই?

দুর্গা বলিল—মুচি-পাড়াকে-পাড়া আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে আপনার মিতে। ঘরে টিন দেবার জন্য টাকা চাইলাম। তা আমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিলে আপনার বন্ধুনোক। সত্যি-মিথ্যে শুধোন আপনি। বলুক ও ঘরে আগুন দিয়েছে কিনা?

শ্রীহরির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। জমাদার তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দুর্গা কি বলছে, পাল মশাই! জমাদারের কণ্ঠস্বর মুহূর্তে পাল্টাইয়া গিয়াছে।

দুর্গা লক্ষ্য করিয়া বুঝিল—একটা বুঝা-পড়ার সময় আসিয়াছে—। সে বলিল—ঘাট থেকে আসি জমাদারবাবু।

জমাদার দুর্গার কথার কোন জবাব দিল না। সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল শ্রীহরির দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ দুর্গা খুব ভাল করিয়া জানে। জরিমানা আদায়ের পূর্বরাগ। এ পর্বটা শেষ হইতে বেশ কিছুক্ষণ লাগিবে। ঘাটে যাইবার জন্য বাহির হইয়া, তখনি ফিরিয়া দুর্গা লীলায়িত ভঙ্গিতে দেহে হিল্লোল তুলিয়া বলিল—আজ কিন্তু মাল খাওয়াতে হবে দারোগাবাবু। পাকি মাল,—বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল ঘাটের দিকে।

শ্রীহরির খিড়কী পুকুরের পাড় ঘন জঙ্গলে ভরা। বাঁশের ঝাড়, তেঁতুল, শিরীষ প্রভৃতি গাছ এমনভাবে জন্মিয়াছে যে দিনেও কখনো রৌদ্র প্রবেশ করে না। নিচেটায় জন্মিয়াছে ঘন কাঁটাবন। চারিদিকে উই-ঢিপি। ওই উইগুলির ভিতর নাকি বড় বড় সাপ বাসা বাঁধিয়াছে। শ্রীহরির খিড়কীর পুকুর সাপের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ চন্দ্রবোড়া সাপের জন্য। সন্ধ্যার পর হইতেই চন্দ্রবোড়ার শিশ শোনা যায়। পুকুরঘাটে আসিয়া দুর্গা জলে নামিল না, সে প্রবেশ করিল ওই জঙ্গলে। নিশাচরীর মত নিঃশব্দে নির্ভয় পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে সে জঙ্গলটা অতিক্রম করিয়া আসিয়া নামিল এ-পাশের পথে। এখান হইতে অনিরুদ্ধের বাড়ী কাছেই। ওই মজলিসের আলো দেখা যাইতেছে। ছুটিয়া আসিয়া দুর্গা চকিতে ছায়াছবির মত অনিরুদ্ধের খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

প্রজা সমিতির সভাপতি পরিবর্তনের কাজ তখন শেষ হইয়াছে। অনিরুদ্ধ চা পরিবেশন করিতেছিল। জগন ডাক্তার ভাবিতেছিল—বিদায়ী সভাপতি

হিসাবে সে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিবে। দেবু ভাবিতেছিল—নূতন কর্মভারের কথা। সহসা একটি মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে চকিতে অনিরুদ্ধের খিড়কির দরজার দিকে চলিয়া যাইতে সকলে চমকিয়া উঠিল। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা, দ্রুত পদধ্বনির সঙ্গে আভরণের ঠুন্‌টান্ শব্দ!—কে? কে? কে গেল?

অনিরুদ্ধ দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পদ্ম? এমন করিয়া সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল? কোথায় গিয়াছিল সে?

—কর্মকার!

—কে?

দুর্গা! দুর্গার কণ্ঠস্বর। ক্রোধে বিরক্তিতে অধীর হইয়া অনিরুদ্ধ দুর্গার সম্মুখীন হইল—কি?

দুর্গা সংক্ষেপে শ্রীহরির বাড়ীতে জমাদারের আগমন সংবাদটা দিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতপদে আভরণের মৃদু সাড়া তুলিয়া বিলীয়মান রহস্যের মত চকিতে মিলাইয়া গেল। ছুটিয়া সে আবার সেই পুকুরপাড়ের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘাটে হাত-পা ধুইয়া যখন শ্রীহরির ঘরে সে প্রবেশ করিল—তখন বোধ হয় ঘরে আগুন দেওয়ার মামলা মিটিয়া গিয়াছে। জমাদারের চোখে প্রসন্ন দৃষ্টি। জমাদার দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল—হাঁপাচ্ছিস কেন?

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দুর্গা বলিল—সাপ!

—সাপ! কোথায়?

—খিড়কির ঘাটে। এই প্রকাণ্ড বড়! চন্দ্রবোড়া। এই দেখুন জমাদারবাবু। বলিয়া সে ডান পা-খানি আলোর সম্মুখে ধরিল। একটা ক্ষতস্থান হইতে কাঁচা রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

জমাদার এবং শ্রীহরি উভয়েই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। কি সর্বনাশ! জমাদার বলিল—বাঁধ, বাঁধ। দড়ি, দড়ি। পাল, দড়ি নিয়ে এস।

শ্রীহরি দড়ির জন্য ভিতরে যাইতে যাইতে বিরক্তিভরে বলিল—কি বিপদ! কোথা থেকে বাধা এসে জুটল দেখ দেখি। দড়ি আনিয়া ভূপালের হাতে দিয়া শ্রীহরি বলিল—বাঁধা। জমাদারবাবু, আসুন চট করে ওদিকের কাজটা সেরে আসি।

দুর্গা বিবর্ণমুখে করুণ দৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে জমাদারবাবু?—চোখ তাহার জলে ছল ছল করিয়া উঠিল।

জমাদার আশ্বাস দিয়া বলিল—কোন ভয় নাই।—ভূপালের হাত হইতে

দড়ি লইয়া সে নিজেই বাঁধিতে বসিল ; ভূপালকে বলিল—এক দৌড়ে থানায় গিয়ে লেস্কিন নিয়ে আয়। আর ওঝা কে আছে, ডাক্ এক্ষুনি।

দুর্গা বলিল—আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, জমাদারবাবু। ওগো আমি মায়ের কোলে মরবো গো।

শ্রীহরি বলিল—সেই ভাল। ভূপাল ওকে বাড়ীতে দিয়ে আসুক। দীনু ওরা আর মিস্তে গড়াঞীকে ডাক। ছুটে যাবি আর আসবি। চলুন জমাদারবাবু।

অনিরুদ্ধের দাওয়ায় তক্তপোশের উপর যতীন একা বসিয়াছিল।

জমাদারকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল—ছোট দারোগাবাবু ? এত রাত্রে ?

জমাদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—গিয়েছিলাম অন্য গ্রামে। পথে ভাবলাম আপনার মজলিসটা দেখে যাই। কিন্তু কেউ কোথাও নেই যে !

যতীন হাসিয়া বলিল—আপনি এসেছেন—ঘোষ মশায় এসেছেন, আবার বসুক মজলিস। ওরে উচ্চিংড়ে, চায়ের জল চড়িয়ে দে তো।

*　　　*　　　*

ভূপাল দুর্গাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া ঔষধ ও ওঝার জন্য চলিয়া গেল। দুর্গার মা হাউ-হাউ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার চিৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জুটিয়া গেল। পাতুর বৌ সকরুণ মমতায় বার বার প্রশ্ন করিল—কি সাপ ঠাকুরঝি ? সাপ দেখেছ ?

দুর্গা অত্যন্ত কাতর স্বরে বলিল—ওগো তোমরা ভিড় ছাড় গো !—সে ছট্‌ফট করিতে আরম্ভ করিল। এ-পাড়ার মাতব্বর সতীশ, সে সত্যিই মাতব্বর লোক। সে অনেক ঔষধপাতির খবর রাখে। সাপের ঔষধও সে দুই-চারিটা জানে। সতীশ একরূপ ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল—ঔষধের সন্ধানে। কিছুকাল পর ফিরিয়া আসিয়া একটা শিকড় দিয়া বলিল—চিবিয়ে দেখ দেখি—তেতো লাগছে না মিষ্টি লাগছে ?

দুর্গা সেটাকে মুখে দিয়া পরক্ষণেই ফেলিয়া দিল—থু-থু-থু !

সতীশ আশ্বস্ত হইয়া বলিল—তেতো যখন লাগছে তখন ভয় নাই।

দুর্গা ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া বলিল—মিষ্টিতে গা বমি-বমি করছে গো। বাবা গো—ওই কে আসছে—ওঝা নাকি গো !

ওঝা নয়। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, অনিরুদ্ধ এবং আরো কয়েকজন।

হরেন ঘোষাল চীৎকার করিয়া উঠিল—হঠ যাও, হঠ যাও। সব হঠ যাও।

জগন তাড়াতাড়ি বসিয়া দুর্গার পা-খানা টানিয়া লইল।—হুঁ ! স্পষ্ট দাঁতের দাগ !

পাতুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল ; সে বলিল—কি হবে ডাক্তারবাবু ?

পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া ডাক্তার বলিল—ওষুধ দিচ্ছি দাঁড়া। অনিরুদ্ধ, এই পারমাঙ্গানেটের দানাগুলো ধর দেখি। আমি চিরে দি—তুই দিয়ে দে।

দুর্গা পা-খানা টানিয়া লইল—না, না গো।

—না কি ?

—না না না ! মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিয়ো না, বাবু।

—ঘোষাল ! ধর তো পা-খানা।

ঘোষাল চমকিয়া উঠিল। সে এই অবসরে পাতুর বউয়ের সঙ্গে কটাক্ষ বিনিময় করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

দুর্গা আবার দৃঢ়স্বরে বলিল—না না না !

জগন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তবে মর।

দুর্গা উল্টাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া বোধ করি নীরব কান্নায় সারা হইয়া গেল। তাহার সমস্ত দেহটাই কান্নার আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অনিরুদ্ধের চোখেও জল আসিতেছিল—কোনমতে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল—দুগ্‌গা ! দুগ্‌গা ! ডাক্তার যা বলছে শোন।

দুর্গার কম্পমান দেহখানি অস্বীকারের ভঙ্গিতে নড়িয়া উঠিল।

জগন এবার রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধ চলিয়া গেল ওঝার সন্ধানে। কুসুমপুরে একজন ভাল মুসলমান ওঝা আছে। হরেন একটি বিড়ি ধরাইল।

অনতিদূরে একটা আলো আসিয়া দাঁড়াইল। আলোর পিছনে জমাদার ও শ্রীহরি। ঘোষালও এইবার সরিয়া পড়িল।

দারোগা সতীশকে প্রশ্ন করিল—কেমন আছে ?

—আজ্ঞে ভালো লয়। একেবারে ছটফট করছে।

—গড়াঞী আসে নাই ?

—আজ্ঞে না।

—ঘোষ, আপনি আর একটা লোক পাঠিয়ে দিন। আমি থানা থেকে লেক্সিন পাঠিয়ে দিচ্ছি। আসুন।

দারোগা ও শ্রীহরি চলিয়া গেল।

দুর্গা আরও কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া খানিকটা সুস্থ হইল, বলিল—সতীশ দাদা তোমার ওষুধ ভাল। ভাল লাগছে আমার।—আরও কিছুক্ষণ পর সে উঠিয়া বসিল।

সতীশ বলিল—ওষুধ আমার অব্যর্থ।

দুর্গা বলিল—আমাকে নিয়ে ওপরে চল, বউ!

উপরে বিছানায় বসিয়া দুর্গা মাথার খোঁপায় একটা বেলকুঁড়ির কাঁটা খুলিয়া আলোর সম্মুখে তাহার অগ্রভাগটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল।

পাতুর বউ বলিল—সাপ তুমি দেখেছ, ঠাকুরঝি? কি সাপ?

দুর্গা বলিল—কালসাপ!

অতি প্রচ্ছন্ন একটি হাসির রেখা তাহার ঠোঁটের কোণে কোণে খেলিয়া গেল। সাপে তাহাকে কামড়ায় নাই। কর্মকারের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথেই সে মনে মনে স্থির করিয়া ঘাটে আসিয়া বেলকুঁড়ির কাঁটাটা পায়ে ফুটাইয়া রক্তমুখী দংশনচিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল। নহিলে কি সকলে পালাইবার অবকাশ পাইত, না জমাদার তাহাকে নিষ্কৃতি দিত? মদ খাইয়া জমাদারের যে মূর্তি হয় মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। একটা ভয় ছিল, লোকে তাহার অনিরুদ্ধের বাড়ী যাওয়ার কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। ভাগ্যক্রমে সে কথাটা কাহারও মনেই হয় নাই।

কিন্তু নজরবন্দী, জামাই পণ্ডিত তাহার এ অবস্থার কথা শুনিয়া একবার তাহাকে দেখিতেও আসিল না?

কেহই তো সত্য কথা জানে না, তবু আসিল না? নজরবন্দীর না-হয় রাত্রে বাহির হইবার হুকুম নাই। জমাদার হাজির ছিল গ্রামে, ছিরু পাল রহিয়াছে, তাই নজরবন্দীর না আসার কারণ আছে। কিন্তু জামাই পণ্ডিত? জামাই পণ্ডিত একবার আসিল না কেন?

অভিমানে তাহার চোখে জল আসিল। জগন ডাক্তার আসিয়াছিল, অনিরুদ্ধ আসিয়াছিল; জামাই পণ্ডিত একবার আসিল না!

পাতুর বউ প্রশ্ন করিল—ঠাকুরঝি, আবার জ্বলছে?

—যা বউ, যা তুই। আবার একটুকুন শুই।

—না। ঘুমুতে তুমি পাবে না আজ।

দুর্গা এবার রাগে অধীর হইয়া বলিল—ঘুমোবো না, ঘুমোবো না। আমার মরণ হবে না, আমি মরব না। তুই যা—তুই যা এখান থেকে।

পাতুর বউ এবার রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। দুর্গা বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

—কে? নিচে কে ডাকিতেছে?

—পাতু, দুর্গা কেমন আছে রে?

হ্যাঁ, জামাই পণ্ডিতের গলা। ওই যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

—কেমন আছিস দুর্গা ?—পাতুর সঙ্গে দেবু ঘরে ঢুকিল।

দুর্গা উত্তর দিল না।

—দুর্গা !

দুর্গা এবার মুখ তুলিল, বলিল—যদি এতক্ষণে মরে যেতাম জামাই পণ্ডিত !

দেবু বলিল—আমি খবর নিয়েছি, তুই ভাল আছিস। রাখাল-ছোঁড়া দেখে গিয়ে আমাকে বলেছে।

দুর্গা আবার বালিশে মুখ লুকাইল ; রাখাল-ছোঁড়া খবর করিয়া গিয়াছে ? মরণ তাহার !

দেবু বলিল—বাড়া গিয়ে বসেছি আর মহাগ্রামের ঠাকুর মশায় হঠাৎ কি করি ? এই তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

মউগাঁয়ের ঠাকুর মশায়। দুর্গার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

মহাগ্রামের ঠাকুর মশায়। মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন। সাক্ষাৎ দেবতার মত মানুষ। রাজার বাড়ীতেও যিনি পদার্পণ করেন না, তিনি।

* * *

ন্যায়রত্ন দেবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে দেবুর নিজেরই বিস্ময়ের সীমা ছিল না। নিতান্ত অতর্কিত ভাবে যেন তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই—

যতীনের ওখান হইতে আসিয়া সে ঘরে বসিয়া দুর্গার কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল দুর্গা বিচিত্র, দুর্গা অদ্ভুত, দুর্গা অতুলনীয়া। বিলু সমস্ত শুনিয়া দুর্গার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া দুর্গার কথাই বলিতেছিল। বলিতেছিল—গল্পের সেই লক্ষহীরে বেশ্যার মত—দেখো তুমি,—আসছে জন্মে ওর ভাল ঘরে জন্ম হবে, যাকে কামনা করে মরবে সে-ই ওর স্বামী হবে।

ঠিক এই সময়েই বাহির দরজায় কে ডাকিল—মণ্ডল মশায় বাড়ী আছেন ?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবু ঠাহর করিতে পারিল না—কে ! কিন্তু সে কণ্ঠস্বর আশ্চর্য সম্ভ্রমপূর্ণ। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে ?

বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিল।

—আমি। আলো হাতে একটি লোকের পিছন হইতে বক্তা উত্তর দিল—আমি বিশ্বনাথের পিতামহ।

দেবু সবিস্ময়ে সম্ভ্রমে হতবাক হইয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। বিশ্বনাথের পিতামহ—পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন। তাহার শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া সেই পথের ধূলার উপরেই সে ন্যায়রত্নের পায়ে প্রণত হইল।

—তোমাকে আশীর্বাদ করতেই এসেছি। কল্যাণ হোক, ধর্ম যেন তোমাকে কোনকালে পরিত্যাগ না করেন। জয়স্তু। তোমার জয় হোক।

বলিয়া তাহার মাথার উপর হাত রাখিলেন। বলিলেন—ঘরটা খোল তোমার, একটু বসব।

দেবুর এতক্ষণে খেয়াল হইল। সে তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া দিল; দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বিলু সব দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল। সে ভিতরের দিক হইতে বাহিরের ঘরে আসিয়া পাতিয়া দিল তাহার ঘরের সর্বোত্তম আসনখানি। তারপর একটি ঘটি হাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—পা ধুইয়ে দেবে মা? প্রয়োজন ছিল না।

বিলু দাঁড়াইয়া রহিল। ন্যায়রত্ন এবার পা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—দাও।

বিলু পা ধুইয়া দিয়া সযত্নে একখানি পুরাতন রেশমী কাপড় দিয়া পা মুছিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমার ছেলেকে আনো মণ্ডল। তাকে আমি আশীর্বাদ করব।

বিস্ময়ে যেন দেবুর চারিপাশে এক মোহজাল বিস্তার করিয়াছিল; কোন অজ্ঞাত পরমভাগ্যে তাহার কুটিরে এই রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়াছেন স্বর্গের দেবতা; পরম কল্যাণের আশীর্বাদ-সম্ভার লইয়া আসিয়াছেন তাহার ঘর ভরিয়া দিতে।

বিলু ঘুমন্ত শিশুকে আনিয়া ন্যায়রত্নের পায়ের তলায় নামাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন শিশুটির দিকে চাহিয়া দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন—বিশ্বনাথের খোকা এর চেয়ে ছোট। এই তো সবে অন্নপ্রাশন হল, তার বয়স আট মাস।

তারপর ঘুমন্ত শিশুর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—দীর্ঘায়ু হোক, ভাগ্য প্রসন্ন হোক।—

কথা শেষ করিয়া গায়ের চাদরের ভিতরের খুঁট খুলিয়া বাহির করিলেন—দুইগাছি বালা। হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—ধর।

দেবু ও বিলু অবাক হইয়া গেল—এ বালা যে খোকারই বালা! আজই বন্ধক দেওয়া হইয়াছে।

—ধর। আমার কথা অমান্য করতে নেই। ধর মা, তুমি ধর।

বিলু হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল—হাত তাহার কাঁপিতেছিল।

—ছেলেকে পরিয়ে দাও মা। আজ অশোক-ষষ্ঠীর দিন, অশোক আনন্দে সংসার তোমাদের পরিপূর্ণ হোক।

তারপর হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বনাথের স্ত্রী, আমার রাজ্ঞী শকুন্তলা। তিনি

এসে আমায় সংবাদটা দিলেন। বাউড়ী-বায়েনদের গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার সংবাদ আমি পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম—কাউকে পাঠিয়ে দি—গরুগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে আসুক। গো-মাতা ভগবতী অনাহারে থাকবেন। আর ওই গরীবদের হয়তো যথাসর্বস্ব যাবে গরুর মাশুল দিতে। এমন সময় সংবাদ পেলাম—দেবু মণ্ডল গরুগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। আশ্বস্ত হলাম। মনে মনে তোমাকে আশীর্বাদ করলাম। মনে হল—বাঁচব, আমরা বাঁচব। মনে হল সেই গল্পের কথা। সঙ্কল্প করলাম—একদিন তোমাকে ডাকব, আশীর্বাদ করব। সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথের স্ত্রী এসে বললে—দাদু, শিবকালীপুরের পণ্ডিতের কাজ দেখুন তো! ষষ্ঠীর দিন—আজ সে ছেলের হাতের বালা বন্ধক দিয়েছে আমাদের চাটুজ্যেদের গিন্নীর কাছে। গিন্নী আমায় দেখিয়ে বললে—দেখ তো নাতবৌ, পনের টাকায় ভাল হয় নাই? আমার মনটা আবার ভরে উঠল, মণ্ডল মশায়, অপার আনন্দে। মনে মনে বার বার তোমাকে আশীর্বাদ করলাম। তবু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। ষষ্ঠীর দিন শিশুর অলঙ্কার, অলঙ্কারের জন্য শিশু হয়তো কেঁদেছে। আমি তৎক্ষণাৎ নিয়ে এলাম ছাড়িয়ে। কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে প্রবৃত্তি হল না। নিজেই এলাম। তোমাকে আশীর্বাদ করতে এলাম। তুমি দীর্ঘজীবী হও; তোমার কল্যাণ হোক। ধর্মকে তুমি বন্দী করে রাখ কর্মের বন্ধনে। তোমার জয় হোক। দাও মা, বালা পরিয়ে দাও ছেলেকে। মণ্ডল, টাকা যখন তোমার হবে, আমায় দিয়ে এস; তোমার পুণ্য, তোমার ধর্মকে আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।

টপ টপ করিয়া দেবুর চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িল।

বিলুর চোখ হইতে ধারা বহিতেছিল। সে বালা দুইগাছি ছেলেকে পরাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কেঁদ না, একটা গল্প বলি শোন।

এমন সময় যতীন আসিয়া ডাকিল—দেববাবু!

যতীনবাবু আসুন—আসুন।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া প্রশ্ন করলেন—ইনি!

দেবু যতীনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। যতীন কয়েক মুহূর্ত ন্যায়রত্নকে দেখিল; তারপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনার নাতি বিশ্বনাথবাবুকে আমি চিনি।

ন্যায়রত্ন প্রথমে নমস্কার করিয়া পরে যতীনকে আশীর্বাদ করিলেন।

তারপর প্রশ্ন করিলেন—চেনেন তাকে? আপনাদের সঙ্গে সে বুঝি সমযোগ্রীয়?

এ প্রশ্নে যতীন প্রথমে একটু বিস্মিত হইল; তারপর অর্থটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—গোত্র এক, গোষ্ঠী ভিন্ন।

ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

যতীন বলিল—তারা নাপিত আমায় সংবাদ দিলে, আমি ছুটে এলাম। আপনাকে দেখতে এলাম।

—দেখবার বস্তু আর কিছু নাই—দেশেও নাই—মানুষেও নাই। প্রকাণ্ড সৌধ, বটবৃক্ষ জন্মে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চোখেই তো দেখছেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন—তাই মধ্যে মধ্যে যখন দুর্যোগে বজ্রঘাতের আঘাতকে প্রতিহত করতে দেখি সেই সৌধের কোন অংশকে, তখন আনন্দ হয়। আজ মণ্ডল আমাকে সেই আনন্দ দিয়েছে।

দেবু কথাটা পরিবর্তন করিবার জন্য বলিল—আপনি একটা গল্প বলবেন বলছিলেন?

—গল্প? হ্যাঁ বলি শোন।—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, মহাকর্মী, মহাপুণ্যবান। জ্যোতির্ময় ললাট, সৌভাগ্যলক্ষ্মী স্বয়ং ললাট-মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম ছিল মহৎ এবং প্রতি কর্মেই ছিল সাফল্য; কারণ যশোলক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর কর্মশক্তিতে। তাঁর কুল ছিল অকলঙ্ক, পত্নী-পুত্র কন্যা-বধূর গৌরবে অকলঙ্ক কুল উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল—কারণ কুললক্ষ্মী তাঁর কুলকে আশ্রয় করেছিলেন। পাপ অহরহ ঈর্ষাতুর অন্তরে ব্রাহ্মণের বাসভূমির চারিদিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর সহ্য হয় না। বহু চিন্তা করে সে একদিন সঙ্গে করে আনল অলক্ষ্মীকে। বাড়ীর বাইরে থেকে ব্রাহ্মণকে ডাকলে। ব্রাহ্মণ বললেন—কি চাও বল?

পাপ বলল—আমি বড় দুর্ভাগা। দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই। আমার সঙ্গিনীটিকে আপনি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিন—এই আমার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি গৃহস্থ; আশ্রয়প্রার্থী দুঃস্থকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধর্ম। বেশ, থাকুন উনি। বধূ-কন্যার মতই যত্ন করব। ইচ্ছা হলে যতদিন দুর্ভাগ্যের শেষ না হয়, ততদিন তুমিও থাকতে পার। এস, তুমি এস।

আহ্বান সত্ত্বেও পাপ কিন্তু পুরপ্রবেশ করতে সাহস করল না। কারণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে রয়েছেন ধর্ম।

যাক অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় ঘটল। ফলবান বৃক্ষগুলির ফল যেন নীরস হয়ে গেল, ফুল ম্লান হল।

রাত্রে ব্রাহ্মণ জপ করছেন—এমন সময় শুনতে পেলেন এক করুণ কান্না। কেউ যেন করুণ স্বরে কাঁদছে। বিস্মিত হয়ে জপ শেষ করে উঠতেই তিনি

দেখলেন—তাঁরই ললাট থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতি, সেই জ্যোতি ক্রমে এক নারীমূর্তি ধারণ করল। তিনিই এতক্ষণ কাঁদছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন—কে মা তুমি? রমণী মূর্তি বললেন—আমি তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী। এতদিন তোমার ললাটে আশ্রয় করেছিলাম, আজ তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে তাই কাঁদছি।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—একটা প্রশ্ন করব, মা? আমার অপরাধ কি হল?

—তুমি আজ অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ। ওই মেয়েটি অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মী এবং আমি তো একসঙ্গে বাস করতে পারি না।

ব্রাহ্মণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রণাম করলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। তিনি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে দেখলেন বৃক্ষের ফল খসে গেছে, ফুল শুকিয়ে গেছে। সরোবর হয়েছে ছিদ্রময়ী, জল ছিদ্রপথে অদৃশ্য হয়েছে। ভূমি হয়েছে শস্যহীনা, গাভী হয়েছে দুগ্ধহীনা। গৃহ হয়েছে শ্রীহীন।

রাত্রে আবার সেই রকম কান্না। আবার দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন এক দিব্যাঙ্গনা। তিনি বললেন—আমি তোমার যশোলক্ষ্মী। অলক্ষ্মীকে তুমি আশ্রয় দিয়েছে, ভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ নীরবে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন তিনি শুনলেন—লোকে তাঁর অপযশ ঘোষণা করছে, বলছে—ব্রাহ্মণ লম্পট, ওই যে মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে—তার দিকে তার কু-দৃষ্টি পড়েছে। তিনি প্রতিবাদ করলেন না।

সেদিন রাত্রে আর এক নারী-মূর্তি তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁর কুললক্ষ্মী। বললেন—অলক্ষ্মী এসেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী চলে গেছেন, যশোলক্ষ্মী চলে গেছেন, লোকে তোমার কলঙ্ক রটনা করছে; আমি কুললক্ষ্মী, আর কেমন করে থাকি তোমাকে আশ্রয় করে? তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক মূর্তি। নারী নয়—পুরুষ-মূর্তি। দিব্য ভীমকান্তি, জ্যোতির্ময় পুরুষ। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে?

দিব্যকান্তি পুরুষ বললেন—আমি ধর্ম।

—ধর্ম? আপনি আমাকে পরিত্যাগ করছেন কোন্ অপরাধে?

—অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি।

—সে কি আমি অধর্ম করেছি ?

ধর্ম চিন্তা করে বললেন—না।

—তবে ?

—ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ত্যাগ করেছেন।

—আশ্রয়প্রার্থী বিপদগ্রস্তকে আশ্রয় দেওয়া যখন অধর্ম নয়, তখন আমার অধর্মের জন্য তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নি। পরিত্যাগ করেছেন অলক্ষ্মীর সংস্পর্শ সইতে না পেরে।

—হ্যাঁ।

—ভাগ্যলক্ষ্মীকে অনুসরণ করেছেন যশোলক্ষ্মী, তাঁর পেছনে গেছেন কুললক্ষ্মী, আমি প্রতিবাদ করি নি। কারণ ওই তাঁদের পন্থা। একের পিছনে এক আসেন, আবার যাবার সময় একের পিছনে অন্যে যান। কিন্তু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন কোন্ অপরাধে ?

ধর্ম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না ; কারণ আপনাকে অবলম্বন করেই আমি বেঁচে রয়েছি। আপনাকে আমি যেতে না বললে—আপনার যাবার অধিকার নাই। আমিই আপনার অস্তিত্ব।

ধর্ম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, নিজের ভ্রম বুঝলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বললেন "—তথাস্তু। তোমার জয় হোক। বলে তিনি আবার ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হলেন।"

ন্যায়রত্নের গল্প বলার ভঙ্গি অতি চমৎকার। প্রথম জীবনে তিনি নিয়মিত ভাগবত কথকতা করিতেন। তাঁহার বর্ণনায়, স্বর-মাধুর্যে, ভঙ্গিতে একটি মোহজালের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি স্তব্ধ হইলেন।

কিছুক্ষণ পর যতীন বলিল—তারপর ?

—তারপর ? ন্যায়রত্ন হাসিলেন, বলিলেন—

—তারপর সংক্ষিপ্ত কথা। ধর্মের প্রভাবে সেইদিন রাত্রে উঠল আবার এক ক্রন্দনধ্বনি ! ব্রাহ্মণ দেখলেন সেই অলক্ষ্মী মেয়েটি এসে বলছে—আমি যাচ্ছি। —আমি চললাম।

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি স্বেচ্ছায় বিদায় চাও ?

—স্বেচ্ছায়। স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। সে মিলিয়ে গেল।

সেইদিন রাত্রেই। ফিরলেন ভাগ্যলক্ষ্মী, ফিরলেন তারপর যশোলক্ষ্মী, তারপর কুললক্ষ্মী।

যতীন বলিল—চমৎকার কথা। লক্ষ্মীই দেয় যশ—সে-ই পবিত্র করে কুল। তাই তাকে নিয়ে এত কাড়াকাড়ি। লক্ষ্মীই সব।

—না, ন্যায়রত্ন বলিলেন—না, ধর্ম। মণ্ডল, সেই ধর্মকে তুমি অবলম্বন করেছ বলেই আজ আশা হচ্ছে। সেই আনন্দেই আমি ছুটে এসেছি। আচ্ছা, আমি চলি আজ, মণ্ডল।

ঠিক এই সময়ে সংবাদ আসিল—দুর্গাকে সাপে কামড়াইয়াছে। রাখাল ছোঁড়াটা বলিল—ভাল আছে। উঠে বসেছে।

দেবু ন্যায়রত্নকে আগাইয়া দিতে বাহির হইল। পথে যতীন বিদায় লইয়া আপন দাওয়ায় উঠিয়া তক্তপোশের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিল।

চব্বিশ

যতীনের মনের অবস্থা বিচিত্র। পল্লীগ্রামের কোন্ নিভৃত কোণে বাস করে ওই বৃদ্ধ—তার চারিপাশে এই ধ্বংসোন্মুখ পারিপার্শ্বিক—অজ্ঞান-অশিক্ষা-দারিদ্র্য, হীনতার তীর্থ। কঠিন জীবন-সংগ্রাম এখানে নিপুণ সরীসৃপের সুকঠিন বেষ্টনীর মত শ্বাসরোধ করিয়া ক্রমশ চাপিয়া ধরিতেছে। ইহারই মধ্যে কেমন করিয়া প্রশান্ত অবিচলিতচিত্ত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ স্বচ্ছ ঊর্ধ্বগদৃষ্টি মেলিয়া পরমানন্দে বসিয়া আছেন! অসীম জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছেন লবণাক্ত সমুদ্রতলে মুক্তাগর্ভ শুক্তির মত। এই মুহূর্তে ইহা এক পরমাশ্চর্যের মত মনে হইল।

দণ্ডে দণ্ডে প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম করিয়া রাত্রি ঘন গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল, পেঁচা ডাকিয়া গিয়াছে। কোন একটা গাছে বসিয়া একটা পেঁচা এখনও মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। এ ডাক অন্য রকমের ডাক—প্রহর ঘোষণার ডাকের সহিত কোন মিল নাই। প্রহরের ডাকের মধ্যে স্পষ্ট একটি ঘোষণার সুর আছে। গাছের কোটরের মধ্যে থাকিয়া অপরিণত কণ্ঠে চাপা শিশের শব্দের মত করিয়া অবিরাম একঘেয়ে ডাকিয়া চলিয়াছে উহাদের শাবকের দল। বনেজঙ্গলে পথেঘাটে ঘরে, চারিদিকে, আশে-পাশে অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে—অসংখ্য কোটি পতঙ্গের সাড়ার। অন্ধকার শূন্যপথে কালো ডানা সশব্দে আস্ফালন করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে বাদুড়ের দল—একটার পর একটা, তারপর একসঙ্গে তিনটা আবার একটা। সেদিন বৃষ্টির পর আকাশ এখনও স্বচ্ছ, নীল। তারাগুলি পূর্ণদীপ্তিতে দীপ্যমান। চৈত্র মাসের বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে; সে বাতাসের সর্বাঙ্গ ভরিয়া

ফুলের গন্ধের অদৃশ্য অরূপ সম্ভার। শেষ প্রহরে বাতাস হিমের আমেজে ক্রমশঃ ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। গল্পটি তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। ঐ বৃদ্ধ এবং ঐ গল্পের মধ্যে সে আজ পল্লীর জীবনমন্ত্রের আভাস পাইয়াছে! যুগ যুগ ধরিয়া ওই বৃদ্ধেরাই তাহাদের ঐ গল্প শুনাইয়া আসিতেছে। গল্পটি সত্যই ভাল—ভাল শুধু নয়—সত্য বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছে। শুধু এক জায়গায় খট্‌কা লাগিয়াছে। অলক্ষ্মীর আগমনে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অন্তর্ধান—কথাটি মৌলিক সত্য কথা। ভাগ্যলক্ষ্মীর অভাবে কর্মশক্তি পঙ্গু হয়, যশোলক্ষ্মী চলিয়া যান। লক্ষ্মীহীন হৃতকর্মশক্তি মানুষের কুলগৌরব ক্ষুণ্ণ করে। উচ্চিংড়ের মা চলিয়া গিয়াছে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের পিওনের সঙ্গে। কিন্তু ধর্ম বলিতে বৃদ্ধ কি বুঝাইতেছেন, ঐ প্রশ্নটা তাঁহাকে করা হয় নাই। অনেক চিন্তা করিয়াও সে এমন কোন উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না—যাহার সহিত পৃথিবীর নব-উপলব্ধ সত্যের একটি সমন্বয় হয়। সে ক্লান্ত হইয়া শূন্য-মস্তিষ্কে রাত্রির পল্লীর দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রগাঢ় দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে পল্লীটা যেন হারাইয়া গিয়াছে। অনুমানে নির্দেশ করা যায় সামনেই পথের ওপারে সেই ডোবাটা। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সন্ধ্যের সময় ঘাটটিতে একবার কেরোসিন ডিবি দেখা যায়, দু'টি মেয়ে ডিবি হাতে বাসন ধুইয়া লইয়া যায়। ডিবির আলোয় তাহাদের মুখ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পায় যতীন। ঘাট হইতে উঠিয়াই তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া কপাট দেয়। পল্লীটার অধিকাংশ ঘরেই সে সন্ধ্যাতেই খিল পড়ে। শ্রীহরি ঘোষ এবং জগন ডাক্তার বা তাহার নিজের এখানে ছোটখাটো একটা করিয়া বিরোধী মজলিস এসবের পরেও জাগিয়া থাকে। কিন্তু সেই-বা কতক্ষণ? দশটা বাজিতে না বাজিতে পল্লীটা নিস্তব্ধ হইয়া যায়।

যতীন একবার ভাল করিয়া গ্রামখানার দিকে চহিয়া দেখিল। প্রগাঢ় অন্ধকারে সুষুপ্ত নিথর পল্লীটার ভঙ্গির মধ্যে নিতান্ত অসহায় শিশুর আত্মসমর্পণের ভঙ্গি যেন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—তাহার জন্মস্থান—মহানগরী কলিকাতাকে। কলিকাতাকে সে বড় ভালবাসে। মহানগরী কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠনগরী-সমূহের অন্যতমা। দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকারের প্রভাব সেখানে কতটুকু? দিনেও সেখানে আলো জ্বলে; রাত্রে পথের পাশে-পাশে আলোয়-আলোয় আলোময়। মানুষের তপস্যার দীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে রাত্রির অন্ধকার মহানগরীর অবশ তনুর মত অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মোড়ে মোড়ে বিটের

প্রহরী জাগ্রত-চক্ষে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করে—সে জাগিয়া আছে। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহার গবেষণার বস্তুর দিকে। গতিশীল দণ্ড স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে যন্ত্রী; যন্ত্র চলিতেছে—উৎপাদন চলিতেছে অবিরাম। জল আলোড়িত করিয়া জাহাজ চলিয়াছে, পোর্ট কমিশনারের লাইনের উপর ট্রেন চলিয়াছে; সাইডিংয়ে শান্টিং হইতেছে। পথে গর্জন করিয়া মোটর চলিয়াছে; মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চক আবেশ জাগাইয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে অশ্বক্ষুরধ্বনি। মহানগরী চলিয়াছেই—চলিয়াছেই—দিনে রাতে, গতির তাহার বিরাম নাই। আসা যাওয়ায়, ভাঙা-গড়ায়, হাসি-কান্নায় নিত্য তাহার নব নব রূপের অভিনব অভিব্যক্তি! তারও একটা অন্ধকার দিক আছে। কিন্তু সে থাক।

পল্লীর কিন্তু সেই একই রূপ! অদ্ভুত পল্লীগ্রাম। বিশেষ এদেশের পল্লীগ্রাম। সমাজ-গঠনের আদিকাল হইতে ঠিক একই স্থানে অনন্ত-পরমায়ু পুরুষের মত বসিয়া আছে। ইণ্ডিয়ান ইকন্‌মিক্‌স-এর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। Sir Charles Metcalfe বলিয়া গিয়াছেন—

'They seem to last where nothing else lasts'···অদ্ভুত! 'Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds revolution; Hindu, Pathan, Mogul, Mahratta, Sikh, English are masters in turn, but the village community remains the same'.

সে কি কোনদিন নড়িবে না? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন শুরু হইয়াছে। সর্বত্র নববিধানের সাড়া উঠিয়াছে। এ দেশের পল্লীতে কি জীর্ণ স্থবির পুরাতনের পরিবর্তন হইবে না?

বিপ্লবী তরুণ, তাহার কল্পনার চোখে অনাগত কালের নূতনত্বের স্বপ্ন। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বৃদ্ধ বলিয়া গেলেন—প্রকাণ্ড সৌধ বটবৃক্ষের শিকড়ের চাপে ফাটিয়া গিয়াছে। সে সেই ভাঙনের মুখে আঘাত করিতে বদ্ধপরিকর। সেই ধর্মে সে যেখানে ক্ষুদ্রতম দ্বন্দ্ব দেখে, সেইখানেই যে দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করিয়া তোলে!

বাড়ীর ভিতর হইতে দরজায় আঘাতের শব্দ হইল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—মা-মণি?

—হ্যাঁ। পদ্ম তিরস্কার করিয়া বলিল—তুমি কি আজ শোবে না? অসুখ-বিসুখ একটা না করে ছাড়বে না দেখছি!

—যাচ্ছি। যতীন হাসিল।

—যাচ্ছি নয়, এখুনি শোবে এস। আমি বরং বাতাস করে ঘুম পাড়িয়ে দি। এস! এস বলছি!

—তুমি গিয়ে শোও। আমি এক্ষুনি শোব।

—না। তুমি এক্ষুনি এস। এস। মাথা খুঁড়ব বলে দিচ্ছি।

যতীন ঘরের ভিতর না গিয়া পারিল না। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই, পদ্ম বলিল—এদিকের দরজা খুলে দাও। বাতাস করি।

—দরকার নেই।

—না। দরকার আছে।

যতীন দরজা খুলিয়া দিল। পদ্ম যতীনের শিয়রে পাখা লইয়া বসিল। বলিল—একজন বেরিয়েছে দুগ্‌গাকে সাপে কামড়েছে বলে—এখনও ফিরল না। তুমি—

—অনিরুদ্ধবাবু এখনও ফেরেন নাই!

—না। দাঁড়াও; দুগ্‌গা মরুক আগে, তারপর ফিরবে চোখে জলে ভাসতে ভাসতে। দুনিয়ার এত লোক মরে—ওই হারামজাদী মরে না!

যতীন শিহরিয়া উঠিল। পদ্মের কণ্ঠস্বরে ভাষায় সে কী কঠিন আক্রোশ! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিছুক্ষণ পরই তাহার কানে একটা দূরাগত বিপুল শব্দ যেন জাগিয়া উঠিল। দ্রুততম গতিতে শব্দটা আগাইয়া আসিতেছে। ঘরে দুয়ারে একটা কম্পন জাগিয়া উঠিতেছে। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল—ভূমিকম্প!

হাসিয়া পদ্ম বলিল—কি ছেলে মা! যেন দেয়ালা করছে! ও ভূমিকম্প নয়, ডাকগাড়ী যাচ্ছে। শোও দেখি এখন।

—ডাকগাড়ী? মেল ট্রেন?

—হ্যাঁ, ঘুমোও।

সেই মুহূর্তেই তীব্র হুইসিলের শব্দ করিয়া ট্রেন উঠিল ময়ূরাক্ষীর পুলে—, ঝমঝম শব্দে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঘর-দুয়ার থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। জংশন-স্টেশনে আলো জ্বলিতেছে। সেখানকার কলে রাত্রেও কাজ চলে। ময়ূরাক্ষীর ওপারেই জংশন। যতীন অকস্মাৎ যেন আশার আলোক দেখিতে পাইল। পল্লী কাঁপিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে পাখা রাখিয়া পদ্ম সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাক, ঘুমাইয়াছে। উপরে মশারি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া আসা হয় নাই, উচ্চিংড়েটাকে হয়তো মশায় ছিঁড়িয়া ফেলিল।

যতীনের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল। উপর হইতে কখন নামিয়া আসিয়াছে উচ্চিংড়ে। আপন মনেই—এই তিন প্রহর রাত্রে উঠানে বসিয়া একা-একাই কড়ি খেলিতেছে।

শেষরাত্রে ঘুমাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিতে দেরি হইয়াছিল। তাহাকে তুলিল পদ্ম।—ওঠ ছেলে! ওঠ!

উঠিয়া বসিয়া যতীন বলিল—অনেক বেলা হয়ে গেছে, না?

—ওদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল!

—সর্বনাশ হয়ে গেল?

—ছিরু পাল লেঠেল নিয়ে এসে গাছ কাটছে। সব ছুটে গেল, দাঙ্গা হবে হয়তো।

—কে ছুটে গেল, অনিরুদ্ধবাবু?

—সব—সব। পণ্ডিত, জগন ডাক্তার, ঘোষাল—বিস্তর লোক।

যতীন খুশী হইয়া উঠিল। বলিল—বেশ কড়া করে চা কর দেখি মা-মণি।

—তুমি কিন্তু নাচতে নাচতে যেয়ো না যেন।

—তবে আমায় ডাকলে কেন?

পদ্ম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিক—জানি না—

সত্যই সে খুঁজিয়া পাইল না কেন সে যতীনকে ডাকিল।

—মুখ হাত ধোও। আমি চা করছি।

—উচ্চিংড়ে কই?

—সে 'বানের আগে কুটো'—সে ছুটে গিয়েছে দেখতে।

গতকল্যকার অপমানের শোধ লইয়াছে শ্রীহরি। বাউড়ী-বায়েনদের কাছে মাথা হেঁট হইয়াছে। শুধু অপমান নয়—তাহার মতে, এটা গ্রামের শৃঙ্খলা ভাঙিবার একটা অপচেষ্টা। তাহার উপর দুর্গা তাহাদিগকে যেভাবে ঠকাইল সে সত্যটা ঘণ্টা দুয়েক পরেই মনে মনে বুঝিয়া ও জানিতে পারিয়া সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং যাহারা ইহার সঙ্গে জড়াইয়া আছে তাহাদের শাস্তি ব্যবস্থা সে কাল সেই গভীর রাত্রেই করিয়া রাখিয়াছে।

কালু সেখ মারফৎ লাঠিয়ালের ব্যবস্থা করিয়া আজ সকালে সে জমিদারের গোমস্তা হিসাবে দেবু, জগন, হরেন ও অনিরুদ্ধের গাছ কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। গাছগুলি জমিদারের পতিত ভূমির উপর আছে। পূর্বকালে চাষী প্রজারা এমনই ভাবে গাছ লাগাইত, ভোগদখল করিত; জমিদার আপত্তি করিত না। প্রয়োজন হইলে, প্রজাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া জমিদার ফলও

পাড়িত, ডালও কাটিত। কিন্তু এমনভাবে সমূলে উচ্ছেদ কখনও করিত না। করিলে বহু পূর্বকালে—একশো বছর পূর্বে জমিদার প্রজায় দাঙ্গা বাধিত। পঞ্চাশ বৎসরে পরে সে যুগ পাল্টাইয়াছিল। তখন প্রজা জমিদারের হাতে-পায়ে ধরিত, ঘরে বসিয়া গাছের মমতায় কাঁদিত। অকস্মাৎ আজ দেখা গেল, আবার তাহারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

যতীন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল—সংবাদের জন্য। শেষ পর্যন্ত খুনখারাপী হইয়া গেলে সে একটা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইবে। উদ্বিগ্নভাবে সে ভাবিতেছিল—তাহার যাওয়া কি উচিত হইবে? তাহাকে এই ব্যাপারে কোনমতে জড়াইতে পারিলে—সমগ্র ঘটনারই রঙ পাল্টাইয়া যাইবে।

পদ্ম ইহারই মধ্যে তিনবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গিয়াছে—সে ঘরে আছে কি না!

যতীন শেষবারে বলিল—আমি যাই নি মা-মণি। আছি।

—তোমাকে বিশ্বাস নাই। সাংঘাতিক ছেলে তুমি।

যতীন হাসিল।

—হেসো না তুমি, হ্যাঁ। কথা বলিতে বলিতে পদ্ম পথের দিকে চাহিয়া বলিল—ওই। ওই লাও, নেলো আসছে। দাও পয়সা দাও।

সেই চিত্রকর ছেলেটি—বৈরাগীদের নেলো আসিতেছে। পয়সার প্রয়োজন হইলেই নেলো আসে। অন্যথায় সে আসে না। নিঃশব্দে আসে—চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, প্রশ্ন না থাকিলে, প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পারে না; কিন্তু উঠিয়া যায় না, বসিয়াই থাকে। প্রশ্ন করিলে সংক্ষেপে বলে—পয়সা। দাবিও বেশী নয়, চার পয়সা হইতে চার আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজ কিন্তু নেলো একটু উত্তেজিত, মুখের গৌরবর্ণ রং রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে, চোখের তারা দুটি অস্থির; সে আসিয়া আজ বসিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

—কি নলিন? পয়সা চাই?

—পণ্ডিতের মাথা ফেটে গিছে।

—কার? দেবুবাবুর?

—হ্যাঁ। আর কালীপুরের চৌধুরী মশায়ের।

—দ্বারকা চৌধুরী মশায়ের?

—হ্যাঁ। পণ্ডিতের আমগাছ কাটছিল, পণ্ডিত একেবারে কুড়ুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—তারপর?

—লেঠেলদের সঙ্গে পণ্ডিতের ঠেলাঠেলি লেগে গেল। চৌধুরী মশায় গেল ছাড়াতে। তা লেঠেলরা দুজনকেই ঠেলে ফেলে দিল।

—ফেলে দিলে ?

—হ্যাঁ। গাছ কাটছিল, সেই কাটা শেকড়ে লেগে দুজনকারই মাথা ফেটে গেল।

—তারপর ?

—খুব রক্ত পড়ছে। ধরাধরি করে ধরে নিয়ে আসছে।

—অন্য লোকেরা কি করছিল ?

—সব দাঁড়িয়েছিল, কেউ এগোয় নাই। কর্মকার কেবল একজন লেঠেলকে এক লাঠি মেরে পালিয়েছে।

—জগন ডাক্তার কোথায় ?

—সে জংশনে গিয়েছে—পুলিসের কাছে।

যতীন ঘরে ঢুকিয়া লিখিতে বসিল; টেলিগ্রাম। একখানা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে—একখানা এস-ডি-ওর কাছে। আর একখানা চিঠি—এ জেলার জেলা-কংগ্রেস কমিটির কাছে। চিঠিখানা গোপনে পাঠাইতে হইবে।

টেলিগ্রাম করিতে ডাক্তারকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এ পত্রখানা জগনের হাতে দেওয়া হইবে না। দেবু ভাল থাকিলেই তাহাকে সদরে পাঠানো সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হইত। সে একটু ভাবিয়া নেলোকে ডাকিয়া বলিল—একটা কাজ করতে পারবে ?

নলিন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—হ্যাঁ।

—একখানা চিঠি জংশনের ডাকঘরে ফেলতে হবে। একটা চার পয়সার টিকিট কিনে বসিয়ে দেবে। কেমন ?

নলিন আবার সেই ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

—কাউকে দেখিয়ো না যেন।

নলিনের আবার সেই নীরব স্বীকৃতি।

—এই চার পয়সার টিকিট কিনবে। আর এই চার পয়সার তুমি জল খাবে।

নলিন চিঠিখানি কোমরে রাখিয়া তাহার উপর সযত্নে ভাঁজ করিয়া কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল। আনি দুইটি বাঁধিল খুঁটে। তারপর ঘাড় হেঁট করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

সমস্ত গ্রামখানা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানায় দেবু ও চৌধুরীকে আনা হয়েছিল। দেবু নিজে হাঁটিয়াই আসিয়াছে। তাহার আঘাত তেমন বেশী নহে, তাছাড়া তাহার জোয়ান বয়স—উত্তেজনাও যথেষ্ট হইয়াছিল; রক্তপাত বেশ খানিকটা হইলেও সে ভীত বা অবসন্ন হয় নাই। কিন্তু বৃদ্ধ চৌধুরী কাতর হইয়া পড়িয়াছে, আঘাতও তাহারই বেশী। প্রথমে চৌধুরী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল; চেতনা হইলেও ধরাধরি করিয়া বহিয়া আনিতে হইয়াছে। চৌধুরী চোখ বুজিয়া শুইয়াই আছে। দেবু নীরবে বসিয়া আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়া। ধুইয়া দেওয়ার পর রক্তাভ জলের ধারা কপাল বহিয়া এখনও ঝরিতেছে। প্রায় সমস্ত গ্রামের লোকই জগনের ডাক্তারখানার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

টিঞ্চার আয়োডিন, তুলা, গরম জল, ব্যাণ্ডেজ লইয়া জগন ব্যস্ত। হরেন তাহাকে সাহায্য করিতেছে। মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে—হট যাও। ভিড় ছাড়ো।

রাঙাদিদি একটা গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছে। দুর্গা দাঁতে দাঁত টিপিয়া নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় ডাক্তারখানায় যতীন আসিয়া উঠিল।

জগন বলিল—গাছ সব আটকে দিয়েছি—পুলিস এসে নোটিশ জারি করে দিয়েছে। কোন পক্ষই গাছের কাছে যেতে পারে না। আমি বারণ করে গেলাম, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু করো না। কাটুক গাছ। ফিরে এসে দেখি—দেবু এই কাণ্ড করে বসে আছে। অনিরুদ্ধ একজনের পিঠে এক লাঠি কসে পালিয়েছে।

ভিড়ের ভিতর হইতে অনিরুদ্ধ আগাইয়া আসিয়া বলিল—অনিরুদ্ধ ঠিক আছে। সে মেয়ে নয়—মরদ।—অনিরুদ্ধের হাতে তাহার টাঙি। সে বলিল—টাঙিটা তখন যে হাতের কাছে পেলাম না। নইলে হয়েই যেত এক কাণ্ড!

যতীন বলিল—সে সব পরে যা হয় করবেন—এখন এদের তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে ফেলুন।

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী এতক্ষণে চোখ মেলিয়া মৃদু হাস্যের সহিত হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রণাম।

যতীন প্রতিনমস্কার করিল—নমস্কার। কেমন বোধ করছেন!

—ভাল। মৃদু হাসিয়া বৃদ্ধ আবার বলিল—মনে করলাম মাঝে পড়ে মিটিয়ে দোব। দেবু গিয়ে কুড়ুলের সামনে দাঁড়াল। থাকতে পারলাম না চুপ করে।

সকলে চুপ করিয়া রহিল। এ কথার কোন উত্তর দিবার ছিল না।

বৃদ্ধ বলিল—পণ্ডিত নমস্য ব্যক্তি। শুধু পণ্ডিতই নয়, বীরপুরুষ। বয়স

হলেও চশমা আমার এখনও লাগে না, দেবতা। কুড়ুলের সামনে পণ্ডিত যখন গিয়ে দাঁড়াল—তখনকার সে মূর্তি পণ্ডিত নিজেও বোধ হয় কখনও আয়নায় দেখে নাই। বীরপুরুষ!

জগন বলিল—ওগুলো হল গোঁয়ার্তুমি। কি ফল হল? রাগ করো না, ভাই দেবু।

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল—সবার গাছই কেটেছে। গাছ এখনও দেবুরই দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্তার।

জগন হরেন ঘোষালকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া উঠিল—কোন্ দিকে চেয়ে কাজ করছ ঘোষাল?

হরেন চমকিয়া উঠিল।

দেবু হাসিল। ডাক্তার বৃদ্ধের উপর চটিয়াছে। ঝালটা পড়িল হরেনের উপর।

* * *

পুলিসের একটা তদন্ত হইল।

শ্রীহরি কোন কথাই অস্বীকার করিল না। শ্রীহরির পক্ষে কথাবার্তা যাহা বলিবার বলিল—দাশজী, এখন জমিদারের সদর-কর্মচারী, এখানকার ভূতপূর্ব গোমস্তা। অভিজ্ঞ, সুচতুর, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি! প্রজাস্বত্ব আইনে, ফৌজদারী আইনে সে সাধারণ উকীল-মোক্তার অপেক্ষাও বিজ্ঞ। শ্রীহরি সংবাদ পাইয়া তাহাকে আনিয়াছে। ব্যাপারটা এখন আর গ্রামের লোক এবং ব্যক্তিগতভাবে শ্রীহরির মধ্যে আবদ্ধ নয়। জমিদারের গোমস্তা হিসাবে সে ব্যাপারটা করিয়াছে, সুতরাং দায়িত্ব জমিদারের উপরও পড়িয়াছে।

জমিদার বয়সে নবীন। এ-কালের বাংলাদেশের জমিদারের ছেলে। ইংরাজী লেখা-পড়া জানে, জমিদারি খুব পছন্দ করে না। বার কয়েক ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিয়া লোকসান দিয়া অগত্যা জমিদারিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। জমিদারির মধ্যে আইন অনুযায়ী চলিবার প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা তাহার আছে, সেকালের জমিদারের মত জোরজবরদস্তির ধারা সে মোটেই পছন্দ করে না। সেকালের জমিদারের মত ব্যক্তিত্বও তাহার নাই। কাজেই তাহার সাধু চেষ্টা ফলবতীও হয় নাই। কলিকাতা যাইবার টাকার অভাব ঘটিলেই নায়েব-গোমস্তার মতে মত দিতে বাধ্য হয়। কলিকাতায় সিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে, একটু-আধটু মদও খায়, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে দর্শক হিসাবে যায়। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার; লোকাল-বোর্ডে দাঁড়াইয়া এবার পরাজিত হইয়াছে। আগামী বারে কংগ্রেস-নমিনেশন পাইবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিতেছে। এবার অর্থাৎ উনিশশো আঠাশ সালে কলিকাতায়

যে কংগ্রেস অধিবেশন হইবে—তাহার ডেলিগেট হইবার চেষ্টাও সে এখন হইতেই করিতেছে।—

জমিদার কিন্তু এই সংবাদটা শুনিয়া পছন্দ করে নাই ; বলিয়াছিল—এমন হুকুম যখন আমরা দিইনি, তখন আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করবেন। শ্রীহরি নিজেকে বুঝুক।

দাশজী হাসিয়া বলিয়াছিল—শ্রীহরির মত গোমস্তা পাচ্ছেন কোথায় ? সেটা ভাবুন। গ্রামের লোকের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছে। গোমস্তা হিসেবে কাজটা অন্যায়ই করেছে। কিন্তু সে-লোকটা আদায় হোক না-হোক মহলের প্রাপ্য পাই-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, এই এক বছর হ্যাণ্ডনোটেও সে টাকা দিয়েছে—হাজার দুয়েক। তারপর সেটেল্‌মেণ্টের খরচা আদায়ের সময় আসছে। এক শিবকালীপুরেই আপনার লাগবে হাজার টাকার ওপর। তাছাড়া অন্য মহলেরও মোটা টাকা আছে। এ সময় ওকে যদি ছাড়িয়ে দেন—তবে কি সেটা ভাল হবে !

জমিদারটি মিটিংয়ে দু-দশ কথা বলিতে পারে, সমকক্ষ স্বজন-বন্ধুর মধ্যে বেশ স্পষ্ট বক্তা বলিয়া খ্যাতি আছে ; কিন্তু এই দাশজীটি যখন এমনই ধারায় চিবাইয়া কথা কয়, তখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাঁপাইয়া উঠিয়া অসহায় ভাবে দুই হাত বাড়াইয়া আত্মসমর্পণ করে।

দাশজী বলিল—আচ্ছা, এক কাজ করুন না কেন। শিবকালীপুর শ্রীহরিকে পত্তনি দিয়ে দেন না।

—পত্তনি ?

—হ্যাঁ, ধরুন শ্রীহরি পাবে দু-হাজারের উপর। তা ছাড়া—আবার এই সেটেল্‌মেণ্টের খরচা লাগবে আর শ্রীহরিকে গোমস্তা রাখতে গেলে—এমনি বিরোধ হবেই। শ্রীহরি নেবেও গরজ করে।

—ও পত্তনি-টত্তনি লয়। যদি কিনে নিতে চায় তো দেখুন।

সম্পত্তি হস্তান্তরে জমিদারের আপত্তি নাই। সে নিজেই বলে—জমিদারী নয়, ও হল জমাদারি।

*　　　*　　　*

তদন্তে দাশজী সবিনয়ে সব স্বীকার করিল। আজ্ঞে, হাঁ, গাছ কাটতে আমরা জমিদার তরফ থেকে হুকুম দিয়েছি। শ্রীহরি ঘোষ আমাদের গোমস্তা হিসেবেই গাছ কাটতে লোক নিযুক্ত করেছিলেন। বৈশাখ মাসে গাছ আমরা হিন্দুরা কাটি না, কাজেই চৈত্র মাসে কাটবার ব্যবস্থা। এই সময়েই আমাদের সমস্ত বছরের কাঠ কেটে রাখা হয়।

জগন বলিল—কাটুন না। নিজের গাছ কাটুন, জমিদার কেন—

বাধা দিয়া দাশজী বলিল—নিজের গাছই তো। ও সব গাছই তো জমিদারের।

—জমিদারের ?

—আপনারই বলুন জমিদারের কি না ?

—না আপনাদের গাছ !

—আপনাদের ? ভাল, কখনও আপনারা গাছের ডাল কেটেছেন ?

—ডাল কাটিনি। কিন্তু আমরাই চিরকাল দখল করে আসছি।

—হ্যাঁ আপনারাই ফল ভোগ করেন। কিন্তু সে তো জমিদারের তালগাছের তাল কাটেন—পাতা কাটেন আপনারা। শিমুল গাছের 'পাবড়া' পাড়েন আপনারা। সরকারী পুকুরে লোকে পলুই চেপে মাছ ধরে। পুকুর পর্যন্ত গ্রামের লোকে একটা ভাগ করে রেখেছে ; এ পুকুরের মাছ ধরবে—রাম, শ্যাম, যদু ; ও পুকুরে ধরবে—ছালি, কানাই, হরি ; অন্য পুকুরে ধরবে—ভবেশ, দেবেশ, যোগেশ। এখন, এই তালগাছ—এই পুকুর এ সবেই কি আপনাদের মালিকানি ?

দেবু অতক্ষণে বলিল—ভাল কথা, দাশ মশায়। কিন্তু এ সব গাছ যদি আপনাদের, তবে আপনারা এত লাঠিয়াল পাঠিয়েছিলেন কেন ? জবর দখল দরকার হয় কোথায় ? যেখানে দখল নেই সেইখানে—কিম্বা যেখানে বে-দখলের সম্ভাবনা আছে সেইখানে। মানে সেখানেও দখল সন্দেহজনক !

দাশ হাসিয়া বলিল—না। না। লাঠিয়াল আমরা পাঠাইনি ! আমরা পাঠিয়েছিলাম পাইক। লাঠি তাদের হাতে থাকে। ওদের ছ' ছোটের সামিল ওটা। এখন ধরুন, যার যেমন বিয়ে, তার তেমন বাদ্যি। আপনার আমার বাড়ীতে বিয়ে হয়, একটা ঢোল বাজে একটা কাঁসী বাজে। তার সঙ্গে বড় জোর সানাই। জমিদার বাড়ীর বিয়েতে বাজনা হয় হরেক রকমের। জমিদার তরফ থেকে গাছ কাটতে এসেছে—পাঁচ-সাতটা গাছ কাটবে, মজুর আছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন— তার সঙ্গে আট-দশটা পাইক এসেছে—কি এমন বেশী এসেছে ? আপনারা এমন বে-আইনী দাঙ্গা করবেন জানলে—আমরা অন্তত পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল পাঠাতাম। তার আগে অবশ্য শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা জানিয়ে খবর দিয়ে রাখতাম। তা ছাড়া আইন তো আপনি বেশ জানেন গো দেবুবাবু ; গাছ কার বলুন না আপনি।

আজ এ তদন্তের ভার পাইয়াছিল এখানকার থানার দারোগাবাবু। দারোগাবাবু লোকটি ভাল। ক্ষমতার অপব্যবহার করে না, ব্যবহারও ভদ্র।

দারোগা বলিল—যাই বলুন দাশজী, কাজটা ভাল হয়নি। মানুষের মনে আঘাত দিতে নেই। যাক্—আমাদের এতে করবার কিছু নাই। স্বত্বের মামলার বিষয়। আমরা নোটিশ দিয়েছি—মুখেও উভয় পক্ষকে বারণ করছি—আদালতে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ গাছের কাছ দিয়ে যাবে না। গেলে ফৌজদারী হলে—আমরা তখন চালান দেব। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে।

তারপর উঠিবার সময় দারোগা আবার বলিল—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন হচ্ছে জানেন তো দাশজী?

—আজ্ঞে জানি বৈকি। দাশজী হাসিল। তারপর বলিল— হলে আমরা বাঁচি, দারোগাবাবু, আমরা বাঁচি।

দারোগাবাবুকে বিদায় করিয়া শ্রীহরি দাশজীকে লইয়া আপনার বৈঠকখানায় উঠিল। ইতিমধ্যে শ্রীহরি একটা নূতন বৈঠকখানা করিয়াছে। খড়ের ঘর হইলেও পাকা সিঁড়ি, পাকা বারান্দা, পাকা মেঝে।

দাশ তারিফ করিয়া বলিল—বা—বা—বা! এ যে পাকা আসর করে ফেললে, ঘোষ। কিন্তু আমাদের নীলকণ্ঠের গান জানো তো?—যদি করবে পাকা বাড়ী—আগে কর জমিদারি!

শ্রীহরি তক্তপোশের উপরের শতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল—বসুন!

বসিয়া দাশজী বলিল—জমিদারি কিনবে ঘোষ?

—জমিদারি?—শ্রীহরি চমকিয়া উঠিল। জমিদারির কল্পনা সে স্পষ্টভাবে কখনও করে নাই।

সে প্রশ্ন করিল—কোন্ মৌজা? কাছে-পিটে বটে তো?

—খোদ শিবকালীপুর! কিনবে?

শ্রীহরি বিচিত্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দাশজীর দিকে চাহিয়া রহিল। শিবকালীপুরের জমিদারি? গ্রামের প্রতিটি লোক তাহার প্রজা হইবে! ঘোষ হইবে সকলের মনিব, বাবু-মহাশয়, হুজুর! চকিতে তাহার অধীর মন নানা কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে সে হাট বসাইবে। স্নানের মজা-দীঘিটা কাটাইয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপে পাকা দেউল তুলিবে, আটচালা ভাঙ্গিয়া নাটমন্দির গড়িবে। এল-পি পাঠশালার বদলে এম-ই স্কুল করিবে; নাম হইবে 'শ্রীহরি এম-ই স্কুল'। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে লোকাল বোর্ডে দাঁড়াইবে।

দাশজী বলিল—কিনে ফেল ঘোষ। তোমার পয়সা আছে। জমিদারি হল অক্ষয় সম্পত্তি। তা ছাড়া—এই গাঁয়ের যারা তোমার শত্রু—একদিনে তোমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে। সেটেল্‌মেণ্ট ফাইনাল পাবলিকেশনের আগেই কেনো। দরখাস্ত করে নাম সংশোধন করিয়ে নাও। ফাইনাল পাবলিকেশনে পর

পাঁচধারার কোর্ট পাবে। টাকায় চার আনা বৃদ্ধি তো হবেই। আট আনার জজীর হাইকোর্ট থেকে নিয়ে রেখেছি। শোন, আমি সুবিধা দরে করে দেব। হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ করে দাও দেখি।

শ্রীহরি দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দীর্ঘকাল পরামর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতেই দুইজনে বাহির হইল। দাশজী বলিল—ও নোটিশ তোমার বাজে, একদম বাজে নোটিশ দিয়াছে। তুমি যদি যাও—তার ফলে শান্তিভঙ্গ ঘটে—তবে হেনো হবে তেনো হবে এই তো?

তারপর মুখের কাছে মুখ আনিয়া ভঙ্গি করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল—কিন্তু শান্তিভঙ্গ যদি না হয় তা হলে? দাশজী ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি বলিল—তবে আমি নিশ্চিন্দি হয়ে করতে পারি?

—নিশ্চয়, তবে সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে। কোন হাঙ্গামা যেন না হয়।

—আর গাজনের কি করব?

—যা হয় কর।

—চণ্ডীমণ্ডপ তাহলে যেমন আছে তেমনি থাক।

—ওই কাজটি করো না ঘোষ। আমি বারণ করছি। চণ্ডীমণ্ডপের সেবাইত জমিদার বটে, কিন্তু অধিকার গাঁয়ের লোকের। পাকা নাটমন্দির দেবমন্দির নিজের বাড়ীতে কর। সম্পত্তি থাকতেও আছে—যেতেও আছে। যদি কোনদিন সম্পত্তি চলেও যায়—তখন আর কোন অধিকার থাকবে না তোমার।

দাশজী শ্রীহরিকে চণ্ডীমণ্ডপের উপর টাকা খরচ করিতে নিষেধ করিতেছে। যে দিন-কাল পড়িয়াছে! সাধারণের জিনিসে নিজের টাকা খরচ করা মূর্খতা মাত্র।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালেই গ্রামে আর একটা হৈ-চৈ উঠিল।

দেবু ঘোষের আধ-কাটা আমগাছটা গতরাত্রেই কাটিয়া কেহ তুলিয়া লইয়াছে। কেহ আর কে? শ্রীহরি লইয়াছে। শান্তিভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং আইনভঙ্গও সে করে নাই! সদ্যকাটা গাছটার শিকড়ের উপর আঙুল চারেক কাণ্ডটা কেবল জাগিয়া আছে। কাটা-গাছটায় অবশিষ্ট কোথাও বিশেষ পড়িয়া নাই। কেবল কতকগুলো ঝরা কাঁচা পাতা, কতকগুলো কাঁচা আম, আঙুলের

মত সরু দুই-চারটা ডাল, শিকড়-কাটা কতক কুচা পড়িয়া আছে। জমিটার জলসিক্ত নরম মাটিতে গাড়ীর চাকার দাগে, গরুর খুরের চিহ্নে, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত রহিয়াছে গত রাত্রের কাহিনী।

ঘোষাল আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছিল—রেগুলার থেফ্‌ট কেস। হি ইজ এ থী-প! হি ইজ এ থী-প! হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে চালান দেবো।

দেবু বারণ করল—না। ওসব বলো না, ঘোষাল!

জগন বলিল—দুপুরের ট্রেনেই চল মামলা রুজু করে আসি।

তাহাতেও দেবু বলিল—না—

ধীর পদক্ষেপে দেবু আসিয়া বসিল যতীনের কাছে।

যতীন বলিল—শুনলাম গাছটা রাতারাতি কেটে নিয়েছে।

দেবু একটি ম্লান হাসি হাসিল।

—কি হবে মামলা করে। গাছ আইন অনুসারে জমিদারের। মিছে টাকা খরচ করে কি লাভ?

—এরই মধ্যে যে অবসন্ন হয়ে পড়লেন দেবুবাবু?

হ্যাঁ। অবসন্ন হয়েছি যতীনবাবু। আর পারছি না।

—দাঁড়ান, একটু চা করি।—উচ্চিংড়ে! উচ্চিংড়ে!

একা উচ্চিংড়ে নয়, সঙ্গে আরও একটা বাচ্চা আসিয়া হাজির হইব।

—চা করতে বল মা-মণিকে।

হরেন বলিল—এটা আবার কোত্থেকে এসে জুটল? ‘একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!’

হাসিয়া যতীন বলিল—উচ্চিংড়ের জংশনের বন্ধু। কাল পিছনে পিছনে এসেছিল গাছ-কাটার হাঙ্গামা দেখতে। সেখানে বনের পাখী আর খাচার পাখীতে মিলন হয়েছে। উচ্চিংড়ে ওকে নিয়ে এসেছে।

—বেশ আছেন মশায়, নন্দী-ভৃঙ্গী নিয়ে। আপনার কাছেই এসে জোটে।

—মানে কামার-বউয়ের কাছে?

হাসিয়া যতীন হলিল—হ্যাঁ।

—অনিরুদ্ধ ওকে মেরে তাড়াবে।

—কাল সে বোঝা-পড়া হয়ে গেছে। অনিরুদ্ধবাবু তাড়াতে চেয়েছিলেন। মা-মণি বলেছেন ও গরু চরাবে—খাবে থাকবে। অনিরুদ্ধবাবু গরু কিনেছেন কি না। আর কামারশালায় হাপর টানবে।

উচ্চিংড়ে আসিয়া দাঁড়াইল—চা লাও গো বাবু।

ওদিকে ঢাক বাজিয়া উঠিল। উচ্চিংড়ে তাড়াতাড়িতে অধেক চা উপচাইয়া

ফেলিয়া, চায়ের বাটিগুলি নামাইয়া দিয়াই—দাওয়া হইতে এক লাফ দিয়া পথে পড়িল ; ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ন্যাটাং ড্যাটাং—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ন্যাটাং ড্যাটাং। আয় রে গোবরা, শিব উঠছে দেখতে যাই।

গাজনের ঢাক বাজিতেছে। পূর্ণ এক বৎসর পরে গাজনের বুড়া শিব পুকুরের জল হইতে উঠিবেন। ভক্তেরা দোলায় করিয়া লইয়া আসিবে।

জগন বলিল—ভক্ত কে-কে হল জান, ঘোষাল ?

হরেন বলিল—ওন্‌লি ফাইব্‌। একটা হাতের অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া সে দেখাইয়া দিল।

—চল, ব্যাপারটা দেখে আসি।

—চল।

জগন, হরেন চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—দেবুবাবু!

—বলুন ?

—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি—দেবু হাসিল। তারপর বলিল—দেখবেন ?

—কি ?

—আসুন আমার সঙ্গে।

অল্প খানিকটা আসিয়াই শ্রীহরির বাড়ী, বাড়ীর পর খামার। পথ হইতেই খামারটা দেখা যায়। প্রকাণ্ড একটা জনতা সেখানে জমিয়া আছে। খামারের উঠানের মাঝখানে সোনার বর্ণ ধানের একটি স্তূপ! পাশেই তিনটি বাঁশের তেপায়াতে বড় বড় ওজনের কাঁটা-পাল্লা টাঙানো হইয়াছে। একটা গাছের তলায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে শ্রীহরি। জনকয়েক লোক দেবু ও যতীনকে দেখিয়া আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াল। ওদিকে ওজনের পাল্লায় অবিরাম ধান ওজন চলিতেছে—দশ দশ—দশ রামে—ইগার ইগার! ইগার ইগার ইগার রামে বারো বারো।

দেবু বলিল—দেখলেন ?

যতীন হাসিয়া বলিল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে'।

—কি ভাবছি আমি বুঝলেন ? আমি একা পড়ে গিয়েছি!

কিছুক্ষণ পর যতীন বলিল—আপনি তা হলে বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন দেবুবাবু। সত্যই বড় কষ্টে পড়বেন আপনি।

দেবু হাসিল, বলিল—নাঃ ও ভাবনা আর ভাবিনে। ভাবছি—এতদিনের

গাজন, আমাদের গ্রামে গাজনে কত ধুম ছিল, সমস্ত গ্রামের লোক প্রাণ দিয়ে খাটত। অন্য গাঁয়ের সঙ্গে আমাদের গাজনের ধুমের পাল্লা চলত। সে সব উঠে যাবে। নয়তো শ্রীহরির একলার হাতে গিয়ে পড়বে। দেবতাতে স্বদ্ধ আমাদের অধিকার থাকবে না! ভগবানে আমাদের অধিকার থাকবে না! আমাদের ভগবান পর্যন্ত কেড়ে নেবে?

নেলো আসিয়া দাঁড়াইল।

যতীন বলিল—কি সংবাদ নলিন?

—আট আনা পয়সা। গাজনে এবার মেলা বসাবে ঘোষ মশায়। পুতুল তৈরী করে বিক্রি করব। রং কিনব।

—মেলা বসাবে শ্রীহরি? দেবু উঠিয়া বসিল।

নলিনকে বিদায় করিয়া যতীন বলিল—নলিনের হাতটি চমৎকার।

দেবু বলিল—ওর মাতামহ যে ছিল নামকরা কুমোর।

—কুমোর! নলিন তো বৈরাগী!

—হ্যাঁ। কাঁচের পুতুলের চল হল, শেষ বয়সে অভাবে পড়ে বুড়ো ভিক্ষে ধরে বোষ্টম হয়েছিল। তা ছাড়া বিধবা মেয়েটার বিয়ের জন্যও বোষ্টম হওয়া বটে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া দেবু আবার বলিল—শ্রীহরি এবার তা হলে ধুম করে গাজন করবে দেখছি।

পঁচিশ

ঢাকের বাজনার শব্দে ভোরবেলাতেই—ভোরবেলা কেন—তখনও খানিকটা রাত্রি ছিল, যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গাজনের ঢাক। পূর্বে চৈত্রের প্রথম দিন হইতেই গাজনের ঢাক বাজিত। গতবার হইতে পাতু দেবোত্তর চাকরান জমি ছাড়িয়া দেওয়ার পর, চৈত্রের বিশ তারিখ হইতে ঢাক বাজিতেছে। ভিন্ন গ্রামের একজন বায়েনের সঙ্গে নগদ বেতনে নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। শেষ রাত্রিতে ঢাকের বাজনা—যতীনের বেশ লাগিল। ঢাকের বাজনার মধ্যে আছে একটা গুরু-গম্ভীর প্রচণ্ডতা। রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ প্রহরে প্রচণ্ড গম্ভীর শব্দের মধ্যেও একটি পবিত্রতার রেশ সে অনুভব করিল। দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া বসিল।

সে আশ্চর্য হইয়া গেল;—গ্রামখানায় এই শেষরাত্রেই জাগরণের সাড়া উঠিয়াছে। ঢেঁকিতে পাড় পড়িতেছে; মেয়েরা ইহারই মধ্যে পথে বাহির হইয়াছে। হাতে জলের ঘটি। চণ্ডীমণ্ডপে জল দিতে চলিয়াছে। রাঙাদিদি বড় বড় করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম করিতেছে—এখান হইতে শোনা

যাইতেছে। জনকয়েক গাজনের ভক্ত স্নান শেষ করিয়া ফিরিতেছে—তাহারা ধ্বনি দিতেছে—বলো শি-বো-শি-বো-শিবো-হে ! হর-হর বোম্—হর-হর বোম্ !

যতীন সকালেই ওঠে, কিন্তু এই শেষরাত্রে সে কোনদিন ওঠে নাই। পল্লীর এ-ছবি তাহার কাছে নূতন। সে যখন ওঠে, তখন রাঙাদিদি ভগবানকে এবং পিতৃপুরুষকে গালিগালাজ আরম্ভ করে। মেয়েদের ঘরের পাট-কাম দেবার্চনা শেষ হইয়া গৃহকর্ম আরম্ভ হইয়া যায়।

অনিরুদ্ধের বাড়ীর খিড়কীর দরজা খুলিয়া গেল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত—উচ্চিংড়ে ও গোবরা বাহির হইয়া গেল। তাহাদের পিছনে বাহির হইয়া আসিল পদ্ম, তাহার হাতেও জলের ঘটি।

একটানা ক্যাঁ-কোঁ শব্দে একখানা সার বোঝাই গরুর গাড়ী চলিয়া গেল। শেষরাত্রি হইতেই মাঠের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। সার ফেলার কাজ চলিতেছে। সারের গাড়ীতেই আছে জোয়াল লাঙ্গল। সার ফেলিয়া জমিতে লাঙল চষিবে। সেদিনের জলের রস এখনও জমিতে আছে। মাটির বতর এখন চমৎকার, অর্থাৎ রোদ পাইয়া কাদার আঠা মরিয়া মাটি চমৎকার চাষের যোগ্য হইয়াছে। লাঙলের ফাল কোমল মাটির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া চিরিয়া চলিবে নিঃশব্দে, নির্বিঘ্নে, স্বচ্ছন্দ গতিতে—ছানার তালের মধ্যে ধারালো ছুরির মতন। বড় বড় চাঁই দুইপাশে উল্‌টাইয়া পড়িবে ; অথচ লাঙ্গলের ফালে এতটুকু মাটি লাগিবে না, সামান্য আঘাতেই চাঁইগুলা গুঁড়া হইয়া যাইবে। গরু মহিষগুলি চলিবে অবহেলায় ধীর অনায়াস গতিতে। এই কর্ষণের মধ্যে চাষীর বড় আনন্দ। অন্তরে অন্তরে যেন আনন্দের রস ক্ষরণ হয়।

একসঙ্গে সারিবন্দী শোভাযাত্রার মত হাল গেল ছয়খানা ; পিছনে চারখানা সার-বোঝাই গাড়ী। বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় হেলে-বলদগুলি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। এগুলি সবই শ্রীহরি ঘোষের। ঘোষের ঘরে দশখানা হাল, কুড়িজন কৃষাণ। ঘোষের সুপ্রসন্ন ভাগ্যচ্ছটার প্রতিফলন তাহার সর্বসম্পদে সুপরিস্ফুট।

যতীন জামা গায়ে দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অতিক্রম করিয়া আসিয়া পড়িল মাঠে। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠে। মাঠের প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ, বাঁধের গায়ে কচি সবুজ শরবনের চাপ। তাহারই ভিতর হইতে উঠিয়াছে তালগাছের সারি। মধ্যে মধ্যে পলাশ-পালতে-শিমুল-শিরীষ-তেঁতুলের গাছ। গাছগুলির মাথার উপরে অস্পষ্ট আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের গায়ে জংশন-শহরের কলের চিমনী। কলে ভোঁ বাজিতেছে—একসঙ্গে চার-পাঁচটা কলে বাজিতেছে। বোধ হয় চারিটা বাজিল।

মাঠ পার হইয়া সে বাঁধে উঠিল। বাঁধ হইতে নামিল ময়ূরাক্ষীর চর-ভূমিতে। জল পাইয়া চরে বেনাঘাসগুলি সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে সযত্নকর্ষিত তার ফসলের জমিগুলির গিরিরঙের মাটি বড় চমৎকার দেখাইতেছে। জমির মধ্যে তরকারির চারাগুলি সাপের ফণার মত ডগা বাড়াইয়া লতাইতে শুরু করিয়াছে। ভোরবেলায় তিতির পাখীর দল বাহির হইয়াছে খাদ্যান্বেষণে। উইয়ের ঢিবি, পিঁপড়ের গর্ত ঠোকরাইয়া উই ও পিঁপড়ে খাইয়া ফিরিতেছে! যতীনের সাড়ায় কয়টা তিতির ফর-ফর শব্দে উড়িয়া দূরে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে লুকাইল।

আকাশ লাল হইয়া উঠিতেছে। যতীন নদীর বালির উপর গিয়া দাঁড়াইল। পূর্বদিগন্তে চৈত্রের বালুকাগর্ভময়ী ময়ূরাক্ষী ও আকাশের মিলন-রেখায় সূর্য উঠিতেছে। কয়েকদিন পরেই মহাবিষুব-সংক্রান্তি। ময়ূরাক্ষী এখানে ঠিক পূর্ববাহিনী।

ময়ূরাক্ষী পার হইয়া সে জংশনের ঘাটে উঠিল। সপ্তাহে দুই দিন তাহাকে থানায় গিয়া হাজিরা দিতে হয়। অন্যান্য দিন সে চা খাইয়া থানায় যায়। আজ ভোরবেলার নেশায় সে বাহির হইয়া এতটা যখন আসিয়াছে, তখন জংশনে হাজিরার কাজটা সারিয়া যাওয়াই ঠিক করিল।

গ্রামের পথে পা দিয়াই যতীন আবার এক হাঙ্গামার সংবাদ পাইল। হাঙ্গামায় হাঙ্গামায় কয়েকদিন হইতেই গ্রামখানার মন্থর জীবন-যাত্রার অকস্মাৎ যেন তালভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আজ শ্রীহরির বাগানে কে বা কাহারা গাছ কাটিয়া তছনছ করিয়া দিয়াছে। গুজবে, জটলায়, উত্তেজনায় গ্রামখানা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় শ্রীহরি ঘোষ রাগে-দুঃখে অধীর-প্রায় মাথায় চুল ছিঁড়িয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ তাহার মধ্য হইতে আজ বাহির হইয়া আসিতেছে পূর্বের সেই বর্বর ছিরু পাল।

গ্রাম হইতে অল্প দূরে—উত্তর মাঠে অর্থাৎ যেদিকে ময়ূরাক্ষী নদী—তাহার বিপরীত দিকে, বন্যাভয়-নিরাপদ মাঠের মধ্যে—একটা মজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া সেই পুকুরের চারিপাশে শ্রীহরি শখ করিয়া বাগান তৈয়ারী করিয়াছিল। অতীত দিনের চাষী ছিরুর সৃষ্টির নেশার সঙ্গে—বর্তমানের আভিজাত্যকামী শ্রীহরির কল্পনা মিশাইয়া বাগানখানি রচিত হইয়াছিল। বহু দামী কলমের বহু চারা আনিয়া পুঁতিয়াছিল শ্রীহরি, মালদহ মুর্শিদাবাদ হইতে আমের কলম, কলিকাতা হইতে লিচু জামরুল কলম ও নানা স্থান হইতে কানাই বাঁশী, অমৃতসাগর, কাবুলী প্রভৃতি কলার চারা সংগ্রহ করিয়া আনাইয়াছিল। শুধু

ফলের কামনাই নয়, ফুলের নেশাও তার ছিল—অশোক, চাঁপা, গোলাপ, গন্ধরাজ, বকুলের গাছও অনেকগুলি লাগাইয়াছিল।

শ্রীহরির কল্পনা ছিল আরও অনেক। বাগানের মধ্যে শৌখীন দুই-কামরা একখানি ঘর, ঘরের সামনে—পুকুরের দিকে খানিকটা বাঁধানো চত্বর হইতে নামিয়া যাইবে একটি বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি। সেই কল্পনায় কাঁচা ঘাটের দুই পাশে দুইটি কনক-চাঁপার গাছ পুঁতিয়াছিল। অশোক ফুলের চারা বসাইয়াছিল —বাগানে ঢুকিবার পথের পাশেই। গাছগুলি বেশ একটু বড় হইলেই গোড়া বাঁধাইয়া বসিবার স্থান তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা ছিল। সন্ধ্যায় সে বন্ধু-বান্ধব লইয়া বাগানে আসিয়া বসিবে, ইচ্ছা হইলে রাত্রে আনন্দ করিবে। গান-বাজনা-পান-ভোজন—কঙ্কণার বাবুদের মত।

গতরাত্রে কে কাহারা শ্রীহরি ঘোষের সেই বাগানটিকে কাটিয়া তছনছ করিয়া দিয়াছে। শ্রীহরি বলিতেছে—চীৎকার করিয়া বলিতেছে—তাদেরও মাথায় কোপ মারব আমি !

তাহার ধারণা—যাহাদের গাছ সে কাটিয়াছে, এ কাজ তাহাদেরই। পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি আক্রোশে অশ্বত্থামা যেমন নিষ্ঠুর আক্রমণে অন্ধকারের আবরণে পাণ্ডবশিশুগুলিকে হত্যা করিয়াছিল তেমনি আক্রোশেই কাপুরুষ শত্রু তাহার শখের চারা-গাছগুলিকে নষ্ট করিয়াছে। শ্রীহরি ছাড়িবে না, অশ্বত্থামার শিরোমণি কাটিয়া সে প্রতিশোধ লইবে। থানায় খবর পাঠানো হইয়াছে। পথে ভূপালের সঙ্গে যতীনের দেখা হইয়াছে।

হরেন ঘোষাল দস্তুরমত ভড়কাইয়া গিয়াছে। শ্রীহরির এই মূর্তিকে তাহার দারুণ ভয়। সে আমলে ছিরু পাল তাহাকে একদিন জলে ডুবাইয়া ধরিয়াছিল। —ঘাড়ে ধরিয়া মুখ মাটিতে রগড়াইয়া দিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভয় করে না, ভদ্রলোক বলিয়া খাতির করে না। যতীন ফিরিতেই সে শুষ্কমুখে আসিয়া কাছে বসিল, বলিল—যতীনবাবু, কেস ইজ সিরিয়াস ! ভেরি সিরিয়াস ! ছিরুপাল ইজ ফিউরিয়াস্ ! হি ইজ এ ডেঞ্জারাস ম্যান !

জগন ঘোষ খুব খুশী হইয়াছে। সে ইহাকে সর্বোত্তম সূক্ষ্ম বিচারক বিধাতার দণ্ড-বিচারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়া বিদ্যায় সে আজ দেবভাষায় ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দিল—ষণ্ডস্য শত্রু ব্যাঘ্রেন নিপাতিতঃ। অর্থাৎ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে।

দেবু বলিল—না ডাক্তার, কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। ছিঃ !

—তোমার কথা বাদ দাও ভাই, তুমি হলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

দেবু কোন উত্তর দিল না; রাগও করিল না। সে সত্য সত্যই দুঃখিত

হইয়াছে। ওই গাছগুলি শ্রীহরি যত্নে পুঁতিয়াছিল—ফলও সে ভোগ করিত। শ্রীহরি তাহার গাছ কাটিয়াছে, তবু দুঃখ সেই পাইয়াছিল। কাজটা অন্যায়। গাছপালার উপর তাহার বড় মমতা। ওই বড় গাছ হইত, ফুলে-ফলে ভরিয়া উঠিত প্রতিটি বৎসর; পুরুষানুক্রমে তাহারা বাড়িয়া চলিত। মানুষের চেয়ে গাছের পরমায়ু বেশী। শ্রীহরি, শ্রীহরির সন্তান-সন্ততি, তাহার উত্তরাধিকারী। তাহারও পরের পুরুষ ওই গাছের ফলে-ফুলে পরিতৃপ্ত হইত। দেবতার ভোগ দিত, গ্রামে বিলাইত, লোক তৃপ্ত হইত। সে গাছ কি এমনভাবে নষ্ট করিতে আছে?

ভোঁ শব্দে দৌড়াইয়া আসিয়া উচ্চিংড়ে বলিল—দারোগা এসেছে।

হরেন চমকিয়া উঠিল—কোথায়?

উচ্চিংড়ে তখন বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। জবাব দিল গোবরা, সে উচ্চিংড়ের পিছনে ছিল, বলিল—সেই পুকুর দেখে গাঁয়ে আসছে।

এবার জগনও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল—যতীনবাবু, বেটা নিশ্চয় আমাদের সবাইকেই সন্দেহ করে এজাহার দেবে। পুলিশও বোধ হয় আমাদেরই চালান দেবে। জামিন-টামিনের ব্যবস্থা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে। আপনি কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখে রাখুন।

দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল।—জামাই পণ্ডিত!

—দুর্গা? দেবু যতীনের তক্তপোশে শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল।

—হ্যাঁ। বাড়ী এস।

—কেন রে?

– পুলিশ এসেছে, ঘর দেখবে। ডাক্তার, আপনার ঘরের সামনেও সিপাই দাঁড়িয়েছে।

হরেন সর্বাগ্রে উঠিয়া বলিল—মাই গড! মায়ের গীতাটা নিয়ে হয়েছে আমার মরণ।

একজন পুলিশের কনস্টেবল জনতিনেক চৌকিদার লইয়া আসিয়া অনিরুদ্ধের তিন দরজায় পাহারা দিয়া বসিল।

পথে যাইতে যাইতে দুর্গা বলিল—জামাই পণ্ডিত!

—কি রে?

—ঘরে কিছু থাকে তো আমাকে দেবে। আমি ঠিক পেট-আঁচলে নিয়ে বাইরে চলে যাব।

—কি থাকবে আমার ঘরে? কিছু নাই।

বাড়ীর দুয়ারে সাব-ইন্সপেকটার নিজে ছিল ; সে বলিল—পণ্ডিত, আপনার ঘর আমরা সার্চ করব। দুগ্‌গা তুই ভেতরে যাস নে!

দুর্গা বলিল—ওরে বাবা দুধের ঘটি রয়েছে যে দারোগাবাবু। আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন ক্যানে?

হাসিয়া দারোগা বলিল—তুই ভারী বজ্জাত। কোথায় ঘটি আছে বল—চৌকিদার এনে দেবে।

দেবু বলিল—আসুন দারোগাবাবু। দুর্গা তুই বস, ঘটি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দারোগা বলিল—ঝরঝরে জায়গায় বোস, দুর্গা, দেখিস—সাপে কি বিছেয় কামড়ায় না যেন!

দেবু একটা জিনিসের কথা ভাবে নাই।

পুলিশ বাড়ী ঘর অনুসন্ধান করিয়া দা-কুড়ুল-কাটারি বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে গতরাত্রের কচি গাছ কাটার কোন চিহ্ন আছে কিনা। কিছু পাওয়া গেল না। কাচা কাপড়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহাতে কলাগাছের কষের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু তাও ছিল না। পুলিশ লইল নূতন প্রজা সমিতির খাতাপত্রগুলি। এই খাতাপত্রগুলির কথাই দেবুর মনে ছিল না। অন্য সকলের বাড়ী হইতে পুলিশ শুধু-হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীহরি যতীনের নামেও এজাহার দিয়াছিল—তাহাকেও তাহার সন্দেহ হয় ; শ্রীহরির বন্ধু জমাদার সাহেব হইলে কি হইত বলা যায় না, নূতন সাব-ইন্সপেকটার শ্রীহরির এ কথা গ্রাহ্যই করিল না। বলিল—ঘোষ মশায়, সবেরই মাত্রা আছে, মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না।

এ সংসারে যাহারা আপন সত্যের বিধান লঙ্ঘন করিতে চায়—বিধাতাকে সব চেয়ে বেশী মানে তাহারাই। বিধাতার তুষ্টিলাভ করিলে সর্বপ্রকার বিধান-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধের দণ্ড লঘু হইয়া যায়—এই বিশ্বাসই তাদের জীবনে পরম আশ্বাস। শ্রীহরি তাড়াতাড়ি বলিল—না—না—না। ওটা আমারই ভুল। ও আপনি ঠিক বলেছেন।

যাহা হউক, দেবুর ঘর তল্লাস করার পর দারোগা বলিল—পণ্ডিত আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করছি। আপনি প্রজা সমিতির প্রেসিডেন্ট, এ কাজটা প্রজা সমিতির দ্বারাই হয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে আমাদের। অবশ্য এনকোয়ারী আমাদের এখনও শেষ হয়নি ; উপস্থিত আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। চার্জটা অবশ্যি থেফ্‌ট্‌!

দেবু বলিল—থেফ্‌ট্‌ চার্জ—চুরি? আমার বিরুদ্ধে?

হাসিয়া দারোগা বলিল—গাছ কাটা তো আছেই, সেটার সমন করবেন এস-ডি-ও। ঘোষের দুটো লোহার তারের জাফরি চুরি গেছে।

—আমাকে চুরির চার্জে চালান দেবেন দারোগাবাবু? দেবু মর্মান্তিক আক্ষেপের সহিত প্রশ্ন করিল।

—অর্জুনের মত বীরকে সময়-দোষে নপুংসক সাজতে হয়েছিল, জানেন তো পণ্ডিত! ও নিয়ে দুঃখু করবেন না। বেলা তো অনেক হয়ে গেল, খাওয়া-দাওয়া সেরেই নিন!

দারোগার কথায় দেবু আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনা পাইল। সে হাসিয়া বলিল—আপনি একটু জল-টল খাবেন?

—চাকরির পেটের দায়ে পণ্ডিত। খাব নিশ্চয়। তবে আপনার ঘরেও না, ঘোষের ঘরেও নয়। আমাদের যতীনবাবু আছেন। ওইখানেই যা হয় হবে।

দারোগা আসিয়া যতীনের ওখানে বসিল।

গ্রামের লোকেরা অবনত মস্তকে চারিপাশে বসিয়া ছিল। সকলেই সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল—কে এ কাজ করিল!

মেয়েরা আসিয়া জড় হইয়াছে—দেবুর বাড়ী। অনেকে উঠানের উপর ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ কেহ দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়াছে। বিলু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। দুর্গার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে অনর্গল ধারায়। রাঙাদিদির আর বিলাপের শেষ নাই। পদ্ম বসিয়া আছে বিলুর পাশে। বিলুর দুঃখে সেও অপরিসীম দুঃখ অনুভব করিতেছে। মনে হইতেছে—আহা, এ দুঃখের ভার যদি সে নিজে লইয়া বিলুর দুঃখ মুছিয়া দিতে পারিত! অবগুণ্ঠনের মধ্যে তাহার চোখ হইতেও টপ টপ করিয়া জল মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিল উচ্চিংড়ে। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে সুকৌশলে মাথা গলাইয়া একেবারে পদ্মের কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—শীগ্‌গির বাড়ী এস মা-মণি।

যতীনের দেখাদেখি সে-ও পদ্মকে মা-মণি বলে।

পদ্ম বিরক্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—কেন?—সে অবশ্য বুঝিয়াছে, যতীনের তলব পড়িয়াছে, চা করিতে হইবে।

—কম্মকারকে যে দারোগাবাবু ধরে নিয়ে যাচ্ছে গো!

পদ্মের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। অনিরুদ্ধকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে! সে আবার কি কথা! একা পদ্ম নয়, কথাটায় সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—তার আবার কি হল ?

কম্মকার যে সাউগিরি করে বললে—আমাকে ধর হে। আমি গাছ কেটেছি। দারোগা অমনি ধরলে। বলতে বলতেই উচ্চিংড়ে যেমন ভিড়ের ভিতর দিয়া সুকৌশলে মাথা গলাইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি সুকৌশলেই বাহির হইয়া গেল।

কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া পদ্মও মেয়েদের ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

—কামারবউ !

পদ্ম পিছন ফিরিয়া দেখিল, ডাকিতেছে দুর্গা।

—দাঁড়াও, আমিও যাব !

উচ্চিংড়ে কথাটা গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বলিয়াছে। স্তব্ধ জনতার মধ্যে হইতে নিতান্ত অকস্মাৎ অনিরুদ্ধ চোখ-মুখ দৃপ্ত করিয়া দারোগার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া আসিয়া বলিয়াছিল--দেবু পণ্ডিতের বদলে আমাকে ধর ! ও গাছ কাটে নাই, গাছ কেটেছি আমি।

ডেটিনিউ যতীনের ঘরের দাওয়ায় বসিয়াছিল দারোগা। তাহার সম্মুখে জমিয়া দাঁড়াইয়াছিল একটি জনতা। সেই দারোগা হইতে সমবেত জনতা আকস্মিক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

অনিরুদ্ধ বলিয়াছিল—কাল রেতে টাঙি দিয়ে আমি বেবাক গাছ কেটেছি ; জাফরি দুটো তুলে ফেলে দিয়েছি 'চরখাই' পুকুরের জলে।

মিথ্যা কথা নয়। ধারালো টাঙি দিয়া অনিরুদ্ধ তাহাদের গাছ কাটার প্রতিশোধ তুলিয়াছে ছিরু পালের উপর। উন্মত্ত প্রতিশোধের আনন্দে গাছ কাটিতে কাটিতে সে সেই অন্ধকার রাত্রে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, আর ছোট ছেলেদের মত মুখে বলিদানের বাজনার রোল আওড়াইয়াছে—খা-জ্জিং-জ্জিং-জিনাক্ জি-জিং ; না-জিং-জিং-জিনাক্। একথা কেহ জানে না, সে কাহাকেও বলে নাই, এমন কি পদ্ম পর্যন্ত না। ওই ছেলে দুটাকে লইয়া পদ্ম আজকাল পৃথক শুইয়া থাকে ; রাত্রে নিঃশব্দে অনিরুদ্ধ উঠিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়াছেও নিঃশব্দে। সকালবেলা হইতে সে ছিরুর আস্ফালন শুনিয়া মনে মনে কৌতুক বোধ করিয়াছে, পুলিস আসিলেও সে একবিন্দু ভয় পায় নাই। ভোরবেলাতেই টাঙিখানাকে সে আগুনে পোড়াইয়া সকল অপরাধের চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। কাপড়খানাতে অবশ্য কলার কষ লাগিয়াছে—সেখানাকে অনিরুদ্ধ খিড়কির ঘাটে জলের তলায় পুঁতিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দেবু পণ্ডিতকে দারোগা গ্রেপ্তার করিল—তখন সে চমকিয়া উঠিল।

তাহার মনে একটা প্রবল ধাক্কা আসিয়া লাগিল। এ কি হইল ? পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করিল ? দেবুকে ? এই মাত্র কিছুদিন হইল সে জেল হইতে ফিরিয়াছে। বিনাদোষে আবার তাহাকে ধরিল ? এ গ্রামের সকলের চেয়ে ভালমানুষ, দশের উপকারী, তাহার পাঠশালার বন্ধু—বিপদের মিত্র দেবুকে ধরিল ? জগনকে ধরিল না, হরেনকে ধরিল না, তাহাকে ধরিল না ? ধরিল পণ্ডিতকে ? জনতার মধ্যে চুপ করিয়া মাটির দিকে সে ক্ষুব্ধ বিষণ্ণমুখে ভাবিতেছিল। তাহার অপরাধের দণ্ড ভোগ করিতে দেবু ভাই জেলে যাইবে ? সমস্ত লোকগুলি নীরবে হায় হায় করিতেছে। আক্ষেপে সে অধীর হইয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে সে আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না। একটা অদ্ভুত ধরণের আবেগের প্রাবল্যে দৃপ্ত ভঙ্গিতে সে দারোগার নিকট আসিয়া নিজের হাত বাড়াইল বলিল, দেবু পণ্ডিতের বদলে আমাকে ধর। ও গাছ কাটে নাই, গাছ কেটেছি আমি।

মুহূর্তে সমস্ত জনতা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। একটা স্তব্ধতা থম থম করিতে লাগিল। দারোগা পর্যন্ত অনিরুদ্ধের দিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই স্তব্ধ এবং বিস্মিত পরিমণ্ডলের মধ্যে অনিরুদ্ধ সোচ্চারে নিজের সমস্ত দোষ কবুল করিয়া ফেলিল।

* * *

এ স্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ করিল দেবু। উচ্চিংড়ের কাছ হইতে খবর পাইয়া বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থর থর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, অনি-ভাই, অনি-ভাই,—কিছু ভেবো না অনি-ভাই! আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে ছাড়াতে চেষ্টা করব।

অনিরুদ্ধ উত্তর দিতে পারিল না—গভীর আনন্দে বোকার মত আকর্ণ-বিস্তার হাসিয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ হইতে দর দর ধারে জল গড়াইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবুও কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে আরও অনেকে, এমন কি যতীন এবং দারোগা পর্যন্ত চোখ মুছিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রত্যেকেই অনিরুদ্ধকে সাধুবাদ দিল।—মানুষের মত কাজ করলে অনিরুদ্ধ এবার! এ একশো বার! সাবাস অনিরুদ্ধ, সাবাস।

ইহারই মধ্যে একটি উচ্চ কণ্ঠ জনতার পিছন হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সাবাস ভাই সাবাস। একশো বার সাবাস।

বিচিত্র ব্যাপার, এ কণ্ঠস্বর সর্বস্বান্ত ভিক্ষুক তারিণী পালের। উচ্চিংড়ের

বাবার। লোকটা কালো, লম্বা, দাঁত-উঁচু, খানিকটা খ্যাপা-খ্যাপা। অনিরুদ্ধের এই কাজটির মধ্যে সে কি করিয়া এক মহোল্লাসের সন্ধান পাইয়াছে।

বাড়ীর ভিতরে পদ্ম নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, চোখ দিয়া তাহার শুধু জলই ঝড়িতেছিল। তাহার বাক্য হারাইয়া গিয়াছে, চোখের জল গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। দুর্গা দাঁড়াইয়া ছিল অল্প দূরে। উচ্চিংড়ে ও গোবরা কাছেই ছিল; অনিরুদ্ধ ভিতরে আসিতেই তাহারা সরিয়া গেল। অনিরুদ্ধ এতক্ষণে সপ্রতিভভাবে হাসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—চললাম তা হলে।

পদ্মের তখনও ভাত হয় নাই, যতীনেরও অল্প দেরি আছে। দেবু বলিল—আমার জন্য ভাতে-ভাত হয়েছে অনি-ভাই, তাই দুটো খেয়ে নেবে, চল।

দেবুর ঘরেই খাইয়া অনিরুদ্ধ থানায় চলিয়া গেল।

যাইবার সময় দারোগা দুর্গাকে একটা তলব দিয়া গেল, থানাতে যাবি একবার। তোর নামেও একটা রিপোর্ট হয়েছে।

আজ যতীন নিজে রান্না করিল। উদ্যোগ করিয়া দিল উচ্চিংড়ে এবং গোবরা। দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত বলিয়া দিল দুর্গা।

পদ্ম কিছুক্ষণ ঘরে বসিয়াছিল, তাহার পর গিয়া বসিল খিড়কির ঘাটে। সেখানে বসিয়া তীক্ষ্ণস্বরে নামহীন কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশে করিয়া তীব্র নিষ্ঠুরতর অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল।

—শরীরে ঘুণ ধরবে, আকাট রোগ হবে। শরীর যদি পাথর হয় তো ফেটে যাবে, লোহার হয় তো গলে যাবে। অলক্ষ্মী ঘরে ঢুকবে—লক্ষ্মী বনবাসে যাবে। ঘরে আগুন লাগবে, ধানের মরাই ছাইয়ের গাদা হবে।

মনের ভিতর রূঢ়তর অভিসম্পাতের আরও চোখা-চোখা বাণী ঘুরিতেছিল—বউ বেটা মরবে, পিণ্ডি লোপ হবে, জোড়া বেটা এক বিছানায় শুয়ে ধড়ফড় করে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গ মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল—বিশীর্ণ গৌরবর্ণা এক সীমন্তিনী নারীর অতি কারত করুণা-ভিক্ষু মুখ। অল্পে অল্পে সে চুপ করিয়া গেল।

দুর্গা আসিয়া ডাকিল—কামার-বউ, এস ভাই, নজরবন্দীবাবু রান্না নিয়ে বসে আছেন।

পদ্ম উত্তর দিল না।

—খালভরি, উঠে আয় কেনে? পিণ্ডি খাবি না? তোর লেগে আমরাও খাব না—না কি?

এবার আসিয়া এমন মধুর সম্ভাষণে ডাকিল উচ্চিংড়ে।

পদ্ম উত্তর দিল—তোরা খা না গিয়ে হতভাগারা, আমি খাব না যা।

—খেতে দিচ্ছে না যি নজরবন্দীবাবু। তুমি না খেলে আমাদিকে দেবে না। নিজেও খায় নাই। কর্মকার তো মরে নাই—তবে তার লেগে এত কাঁদছিস ক্যানে?

—তবে রে মুখপোড়া!—পদ্ম ক্রোধভরে তাহাকে তাড়া করিয়া আসিয়া সেই টানে একবারে বাড়ী ঢুকিয়া পড়িল।

* * *

উনত্রিশে চৈত্র অনিরুদ্ধের মামলার দিন পড়িয়াছে। বিচার করিবার কিছু নাই; সে নিজেই স্বীকারোক্তি করিয়াছে। পুলিসের কাছেই করিয়াছিল। হাকিমের কাছেও করিয়াছে। উকিল মুক্তার কাহারও পরামর্শেই সে তাহা প্রত্যাহার করে নাই। সে যেন অকাস্মৎ বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিনের সর্বজনের বাহবা তাহাকে যেন একটা নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। সাজা তাহার হইবেই। দেবু কয়েকদিনই সদর শহরে গিয়াছিল, উকীল-মোক্তারও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সকল উকিল-মোক্তারে এক কথাই বলিয়াছে। সাজা দুই মাস হইতে ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু সাজা হইবে।

ইহার মধ্যে ইন্সপেকটার আসিয়া একবার তদন্ত করিয়া গিয়াছে। প্রজা সমিতির সহিত কোন সংস্রব আছে কিনা—ইহাই ছিল তদন্তের বিষয়। ইন্সপেকটার তাহার ধারণা স্পষ্টই গ্রামের লোকের কাছে বলিয়া গিয়াছে—প্রজা সমিতি এ কাজ করতে বলে নাই এটা ঠিক; কিন্তু প্রজা সমিতি যদি না থাকত গ্রামে, তবে এ কাণ্ড হত না। এতে আমি নিঃসন্দেহ।

দুর্গাকে ডাকা হইয়াছিল—তাহার বিরুদ্ধে নাকি রিপোর্ট হইয়াছে। কে রিপোর্ট করিয়াছে না বলিলেও দুর্গা বুঝিয়াছে। ইন্সপেকটর তীক্ষ্দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, শুনছি তোর যত দাগী বদমায়েস লোকের সঙ্গে আলাপ, তাদের সঙ্গে তুই—। ব্যাপার কি বল তো?

দুর্গা হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে হুজুর, আমি নষ্ট-দুষ্ট—এ কথা সত্যি। তবে মশায়, আমাদের গাঁয়ের ছিরু পাল—। জিভ কাটিয়া সে বলিল—না, মানে ঘোষ মহাশয়, শ্রীহরি ঘোষ, থানার জমাদারবাবু, ইউনান বোর্ডের পেসিডেনবাবু—এঁরা সব যে দাগী বদমাস নোক—এ কি করে জানব বলুন। মেলামেশা আলাপ তো আমার এঁদের সঙ্গে।

ইন্সপেকটার ধমক দিল। দুর্গা কিন্তু অকুতোভয়। বলিল—আপনি ডাকুন সবাইকে—আমি মুখে মুখে বলছি। এই সেদিন রেতে জমাদার ঘোষ মশায়ের বৈঠকখানায় এসে আমোদ করতে আমাকে ডেকেছিলেন—আমি গেছলাম। সেদিন ঘোষ মশায়ের খিড়কীর পুকুরে আমাকে সাপে কামড়েছিল—

পেরমাই ছিল তাই বেঁচেছি। রামকিষণ সিপাইজি ছিল, ভূপাল থানাদার ছিল। শুধান সকলকে। আমার কথা তো ছাপি কারু কাছে নাই।

ইন্সপেকটার আর কোন কথা না বাড়াইয়া কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—আচ্ছা আচ্ছা, যাও তুমি, সাবধানে থাকবে।

পরম ভক্তি সহকারে একটি প্রণাম করিয়া দুর্গা চলিয়া আসিয়াছিল।

ছাব্বিশ

ইহার পর বিপদ হইল পদ্মকে লইয়া। তাহার মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার। এই এখনই সে এক রকম, আবার মুহূর্ত পরেই সে আর এক রকমের মানুষ। উচ্চিংড়ে গোবরা পর্যন্ত প্রায় হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহার বাড়ীতে বড় একটা থাকে না। বিশ তারিখ হইতে গাজনের ঢাক বাজিয়াছে, মাঠের চেঁচুড়ে দীঘি হইতে বুড়াশিব চণ্ডীমণ্ডপ জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, তাহারা দুইজনে নন্দী-ভৃঙ্গির মত অহরহ চণ্ডীমণ্ডপে হাজির আছে। গাজনের ভক্তের দল বাণ-গোসাঁই লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা সাধিতে যায়—ছোঁড়া দুইটাও সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

গ্রামে গাজনে এবার প্রচুর সমারোহ। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে দেউল ও নাটমন্দির তৈয়ারীর সঙ্কল্প মুলতুবী রাখিলেও হঠাৎ এই কাণ্ডের পর গাজনের আয়োজনে সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। লোকে ভক্ত হইতে চাহিতেছে না কেন তাহার কারণ সে বোঝে। দেবু ঘোষ, জগন ডাক্তার আর দুগ্ধপোষ্য একটা আগন্তুক বালক ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে অপমান করিবার জন্যই গাজন ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা শ্রীহরি বোঝে। তাই হঠাৎ সে এবার গাজনে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। ছোট ধরনের একটি মেলার আয়োজনও করিয়া ফেলিল। দুই দল ভাল 'বোলান' গান, একদল ঝুমুর, একদল কবি-গানের পাল্লার ব্যবস্থা করিয়া সে গ্যাঁট হইয়া বসিল। যাহারা বলিয়াছে চণ্ডীমণ্ডপ ছাইব না, তাহারাই যেন চব্বিশ ঘণ্টা আনন্দ আয়োজনের দ্বারপ্রান্তে পথের কুকুরের মত দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারই জন্য এত আয়োজন। ভাত ছড়াইলে কাক ও কুকুর আপনি আসিয়া জুটে। সে যেদিন দাদন করে, সেদিন গ্রামের লোক তাহার বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই মধ্যে ভবেশ খুড়ো বহুজনের দরবার লইয়া আসিয়াছে। কথাবার্তা চলিতেছে, তাহারা ঘাট মানিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত ; প্রজা সমিতিও তাহারা ছাড়িয়া দিবে বলিয়া কথা দিয়াছে।

গড়গড়া টানিতে টানিতে শ্রীহরি আপন মনেই হাসিল। তবে ওই

হরিজনের দলকে সে ক্ষমা করিবে না। কুকুর হইয়া উহারা ঠাকুরের মাথার উপর উঠিতে চায়?

কাল আবার অনিরুদ্ধের মামলার দিন। সদরে যাইতে হইবে। শ্রীহরি চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধ জেলে গেলে পদ্ম একা থাকিবে। অন্নের অভাব হইবে— বস্ত্রের অভাব হইবে। দীর্ঘ-তনু, আয়ত-নয়না, উদ্ধতা, মুখরা কামারিণী এবার সে কি করে দেখিতে হইবে! তারপর অনিরুদ্ধের চার বিঘা বাকুড়ি। কামারের গোটা জোতটাই নীলামে উঠিয়াছে! হয়তো নীলাম এতদিন হইয়া গেল। যাক!

কালু শেখ আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—হুজুরের মা ডাকিতেছে।

—মা? ও, আজ যে আবার নীল ষষ্ঠী! শ্রীহরি উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল।

চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন নীল-ষষ্ঠী। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও মেয়েদের যাহাদের নীলের মানত আছে, তাহারা ষষ্ঠীর উপবাস করিবে, পূজা করিবে, সন্তানের কপালে কোঁটা দিবে। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ এই দিনে নাকি লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লীলাবতীর কোল আলো করিয়া নীলমণির শোভা। নীল-ষষ্ঠী করিলে নীলমণির মত সন্তান হয়।

পদ্ম সকল ষষ্ঠীই পালন করে; সে-ও উপবাস করিয়া আছে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে উচ্চিংড়ে ও গোবরাকে লইয়া। আজ সকালবেলা হইতেই তাহাদের দেখা নাই। চড়ক-পাটা বাহির হইয়াছে। ঢাক বাজাইয়া ভক্তরা গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে। একটা লোহার কাঁটায় কণ্টকিত তক্তার উপর একজন ভক্ত শুইয়া থাকিবে। সে কি সোজা কথা? সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের পিছনে পিছনে তাহারা ফিরিতেছে। আগে এখানে বাণ কোঁড়া হইত, এখন আর হয় না।

পদ্ম অপেক্ষা করিয়া অবশেষে নিজেই চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ডীমণ্ডপে ঢাক বাজিতেছে। বোধ হয় এ বেলার মত চড়ক ফিরিয়া আসিল।

চণ্ডীমণ্ডপ ঘিরিয়া মেলা বসিয়াছে। খানবিশেক দোকান। তেলেভাজা মিষ্টির দোকানই বেশী। বেগুনী, ফুলুরী, পাঁপড়-ভাজ হইতেছে। ছেলেরা দলে দলে আসিয়া কিনিয়া খাইতেছে। খানচারেক মণিহারী দোকান। সেখানে তরুণী মেয়েদেরই ভিড় বেশী—ফিতা, টিপ, আলতা, গন্ধ কিনিতেছে। গাছতলায় ছোট আসর পাতিয়া বসিয়াছে তিনজন চুড়িওয়ালী। একটা গাছতলায় বৈরাগীদের নেলোও বসিয়াছে কতকগুলা মাটির পুতুল লইয়া। ওমা বুড়ো পুতুলগলা তো বেশ গড়িয়াছে! হুঁকা হাতে তামাক খাইতেছে—আবার

ঘাড় নাড়িতেছে। বয়স্কেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অলস পদক্ষেপে! আজকাল দুইদিন কোন চাষের কাজ নাই। হাল চষিতে নাই, গরু জুতিতে নাই। এই দুই দিন সর্বকর্মের বিশ্রাম।

উচ্চিংড়ে ও গোবরার সন্ধান মিলল না। তাহা হইলে চড়ক এখনও ফেরে নাই। ও ঢাক শ্রীহরি ঘোষের ষষ্ঠী-পূজার ঢাক। পদ্ম বোধ হয় জানে না—ঘোষ এবার দশখানা ঢাকের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

পাতু নিজের গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে বাজাইতে গিয়াছে। সর্বত্রই এক অবস্থা। বাদ্যকরের চাকরান জমি প্রায় সর্বত্রই উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামের ঢাকী ও গ্রামে যায়, সে গ্রামের ঢাকী আসিয়াছে এ গ্রামে। সতীশ বাউড়াও তাহার বোলানের দল লইয়া অন্য গ্রামে গিয়াছে।

অগত্যা পদ্ম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাটিতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। পরের সন্তান লইয়া এ কি বিড়ম্বনা তাহার! কিছুক্ষণ পর আবার সে বাহির হইল। এবার শুষ্ক মুখ, ধূলিধূসর-দেহ ছেলে দুইটাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া যতীনের সম্মুখে আনিয়া বলিল—এই দেখ, একবার ছেলে দুটোর দশা দেখ। তুমি শাসন কর।

যতীন কিছু বলিল না মৃদু হাসিল।

পদ্ম বলিল—হেসো না তুমি। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় তোমার হাসি দেখলে। ভেতরে এস একবার, কোঁটা দেব।

কোঁটা দিয়া পদ্ম বলিল—হাসি নয়, উচ্চিংড়েকে তুমি বল, এমনি করে বাইরে বাইরে ফিরলে তুমি ওকে রাখবেই না এখানে, জবাব দেবে। খেতে দেবে না গোবরাটা ভাল—ওকে নিয়ে যায় উচ্চিংড়েই। কাল ওরা যেন না বেরোয় ঘর থেকে।

যতীন এবার মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া বলিল—তথাস্তু মা-মণি। তারপর সে উচ্চিংড়েকে কড়া রকমের ও গোবরাকে মৃদু রকমের শাসন করিয়া দিল। অর্থাৎ দুইজনেই দুই রকমের কান মলিয়া দিল।

কিন্তু তাহাই কি হয়?

উচ্চিংড়ে আর গোবরা হোম-সংক্রান্তি, অর্থাৎ গাজনের দিন কি ঘরে থাকিবে? সেই ভোররাত্রেই ঢাক বাজিবার সঙ্গেই উচ্চিংড়ে গোবরাকে লইয়া বাহির হইল, আর বাড়ীমুখো হইল না,—পাছে পদ্ম তাহাদের আটক করে।

আজ বুড়ো-শিবের পূজা। পূজা হইবে, বলিদান হইবে, হোম হইবে। আজ ভক্ত শুইয়া থাকিবে সমস্ত দিন। লোহার কাঁটাওয়ালা তক্তাখানা এমন ভাবে বসানো আছে যে ঘুরাইলে বন্-বন্ করিয়া ঘোরে।

উচ্চিংড়ে গোবরাকে বলিল—আজ ভাই আমরা শিবের উপোস করব।

—উপোস ? গোবরার ক্ষুধাটা কিছু বেশী।

—হ্যাঁ ! বাবা বুড়ো-শিবের উপোস। সবাই করে, না করলে পাপ হয়। উপোস করলে মেলা টাকা হয়।

সবাই গাজনের উপবাস করে, এ কথাটা গোবরা অস্বীকার করিতে পারিল না। গাজনের উপবাস প্রায় সার্বজনীন। বাউড়ী-বায়েন হইতে উচ্চতম বর্ণ ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আজ প্রায় সকলেরই উপবাস। অনিরুদ্ধের মামলার তদ্বিরে দেবু উপবাস করিয়াই সদরে গিয়াছে। শ্রীহরিরও উপবাস। কিন্তু উপবাস করিলেই টাকা হয়—এ কথাটা গোবরা স্বীকার করিতে পারিল না। তাহা হইলে পণ্ডিত গরীব কেন ?

গোবরার অন্তরের একান্ত অনিচ্ছা উচ্চিংড়ে বুঝিল ; বলিল—বেশী ক্ষিদে লাগে তো, হুই চৌধুরীদের বাগানে গিয়ে আম পেড়ে খাব ! বেশ বড় বড় হয়েছে—বুঝলি ? আম পাড়লে চৌধুরীরা কিছু বলবে না, আর ওতে পাপও হবে না।

এবার গোবরার তেমন আপত্তি রহিল না।

—শেষকালে না-হয় কারু বাড়ীতে মেগে খাব দুটো।

—উঁহু। মা-মণি তা হলে মারবে। বলবে—ভিখিরি কোথাকার, বেরো হতভাগারা।

—তবে চল আমরা মহাগেরাম যাই। সেখানে এখানকার চেয়ে বেশী ধূম। আর সেখানে মেগে খেলে, মা-মণি কি করে জানবে। তাই চল।

গোবরা এ প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

গ্রামের প্রান্তে একটা জলশূন্য পুকুরের পাড়ে খোঁড়া পুরোহিতের তেঠেঙে ঘোড়াটা ঘাস খাইতেছিল। উচ্চিংড়ে দাঁড়াইল। বলিল—এই, ঘোড়াটা ধর দিকি।

—চাঁট ছুঁড়বে।

—তোর মাথা। পেছনকার একটা ঠ্যাং খোঁড়া। চাঁট ছুড়তে গেলে নিজেই ধপাস করে পড়ে যাবে। ধর্। ওইটার উপর চেপে দুজনা চলে যাব। তোর কাপড়টা খোল্, নাগাম করব।

সত্যই ঘোড়াটা চাঁট ছুঁড়িতে পারে না ; কিন্তু কামড়ায়, খেঁকী কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া মাথা উঁচাইয়া কামড়াইতে আসে। এটা উচ্চিংড়ে জানিত না। সম্ভবত এটা ঘোড়াটার আত্মরক্ষার আধুনিকতম অস্ত্র আবিষ্কার। অশ্বারোহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।

সন্ধ্যায় গাজনের পূজা শেষ। চড়ক শেষ হইয়াছে। ভক্তদের আগুন লইয়া ফুল-খেলাও হইয়া গিয়াছে। বলি-হোমও হইয়া গিয়াছে। কপালে তিলক পরিয়া ভবেশ ও হরিশ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে। শ্রীহরি এখনও সদর হইতে ফেরে নাই। ঢাকীর দল প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকের বাজনার কেরামতি দেখাইতেছে। বড় বড় ঢাক, ঢাকের মাথায় দেড় হাত লম্বা পালকের ফুল। এ ঢাকের আওয়াজ প্রচণ্ড; ভদ্রলোকেরা বলে, ঢাকের বাদ্য থামিলেই মিষ্টি লাগে। কিন্তু ঢাকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ নিপুণ বাদ্যকরের হাতে রাগিণীর উপযুক্ত বোলে যখন বাজে, তখন আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া যায়—গুরুগম্ভীর ধ্বনির আঘাতে মানুষের বুকের ভিতরেও গুরুগম্ভীর ঝঙ্কার উঠে। নাচিয়া নাচিয়া নানা ভঙ্গি করিয়া মুখে বোল আওড়াইয়া—এক-একজন ঢাকী পর্যায়ক্রমে ঢাক বাজাইতেছে, তাহাদের নাচের সঙ্গে নাচিতেছে—কাকের পাখার কালো পালকে তৈয়ারী ফুল; একেবারে মাথার কাছে বকের সাদা পালকের গুচ্ছ।

হরিশ আক্ষেপ করিতেছিল—এবার চৌধুরী আসতে পারলেন না, ঠাঁইটি একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

চৌধুরী প্রতি বৎসর উপস্থিত থাকে। ঢাকের বাজনার সে একজন সমঝদার শ্রোতা। বসিয়া বসিয়া তালে তালে ঘাড় নাড়ে। পাশে থাকে একটি পোঁটলা। বাজনার শেষে চৌধুরী পোঁটলা খুলিয়া পুরস্কার দেয়—কাহাকেও পুরানো জামা, কাহাকেও পুরানো চাদর, কাহাকেও বা পুরানো কাপড়। এবার চৌধুরী শয্যাশায়ী হইয়া আছে। সেই মাথায় আঘাত পাইয়া বিছানায় শুইয়াছে, আর উঠে নাই। ঘা শুকাইতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প জ্বরও হইতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের চারিপাশে মেলার মধ্যে পথে ভিড় এখন প্রচুর। মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী, পুরুষ দলে দলে ঘুরিতেছে। সন্ধ্যার পর কবিগান হইবে। কলরবের অন্ত নাই। অকস্মাৎ সেই কলরব ছাপাইয়া কালু সেখের গলা শোনা গেল—হঠ হঠ হঠ সব!

ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া কালু সেখ বাহির হইয়া আসিল—তাহার পিছনে শ্রীহরি। ঘোষ ফিরিয়াছে। ভবেশ ও হরিশ অগ্রসর হইয়া গেল।

শ্রীহরি ফোকলা-দাঁতে একগাল হাসিয়া বলিল—সুখবর। দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

পথের ভিড় ঠেলিয়া দেবু ঘোষও যাইতেছিল। বিমর্ষমুখে সে গেল যতীনের ওখানে।

যতীন, দেবু, জগন ও হরেন—আজ সান্ধ্য মজলিসে লোক কেবল চারজন। সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আজিকার সমস্যা—পদ্মকে এ সংবাদটা কে দিবে, কেমন করিয়া দিবে?

ভিতরের দরজায় শিকল নড়িয়া উঠিল। পদ্ম ডাকিতেছে। যতীন উঠিয়া গেল। অনিরুদ্ধের দণ্ডের কথা শুনিয়া যতীন খুব বিষণ্ণ হয় নাই। দুই মাস জেল—যতীনের মতে লঘুদণ্ডই হইয়াছে। যে মন লইয়া অনিরুদ্ধ দেবুকে মিথ্যা দণ্ড হইতে বাঁচাইতে গিয়া সত্য স্বীকারোক্তি করিয়াছে, সে মন যদি তাহার টিকে—তবে সে নূতন মানুষ হইয়া ফিরিবে। আর যদি সে মন বুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ীই হয়—তবুও বা দুঃখ কিসের? দারিদ্র্য-ব্যাধিতে জীর্ণ মনুষ্যত্বের মৃত্যু তো ধ্রুবই ছিল। কিন্তু বিপদ হইয়াছে পদ্মকে লইয়া। কি মায়ায় যে এই অশিক্ষিতা আবেগ-সর্বস্বা পল্লী-বধূটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। বৃহত্তর জীবন, মহত্তর স্বার্থের মানদণ্ডে ওজন করিয়াও সে কিছুতেই তাহার মূল্যকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলিতে পারে না। মাটির মূর্তির মধ্যে সে দেবীরূপ কল্পনা করিতে পারে না। জলে বিসর্জন দিলে সে মূর্তি গলিয়া কাদা হইয়া যায়, জলতলে সে রূপ পঙ্কসমাধি লাভ করে, এ সত্য মনে করিয়া সে হাসে। কিন্তু ঐ ভঙ্গুর মাটির মূর্তি অক্ষয় দেবীরূপ লাভ করিল কেমন করিয়া? কালের নদী-জলে তাহাকে বিসর্জন দিলেও যে সে গলিবে না বলিয়া মনে হইতেছে। শিক্ষা নাই সংস্কৃতি নাই অভিমান ও কুসংস্কার সর্বস্ব পদ্ম মাটির মূর্তি ছাড়া আর কি? সে এমন সজীব দেবীমূর্তি হইয়া উঠিল কি করিয়া? কোন্ মন্ত্রে?

ইতিমধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পদ্মের চোখ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখের জল মুছিতে মুছিতে ম্লান হাসিয়া সে বলিল—দু'মাস জেল হয়েছে?

যতীন আশ্চর্য হইয়া গেল। ইহার মধ্যে কথাটা তাহাকে কে বলিল? মাথা নিচু করিয়া সে বলিল—হ্যাঁ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল পদ্ম, বলিল—তা হোক। ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক সে। কিন্তু পণ্ডিতকে যে তার পাপে দণ্ডভোগ করতে হয় নাই, সে যে সত্যি কথা বলছে—সেই আমার ভাগ্যি! তা না হলে তার অনন্ত নরক হত, সাত পুরুষ নরকস্থ হত।

যতীন অবাক হইয়া গেল।

পদ্ম বলিল—জল গরম হয়েছে। চা তুমি করে নাও। আমি একবার দেখি সেই মুখপোড়া ছেলে দুটোকে। এখনও ফেরে নাই। সারাদিন খায় নাই।

—তুমিও তো খাওনি মা-মণি? খেয়ে নাও। যতীনের মনে পড়িল—কাল পদ্মের নীল-ষষ্ঠীর উপবাস গিয়াছে আজ আবার সে সারাদিন গাজনের উপবাস করিয়াছে।

—খাব। সে ছুটোকে আগে ধরে আনি।

যতীন আর কিছু বলিবার পূর্বেই পদ্ম বাহির হইয়া গেল।

শ্রীহরির খিড়কীর ঘাটে শ্রীহরির মা উচ্চকণ্ঠে সবিস্তারে অনিরুদ্ধের শাস্তির কথা দম্ভ-সহকারে ঘোষণা করিতেছে। এ সে বহুক্ষণ পূর্বেই আরম্ভ করিয়াছে; এখনও শেষ হয় নাই। পুত্রগর্বিতা বৃদ্ধা শুধু অপেক্ষা করিতেছে—অদূরে উচ্চকণ্ঠের একটি সবিলাপ রোদন-ধ্বনির।

কথাবার্তা কহিবার অবসর আজ খুব কমই হইতেছিল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া যতীন বলিল—চৌধুরী কেমন আছেন ডাক্তারবাবু?

দেবু চমকাইয়া উঠিল, অনিরুদ্ধের হাঙ্গামায় আজ দু-দিন চৌধুরীর সংবাদ লওয়াই হয় নাই।

জগন বলিল—একটু ভাল আছেন। তবে এই একটুকু ঘা আর কিছুতেই সারছে না। ঘায়ের মুখ থেকে অল্প অল্প পুঁজ পড়ছে, আর প্রায়ই সামান্য সামান্য জ্বর হচ্ছে।

যতীন বলিল—যাব একদিন দেখতে।

দেবু বলিল—কালই চলুন না সকালে। আমি যাব।

—আমাকে ডেকো দেবু। তোমাদেরই সঙ্গে যাব। তোমাকে তো যেতেই হবে। একসঙ্গেই যাব। হরেন যাবে নাকি?

—টু-মরো তো হবে না ব্রাদার! পয়লা বোশেখ—খাতা ফেরার হাঙ্গামা আছে। আমাকে ছুটতে হবে আলেপুর, ইছু শেখের কাছে—গোটা চারেক টাকা আনতে হবে। নইলে বেটা বৃন্দাবনকে তো জান? একটি পয়সা আর ধার দেবে না।

পয়লা বৈশাখ—হালখাতা। কথাটা যেন ঝনাৎ করিয়া পড়িল। কথাটা দেবুরও মনে হইল। ধার সে বড় করে না। তবে এবার তাহার অনুপস্থিতিতে দুর্গার মারফত জংশনের একটা দোকানের বাকী পড়িয়াছে এগারো টাকা দশ আনা। অনিরুদ্ধের হাঙ্গামায় কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। দুর্গাও কোন তাগাদা দেয় নাই। টাকাই বা কোথা হইতে আসিবে? আসিয়া অবধি নিজের ভাবনা যে ভাবাই হয় নাই। কিন্তু না ভাবিলে ভবিষ্যৎ কি হইবে?

সে যদি হঠাৎ মারা যায়, তবে কি বিলু এই পদ্মের মত—কিংবা অবশেষে তারিণীর স্ত্রীর মত—ভাবিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। বার বার সে নিজেকে ধিক্কার দিয়া উঠিল—ছি, ছি, ছি!

তবুও চিন্তা গেল না। বিলুর বদলে মনে হইল খোকার কথা।

তাহার খোকাও কি ওই উচ্চিংড়ের মত—না—না—না। সে মনে মনেই

বলিল—কিছুতেই না। কাল নববর্ষের প্রথম দিন হইতে সে নিজের ভাবনা ভাবিবে, আর নয়—আর নয়। স্ত্রী-পুত্র লইয়া—দারিদ্র্য লইয়া দশের ভাবনা ভাবিবার অধিকার তাহার নাই, সে অধিকার ভগবান তাহাকে দেন নাই। সে ভার—সে অধিকার শ্রীহরির। গোটা গাজনের খরচটা সে-ই দিয়াছে। গোটা দেশের লোককে ধান দাদন সে-ই দিয়াছে; সে ভার তাহার।

সে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে উঠিয়া পড়িল।

জগন জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যাপার হে? হঠাৎ উঠলে?

—একটা জরুরী কাজ ভুলেছি।

সে চলিয়া আসিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া শিবকে প্রণাম করিল—হে দেবাদিদেব মহাদেব, ভালয়-ভালয় এ বৎসর পার করে দিলে। আশীর্বাদ কর—আগামী বৎসরটি যেন ভালয়-ভালয় যায়।

খোঁড়া পুরোহিত তাহাকে আশীর্বাদী নির্মাল্য দিল।

পথে নামিয়া সে বাড়ী গেল না। সে গেল দুর্গার বাড়ী। দুর্গাই দোকান হইতে ধার আনিয়া দিয়াছিল। তাহারই মারফতে একটা টাকা কাল সে পাঠাইয়া দিবে এবং মাসখানেক সময় চাহিয়া লইবে। সময় একটু বেশী লওয়াই ভাল। বৈশাখের প্রথমেই সে তিসি, মসিনা, গম, যব—যে কয়টা ঘরে আছে—বিক্রি করিয়া দিবে। সর্বাগ্রে সে ঋণ পরিশোধ করিবে।

বাড়ীতে দুর্গার মা বসিয়াছিল; একা অন্ধকারে দাওয়ার উপর বসিয়া কাহাকে গালি দিতেছিল—রাক্ষস, প্যাটে আগুন নাগুক—আগুন নাগুক—আগুন নাগুক। মরুক, মরুক, মরুক। আর হারামজাদী নচ্ছারী, বানের আগে কুটো,—সব্বাগ্যে তোর যাওয়ার কি দরকার শুনি?

দেবু জিজ্ঞাসা করিল—ও পিসেস, দুর্গা কই?

বিলু দুর্গার মাকে বাপের বাড়ীর গ্রামবাসিনী হিসাবে পিসী বলে, তাই দেবু বলে পিসেস অর্থাৎ পিস-শাশুড়ী।

দুর্গার মা মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। জামাইয়ের সামনে মাথায় কাপড় না থাকিলে এবং জামাই মাথার চুল দেখিলে, চিতায় নাকি মাথার চুল পোড়ে না। ঘোমটা দিয়া দুর্গার মা বলিল—সে নচ্ছারীর কথা আর বলো না বাবা! বানের আগে কুটো। 'রূপেন' বায়েনের কি না কি ব্যামো হয়েছে, তাই সব্বাগ্যে গিয়েছেন তিনি।

'রূপেন' অর্থাৎ উপেন। আত্মীয়স্বজনহীন বৃদ্ধ উপেন, আহা-হা বেচারী! কেউ নাই সংসারে। কিন্তু সে তো এখানে থাকে না। সে তো কঙ্কণায় ভিক্ষা করিত।

দেবু প্রশ্ন করিল—উপেন আজকাল গাঁয়ে ফিরছে নাকি ?

—মরতে ফিরেছে বাবা! গাঁয়ে আগুন লাগাতে ফিরেছে। কাল থেকে গাঁয়ে গাজনের মেলা দেখতে এসেছে। আজ সকালে ফুলুরীর দোকানদার কতকগুলো তে-বাসী ফুলুরী ফেলে দিয়েছিল—সেনেটারী বাবু আসবে শুনে। রূপেন তাই কুড়িয়ে গবাগব খেয়েছে। খেয়ে সনঝে থেকে 'নামুনে' হয়েছে। আমাদের দুগ্‌গা বিবি তাই শুনে দেখতে ছুটেছেন। আহা-হা, দরদ কত! কি বলব বাবা বল ?

'নামুনে' ; অর্থাৎ কলেরা ? সর্বনাশ! সম্মুখে এই বৈশাখ মাস—কোথাও এক কোঁটা পানীয় জল নাই! এই সময় কলেরা!

সে দ্রুতপদে আসিয়া উঠিল উপেনের বাড়ী। এক মুহূর্তে তাহার সব ভুল হইয়া গেল।

উঠানে মাটির উপর পড়িয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ছটফট করিতেছিল,—জল—জ-ল জল! স্বর অনুনাসিক হইয়া উঠিয়াছে। অন্য কেহ নাই, কেবল দুর্গা দাঁড়াইয়া আছে, সে যথাসাধ্য সংস্পর্শ বাঁচাইয়া একটা ভাঁড়ে করিয়া তাহাকে জল ঢালিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ কিন্তু আপনার জল খাইবার ভাঁড়ের নিকট হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কম্পিত বাহু বিস্তার করিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তীব্র ব্যগ্রতায় সে চীৎকার করিতেছে, জল—এঁকটু জল।

দেবু অগ্রসর হইল, ভাঁড়টি লইয়া উপেনের মুখের কাছে বসিয়া একটু একটু করিয়া জল ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল। দুর্গাকে বলিল—দুর্গা, শীগগির গিয়ে একবার জগনকে খবর দে। বলবি আমি বসে রয়েছি।

যতীনের কথাও একবার মনে হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—বিদেশী ভদ্রলোক। তাহাকে এসব বিপজ্জনক ব্যাপারে টানিয়া আনা উচিত হইবে না। এ তাহাদের গ্রাম, এখানকার সকল দুঃখকষ্ট একান্ত করিয়া তাহাদের। অতিথি-আগন্তুককে দিতে হয় সুখের ভাগ। দুঃখের ভাগ কি বলিয়া কোন্ মুখে সে তাহাকে লইতে আহ্বান করিবে!

সাতাশ

শুভ নববর্ষ। বৃদ্ধেরা শিহরিয়া উঠিল। নিতান্ত অশুভ প্রারম্ভ। রুদ্ররূপে মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে—সঙ্গিনী মহামারীকে লইয়া। চণ্ডীমণ্ডপে বর্ষ-গণনা পাঠ ও পঞ্জিকা বিচার চলিতেছে। করিতেছে খোঁড়া পুরোহিত, শুনিতেছে শ্রীহরি ঘোষ এবং প্রবীণ মণ্ডলেরা।

গতরাত্রির শেষভাগ হইতে বায়েন-পাড়ায় তিন জন আক্রান্ত হইয়াছে ; বাউড়ী

পাড়ায় দুইজন। উপেন মরিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীরভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল। এ যে প্রকাণ্ড দায়িত্ব সম্মুখে। গ্রামকে রক্ষা করিতে হইবে। হতভাগ্যের দল, তাহার সহিত বিরোধিতা করিয়াছে বলিয়া সে এ সময় বিমুখ হইলে, সে যে ধর্মে পতিত হইবে। অবশ্য কাজ সে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ভূপাল চৌকিদারকে ইউনিয়ন বোর্ডে পাঠাইয়াছে। স্যানিটারী ইন্সপেকটরের কাছে সংবাদ দিতে ইউ-বির সেক্রেটারীকে পত্র দিয়াছে। লোকটি কাল সকালেই আসিয়াছিল। বাউড়ীপাড়ায় বায়েন-পাড়ায় কিছু চাল সাহায্য দিবার কথাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ইঁদারাটিকে কলেরার সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছে। কালু সেখ পাহারায় মোতায়েন আছে।

বুড়ী রাঙাদিদি আজ সকালে ভগবানকে গাল দেয় নাই; সে জোড়হাতে তারস্বরে বার বার বলিতেছে—ভগবান, রক্ষে কর, হে ভগবান! দোহাই তোমার বাবা! তুমি ছাড়া গরীবের আর কে আছে দয়াময়! গেরাম রক্ষা কর বাবা বুড়ো শিব! হে বাবা! হে ভোলানাথ! হে মা কালী!

পদ্ম আকুল হইয়া উঠিয়াছে উচ্চিংড়ে ও গোবরার জন্য। 'আসাপা' ছেলে—সাপ দেখিলে ধরিবার মত দুঃসাহস উহাদের;—কি করিয়া উহাদের সে বাঁচাইবে? তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

যতীনও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছে; বাংলাদেশে কতলোক কলেরায় মরে, কত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে, কত লোক অনাহারে মরে, কত লোক অর্ধাশনে থাকে—এ সব তথ্য সে জানে। নিয়তিকে সে স্বীকার করে না। সে জানে এ মনুষ্যকৃত ত্রুটি, আপনাদের অজ্ঞানতার অক্ষমতার অপরাধের প্রতিফল। অপরাধ একমাত্র এই দেশটিতেই আবদ্ধ নয়—মানুষের ভ্রম হইতে, ভেদ-বুদ্ধি হইতে, অক্ষমতা হইতে উদ্ভূত এ অপরাধ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত। ব্যাধি এক দেশ হইতে অন্য দেশে সংক্রামিত হয় নাই, সেই দেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—অর্থগৃধ্নুর ধন উপার্জন-শক্তির প্রতিক্রিয়ার চৌর্যের মত, দানধর্মের প্রতিক্রিয়ার ভিক্ষা-ব্যবসায়ের মত! পুলিস য়্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন-রিপোর্ট সে পড়িয়াছে—ভিক্ষুকের দল এক-একটা শিশুকে হাঁড়ির ভিতর দিবারাত্র বসাইয়া রাখে—বৎসরের পর বৎসর বসাইয়া রাখে, যাহাতে তাহাদের অর্ধাঙ্গ বৃদ্ধি না পায়, পুষ্ট না হয়। পরে ইহাদের বিকলাঙ্গের দোহাই দিয়া দিব্য ভিক্ষার ব্যবসার পুতুল করিয়া তুলে। হয়তো এ দেশের ত্রুটি বেশী, এ দেশে লোক বেশী মরে, কুকুর বিড়ালের মত মরে। তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও চলিতেছে। হয়তো একদিন তাহার চোখ জলজ্বল করিয়া জলিয়া উঠিল—আরতির যুগল কর্পূর-প্রদীপের

শিখার মত মুহূর্তের জন্য, পরমুহূর্তেই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কালের দ্বারে বলি ভাবিয়া দৃঢ়চিত্তে আজ কিন্তু এ সমস্ত সে দেখিতে পারিতেছে না। পদ্মের মত সমস্ত গ্রামখানাই কবে কখন তাহার সমস্ত অন্তরকে মমতায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—সে বুঝিতে পারে নাই। গ্রামের এই বিপর্যয়ে—বিয়োগে—শোকে সে নিতান্ত আপনজনের মতই একান্ত বিষণ্ণ ও ব্যথিত হইয়া উঠিল।

বৈশাখের প্রথম দিন। সেই মধ্যরাত্রে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে, তারপর আর হয় নাই। হু হু করিয়া গরম ধূলিকণাপূর্ণ বাতাস বহিতেছে ঝড়ের মত। সেই বাতাসে শরীরের রক্ত যেন শুকাইয়া যাইতেছে। মাটি তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে যেন একটা তৃষাতুর হা-হা-ধ্বনি উঠিয়াছে। কোথাও মানুষ দেখা যায় না। এক দিনেই এক বেলাতেই একটা মানুষের মৃত্যুতেই মানুষ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়াছে, একটা মানুষও আর পথের উপরে নাই।

শুধু বাহির হইয়াছে দেবু ও জগন। তাহারা এখনও ফেরে নাই। যতীনও একবার বাহির হইয়াছিল, অল্পক্ষণ পূর্বে ফিরিয়াছে। সে ফিরিতেই পদ্ম অঝোরঝরে কাঁদিয়া বলিল—আমাকে খুন করো না তুমি—তোমার পায়ে পড়ি। দোহাই একটু সাবধানে থাক তুমি।

যতীন ভাবিয়া পায় না—এই অবোধ মা-মণিকে সে কি বলিবে ?

দেবু গিয়াছে উপেনের সৎকারে। সকাল হইতে দেবু যেন একাই একশ হইয়া উঠিয়াছে। এই অর্ধ-শিক্ষিত পল্লী-যুবকটির কর্মক্ষমতা ও পরার্থপরতা দেখিয়া যতীন বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। আরও একটা নূতন জিনিস সে দেখিয়াছে। ডাক্তারের অভিনব রূপ। চিকিৎসকের কর্তব্যে তাহার একটুকু ত্রুটি নাই। শৈথিল্য নাই। এই মহামারী ক্ষেত্রে নির্ভীক জগন— পরম যত্নের সহিত প্রতিটি জনকে আপনার বিদ্যাবুদ্ধি মত অকাতরে চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছে। গ্রামের সে কখনও ফি লয় না; কিন্তু এমন ক্ষেত্রে, কলেরার মত ভয়াবহ মহামারীর সময় ডাক্তারদের উপার্জনের বিশেষ একটা সুযোগ পাইয়াও জগন আপনার প্রথা-রীতি ভাঙে নাই,—এটা জগনের লুকাইয়া রাখা একটা আশ্চর্য মহত্ত্বের পরিচয়। মুখে আজ তাহার কর্কশ কথা পর্যন্ত নাই, মিষ্ট ভাষায় সকলকে অভয় দিয়া চলিয়াছে।

দেবু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে। টেলিগ্রাম লইয়া জংশনে গিয়াছে দুর্গা। ইউনিয়ন বোর্ডেও দেবু সংবাদ পাঠাইয়াছে, পাতু সেখানে গিয়াছে। নিজে রোগাক্রান্তদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছে। যাহারা গ্রাম হইতে সরিয়া যাইতে চাহিয়াছে—তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। তারপর উপেন বায়েনের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে বসিয়াছে। বায়েনদের মধ্যে এখানে সক্ষম

পুরুষ মাত্র তিনজন। তাহাদের একজন পলাইয়াছে। বাকী দুইজন রাজী থাকিলেও দুইজনে একটা শব লইয়া যাওয়া অসম্ভব কথা! পাশেই বাউড়ী-পাড়ায় অনেক লোক আছে বটে, কিন্তু বাউড়ীরা মুচীর শব স্পর্শ করিবে না। তবে বাউড়ীদের মাতব্বর সতীশ তাহার সঙ্গে আছে।

শ্মশানের পথও কম নয়, ময়ূরাক্ষীগর্ভের উপর শ্মশান—দূরত্ব দেড় মাইলের উপর। অনেক চিন্তা করিয়া শেষে বেলা এগারোটার সময় আপনার গাড়ী গরু আনিয়া, দেবু গাড়ীতে করিয়া উপেনের সৎকারের ব্যবস্থা করিল।

সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াই তাহার কর্তব্য শেষ হইল না; বাউড়ী-বায়েনদের দায়িত্বজ্ঞান কম—হয়তো গ্রামের কাছেই কোথাও ফেলিয়া দিবে আশঙ্কা করিয়া সে শবের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হইল। তা ছাড়া পাতু ও তাহার সঙ্গী—মাত্র দুইজনে এই কলেরা রোগীর মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাইতে তাহারা যেন ভয় পাইতেছিল। দেবু তাহা অনুভব করিল। এবং বলিল—ভয় করছে পাতু?

শুষ্কমুখে পাতু বলিল—আজ্ঞে?

—ভয় করছে নিয়ে যেতে?

—করছে একটুকু। ভয়ার্ত শিশুর মতই অকপটে সে স্বীকার করিল।

—তবে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই।

—আপুনি?

—হ্যাঁ, আমি। চল যাই।

পাতু ও তাহার সঙ্গীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাতু বলিল—আপুনি বাঁধের ওপরটিতে শুধু দাঁড়াবেন তা হলেই হবে!

—চল, আমি শ্মশান পর্যন্তই যাব।

প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত বৈশাখী দ্বিপ্রহরে তাহারা গাড়ীর উপর শবদেহ চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাঠ আজ জনশূন্য। রাখালেরা সকলেই প্রায় এই বাউড়ীবায়েনদের ছেলে—তাহারা এমন আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, মাঠে গরু লইয়া আসে নাই। গ্রামের আশেপাশেই গরু লইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। বৈশাখী দ্বিপ্রহরে এই ধু-ধু করা প্রান্তরে আসিয়া যদি অকস্মাৎ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি হইবে? মাঠে আগুনের মত ধূলায় পড়িয়া তৃষ্ণায় ছট্‌ফট করিয়া মরিবে যে! এই আতঙ্কে তাহারা আতঙ্কিত। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠখানা খাঁ খাঁ করিতেছে। মধ্যে যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহার আর এক বিন্দুও কোথাও জমিয়া নাই। মাটির রস পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের বড় বড় সিচের পুকুরগুলি এমনভাবে মজিয়া গিয়াছে, মোহনার বাঁধ এমনভাবে ভাঙিয়া গিয়াছে যে, বিন্দু

বিন্দু করিয়া যেজল ভিতরে জমে, তাহাও নিঃশেষে বাহির হইয়া আসে। গ্রামের প্রান্ত হইতে ময়ূরাক্ষী পর্যন্ত কোথাও এক কোঁটা জল নাই। ঝড়ের মত প্রবল বৈশাখী দ্বিপ্রহরের বাতাসে মাঠের ধূলা উড়িতেছে ; তাহাতে যেন আগুনের স্পর্শ। ইহারই মধ্যে গাড়ীটা ধীর গতিতে চলিয়াছিল। কাঁ্য—কাঁ্যা—কাঁ্যা—চাকার দীর্ঘ একটানা একঘেয়ে শব্দ উঠিতেছে। কাঁ্যা—কাঁ্যা—

পাতু বলিল—এবার আর আমাদের রক্ষে নাই ; কেউ বাঁচবে না পণ্ডিত মশায়।

দেবু স্নেহসিক্ত স্বরে অভয় দিয়া বলিল—তুই পাগল পাতু ! ভয় কি ?

—ভয় ? পাতু হাসিল, বলিল—একেবারে পয়লা বোশেখ নামুনে ঢুকল গাঁয়ে ! তা ছাড়া লোকে বলছে—এবার আমরা চণ্ডীমণ্ডপ ছাইয়ে দিলাম না—বাবা বুড়ো শিবের রাগে হয়তো—

দেবুও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে দেবধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু বাবা এমনই অবিচার করিবেন ? নিরপরাধের অপরাধটাই বড় হবে তাঁহার কাছে ? দেবোত্তর সম্পত্তি যাহারা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে, তাদের তো কিছু হয় নাই। সে দৃঢ়স্বরে বলিল—না পাতু। বাবার কাছে কোন অপরাধ তোমাদের হয় নাই। আমি বলছি।

পাতু বলিল—তবে ই-রকমটা ক্যানে হল পণ্ডিত মশাই ?

দেবু কলেরার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল।

উঃ ! এই ঠিক দুপুরে স্ত্রীলোক কে এদিকে আসিতেছে ? বোধ হয় জংশন হইতে ফিরিতেছে। হ্যাঁ—তাই তো ! এ যে দুর্গা ? দুর্গা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ফিরিতেছে।

উপেনের শবের সঙ্গে দেবুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—নিকটে আসিয়া তিরস্কার-ভরা কণ্ঠ করিয়া বলিল—এ কি করেছ জামাই ! তুমি কেন এলে ? তুমি যাচ্ছ কেন ? ফের !

দেবু কথাটা একেবারে ঘুরাইয়া দিল—এতক্ষণে ফিরলি দুর্গা। টেলিগ্রাম হল ?

—হল। কিন্তু তুমি কিসের লেগে যাচ্ছ জামাই ? ফিরে চল।

—ফিরছি, তুই যেতে লাগ।

—না, তুমি ফের আগে।

—পাগলামি করিস না দুর্গা। তুই যা, আমি শীগগির ফিরব।

তাহারা চলিয়া গেল ; দুর্গার চোখ দিয়া অকারণে জল পড়িতে আরম্ভ করিল।

শীঘ্র ফিরিব বলিলেও—শীঘ্র ফেরা হইল না। ফিরিতে অপরাহ্ন গড়াইয়া

গেল। ময়ূরাক্ষীর কাদা-বালি গোলা, হাঁটুডোবা জলে কোনমতে স্নান সারিয়া বাড়ী আসিয়া দেবু ডাকিল—বিলু!

ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল খোকা, তাহার খোকনমণি। দুটি হাত বাড়াইয়া সে ডাকিল—বা-বা!

দেবু দুই পা পিছনে সরিয়া আসিয়া বলিল—না না, ছুঁয়ো না আমাকে। না।

খোকন আমোদ পাইয়া গেল। মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল লুকোচুরি খেলার আমোদ, সে খিল-খিল করিয়া হাত বাড়াইয়া আরও ছুটিয়া আসিল। খোকনের আমোদের ছোঁয়াচ দেবুকেও লাগিল—সে আরও খানিকটা সরিয়া আসিয়া বলিল—না খোকন, দাঁড়াও ওখানে। তারপর সে ডাকিল বিলুকে।—বিলু—বিলু!

বিলু বাহির হইয়া আসিল—অভিমানস্ফুরিতাধরা। সে কোন কথা বলিল না। চুপ করিয়া স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। দেবু কি তাহার সর্বনাশ করিতে চায়? এই প্রখর গ্রীষ্ম, তাহার উপর এই ভয়ঙ্কর মহামারী, দেবু সেই মহামারী লইয়া মাতিয়া উঠিল তাহার সর্বনাশ করিবার জন্য? সে সমস্ত দুপুর কাঁদিয়াছে।

দুর্গা আসিয়াছিল; সে বিলুকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, একটুকুন শক্ত হও বিলু-দিদি, জামাই-এর একটু রাশ টেনে ধর। নইলে এই রোগের পিছুতে ও আহারনিদ্রে ভুলবে, হয়তো তোমাদের সর্বনাশ—নিজের সর্বনাশ করে ফেলবে।

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অভিমান অনুভব করিল। হাসিয়া বলিল—আমার বিলুমণির রাগ হয়েছে? শীগগির একটু খোকাকে ধর বিলু!

বিলুর চোখের জল আর বাঁধ মানিল না। ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবু বলিল—কেঁদো না, ছি! কথা শোন, শীগগির ধর খোকাকে। আর আমাকে একটু খড় জ্বেলে আগুন করে দাও, তারপর তাড়াতাড়ি এককড়া জল গরম চাপাও। গরম জলে হাত-পা ধুয়ে ফেলব; কাপড়-জামাও গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে।

বিলু কোন কথা বলিল না, ছেলেটিকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছেলেটি দেবুকে সকাল হইতে দেখিতে পায় নাই, সে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা দাব! বাবা দাব!

বিলু তাহার পিঠে একটা চাপড় বসাইয়া দিয়া বলিল—চুপ কর বলছি, চু-উ-প। তবুও তাহার জিদ দেখিয়া তাহাকে দুম করিয়া নামাইয়া দিল।

দেবু আর সহ্য করিতে পারিল না। বিলুকে তিরস্কার করিয়া বলিল—আঃ, বিলু! ও কি হচ্ছে! শীগগির ওকে কোলে নাও বলছি!

বিলু আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে, সে বলিল—কেন, তুমি মারবে নাকি? ছেলের আদর কত করছ—তা জানি!

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিলু হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল—এমন দগ্ধে মারার চেয়ে আমাকে তুমি খুন করে ফেল। আমাকে তুমি বিষ এনে দাও।

দেবু উত্তর দিতে গেল—সান্ত্বনা মধুর উত্তরই সে দিতেছিল। কিন্তু দেওয়া হইল না। সর্পস্পৃষ্টের মত সে চমকিয়া উঠিল, শিহরিয়া উঠিল—পিছন হইতে খোকা তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিতেছে। ধরিয়াছে, সে ধরিয়াছে—পলাতককে সে ধরিয়াছে! দেবু পিছন ফিরিয়া খোকার দুই হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিল, আর্তস্বরে বিলুকে বলিল—শীগগির জল গরম কর বিলু, শীগগির! খোকার হাত ধুয়ে দিতে হবে। এখুনি হয়তো ওই হাত মুখে দেবে!

খোকা দুরন্ত অভিমানে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার ধারণা হইল—তাহার বাবা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। শুধু সে কাঁদিলই না—ঝুঁকিয়া পড়িয়া রোষে ক্ষোভে দেবুর হাতের এক জায়গায় কামড়াইয়া প্রায় ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। শেষে তাহার ভিজা কাপড়ের খানিকটাও দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া দিল।

দেবু ইহাতে রীতিমত আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। বিলুকে একপ্রকার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—বিলু লক্ষ্মীটি, সব বুঝিয়ে বলছি তোমায়। চট করে এখনি তুমি গরম জল চড়াও। খোকার মুখখানা তাড়াতাড়ি ধুইয়ে দাও।—

বিলুর রাগ কিন্তু একটু পরেই নিভিয়া গিয়াছে। দেবুর কোলে খোকনকে দেখিয়া সে মহাখুশী হইয়া উঠিয়াছে। বলিল—তুমি কি নিষ্ঠুর বল দেখি? ছেলেটা আমার চেয়েও তোমাকে ভালবাসে—আর তুমি কিনা ওকে ফেলে বাইরে বাইরে থাক! তোমার বোধ হয় বাড়ীর বাইরে পা দিলে সংসার বলে কিছুই মনে থাকে না। ছিঃ, খোকাকে ভুলে যাও তুমি!

দেবু বলিল—না। আর যাব না বিলু, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর যাব না।

গরম জলে মুখ হাত পা ধোওয়াইয়া নিজের ধুইয়া দেবু খোকাকে এতক্ষণে ভাল করিয়া কোলে লইল। বাপের কোলে থাকিয়াই সে মাকে কাছে আসিতে দেখিয়া বাপের বুকে মুখ লুকাইল। বিলু দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ওই দেখ দেখি!

খোকন বলিয়া উঠিল—না, দাব না। না, দাব না।

বিলু খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—ওরে দুষ্ট ছেলে! না, দাবে না তুমি? বাপ পেয়ে আমায় ভুললে বুঝি? আচ্ছা, আমিও তোমাকে মেনু দেব না।

খোকন এবার মায়ের মন রাখিতে দেবুকে বলিল—বাবা, মা দাই!

বিলু বলিল—উঁহু! বাবাকে ধরে রাখ, বাবা পালাবে।

দেবুর বুকখানা রুদ্ধ আবেগে তোলপাড় করিয়া উঠিল।

সেটা বিলুর চোখে পড়িল। সে শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাগো, তোমার শরীরটা ভাল আছে তো?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া দেবু বলিল—শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়েছে।

—একটু চা করব, খাবে?

—কর।

চা খাইয়াও সে তেমনি নীরব বিষণ্ণতার মধ্যে উদ্বেগ-উদ্বেলিত অন্তরে একটা ভীষণ কিছুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় বাউড়ী-বায়েন-পাড়ায় একটা কান্নার রোল উঠিল। কেহ নিশ্চয় মরিয়াছে। দেবু খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে অধীর হইয়া উঠিল।

বিলু বলিল—কেউ ম'ল বোধ হয়?

তিক্তস্বরে দেবু বলিল—মরুক গে, আমি আর খোঁজ নিচ্ছি না।

অবাক হইয়া বিলু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর বলিল—আমি কি তোমাকে বলেছি যে, কেউ মলে তুমি খোঁজ করবে না, না তাদের বিপদে তুমি দেখবে না! উপেন বায়েন—মুচী, তার সৎকারের জন্যে গাড়ী দিলে আমি কিছু বলেছি? কিন্তু তুমি শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গে গেলে কেন বল দেখি? খাওয়া নাই—এই বোশেখ মাসের রোদ! তাই বলেছি আমি।

খোকা দেবুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিলু খোকাকে দেবুর কোল হইতে লইয়া বলিল—যাও, একবার দেখে এখুনি ফিরে এস। তোমার উপর কত ভরসা করে ওরা—তা তো জানি।

দেবু যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই বিলুর কথায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। চণ্ডীমণ্ডপে খোল-করতাল লইয়া হরিনাম-সংকীর্তনের দল বাহির করিবার উদ্যোগ হইতেছে। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে নাকি অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

ও-পাড়ার ধর্মদেবের পূজার আয়োজন চলিতেছে। সে সতীশকে ডাকিল। সতীশ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—অবস্থা যে ভয়ানক হয়ে উঠল পণ্ডিত মশায়! বিকেলে আবার দু'জনার হয়েছে। গণার পরিবার একটু আগে মারা গেলেন।

—তাড়াতাড়ি সৎকারের ব্যবস্থা কর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে সব করছি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপরাধীর মত সে বলিল—উ বেলায় রূপেনের মড়া নিয়ে আপনাকে—কি করব বলেন? আমাদের জাতি তো লয়। আমাদের লেগে আপনাকে এত ভাবতে হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—ডাক্তার বিকেলে এসেছিল?

—আজ্ঞে হাঁ। বিকেলে আবার ঘোষ মশায় নোক পাঠিয়েছিলেন—চাল দেবেন বলে। তা ডাক্তারবাবু বললেন—কিছুতেই লিবি না।—আমরা যাই মশায়।

দেবু অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা গভীর উদাসীনতা যেন নিবিড় কুয়াশার মত জাগিয়া উঠিতেছে—তাহার সুখ-দুঃখ সব যেন সংবেদন-শূন্যতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। যে গভীর উদ্বেগ সে সহ্য করিতেছিল—সেই উদ্বেগ যেন পুরাণের নীলকণ্ঠের হলাহল। নীলকণ্ঠের হলাহলের মতই তাহাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সতীশ আবার ডাকিল—পণ্ডিত মশায়!

—আমাকে কিছু বলছ?

সতীশ অবাক হইয়া গেল, বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পণ্ডিত মশায় আর কে আছে এখানে, ও-নামে আর কাহাকে ডাকিবে সে?

—কি বল?

—বলছি। রাগ করবেন না তো?

—না না, রাগ করব কেন?

—বলছিলাম কি, ঘোষ মশায় চাল দিতে চাইছেন, তা লিতে দোষ কি? অভাবী লোক সব—এই মহা বেপদের সময়—

দেবু প্রসন্ন সহানুভূতির সঙ্গেই বলিল—না না, কোন দোষ নাই সতীশ। ঘোষ মশায় তো শত্রু নন তোমাদের, আমাদেরও নন। তিনি যখন নিজে যেচে দিতে চাচ্ছেন—তখন নেবে বৈকি।

সতীশ দেবুর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আপনকার মত যদি সবাই হত পণ্ডিতমশায়। আপনি একটুকুন বলে দেবেন ডাক্তারবাবুকে। উনি আবার রাগ করবেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আমি বলে দোব ডাক্তারকে।

—ডাক্তোরবাবু বসে আছেন লজরবন্দীবাবুর কাছে।

দেবু ফিরিল। কিন্তু আজ আর যতীনের ওখানে যাইতে ইচ্ছা হইল না। সে বাড়ীর পথ ধরিল। বাড়ীতে দুর্গা আসিয়া বসিয়া আছে। দুর্গা বলিল—

আমাদের পাড়ায় গিয়েছিলে জামাই-পণ্ডিত? গণার বউটা মারা গেল, নয়?

—হাঁ। সে বিলুকে বলিল—খোকন কই?

—সে সেই ঘুমিয়েছে, এখনো ওঠেনি।

—ঘুমিয়েছে! দেবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। প্রায় ঘণ্টাচারেক কাটিয়া গেল, খোকা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম সুস্থতার একটা লক্ষণ। তারপর সে দুর্গাকে প্রশ্ন করিল—তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—জংশন গেছলাম।

বিলু বলিল—একটু জল খাও। দুর্গা খাতা ফিরিয়ে মিষ্টি এনেছে।

—তাই তো! হ্যাঁরে দুর্গা, জংশনে দোকানদারদের কাছে কথার খেলাপ হয়ে গেল রে!

—সে সব ঠিক হয়েছে গো, তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

দুর্গা হাসিল—বিলু-দিদির মত লক্ষ্মী তোমার ঘরে, ভাবনা কি? বিলু-দিদি আমাকে দু-টাকা দিয়েছিল, আমি দিয়ে এসেছি। আবার সেই আষাঢ়ে কিছু দিয়ো রথের দিনে, আর কিছু আশ্বিনে,—দোকানী তাতেই রাজী হয়েছে।

পরম আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া এতক্ষণে সত্যকার হাসি হাসিয়া দেবু বলিল—বিলু আমি যতীনবাবুর কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি, বুঝলে?

—এই রাত্তিরে আবার বেরুচ্ছো? তা একটুকুন জল খেয়ে যাও।

—আমি যাব আর আসব। জল এখন আর খাব না।

—আচ্ছা উপোস করতে পার তুমি! বিলু হাসিল। দেবু বাহির হইয়া গেল।

যতীনের আসরে আজ কেবল যতীন, জগন, আর চা-প্রত্যাশী গাঁজাখোর গদাই। চিত্রকর নলিনও আসিয়া একটি কোণে অভ্যাসমত চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে আজ একটি টাকা চাহিতে আসিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া কয়েকদিনের জন্য সে অন্যত্র যাইবে।

জগন অনর্গল বকিতেছে। দেবুকে দেখিয়া ডাক্তার বলিল—কি ব্যাপার হে, এ বেলা পাত্তাই নেই! আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি ভয় পেয়েছ।

দেবু হাসিল।

যতীন বলিল—শরীর কেমন দেবুবাবু? শুনলাম শ্মশানে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন চারটের পর।

—শরীর খুব ক্লান্ত। নইলে ভালই আছি।

—তুমি মুচী মড়ার সঙ্গে গিয়েছ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখে এস একবার ব্যাপারটা। আর তোমার রক্ষে নাই!

দেবু ও কথা আমলেই আনিল না, বলিল—আচ্ছা ডাক্তার, কলেরার বিষ যদি শরীরে ঢোকে, তবে কতক্ষণ পরে রোগ প্রকাশ পায় ?

জগন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছ দেবুভাই।

গদাই ওপাশ হইতে সসঙ্কোচে বলিল—কিসের ভয় ? ওর ওষুধ হল এক ছিলিম গাঁজা !

দেবু আর কোন প্রশ্ন করিল না, প্রশ্ন করিতেও তাহার ভয় হইতেছে। বিজ্ঞানের সত্য যদি তাহার উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দেয় ? সে বার বার মনে করিল—বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য নয়, এ সংসারে আর একটা পরম তত্ত্ব আছে—সে পুণ্য, সে ধর্ম। তাহার ধর্ম, তাহার পুণ্য তাহাকে রক্ষা করিবে। সেই অমৃতের আবরণ খোকাকে মহামারীর বিষ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবে।

যতীন বলিল—কি ব্যাপার বলুন তো দেবুবাবু ? হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন কেন আপনি ?

দেবু বলিল—আজ যখন বাড়ী ফিরলাম, শ্মশানে উপেনের শব আমাকে ধরতে হয়েছিল ; তারপর অবশ্যি ময়ূরাক্ষীতে স্নান করেছি ! তারপর বাড়ী ফিরে—। কে ? দুর্গা নাকি ?

হ্যাঁ, দুর্গাই। অন্ধকার পথের উপর আলো হাতে আসিয়া দুর্গাই দাঁড়াইল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দুর্গা বলিল—হ্যাঁ, বাড়ী এস শীগ্‌গির। খোকার অসুখ করেছে, একবার জলের মতন—

দেবু বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত উঠিয়া একলাফে পথে নামিয়া ডাকিল—ডাক্তার !

বৈজ্ঞানিক সত্য ধর্মবিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করিয়া শেষে কি তাহার গৃহেই রুদ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল ?

সর্বনাশী মহামারী মানবদেহের সকল রস দ্রুত শোষণ করিয়া জীবনীশক্তিকে নিঃশেষিত করিয়া দেয়। সেই মহামারী দেবুর সকল রস, সকল কোমলতা নিষ্ঠুর পেষণে পিষ্ট করিয়া পাথর করিয়া দিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একা খোকা নয়, খোকা ও বিলু—দুজনেই কলেরায় মারা গেল। প্রথম দিন খোকা, দ্বিতীয় দিন বিলু। শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নাই। জংশন শহর হইতে রেলের ডাক্তার, কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তার—দুইজন বড় ডাক্তার আনা হইয়াছিল। কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারটি সংবাদ পাইয়া আপনা হইতেই আসিয়াছিল। লোকটি গুণগ্রাহী, দেবুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আসিয়াছিল। জগন নিজে জংশনে গিয়া রেলের ডাক্তারকে আনিয়াছিল। অনাহারে অনিদ্রায় দেবু অকাতরে তাহাদের সেবা করিয়াছে আর ঈশ্বরের নিকট মাথা খুঁড়িয়াছে—দেবতার নিকট মানত করিয়াছে।

দুর্গাও কয়দিন প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিয়াছে। জগন ডাক্তারের তো কথাই নাই, যতীন, সতীশ, গদাই, পাতু দুইবেলা আসিয়া তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। দেবু পাথরের মত অশ্রুহীন নেত্রে নীরব নির্বাক হইয়া সব দেখিল—বুক পাতিয়া নিদারুণ আঘাত গ্রহণ করিল।

বিলুর সৎকার যখন শেষ হইল, তখন সূর্যোদয় হইতেছে। দেবু ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃস্ব, রিক্ত, তিক্ত জীবন লইয়া। সুখ-দুঃখের অনুভূতি মরিয়া গিয়াছে, হাসি ফুরাইয়াছে, অশ্রু শুকাইয়াছে, কথা হারাইয়াছে; মন অসাড়, দৃষ্টি শূন্য; ঠোঁট হইতে বুক পর্যন্ত নীরস শুষ্ক—সাহারার মত সব খাঁ খাঁ করিতেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়া সে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সব আছে—সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বাড়ী-ঘর, সেই গাছপালা, কিন্তু দেবুর দৃষ্টির সম্মুখে সব অর্থহীন, সব অস্তিত্বশূন্য ঝাপসা; এক রিক্ত অসীম তৃষাতুর ধূসর প্রান্তর আর বেদনাবিধুর পাণ্ডুর আকাশ। ওই বিবর্ণ ধূসরতার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন।

সমস্ত গ্রামের লোকই ভিড় করিয়া আসিয়াছিল তাহাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি জানাইতে। কিন্তু দেবুর এই মূর্তির সম্মুখে তাহারা কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যতানও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। আত্মগ্লানিতে সে কষ্ট পাইতেছে—তাহার মনে হইতেছে দেবুকে সে-ই বোধ হয় এই পরিণামের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। জগনও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীহরি, হরিশ, ভবেশও আসিয়াছিল। তাহারাও নীরব। দেবুর সম্মুখে কথা বলিতে শ্রীহরিরও যেন কেমন সঙ্কোচ হইল।

ভবেশ শুধু বলিল—হরি-হরি-হরি।

নির্বাক জনমণ্ডলীর প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল—ডাক্তারবাবু!

বিরক্ত হইয়া জগন বলিল—কে? কি?

—আজ্ঞে, আমি গোপেশ। একবার আসেন দয়া করে।

—কেন, হল কি?

দেবু একদিকে ঠোঁট বাঁকাইয়া বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল—আর কি? বুঝতে পাচ্ছ না? যাও দেখে এস।

জগন বিরুক্তি করিল না, উঠিয়া গেল। যতীন বলিল—দাঁড়ান, আমিও যাচ্ছি।

একে একে জনমণ্ডলী নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল, দেবু একা ঘরে বসিয়া রহিল। এইবার তাহার ইচ্ছা হইল সে একবার বুক ফাটাইয়া কাঁদিবে। চেষ্টাও করিল, কিন্তু কান্না তাহার আসিল না। তারপর সে শুইবার চেষ্টা করিল।

এতক্ষণে চারিদিক চাহিয়া চোখে পড়িল—চারিদিকে শত সহস্র স্মৃতি! দেওয়ালে খোকার হাতের কালির দাগ, বিলুর হাতের সিঁদুরের চিহ্ন, পানের পিচ, খোকার রং-চটা কাঠের ঘোড়া, ভাঙা বাঁশী, ছেঁড়া ছবি। পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া শয্যাতলে যেন কিসের চাপে সে একটু বেদনা বোধ করিল। হাত দিয়া সেটা বাহির করিল—খোকার বালা! সেইবালা ছুইগাছি, বিলুর নাকছাবি, কানের ফুল, হাতের নোয়া। একটা পাঁজর-ফাটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে অকস্মাৎ ডাকিয়া উঠিল—খোকা! বিলু!

ঠিক এই সময় বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজার মুখে কে মুখ বাড়াইয়া বলিল, দেবু!

—কে? দেবু উঠিয়া আসিল—রাঙাদিদি?

বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে আরও কেউ।

একা রাঙাদিদি নয়, দুর্গাও একপাশে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল।

দেবুর ইচ্ছা ছিল, গভীর রাত্রে—সকলে ঘুমাইলে—বিশ্বপ্রকৃতি নিস্তব্ধ হইলে সে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবে।

একা নয়। সন্ধ্যা হইতে বহুজনেই আসিয়াছিল, সকলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট শুইতে আসিয়াছে জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল ও গাঁজাখোর গদাই, উচ্চিংড়ের বাবা তারিণী। শ্রীহরি ভূপাল চৌকিদারকেও পাঠাইয়াছে। সে রাত্রিতে দেবুর দাওয়ায় শুইয়া থাকিবে।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে দেবু উঠিল। উঠানে আসিয়া উর্ধ্বমুখে আকাশের দিয়া চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। খোকা নাই—বিলু নাই—বিশ্বসংসারে কোথাও নাই! স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা, পাপ মিথ্যা, পুণ্য মিথ্যা। কোন্ পাপ সে করিয়াছিল? পূর্বজন্মের? কে জানে? একবার যতীনের কাছে গেলে হয় না? একা বসিয়া সে খোকা ও বিলুকে চিন্তা করিবার অবসর খুঁজিয়াছিল, কিন্তু তাহাও যেন ভাল লাগিতেছে না। আত্মগ্লানিতেই তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে-ই তো মৃত্যুর বিষ বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে-ই তো তাহাদের হত্যা করিয়াছে। কোন্ লজ্জায় সে কাঁদিবে? সে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে রাস্তায় একটা আলো আসিতেছে।

এত রাত্রে আলো হাতে কে আসিতেছে? একজন নয়, জনকয়েক লোকই আসিতেছে।

কাহার কণ্ঠধ্বনি বাজিয়া উঠিল—পণ্ডিত!

দেবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ন্যায়রত্ন; তাঁহার সঙ্গে যতীন, পিছনে লণ্ঠন হাতে আর একটি লোক।

—আপনি ! কিন্তু আমাকে তো—

—চল, বাড়ীর ভেতর চল।

—আমাকে তো প্রণাম করতে নাই—আমার অশৌচ।

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—অশৌচ ? তিনি মৃদু হাসিলেন।—একটা কিছু আন পণ্ডিত, এইখানেই এই উঠোনেই বসা যাক। ঘরের ভেতর থেকে ঘুমন্ত লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন। থাক, যারা ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক। তোমার সঙ্গে নিরালায় একটু আলাপ করবো বলে এত রাত্রে আমার আসা। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আসতে ইচ্ছা হল না, পথে যতীনভায়া সঙ্গ নিলেন। ওদের দৃষ্টি জাগ্রত তপস্বীর মত। ফাঁকি দিতে পারলাম না। দেখলাম আকাশের দিকে চেয়ে উনিও বসে আছেন তোমার মত। আমাকে বললেন—তোমার এই নিষ্ঠুর বিপর্যয়ের জন্য উনিই দায়ী। ওঁর চোখে জল ছল-ছল করে উঠল। তাই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমাদের সুখ-দুঃখের কথায় উনিও অংশীদার হবেন।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। এ হাসি সুখের নয়—দুঃখেরও নয়—এক বিচিত্র দিব্য হাসি।

দেবুও হাসল। ন্যায়রত্নের হাসির প্রতিবিম্বটিই যেন ফুটিয়া উঠিল। ঘর হইতে একটি মোড়া আনিয়া পাতিয়া দিয়া সে বলিল—বসুন।

ন্যায়রত্ন বসিয়া বলিলেন—বস, আমার কাছে বস। বস যতীন-ভায়া, বস।

তাহারা মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল। দেবু বলিল—এই সেদিন পরমশ্রদ্ধায় বিলু আপনার পা ধুইয়ে দিয়েছিল— কিন্তু আজ—আজ সে কোথায়।

ন্যায়রত্ন তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—দেবু, ভাই, আমি সেই দিনই বুঝে গিয়েছিলাম—এই পরিণামের দিকেই তুমি এগিয়ে চলেছ। তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম, তোমার স্ত্রীকে দেখেও বুঝেছিলাম।

দেবু ও যতীন উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—সেদিনের গল্পটা মনে আছে বাবা ? সবটা সেদিন বলিনি। বলি শোন। গল্প এখন ভাল লাগবে তো ?

'দেবু সাগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বলুন।

ন্যায়রত্ন আরম্ভ করিলেন—' সেই ব্রাহ্মণ ধনবলে আবার আপন সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পুত্র-কন্যা-জামাতায়, পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে সংসার হয়ে উঠল—দেহবৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়। ফলে অমৃতের স্বাদ ফুলে অগুরু-চন্দনকেও লজ্জা দেয় এমন গন্ধ। কোন ফল অকালে চ্যুত হয় না, কোন ফুল অকালে শুষ্ক হয় না। পরিপূর্ণ সংসার তাঁর, আনন্দে শান্তিতে সুখে স্নিগ্ধ

সমুজ্জ্বল। ছেলেরাও প্রত্যেকে বড় বড় পণ্ডিত, জামাতারাও তাই। প্রত্যেকেই দেশান্তরে স্বকর্মে প্রতিষ্ঠিত। কেউ কোন রাজার কুল-পণ্ডিত, কেউ সভাপণ্ডিত, কেউ বড় টোলের অধ্যাপক। ব্রাহ্মণ আপন গ্রামেই থাকেন—আপন কর্ম করেন।

একদিন তিনি হাটে গিয়ে এক মেছুনীর ডালার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন। মেছুনীর ডালায় একটি কালো রঙের সুডোল পাথর, গায়ে কতকগুলি চিহ্ন। তিনি চিনলেন, নারায়ণ-শিলা—শালগ্রাম। মেছুনীর এই অপবিত্র ডালায় আমিষ গন্ধের মধ্যে পূত নারায়ণ-শিলা! তিনি চমকে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই মেছুনীকে বললেন—মা, ওটি তুমি কোথায় পেলে?

মেছুনী একগাল হেসে প্রণাম করে বলল—বাবা, ওটি নদীর ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছি, ঠিক একপো ওজন; বাটখারা করেছি ওটিকে। ভারি পয় আমার বাট-খারাটির। যেদিন থেকে ওটি পেয়েছি—সেদিন থেকে আমার বাড়বাড়ন্তর আর সীমা নেই।

সত্য কথা। মেছুনীর এক-গা সোনার গহনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—দেখ মা, এটি হল শালগ্রাম-শিলা। ঐ আমিষের মধ্যে এঁকে রেখে দিয়েছ—ওতে তোমার মহা অপরাধ হবে।

মেছুনী হেসেই সারা।

ব্রাহ্মণ বললেন—ওটি তুমি আমাকে দাও। আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি। পাঁচ টাকা দিচ্ছি তোমাকে।

মেছুনী বললে—না বাবা! এটি আমি বেচব না।

—বেশ, দশ টাকা নাও।

—না, বাবা-ঠাকুর। ও আমাকে অনেক দশ টাকা পাইয়ে দেবে।

—বেশ, কুড়ি টাকা!

—না বাবা। তোমাকে জোড়-হাত করছি।

—আচ্ছা, পঞ্চাশ টাকা!

—হবে না।

—একশো!

—না গো, না।

—এক হাজার!

—মেছুনী এবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না; দিতে পারল না।

—পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি তোমায়!

এবার মেছুনী আর লোভ সম্বরণ করতে পারল না। ব্রাহ্মণ তাকে পাঁচটি

হাজার টাকা গুণে দিয়ে নারায়ণকে এনে গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তৃতীয় দিনের দিন ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখলেন—একটি জ্যোতির্ময় দুরন্ত কিশোর তাঁর মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলছে—আমাকে কেন তুমি মেছুনীর ডালা থেকে নিয়ে এলে? আমি সেখানে বেশ ছিলাম। যাও, এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে এস আমাকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হলেন।

দ্বিতীয় দিনেও আবার সেই স্বপ্ন। তৃতীয় দিনের দিনে স্বপ্নে দেখলেন কিশোরের ভীষণ উগ্রমূর্তি। বললেন—ফিরিয়ে দিয়ে এস, নইলে কিন্তু তোমার সর্বনাশ হবে।

সকালে উঠে সেদিন তিনি গৃহিণীকে সব বললেন। এতদিন স্বপ্নের কথাটা প্রকাশ করেন নি, বলেন নি। আজ আর না বলে পারলেন না।

গৃহিণী উত্তর দিলেন—তাই বলে নারায়ণকে পরিত্যাগ করবে নাকি? যা হয় হবে। ও চিন্তা তুমি ক'র না।

রাত্রে আবার সেই স্বপ্ন। আবার, আবার। তখন তিনি পুত্র-জামাতাদের এই স্বপ্ন-বিবরণ লিখে জানতে চাইলেন তাঁদের মতামত। মতামত এল, সকলেরই এক জবাব—গৃহিণী যা বলেছিলেন তাই।

সেদিন রাত্রে স্বপ্নে তিনি নিজে উত্তর দিলেন—ঠাকুর, কেন তুমি রোজ এসে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত কর বল তো? কাজে-কর্মে-বাক্যে-চিন্তায় আমার জবাব কি তুমি আজও পাও নি? আমিষের ডালায় তোমাকে আমি রেখে দিতে পারব না।

পরের দিন ব্রাহ্মণ পূজা শেষ করে উঠে নাতি-নাতনীদের ডাকলেন—প্রসাদ নেবার জন্যে। সকলের যেটি ছোট, সেটি ছুটে আসছিল সকলের পিছনে। সে অকস্মাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাকে তুললেন—কিন্তু তখন শিশুর দেহে আর প্রাণ নাই। মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন—সেই কিশোর নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলছে—এখনও বুঝে দেখ। জান তো, 'সর্বনাশের হেতু যার, আগে মরে নাতি তার'।

ব্রাহ্মণ নীরবে হাসলেন।

তারপর অকস্মাৎ সংসারে আরম্ভ হয়ে গেল মহামারী। একটির পর একটি—'একে একে নিভিল দেউটি'। আর রোজ রাত্রে একই স্বপ্ন। রোজই ব্রাহ্মণ নীরবে হাসেন।

একে একে সংসারে সব শেষ হয়ে গেল। অবশিষ্ট রইলেন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী!

আবার স্বপ্ন দেখলেন—এখনও বুঝে দেখ ব্রাহ্মণী থাকতে।

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি বড়ই প্রগল্‌ভ হে ছোকরা, তুমি বড়ই বিরক্ত করছ আমাকে।

পরদিন ব্রাহ্মণীও গেলেন।

আশ্চর্য, সেদিন আর রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখলেন না!

অতঃপর ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি শেষ করে, একটি ঝোলায় সেই শালগ্রাম-শিলাটিকে রেখে ঝোলাটি গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, নদ-নদী-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে চললেন। পূজার সময় হলে একটি স্থান পরিষ্কার করে বসেন—ফুল তুলে পূজা করেন, ফল আহরণ করে ভোগ দেন—প্রসাদ পান।

অবশেষে একদা তিনি মানস সরোবরে এসে উপস্থিত হলেন। স্নান করলেন—তারপর পূজায় বসলেন। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন—এমন সময় অপূর্ব দিব্যগন্ধে স্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করে বাজতে লাগল দেব-দুন্দুভি! কে যেন তাঁর প্রাণের ভিতর ডেকে বলল—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ বন্ধ করেই ব্রাহ্মণ বললেন—কে তুমি?

—আমি নারায়ণ।

—তোমার রূপটা কেমন বল তো?

—কেন, চতুর্ভুজ। শঙ্খ চক্র—

—উঁহু, যাও—যাও, তুমি যাও।

—কেন?

—আমি তোমায় ডাকি নি।

—তবে কাকে ডাকছ?

—সে এক প্রগল্‌ভ কিশোর। প্রায়ই সে স্বপ্নে এসে আমাকে শাসাত, আমি তাকে চাই।

এবার সেই স্বপ্নের কিশোরের কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন,—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ খুলে ব্রাহ্মণ এবার দেখলেন—হ্যাঁ, সেই তো বটে!

হেসে কিশোর বললেন—এস আমার সঙ্গে।

ব্রাহ্মণ আপত্তি করলেন না, বললেন—চল। তোমার দৌড়টাই দেখি।

কিশোর দিব্যরথে চড়িয়ে তাঁকে এক অপূর্ব পুরীতে এনে বললেন—এই তোমার পুরী। তোমার জন্যে আমি নির্মাণ করে রেখেছি। পুরীর দ্বার খুলে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল—সেই সকলের ছোট নাতিটি—যে সর্বাগ্রে মারা গিয়েছিল। তার পিছনে পিছনে আর সব।

গল্প শেষ করিয়া ন্যায়রত্ন চুপ করিলেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া একটু হাসিল।

যতীন ভাবিতেছিল এই অদ্ভুত ব্রাহ্মণটির কথা।

ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—সেদিন তোমাকে দেখে—বিলুকে দেখে এই কথাই আমার মনে হয়েছিল। তারপর যখন শুনলাম—উপেন রুইদাসের মৃতদেহের সৎকার করতে গেছ তুমি—তাদের সেবা করছ, তখন আর সন্দেহ রইল না। আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম—মেছুনীর ডালার শালগ্রাম উদ্ধার করতে হাত বাড়িয়েছ তুমি। আত্মা নারায়ণ, কিন্তু ওই বায়েন-বাউড়ীদের পতিত অবস্থাকে মেছুনীর ডালার সঙ্গে তুলনা করি, তবে আধুনিক তোমরা রাগ করো না যেন।

এতক্ষণে দেবুর চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ন্যায়রত্ন চাদরের খুঁট দিয়া সস্নেহে সে জল মুছাইয়া দিলেন। দেবুর মাথায় হাত দিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—এখন উঠি ভাই। তোমার সান্ত্বনা তোমার নিজের কাছে, প্রাণের ভেতরেই তার উৎস রয়েছে। ভাগবত আমার ভাল লাগে। আমার শশী যেদিন মারা যায় সেদিন ভাগবত থেকেই সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। তাই তোমাকে আজ বলতে এসেছিলাম ভাগবতী লীলার একটি গল্প।

যতীনও ন্যায়রত্নের সঙ্গে উঠিল।

পথে যতীন বলিল—এই গল্পগুলি যদি এ যুগের উপযোগী করে দিয়ে যেতেন আপনি!

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—অনুপযোগী কোন্ জায়গা মনে হল ভাই ?

—রাগ করবেন না তো ?

—না, না, না। সত্যের যুক্তির কাছে নতশির হতে বাধ্য আমি। রাগ করব ? ন্যায়রত্ন শিশুর মত অকুণ্ঠায় হাসিয়া উঠিলেন।

—ওই আপনার মাছের চুবড়ি, চতুর্ভুজ—শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি।

—ভগবানের অনন্ত রূপ। যে রূপ খুশি তুমি বসিয়ে নিয়ো। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ তো চতুর্ভুজ মূর্তি চোখেই দেখেন নি। তিনি দেখলেন—তাঁর স্বপ্নের মূর্তিকে সেই উগ্র কিশোরকে।

যতীন বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছিল, রাত্রিও অনেক হইয়াছে। কথা বাড়াইবার আর অবকাশ রহিল না, ন্যায়রত্ন চলিয়া গেলেন।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে যতীনের মনে অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে' বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।...'

নাঃ, ন্যায়রত্নের কথা সে মানিতে পারিল না।

আঠাশ

মাস দুয়েক পর। গ্রামের কলেরা থামিয়া গিয়াছে।

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। সাত তারিখে অম্বুবাচী পড়িল। ধরিত্রী নাকি এই দিনটিতে ঋতুমতী হইয়া থাকেন। আকাশ ঘন-ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। বর্ষা প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। 'মিগের বাতে' এবার যেরূপ প্রচণ্ড গুমোট গিয়াছে, তাহাতে এবার বর্ষা সত্বর নামিবে বলিয়া চাষী অনুমান করিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে মৃগশিরা নক্ষত্রে যেবার যেমন গুমোট হয়, সেবার বর্ষা প্রথম আষাঢ়েই নামিয়া থাকে। অম্বুবাচীতে বর্ষণ হইয়া যদি কাড়ান লাগে, তবে সে অতি সুলক্ষণ—ঋতুমতী ধরিত্রীর মৃত্তিকা জলে ভিজিয়া অপরূপ উর্বরা হইয়া উঠে। অম্বুবাচীর তিনদিন হল কর্ষণ নিষিদ্ধ। গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল।

অম্বুবাচীতে চাষীদের মধ্যে কুস্তি-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলতি ভাষায় ইহাকে বলে 'আমুতির লড়াই'; এখানকার মধ্যে কুসুমপুর ও আলেপুরেই সমারোহ সর্বাপেক্ষা বেশী। এইখানি মুসলমানের গ্রাম। আমুতির লড়াই হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সমারোহের বস্তু। চাষের পূর্বে চাষীরা বোধ হয় শক্তি পরীক্ষা করে। এ অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া। বিভিন্ন স্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চাষীরা—যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত, তাহারা যোগ দেয়। ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়, সে-ই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তবে শক্তি-চর্চায় শক্তি-প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশী।

যতীনের বাড়ীর সম্মুখে একটা জায়গা খুঁড়িয়া উচ্চিংড়ে ও গোবরা আখড়া খুলিয়াছে। দুইটাতে সারাদিন যুধ্যমান হইয়া পড়িয়াই আছে।

আজ নিষ্ঠাবান চাষীর বাড়ীতে অরন্ধন। ঋতুমতী ধরিত্রীর বুকে আগুন জ্বালিতে নাই। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং বিধবারা এই তিন দিনই অগ্নিসিদ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ কোন জিনিসই খাইবে না। দেবু আজ অরন্ধন-ব্রত প্রতিপালন করিতেছে। একা বসিয়া শান্ত উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে। বর্ষার সজল ঘন মেঘ পুঞ্জিত হইতেছে, আবর্তিত হইতেছে, ভাসিয়া চলিতেছে ওই দূর-দিগন্তের অন্তরালে। আবার এ দিগন্ত হইতে উদয় হইয়াছে নূতন মেঘের পুঞ্জ। অচিরে বর্ষা নামিবে। অজস্র বর্ষণে পৃথিবী সুজলা হইয়া উঠিবে, শস্যসম্ভারে শ্যামলা হইয়া উঠিবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে।

সবুজ হইয়া উঠিবে মাঠ, জলে ভরিয়া উঠিবে ঘাট। ময়ূরাক্ষী বহিয়া গৈরিক জলস্রোত বহিয়া যাইবে। শূন্য মাঠ ফসলে ভরিয়া উঠে। নীল আকাশ মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। মেঘ কাটিয়া গেলে সূর্য, রাত্রে চন্দ্র তারায় ভরিয়া থাকিবে। তাহারই জীবন শুধু শূন্য হইয়া গিয়াছে। এ আর ভরিয়া উঠিবে না।

একা বসিয়া এমনি করিয়া কত কথাই ভাবে। অকস্মাৎ জীবনে যে প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটিয়া গেল—তাহার ফলে তাহার প্রকৃতি—চরিত্রেও একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত, উদাসীন, একান্ত একাকী একটি মানুষ; গ্রামের সকলে তাহাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তবু তাহারা তাহার পাশে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। দেবুর নিশ্চেষ্ট নির্বাক উদাসীনতার মধ্যে তাহারা যেন হাঁপাইয়া উঠে।

রাত্রে—গভীর রাত্রে দেবু গিয়া বসে যতীনের কাছে। ওই সময় তাহার সাথী মেলে। যতীন তাহাকে অনেকগুলি বই দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দেবুর ছিল। যতীন তাহাকে দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা বই, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, কয়েকজন আধুনিক লেখকের লেখা কয়েকখানা বইও তাহার মধ্যে আছে। নিঃসঙ্গ অবসরে উহারই মধ্যে তাহার সময় অনেকটা নিরুদ্বেগ প্রশান্তির মধ্যে কাটে। কখনও কখনও সে দাওয়ার উপর একা বসিয়া চাহিয়া থাকে। ঠিক দাওয়ার সম্মুখে রাস্তার উপরের শিউলি গাছটির দিকে। ওই শিউলি গাছটির সঙ্গে বিলুর সহস্র স্মৃতি বিজড়িত। বিলু শিউলি ফুল বড় ভালবাসিত। কতদিন দেবুও বিলুর সঙ্গে শরৎকালের ভোরে উঠিয়া শিউলি ফুল কুড়াইয়াছে।

আজ আবার বৈকালে তাহাকে আলেপুর যাইতে হইবে। আলেপুরের সেখ চাষীরা তাহার নিকট আসিয়াছিল; তাহাকে তাহাদের কুস্তির প্রতিযোগিতায়

পাঁচজন বিচারকের মধ্যে একজন হইতে হইবে। সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আমাকে কেন ইছু-ভাই, আর কাউকে—

ইছু বলিয়াছিল—উরে বাস রে! তাই কি হয়! আপনি যে বাত বুলবেন পাঁচখানা গাঁয়ের লোক সিটি মানবে।

দেবু সেই কথাই ভাবিতেছে। পাঁচখানা গ্রামের লোক তাহাকে মানিবে—একদিন এমনি আকাঙ্ক্ষাই তাহার অন্তরে ছিল। কিন্তু কোন্ মূল্যে সে ইহা পাইল।

যতীন যদি তাহার সঙ্গে আলেপুর যাইত, বড় ভাল হইত; এই রাজবন্দী তরুণটিকে তাহার বড় ভাল লাগে, সে তাহাকে অসীম শ্রদ্ধাও করে। যতীন মধ্যে মধ্যে বলে—আমাদের দেশের লোকশক্তির চর্চটা একেবারে করে না। তাহাকে সে 'আমুতির লড়াই' দেখাইত। সকলেই শক্তির চর্চা একদিন করিত; প্রথাটা এখনও বাঁচিয়া আছে—এই চণ্ডীমণ্ডপটার মত। চণ্ডীমণ্ডটা এবার ছাওয়ানো হয় নাই, বর্ষায় এবার ওটা পড়িয়া যাইবে। গ্রামের লোক ছাওয়ায় নাই, শ্রীহরিও হাত দেয় নাই। শ্রীহরি ওটা ভাঙিতে চায়। এবার দুর্গাপূজার পর সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশীর দিন সে ওখানে দেউল তুলিবে, পাকা নাটমন্দির গড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপ এখন সত্যসত্যই শ্রীহরির। শ্রীহরিই এখন এ গ্রামের জমিদার। শিবকালীপুরের জমিদারী সে-ই কিনিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ তাহার নিজস্ব। ইহার মধ্যে অনাচ্ছাদিত চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালগুলি বৈশাখের ঝড়ে, কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। কত পুরাতন দিনের বসুধারার চিহ্নগুলির একটিও আর দেখা যায় না।

শ্রীহরিও এখন তাহাকে প্রায়ই ডাকে—এস খুড়ো, আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিয়ে। ব্যঙ্গ করিয়া বলে না, সত্যই সে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া বলে।

কিন্তু বলিলে কি হইবে? ওদিকে আবার যে শ্রীহরির সঙ্গে গ্রামের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বীজ হইতে অঙ্কুরের মত উদ্গত হইতেছে। সেটেল্‌মেন্টের পাঁচ ধারায় ক্যাম্প আসিতেছে। শস্যের মূল্যবৃদ্ধির দাবীতে শ্রীহরি খাজনা বৃদ্ধি দাবি করিবে। শ্রীহরি সেদিন তাহার কাছে কথাটা তুলিয়াছিল। দেবু বলিয়াছে—আশেপাশের গ্রামে কি হয় দেখ। সব গ্রামে কি হয় দেখ। সব গ্রামের লোক যদি জমিদারকে বৃদ্ধি দেয়—তুমিও পাবে।

গভর্নমেণ্ট সার্ভে হওয়ার ফলে এ দেশে জমিদারদের একটা সার্বজনীন পর্বের মত খাজনা বৃদ্ধির একটা সাধারণ উপলক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। প্রজারা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের মাতব্বরেরা তাহার কাছে ইহারই মধ্যে গোপনে গোপনে আসিতেছে। সে বরাবর বলিয়াছে, মনেও করিয়াছে—এসব ব্যাপারে

সে থাকিবে না। তবু লোকে শুনিতেছে না। কিন্তু খাজনা বৃদ্ধি! ইহার উপর খাজনা বৃদ্ধি? সে শিহরিয়া উঠে। গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখে—জীর্ণগ্রাম, মাত্র দুইখানা কাপড় দুই মুঠা ভাত মানুষের জুটিতেছে, ইহার উপর খাজনা বৃদ্ধি হইলে প্রজারা মরিয়া যাইবে। চাষীর ছেলে জমিদার হইয়া শ্রীহরি এসব কথা প্রায় ভুলিয়াছে; কিন্তু খোকাকে বিলুকে হারাইয়া সে আজ প্রায় সন্ন্যাসী হইয়াও একথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না। গত কয়েকদিন ধরিয়া যতীনের সঙ্গে তাহার এই আলোচনাই চলিতেছে।

কি করিবে? যদি প্রয়োজন হয়—তবে আবার সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়—না, কাজ কি এসব পরের ঝঞ্ঝাটে গিয়া? তাহার মনে পড়ে ন্যায়রত্নের গল্প। ধর্মজীবন যাপন করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাহা হইয়া ওঠে না। যতীন তাহাকে এ গল্পের অন্যরূপ অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতেও তাহার ভাল লাগে নাই। কিন্তু একান্তভাবে ধর্মকর্ম লইয়াও সে থাকিতে পারিল না—এটাই তাহার নিজের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার ভিতরে একজন কে যেন আছে যে তাহাকে এই পথে এই ভাবে লইয়া চলিতেছে। সে-ই হয়তো আসল দেবু ঘোষ।

জগন ও হরেন তো ইহারই মধ্যে ভাবী খাজনা-বৃদ্ধিকে উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণার পাঁয়তাড়া করিতেছে। হরেন পথে-ঘাটে পাড়ায়-পাড়ায় বেড়ায়, অকারণে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠে—লাগাও ধর্মঘট। আমরা আছি।

বাংলার প্রজা-সমাজে ধর্মঘট একটি অতি পরিচিত কথা ও একটি অতি পুরাতন প্রথা। ধর্মঘট নামেই ইহার প্রাচীনত্বের পরিচয় বিদ্যমান। ধর্ম সাক্ষ্য করিয়া—ঘট পাতিয়া যে-কোন সর্বসাধারণের কর্মসাধনের জন্য পূর্ব হইতে শপথ গ্রহণ করা হইত। পরে উহা জমিদার ও প্রজার—পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

ইহার মধ্যে তাহারা বিপুল উত্তেজনা অনুভব করে, সঙ্ঘশক্তির প্রেরণায় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চায়,—আত্মস্বার্থ অদ্ভুতভাবে হাস্যমুখে বলি দেয়। প্রতি গ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—দরিদ্র চাষীদের মধ্যে এক-আধজনের পূর্বপুরুষ সেকালের প্রজা-ধর্মঘটের মুখ্য ব্যক্তি হইয়া সর্বস্ব খোয়াইয়া ভাবী পুরুষকে দরিদ্র করিয়া গিয়াছে। কোন কোন গ্রামে পোড়ো ভিটা পড়িয়া আছে; সেখানে পূর্বে ছিল কোন সমৃদ্ধিশালী চাষীর ঘর—সে ঘর ওই ধর্মঘটের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ঘরের মানুষেরা উদরান্নের তাড়নায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অথবা রোগ অনশন আসিয়া বংশটাকে শেষ করিয়াছে।

কিন্তু ধর্মঘট সচরাচর হয় না। ধর্মঘট করিবার মত সার্বজনীন উপলক্ষ সাধারণত বড় আসে না। আসিলেও অভাব হয় প্রেরণা দিবার লোকের। এবার এমনই একটি উপলক্ষ আসিয়াছে। এ অঞ্চলেও প্রতি গ্রামেই গভর্নমেণ্ট সার্ভের পর শস্যের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে খাজনা বৃদ্ধির আয়োজন করিতেছে জমিদারেরা। প্রজারা খাজনাবৃদ্ধি দিতে চায় না। এটাকে তাহারা অন্যায় বলিয়া মনে করে। কোন যুক্তিই তাহাদের মন মানিতে চায় না। তাহারা পুরুষানুক্রমে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জমিকে উর্বরা করিতেছে—সে জমির শস্য তাহাদের। অবুঝ মন কিছুতেই বুঝিতে চায় না। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আশ্চর্য, তাহার প্রতিটি তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে দেবুকে!

আলেপুরের মুসলমান অধিবাসীরা তাহাকে আজ যে আমুতির লড়াই দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে-ও এই তরঙ্গ। লড়াইয়ের পর ওই কথাই আলোচিত হইবে।

মহাগ্রামের তরঙ্গও তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গ্রামের লোকেরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয় তাহাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন দেবুর কাছে। একটা চিঠিতে লিখিয়া দিয়াছেন—পণ্ডিত, আমার শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম—তুমি পার; বিবেচনা করিয়া বিধান দিয়ো।

ন্যায়রত্নকে সে মনে মনে প্রণাম করিয়াছে।—তুমি আমার ঘাড়ে এই বোঝা চাপাইতেছ ঠাকুর? বেশ, বোঝা ঘাড়ে লইব। মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিরা উঠিয়াছে। সে তাই ভাবিতেছে—অন্যায় সংঘর্ষ সে বাধাইবে না। আগামী রথের দিন—ন্যায়রত্নের বাড়ীতে গৃহদেবতার রথযাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যে মেলা বসিবে, সেই মেলায় সমবেত হইবে পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক। প্রতি গ্রামের মাতব্বরেরা ন্যায়রত্নের আশীর্বাদ লইতে আসে। ন্যায়রত্ন দেবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দেবু ঠিক করিয়াছে, সেইখানেই সকল গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় স্থির করিবে।

'পোঁ ভস-ভস-ভস।'

রেলগাড়ী ছুটাইয়া আসিয়া হাজির হইল উচ্চিংড়ে। মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া সে-ই বলিল—'লজরবন্দীবাবু ডাকছে।' তারপর মুখে বাঁশী-বাজাইয়া দিয়া ছুটিল—পোঁ ভস-ভস-ভস—

দেবু উচ্চিংড়ের ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবু আসিতেই যতীন বলিল অনিরুদ্ধের কথা।

—ছ'মাস তো পেরিয়ে গেল দেবুবাবু। তাঁর তো এতদিনে ফেরা উচিত ছিল। আমি হিসেব করে দেখেছি—দশদিন আগে বেরিয়েছেন তিনি। হিসেবে তাই হয়, থানাতেও তাই বলে।

—তাই তো! অনি ভাইয়ের তো এতদিনে ফেরা উচিত ছিল।

—আমি ভাবছি—জেলে আবার কোন হাঙ্গামা করে নতুন করে মেয়াদ হল না তো?

বিচিত্র নয়। অনি-ভাইকে বিশ্বাস নাই। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, দুর্দান্ত ক্রোধী। অনিরুদ্ধ সব পারে। দেবু বলিল—কামার-বউ বোধ হয় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

যতীন হাসিল—মা-মণি? দেবুবাবু, ও এক বিচিত্র মানুষ। দেখছেন না—বাউণ্ডুলে ছেলে দুটো আর কোথায়ও যায় না। বাড়ীর আশে-পাশেই ঘুরছে দিন-রাত। মা-মণি ওই ওদের নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। একদিন মাত্র অনিরুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। ব্যস। আবার যেদিন মনে পড়বে জিজ্ঞাসা করবে।

দেবুর চোখে এই তুচ্ছ কারণে জল আসিল। খোকাকে কোলে করিয়া বিলুর হাসিভরা মুখ, ব্যস্তসমস্ত দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। যতীন বলিল—বরং দুর্গা আমাকে দু-তিন দিন জিজ্ঞাসা করেছে।

চোখ মুছিয়া দেবু হাসিল, বলিল—দুর্গা আমার ওদিক দিয়ে আজকাল বড় যায় না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম তো বললে—গাঁয়ের লোককে তো জান জামাই? এখন আমি বেশী গেলে-এলেই তোমাকে জড়িয়ে নানান কুকথা রটাবে।

সত্য কথা। দুর্গা দেবুর বাড়ী বড় একটা যায় না। কিন্তু তাহার মাকে পাঠায় দুধ দিতে, পাতুকে পাঠায় দু-বেলা। রাত্রে পাতুই দেবুর বাড়ীতে শুইয়া থাকে,—সে-ও দুর্গার বন্দোবস্ত। তাছাড়া সে-ও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সে আর লীলাচঞ্চলা তরঙ্গময়ী নাই। আশ্চর্য রকমের শান্ত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় দেবুর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে তাহাকে। যতীনের কিশোর তরুণ রূপ তাহাকে আর বিচলিত করে না। সে মাঝে মাঝে দূর হইতে দেবুকে দেখে—তাহারই মত উদাস দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে নিরর্থক চাহিয়া থাকে।

যতীন কিছুক্ষণ পরে বলিল—শুনেছি শ্রীহরি ঘোষ সদরে দরখাস্ত করেছে—গ্রামে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজন হচ্ছে, তার মূলে আমি আছি। আমাকে সরাবার চেষ্টা করছেন। সরতেও আমাকে হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই স্নেহ-পাগলিনী মেয়েটির জন্য যে ভেবে আকুল হচ্ছি। এক ভরসা আপনি আছেন। কিন্তু সেও তো একটা ঝঞ্ঝাট। তা ছাড়া এক অদ্ভুত মেয়ে, দেবুবাবু; ওই দুটো ছেলেকে আবার জুটিয়েছে। খাবে কি, দিন চলবে কি

করে? আমি গেলেই ঘর ভাড়া দশ টাকা তো বন্ধ হয়ে যাবে। আজকাল মা-মণি ধান ভানে, কঙ্কণায় ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়ে মুড়ি ভাজে। কিন্তু ওতে কি ওই ছেলে দুটো সমেত সংসার চলবে?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেবু বলিল—জেল-অফিস ভিন্ন তো অনিরুদ্ধের সঠিক খবর পাওয়া যাবে না। আমি বরং একবার সদরে গিয়ে খোঁজ করে আসি। সদরে গিয়া দেবু দুই দিন ফিরিল না।

যতীন আরও চিন্তিত হইয়া উঠিল। অপর কেহ এ সংবাদ জানে না। পদ্মও জানে না। তৃতীয়দিনের দিন দেবু ফিরিল। অনিরুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জেল হইতে সে বাহির হইয়াছে দশ দিন আগে। দেবু অনেক সন্ধান করিয়াছে, সেই জন্য দুই দিন দেরি হইয়াছে। জেল হইতে বাহির হইয়া একটা দিন সে শহরেই ছিল—দ্বিতায় দিন জংশন পর্যন্ত আসিয়াছিল। সেখান হইতে নাকি একটি স্ত্রীলোককে লইয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এই পর্যন্ত সংবাদ মিলিয়াছে যে কলে কাজ করিবার জন্য সে কলিকাতা বা বোম্বাই বা দিল্লী বা লাহোর গিয়াছে। অন্তত সেই কথাই সে বলিয়া গিয়াছে—কলে কাজ করব তো এখানে কেন করব? বড় কলে কাজ করব। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর যেখানে বেশী মাইনে পাব বলে।

বাড়ীর ভিতর শিকল নড়িয়া উঠিল।

যতীন ও দেবু উভয়েই চমকিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। আবার শিকল নড়িল। যতীন এবার উঠিয়া গিয়া নতশিরে অপরাধীর মত পদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইল।

পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল—সে জেল থেকে বেরিয়ে কি কোথাও চলে গিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কলকাতা, বোম্বাই?

—হ্যাঁ।

পদ্ম আর কোন প্রশ্ন করিল না। ফিরিয়া চুপ করিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। সে চলিয়া গিয়াছে যাক! তার ধর্ম তার কাছে!

তাহার এ মূর্তি দেখিয়া যতীন আজ আর বিস্মিত হইল না। পদ্ম বিষণ্ণ মূর্তিতে বসিতেই গোবরা ও উচ্চিংড়ে আসিয়া চুপ করিয়া পাশে বসিল। যতীন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া দেবুর নিকট ফিরিয়া আসিল।

দিন চারের পর। সে-দিন রথের দিন।

গতরাত্রি হইতে নব-বর্ষার বর্ষণ শুরু হইয়াছে। আকাশ-ভাঙা বর্ষণে চারিদিকে জলে থৈ থৈ করিতেছে। 'কাড়ান্' লাগিয়াছে। প্রচণ্ড বর্ষনের

মধ্যে মাথালী মাথায় দিয়া চাষীরা মাঠে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জমির আইলের কাটা মুখ বন্ধ করিতেছে, ইঁদুরের গর্ত বন্ধ করিতেছে,—জল আটক করিতে হইবে। পায়ের নিচে মাটি মাখনের মত নরম, সেই মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে। সাদা জল পরিপূর্ণ মাঠ চক-চক করিতেছে মেঘলা দিনের আলোর প্রতিফলনে। মধ্যে মধ্যে বীজধানের জমিতে সবুজ সতেজ ধানের চারা চাপ বাঁধিয়া এক-একখানি সবুজ গালিচার আসনের মত জাগিয়া আছে। বাতাসে ধানের চারাগুলি দুলিতেছে—যেন অদৃশ্য লক্ষ্মীদেবী মেঘলোক হইতে নামিয়া কোমল চরণপাতে পৃথিবীর বুকে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবেন বলিয়া চাষীরা আসনখানি পাতিয়া রাখিয়াছে।

সেই বর্ষণের মধ্যে যতীন বাসা ছাড়িয়া পথে নামিল। তাহার সঙ্গে দারোগাবাবু। দুইজন চৌকিদারের মাথায় তাহার জিনিসপত্র। দেবু, জগন, হরেন—গ্রামের প্রায় যাবতীয় লোক সেই বর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

যতীনের অনুমান সত্য হইয়াছে। তাহার এখান হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ আসিয়াছে। সদর শহরে—একেবারে কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে এবার। দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ম্লানমুখী পদ্ম; আজ তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন নাই। দুই চোখ দিয়া তাহার জলের ধারা গড়াইতেছে। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে ও গোবরা—স্তব্ধ, বিষণ্ণ।

প্রথমটা যতীন শঙ্কিত হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল পদ্ম হয়তো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। মূর্ছা-ব্যাধিগ্রস্ত পদ্ম হয়তো মূর্ছিত হইয়া পড়িবে—এইটাই তাহার বড় আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু পদ্ম তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া কেবল কাঁদিল। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে গোবরা বেশ শান্ত হইয়া বসিয়া ছিল। পদ্ম তাহাকে কোন কথা বলিল না।

উচ্চিংড়ে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি চলে যাবা বাবু?

—হ্যাঁ। মা-মণির কাছে খুব ভাল হয়ে থাকবি, উচ্চিংড়ে। কেমন? আমি চিঠি দিয়ে খোঁজ নেব তোদের।

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া উচ্চিংড়ে বলিল—আর তুমি ফিরে আসবা না বাবু?

যতীন ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে গিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—তারপর পদ্মকে বলিল—মা-মণি, যেদিন ছাড়া পাব, একদিন তো ছেড়ে দেবেই-তোমার কাছে আসব।

পদ্ম চুপ করিয়াই ছিল।

এতক্ষণে পদ্ম নীরব রোদনের মধ্যেও মৃদু হাসিয়া হাতটি উপরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

যতীনের চোখে জল আসিল। আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—যখন যা হবে পণ্ডিতকে বলবে—তার পরামর্শ নেবে।

পদ্মের মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—হ্যাঁ, পণ্ডিত আছে। চোখ মুছিয়া এবার সে বলিল—সাবধানে থেকো তুমি।

নলিন, সেই চিত্রকর ছেলেটিও ভিড়ের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া, অভ্যাসমত নীরবেই চলিয়া গেল।

যতীন তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল।

হরেন হাত ধরিয়া বলিল—গুডবাই ব্রাদার।

জগন বলিল—রিলিজড হলে যেন খবর পাই।

সতীশ বাউড়ী আসিয়া প্রণাম করিয়া একখানি ভাঁজকরা ময়লা কাগজ তাহার দিকে বাড়াইয়া একমুখ বোকার হাসি হাসিয়া বলিল—আমাদের গান। নিকে নিতে চেয়েছিলেন আপুনি। অনেকদিন নিকিয়ে রেখেছি, দেয়া হয় নাই।

যতীন কাগজখানি লইয়া সযত্নে পকেটে রাখিল।

আশ্চর্য! দুর্গা আসে নাই।

দারোগাবাবু বলিল—এইবার চলুন যতীনবাবু।

যতীন অগ্রসর হইল—চলুন।

দেবু তাহার পাশে পাশে চলিল। পিছনে জগন, হরেন, আরও অনেকে চলিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপের ধারে শ্রীহরি ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। মজুরেরা চণ্ডীমণ্ডপের খড়ের চাল খুলিয়া দিতেছে; বর্ষার জলে ওটা ভাঙিয়া পড়িবে। তারপর সে আরম্ভ করিবে—ঠাকুরবাড়ী। শ্রীহরি ঘোষও মৃদু হাসিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল।

গ্রাম পার হইয়া তাহারা মাঠে আসিয়া পড়িল। যতীন বলিল—ফিরুন এবার আপনারা।

সকলেই ফিরিল। কেবল দেবু বলিল—চলুন, আমি বাঁধ পর্যন্ত যাব। ওখান থেকে মহাগ্রামে যাব ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী। তাঁর ওখানে রথযাত্রা।

পথের নির্জন একটি মাঠের পুকুরপাড়ে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল দুর্গা। তাহাকে কেহ দেখিল না। কিন্তু সে তাহাদের দিকে চাহিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল—তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

সকলেই চলিতেছিল নীরবে। একটি বিষণ্ণতায় সকলেই যেন কথা হারাইয়া ফেলিয়াছে। দারোগাবাবুটিও নীরব। এতগুলি মানুষের মিলিত বিষণ্ণতা তাঁহার মনকে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই স্পর্শ করিয়াছে।

যতীনের মনে পড়িতেছিল অনেক কিছু কথা, ছোটখাটো স্মৃতি। সহসা মাঠের দিকে চাহিয়া তাহার ভাবান্তর উপস্থিত লইল। এই বিস্তীর্ণ মাঠ একদিন সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিবে, ধীরে ধীরে হেমন্তে স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। চাষীর ঘর ভরিবে রাশি-রাশি সোনার ফসলে।—

পরমুহূর্তেই মনে হইল—তারপর ? সে ধান কোথায় যাইবে ?

তাহার মনে পড়িল অনিরুদ্ধের সংসারের ছবি। আরও অনেকের ঘরের কথা। জীর্ণ ঘর রিক্ত অঙ্গন, অভাবক্লিষ্ট মানুষের মুখ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ঋণভার ; শীর্ণকায় অর্ধ-উলঙ্গ অজ্ঞ শিশুর দল। উচ্চিংড়ে ও গোবরা—বাংলার ভাবী-পুরুষের নমুনা।

পরক্ষণেই মনে পড়িল—পদ্ম তাহাদের কপালে অশোক-ষষ্ঠীর ফোঁটা দিতেছে।

হঠাৎ তাহার পড়া স্ট্যাটিষ্টিক্সের কথা তুচ্ছ মনে হইল। অর্ধ সত্য—সে শুধু কঠিন বস্তুগত হিসাব। কিন্তু সংসারটা শুধু হিসাব নয়। কথাটা তাহাকে একদিন ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে মনে পড়িয়া গেল। সে অবনত মস্তকে বার বার তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া স্বীকার করিল—সংসার ও সংসারের কোন কোন মানুষ হিসাবের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। ন্যায়রত্ন হিসাবের ঊর্ধ্বে—পরিমাপের অতিরিক্ত। আর তাহার পাশের এই মানুষটির—পণ্ডিত দেবু ঘোষ ; অর্ধ শিক্ষিত চাষীর ছেলে, হৃদয়ের প্রসারতায় তাহার নির্ধারিত মূল্যাঙ্ককে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কতখানি—কতদূর—যতীন তাহা নির্ধারিত করিতে পারে নাই, কেমন করিয়া গেল—সেও অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত এক রহস্য।

এই হিসাব-ভুলের ফেরেই তো সৃষ্টি বাঁচিয়া আছে। এক ধূমকেতুর সঙ্গে সংঘর্ষে পৃথিবীর একবার চুরমার হইয়া যাইবার কথা ছিল। বিরাট বিরাট হিসাব করিয়া ও অঙ্ক কষিয়াই সেই অঙ্কফল হিসাবেই ঘোষিত হইয়াছিল। অঙ্ক ভুল হয় নাই, কিন্তু পৃথিবী কোন্ রহস্যময়ের ইঙ্গিতে ভুল করিয়া ধূমকেতুটার পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

নহিলে সেই সমাজ-শৃঙ্খলার সবই তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্রামের সনাতন ব্যবস্থা—নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি আজ স্বকর্মত্যাগী, স্বকর্মহীন। এক গ্রাম হইতে পঞ্চ গ্রামের বন্ধন, পঞ্চ গ্রাম হইতে সপ্ত গ্রাম, নব গ্রাম, দশ গ্রাম, বিংশতি গ্রাম ! শত গ্রাম, সহস্র গ্রামের বন্ধন-রজ্জু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এলাইয়া গিয়াছে।

মহাগ্রামের 'মহা' বিশেষণ বিকৃত হইয়া মহুতে পরিণত হইয়াছে, শুধু শব্দার্থে নয়—বাস্তব পরিণতিতেও তাহার মহা-মহিমত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আঠারো পাড়া গ্রাম আজ মাত্র অল্প কয়েক ঘর লোকের বসতিতে পরিণত। ন্যায়রত্ন জীর্ণ বৃদ্ধ একান্তে মহাপ্রয়াণের দিন গণনা করিয়া চলিয়াছেন

নদীর ওপারে নূতন মহাগ্রাম রচনা করিয়াছে নূতন কাল। নূতন কালের সে রচনার মধ্যে যে রূপ ফুটিয়া উঠিবে—সে যতীন বইয়ের মধ্যে পড়িয়াছে—তার জন্মস্থান কলিকাতায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। সে মনে হইলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, মনে হয় গোটা পৃথিবীর আলো নিভিয়া যাইবে, বায়ুপ্রবাহ শুদ্ধ হইবে, গোটা সৃষ্টিটা দুর্বৃত্ত-ধর্ষিতা নারীর মত অন্তঃসারশূন্য কাঙালিনীতে পরিণত হইবে। জীর্ণ অন্তর বুকে হাহাকার, বাহিরে চাকচিক্য, মুখে কৃত্রিম হাসি। দুর্ভাগিনী সৃষ্টি! আঙ্কিক নিয়মে তার পরিণতি—ক্ষয়রোগীর মত তিলে তিলে মৃত্যু। তবু কিন্তু সে হতাশ নয় আজ। মানুষ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত রহস্য। পৃথিবীর সমুদ্রতটের বালুকারাশির মধ্যে একটি বালুকণার মত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্তির অভ্যন্তরে এই পৃথিবী, তাহার মধ্যে যে জীবনরহস্য, সে রহস্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ উপগ্রহের রহস্যের ব্যতিক্রম—এক কণা পরিমাণ জীবন, প্রকৃতির প্রতিকূলতা, মৃত্যুর অমোঘ শক্তি—সমস্তকে অতিক্রম করিয়া শত ধারায় সহস্র ধারায় কোটি কোটি ধারায় কালে কালে তালে তালে উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাপ্রবাহে পরিণত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। সে সকল বাধাকেই অতিক্রম করিবে। আনন্দময়ী প্রাণবতী সৃষ্টি, অফুরন্ত তাহার শক্তি—সে তাহার জীবন-বিকাশের সকল প্রতিকূল শক্তিকে ধ্বংস করিবে, তাহাতে তাহার সংশয় নাই আজ। ভারতের জীবনপ্রবাহ বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া আবার ছুটিবে।

ন্যায়রত্ন জীর্ণ। তাহার কাল অতীত হইতে চলিয়াছে। তিনি থাকিবেন না। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আদর্শ নূতন জন্মলাভ করিবে।

যতীন হাসিল। মনে পড়িল ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথকে। সে আসিবে। দেবু ঘোষ নবরূপে পল্লীর এই শৃঙ্খলাহীন যুগে, ভাঙাগড়ার আসরের মধ্যে শ্রীহরি পাল, কঙ্কণার বাবু, থানার জমাদার, দারোগার রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহামারীর আক্রমণকে সে রোধ করিয়াছে। দেবুর বুকে বুক রাখিয়া আলিঙ্গনের সময় সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে অভয়ের বাণী তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইতে। সকল বাধা দূর করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভের অদম্য আগ্রহের বাণী!

উত্তেজনায় বিপ্লববাদী যতীনের শরীরে থর থর করিয়া কম্পন বহিয়া গেল। এ চিন্তা তাহার বিপ্লববাদের চিন্তা। আনন্দে তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল অদ্ভুত

এক দীপ্তি। তাহার আনন্দ, তাহার সান্ত্বনা এই যে সে তাহার কর্তব্য করিয়াছে। বন্দী-জীবনে এই পল্লীর মধ্যে দেবুর জাগরণে সে সাহায্য করিয়াছে। বন্দীত্ব তাহার নিজের জীবনে জাগরণের ভাবপ্লাবনের গতিরোধ করিতে পারে নাই। এমনি করিয়াই নূতন কালের ধর্ষণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে-মানুষ বাঁচিবে। ভয় নাই, ভয় নাই।

বাঁধের উপর দেবু দাঁড়াইয়া বলিল—যতীনবাবু, আসি তা হলে। নমস্কার।

যতীন বলিল—নমস্কার দেবুবাবু। বিদায়। দেবুর হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; হঠাৎ থামিয়া আবৃত্তি করিল—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

তারপর সে নিতান্ত অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। দেবু যতীনের গতিপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চোখ দিয়া তাহার দরদর-ধারে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। এই একান্ত একক জীবন—বিলু খোকা চলিয়া গিয়াছে, জগন হরেন আসিয়া আর তেমন কলরব করে না। সমস্ত গ্রাম হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ যতীনবাবুও চলিয়া গেল। কেমন করিয়া দিন কাটিবে তাহার। কাহাকে লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? সহসা মনে পড়িল ন্যায়রত্নের গল্প। কই, তাহার সে শালগ্রাম কই? সে ঊর্ধ্বলোকে আকাশের দিকে চাহিয়া আত্মহারার মত হাত বাড়াইল, সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া অকপট-কাতর স্বরে ডাকিল—ভগবান!

ময়ূরাক্ষীর গর্ভে নামিয়া যতীন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। সু-উচ্চ বাঁধের উপর দণ্ডায়মান ঊর্ধ্ববাহু দেবুকে দেখিয়া সে আনন্দে তৃপ্তিতে মোহগ্রস্তের মত নিশ্চল হইয়া দেবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

দারোগা ডাকিল—যতীনবাবু, আসুন!

যতীন মাটিতে হাত ঠেকাইয়া, সেই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর বলিল—চলুন।

অকস্মাৎ দূরে কোথাও ঢাক বাজিয়া উঠিল।

সেই দূরাগত ঢাকের শব্দে সচেতন হইয়া দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ঢাক বাজিতেছে। মহাগ্রামে ঢাকের শব্দ। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রা। রথ কোথায় গিয়া থামিবে কে জানে?

বাঁধের পথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

পঞ্চগ্রাম

এক

আষাঢ় মাস। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা পর্ব ; দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে আষাঢ়ে রথযাত্রা হিন্দুর সার্বজনীন উৎসব। পুরীতে জগন্নাথ-বিগ্রহের রথযাত্রাই ভারতবর্ষে প্রধান রথযাত্রা। সেখানেও আজ জগন্নাথ-বিগ্রহ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের ঠাকুর ; অবশ্য এ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষত্ব কেবল হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; হিন্দুদের সকলেই আজ রথের দড়ি স্পর্শ করিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহের স্পর্শ পুণ্যলাভের অধিকারী। জগন্নাথ বিগ্রহ কাঙালের ঠাকুর।

পুরীর রথযাত্রা প্রধান রথযাত্রা হইলেও, হিন্দু-সমাজের সর্বত্র বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের প্রায় গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ আকারে রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু-গৃহে আজ জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হইবে। আম-কাঁঠালের সময়, আম-কাঁঠাল ভোগের একটি অপরিহার্য উপকরণ। ধনী জমিদারদের অনেকেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রথ আছে ; কাঠের রথ, পিতলের রথ। এই রথে শালগ্রাম-শিলা অথবা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহমূর্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়া পুরীর অনুকরণে রথ টানা হয়। বৈষ্ণবদের মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সংকীর্তন হয়, মেলা বসিয়া থাকে। বাংলার চাষীদের অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী, তাহারা এই পর্বটি বিশেষ আগ্রহে পালন করে ; হলকর্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া তাহারা পর্বটিকে আপনাদের জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্টভাবে জড়াইয়া লইয়াছে। দু-দশখানা গ্রাম অন্তর অবস্থাপন্ন-চাষীপ্রধান গ্রামে বাঁশ কাঠ দিয়া প্রতি বৎসর নূতন রথ তৈয়ারী করিয়া পর্বের সঙ্গে উৎসব করে। ছোট খাটো মেলা বসে। আশপাশের লোকজন ভিড় করিয়া আসে। কাগজের ফুল, রঙীন কাগজে মোড়া বাঁশী, কাগজের ঘূর্ণীফুল, তালপাতার তৈরী হাত পা নাড়া হনুমান, দুম-পটকা বাজী, তেলেভাজা পাঁপর, বেগুনি, ফুলুরী ও অল্পস্বল্প মনিহারীর জিনিস বিক্রি হয়।

মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রার অনুষ্ঠান অনেক দিনের ; ন্যায়রত্নের উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ রথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৃহদেবতা

লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুর রথারোহণ করেন; পাঁচচূড়া বিশিষ্ট মাঝারি আকারের কাঠের রথ। একটি মেলাও বসে। আগে মেলাটা বেশ বড় হইত। বিশেষ করিয়া লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের টুকরো, বাবুই ঘাসের দড়ি, তৈয়ারী দরজা জানালা এবং কামারের সামগ্রী অর্থাৎ লোহার বড় গজাল, ফাল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারী, হাতা, খন্তা কিনিতে কয়েকখানা গ্রামের লোকই এখানে ভিড় করিয়া আসিত। কিন্তু এখন আর সে সব জিনিস কেনাবেচা হয় না। স্থানীয় ছুতার কামারেরা এখন সাহস করিয়া এ সব জিনিস মেলায় বিক্রির জন্য তৈয়ারী করে না। তাহাদের পুঁজির অভাবেও বটে, আবার লোকে কেনে না বলিয়াও বটে। এক মাত্র লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের কেনাবেচা এখনও কিছু হয় এবং বাবুই ঘাস এবং বাবুই দড়িও এখনও কিছু বিক্রি হয়। তবে অন্য কেনাবেচা কম হয় নাই, দোকানপাটও পূর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় আসে, লোকের ভিড়ও বাড়িয়াছে। মাতব্বর ছাড়াও লোকজনেরা ভীড় করিয়া আসিয়া থাকে। সস্তা শৌখীন মনিহারী জিনিসের দোকান, তৈরী জামা কাপড়ের দোকান আসে, জংশনের ফজাই শেখের জুতার দোকানও আসিয়া একপাশে বসে। কেনাবেচা যাহা হয় তাহা—এইসব দোকানেই। লোকও অনেক আসে। কয়েকখানা গ্রামের মাতব্বর লোকেরা আজও সসম্ভ্রমে ন্যায়রত্নের বাড়ীতে ঠাকুরের রথযাত্রা উপলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, রথের টানে প্রথম মাতব্বরেরাই দড়ি ধরিবার অধিকারী। অপর লোকের জনতা দোকানেই বেশী। এখনও তাহারা ভিড় করিয়াই আসে। পাঁপর খাইয়া, কাগজের বাঁশী বাজাইয়া, নাগর দোলায় চাপিয়া ঘুরপাক খাইয়া তাহারাই মেলা জমাইয়া দেয়।

মহাগ্রাম এককালে—এককালে কেন, প্রায় সত্তর আশী বৎসর পূর্বেও—ঐ অঞ্চলের প্রধান গ্রাম ছিল। ন্যায়রত্নই এ অঞ্চলের সমাজপতি, পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিতবংশের উত্তরাধিকারী। এককালে ন্যায়রত্নের পূর্বপুরুষেরাই ছিলেন এখানকার পঞ্চবিংশতি গ্রাম সমাজের বিধান দাতা। পঞ্চবিংশতি গ্রাম সমাজ অবশ্য বর্তমানকালে কল্পনার অতীত। কিন্তু এককালে ছিল। গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রাম, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, বিংশতিগ্রাম, পঞ্চবিংশতিগ্রাম—এমনি ভাবেই গ্রাম্য সমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল; বহুপূর্বে শতগ্রাম পড়ন্ত এই বন্ধন সূত্র অটুটও ছিল। তখন যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য। এখন যাতায়াত সুগম হইয়াছে কিন্তু সম্পর্ক বন্ধন বিচিত্রভাবে শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজ অবশ্য সে সব নিতান্তই কল্পনার কথা, তবে পঞ্চগ্রাম বন্ধন এখনও আছে। মহাগ্রাম আজ নামেই মহাগ্রাম, কেবলমাত্র ন্যায়রত্নের বংশের অস্তিত্বের লুপ্তপ্রায় প্রভাবের অবশিষ্টাংশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া মহৎ বিশেষণে কোনমতে টিকিয়া আছে।

রথযাত্রার মতই কয়েকটি পর্ব উপলক্ষে লোকে ন্যায়রত্নদের টোল ও ঠাকুর বাড়ীতে আসে। রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, বাসন্তীপূজা—এই তিনটি পর্ব এখনও ন্যায়রত্নের বাড়ীতে বেশ একটু সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আজ ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রার উৎসব।

ন্যায়রত্ন নিজে হোম করিতেছেন। টোলের ছাত্ররা কাজকর্ম করিয়া ফিরিতেছে। কয়েকখানি গ্রামের মাতব্বরেরা আটচালায় শতরঞ্চির আসরে বসিয়া আছে। গ্রাম্য চৌকিদার এবং আরও কয়েকজন তামাক সাজিয়া দিতেছে। মেলার মধ্যেও লোকজনের ভীড় ধীরে ধীরে ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। একটা ঢাকী ঢাক বাজাইয়া দোকানে দোকানে পয়সা মাগিয়া ফিরিতেছে।

বর্ষার আকাশে ঘনঘোর মেঘের ঘটা; শূন্যলোক যেন ভূ-পৃষ্ঠের নিকট স্তরে স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানা পাতলা কালো ধোঁয়ার মত মেঘ অতি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়াছে; মনে হইতেছে সেগুলি বুঝি ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী উঁচু বাঁধের উপর বহুকালের সুদীর্ঘ তালগাছগুলির মাথা ছুঁইয়া চলিয়াছে।

ঢাকের বাজনা শূন্যলোকের মেঘস্তরের বুকে প্রতিহত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শিবকালীপুরের দেবু ঘোষ ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ ধরিয়া দ্রুতপদে মহাগ্রামের দিকে চলিয়াছিল। ঢাকের গুরুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি দিগন্তে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহাগ্রামের ঢাক বাজিতেছে। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রা। এতক্ষণে ঠাকুর বোধহয় রথে চড়িলেন। রথ হয়ত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুত গতিতেই সে চলিয়াছিল, তবু সে তাহার গতি আরও দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথ দেবুর স্কুলের বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, স্কুলে তাহারা ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ক্লাসে কোনবার দেবু ফার্স্ট হইত, কোনবার হইত বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ এম্-এ পড়ে। দেবু পাঠশালার পণ্ডিত। এককালে, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রের মৃত্যুর পূর্বে, একথা মনে করিয়া তীব্র অসন্তোষের আক্ষেপে দেবু বিদ্রূপের হাসি হাসিত। কিন্তু এখন আর হাসে না। দুঃখও তাহার নাই। প্রাক্তন অথবা অদৃষ্ট অমোঘ অখণ্ডনীয় বলিয়া নয়, সে যেন এখন এসবের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যতীনকে।

ডেটিন্যু যতীন তাহাকে দিয়া গেল অনেক! এ সমস্তকে জয় করিবার

শক্তি—যতীনের সাহায্যই তাহাকে দিয়াছে। যতীনবাবু আজ এখান হইতে চলিয়া গেলেন। এই কিছুক্ষণ পূর্বে সে তাঁহাকে ময়ূরাক্ষীর ঘাট পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বিদায় লইয়াছে। সেখান হইতে সে মহাগ্রামের দিকে আসিতেছে। তাহার শূন্য জীবনের ডেটিন্যু যতীনই ছিল একমাত্র সত্যকারের সঙ্গী। আজ সে-ও চলিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—এই বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিনটিতে এই ময়ূরাক্ষীর ঘাটেই কোন নির্জন গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ওই ঘাটের পাশেই—ময়ূরাক্ষীর বালুচরের উপর সে তাহার খোকন এবং প্রিয়তমা বিলুকে ছাই করিয়া দিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে—অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে সে চিহ্ন আজও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই; তাহার পাশ দিয়া ভিজাবালির উপর পায়ের ছাপ আঁকিয়া যতীন চলিয়া গেল। আজ যে ঘটা করিয়া মেঘ নামিয়াছে, নৈঋত কোণ হইতে যে মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে বর্ষার বর্ষণ নামিতে আর দেরি নাই। গ্রাম মাঠ ঘাট ভাসিয়া ময়ূরাক্ষীতে ঢল নামিবে—সেই ঢলের স্রোতে খোকন-বিলুর চিতার চিহ্ন, যতীনের পায়ের দাগ নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে—সেই মুছিয়া যাওয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ীর আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। যতীন তাহাকে জীবনে দিয়াছে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ আর ন্যায়রত্ন তাহার জীবনে দিয়াছেন এক পরম সান্ত্বনা। তাঁহার সে গল্প যে ভুলিবার নয়। ঠাকুরমশাই আজ তাহাকে বিশেষ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহার একটি বিশেষ কারণও আছে। স্নেহ তো আছেই, কিন্তু যে কারণ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—সেই কথাটিই দেবু ভাবিতেছিল।

সরকারী জরীপ আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে সেটেলমেণ্ট সার্ভে হইয়া গেল। রেকর্ড অব্ রাইটসের ফাইন্যাল পাব্লিকেশনও হইয়া গিয়াছে। সেটেলমেণ্টের খরচের অংশ দিয়া প্রজারা 'পরচা' লইয়াছে। এইবার জমিদারের খাজনা-বৃদ্ধির পালা। সর্বত্র সকল জমিদারই এক ধুয়া তুলিয়াছে—খাজনা-বৃদ্ধি। আইন-সম্মতভাবে—তাহারা প্রতি দশ বৎসর অন্তর নাকি খাজনায় বৃদ্ধি পাইবার হক্‌দার। আজ বহু দশ বৎসর পর সেটেলমেণ্টের বিশেষ সুযোগে তাহারা খাজনা বৃদ্ধি করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—এইটাই হইল খাজনা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। রাজসরকারে প্রতিভূ স্বরূপে জমিদারের প্রাপ্য নাকি ফসলের অংশ। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের আমলে জমিদারেরা সেই প্রাপ্য ফসলের তৎকালীন মূল্যকেই টাকা-খাজনায় রূপান্তরিত করিয়াছিল। সুতরাং আজ যখন ফসলের মূল্য সেকাল হইতে বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, তখন জমিদার বৃদ্ধি পাইবার হক্‌দার। তা ছাড়া আরও একটা

প্রকাণ্ড সুবিধা জমিদারদের হইয়াছে। সেটেলমেণ্ট আইনের পাঁচধারা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সাময়িক আদালত বসিবে। সেখানে কেবল এই খাজনা-বৃদ্ধির উচিত-অনুচিতের বিচার হইবে। অতি অল্পখরচে বৃদ্ধি মামলা দায়ের করা চলিবে—বিচারও হইবে অল্প সময়ের মধ্যে। তাই আজ ছোট বড় সমস্ত জমিদারই একসঙ্গে বৃদ্ধি-বৃদ্ধি করিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।

প্রজারাও বসিয়া নাই; 'বৃদ্ধি দিব না' এই রব তুলিয়া তাহারাও মাতিয়া উঠিয়াছে। হ্যাঁ, 'মাতন' বই কি! যুক্তি আছে তাহাদের, তর্কও তাহারা করে। তাহারা বলে—ফসলের দাম বাড়িয়াছে সে কথা ঠিক, কিন্তু আমাদের সংসার-খরচ কত বাড়িয়াছে দেখ! জমিদার বলে—সে দেখিবার কথা আমাদের নয়; আমাদের সম্পর্ক রাজভাগ ফসলের দামের সঙ্গে। এ সূক্ষ্ম যুক্তি প্রজারা বুঝিতে পারে না—বুঝিতে চায় না। তাহারা বলিতেছে—আমরা 'দিব না'। এই 'দিব না' কথাটির মধ্যে তাহারা আস্বাদ পায় এক অদ্ভুত তৃপ্তির। একক কেহ পাওনাদারের প্রাপ্য দিব না বলিলে সমাজে সে নিন্দিত হয়, কিন্তু ওইটিই মানুষের যেন অন্তরের কথা। না দিলে আমার যখন বাড়িবে—অন্তত কমিয়া যাওয়ার দুঃখ হইতে বাঁচিব—তখন না-দিবার প্রবৃত্তিই অন্তরে জাগিয়া উঠে। তবে একক বলিলে সমাজে নিন্দা হয়, আদালতে পাওনাদার দেনাদারের কাছে সহজেই প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়। কিন্তু আজ যখন সমাজসুদ্ধ সকলেই দিব না রব তুলিয়াছে, তখন এ আর নিন্দার কথা কোথায়? আজ দাঁড়াইয়াছে দাবীর কথা। রাজদ্বারে পাওনাদার করুক নালিশ; কিন্তু আজ তাহারা একখানি বাঁশের কঞ্চি নয়, আজ তাহারা কঞ্চির আঁটি—মুট করিয়া অনায়াসে ভাঙিয়া যাইবার ভয় নাই। 'ভয় নাই' এই উপলব্ধির মধ্যে যে শক্তি আছে, যে মাতন আছে, সেই মাতনেই তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রায় সকল গ্রামের প্রজারাই ধর্মঘট করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। এখন প্রয়োজন তাহাদের নেতার। প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে দেবু নিমন্ত্রণ পাইয়াছে। তাহাদের গ্রাম শিবকালীপুরের লোকেরা তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ সব ব্যাপারে দেবুর আর নিজেকে জড়াইয়া ফেলিবার ইচ্ছা ছিল না। বারবার সে তাহাদের ফিরাইয়া দিতেই চাহিয়াছে—তবু তাহারা শুনিবে না। এদিকে মহাগ্রামের লোকে শরণাপন্ন হইয়াছিল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের। ন্যায়রত্নের পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দেবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত আমার শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম—তুমি বিধান দিতে পার, বিবেচনা করিয়া তুমি ইহার বিধান দিও।"

আজ এই রথযাত্রা উপলক্ষে পঞ্চগ্রামের চাষী মাতব্বরেরা ন্যায়রত্নের ঠাকুর-

বাড়ীতে সমবেত হইবে। মহাগ্রামের উদ্যোক্তারা এই সুযোগে ধর্মঘটের উদ্যোগপর্বের ভূমিকাটা সারিয়া লইতে চায়। তাই বারবার দেবুকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছে। ন্যায়রত্ন নিজেও আবার লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত আমার আশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুরের রথযাত্রা, অবশ্যই আসিবে। আমাকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর। আমার ঠাকুরের রথ চলিবে সংসার সমুদ্র পার হইয়া পরলোকে। ইহলোকে যাহাদের প্রভুর রথ সুখ-সম্পদময় মাসীর ঘর যাইবে, তাহারা আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। দায়িত্বটা তুমি লইয়া আমাকে মুক্তি দাও। তোমার হাতে ভার দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কারণ মানুষের সেবায় তুমি সর্বস্ব হারাইয়াছ। তোমার হাতে ঘটনাচক্রে যদি লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হয়—তবে সে ক্ষতিতে অমঙ্গল হইবে না বলিয়া আমার প্রত্যয় আছে।" দেবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাই স্ত্রী-পুত্রের চিতা-চিহ্নের বিপুল আকর্ষণ, বন্ধু যতীনের বিদায়-বেদনার অবসাদ—সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে মহাগ্রাম অভিমুখে চলিয়াছে।

ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর হইতে সেমাঠের পথে উত্তরমুখি নামিল। খানিকটা দূর গিয়াই মহাগ্রাম। ঢাকের শব্দ উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। পথ-চলার গতি আরও খানিকটা দ্রুততর করিয়া, জনতার ভিড় ঠেলিয়া শেষে সে ন্যায়রত্নের ঠাকুর-বাড়ীর আটচালায় আসিয়া উঠিল। পূজার স্থানে প্রজ্বলিত হোমবহ্নির সম্মুখে বসিয়াই ন্যায়রত্ন তাহাকে স্মিতহাস্যে সস্নেহে নীরব আহ্বান জানাইলেন।

দেবু প্রণাম করিল।

চাষী মাতব্বরেরাও দেবুকে সাগ্রহে সস্নেহে আহ্বান করিল।—এস এস, পণ্ডিত এস। এই-এই এইখানে বস। সকলেই তাহাকে বসিতে দিবার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া কাছে পাইতে চাহিল। দেবু কিন্তু সবিনয়ে হাসিয়া এক পাশেই বসিল, বলিল—এই বেশ বসেছি আমি।—তবে তাহাদের আহ্বানের আন্তরিকতা তাহার বড় ভাল লাগিল। স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া সে যেন এ অঞ্চলের সকল মানুষের স্নেহ-প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। দুইবিন্দু জল তাহার চোখের কোণে জমিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অন্তরটা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। মানুষের এত প্রেম!

আসিয়াছে অনেকে। মহাগ্রামের মুখ্য ব্যক্তি শিবু দাস, গোবিন্দ ঘোষ, মাখন মণ্ডল, গণেশ গোপ প্রভৃতি সকলে তো আছেই—তাছাড়া শিবকালীপুরের হরেন্দ্র ঘোষাল আসিয়াছে, জগন ডাক্তারও আসিবে। দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস আসিয়াছে, সঙ্গে আরও কয়েকজন; বালিয়াড়ার বৃদ্ধ কেনারাম, গোপাল

ও গোকুলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। কেনারাম সে-কালে গ্রাম্যপাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, এখন সে বৃদ্ধ এবং অন্ধ; প্রাচীনকালের অভ্যাসবশেই বোধকরি দৃষ্টিশক্তিহীন চোখে এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চাহিয়া দেখিল, তারপর সঙ্গী গোপালকে মৃদুস্বরে ডাকিল—গোপাল!

গোপাল পাশেই ছিল, সে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস করিয়া বলিল—পণ্ডিত দেবু ঘোষ।

কুব্জ বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিলা ডাকিল—দেবু? কই, দেবু কই?

দেবু আপনার স্থান হইতেই উত্তর দিল—ভাল আছেন?

—এইখানে—এইখানে, আমার কাছে এস তুমি।

এ আহ্বান দেবু উপেক্ষা করিতে পারিল না, সে উঠিয়া আসিয়া বৃদ্ধের কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ জানাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম করছি।

আপনার দুইখানি হাত দিয়া দেবুর মুখ হইতে বুক পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ বলিল—তোমাকে দেখতেই এসেছি আমি। পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—চোখে দেখতে পাই না, দৃষ্টি নাই, তাই তোমাকে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দেখছি।

দেবু এই বৃদ্ধের কথার অন্তরালে যে সমবেদনা এবং প্রশংসার গাঢ় মধুর আস্বাদ অনুভব করিল, সে উচ্ছ্বাসকে এড়াইবার জন্যই প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিয়া বলিল—চোখের ছানি কাটিয়ে ফেলুন না। এই তো 'বেনাগড়ে'তে পাদ্রীদের হাসপাতালে একছার ছানি কাটিয়ে আসছে লোকে। সত্যি-সত্যিই ওখানে অপারেশন খুব ভাল হয়।

—অপারেশন? অস্ত্র করাতে বলছ?

—হ্যাঁ। সামান্য অপারেশন—হয়ে গেলেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

—কি দেখব?—বৃদ্ধ অদ্ভুত হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি দেখব? তোমার শূন্য ঘর? তোমার চোখের জল? চোখ গিয়েছে ভালই হয়েছে দেবু। অকাল-মৃত্যুতে দেশ ছেয়ে গেল। সেদিন আমার একটা ভাগ্নে ম'ল, বোনটা বুক ফাটিয়ে কাঁদলে—কানে শুনলাম, কিন্তু তার মরা মুখ তো দেখতে হ'ল না। এ ভাল, দেবু এ ভাল! এখন কানটা কালা হয় তো এ সব আর শুনতেও হয় না।

বৃদ্ধের দৃষ্টিহীন বিস্ফারিত চোখ হইতে জলের ধারা মুখের কুঞ্চিত লোলচর্ম সিক্ত করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। ম্লান হাসিমুখে দেবু চুপ করিয়া রহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না। সমবেত সকলের কথাবার্তাও বন্ধ হইয়া গেল। শুধু ন্যায়রত্নের মন্ত্রধ্বনি একটা সঙ্গীতময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া উচ্চারিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়েই টোল-বাড়ীর আটচালার বাহিরে খোলা উঠানে রাস্তা হইতে আসিয়া উঠিল আধুনিক সুদর্শন তরুণ, দেবুরই সমবয়সী। তাহার পিছনে একটি কুলির মাথায় ছোট একটি সুটকেশ ও একটি ফলের ঝুড়ি। দেবু সাগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইল—বিশু-ভাই!

দেবুর বিশু-ভাই—বিশ্বনাথ—ন্যায়রত্নের পৌত্র।

ন্যায়রত্নের তখন কথা বলিবার অবকাশ ছিল না, শুধু তাঁহার ঠোঁটের কোণে মন্ত্রোচ্চারণের ছেদের মধ্যে একটু সস্নেহ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দুই

শিবকালীপুর অঞ্চলে—শিবকালীপুরেই প্রথম খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধর্মঘটের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আগুন জ্বলিতেই প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুস্তরে প্রবাহ জাগিয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আগুনের আশপাশের বস্তুগুলির ভিতরের দাহিকা শক্তি অগ্নির স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া যেন অধীর আগ্রহে কাঁপে। খড়ের চালে যখন আগুন জ্বলে, তখন পাশের-ঘরের চালের খড় উত্তাপে স্ত্রীপুষ্পের গর্ভকেশরের মত ফুলিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। অগ্নিকণার স্পর্শ না পাইলেও—উত্তাপ গ্রাস করিতে করিতে সে চালও এক সময় দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আগুন জ্বলে, সে আগুনের উত্তাপে আশ-পাশের ঘরেও আগুন লাগে। তেমনি ভাবেই শিবকালীপুরের ধর্মঘট চারিপাশের গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল। দিনকয়েকের মধ্যেই এ অঞ্চলে প্রায় সকল গ্রামেই ধুয়া উঠিল—খাজনা-বৃদ্ধি দিতে পারিব না। দিব না। কেন বৃদ্ধি? কিসের বৃদ্ধি?—অন্যদিকে শিবকালীপুরের নূতন পত্তনীদার চাষী-হইতে-জমিদার শ্রীহরি ঘোষও সাজিল। সে পাকা মামলাবাজ গোমস্তা, সদরের প্রধান দেওয়ানী-আইনবিদ উকীল এবং পাইক-লাঠিয়াল লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া সে ঘোষণা করিল—তাহার স্বপক্ষে আইনের সপ্তসিন্ধু উত্তাল হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার অপরিমেয় অর্থশক্তি দ্বারা সেই সিন্ধুসলিল ক্রয় করিয়া আনিয়া সে এই ক্ষুদ্র শিবকালীপুরকে প্লাবিত করিয়া দিবে। খাজনা-বৃদ্ধির মামলা লইয়া সে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়িবে। আশপাশের জমিদারেরাও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিল। তাহারাও শ্রীহরিকে আশ্বাস দিল।

রথযাত্রার কয়েকদিন পর।

এই কয়েক দিনের মধ্যেই ধর্মঘটের উত্তাপ গ্রীষ্মের উত্তাপের মত ছড়াইয়া

পড়িল। প্রবল বর্ষণে মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। চাষের কাজ শুরু হইয়া গেল ঝপ করিয়া। রাত্রি থাকিতে চাষীরা মাঠে গিয়া পড়ে। চারিপাশে গ্রামগুলির মধ্যস্থলে মাঠের মধ্যেই কাজ করিতে করিতে ধর্মঘটের আলোচনা চলিতেছিল।

জলভরা মাঠের আইল কাটিতে কাটিতে ক্লান্ত হইয়া একবার তামাক খাইবার জন্য শিবু আসিয়া বসিল। চকমকি ঠুকিয়া শোলায় আগুন ধরাইয়া তামাক সাজিয়া বেশ জুত করিয়া বসিতেই আশপাশ হইতে কয়েকজন আসিয়া জুটিয়া গেল। কুসুমপুরের রহম শেখই প্রথমটা আরম্ভ করিল।

—চাচা, তোমরা লাগাল্ছ শুনলাম?

শিবু দাস বিজ্ঞের মত একটু হাসিল।

এই সেদিন ন্যায়রত্নের বাড়িতে ধর্মঘট করা ঠিক হইয়াছে।

দেবু তাহাদের সব বুঝাইয়া বলিয়াছে। বাধা-বিপত্তি দুঃখকষ্ট অনিবার্যরূপে যাহা আসিবে, তাহারই কথা সে বারবার বলিয়াছে। বিগত একশত বৎসরের মধ্যেই এই পঞ্চগ্রামে যত ধর্মঘট হইয়াছে তাহার কাহিনী শুনাইয়া জানাইয়াছে—কত চাষী জমিদারের সঙ্গে ধর্মঘটের দ্বন্দ্বে সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। বারবার বলিয়াছে, আইন যেখানে জমিদারের স্বপক্ষে, সেখানে 'বৃদ্ধি দিব না' এ কথা বলা ভুল, আইন অনুসারে অন্যায়। প্রজা ও জমিদারের অর্থ-শক্তির কথা এবং আইনানুযায়ী অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া সে প্রকারান্তরে নিষেধই করিয়াছিল।

সকলে দমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ন্যায়রত্নমহাশয়ের পৌত্র বিশু সেখানে উপস্থিত ছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আইন পাল্টায় দেবু-ভাই। আগে গভর্নমেণ্টের মতে জমির মালিক ছিল জমিদার; প্রজার অধিকার ছিল শুধু চাষ-আবাদের। প্রজা কাউকে জমি বিক্রি করলে জমিদারের কাছে খারিজ-দাখিল করে হুকুম নিতে হত। জমির উপর মূল্যবান গাছের অধিকারও প্রজার ছিল না। কিন্তু সে আইন পাল্টেছে। প্রজারা যদি 'বৃদ্ধি দেব না' বলে—না-দেবার দাবীটাকে জোরালো করতে পারে, সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারে—তবে বৃদ্ধির আইনও পাল্টাবে।

কথাটা বলিবামাত্র সমস্ত লোকের মনে একটিমাত্র যুক্তি স্ফীতকলেবর বিন্ধ্যপর্বতের মত মাথা ঠেলিয়া আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল—কোথা হইতে দিব? দিলে আমাদের থাকিবে কি? আমরা কি খাইয়া বাঁচিব? সরকারের এমন আইন কি করিয়া ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে?

অন্ধ বৃদ্ধ পণ্ডিত কেনারাম হাসিয়া বলিয়াছিল—কিন্তু বিশুবাবু, মারে হরি তো রাখে কে?

বৃদ্ধের কথায় সমস্ত মজলিসটা ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছিল। জীব-জীবনের ধাতুগত প্রকৃতি অনুযায়ী একজন অপরজনকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করিয়া শোষণ করিয়া আপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলে। যে পরাজিত হয়, শোষিত হয়, শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তির প্রচেষ্টায় সে বিরত হয় না; সে-ক্ষেত্রে ক্ষোভ বা অভিমান সে করে না। কিন্তু প্রতিবিধানের জন্য—সে যাহার উপর নির্ভর করে, সে-ও যদি আসিয়া ওই শোষণকারীকেই সাহায্য করে, তাহার শক্তির চাপ চাপাইয়া দেয় প্রাণপণ মুক্তিপ্রচেষ্টার বুকে তবে শোষিতের শেষ সম্বল—দুটি-বিন্দু অশ্রুসিক্ত মর্মান্তিক ক্ষোভ; শুধু ক্ষোভ নয়—অভিমানও থাকে। সেই ক্ষোভ, সেই অভিমান তাহাদের জাগিয়া উঠিল।

বিশু এবার বলিয়াছিল—হরি যদি ন্যায়বিচার না করে মারতেই চায়, তবে এ হরিকে পাল্টে অন্য হরিকে পূজো করব আমরা।

দেবু শিহরিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—কি বলছ বিশু-ভাই! না—না, ও কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।

শুধু দেবু নয় গোটা মজলিসটা শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বিশু কিন্তু হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—বংশীধারী বা চক্রধারী গোকুল বা গোলকবিহারী হরির কথা বলছি না দেবু-ভাই, তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন মাথার ওপর। আমি বলছি আইন যাঁরা করেন তাঁদের কথা। যাঁরা আইন করেন—তাঁরা যদি আমাদের দুঃখের দিকে না চান, তবে আসছে-বারে আমরা তাঁদের ভোট দেব না। ভোট তো আমাদের হাতে!

এই সময় ন্যায়রত্ন আসিয়া বিশ্বনাথকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন পাশের ঘরেই ছিলেন; তিনি সবই শুনিতেছিলেন। বলিয়াছিলেন—বিশ্বনাথের সংসার-জ্ঞান নেই। ওর যুক্তিতে তোমরা কান দিও না। তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরা পাঁচজনে বিচার করে যা হয় কর।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলেও তুমুল তর্ক-কোলাহলের মধ্যে তাহাদের অন্তরের অকপট অভিলাষই জয়লাভ করিল—বৃদ্ধি দিব না।

দেবু বলিল—তবে আমি এর মধ্যে নেই। আমাকে রেহাই দাও।

—কেন?

—আমার মত—'বৃদ্ধি দেব না' এ কথা ঠিক হবে না। যা ন্যায়সঙ্গত তার বেশী দেব না এই কথাই বলা উচিত। এর জন্যে ধর্মঘট করতে হয়—আমি রাজী আছি।

—কিন্তু বিশুবাবু যে বললেন—'আমরা দেব না' বললে বৃদ্ধি আইন পাল্টে যাবে!

মৃদু হাসিয়া দেবু বলিয়াছিল—ঠাকুরমশায় যে বললেন—বিশু-ভাইয়ের সংসার-জ্ঞান নেই, আমিও তাই বলি। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার আমাদের, বৃদ্ধি দেব না—পণ ধরলে আমাদের জমি-জেতার এক ছটাক কারও থাকবে না। অবশ্যি তারপর হয়ত আইন পাল্টাতে পারে।

জগন উঠিয়া বলিল—এটা তোমার কাপুরুষের মত কথা। সবাই যদি ধর্মঘট করে, তবে জমি কিনবে কে?

—কিনবে কে? হাসিয়া দেবু স্মরণ করাইয়া দিল কঙ্কণার এবং আশ-পাশের ভদ্রলোক বাবুদের কথা—জংশনের গদিওয়ালা মহাজনদের কথা।

জগনও এবার মাথা নিচু করিয়া বসিয়াছিল।

অবশেষে দেবুর মতেই সকলে রাজী হইয়াছে। কিন্তু স্থির হইয়াছে—ও কথাটা ভিতরের কথা, প্রথমত বলা হইবে 'দিব না—বৃদ্ধি দিব না।'

শিবু দাস ওই ভিতর-বাহিরের কথা জানে,—তাই বিজ্ঞের মত একটু হাসিল।

—আমাদের তো কাল জুম্মার নমাজ—মছ্‌জেদেই সব ঠিক হবে আমাদের।

শিবু এবার প্রশ্ন করিল—দৌলত শেখ? শেখজী রাজী হয়েছে?

দৌলত শেখ চামড়ার ব্যবসায়ী ধনী লোক। অতীতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া শিবু দাসের সন্দেহ জাগিয়া উঠিল দৌলত শেখ সম্বন্ধে। তাহাদের গ্রামেও ঠিক ওই একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভদ্রলোকেরা ধর্মঘটে যোগ দিতে রাজী হয় নাই। তাহাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে মামলা-মকদ্দমা করিবে স্থির করিয়াছে। কেহ-কেহ আপোষে বৃদ্ধি দিবে বা দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নিজ হাতে চাষ করে না বলিয়া তাহারা জমিদারকে ধরিয়াছে। প্রথমেই তাহারা বৃদ্ধি দিতেছে বলিয়া ভদ্রতা এবং আনুগত্যের দাবীও তাহাদের আছে। ইহারা সকলেই চাকুরে এবং গরীব ভদ্র গৃহস্থ।

রহম হাসিয়া বলিল—ত্যালে আর পানিতে কখনও মিশ খায় চাচা? স্যাখ আলাদা মামলা করবে। সবারই সঙ্গে সি নাই।

কুসুমপুরের পাশেই দেখুড়িয়া গ্রাম, দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস দুর্ধর্ষ লোক, দুর্ধর্ষপনার জন্যই সে প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন সে অন্য লোকের জমি ভাগে চষিয়া খায়, শিবকালীপুরের এলাকার মধ্যেই কঙ্কণার ভদ্রলোকের জমিতে চাষ দিতে আসিয়াছিল, সে বলিল—আমাদের গাঁয়ের শালারা এখনও সব 'গুজুর-গুজুর' করছে। আমি বলে দিয়েছি—যে দেবে সে দিতে পারে, আমি দোব না।

পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—জমি তো মোটে পাঁচ বিঘে। পঁচিশ বিঘে

গিয়েছে, পাঁচ বিঘে আছে। যাক্ ও পাঁচ বিঘেও যাক্! তারপর তল্পিতল্পা নিয়ে বম্-বম্ করে পালাব একদিন!

রহম বলিল—তুরা সব তাক্ জানিস্ না। মেড়ার মতন ঢু মারতেই জানিস্। লড়াই কি শুধু গায়ের জোরে হয়? প্যাঁচ হল আসল জিনিস। 'আমতি'র (অম্বুবাচীর) লড়ায়ে সিবার এইটুকুন জনাব আলি—কেমন দিলে—তুদের লগেন গঁয়লাকে দড়াম করে ফেলে—দেখেছিলি?

তিনকড়ি চটিয়া উঠিল। সিধা হইয়া দাঁড়াইল।

দেখুড়িয়ার তিনকড়ি যেমন গোঁয়ার, দৈহিক শক্তিতেও সে তেমনি বলশালী লোক—তাহার উপর সে নামজাদা লাঠিয়ালও বটে। রহমের এই শ্লেষে সে চটিয়া উঠিল। চটিয়া উঠিবার হেতুও আছে। দেখুড়িয়ার লোকের সঙ্গে কুসুমপুরের সাধারণ চাষী মুসলমানদের শক্তি-প্রতিযোগিতা বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। দেখুড়িয়ার বাসিন্দাদের অধিকাংশই ভল্লাবাগ্দী; ভল্লাবাগ্দীদের শক্তি বাংলা দেশে বিখ্যাত। তিনকড়ি চাষী সদ্‌গোপ হইলেও ওই ভল্লাবাগ্দীদের নেতৃত্ব করিয়া থাকে। এ অঞ্চলে তাহার গ্রামের শক্তি তাহার অহঙ্কার। তাহার সেই অহঙ্কারে রহম ঘা দিয়াছে। শিবু দাস কিন্তু বিব্রত হইয়া উঠিল। দুজনে বুঝি লড়াই বাধিয়া যায়। সহসা বাঁ দিকে চাহিয়া শিবু আশ্বস্ত হইয়া বলিল—চুপ কর তিনকড়ি—চৌধুরী আসছেন!

ও-দিক হইতে দ্বারিকা চৌধুরী আসিতেছিল চাষের তদ্বিরে। সাদা কাপড় দিয়া ডবল করা ছাতাটি মাথায়, লাঠি হাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এ অঞ্চলে সকলেই দূর হইতে চিনিতে পারে। তা ছাড়া লোকটিকে সকলেই শ্রদ্ধা সম্মান করে। শিবু দাস দূর হইতে চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—চৌধুরী আসছেন, চুপ কর।

চৌধুরীরা একপুরুষ পূর্বে জমিদার ছিল, এখন জমিদারী নাই। চৌধুরী বর্তমানে চাষবাস বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছে, বৃত্তি অনুসারে চাষীই বলিতে হয়, তবুও চৌধুরীরা, বিশেষতঃ বৃদ্ধ চৌধুরী এখনও সাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, লোকও বৃদ্ধ চৌধুরীকে একটু বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখে।

চৌধুরী কাছে আসিয়া অভ্যাস মত মৃদু হাসিয়া বলিল—কি গো বাবা সকল, তামাক খেতে বসেছেন সব?

আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিতে চৌধুরী এমনি ভাবেই সকলকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। আপনি বলিয়া সম্বোধন করিলে প্রত্যুত্তরে তুমি এ সংসারে কেহ বলিতে পারে না!

শিবু দাস উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—পেন্নাম; এইবার তাহলে সেরে উঠেছেন?

চৌধুরী বললে—হ্যাঁ বাবা, উঠলাম। পাপের ভোগ এখনও আছে—সেরে উঠতে হল।—কিছুদিন পূর্বে শিবকালীপুরের নূতন পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষ ও দেবু ঘোষের মধ্যে একটা গাছ কাটা লইয়া দাঙ্গা বাঁধিয়াছিল। শ্রীহরি ঘোষ—দেবু ঘোষকে জব্দ করিবার জন্য তাহার পিতামহের প্রতিষ্ঠা করা গাছ কাটিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল; দেবু নির্ভয়ে উদ্যত কুড়ুলের সামনে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়াছিল। সেই দাঙ্গায় উভয় পক্ষকে নিরস্ত করতে গিয়া—চৌধুরী শ্রীহরি ঘোষের লাঠিয়ালের লাঠিতে আহত হইয়া কয়েক-মাসই শয্যাশায়ী ছিল। ঘটনায় সকলেই হায় হায় করিয়াছে।

শিবু দাস বলিল—কালকের মজলিসের কথা শুনেছেন?

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—শুনলাম বৈকি। জগন ডাক্তার মশায় গিয়েছিলেন আমার কাছে।

ব্যগ্র হইয়া শিবু প্রশ্ন করল—কি হল?

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল না। প্রসঙ্গটা সে এড়াইয়া যাইতে চায়।

শিবু কিন্তু আবার প্রশ্ন করিল—চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, সেকেলে লোক; একেলে কাণ্ড-কারখানা বুঝিও না, সহ্যও হয় না। ও-সবে আমি নাই।

কথাটা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত অশোভন নীরবতার মধ্যে কাটিবার পর চৌধুরী অন্য প্রসঙ্গ আনিবার জন্যই হাসিয়া বলিল—জল তো এবার ভাল—সকাল-সকালই বর্ষা নামল—এখন শেষ রক্ষে করলে হয়!

রহম শেখ কথা বলিবার একটা সূত্র খুঁজিতেছিল—পাইবামাত্র সে সেলাম করিয়া বলিল—সেলাম গো চৌধুরী জ্যাঠা! শেষ-রক্ষে কিন্তু হবে না—ই একেবারে খাঁটি কথা।

—সেলাম। কি রকম? শেষ-রক্ষে হবে না কি করে বলছেন শেখজী?

—পাপ। পাপের লেগে বলছি। আল্লার দুনিয়া পাপে ভরে গেল। বড়—লোকের গোড়ের তলায় দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ কুত্তার মতন লেজ নাড়ছে; পাপের আবার বাকী আছে চৌধুরী মশায়?

—তা বটে। তবে বড়লোক, গরীবলোক—সে তো আল্লাই করে পাঠান শেখজী।

—তা পাঠান, কিন্তু বড়লোকের পা চাটতে তো বলেন নাই আল্লা। এই ধরুন, আপনার মতো লোক; এককালে আপনারাও আমীর ছিলেন, জমিদার

ছিলেন। ছিরে চাষা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে—আপনি তার ভয়ে দশ-জনার ধর্মঘট আসছেন নাই। ইতে কি আল্লা দয়া করেন, না, শেষ-রক্ষে হয়?

চৌধুরী তবুও হাসিল। কিন্তু—একথার কোন উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে চলিতে বলিল—আচ্ছা, তাহলে চলি এখন।

চৌধুরী ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরি নারায়ণ, পার কর প্রভু!

একান্ত অন্তরের সঙ্গেই সে এ কামনা করিল। রহমের কথার শ্লেষ তাহাকে আঘাত করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু ওটাই একমাত্র হেতু নয়। কিছুদিন হইতেই সে জীবনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে। সে অস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন যেন গভীর এবং প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একালের সঙ্গে সে কিছুতেই আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। রীতি-নীতি, মতি-গতি, আচার-ধর্ম সব পাল্টাইয়া গেল। তাহারই পুরানো পাকা বাড়িটার মত সব যেন ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ঝুর-ঝুর করিয়া অহরহ যেমন বাড়িটার চুনবালি ঝরিয়া পড়িতেছে—তেমনিভাবেই সেকালের সব ঝরিয়া পড়িতেছে। লোক আর পরকাল মানে না, দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই, প্রবীণকে সমীহ করে না, রাজা-জমিদার-মহাজনে প্রতি শ্রদ্ধা নাই; অভক্ষ্যভক্ষণের দ্বিধা নাই। পুরোহিতের ছেলে সাহেবী ফ্যাসানে চুল ছাঁটিয়া টিকি কাটিয়া কি না করিতেছে? কঙ্কণার চাটুজ্জেদের ছেলে চামড়ার ব্যবসা করে। গ্রামের কুমোর পলাইয়াছে, কামার ব্যবসা তুলিয়া দিল, বায়েন ঢাক বাজানো ছাড়িল; ডোমে আর তালপাতা-বাঁশ হইয়া ডোম-বৃত্তি দেয় না, নাপিত আর ধান লইয়া ক্ষৌরি করে না, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে চর্বি, নুনের ভিতর মধ্যে মধ্যে হাড়ও বাহির হয়। সকলের চেয়ে খারাপ—মানুষের সঙ্গে মানুষের অমিল। প্রত্যেক লোকটিই একালে স্বাধীন—প্রধান; কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না। এই প্রজা ধর্মঘট সে-কালেও হইয়াছে, নূতন নয়, কিন্তু এইবারের ধর্মঘটের যাহা আরম্ভ—তাহার সহিত কত প্রভেদ! জমিদার সেকালে অত্যাচার করিলে বা অন্যায় দাবী করিলে ধর্মঘট হইত; কিন্তু এবার জমিদার যে বৃদ্ধি দাবী করিতেছে—চৌধুরী অনেক বিবেচনা করিয়াও সে দাবীকে অন্যায় বলিয়া একবারে উড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাহার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী একটা বৃদ্ধি জমিদারের প্রাপ্য হইয়াছে। আইনে বিশ বৎসর অন্তর জমিদার শস্য-মূল্যের বৃদ্ধি অনুপাতে একটা বৃদ্ধি পাইবার হক্‌দার। অবশ্য পরিমাণ মত পাইতে হইবে জমিদারকে। অন্যায্য দাবী করিলে—'ন্যায্য প্রাপ্যের বেশী

দিব না' একথা লোকে বলিতে পারে, কিন্তু একেবারে দিব না একথা বলিতেছে কোন্ ধর্ম-বুদ্ধিতে কোন্ বিবেচনায় ?

আপনাকে ঐ প্রশ্নটা করিয়া চৌধুরী পরক্ষণেই আপনার মনে হাসিল। ধর্ম-বুদ্ধি ? তাহাদের পুরানো বাড়িটার পলেস্তারা-খসা ইট-বাহির-করা দেওয়ালের মত মানুষ ধর্মবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া ক্ষোভ, ক্ষুধা আর স্বার্থ-সর্বস্ব দাঁতগুলিই একালে মানুষের সার হইয়াছে। ধর্ম বুদ্ধি ? তাও যদি উদরসর্বস্ব স্বার্থসর্বস্ব হইয়া পেটটাকেই ভরাইতে পারিত—তবুও একটা সান্ত্বনা থাকিত। একালে কয়টা লোকের ঘরে ভাত আছে ? জমিদারের ঘর ফাঁক হইয়া গেল, চাষীর গোলায় আর ধান ওঠে না ; সমস্ত ধান কয়টা মহাজনের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ছিরু পাল মহাজনী করিতে করিতে শ্রীহরি ঘোষ হইল—জমিদারের গোমস্তা হইল—অবশেষে পত্তনীদার হইয়া বসিয়াছে। একালকে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। এই সময় মানে মানে যাওয়াই ভাল। অন্তরের সঙ্গেই সে হরিকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিল—পার কর প্রভু !

চারিপাশ জলে ভরিয়া গিয়াছে, ও মাঠ হইতে পাশে নিচু মাঠে কলকল শব্দে জল বহিয়া চলিয়াছে। আবারও আজ আকাশে মেঘ জমিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বর্ষণও হইয়াছে। চৌধুরী সন্তর্পণে পিছল আলপথের উপর দিয়া চলিতেছিল। তাহার নিজের জমির মাথায় দাঁড়াইয়া চৌধুরী দেখিল গরু দুইটার পিঠে পাঁচন-লাঠির আঘাতের দাগ ফুটিয়া রহিয়াছে মোটা দড়ির মত। চৌধুরীর রাগ সহজে হয় না, কিন্তু গরু দুইটার পিঠের দাগ দেখিয়া সে আজ অকস্মাৎ রাগে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। রহম শেখের কথার জ্বালা—জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এমনি একটা নির্গমন পথের সুযোগ পাইয়া অগ্নি-শিখার মত বাহির হইয়া পড়িল। চৌধুরী জলভরা জমিতে নামিয়া পড়িয়া কৃষাণটার হাতের পাঁচনটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখবি ? দেখবি ?

কৃষাণটা আশ্চর্য হইয়া বলিল—ওই ! কি ? করলাম কি গো ?

—গরু দুটাকে এমনি করে মেরেছিস যে—?

চৌধুরী পাঁচন উদ্যত করিয়াছিল, কিন্তু পিছন হইতে কে ডাকিল—হাঁ, হাঁ, চৌধুরী মশায় !

চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দেখিল, দেবু ঘোষ আর একটি বাইশ তেইশ বৎসরের ভদ্রযুবা। চৌধুরী লজ্জিত হইয়াই পাঁচনটা ফেলিয়া দিল। বলিল —দেখ দেখি বাবা, গরু দুটোকে কি রকম মেরেছে দেখ দেখি ? অবোলা জীব গরু—ভগবতী !

ভদ্র যুবকটি হাসিয়া বলিল—ও লোকটার কিন্তু গরুদুটোর সঙ্গে খুব তফাত নেই চৌধুরী মশায়। তফাত কেবল—অবোলা নয়, আর ভগবতী নয়।

চৌধুরী আরও লজ্জিত হইয়া বলিল—তা বটে। ভয়ানক অন্যায় হত। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

দেবু বলিল—মহাগ্রামের ঠাকুর মশায়ের নাতি।

তৎক্ষণাৎ চৌধুরী সেই কর্দমাক্ত আলপথের উপরেই মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ও রে বাপ রে! বাপ রে! আজ আমার মহাভাগ্যি, আপনার পুণ্যেই আজ আমি মহা অন্যায় করতে করতে বেঁচে গেলাম।

বিশ্বনাথ কয়েক পা পিছাইয়া গেল, তারপর বলিল—না—না—না! এ কি করছেন আপনি!

চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিল—কেন?

—আপনি আমার দাদুর বয়সী। আপনি এভাবে প্রণাম করলে—শুধু লজ্জাই পাই না, অপরাধও স্পর্শ করে।

—আপনি এই কথা বলছেন?

—হাঁ বলছি।—বলিয়া বিশ্বনাথ তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল।

চৌধুরী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এ অঞ্চলের মহাগুরু বলিয়া পূজিত ন্যায়রত্নের পৌত্রের মুখে এ কি কথা! কিছুদিন পূর্বে শিবকালীপুরে যতীনবাবু ডেটিন্যু, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনিও তাহাকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৌধুরী সেদিন এত বিস্মিত হয় নাই, তাহার অন্তরের সংস্কারে এতখানি আঘাত লাগে নাই। সেদিন সে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল—যতীনবাবু কলিকাতার ছেলে, তাহার এ ম্লেচ্ছভাব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু ন্যায়রত্নের পৌত্র এ অঞ্চলের ভাবী মহাগুরু, তিনি যদি নিজ হইতে এই ভাবে সমাজের কর্ণধারত্ব ত্যাগ করেন—তবে কি গতি হইবে সমাজের?

দেবু অগ্রসর হইয়া বলিল—আপনার ওখানে কাল যাব চৌধুরী মশায়।

—এঁ্যা?—সচকিত হইয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিল—এঁ্যা?

—কাল আমরা আপনার ওখানে যাব।

—সে আমার ভাগ্য। কিন্তু কারণটা কি? ধর্মঘট?

—হ্যাঁ।

—আমি ও ধর্মঘটে নেই বাবা। আমাকে বাবা ক্ষমা করো।—বলিয়াই সে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল।

দেবু পিছন হইতে ডাকিল—চৌধুরী মশায়!

অগ্রসর হইতে হইতেই চৌধুরী হাত নাড়িয়া বলিল—না বাবা।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এস, পরে হবে। প্রণাম না নেওয়াতে বুড়ো চটে গেছে।

দেবু বলিল—ও কথা বলেই বা তোমার কি লাভ হল বল তো? আর প্রণাম নেবে নাই বা কেন? তুমি ব্রাহ্মণ।

—পৈতে আমি ফেলে দিয়েছি দেবু।

—পৈতে ফেলে দিয়েছ?

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—ফেলেই দিয়েছি, তবে বাক্সে রাখি। যখন বাড়ি আসি গলায় পরে নি। দাদুকে আঘাত দিতে চাই নে।

—কিন্তু সে তো প্রতারণা কর তুমি! ছি!

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল—ও আলোচনা পরে করা যাবে। এখন চল।

—না। দেবু দৃঢ়স্বরে বলিল—না। আগে ওই মীমাংসাই হোক তোমার সঙ্গে তারপর দুজনে একসঙ্গে পা ফেলব। নইলে ধর্মঘটের ভার তুমি নাও, আমি সরে দাঁড়াই। কিম্বা—তুমি সরে দাঁড়াও।

—সেটা তুমিই ভেবে দেখ। তুমি যা বলবে তাই আমি করব।—বিশ্বনাথ তখনও হাসিতেছিল।

দেবু বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ঠিক এই সময়েই তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল রহম শেখ।—আদাব গো দেবুবাবু!

চিন্তান্বিত মুখেই একটু শুধু হাসি হাসিয়া দেবু প্রত্যভিবাদন জানাইল—আদাব চাচা।

রহম বলিল—হাল ছেড়্যা আসতে লারছি, আর তুমরাও আচ্ছা গুজুর গুজুর লাগল্ছ যা হোক। তা আমাদের গাঁয়ে যাবা কবে বল দেখি?

—যাব চাচা, আজই যাব।

—হ্যাঁ। যাইও। কাল শুকুর বারে জুম্মার নামাজ হবে। মছ্জেদেই সব কায়েম হয়ে যাবে। তুমি বরং আজই উবেলাতেই যাইও, যেন ভুলিও না!

—আচ্ছা। দেবু একটু হাসিল

—আর শুন। ওই তুমাদের ঠাকুরের লাতি—উয়াকে নিয়া যাইও না। আমাদের তাসের মিয়া—জান তো তাসের মিয়ারে? কলকাতায় কলেজে পড়ে? উ বুলছিল—ঠাকুরের নাতি নাকি স্বদেশী করে। তা ছাড়া আমাদের ইরসাদ মৌলভী বুলছিল—উনি বামুন ঠাকুর মানুষ—উয়ারে তুমরা হিঁদুরা মানতি পার, আমরা মানব কেনে?

—না, না, তুমি জান না রহম চাচা—বিশু-ভাই আমাদের সে-রকম নয়। —দেবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

দুর্দান্ত রূঢ়ভাষী রহম—আন্দাজে বিশুকে চিনিয়াই কথাগুলি বলিয়াছিল—এবার সে হাসিয়া বলিল—অ! তুমিই বুঝি ঠাকুরের নাতি?

হাসিয়া বিশু বলিল—হঁ্যা।

—তুমি যাইও না ঠাকুর, তুমি যাইও না—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিল আপনার জমির দিকে।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—মীমাংসা হয়ে গেল দেবু ভাই। আমি তাহলে ফিরলাম।

দেবু কাতর দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—দরকার হলেই ডাক দিও—আমি তৎক্ষণাৎ আসব।

রিম-ঝিম বৃষ্টি নামিয়া আসিল। তাহারই ভিতর দুজনে দুজনের কাছ হইতে সামান্য দূরত্বের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রহম রূঢ় সত্য প্রকাশ করিয়া মনের আনন্দে লাঙল ঠেলিতে ঠেলিতে তখন গান ধরিয়া দিল—

> "হোসেন হাসান দুটি ভাই—এই দুনিয়ায় পয়দা হয়,
> তাদের মত খাস বান্দা এই দুনিয়ায় নাই।
> ফতেমা-মা মা-জননী—তাঁর কাহিনী বলি আমি,
> তাঁহার স্বামী হজরৎ আলি বলিয়া জানাই।"

তিন

মহুগ্রাম বা মহাগ্রাম এককালে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বহুসংখ্যক মাটির এবং ইটের বাড়ির পড়ো-ভিটা গ্রামখানির প্রাচীনত্ব এবং বিগত সমৃদ্ধির প্রমাণ-হিসাবে আজও দেখা যায়। গ্রামখানি এখনও আকারে অনেক বড়, কিন্তু বসতি অত্যন্ত ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত। মধ্যে মধ্যে বিশ-পঁচিশ, এমন কি পঞ্চাশ-ষাট ঘর বসতির উপযুক্ত স্থান পতিত হইয়া পড়িয়া আছে, খেজুর, কুল, আঁকড়, সেওড়া প্রভৃতি গাছে ও ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এগুলি এককালে নাকি বসতি-পরিপূর্ণ পাড়া ছিল। বসতি নাই কিন্তু এখনও দুই-চারিটার নাম বাঁচিয়া আছে। জোলাপাড়া ধোপাপাড়ায় একঘরও বসতি নাই; পালপাড়ায় মাত্র দুই ঘর কুমোর অবশিষ্ট; খাঁ-য়ের পাড়ায় খাঁ উপাধিধারী হিন্দু পরিবার এককালে রেশমের দালালী করিয়া সম্পদশালী হইয়াছিল; রেশমের ব্যবসায়ের পতনের সঙ্গে তাহাদের সম্পদ গিয়াছে, খাঁয়েরাও কেহ

নাই; আছে কেবল খাঁ মহাজনদের ভাঙা বাড়ির ইটের বনিয়াদের চিহ্ন। খাঁয়ের পাড়া পার হইয়া বিশ্বনাথ আপনাদের বাড়িতে আসিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন—শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন—এ অঞ্চলের মহামাননীয় ব্যক্তি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। বহুকাল হইতেই বংশটি পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার জন্য এ অঞ্চলে বিখ্যাত। দেশ-দেশান্তর হইতে তাঁহাদের টোলে বিদ্যার্থী-সমাগম হইত। এখনও টোল আছে, ন্যায়রত্নের মতো মহামহোপাধ্যায় গুরুও আছেন, কিন্তু এ-কালে বিদ্যার্থীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বাড়ির প্রথমেই নারায়ণশিলার খড়ো-ঘরের সম্মুখে খড়ের আটচালায় টোল বসে। এক পাশে লম্বা একখানি ঘরে ছাত্রদের থাকিবার ব্যবস্থা। ঘরখানি প্রকাণ্ড; সুদৃশ্য এবং মনোরম না হইলেও বাস করিবার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাই; সেকালে কুড়িজন পর্যন্ত ছাত্র এই ঘরে বাস করিত, এখন থাকে মাত্র দুইজন। বিশ্বনাথ যখন আসিয়া আটচালায় ঢুকিল তখন তাহারাও কেহ ছিল না, বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তাহাদের দুইজনকেই চাষের কাজ দেখিতে মাঠে পাঠাইয়াছেন! কেবল একটা কুকুর ন্যায়রত্নের বসিবার আসন ছোট চৌকিটার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া বাদলের দিনে পরম আরাম উপভোগ করিতেছিল। বিশ্বনাথ দেখিয়া শুনিয়া বিষম চটিয়া গেল। দাদুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি, সেই দাদুর আসনে আসিয়া বসিয়াছে একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর! এদিক-ওদিক চাহিয়া কিছু না পাইয়া সে হাতের ছাতাটা উদ্যত করিয়া কুকুরটার পিছন দিক হইতে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ভিতরবাড়ির দরজায় ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্য!

মুখ ফিরাইয়া দাদুর দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এ ব্যাটা যদি আপনার কৃষ্ণসার আশ্রমমৃগ হয় তবে ঋষিবাক্যও আমি মানব না। ব্যাটা ঘেয়ো কুকুর—

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—ও আমার কাঙালীচরণ।

কাঙালী আপন নাম শুনিয়া মুখ তুলিয়া ছত্রপাণি বিশ্বনাথকে দেখিয়াও নড়িবার নাম করিল না, শীর্ণ কাটির মত লেজটা জলচৌকির উপর আছড়াইয়া পটপট শব্দ-মুখর করিয়া তুলিল। ন্যায়রত্ন অগ্রসর হইয়া আসিতেই সে চিত হইয়া শুইয়া পা চারিটা উপরের দিকে তুলিয়া দিল। এবার বিশ্বনাথ না হাসিয়া পারিল না। ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—এক ঘা খেলেই তো মরে যেতো। যা ছাতা তুমি তুলেছিলে!

বিশ্বনাথ উদ্যত ছাতাটা নামাইয়া বলিল—মাথা রাখবার জন্য ছাতার ব্যবস্থা দাদু, ওর বাঁট আর শিক যতই মজবুত হোক—মাথা ভাঙবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মাথা ওর ভাঙত না, এক ঘা ওটাকে দেওয়াই আমার উচিত

ছিল। যাক্ গে—হঠাৎ ও ব্যাটা জুটল কি করে? কি নাম বললেন ওর?

—কাঙালীচরণ। নামটা দিয়েছি আমিই। নামেই পরিচয়, কেমন করে কোথা থেকে এসে জুটলেন উনি। কিন্তু এই বাদলা মাথায় করে গিয়েছিলে কোথায়?

—গিয়েছিলাম দেবুর সঙ্গে। বলছি। দাঁড়ান আগে জামা গেঞ্জি খুলে আসি আমি।

বিশ্বনাথ ভিতরে চলিয়া গেল।

দেবুর নামে ন্যায়রত্নের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই তিনি স্বাভাবিক প্রসন্নমুখে বাড়ির ভিতরেই চলিয়া গেলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই ন্যায়রত্ন শুনিলেন নারীকণ্ঠের কথা—আর বল না, বুড়ীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। কানে বদ্ধ কালা—বকলেও শুনতে পায় না; একবার কাপড় নিলে পনর দিনের আগে দেবে না! জবাব দিতেও মায়া লাগে।

বিশু বলিল—তাই বলে এই রকম ময়লা কাপড় পরে থাকবে! ছি!

—তা বটে। লোকজনের সামনে বেরুতে লজ্জা।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বাড়ির উঠানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং।
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।"

সখি শকুন্তলে, মধুরাণাং আকৃতিনাং মন্দনং শোভনং কিমিব ন। তোমার সুন্দর বরতনুতে এই ময়লা কাপড়খানিই অপরূপ শোভন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার দুষ্মন্ত ওতেই মুগ্ধ হয়েছেন।

বিশ্বনাথ কথা বলিতেছিল স্ত্রীর সঙ্গে। সুন্দর একটি খোকাকে কোলে করিয়া তরুণী জয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিল; সেও লজ্জিত হইয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। বিশ্বনাথও হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

শূন্য উঠানে দাঁড়াইয়া ন্যায়রত্ন আবার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল খোকাটি। সুন্দর খোকা! মনোরম একটি লাবণ্য যেন সর্বাঙ্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। বছরখানেক বয়স, সে আসিয়া বলিল—ঠাকুল!

জয়া তাহাকে শিখাইয়াছে কথাটি; প্রপিতামহ ন্যায়রত্নকে সে বলে ঠাকুর। ন্যায়রত্ন পৌত্রের সহিত ভাই সম্বন্ধ ধরিয়া প্রপৌত্রকে বলেন—বাবা, বাপি।

ছেলেটি আবার ডাকিল—ঠাকুল!

মুহূর্তে ন্যায়রত্নের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তিনি দুই হাত প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন—বাপি!

—আবা কোলো, আবা গান কোলো। অর্থাৎ আবার গান করো। ন্যায়রত্নের শ্লোক আবৃত্তির মধ্যে যে স্বরটি থাকে—শুনিয়া শুনিয়া শিশু সেই স্বরের মাধুর্যটিকে চিনিয়াছে, একবার শুনিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, সে বলে—আবা গান কোলো। ন্যায়রত্ন শিশুর অনুরোধ উপেক্ষা করেন না, আবার তিনি শ্লোক আবৃত্তি করেন। শিশুটির নাম অজয়, অজয় আবারও বলে—আবা কোলো।

ন্যায়রত্ন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরেন। আনন্দে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। তাঁহার মনে হয়—এ সেই। হারানো ধন তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্নের হারানো-ধন, তাঁহার একমাত্র পুত্র শশিশেখর, বিশ্বনাথের বাপ। সৌম্যকান্তি সুপুরুষ শশিশেখর এমনি তীক্ষ্ণধী ছিলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। শুধু হিন্দুদর্শন নয়, বৌদ্ধদর্শন, এমন কি বাপকে লুকাইয়া ইংরাজী শিখিয়া পাশ্চাত্য দর্শনও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই হইয়াছিল সর্বনাশের হেতু।

সে আমলে শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন ছিলেন আর এক মানুষ। প্রাচীন কাল এবং সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মহাকালের তপোবনরক্ষী শূলহস্ত নন্দীর মত ভ্রূভঙ্গি করিয়া তর্জনী উদ্যত করিয়া সদাজাগ্রত ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। শশিশেখরও আপনার ইংরাজী শিক্ষার কথা সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ সে কথা একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আই-সি-এস কর্মচারী হইলেও রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যানুশীলনেই বেশী অনুরাগী ছিলেন। আপন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র। ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জেলায় আসিয়া তিনি মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্নের নাম শুনিয়া একদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন ন্যায়রত্নের টোলে। সাহেবের সঙ্গে ছিলেন জেলা স্কুলের হেডমাস্টার। দোভাষীর কাজ করিবার জন্যই সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শশিশেখর তখন সবে নবদ্বীপ হইতে দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। ন্যায়রত্ন সাদর অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। শশীর কিন্তু এতটা ভাল লাগিল না। তবু সে চুপ করিয়াই রহিল। সাহেবও একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ন্যায়রত্নকে বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না ন্যায়রত্ন মশায়—

সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আপনার এখানে আসেন নি। উনি এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আলাপের ভূমিকাই হল অভ্যর্থনা। আর এটা আমার আতিথ্য-ধর্ম। রাজার দরবারে পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মান যেমন প্রাপ্য—পণ্ডিতের কাছে রাজা রাজপুরুষের সম্মানও তেমনি প্রাপ্য। এ আমার কর্তব্য।

অতঃপর আরম্ভ হইল আলাপ। আলাপ আলোচনা শেষ করিয়া সাহেব উঠিয়া হাসিয়া ইংরাজীতে হেডমাস্টারকে কি বলিলেন। মাস্টারটি ন্যায়রত্নকে কথাটা অনুবাদ করিয়া না শুনাইয়া পারিলেন না! বলিলেন—সাহেব কি বলছেন জানেন?

ন্যায়রত্ন কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশের এক যোগী-পুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম তবে এই ভারতের যোগী হবার কামনা করতাম। সাহেবও ঠিক তাই বলছেন। বলছেন যে, ইংলণ্ডে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি শিবশেখরেশ্বর হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আমার এ ব্রাহ্মণজন্ম না হলেও আমি কিন্তু এই দেশের কীটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে কামনা করতাম, অন্যত্র জন্ম কামনা করতাম না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ন্যায়রত্নের কথার মর্ম শুনিয়া হাসিয়া ইংরেজীতে মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন—ইনফিরিয়ারিটির এ এক ধারার বিচিত্র প্রকাশ! এটা যেন ভারতবাসীর প্রকৃতিগত।

মাস্টারটির মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু সাহেবের কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহার হইল না। ন্যায়রত্ন ইংরাজী বুঝিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও কথার সুর শুনিয়া ব্যঙ্গের শ্লেষ অনুভব করিলেন। তবুও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শশিশেখর দৃঢ়স্বরে ঈষৎ উষ্ণতার সহিত ইংরাজীতেই বলিয়া উঠিলেন—না ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স এ নয়। এই তার এবং ভারতীয় মনীষীদের অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যা মনের অতিরিক্ত কিছু বোঝে না—বিশ্বাস করে না, আমরা মনের সীমানা অতিক্রম করে অন্তর এবং আত্মাকে বিশ্বাস করি। মন ও চিত্তকে জয় করে আত্মোপলব্ধির সাধনাই আমাদের সাধনা। আমাদের আত্মাকে মন পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত। সুতরাং তোমাদের মনোবিশ্লেষণে আমাদের ভারতীয় সাধক মনীষীদের কম্‌প্লেক্স বিচার মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহেব সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মাস্টারটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, রাজপুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টিকেও তিনি বিশ্বাস করেন না। ন্যায়রত্ন বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন শশী ম্লেচ্ছভাষায় অবলীলাক্রমে কথা বলিয়া গেল! শশীর মুখে ম্লেচ্ছভাষা!

এই লইয়াই পিতাপুত্রে বিরোধ বাধিয়া গেল।

ন্যায়রত্ন কালধর্মকে শিবের তপোবনে ঋতুচক্রের আবর্তনকে ঠেকাইয়া রাখার মত দূরে রাখিয়া সনাতন মহাকালধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু অকস্মাৎ দেখিলেন—কখন কোন এক মুহূর্তে সেখানে অকাল বসন্তের মত কালধর্ম বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারই ঘরে শশীর মধ্য দিয়া ম্লেচ্ছ বিদ্যার ভাবধারা সনাতন মহাকালধর্মকে ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অপর দিকে শশিশেখর, এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ফলে, সঙ্কোচশূন্য হইয়া আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসংস্কৃতিমত জীবন নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

তারপর সে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি। ন্যায়রত্ন শূলপাণি নন্দীর মতই কঠিন নির্মম হইয়া উঠিলেন। শশিশেখর স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিল। ন্যায়রত্ন তাহাকে বাধা দিলেন না। কিন্তু বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুত্রবধূ ও পৌত্রকে লইয়া যাইতে দিলেন না। সংকল্প করিলেন, শশী যে সংস্কৃতির ধারাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে সেই ধারাকে সংস্কার করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন ঐ পৌত্রকে ; এক বৎসর পরে ঘটিল এই ঘটনার চরম পরিণতি। এক পণ্ডিত-সভায় পিতা-পুত্রে শাস্ত্রবিচার লইয়া বিতর্ক উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ্য বিরোধ বাধিয়া গেল। শশিশেখরের সেই দীপ্ত চক্ষু, স্ফুরিত অধর, প্রতিভার বিস্ফোরণ আজও ন্যায়রত্নের চোখের উপর ভাসে। তাঁহার চোখে জল আসে।

সভার শেষে পিতা পুত্রকে বলিলেন—আজ থেকে জানব আমি পুত্রহীন। সনাতন ধর্মকে যে আঘাত করতে চেষ্টা করে, সে ধর্মহীন। ধর্মহীন পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা বরণীয় কল্যাণ আর কিছু কামনা করিতে পারি না আমি।

শশীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল—তা হলেই কি সনাতন ধর্ম রক্ষা হবে আপনার?

—হবে?

সেইদিনই শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন পুত্রহীন হইয়া গেলেন। শশিশেখর আত্মহত্যা করিল।

শিবশেখরেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া কিছুকালের জন্য যেন সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। মদন ভস্ম করিয়া মহাকাল—অন্তর্হিত হইলে নন্দার যেমন অবস্থা হইয়াছিল—ন্যায়রত্নেরও তেমনি অবস্থা হইল। তারপর অকস্মাৎ একদা

তিনি মহাকালকে—ওই নন্দীর মতই গিরিভবন-পথে বরবেশী মহাকালকে আবিষ্কারের মতই—আবিষ্কার করিলেন। কালের পরিবর্তনশীলতাকে মহাকালের লীলা বলিয়া যেন প্রত্যক্ষ করিলেন। সতীপতি মহাকাল সেই লীলায় গৌরীপতি; কিন্তু সেইখানেই কি তাঁহার লীলার শেষ হইয়া গিয়াছে? এককালে তাই তিনি বিশ্বাস করিতেন বটে। কিন্তু আজ অনুভব করেন—সতী গৌরীরূপিণী মহাশক্তি কত নূতন রূপে মহাকালকে বরণ করিয়াছেন, কিন্তু সে লীলা প্রত্যক্ষ করিবার মত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাসদেব আবির্ভূত হইয়া আর নব পুরাণ-রচনা করেন নাই।

বিশ্বনাথের পড়িবার বয়স হইতেই তিনি বিশ্বনাথকেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—দাদুর কোথায় পড়তে মন? আমার টোলে—না কঙ্কণার ইস্কুলে?

ছয়-সাত বয়সের বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—বাড়িতে তোমার কাছে পড়ব দাদু আর ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাব। টোলের নামও করে নাই।

ন্যায়রত্ন সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।···বিশ্বনাথ আজ এম-এ পড়ে। ন্যায়রত্নের স্ত্রী মারা গিয়াছেন, পুত্রবধূ বিশ্বনাথের মা-ও নাই। বিশ্বনাথের বিবাহ দিয়া ন্যায়রত্ন আজ সংসার করিতেছেন, আর কালধর্মকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধ দ্রষ্টার মত তাঁহার চরণক্ষেপের দিকে চাহিয়া আছেন।

কিন্তু তবু আজ দুই দুইবার তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। বিশ্বনাথ এ কি করিতেছে? স্থানীয় বৈষয়িক গণ্ডগোলে আপনাকে জড়াইতেছে কেন? নিরস্ত হইবার জন্যই তিনি ঘরে গিয়া পুঁথি লইয়া বসিলেন। সমস্ত দুপুর চিন্তা করিয়াও তিনি নিরস্ত এবং নিস্পৃহ হইতে পারিলেন না। অপরাহ্ণে পৌত্রের ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন—বিশু!

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল শিশু অজয়—ঠাকুর! কোলে চাপি বাড়ি যাই।—বাড়ি যাই অর্থাৎ বাহিরে যাই।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন—বিশ্বনাথ ঘরে নাই। অজয়কে কোলে তুলিয়া লইয়া পৌত্রবধূকে প্রশ্ন করিলেন—হলা রাজ্ঞী শউন্তলে! রাজা দুষ্মন্ত কোথায় গেলেন?

হাসিয়া মাথার ঘোমটা অল্প বাড়াইয়া দিয়া জয়া বলিল—কি জানি কোথায় গেলেন।

ন্যায়রত্ন অজয়কে আদর করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তোমার সংসার-জ্ঞান আর কখনও হবে না। —বলিয়া প্রপৌত্রকে পৌত্রবধূর কোলে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন চণ্ডীমণ্ডপে। বিশ্বনাথ নাটমন্দিরেই বসিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—বিশ্বনাথ!

'বিশ্বনাথ' ডাকে বিশ্বনাথ চকিত হইয়া উঠিল। দাদু তাহাকে ডাকেন 'দাদু' বা 'বিশু' নামে অথবা সংস্কৃত নাটক-কাব্যের নায়কদের নামে—কখনও ডাকেন রাজন, কখনও রাজা দুষ্মন্ত, কখনও অগ্নিমিত্র ইত্যাদি—যখন যেটা শোভন হয়। বিশ্বনাথ নামে দাদু কখনও ডাকিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। চকিত হইয়া সে সসম্ভ্রমেই উত্তর দিল—আমাকে ডাকছেন?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত আছ কি?

ন্যায়রত্ন অকস্মাৎ আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্র শশিশেখরের আত্মহত্যার পর হইতে তিনি নিরাসক্তভাবে সংসারে বাস করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। স্ত্রী বিয়োগে তিনি এককোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই, এমন কি মনের গোপনতম কোণেও একবিন্দু বেদনাকে জ্ঞাতসারে স্থান দেন নাই। তারপর পুত্রবধূ মারা গেলে—সেদিনও তিনি অচঞ্চলভাবেই আপনার কর্তব্য করিয়াছিলেন। নিজে হাতে রান্না করিয়া দেবতার ভোগ দিয়াছেন, পৌত্র বিশ্বনাথকে খাওয়াইয়াছেন, গৃহকর্ম করিয়াছেন; স্থিরতা কখনও হারান নাই। আজ কিন্তু অন্তরে অস্থির, বাহিরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এখানে যে প্রজা-ধর্মঘট লইয়া আন্দোলন উঠিয়াছে—সে সংবাদ বিশ্বনাথ কলিকাতায় বসিয়া কেমন করিয়া পাইল? এবং প্রজা-ধর্মঘটে সে কেন আসিল?

তাহার এই আসা রথযাত্রা উপলক্ষে হইলেও ধর্মঘটের ব্যাপারটাই যে এই আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য একথা স্পষ্ট। দেশ-কালের পরিচয় তাঁহার অজ্ঞাত নয়, রাজনীতিক আন্দোলনের সংবাদ তিনি রাখিয়া থাকেন; দেশের বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ধীরে ধারে প্রজা-জাগরণের মধ্যে কেমন করিয়া সঞ্চারিত হইতেছে —তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই আজ দেবু ঘোষের সহিত বিশ্বনাথের এই যোগাযোগে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। অকস্মাৎ অনুভব করিলেন যে, এতকালের নিরাসক্তির খোলসটা আজ যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, কখন আবার ভিতরে ভিতরে আসক্তির নূতন ত্বক সৃষ্ট হইয়া নিরাসক্তির আবরণটাকে জীর্ণ পুরাতন করিয়া দিয়াছে।

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—বাঁকা কথা কয়ে লাভ নেই দাদু—আমি সোজা কথাই বলতে চাই। প্রজা-ধর্মঘটের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? দেবু ঘোষের এই হাঙ্গামার খবর তোমাকে জানালেই বা কে?

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আজকাল টেলিগ্রাফের কল এখানে টিপ্‌লে

হাজার মাইল দূরের কল সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, আর কলকাতায় খবরের কাগজ বের হয় দুবেলা। তা ছাড়া আপনি তো জানেন যে, দেবু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।

—আমি তো বলেছি বিশ্বনাথ, আমি সোজা কথা বলছি, উত্তরে তোমাকেও সোজা কথা বলতে অনুরোধ করছি। আর আমার ধারণা তুমি অন্তত আমার সামনে সত্য কখনও গোপন কর না।

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর আন্তরিকতায় গভীর ও গম্ভীর। বিশ্বনাথ পিতামহের দিকে চাহিল—দেখিল মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পূর্বে ন্যায়রত্নের এ মুখ দেখিলে এ অঞ্চলের সকলেই অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র শশিশেখর পর্যন্ত এ মূর্তির সম্মুখে চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। পিতার সহিত, তিনি বিদ্রোহ করিয়াছেন তর্ক করিয়াছেন—কিন্তু সে সবই করিয়াছেন নতমুখে মাটির দিকে চোখ রাখিয়া। ন্যায়রত্নের সেই মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—কথার উত্তর দাও ভাই!

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার কাছে মিথ্যে কখনও বলিনি, বলবও না। এখানে—মানে, ওই শিবকালীপুর গ্রামে—একজন রাজবন্দী ছিল জানেন? যাকে এখান থেকে ক'দিন হল সরিয়ে দিয়েছে? খবর দিয়েছিল সে-ই।

—তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

—আছে।

—তাহলে—ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—তোমরা তাহলে একই দলভুক্ত?

—এককালে ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা ভিন্ন মত ভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করেছি।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমাদের মত, তোমাদের আদর্শ টা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার বিশ্বনাথ?

পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—আমার কথায় আপনি কি দুঃখ পেলেন দাদু?

—দুঃখ?—ন্যায়রত্ন অল্প একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন—সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া সহজ সাধনার কাজ নয় ভাই। দুঃখ একটু পেয়েছি বই কি।

—আপনি দুঃখ পেলেন দাদু! কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। সংসারে যারা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদেরই একজন হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই বলে দুঃখ পেলেন?

—বিশ্বনাথ, দুঃখ পাব না, সুখ অনুভব করব না, এই সংকল্পই তো শশীর মৃত্যুর দিন গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু জয়াকে যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলাম, আজ মনে হচ্ছে সেইদিন শৈশব কালের মত গোপনে চুরি করে আনন্দরস পান করেছিলাম—তারপর এল অজুমণি, অজয়। আজ দেখছি—শশীর মৃত্যুদিনের সংকল্প আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। জয়া আর অজয়ের জন্যে চিন্তার, দুঃখের যে সীমা নেই।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিল।

ন্যায়রত্নও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তোমার আদর্শের কথা তো আমাকে বললে না ভাই ?

—আপনি সত্যিই শুনতে চান দাদু ?

—হ্যাঁ, শুনব বই কি।

বিশু আরম্ভ করিল—তাহার আদর্শের কথা, অর্থাৎ মতবাদের কথা। ন্যায়রত্ন নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন, একটি কথাও বলিলেন না। রুশ দেশের বিপ্লবের কথা, সে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এই আমাদের আদর্শ দাদু। কম্যুনিজম্, মানে সাম্যবাদ।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমাদের ধর্মও তো অসাম্যের ধর্ম নয় বিশ্বনাথ। যত্র জীব তত্র শিব, এতো আমাদেরই কথা, আমাদের দেশের উপলব্ধি।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম দাদু, শুনেছিলাম শিবময় কাশী। দেখলাম সত্যিই তাই। বিশ্বনাথ থেকে আরম্ভ করে মন্দিরে, মঠে, পথে, ঘাটে, কুলুঙ্গীতে শিবের আর অন্ত নাই, অগুন্তি শিব। কিন্তু ব্যবস্থায় দেখলাম বিশ্বনাথের বিরাট রাজসিক ব্যবস্থা—ভোগে, শৃঙ্গারবেশে, বিলাসে, প্রসাধনে—বিশ্বনাথের ব্যবস্থা বিশ্বনাথের মতই। আবার দেখলাম কুলুঙ্গিতে শিব রয়েছেন—গুণে চারটি আতপ চাল আর একটি বেলপাতা তাঁর বরাদ্দ। আমাদের দেশের 'যত্র জীব তত্র শিব' ব্যবস্থাটা ঠিক ওই রকম ব্যবস্থা। সেইজন্যেই তো এখানে-ওখানে ছড়ানো ছোটখাটো শিবদের নিয়ে বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান!

—থাক্ বিশ্বনাথ, ধর্ম নিয়ে রহস্য করো না ভাই; ওতে অপরাধ হবে তোমার।

—অঙ্কশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্রই আমাদের সর্বস্ব দাদু, ধর্ম আমাদের—

—উচ্চারণ কর না বিশ্বনাথ—উচ্চারণ কর না!

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বরে বিশ্বনাথ এবার চমকিয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের আরক্তিম মুখে-চোখে এবার যেন আগুনের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুকালের নিরুদ্ধ

আগ্নেয়গিরির শীতল গহ্বর হইতে যেন শুধু উত্তাপ নয়, আলোকিত ইঙ্গিতও ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারিতেছে।

নারায়ণ, নারায়ণ।—বলিয়া ন্যায়রত্ন উঠিয়া পড়িলেন। বহুকাল পরে তাঁহার খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময়েই জয়া অজয়কে কোলে করিয়া বাড়ি ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নাতি-ঠাকুর্দায় খুব তো গল্প জুড়ে দিয়েছেন, এদিকে সন্ধ্যে যে হয়ে এল!

চার

কয়েকদিন পর দেবু চলিয়াছিল কুসুমপুর।

পাঁচখানা গ্রাম—মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া-দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা এই লইয়া এককালে হিন্দুসমাজের পঞ্চগ্রাম গঠিত ছিল। তারপর কবে, কেমন করিয়া সমগ্র কুসুমপুর পুরাপুরি মুসলমানের গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। হিন্দু সামাজিক বন্ধন হইতে কুসুমপুর দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবুও একটা নিবিড় বন্ধন ছিল কুসুমপুরের সঙ্গে। এককালে কুসুমপুরের মিঞা-সাহেবরাই এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। কুসুমপুরের মিঞাদের প্রদত্ত লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তরের জমি এ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ এবং বহু দেবস্থান আজও ভোগ করিতেছে। আবার কুসুমপুরের প্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটির নিম্নাংশ যে এককালে কোন দেব-মন্দির ছিল—সে কথা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। ধর্ম কর্ম, পাল-পার্বণ এবং বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে দুই সমাজের মধ্যে নিমন্ত্রণ এবং লৌকিকতার আদান-প্রদানও ছিল; বিশেষ করিয়া বিবাহাদি ব্যাপারে দুই পক্ষের সহযোগিতা ছিল নিবিড়। সেকালে মিঞাসাহেবদের পাল্কী ছিল চার-পাঁচখানি। এ অঞ্চলের যাবতীয় বিবাহে সেই পাল্কীই ব্যবহৃত হইত। সামিয়ানা, সতরঞ্চি মিঞাদের বাড়ি হইতেই আসিত। বিবাহে মিঞারা লৌকিকতা করিতেন। বিবাহ-বাড়ি হইতে নিমন্ত্রিত মিঞাসাহেবদের বাড়িতে অধিকাংশ স্থলেই পানসুপারী এবং চিনির সওগাত পাঠান হইত; ক্ষেত্রবিশেষে অবস্থাপন্ন হিন্দুর বাড়ি হইতে যাইত সিধা—ঘি, ময়দা, মাছ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। মিঞাসাহেবদের বাড়ির বিবাহ-উৎসবে হিন্দুদের বাড়িতেও অনুরূপ উপঢৌকন আসিত। হিন্দুদের পূজা-অর্চনায়, পূজার ব্যাপার চুকিয়া গেলে, মুসলমানেরা প্রতিমা দেখিতে আসিত, বিসর্জনের মিছিলে যোগ দিত, এককালে মিঞাসাহেবদের দলিজার সম্মুখ পর্যন্ত বিসর্জনের মিছিল যাইত, মিঞাসাহেবরা

প্রতিমা দেখিতেন, হিন্দুদের জন্য সেখানে তামাকের বন্দোবস্ত থাকিত। মুসলমানদের মহরমের মিছিলও হিন্দুদের গ্রামে আসিত, তাজিয়া নামাইয়া তাহারা লাঠি খেলিত, তামাক খাইত। সে-কালে হিন্দুদের পূজা-পার্বণে বাদ্যকর, প্রতিমা-বিসর্জনের-বাহক, নাপিত, পরিচারক প্রভৃতিদের, মিঞাসাহেবদের সেরাস্তায় পার্বণী বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের অনেক বাড়িতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালদের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। লাঠিয়ালদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই থাকিত। পীরের দরগায় হিন্দুবাড়ির মান্‌সিক চিনি-মিষ্টির নৈবেদ্যের রেওয়াজ এখনও একেবারে যায় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য দেখুড়িয়া কালীবাড়িতে মুসলমান রোগী আজও আসিয়া থাকে।

বর্তমান কালে কিছুদিন হইতে এসব কথা ক্রমে লোপ পাইতেছে বিশেষ করিয়া এই ভোটপ্রথা প্রচলিত হইবার পর। ইহা ছাড়া কারণ অবশ্য লোকের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি; মিঞারা আজ প্রায় সর্বস্বান্ত। অন্যান্য হিন্দু-মুসলমানের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিয়াছে। যাহাদের নূতন অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাদেরও ধারা-ধরন নূতন রকমের। আপনাদের সমাজ, আপনাদের জাতির মধ্যেও তাহাদের বন্ধনটা নিতান্তই লৌকিক। এখানকার দেশকাল সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তবুও বন্ধন কিছু আছে, সেটুকু গ্রাম্য-জীবন-যাপন করিতে হইলে ছিন্ন করা অসম্ভব। সমস্তটুকুই চাষের ব্যাপার লইয়া। কামার-ছুতারের বাড়িতে এখনও বর্ষার সময় দুই দল ভিড় করিয়া একত্র বসে—গল্প করে। জমিদারের কাছারীতে কিস্তির সময় পাশাপাশি বসিয়া খাজনা দেয়, অজন্মার বৎসর খাজনা ও সুদ লইয়া উভয় পক্ষ একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া জমিদার সেরেস্তায় একসঙ্গে দাবী উত্থাপন করে। যাত্রা ও কবিগানের আসরে উভয় পক্ষ ভিড় করিয়া আসে! কঙ্কণার বাবুদের থিয়েটার দেখিতে দুই পক্ষের ভদ্র শিক্ষিতেরা সমবেত হন। অম্বুবাচী উপলক্ষে চাষীদের যে সার্বজনীন কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের চাষীরাই যোগদান করে। হিন্দুর আখড়ায় মুসলমান লড়িতে আসে, মুসলমানদের আখড়ায় হিন্দুরা যায়। তবে আজকাল একটু সাবধানে দল বাঁধিয়া যায়। মারামারি হইবার ভয়টা যেন ইদানীং বাড়িয়াছে। উভয় পক্ষের গানের দলের প্রতিযোগিতা এখনও হয়। হিন্দুরা গায় ঘেঁটুগান, মুসলমানদের আছে আলকাটার কাপ, মেরাচিনের দল! মনসার ভাসানের গান দুইদলেই গায়।

বর্তমানে কুসুমপুরের চামড়ার ব্যবসায়ী দৌলত শেখ সর্বাপেক্ষা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। শেখ ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার। গ্রামে ঢুকিতেই পড়ে তাহার দলিজা।

সে আপনার দলিজায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, পথে দেবুকে দেখিয়া সে ডাকিল—আরে দেবু পণ্ডিত নাকি ? কুথাকে যাবে বাপজান ? আরে শুন শুন !

দেবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া আসিল। দৌলত শেখ সহৃদয়তার সঙ্গেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দলিজায় বসাইল। তারপর বিনা ভূমিকায় সে বলিল—ই কাম তুমি ভাল করছ না বাপজান।

দেবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শেখের দিকে চাহিল। শেখ বলিল—খাজনা বৃদ্ধি নিয়া হাঙ্গামা করছ, ধর্মঘট বাধাইছ—ই কাম তুমি ভাল করছ না।

সবিনয়ে হাসিয়া দেবু বলিল—কেন ?

দাড়িতে হাত বুলাইয়া দৌলত বলিল– আপন কামে কলকাতা গেছিলাম। লাটসাহেবের মেম্বরদের সঙ্গে মুলাকাত হয়েছিল আমার। আমার মক্কেল আমারে নিয়া গেছিল মিনিস্টরের বাড়ি। হক সাহেবের পেয়ারের লোক মুসলমান মিনিস্টর, তাঁর বাড়ি। আমি শুধালাম। মিনিস্টর আমারে বললেন মিটমাট করে নিবার লেগে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। দৌলতই বলিল—তুমি বহুত কৈজতে পড়বা পণ্ডিত, ই কাম তুমি করিও না। শেষ-মেষ সকল হুজ্জত তোমার উপর গিয়ে পড়বে। বেইমানরা তখন ঘরের কোণে জরুর আঁচল ধরে গিয়ে বসবে। মিনিস্টার আমারে বললেন—সরকারী আইনে যখন জমিদার বৃদ্ধি পাবার হক্‌দার হইছে, তখন ঠেকাবে কে ? তার চেয়ে মিটমাট করে নেন গিয়া—সেই ভাল হবে। হুজ্জত বাধাইলে সরকারের ক্ষতি সরকার সহ্য করবে না।

দেবু এবার বলিল—কিন্তু যে বৃদ্ধি জমিদার দাবী করছেন, সে দিতে গেলে আমাদের থাকবে কি ? আমরা খাব কি ?

দৌলত মৃদুস্বরে বলিল—ঘোষের সাথে আমি কথা বলেছি বাপজান। আমারে ঘোষ পাকা কথা দিছে। তুমি বল—তুমারও আমি সেই হারে করে দিব। টাকায় আনা। ব্যস ! দৌলত অত্যন্ত বিজ্ঞের মত হাসিতে লাগিল।

—তাতে তো আমরা এক্ষুণি রাজী। আজই আমি ডেকে বলছি সব—

বাধা দিয়ে দৌলত বলিল—সবার কথা বাদ দিতে হবে, ই আমি তুমার কথা বুলছি।

দেবু এবার সমস্ত কথা এক মুহূর্তে বুঝিয়া লইল। সে ঈষৎ হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—মাফ করবেন চাচা, একলা মিটমাট আমি করব না। আপনি চার পয়সা বলছেন ?—আমি জানি, এদের পক্ষ আমি যদি ছেড়ে দি—শ্রীহরি টাকায় এক পয়সা বৃদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে মিটমাট করবে, কিন্তু সে আমি পারব না। —দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল।

দৌলত তাহার হাত ধরিয়া বলিল—বস, বাপজান বস!

দেবু বসিল না, কিন্তু হাতও ছাড়াইয়া লইল না; দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—বলুন।

দেখ বাপ, আমার বয়স তিন কুড়ি হয়ে গেল—দুনিয়ার অনেক দেখলাম, অনেক শুনলাম। ই কাম তুমি করিয়ো না দেবু। আমি তোমাকে বলছি, ই কাম তুমি করিয়ো না। শুন দেবু, দুনিয়াতে মানুষ বড় হয় ধনদৌলতে, আর বড় হয় আপনার এলেমে। ভাল কাম যে করে, আল্লা তাকে বড় করে। বাপজান, প্রথম বয়সে খালি পায়ে ছাতা মাথায় বিশ কোশ হেঁটেছি—মুচিদের বাড়ি গিয়ে খাল কিনেছি, জমিদারে সেলাম ঠুকেছি, তুমার লগ্দিরে বুলেছি চাচা। আজ আল্লার মেহেরবানিতে ক্ষেত-খামার করলাম—নগদ টাকা জমালাম—এখন যদি আমারে আমি কদর না করি, তবে দশজনা ছোট আদমিতেই বা আমার খাতিরও করবে কেনে, আর আল্লাই বা আমার উপর মেহেরবানি রাখবে কেনে? তোমার গাঁয়ের ঘোষেরে দেখ, দেখ তার চাল-চলন। আরও শুন, কঙ্কনার মুখুর্জাদের কর্তার সবে তখন ব্যবসার পত্তন। তখন মুখুর্জা রায়বাবুদের, বাঁড়ুজ্জা বাবুদের সালাম বাজাত, পায়ের ধুলা নিত। আবার দেখলাম—লাখ-টাকা রোজগার করলে, মুখুর্জাকর্তাই মুলুকের সেরা আদমি হল; তখুনি নিজে বসত চেয়ারে, রায়বাবুদের বসতে দিত তক্তপোশে! ইজ্জত রাখতে হয়। বাপজান, তুমার বেটা গেছে—বহুত মাশুল তুমি দিছ, তার জন্যে দশজনা তুমাকে ধন্যি করছে। আমীর রইস থেকে ছোটলোক সবাই ভাল বুলছে। এই সময় নিজের ইজ্জত তুমার নিজেকে বুঝতে হবে। ছোটলোক হারামীদের সাথে উঠা-বসা তুমি করিও না। কঙ্কণার বাবু, পেসিডেন্ বাবু বুলছিল—দেবু ঘোষ যদি ইহার বোডে দাঁড়ায় তবে মুশকিল করবে। বোডে দাঁড়াও তুমি। ব্যবসা-পাতি কর, এখুন তুমাকে খাতির করে বহুত মাহাজন মাল দিবে; আমি বুলছি দিবে! সাদি কর, ঘর-সংসার কর।

দেবু ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইল। অভিবাদন করিয়া বলিল—সেলাম চাচা, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।

দৌলত এবার স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল—তুমি ব্যবসা কর, শ্রীহরি ঘোষ মাহাজনের কাছে তোমার লাগি জামিন থাকবে।

হাত জোড় করিয়া দেবু বলিল—সে হয় না চাচা, কিছু মনে করবেন না আপনি।

সে আসিয়া উঠিল চাষী মুসলমানদের পাড়ায়। সেখানে তখন অনেকে জুটিয়াছে। সমবেত হওয়ার আনন্দে উৎসাহে তাহারা তাহাদের পাড়ার

গানের-দলটাকে লইয়া গান-বাজনার ব্যবস্থাও করিয়াছে। শ্রমিক ও শ্রমিক-চাষীদের গান-বাজনার দল। পশ্চিম-বাংলায় এই ধরনের দলকে বলে—ছ্যাঁচড়ার দল। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে ধুয়া ধরিয়া গান গাহিতেছিল. মূল গায়েন ইট-পাড়াইয়ের ঠিকাদার ওস্মান—মূল গানটা গাহিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের বহু প্রাচীন কালের গান। ছেলেগুলি ধুয়া গাহিতেছে—

"—সজনি লো—দেখে যা—এত রেতে চরকায় ঘর্‌ঘরনী—
সজনি—লো—!"

ওসমান গাহিয়া চলিয়াছিল—

"কোন্ সজনি বলে রে ভাই চরখার নাইক হিয়া—
চরখার দৌলতে আমার সাতটি বেটার বিয়া।
কোন্ সজনী বলে রে ভাই চরখার নাইক পাঁতি—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি।
কোন্ সজনী বলে রে ভাই চরখার নাইক নোরা—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা ঘোড়া।"

দেবু আসিতেই গান থামিয়া গেল। কয়েকজন একসঙ্গেই বলিল—এই যে, আসুন—পণ্ডিত সাহেব আসুন।

রহম বলিল—বুড়ো শয়তান তুমাকে কি বুলছিল চাচা?

দেবু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

চাষীদের মাতব্বর, কুসুমপুর মক্তবের শিক্ষক ইরসাদ বলিল—বসেন ভাই সাহেব। দৌলত শেখ যা বুলছিল—সে আমরা জানি। আমাদের গাঁয়ে মজলিসের কথা শুনে—ছিরু ঘোষও যে এসেছিল আজ দৌলত শেখের কাছে।

দেবু এ কথার কোন উত্তর দিল না।

ইরসাদ বলিল—আপনি বুড়াকে কি বললেন?

—ওর কথা থাক্ ভাই ইরসাদ। এখানে আমাকে ডেকেছেন যার জন্যে, সেই কথা বলুন।

ইরসাদ স্থির দৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উদ্ধত দুর্ধর্ষ রহম মুহূর্তে উগ্র উত্তেজনায় উঠিয়া বলিল—আলবাৎ বুলতে হবে তুমাকে।

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না।

—আল্‌বাৎ বুলতে হবে।

দেবু এইবার প্রশ্ন করিল ইরসাদকে—ইরসাদ ভাই?

ইরসাদ রহমকে ধমক দিয়া বলিল—রহম চাচা, করছ কি তুমি? বস, চুপ করে বস।

রহম বসিল, কিন্তু দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া আপন মনেই বলিল—যে হারামী বেইমানী করবে, তার নলীটা আমি দু ফাঁক করে ময়ূরাক্ষীর পানিতে ভাসায়ে দিব হ্যাঁ! যা থাকে আমার নসীবে।

দেবু এবার হাসিয়া বলিল—সে যদি করি রহম চাচা, তবে তুমি তাই করো। সে সময়ে যদি চেঁচাই কি তোমাকে বাধা দি, তবে আজকের কথা তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও। আমি তোমাকে বাধা দেব না; চেঁচাব না, কাঁদব না, গলা বাড়িয়ে দেব।

সমস্ত মজলিশটা স্তব্ধ হইয়া গেল। ছ্যাচড়ার দলের ছোকরা কয়টি বিড়ি টানিতে টানিতে মৃদুস্বরে রসিকতা করিতেছিল—তাহারা পর্যন্ত সবিস্ময়ে দেবু ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। অনুত্তেজিত শান্ত স্বরে উচ্চারিত কথা কয়টি শুনিয়া সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল—এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে আশ্চর্য সে এক মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। ওই কথাগুলা বলিয়া মানুষ এমন করিয়া হাসিতে পারে? রহম যে রহম, সেও একবার দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া, পরমুহূর্তেই মাথাটা নিচু করিল, এবং অকারণে নখ দিয়া মাটির উপর হিজিবিজি দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর ইরসাদ বলিল—আপনি কিছু মনে করবেন না দেবু-ভাই। রহম চাচাকে তো আপনি জানেন।

—না—না—না, আমি কিছু মনে করি নাই।—দেবু হাসিল। এখন কাজের কথা বলুন ইরসাদ ভাই। রাত্রি অনেক হয়ে গেল।

ইরসাদ বিড়ি বাহির করিয়া দেবুকে দিল; দেবু হাসিয়া বলিল—ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছেন?—ইরসাদ নিজে একটা বিড়ি ধরাইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি ফকির হয়ে গেলেন দেবু-ভাই।

খাজনা-বৃদ্ধি সম্পর্কিত কথাবার্তা শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল। কথা হইল, কুসুমপুরের মুসলমান প্রজারা আলাদাভাবেই ধর্মঘট করিবে; হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক এইটুকু থাকিল যে, পরস্পরে পরামর্শ না করিয়া কোন সম্প্রদায় পৃথকভাবে জমিদারের সঙ্গে মিটমাট করিতে পারিবে না। মামলা-মকদ্দমায় দুই পক্ষেরই পৃথক উকীল থাকিবেন, তবে তাঁহারাও পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন।

ইরসাদ বলিল—সদরে নূরউল মহম্মদ সাহেবকে জানেন তো? আমাদের

জেলার লীগের সভাপতি ; উনাকেই আমরা ওকালতনামা দিব। আমাদের সুবিধা করে দিবেন।

—বেশ, তাই হবে। আজ তাহলে আমি উঠি !···বলিয়া কথা শেষ করিয়া দেবু উঠিল।

—রাত্রি অনেক হয়েছে দেবু-ভাই, দাঁড়ান, আলো নিয়ে লোক সঙ্গে দি আপনার।

—দরকার হবে না। বেশ চলে যাব আমি।

—না, না। বর্ষার সময়, আঁধার রাত, সাপ-খোপের ভয়। তা ছাড়া তোমার ঘোষকে বিশ্বাস নাই। ঘোষের সাথে দৌলত শেখ জুটেছে। উঁহু !

সম্মুখের প্রাঙ্গণটায় লোকজন তখনও দাঁড়াইয়াছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল রহম চাচা, এক হাতে হ্যারিকেন, অন্য হাতে একগাছা লাঠি।—আমি যাচ্ছি ইরসাদ, আমি যাচ্ছি। চল বাপজান।—বলিয়া সে একমুখ হাসিল।

রহম দুর্দান্ত গোঁয়ার হইলেও চাষীদের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তাহার পক্ষে এইভাবে কাহাকেও আগাইয়া দেওয়া অগৌরবের কথা। দেবু ব্যস্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না না, চাচা,—সে কি, তুমি কেন যাবে ?

—আরে বাপজান, চল। দেখি তুমার দৌলতে যদি পথে ঘোষ কি শেখের লোকজনের সাথে মুলাকাত হয় তো একপ্যাঁচ আমুতির লড়াই করে লিব।··· সে পরম গৌরবে হাসিতে আরম্ভ করিল। দেবু আর আপত্তি করিল না। ইরসাদও বাধা দিল না। অন্যায় সন্দেহে আকস্মিক ক্রুদ্ধ-মুহূর্তে সে দেবুকে যে কটু কথা বলিয়াছে, তাহারই অনুশোচনায় সে এমনভাবে লাঠি-আলো লইয়া এই রাত্রে দেবুর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছে ; আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও 'মাফ কর' কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই ; সে তাই মমতাময় অভিভাবকের মত আপনার সকল সম্মান খর্ব করিয়া তাহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া বুঝাইতে চায়—সে তাহাকে কত ভালবাসে, সে তাহার কত বড় আত্মীয় !

ইরসাদ বলিল—যাও চাচা—তাই তুমিই যাও।···

মাঠে পড়িয়াই রহম উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

"কালো বরণ মেঘ রে, পানি নিয়া আয়
আমার জান জুড়ায়ে দে।"

হাসিয়া দেবু বলিল—আর জল নিয়ে করবে কি চাচা ? মাঠ যে ভেসে গেল।

রহম একটু অপ্রস্তুত হইল। চাষের সময় এই মাঠের মধ্যে তাহার এই গানটাই মনে আসিয়া গিয়াছে। বলিল—ব্যাঙের সাদীর গান চাচা! বলিয়াই আবার দ্বিতীয় ছত্র ধরিল—

"বেঙীর সাদী দিব রে মেঘ, ব্যাঙের সাদী দিব,
হুড়-হুড়ায়ে দে-রে জল, হুড়-হুড়ায়ে দে।
আমার জান জুড়ায়ে দে।"

আষাঢ়-শ্রাবণে অনাবৃষ্টি হইলে এ অঞ্চলে ব্যাঙের বিবাহ দিবার প্রথা আছে। ব্যাঙের বিবাহ দিলে নাকি আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামে। বাল্যকালে দেবুও দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া ব্যাঙের বিবাহ দিয়াছে। ব্যাঙের বিবাহে তাহার প্রিয়তমা বিলুরও বড় উৎসাহ ছিল। তাহার মনে পড়িল, বিলু একবার একটা ব্যাঙকে কাপড়-চোপড় পরাইয়া অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে কনে সাজাইয়াছিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিলু ও খোকা! তাহার জীবনের সোনার লতা ও হীরার ফুল। ছেলেবেলায় একটি রূপকথা শুনিয়াছিল—রাজার স্বপ্নের কথা। স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছিলেন—এক অপূর্ব গাছ, রূপার কাণ্ড, সোনার ডাল-পালা, তাহাতে ধরিয়াছে হীরার ফুল। আর সেই গাছের উপর পেখম ধরিয়া নাচিতেছে হীরা-মোতি-পান্না-প্রবাল-পোখ্‌রাজ-নীলা প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের মণিমাণিক্যময় এক ময়ূর। বিলু ছিল তাহার সেই গাছ, খোকা ছিল সেই, আর সেই গাছে নাচিত যে ময়ূর—সে ছিল তাহার জীবনের সাধ-সুখ-আশা-ভরসা, তাহার মুখের হাসি, তাহার মনের শান্তি! সে নিজে, হ্যাঁ নিজেই তো, সেই গাছ কাটিয়া ফেলিয়াছে। আজ সে শুধু ধর্ম, কর্তব্য, সমাজ লইয়া কেবল ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাই যদি সে ভগবানকে ডাকিতে পারিত!

রাজবন্দী যতীনবাবু এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর মধ্যে মধ্যে কতদিন তাহার মনে হইয়াছে যে, সব ছাড়িয়া যে কোন তীর্থে চলিয়া যায়। কিন্তু সে যেন পথ পাইতেছে না। যেদিন যতীনবাবু চলিয়া গেলেন, সেইদিনই ন্যায়রত্ন মহাশয় চিঠি পাঠাইলেন—"পণ্ডিত, আমাকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর।"

খাজনা-বৃদ্ধি লইয়া জমিদার-প্রজায় যে বিরোধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে সে বিরোধ প্রজাপক্ষের সমস্ত দায়িত্ব, বিপুল-ভার পাহাড়ের মত তাহার মাথায় আজ চাপিয়া বসিয়াছে। খাজনা-বৃদ্ধি! প্রজার অবস্থা চোখে দেখিয়াও জমিদার কেমন করিয়া যে খাজনা-বৃদ্ধি চায়, তা সে বুঝিতে পারে না।

প্রজার কি আছে? ঘরে ধান নাই, বৈশাখের পর হইতে চাষী প্রজা ধান ধার করিয়া খাইতে শুরু করিয়াছে। গোটা বৎসর পরনে তাহাদের চারিখানার

বেশী কাপড় জোটে না অসুখে লোকে বিনা চিকিৎসায় মরে। চালে খড় নাই ; গোটা বর্ষার জলটা তাহাদের ঘরের মেঝের উপর ঝরিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়াও খাজনা-বৃদ্ধি দাবী কেমন করিয়া করে তাহারা ? এ অঞ্চলের জমিদারেরা একটা যুক্তি দেখাইয়াছেন যে ময়ূরাক্ষী নদীর বন্যারোধী বাঁধ তাঁহারা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, তাহার ফলে এখানকার জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। এত বড় মিথ্যা কথা আর হয় না। এ বাঁধ তৈয়ার করিয়াছে প্রজারা। জমিদার মাথা হইয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছে, চাপরাশী দিয়া প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আজও প্রজারাই প্রতি বৎসর বাঁধ মেরামত করে। ইদানীং অবশ্য চাষী-প্রজারা অনেকে বাঁধ মেরামতের কাজে যায় না। এখন আইনও কিছু কড়া হইয়াছে বলিয়া জমিদার সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতির প্রজাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া কাজ করাইতে সাহসও করে না ; কিন্তু বাউরী, মুচি, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর প্রত্যেককে আজও বেগার খাটাইয়া লয়। সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অব রাইট্‌সে পর্যন্ত ওই বেগার দেওয়াটাই তাহাদের খাজনা হিসাবে লেখা হইয়াছে। 'ভিটার খাজনা বৎসরে তিনটি মজুর'—একটি বাঁধ মেরামতের জন্য একটি চণ্ডীমণ্ডপের জন্য অপরটি জমিদারের নিজের বাড়ির জন্য।

—দেবু চাচা ! ইবার আমি যাই ?···এতক্ষণ ধরিয়া রহম শেখ সেই গানটাই গাহিতেছিল, অকস্মাৎ গান বন্ধ করিয়া দেবুকে বলিল—গাঁয়ের ভিতরে আমি আর যাব না। লণ্ঠন ও লাঠি হাতে দেবুর সঙ্গী হিসাবে রহম এ গ্রামে ঢুকিতে চায় না।

দেবু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল– গ্রামপ্রান্তে মুচিপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার তুমি যাও চাচা।

—আদাব।

—আদাব চাচা।

—আমার কথায় তুমি যেন কিছু মনে করিও না বাপজান !···রহম এতটা পথ লাঠি ও লণ্ঠন হাতে দেবুর সঙ্গে আসিয়া রূঢ় কথার অপরাধ-বোধের গ্লানি হইতে অনেকখানি মুক্ত হইয়াছে, হাল্কা মনে এবার সে সহজভাবেই কথাটা বলিয়া ফেলিল।

দিব্যহাস্যে দেবুর মুখ ভরিয়া উঠিল, বলিল—না, না, চাচা ! ছেলেপিলেকে কি শাসন করি না ? বলি না—খারাপ করলে খুন করব ?

—তাহলে আমি যাই ?

—হ্যাঁ, যাও তুমি।

—নাঃ চল তুমারে বাড়িতে পৌঁছায়ে দিয়া তবে যাব।···দেবুর মিষ্টহাস্যে, তাহার ওই পরম আত্মীয়তা-সূচক কথাতে রহমের মনের গ্লানি তো মুছিয়া গেলই উপরন্তু সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে মুহূর্তে মান-অপমানের প্রশ্নটাও মুছিয়া গেল। সে বলিল—আপন ছেলেকে পৌঁছায়ে দিতে আসছি—তার আবার শরম কিসের? চল।

দেবুর বাড়ির দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। দেবু বিস্মিত হইয়া গেল। আপনজনহীন বাড়ি,—সেখানে কাহারা এমন করিয়া বসিয়া আছে? এত রাত্রিতে কোথা হইতে কাহারা আসিল? কুটুম্ব নয় তো? অম্বুবাচী ফেরত গঙ্গাস্নানের যাত্রী হওয়াও বিচিত্র নয়!

বাড়ির দুয়ারে আসিতেই পাতু মুচি বলিল—এই যে এসে গিয়েছেন পণ্ডিত।

দাওয়ার উপরে বসিয়াছিল হরেন ঘোষাল, তারা নাপিত, গিরীশ ছুতার এবং আরও কয়েকজন। শঙ্কিত হইয়াই দেবু প্রশ্ন করিল—কি হল?

হরেন বলিল—This is very bad পণ্ডিত, very bad;—এই জল-কাদা সাপ-খোপ, অন্ধকার রাত্রি, তার ওপর জমিদারের সঙ্গে এই সব চলছে। তুমি সন্ধ্যাবেলায় আসবে বলে গেলে, তারপর এত রাত্রি পর্যন্ত আর নো পাত্তা!

দরজার মুখের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা; সে হাসিয়া বলিল—জামাই তো কাউকে আপন ভাবে না ঘোষাল মশায়, যে মনে হবে আমার লেগে কেউ ভাবছে!

দেবু মৃদু হাসিল।

পাতু বলিল—আমি এই বেরুচ্ছিলাম লণ্ঠন নিয়ে।

দুর্গা বলিল—রাত হল দেখে কামার-বৌকে দিয়ে রুটি করিয়ে রেখেছি। মুখ-হাতে জল দাও, দিয়ে—চল খেয়ে আসবে। আজ আর রান্না করতে হবে না।

এই দুর্গা আর কামার-বউ পদ্ম! দেবুর স্বজনহীন জীবনে শুধু পুরুষেরাই নয়, এই মেয়ে দুটিও অপরিমেয় স্নেহমমতা লইয়া অযাচিতভাবে আসিয়া তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিতে চায়। কামার-বউ তাহার মিতেনী। অনি-ভাই যে দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল! কামার-বউ পদ্ম এখন তাহার পোষ্যের সামিল; স্বামী-পরিত্যক্তা বন্ধ্যা মেয়েটার মাথাও খানিকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। পদ্মকে লইয়া সে যে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

ভাবিতে ভাবিতে সে দুর্গার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। দুর্গা বলিল—দেবতা ললপাচ্ছে। রাতে জল হবে। ওঃ কি মেঘ!

পাঁচ

পদ্ম প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়াছিল।

প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া অনেকদিন পর আজ আবার সে তৃপ্তি পাইয়াছে। একসময় অনিরুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া কতদিন সারারাত জাগিয়া থাকিত। তারপর আসিয়াছিল যতীন।

পদ্মার রিক্ত জীবনে যতীনের আসাটা যেন একটা স্বপ্ন। ছেলেটি হঠাৎ আসিয়াছিল। বিধাতা যেন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিতেও বিস্ময় লাগে হঠাৎ থানার লোক আসিয়া তাহাদের একখানা ঘর ভাড়া লইল। কে নজরবন্দী আসিবে। তাহার পর আসিল যতীন।

অনিরুদ্ধের একখানা ঘর ভাড়া লইয়া পুলিশ-কর্তৃপক্ষ কলিকাতার এই ছেলেটিকে এই সুদূর পল্লীগ্রামের উত্তেজনাহীন আবেষ্টনার মধ্যে আনিয়া রাখিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিয়াছিল বাংলার মুমূর্ষু সমাজের অসুস্থ নিঃশ্বাস ইহাদের অন্তরেও সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। বর্ষার জলভরা মেঘের প্রাণদ-শক্তিকে নিষ্ফল করিবার জন্য মরুভূমির আকাশে পাঠাইয়াছিলেন যেন ক্রুদ্ধ দেবতা। কিন্তু একদিন দেবতা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন প্রাণশক্তি ব্যর্থ হয় নাই ; উষর-মরু-বুকে মধ্যে মধ্যে সবুজের ছোপ ধরিয়াছে, ওয়েসিস্ শিশু জাগিয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লীগ্রামের তাপতৃষ্ণাময় নিরুদ্যম জীবনে এই রাজবন্দীগুলির প্রাণশক্তির স্পর্শে মরূদ্যান আবির্ভাবের মত নব জাগরণের আভাস ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেখিয়া-শুনিয়া সরকার রাজবন্দীদের এই পল্লীনির্বাসন প্রথা তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া লইলেন। বাংলাদেশের সরকারী রিপোর্টে এবং বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসে এ তথ্য স্বীকৃত এবং সত্য।

সে-কথা থাক্। পদ্মের কথা বলি। পদ্ম তখন অপ্রকৃতিস্থ ছিল! রাজবন্দী যতীনবাবুকে লইয়া পদ্ম কয়েকদিন পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে সাজিয়া বসিয়াছিল তাহার মা। মেয়েদের মা সাজিবার শক্তি সহজাত। তিন-চার বছরের মেয়ে যেমন তাহার সমান আকারের সেলুলয়েডের পুতুল লইয়া সাজিয়া খেলা করে—তেমনি করিয়াই পদ্ম কয়েকদিন যতীনকে লইয়া খেলা-ঘর পাতিয়াছিল। যতীন জুটাইয়াছিল এই গ্রামেরই পিতৃমাতৃহীন একটা বাচ্চাকে—উচ্চিংড়েকে। উচ্চিংড়ে আবার আনিয়াছিল আর একটাকে—সেটার নাম ছিল গোবরা।

দিনকতক খেলা-ঘর জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ ঘরটা ভাঙিয়া গেল। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ যতীনকে সরাইয়া লইতে পদ্মর জীবনে আর এক বিপর্যয় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার একমাত্র আর্থিক সংস্থান ঘরভাড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চিংড়ে এবং গোবরাও পদ্মকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কারণ আহারের কষ্ট সহ্য করিতে তাহারা রাজী নয়। জীবনে ইহারই মধ্যে তাহারা উপার্জনের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে বড় রেলওয়ে জংশন-স্টেশন। ব্যবসায় সেখানে দিন-দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; মাড়োয়ারী মহাজনদের গদী—বড় বড় ধান-কল, তেল-কল, ময়দা-কল, মোটর-মেরামতের কারখানা প্রভৃতিতে অহরহ টাকা-পয়সার লেনদেন চলিতেছে—বর্ষার জলের মত; মাঠের মাছের মত বন্যার জলের সন্ধান পাইয়া উচ্চিংড়ে ও গোবরা সেইখানে গিয়া জুটিয়াছে। কয়েকদিন ভিক্ষা করে; কয়েকদিন চায়ের দোকানে ফাই-ফরমাশ খাটে; কখনও মোটর-সার্ভিসের বাস ধুইবার জন্য জল তুলিয়া দেয়; আর সুযোগ পাইলে গভীর রাত্রে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে ঘুমন্ত যাত্রিদের দুই-একটা ছোটখাটো জিনিস লইয়া সরিয়া পড়ে।

পদ্ম যে তাহাদের ভালবাসিয়াছিল, সেও বোধ হয় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। কোনদিন একবারের জন্যও তাহারা আসেও না। অনিরুদ্ধ জেলে। পদ্ম আবার বিশ্ব-সংসারে একা হইয়া পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে তাহার মানসিক অসুস্থতা আবার বাড়িতেছিল। একা উদাসদৃষ্টিতে জনহীন বাড়িটার মাথার উপরের আকাশের দিকে চাহিয়া সে এখন নিথর হইয়া বসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে খুটখাট শব্দ উঠে। বিড়াল অথবা ইঁদুরে শব্দ করে; অথবা কাক আসিয়া নামে। সেই শব্দে দৃষ্টি নামাইয়া সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া একটুকরা বিচিত্র হাসিয়া আবার সে আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া তাকায়। উচ্চিংড়ে-গোবরা যে পরের ছেলে, তাহারা যে চলিয়া গিয়াছে এ কথাটা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

একমাত্র দুর্গা-মুচিনী তাহার খোঁজখবর করে। দুর্গা তাহাকে বলে, মিতেনী। এককালে স্বৈরিণী দুর্গা অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিতে পাতাইয়াছিল; শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ করিবার জন্যই পদ্মকে তখন সে মিতেনী বলিত। কিন্তু এখন সম্বন্ধটা হইয়া উঠিয়াছে পরম সত্য। দুর্গাই দেবু ঘোষকে পদ্মের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—একটা উপায় না করলে তো চলবে না জামাই!

দেবু চিন্তিত হইয়া উত্তর দিয়াছিল—তাই তো দুর্গা!

—তাই তো বলে চুপ করলে তো হবে না। তোমার মত লোক গাঁয়ে থাকতে একটা মেয়ে ভেসে যাবে?

—কামার-বউয়ের বাপের বাড়িতে কে আছে?

—মা-বাপ নাই, ভাই-ভাজ আছে—তারা বলে দিয়েছে ঠাঁইঠুনো তারা দিতে পারবে না।

—তাহলে?

—তাই তো বলছি। শেষকালে কি ছিরু পালের—

—ছিরু পালের? দেবু চমকিয়া উঠিয়াছিল।

হাসিয়া দুর্গা বলিয়াছিল—ছিরু পালকে তো জান? ঢের দিন থেকে তার নজর পড়ে আছে কামার-বউয়ের ওপর। ওর দিকে নজর দিয়ে আমাকে ছেড়েছিল সে। তাইতো আমি ইচ্ছে করে ওকে দেখাবার জন্যে অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিতে পাতিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিয়াছিল—খাওয়া-পরার কথা আমি ভাবছি না দুর্গা। একটি অনাথা মেয়ে, তার ওপর অনি-ভাই আমার বন্ধু ছিল, বিলুও কামার-বউকে ভালবাসত। খাওয়া-পরার ভার না-হয় আমি নিলাম, কিন্তু ওকে দেখবে-শুনবে কে? একা মেয়েলোক—

শুনিয়া লঘু হাস্য ফুটিয়াছিল দুর্গার মুখে।

দেবু বলিয়াছিল—হাসির কথা নয় দুর্গা।

এ কথায় দুর্গা আরও একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—জামাই, তুমি পণ্ডিত মানুষ। কিন্তু—

সহসা সে আপনার আঁচলটা মুখে চাপা দিয়া বেশ খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিয়াছিল—এই সব ব্যাপারে আমি কিন্তু তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত।

দেবু স্বীকার করিয়া হাসিয়াছিল।

—পোড়ার মুখের হাসিকে আর কি বলব?—বলিয়া সে হাসি সংবরণ করিয়া অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলিয়াছিল—জান জামাই! মেয়েলোকে নষ্ট হয় পেটের জ্বালায় আর লোভে। ভালবেসে নষ্ট হয় না—তা নয়, ভালবেসেও হয়। কিন্তু সে আর ক'টা? একশোটার মধ্যে একটা। লোভে পড়ে—টাকার লোভে, গয়না-কাপড়ের লোভে মেয়েরা নষ্ট হয় বটে। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পণ্ডিত। তুমি তাকে পেটের জ্বালা থেকে বাঁচাও। কর্মকার পেটের ভাত রেখে যায় নাই, কিন্তু একখানা বগি-দা রেখে গিয়েছে; বলত, এ দা দিয়ে বাঘ কাটা যায় সেই দা-খানা পদ্ম-বউ পাশে নিয়ে থাকে। কাজ করে, কর্ম করে—দা-খানা রাখে হাতের কাছাকাছি। তার লেগে তুমি ভেবো না। আর যদি দেহের জ্বালায় সে থাকতে না পারে, খারাপই হয় তা হলে তোমার ভাত আর সে তখন খাবে না। চলে যাবে।

দেবু সেইদিন হইতে পদ্মের ভরণপোষণের ভার লইয়াছে। দুর্গা দেখাশুনা করে। আজ পদ্মের বাড়িতেই দুর্গা ময়দা কিনিয়া দেবুর জন্য রুটি গড়াইয়া রাখিয়াছে।

খাবারের আয়োজন সামান্যই, রুটি, একটা তরকারি, দুই টুকরা মাছ, একটু মসুর-কলাইয়ের ডাল ও খানিকটা গুড়। কিন্তু আয়োজনের পারিপাট্য একটু অসাধারণ রকমের। থালা-গেলাস-বাটিগুলি ঝক্-ঝক্ করিতেছে রুপার মত; ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের সুতা দিয়ে তৈরী-করা আসনখানি ভারি সুন্দর। তাহার নিজের হাতের তৈরী। কয়েকটি কচি পদ্মপাতা সুনিপুণভাবে গোল করিয়া কাটিয়া জলের গেলাসের ঢাকা করিয়াছে, ডালের বাটিও পদ্মপাতায় ঢাকা; সব চেয়ে ছোট যেটি সেটির উপর দিয়াছে একটু নুন, ইহাতেই সামান্য যেন অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে; প্রথম দৃষ্টিতেই মন অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। পদ্মের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া শুচি-শ্রদ্ধা-মাখা এই আয়োজন দেখিয়া দেবু বেশ একটু লজ্জিত হইল।

—আরে বাপ রে! মিতেনী এসব করেছে কি দুর্গা?

দাওয়ার উপর এক প্রান্তে দুর্গা বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল—আর বলো না বাপু, নুন দেবে কিসে—এই নিয়ে ভেবে সারা। আমি বললাম—একটু শালপাতা ছিঁড়ে তারই উপর দাও—উঁহু। শেষে এই রাত্তিরে গিয়ে পদ্মপাতা নিয়ে এল। তারপর ওই সব তৈরী হল।

পদ্ম খাবারের থালা নামাইয়া দিয়া রান্নাঘরের দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কথাগুলি শুনিয়া তাহার মাথাটা অবসন্ন হইয়া দেওয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িল, স্থির-উদাস দৃষ্টিভরা বড় চোখ দুটিও মুহূর্তে বন্ধ হইয়া আসিল, দেহ-মন যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, চোখে স্বস্তির ঘুম জড়াইয়া আসিতেছে।

আসনে বসিয়া দেবুরও বড় ভাল লাগিল। বহুদিন—বিলুর মৃত্যুর পর হইতে এমন যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ খাইতে দেয় নাই। গ্লাসে জল গড়াইয়া হাত ধুইয়া সে হাসিয়া বলিল—দুর্গা, বিলু যাওয়ার পর থেকে এত যত্ন করে আমাকে কেউ খেতে দেয় নাই।

দুর্গা দেবুকে জবাব দিল না, রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল—শুনছ হে মিতেনী, তোমার মিতে কি বলছে? ঘরের মধ্যে পদ্মর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুর্গা দেবুকে বলিল—বেশ মিতেনী তোমার, জামাই! খেতে দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। কি চাই—কোন্‌টা ভালো হয়েছে, শুধোবে কে বল তো?

দেবু বলিল—না, না, আমার আর কিছু চাই না। আর রান্না সবই ভালো হয়েছে।

—তা হলেও এসে দুটো কথা বলুক। গল্প না করলে খাওয়া হবে কি করে?

—তুই বড় ফাজিল দুর্গা।

—আমি যে তোমার শালী গো!—বলিয়া হাসিয়া সারা হইল, তারপর বলিল—আমার হাতে তো তুমি খাবে না ভাই, নইলে দেখতে এর চেয়ে কত ভালো করে খাওয়াতাম তোমাকে।

দেবু কোন উত্তর দিল না, গম্ভীরভাবে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল; বলিল—আচ্ছা, এখন চললাম।

আলোটা তুলিয়া লইয়া দুর্গা অগ্রসর হইল। দেবু বলিল—তোমাকে যেতে হবে না, আলোটা আমাকে দে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দুর্গা আলোটা নামাইয়া দিল। বাড়ি হইতে দেবু বাহির হইতেই কিন্তু সে আবার ডাকিয়া বলিল—শোন জামাই, একটু দাঁড়াও!

দেবু দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

দুর্গা অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল—একটা কথা বলছিলাম।

—বল।

—চল, যেতে যেতে বলছি।

একটু অগ্রসর হইয়া দুর্গা বলিল—কামার-বউকে কিছু ধানভানা কোটার কাজ দেখে দাও, জামাই। একটা পেট তো, ওতেই চলে যাবে। তারপর যদি কিছু লাগে তা বরং তুমি দিও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু শুধু বলিল—হুঁ!

আরও কিছুটা আসিয়া দুর্গা বলিল—এ গলির পথে আমি বাড়ি যাই।

দেবু কোনও উত্তর দিল না। দুর্গা ডাকিল—জামাই!

—কি?

—আমার উপর রাগ করেছ?

দেবু এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—না।

—হুঁ, রাগ করেছ। রাগ যদি না করেছ তো হাস দেখি একটুকুন।

দেবু এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল—যা; ভাগ্।

কৃত্রিম ভয়ে দুর্গা বলিয়া উঠিল—বাবা রে! এইবারে জামাই মারবে বাবা! পালাই।—বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া এক-হাত কাচের চুড়িতে যেন বাজনার ঝঙ্কার তুলিয়া গলি-পথের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

দেবু সস্নেহে একটু হাসিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া সে যখন বাড়িতে পৌছিল, তখন দেখে পাতু শুইতে আসিয়া বসিয়া আছে। দুর্গার দাদা পাতু মুচি দেবুর বাড়িতেই শোয়।

বিছানায় শুইয়াও দেবুর ঘুম আসিল না।

যাহাকে বলে খাঁটি চাষী, সেই খাঁটি চাষীর ঘরের ছেলে সে। বাপ তাহার নিজের হাতে লাঙল ধরিয়া চাষ করিত; কাঁধে করিয়া বাঁক বহিত, সারের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া গাড়ি বোঝাই করিত, ধানের বোঝা মাঠ হইতে মাথায় বহিয়া ঘরে আনিত, গরুর সেবা করিত। দেবুও ছেলেবেলায় ভাগের রাখালের পালে গরু দিয়া আসিয়াছে, গরুর সেবা সে-ও সে-সময় নিয়মিত করিত, চাষের সময় বাপের জন্য জলখাবার মাঠে লইয়া যাইত। তাহার বাপ জল খাইতে বসিলে—বাপের ভারী কোদালখানা চালাইয়া অভ্যাস করিত; বাড়িতে কোদালের যাহা কিছু কাজকর্ম সে-বয়সে সে-ই করিয়া যাইত। তারপর একদা গ্রাম্য পাঠশালা হইতে সে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল। পাঠশালায় পণ্ডিত ছিল ওই বৃদ্ধ, বর্তমানে দৃষ্টিহীন কেনারাম। কেনারামই সেদিন তাহার বাপকে বলিয়াছিল—তুমি ছেলেকে পড়তে দাও দাদা। ছেলে হতে তোমার দুঃখ ঘুচবে। দেবু যেমন-তেমন বৃত্তি পায় নাই, গোটা জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। কঙ্কণার ইস্কুলে মাইনে লাগবে না, তার ওপর মাসে দু-টাকা বৃত্তি পাবে। না পড়লে বৃত্তিটা পাবে না বেচারী।···

কেনারামই কঙ্কণার স্কুলে তাহার মণ্ডল উপাধি বাদ দিয়া ঘোষ লিখাইয়া ছিল। তারপর প্রতিবারই সে ফার্স্ট অথবা সেকেণ্ড হইয়া ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত উঠিয়াছে। এই কালটির মধ্যে তাহার বাপ তাহাকে কোন কাজ করিতে দেয় নাই। তাহার বাপ হাসিয়া তাহার মাকে কতবার বলিয়াছে—দেবু আমার হাকিম হবে।···দেবুও সেই আশা করিত।···

কথাগুলো মনে করিয়া দেবু আজ বিছানায় শুইয়া হাসিল।

তারপর—অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত তাহার জীবনে নামিয়া আসিল জীবনের প্রথম দুর্যোগ, বাপ-মা প্রায় একসঙ্গেই মারা গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস হইতেই দেবুকে বাধ্য হইয়া পড়া ছাড়িতে হইল। তাহাকে অবলম্বন করিতে হইল তাহার পৈতৃক-বৃত্তি। হাল-গরু লইয়া বাপ-পিতামহের মত সে চাষ আরম্ভ করিল। তারপর পাইয়া গেল সে ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রী প্রাইমারী পাঠশালার পণ্ডিতের পদটি। বেশ ছিল সে। শান্ত-শিষ্ট বিলুর মত স্ত্রী, পুতুলের মত খোকামণি, মাসিক বারো টাকা বেতন, তাহার উপর চাষবাসের আয়। মরাইয়ে ধান, ভাঁড়ারে মাটির জালায় কলাই, গম তিল, সরিষা, মষ্‌নে;

গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, দুই চারিটা আম-কাঁঠালের গাছ, রাজার চেয়েও সুখ ছিল তাহার। অকস্মাৎ তাহার দুর্মতি জাগিল। দুর্মতিটা অবশ্য সে কঙ্কণার স্কুল হইতেই আয়ত্ত করিয়াছিল। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দুর্মতি স্কুল হইতে তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। সেই নেশায়—সেটল্‌মেণ্টের কানুনগোর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া—কানুনগোর চক্রান্তে জেল খাটিল।

জেল হইতে ফিরিয়া নেশাটা যেন পেশা হইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। নেশা ছাড়িলেও ছাড়া যায়, কিন্তু পেশা ছাড়াটা মানুষের সম্পূর্ণ নিজের হাতে নয়। ব্যবসা বা পেশা ছাড়িব বলিলেই ছাড়া যায় না; যাহাদের সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আছে তাহারা ছাড়ে না। চাষ যাহার পেশা, সে ছাড়িলে জমিদার বাকী-খাজনার দাবী ছাড়ে না। জমি বিক্রয় হইয়া গেলেও খাজনার দায়ে অস্থাবরে টান পড়ে। সংসারে শুধু কি পাওনাদারেই ছাড়ে না? দেনাদারেও ছাড়ে না যে! মহাজন যদি বলে—মহাজনী ব্যবসা করিব না তবে দেনাদারেরা যে কাতর অনুরোধ জানায়—সেও তো নৈতিক দাবী, সে-দাবী আদালতের দাবী হইতে কম নয়। আজ তাহারও হইয়াছে সেই দশা। আজ সংসারে তাহার নিজের প্রয়োজন কতটুকু? কিন্তু পাঁচখানা গ্রামের প্রয়োজন তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে।

ছাড়িয়া দিব বলিলে একদিকে লোক ছাড়ে না, অন্যদিকে পাওনাদার ছাড়ে না। তাহার পাওনাদার ভগবান। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গল্প মনে পড়িল;—মেছুনীর ডালা হইতে শালগ্রামশিলা আনিয়াছিলেন এক ব্রাহ্মণ। সেই শিলারূপী ভগবানের পূজার ফলে ব্রাহ্মণ সংসারে নিঃস্ব হইয়াও শিলাটিকে পরিত্যাগ করেন নাই। ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, এই দুর্গত মানুষের মধ্যে যে ভগবান, তিনি ওই মেছুনীর ডালার শিলা।...তাহার বিলু গিয়াছে, খোকন গিয়াছে, এখন তাহাকে লইয়া তাহার অন্তর-দেবতা কি খেলা খেলিবেন তিনিই জানেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু মনে মনেই বলিল—তাই হোক ঠাকুর দেখি তোমার দৌড়টা কতদূর! স্ত্রী-পুত্র নিয়েছ, এখন পাঁচখানা গ্রামের লোকের দায়ের বোঝা হয়ে তুমি আমার মাথায় চেপে বসেছ! বস, তাই বস।...

বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বর্ষার জলভরা মেঘের গুরুগম্ভীর ডাক গাঢ় ঘন অন্ধকারের মধ্যে অবিরাম রিমিঝিমি বর্ষণ চলিয়াছে। বড় বড় ব্যাঙগুলো পরমানন্দে ডাক তুলিয়াছে। ঝিঁঝিঁর ডাক আজ শোনা যায় না। এতক্ষণ দেবুর এ সম্পর্কে সচেতনতা ছিল না। সে চিন্তার মধ্যে ডুবিয়াছিল। সে জানলার বাহিরের দিকে তাকাইল। বাহিরে ঘন অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর সেই

অন্ধকারের মধ্যে আলো ভাসিয়া আসিল। রাস্তায় কেহ আলো লইয়া চলিয়াছে। এত রাত্রে এই বর্ষণের মধ্যে কে চলিয়াছে? চলায় অবশ্য এমন আশ্চর্যের কিছু নাই। তবু সে ডাকিল—কে যাচ্ছ আলো নিয়ে?

উত্তর আসিল—আজ্ঞে পণ্ডিতমশাই, আমরাই গো; আমি সতীশ।

—সতীশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঠে একটা কাট বাঁধাতে হবে। ভেবেছিলাম কাল বাঁধব। তা যে রকম দেবতা নেমেছে, তাতে রেতেই না বাঁধলে—মাটি-ফাটি সব খুলে চেঁচে নিয়ে যাবে।

সতীশরা চলিয়া গেল, দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, নিতান্তই অকারণেই ফেলিল। সংসারে সবচেয়ে দুঃখী ইহারাই। চাষী গৃহস্থ তো ঘরে ঘুমাইতেছে, এই গরীব কৃষাণেরা ভাগীদারেরা গভীর রাত্রে চলিয়াছে ভাঙন হইতে তাহাদের জমি রক্ষা করিতে। অথচ ইহাদিগকে খাদ্য হিসাবে ধান ধার দিয়া তাহার উপর সুদ নেয় শতকরা পঞ্চাশ। প্রথাটির নাম 'দেড়ী'।

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেবু ওই কথাই ভাবিতেছিল। আজ এই ঘটনাটি এই মুহূর্তে তাহার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ চাষীর গ্রামে এ অতি সাধারণ ঘটনা।

কিছুক্ষণ পর জানালার নিচে দাঁড়াইয়া ভয়ার্ত মৃদুস্বরে চুপি চুপি কে ডাকিল —পণ্ডিতমশাই!

কণ্ঠস্বরে ভয়ার্ততার স্পর্শে দেবু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে?

—আমি সতীশ।

—সতীশ? কি সতীশ?

—আজ্ঞে, মৌলকিনীর বটতলায় মনে হচ্ছে 'জমাট-বস্তি' হয়েছে।

—'জমাট-বস্তি'? সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাঁ থেকে বেরিয়েই দেখি মাঠের মধ্যে আলো, আজ্ঞে এই জলের মধ্যেও বেশ জোর আলো। লাল বরণ আলো দপ দপ করে জ্বলছে। ঠাওর করে দেখলাম, মৌলকিনীর পাড়ে বটতলায় মশালের আলো জ্বলছে।

'জমাট-বস্তি'—অর্থাৎ রাত্রে আলো জ্বালাইয়া ডাকাতের দলের সমাবেশ। দেবু দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল,—বলিল—তুমি ভূপাল চৌকিদারকে তাড়াতাড়ি ডাক দেখি!

—আপনি ঘরের ভেতরে যান পণ্ডিতমশায়। আমি এখুনি ডেকে আনছি।

দেবু অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি যাও, শীগ্‌গির যাবে। আমি ঘরেই দাঁড়িয়ে আছি।

সতীশ চলিয়া গেল, দেবু অন্ধকারের মধ্যেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। 'জমাট-বস্তি'! বিশ্বাস নাই। বর্ষার সময় এখন গরীবদের ঘরে ঘরে অভাব-অনটন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আকাশে মেঘ, বর্ষণ রাত্রিকে দুর্যোগময়ী করিয়া তুলিয়াছে। চুরি-ডাকাতি যাহারা করে, সংসারের অভাব-অনটনে তাহাদের সুপ্ত আক্রোশ যখন এই হিংস্র পাপ-প্রবৃত্তিকে খোঁচা দিয়া জাগায়, তখন বহির্জগতের এই দুর্যোগের সুযোগ তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকে; ক্রমে তাহারা পরস্পরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। তারপর একদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়ে নিষ্ঠুর উল্লাসে। নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া একজন হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়া অদ্ভুত এক রুদ্র রব তুলিয়া ধ্বনিটাকে ছড়াইয়া দেয় স্তব্ধরাত্রে দিগ্‌দিগন্তরে। সেই সঙ্কেতে সকলে আসিয়া সমবেত হয় ঠিক স্থানটিতে; তারপর তাহারা অভিযানে বাহির হইয়া পড়ে। সে সময় তাহাদের মায়া নাই, চোখে জ্বলিয়া উঠে এক পরুষ কঠিন বিস্মৃতিময় দৃষ্টি—তখন আপন সন্তানকেও তাহারা চিনিতে পারে না; দেহে মনে জাগিয়া উঠে এক ধ্বংসশক্তির দুর্বার চাঞ্চল্য। তখন যে বাধা দেয়, তাহারা মাথাটা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহারা গেণ্ডুয়ার মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় অথবা নিজেরাই মরে। নিজেদের কেহ মরিলে তাহারা মৃতের মাথাটা কাটিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

কথাগুলো ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিল। এখনি কোথায় কোন্ পল্লীতে হা-হা শব্দে একটা ভয়ানক অট্টশব্দ তুলিয়া উহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ভূপাল এখনও আসিতেছে না কেন? ভূপালের আসিবার পথের দিকে সে স্থির ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বর্ষণ-মুখর রাত্রি, একটানা ব্যাঙের ডাক, কোথায় জলে ভিজিয়া পেঁচা ডাকিতেছে। দুর্যোগময়ী রজনী যেন ওই নিশাচরদের মতই উল্লাসময়ী হইয়া উঠিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাহার শরীরে একটা উত্তেজনার প্রবাহ ক্রমশঃ তেজোময় হইয়া উঠিতেছে।···কিন্তু ভগবান, তোমার পৃথিবীতে এত পাপ কেন? কেন মানুষের এই নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি? কেন তুমি মানুষকে পেট পুরিয়া খাইতে দাও না? তুমিই তো নিত্যনিয়মিত প্রতিটি জনের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা কর! মহামারীতে, ভূমিকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, অগ্নিদাহে, ঝড়ে তুমি নিষ্ঠুর খেলা খেল, তুমি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠ,—বুঝিতে পারি; তখন তোমাকে হাতজোড় করিয়া ডাকি—হে প্রভু, তোমার এ রুদ্র রূপ সংবরণ কর। সে ডাক তুমি না শুনলেও সে বিরাট মহিমময় রুদ্র রূপের সম্মুখে নিতান্ত অসহায় কীটের মত মরিয়া যাই, তাহাতে আক্ষেপ করিবার মত শক্তিও থাকে না। কিন্তু মানুষের এ ভয়ঙ্কর প্রকাশকে তো তোমার সে রুদ্র রূপ বলিয়া মানিতে পারি না

এ যে পাপ। এ পাপ কেন? কোথা হইতে এ পাপ মানুষের মধ্যে আসিল?

কিছুক্ষণ পর।

ভূপাল ডাকিল—পণ্ডিতমশাই!

—হ্যাঁ চল। দেবু লাফ দিয়ে পথে নামিল।

—হাঁক্ দোব পণ্ডিত?

—না, আগে চল, গ্রামের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি, ব্যাপার কি!

—দাঁড়ান গো।—পিছন হইতে সতীশ বাউরী ডাকিল। সে তাহার পাড়ার আরও কয়েকজনকে জাগাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ছয়

দুর্যোগময়ী রাত্রির গাঢ় অন্ধকার আবরণে ঢাকা পৃথিবী; আকাশে জ্যোতিলোক বিলুপ্ত. গাছপালা দেখা যায় না, গ্রামকে চেনা যায় না, একটা প্রগাঢ় পুঞ্জীভূত অন্ধকারে সব কিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উৎকণ্ঠিত মানুষ কয়টি আপনাদের ঘন-সান্নিধ্য হেতু স্পর্শ বোধ এবং মৃদু কথাবার্তার শব্দ-বোধের মধ্যেই পরস্পরের কাছে বাঁচিয়া আছে। এই অখণ্ড অন্ধকারকে কোন একস্থানে খণ্ডিত করিয়া জ্বলিতেছে একটা নর্তনশীল অগ্নিশিখা। উৎকণ্ঠিত মানুষগুলির চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি। দেবু ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল; এই সব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া অন্ধকারের মধ্যে সে স্থানটা নির্ণয় করিতেছিল। এই গ্রাম, এই মাঠ, এখানকার দিগ্‌দিগন্তের সঙ্গে তাহার নিবিড় পরিচয়! সে যদি আজ অন্ধও হইয়া যায়, তবুও সে স্পর্শে, গন্ধে, মনের পরিমাপের হিসাবে সমস্ত চিনিতে পারিবে চক্ষুষ্মানের মত। তাহার উপর বর্তমানে এই অঞ্চলের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে অহরহ কর্মস্পন্দনে মুখরিত এক নূতন পুরী; এই দুর্যোগ-ভরা অন্ধকারের মধ্যেও সে সামনে সাড়া দিতেছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংসন-স্টেশন; স্টেশনের চারিপাশে কলকারখানা, সেখানে মালগাড়ী-শান্টিংয়ের শব্দ—মিল এঞ্জিনের শব্দ উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছে রেল-এঞ্জিনের বাঁশী।

দেবুর সম্মুখের দিকেই ওই বাম কোণে পশ্চিম-দক্ষিণে জংশনের সাড়া উঠিতেছে। জংশনের উত্তর প্রান্তে ময়ূরাক্ষী নদী। জংশন সৃষ্টির আগে এমন অন্ধকার রাত্রে এই পল্লীর মানুষকে ময়ূরাক্ষীই দিত দিক্-নির্ণয়ের সাড়া। দেবুদের বামপাশে দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে বহমানা ময়ূরাক্ষী।

ওই ময়ূরাক্ষীকে ধনুকের জ্যার মত রাখিয়া অর্ধ-চন্দ্রাকারে ওই কঙ্কণা।

পাশে কঙ্কণার উত্তর-পূর্বে কুসুমপুর, তাহার পাশে মহুগ্রাম ; মহুগ্রামের পাশে শিবকালীপুর, শিবকালীপুরের পূর্ব-দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর কোল ঘেঁষিয়া বালিয়াড়া-দেখুড়িয়া। অর্ধ-চন্দ্রাকার বেষ্টনীটার মধ্যে প্রকাণ্ড এই মাঠখানা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল, প্রস্থে চার মাইলের অল্প কিছু কম। মাঠখানার নামই পঞ্চ-গ্রামের মাঠ। পাঁচখানা মৌজার সীমানারই জমি আছে এই মাঠে। এই বিস্তীর্ণ মাঠখানার বুকের মধ্যে এক জায়গায় এই রিমি-ঝিমি বর্ষনের মধ্যেও আগুনের রক্তাভ শিখা যেন নাচিতেছে, বোধ হয় বাতাসে কাঁপিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে দেবু হিসাব করিয়া বুঝিল, সতীশ ঠিক অনুমান করিয়াছে, জায়গাটা মৌলকিনীর বটতলাই বটে।

কোন বিস্মৃত অতীতকালে কেহ মৌলকিনী নামে ওই দীঘিটা কাটাইয়াছিল। দীঘিটা প্রকাণ্ড। দীঘিটা এককালে এই পঞ্চগ্রামের মাঠের একটা বৃহৎ অংশে সেচনের জল যোগাইয়াছে ; ওই দীঘিটার পাড়ের উপর প্রকাণ্ড বটগাছটাও বোধ হয় দীঘি কাটাইবার সময়ই লাগানো হইয়াছিল। আজও রৌদ্রতপ্ত তৃষ্ণার্ত পথিক ও কৃষক, গরু-বাছুর, কাকপক্ষী দীঘিটার জল খায়, ওই গাছের ছায়ায় দেহ জুড়াইয়া লয় ; কিন্তু রাত্রে বহুকাল হইতেই ওই বটতলাতে মধ্যে মধ্যে জমাট-বস্তির আলো জ্বলিয়া উঠে। জমাট-বস্তির আরও কয়েকটা স্থান আছে—ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপর অর্জুন-তলায়, কুসুমপুরের মিঞাদের আম-বাগানেও অন্ধকার রাত্রে এমনই ভাবে আলো জ্বলে। আজিকার আলো কিন্তু মৌলকিনার বটগাছতলাতেই জ্বলিতেছে।

দেবু বলিল—মৌলকিনীর বটতলাই বটে, ভূপাল। মশালের আলোও বটে।

ভূপাল বলিল—আজ্ঞে হাঁ। ভল্লার দল।

—ভল্লার দল ?

—হুঁ। একেবারে নিয্যস। মশাল জেলে ভল্লারা ছাড়া অন্য দল তো আগে ভাগে মশাল জেলে জমায়েত হয় না।

ভল্লা—অর্থাৎ বাগ্দীর দল। বাংলাদেশে ভল্লা বাগ্দীরা বহু বিখ্যাত শক্তিমান সম্প্রদায়। দৈহিক শক্তিকে, লাঠিয়ালির সুনিপুণ কৌশলে, বিশেষ করিয়া সড়কি চালনার নিপুণতায় ইহারা এককালে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। এখনও দৈহিক শক্তি ও লাঠিয়ালির কৌশলটা পুরুষপরম্পরায় ইহাদের বজায় আছে। ডাকাতিটা এককালে ইহাদের গৌরবের পেশা ছিল। ইংরেজ আমলে—বাংলাদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের নব-জাগরণের সময় নব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ নেতাদের সহযোগিতায় শাসক সম্প্রদায় বাংলার নিম্নজাতির দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ভল্লাদের বহুল পরিমাণে দমন করিয়াছেন। তবু তাহারা

একেবারে মরে নাই। আজ অবশ্য তাহাদের শক্তির ঐতিহ্য তাহারা অত্যন্ত গোপনে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের মত ঘাঘরা-কাঁচুলি পরিয়া রায়বেশের দল গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়। ক্ষেত্র-বিশেষে একটু বেশী পুরস্কার পাইলে—দৈহিক শক্তি ও লাঠিখেলায় নিপুণতার কসরৎ দেখায়। সাধারণত এখনও ইহারা চাষী, বাহ্যত অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে—বিশেষ করিয়া এই বর্ষাকালে কঠিন অভাবের সময় তাহাদের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কয়েকদিন অভাব অভিযোগের দুঃখ-ব্যথার কথা বলিতে বলিতে কখন যে ডাকাতির পরামর্শ আঁটিয়া বসে, সে কথা নিজেরাও বুঝিতে পারে না। পরামর্শ পাকিয়া উঠিলে তাহারা একদা বাহির হইয়া পড়ে। ভল্লা বাগ্দী ছাড়াও অবশ্য এই ধারার সম্প্রদায় আছে ; ডোম আছে, হাড়ি আছে। মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই শ্রেণীর দল আছে ; আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক লইয়া মিশ্রিত দলও আছে।

ভূপাল বলিল—এ ভল্লা বাগ্দীর দল। দেখুড়িয়া গ্রামখানা ভল্লা বাগ্দীর গ্রাম। গ্রামে অন্য বর্ণের বাসিন্দারাও কিছু কিছু আছে, কিন্তু ভল্লারই সংখ্যায় প্রধান। পূর্বাকালে দেখুড়িয়ার ভল্লারাই ছিল পঞ্চগ্রামের বাহুবল। আজ দুইশত বৎসরের অধিককাল তাহারা লুঠেরা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষ কয়টি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে কয়েকটি কথা হইতেছে, আবার চুপ হইয়া যাইতেছে। ওদিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সেই দূরে একই স্থানে জ্বলিতেছে মশালের আলোটা। দেবু না থাকিলে ইহারা অবশ্য আপন বুদ্ধিমত যাহা হয় করিত। দেবুর প্রতীক্ষাতেই সকলে চুপ করিয়া আছে।

সতীশ বাউড়ী বলিল—পণ্ডিতমশায় ?

—হুঁ।

—হাঁক মারি ?

হাঁক মারিলে জাগ্রত মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচরের দল চলিয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ এ গ্রামের দিকে আসিবে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহারা যদি মাতিয়া উঠিয়া থাকে, তবে আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া এ গ্রাম বাদ দিয়া অপর কোন প্রসুপ্ত পল্লীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

ভূপাল বলিল—ঘোষমশায়কে একটা খবর দি পণ্ডিতমশায়, কি বলেন ?

—শ্রীহরিকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বন্দুক নিয়েছেন, বন্দুক আছে। কালু শেখ আছে ঘোষ-

মশায়ের বাড়িতে। তা ছাড়া—ঘোষমশায় ঠিক বুঝতে পারবেন—এ কীর্তি কার।—বলিয়া ভূপাল একটু হাসিল।

শ্রীহরি ঘোষ এখন গ্রামের পত্তনীদার, সে এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু এককালে সে যখন ছিরু পাল বলিয়া খ্যাত ছিল, তখন দুর্ধর্ষপনায় সে ওই নিশাচরদেরই সমকক্ষ ছিল। অনেকে বলে—চাষ এবং ধান দাদন করিয়া জমিদার হওয়ার অসম্ভব কাহিনীর অন্তরালে ওই সব নিশাচর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কাহিনী লুক্কায়িত আছে। সে আমলে ছিরু নাকি ডাকাতির বামালও সামাল দিত। অনিরুদ্ধ কর্মকারের ধান কাটিয়া লওয়ার জন্য একবার মাত্রই তাহার ঘর খানাতল্লাস হয় নাই, তাহারও পূর্বে আরও কয়েকবার এই সন্দেহে তাহার ঘর-সন্ধান হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে জমিদার —প্রভাবশালী ব্যক্তি, এখন শ্রীহরি আর এই সব সংস্রবে থাকে না; কিন্তু সে ঠিক চিনিতে পারিবে—এ কাহার দল। হয়তো দুর্দান্ত কালু শেখকে সঙ্গে লইয়া বন্দুক হাতে নিঃশব্দে আলো লক্ষ্য করিয়া অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইয়া, এক সময় হঠাৎ বন্দুকটা দাগিয়া দিবে।

দেবু বলিল—এ রাত্রে দুর্যোগে তাঁকে আবার কষ্ট দিয়ে কাজ নাই ভূপাল। তার চেয়ে এক কাজ কর। সতীশ, তুমি তোমাদের পাড়ার নাগরা নিয়ে, নাগরা পিটিয়ে দাও; ক'টা নাগরা আছে তোমাদের?

—আজ্ঞে, দুটো।

—বেশ। তবে দুজনে দুটো নাগরা নিয়ে—গাঁয়ের এ-মাথায় আর ও-মাথায় দাঁড়িয়ে পিটিয়ে দাও।

নাগরার শব্দ—বিশেষ করিয়া বর্ষার রাত্রে নাগরার শব্দ এ অঞ্চলের আসন্ন বন্যার বিপদ-জ্ঞাপন সংকেত-ধ্বনি। ময়ূরাক্ষীর বন্যায় বাঁধ ভাঙিলে এই নাগরার ধ্বনি উঠে; পরবর্তী গ্রাম জাগিয়া উঠে, সাবধান হয় তাহারাও নাগরা বাজায় —সে ধ্বনিতে সতর্ক হয় তাহার পরবর্তী গ্রাম।

ডাকাতি হইলেও এই নাগরাধ্বনির নিয়ম ছিল এবং আছেও। কিন্তু সব সময়ে এ নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। গ্রামে ডাকাত পড়িয়া গেলে তখন সব ভুল হইয়া যায়। তা ছাড়া নাগরা দিলেও ভিন্ন গ্রামে লোক জাগে বটে, কিন্তু সাহায্য করিতে আসে না। কারণ পুলিশ-হাঙ্গামায় পড়িতে হয়, পুলিসের কাছে প্রমাণ দিতে হয় যে সে ডাকাতি করিতে আসে নাই, ডাকাত ধরিতে আসিয়াছিল।

নাগরার কথাটা সতীশদের ভালই লাগিল। সতীশ সঙ্গে সঙ্গে দলের দুজনকে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ভূপাল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—ঘোষমশায়

বোর্ডের মেম্বর লোক। খবরটা ওঁকে না দিলে ফৈজতে পড়তে হবে আমাকে।

শ্রীহরিকে সংবাদ দিতে দেবুর মন কিছুতেই সায় দিল না। একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—চল, আমরাই আর একটু এগিয়ে দেখি।

—না, আর এগিয়ে যেও না।

স্ত্রীলোকের দৃঢ়তাব্যঞ্জক চাপা কণ্ঠস্বরে সকলে চমকিয়া উঠিল। দেবুও চমকিয়া উঠিল,—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নারীকণ্ঠে কে কথা বলিল? বিলু! বিলুর অশরীরী আত্মা!

আবার নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল—বিপদ হতে বেশিক্ষণ লাগে না জামাই।

দেবু এবার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে? দুর্গা?

—হ্যাঁ।

সমস্বরেই প্রায় সকলে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—দুগ্‌গা?

—হ্যাঁ।—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে রসিকতা করিয়া বলিল—ভয় নাই পেত্নী নই, মানুষ, আমি দুগ্‌গা।

—তুই কখন এলি?

দুর্গা বলিল—সতীশদাদা থানাদারকে ডাকলে, পাড়ায় ডাকলে, আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে থাকতে নারলাম, ওই সতীশদাদের পিছু পিছু উঠে এলাম।

—বলিহারি বুকের পাটা তোমার দুগ্‌গা!—ভূপাল ঈষৎ শ্লেষভরেই বলিল।

—বুকের পাটা না থাকলে, থানাদার, রাত-বিরেতে পেসিডেনবাবুর বাংলাতে নিয়ে যাবার জন্য কাকে পেতে বল দেখি? বকশিশই তোমার মিলত কি করে? আর চাকরির 'কৈফৎ'ই বা কাটাতে কি করে?

কথাটার মধ্যে অনেক ইতিহাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট; ভূপাল লজ্জিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল!

ঠিক এই মুহূর্তেই গ্রামের দুই প্রান্তে নাগরা বাজিয়া উঠিল। দুর্যোগময়ী স্তব্ধ রাত্রির মধ্যে ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্ ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। দেবু হাঁক দিয়া উঠিল—আ—আ—হৈ! সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাঁক দিয়া উঠিল সমস্বরে—আ—আ—আ—হৈ! আ—হৈ! দূরে অন্ধকারের মধ্যে যে আলোটা বাতাসে কাঁপিয়া যেন নাচিতেছিল—সে আলোটা অস্বাভাবিক দ্রুততায় কাঁপিয়া উঠিল। আবার দেবু এবং সমবেত সকলে হাঁক দিয়া উঠিল—আ—হৈ, আ—হৈ! ওদিকে গ্রামের ভিতরে ইহারই মধ্যে সাড়া জাগিয়া উঠিল। স্পষ্ট শোনা যাইতেছে স্তব্ধ রাত্রে পরস্পর পরস্পরকে ডাকিতেছে। একটা উচ্চ কণ্ঠের

প্রহরা-ঘোষণার শব্দ উঠিল। এ শব্দটা শ্রীহরির লাঠিয়াল কালু শেখের হাঁক! ওদিকে নাগরা দুইটা ডুগ্-ডুগ্ শব্দে বাজিয়াই চলিয়াছে।

এবার দূরে মাঠের বুকে অন্ধকারের মধ্যে জলন্ত আলোটা হঠাৎ নিম্নমুখী হইয়া অকস্মাৎ যেন মাটির বুকের ভিতর লুকাইয়া গেল। স্পষ্ট বুঝা গেল মশালের আলোটা কেহ জলসিক্ত নরম মাটির মধ্যে গুঁজিয়া নিভাইয়া দিল। ওদিকে আরও দূরে আরও একটা নাগরা অন্য কোথাও, সম্ভবতঃ বালিয়াড়া-দেখুড়িয়ায় বাজিয়া উঠিল।

এতক্ষণে দেবু বলিল—এবার তুমি ঘোষমশায়কে খবর নিয়ে এস ভূপাল। কাজ কি কৈফিয়তের মধ্যে গিয়ে!

পিছন হইতে কাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ভূপাল!

হ্যারিকেনের আলোও একটা আসিতেছে। ভূপাল চমকিয়া উঠিল—এ যে স্বয়ং ঘোষমশায়!...শ্রীহরি নিকটে আসিতেই হাতজোড় করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—হুজুর!

—কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, মাঠের মধ্যে জমাট-বস্তি।

—কোথায়?

—মৌলকিনীর পাড়ে মনে হল। আলো জলছিল এতক্ষণ, আমাদের নাগরার শব্দ আর হাঁক শুনে আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

—আমাকে খবর দিস নাই কেন?

দেবু বলিল—দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তুমি নিজে এসে পড়লে।

—কে? দেবু খুড়ো?

—হ্যাঁ।

—হুঁ। কারা, কিছু বুঝতে পারলে?

—কি করে বুঝব? তবে মশালের আলো দেখে ভূপাল বলছিল ভল্লার দল। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে সকলে চমকিয়া উঠিল। বন্দুকের মধ্যে কার্টিজ পুরিয়া আকাশমুখ পর পর দুইটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দিল শ্রীহরি। তীক্ষ্ণ উচ্চ শব্দ দুইটা রাত্রির অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফাড়িয়া দিল। চেম্বার খুলিয়া ফায়ার-করা কার্টিজ দুইটা বাহির করিয়া, শ্রীহরি বলিল—দেবু খুড়ো, এ সব হল গিয়ে তোমাদের ধর্মঘটের ধুয়োর ফল।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে সে বলিল—ধর্মঘট ধুয়োর ফল? মানে?

হ্যাঁ। এ তোমার দেখুড়ের তিনকড়ি মোড়লের কাণ্ড। তিনকড়ি তোমাদের ধর্মঘটের একজন পাণ্ডা। ভল্লাদের দল অনেক দিনের ভাঙা দল। এই

হুজুগে সে-ই আবার জুটিয়াছে। আমি খবরও পেয়েছি। তিনকড়ি মাঠের মধ্যে চাষ করতে করতে কি বলেছে জান? বলেছে—বৃদ্ধির শখ একদিন মিটিয়ে দোব। আমার নাম করে বলেছে, তাকে দোব একদিন মূলোর মত মুচড়ে।

দেবু ধীরভাবেই বলিল—ওসব কথার কোন দাম নাই শ্রীহরি। তুমিও তো বলছ শুনতে পাই—যারা বেশী চালাকী করবে, তাদের তুমি গুলি চালিয়ে শেষ করে দেবে।

অকস্মাৎ পিছনের দিকে একটা চটাস্ করিয়া শব্দ উঠিল—কে যেন কাহাকে প্রচণ্ড জোরে চড় মারিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে দুর্গা বলিয়া উঠিল—আমার হাত ধরে টানিস, বদমাস—পাজী!

শ্রীহরি হ্যারিকেনটা তুলিয়া ধরিল। দুর্গার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে শ্রীহরির লাঠিয়াল কালু। শ্রীহরি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—কে দুর্গা?

দুর্গা সাপিনীর মত ফোঁস্ করিয়া উঠিল—তোমার লোক আমার হাত ধরে টানে?

শ্রীহরি কালুকে ধমক দিল—কালু, সরে আয় ওখান থেকে। তারপর আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল—এই এখানে কোথায় এত রাতে?...পরমুহূর্তেই নিজের উত্তরটা আবিষ্কার করিয়া বলিল—আ! দেবু খুড়োর সঙ্গে এসেছিস্ বুঝি!

দেবু কয়েক মুহূর্ত শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দুর্গাকে বলিল—আয় দুর্গা, বাড়ি আয়, এত রাত্রে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে না। সতীশ, এস, তোমরাও এস।

তাহারা সকলেই চলিয়া গেল, কেবল ভূপাল শ্রীহরি ঘোষকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। শ্রীহরি বলিল—কালই থানায় ডায়রি করবি। বুঝলি?

—যে আজ্ঞে।

—দেখুড়ের তিনকড়ির নামে আমার ডায়রি করা আছে। দারোগাবাবুকে মনে করিয়ে দিবি কথাটা। বলিস কাল সন্ধ্যের দিকে আমি থানায় যাব।

ভূপালও জাতিতে বাগ্দী; পুলিশের চাকরি তাহার অনেক দিনের হইয়া গেল। তাহার অনুমান সত্য—স্থানটাও মৌলকিনী দীঘির পাড়ের বটতলাই বটে এবং জমায়েত যাহারা হইয়াছিল তাহারাও ভল্লা বাগ্দী ছাড়া আর কেহ নয় কিন্তু নেতৃত্ব তিনকড়ির নয়; শ্রীহরির অনুমান ভ্রান্তও বটে, আক্রোশ প্রসূতও বটে। তিনকড়ি জাতিতে সদ্‌গোপ, শ্রীহরির সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে; কিন্তু শ্রীহরির সঙ্গে বিবাদ তাহার অনেকদিনের। তিনকড়ি দুর্ধর্ষ গোঁয়ার। পৃথিবীতে কাহারও কাছে বাধ্য-বাধকতার খাতিরে

মাথা নিচু করে না। কঙ্কণার লক্ষপতি বাবু হইতে শ্রীহরি পর্যন্ত—ওদিকে সাহেব-সুবো হইতে দারোগা পর্যন্ত কাহাকেও সে হেঁট-মুণ্ডে জোড়হস্তে প্রণাম জানায় না। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্টই সে ভোগ করিয়াছে।

দেখুড়িয়ার ভল্লা বাগ্দীদের নেতা সে বটে; কিন্তু তাহাদের ডাকাতি কি চুরির সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই। ডাকাতি করার জন্য সে ভল্লাদের তিরস্কার করে, অনেক সময় রাগের মাথায় মারিয়াও বসে। সে তিরস্কার, সে প্রহার ভল্লারা সহ্য করে, কারণ তাহাদের পাপের ধনের সহিত সংস্রব না রাখিলেও মানুষগুলির সঙ্গে তিনকড়ির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, বিপদের সময় সে কখনও তাহাদের পরিত্যাগ করে না। ডাকাতি কেসে, বি-এল কেসে তিনকড়িই তাহাদের প্রধান সহায়, সে-ই তাহাদের মামলা মকদ্দমার তদ্বির তদারক করিয়া দেয় তাহাদের পাপার্জিত ধন দিয়াই করে, কিন্তু একটি পয়সার তঞ্চকতা কখনও করে না। অবশ্য তদ্বির করিতে গিয়া ঐ পয়সা হইতেই সে অল্পস্বল্প ভালমন্দ খায়—বিড়ির বদলে সিগারেটও কেনে, মামলা জিতিলে মদও খায়, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার পাই পয়সাটি সে ভল্লাদের ফিরাইয়া দেয়। লোকে এই কারণেই সন্দেহ করে—ভল্লাদের গোপন পাপ-জীবনযাত্রারও নেতা ওই তিনকড়ি। পুলিশের খাতায় বহুস্থানে তাহার উল্লেখ আছে। ভল্লাদের প্রায় প্রতিটি কেসেই পুলিশ তিনকড়িকে জড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ভল্লাদের মধ্যে কাবুল-খাওয়া লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কালে ভদ্রে নিতান্ত অল্পবয়সী নতুন কেহ হয়তো পুলিশের ভীতি প্রলোভনময় কসরতে কাবু হইয়া কবুল করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মুখ হইতেও কখনও তিনকড়ির নাম বাহির হয় নাই।

বি-এল কেস—এসব ক্ষেত্রে পুলিসের মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু বি-এল কেসে অর্থাৎ 'ব্যাড লাইভ্‌লিহুড্‌' বা অসদুপায়ে জীবিকা-উপার্জনের অভিযোগের পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় তিনকড়ির পৈতৃক জোত-জমা। জোত-জমা তাহার বেশ ভালই ছিল। এবং গোঁয়ার হইলেও তিনকড়ি নিজে খুব ভাল চাষী; এ অঞ্চলের কোন সাক্ষীই একথা অস্বীকার করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে তাহার কয়েকটা ব্রহ্মাস্ত্রের মত প্রমাণ আছে। জেলার সদর শহরে অনুষ্ঠিত সরকারী কৃষি-শিল্প ও গবাদি-পশু প্রদর্শনীতে চাষে উৎপন্ন কপি, মূলা, কুমড়া প্রভৃতির জন্য সে বহু পুরস্কার পাইয়াছে, সার্টিফিকেট পাইয়াছে। বার দুয়েক মেডেলও পাইয়াছে;—ভাল বলদ, দুধালো গাইয়ের জন্যও তাহার প্রশংসাপত্র আছে। সেইগুলি সে দাখিল করে।

এতদিনে অবশ্য পুলিসের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। চাষে এমন উৎপাদন সত্ত্বেও তিনকড়ির জোত-জমার অধিকাংশ জমিই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। পঁচিশ বিঘার মধ্যে মাত্র পাঁচ বিঘা তাহার অবশিষ্ট আছে।

তিনকড়ির একসময় প্রেরণা জাগিয়াছিল—সে তাহাদের গ্রামের অধীশ্বর বৃক্ষতল-অধিবাসী বাবা মহাদেবের একটা দেউল তৈয়ারী করাইয়া দিবে। সেই সময় তাহার হাতে কতকগুলা নগদ টাকাও আসিয়াছিল। তাহাদের গ্রামের খানিকটা সীমানা ময়ূরাক্ষীর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত—ওপারের জংশন স্টেশনে নতুন একটা ইয়ার্ড তৈয়ারী করিবার প্রয়োজনে সেই সীমানার অধিকাংশটাই রেল-কোম্পানী গভর্নমেন্টের ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন আইন অনুসারে কিনিয়া লয়। ওই সীমানার মধ্যে তিনকড়িরও কিছু জমি ছিল—বাবা দেবাদিদেবেরও ছিল। বাবার জমির মূল্যটা বাবার অধীশ্বর জমিদার লইয়াছিলেন, টাকাটা খুব বেশী নয়—দুই শত টাকা। তিনকড়ি পাইয়াছিল শ'চারেক। তাহার উপর তখন তাহার ঘরে ধানও ছিল অনেকগুলি। এই মূলধনে তিনকড়ি উৎসাহিত হইয়া গাছতলাবাসী দেবাদিদেবকে গৃহবাসী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল! জমিদারের কাছে গিয়া প্রস্তাব করিল, দেবাদিদেবের জমির টাকাটা হইতে বাবার মাথার উপর একটা আচ্ছাদন তুলিয়া দেওয়া হউক! জমিদার বলিলেন—দুশো টাকায় দেউল হয় না।

তিনকড়ির অদম্য উৎসাহ, সে বলিল—আমরা চাঁদা তুলব, আপনি কিছু দেন, ভল্লারা গতরে খেটে দেবে—হয়ে যাবে একরকম করে। আরম্ভ করুন আপনি।

জমিদার বলিলেন—তোমরা আগে কাজ আরম্ভ কর, চাঁদা তোল—তারপর এ টাকা আমি দেব।

তিনকড়ি সে কথাই স্বীকার করিয়া লইল এবং ভল্লাদের লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। প্রায় হাজার ত্রিশেক কাঁচা ইট তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়া জমিদারকে গিয়া বলিল—কয়লা চাই, টাকা দেন।

জমিদার আশ্বাস দিলেন—একেবারে কয়লা-কুঠী থেকে কয়লা আনবার ব্যবস্থা করব।

কয়লা আসিবার পূর্বে বর্ষা আসিয়া পড়িল, ত্রিশ হাজার কাঁচা ইট গলিয়া আবার মাটি স্তূপে পরিণত হইল, বহু তালপাতা কাটিয়া ঢাকা দিয়াও তিনকড়ি তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। রাগে ফুটিয়া উঠিয়া এবার সে জমিদারকে আসিয়া বলিল—এ ক্ষতিপূরণ আপনাকে লাগবে।

জমিদার তৎক্ষণাৎ তাহাকে খেদাইয়া দিলেন।

তিনকড়ি ক্ষিপ্ত হইয়া দেবোত্তরের অর্থ আদারের জন্য জমিদারের নামে নালিশ করিল। দুই শত টাকা আদায় করিতে মুন্সেফী আদালত হইতে জজ আদালত পর্যন্ত সে খরচ করিল সাড়ে তিনশত টাকা। ইহাতেই শুরু হইল তাহার জমি-বিক্রয়। টাকা আদায় হইল না, উপরন্তু জমিদার মামলা খরচ আদায় করিয়া লইলেন। লোকে তিনকড়ির দুর্বুদ্ধির অজস্র নিন্দা করিল, কিন্তু তিনকড়ি কোনদিন আফসোস করিল না। সে যেমন ছিল তেমনি রহিল, শুধু ওই দেবাদিদেবকে প্রমাণ করা ছাড়িল ;—আজকাল যতবার ঐ পথে সে যায়-আসে, ততবারই বাবাকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যায়।

দেবাদিদেবের উদ্ধার চেষ্টার পরও তাহার যাহা ছিল—তাহাতেও তাহার জীবন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। কিন্তু ইহার পরই শিবু দারোগার নাকে ঘুষি মারার মামলায় পড়িয়া সে প্রায় তিন বিঘা জমি বেচিতে বাধ্য হইল। শিবু দারোগা আসিয়াছিল তাহার ঘর সার্চ করিতে। কোনও কিছু সন্দেহজনক না পাইয়া শিবচন্দ্রের মাথায় খুন চড়িয়া গেল ; ক্ষুব্ধ আক্রোশে যথেচ্ছ হাত-পা চালাইয়া তিনকড়ির ঘরের চাল-ডাল-নুন-তেল ঢালিয়া মিশাইয়া সে একাকার করিয়া দিল। খানাতল্লাসিতে তিনকড়ি আপত্তি করে নাই, বরং মনে মনে সকৌতুকে হাসিতেছিল। এমন সময় শিবু দারোগার এই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব দেখিয়া সে-ও ক্ষেপিয়া গেল। ধাঁ করিয়া বসাইয়া দিল শিবচন্দ্রের নাকে এক ঘুষি। প্রচণ্ড ঘুষি—দারোগার নাকের চশমাটা একেবারে নাক-কাটিয়া বসিয়া গেল। দারোগার নাকে সে দাগটা আজও অক্ষয় হইয়া আছে। সেই ব্যাপার লইয়া পুলিশ তাহার নামে মামলা করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও দারোগার নামে মামলা করিল—ওই তাণ্ডব নৃত্যের অভিযোগে। গ্রামের ভল্লারা সকলেই তিনকড়ির সাক্ষী, প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যের কথাটা সকলেই একবাক্যে নির্ভয়ে বলিয়া গেল। পুলিশ সাহেব আপোষে মামলা মিটাইয়া লইলেন। ততদিনে কিন্তু তিনকড়ির আরও তিন বিঘা জমি চলিয়া গিয়াছে।

বর্তমানে তিনকড়ি প্রজা-ধর্মঘটে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভল্লাদের লইয়া শ্রীহরির ঘরে ডাকাতি করিবার মত মনোবৃত্তি তাহার নয়। অবশ্য সে মাঠেও ও-কথাটা বলিয়াছিল—দোব ছিরেকে একদিন মূলোর মত মুচ্‌ড়ে।···কথাটা নেহাতই কথার কথা। তাহার কথারই ওই ধারা ; তাহার স্ত্রী যদি একটু উচ্চকণ্ঠে কথা বলে, তবে তৎক্ষণাৎ সে গর্জন করিয়া উঠে—টুটিতে পা দিয়ে দোব তোর 'নেতার' মেরে দেখবি ?···

সেদিন দেখুড়িয়ায় যে নাগরা বাজিল সে নাগরা তিনকড়িই বাজাইতেছিল।

এই গভীর দুর্যোগের রাত্রে নাগরার শব্দ শুনিয়া তিনকড়ির স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনকড়ির ঘুম অসাধারণ ঘুম; খাইয়া-দাইয়া বিছানায় পড়িবামাত্র তাহার চোখ বন্ধ এবং মিনিট তিনেকের মধ্যেই নাক ডাকিতে শুরু করে। নাকডাকা আবার যেমন-তেমন নয়, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে যেমন বিচিত্র, গর্জনগাম্ভীর্যে তেমনি গুরুগম্ভীর। রাত্রিতে প্রসুপ্ত পল্লীপথে তিনকড়ির বাড়ির অন্ততঃ আধ রশি দূর হইতে সে ধ্বনি শোনা যায়। একবার এ অঞ্চলের থানার নূতন জমাদার প্রথম দিন দেখুড়িয়ায় রোঁদে আসিয়া তিনকড়ির বাড়ির আধ রশিটাক দূরে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌকিদারটাকে বলিয়াছিল—এই! দাঁড়া!

চৌকিদারটা কিছু বুঝিতে পারে নাই, তাহার কাছে অস্বাভাবিক কিছুই ঠেকে নাই, সে একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—আজ্ঞে?

জমাদার দুই পা পিছাইয়া গিয়া চারিদিকে চাহিয়া গর্জনের স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল, দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—সাপ,—হারামজাদা, শুনতে পাচ্ছ না? গোঙাচ্ছে···তারপরই বলিয়াছিল—সাপে নেউলে বোধ হয় লড়াই লেগেছে। শুনতে পাচ্ছিস্?

এতক্ষণে চৌকিদারটা ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজ্ঞে না।

—না? মারব বেটাকে এক থাপ্পড়।

—আজ্ঞে না, উ তিনকড়ি মোড়লের নাক ডাকছে।

—নাক ডাকছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনকড়ি মোড়লের।

জমাদার বিস্ফারিত-নেত্রে আবার একবার প্রশ্ন করিয়াছিল—নাক ডাকছে?

এবার চৌকিদারটা আর হাসি সামলাইতে পারে নাই, খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, নাক।

—কোন্ তিনকড়ি? পুলিশ সস্‌পেক্ট্ যে লোকটা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোজ ডাকিস্ লোকটাকে?

চৌকিদারটা চুপ করিয়াছিল, কোনদিনই ডাকে না, ওই নাক ডাকার শব্দ হইতেই তিনকড়ি বাড়িতে থাকার প্রমাণ লইয়া চলিয়া যায়।

জমাদার বলিয়াছিল—থাক্, ডাকিস্ না বেটাকে। যেদিন নাক না-ডাকবে সেইদিন খবর করিস্।—কিছুক্ষণ পর আবার বলিয়াছিল—বেটা বড় সুখে ঘুমোয় রে!

এমনি ঘুম তিনকড়ির। এ ঘুম ভাঙাইলে আর রক্ষা থাকে না। কিন্তু আজ এই নিশীথরাত্রে নাগরার শব্দ শুনিয়া তিনকড়ির স্ত্রী লক্ষ্মীমণি স্থির থাকিতে পারিল না। সে চাষীর মেয়ে, নাগরার ধ্বনির অর্থ সে জানে, তাহার মনে হইল, ময়ূরাক্ষীতে বুঝি বন্যা আসিয়াছে। তিনকড়ির একটি ছেলে, একটি মেয়ে; ছেলেটির বয়স বছর ষোল, মেয়েটির বয়স চৌদ্দ। তাহাদেরও ঘুম ভাঙিয়াছিল। মেয়েটি মায়ের কাছেই শোয়, ছেলে শোয় পাশের ঘরে। তিনকড়ি শুইয়া থাকে বাহিরের বারান্দায়; পাশে থাকে একটা টেঁটা; একখানা খুব লম্বা হেঁসে দা এবং একগাছা লাঠি।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া তিনকড়ির স্ত্রী তাহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইল—ওগো—ওগো—ওগো!

প্রবল ঝাঁকুনিতে তিনকড়ি একটা চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল—এ্যাও! কে রে?—সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়াইল হেঁসো দা-খানার জন্য।

লক্ষ্মীমণি খানিকটা পিছাইয়া গিয়া বারবার বলিল—আমি—আমি—ওগো আমি ওগো আমি। আমি লক্ষ্মী-বউ! আমি সন্নর মা!

—কে? লক্ষ্মী-বউ?

—হ্যাঁ।

—কি?

—নাগরা বাজছে, বোধ হয় বান এসেছে।

—বান?

—ওই শোন নাগরা বাজছে।

তিনকড়ি কান পাতিয়া শুনিল। তারপর বলিল—হু।

লক্ষ্মীমণি বলিল—ঘর-দোর সামলাই?

তিনকড়ি উত্তর না দিয়া সেই দুর্যোগের মধ্যেই বারান্দার চালে উঠিয়া বারান্দার চাল হইতে তাহার কোঠা-ঘরের চালে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিল। নাগরা বাজিতেছে। হাঁকও উঠিতেছে। কিন্তু এ হাঁক তো বন্যা-ভয়ের হাঁক নয়!—আ—আ—হৈ! এ যে চৌকিদারী হাঁক। এদিকে ময়ূরাক্ষী হইতে তো কোন গোঁ-গোঁ ধ্বনি উঠিতেছে না। নদীর বুকে ডাক নাই। তবে তো এ ডাকাতির ভয়ের জন্য নাগরা বাজিতেছে! কাহারা? এ কাহারা?

তাহার গ্রামের পরেও চৌকিদার এবার হাঁকিয়া উঠিল—আ—আ—হৈ!

তিনকড়ি বারবার আপন মনে ঘাড় নাড়িল—হুঁ! হুঁ! হুঁ! ডাকাতির ভয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে নাগরা বাজিতেছে, আর দেখুড়িয়ার ভল্লাদের সাড়া

নাই! তাহারা লাঠি হাতে বাহির হয় নাই; বদমাস্ পাষণ্ডের দল সব!—সে চালের উপর হইতেই হাঁক মারিল—আ—আ—হৈ!

চৌকিদারিটা প্রশ্ন করিল—মোড়লমশাই?

—হ্যাঁ। দাঁড়া। তিনকড়ি কোঠার চাল হইতে বারান্দায় চালে লাফ দিয়া পড়িল, সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িল একেবারে উঠানে। দেরী তাহার আর সহিতেছিল না। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে বলিল—ভল্লাপাড়ায় কে কে নাই রে? ডেকে দেখেছিস?

চৌকিদারও জাতিতে ভল্লা। সে চুপি চুপি বলিল—রাম নাই একেবারে নিষাস। গোবিন্দ, রংলেলে (রঙলাল), বিন্দেবন, তেরে (তারিণী) এরাও নাই। আর সবাই বাড়িতে আছে।

—থানার কেউ রোঁদে আসবে না তো আজ?

—আজ্ঞে না।

তিনকড়ি আপন দাঁতে দাঁত ঘষিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে দুর্যোগময়ী রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা যেন চিরিয়া-ফাড়িয়া পর পর দুইটা বন্দুকের শব্দ ময়ূরাক্ষীর কূলে কূলে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তিনকড়ি শঙ্কিত হইয়া বলিল—বন্দুকের শব্দ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিছন হইতে তিনকড়ির ছেলে ডাকিল—বাবা!

ছেলে গৌর এবং মেয়ে স্বর্ণ বাপের বড় প্রিয়। গৌর মাইনর স্কুলে পড়ে, বাপের সঙ্গে চাষেও খাটে। ছেলের ধার তেমন নাই, নতুবা তিনকড়ি তাহাকে বি-এ, এম-এ পর্যন্ত পড়াইত। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলে—গৌরটা যদি মেয়ে হত, আর স্বর্ণ যদি আমার ছেলে হত!

সত্যই স্বর্ণ ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, মেয়েটি তাহাদের গ্রাম্য পাঠশালা হইতে এল-পি পরীক্ষা দিয়া মাসে দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু তারপর তাহার পড়ার উপায় হয় নাই। তবু সে দাদার বই লইয়া আজও নিয়মিত পড়ে; মাকে গৃহকর্মে সাহায্যও করে। চমৎকার সুশ্রী মেয়ে, কিন্তু হতভাগিনী। স্বর্ণ সাত বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। তিনকড়ির ঐ ক্ষুব্ধ কামনার মধ্যে বোধ হয় এ দুঃখও লুকানো আছে। স্বর্ণ যদি ছেলে হইত আর গৌর যদি মেয়ে হইত, তবে তো তাহাকে কন্যার বৈধব্যের দুঃখ সহ্য করিতে হইত না; গৌর তো স্বর্ণের ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিত না। ছেলে গৌর তাহার অত্যন্ত প্রিয়। বাপের মতই বলিষ্ঠ। ভোররাত্রি হইতে বাপের সঙ্গে মাঠে যায়, বেলা নয়টা পর্যন্ত তাহাকে সাহায্য করে; তারপর সে স্নান করিয়া খাইয়া

জংশনের স্কুলে পড়িতে যায়। বাবুদের স্কুল বলিয়া তিনকড়ি তাহাকে কঙ্কণায় পড়িতে দেয় নাই। যে বাবুরা দেবতার সম্পত্তি মারিয়া দেয়, তাহাদের স্কুলে পড়িলে তাহার ছেলেও পরের সম্পত্তি মারিয়া দিতে শিখিবে—এই তাহার ধারণা! চারিটায় বাড়ি ফিরিয়া গৌর আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাপকে সাহায্য করে, তাহার পর সন্ধ্যায় বাড়ির একটি মাত্র হ্যারিকেন জ্বালিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত পড়ে।

ছেলের ডাকে তিনকড়ি উত্তর দিল—কি বাবা?

—ঘর-দোর সামলাতে হবে না?

—না। তোমরা ঘরে গিয়ে শোও। আমি আসছি। ভয় নাই, কোন ভয় নাই! বানের ঢেঁড়া নয়।—বলিয়া চৌকিদার রতনকে ডাকিল—রতন, আয়।

গ্রামের প্রান্তে মাঠের ধারে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল জমাট-বস্তির সন্ধানে। চারিদিকে অন্ধকার থমথম করিতেছে। সঠিক কিছু বুঝা যাইতেছে না। হঠাৎ তিনকড়ি বলিল—রতন!

—আজ্ঞে।

—আঠারো সালের বান মনে আছে?

আঠারো সালের বন্যা ময়ূরাক্ষীর তটপ্রান্তবাসীদের ভুলিবার কথা নয়। যাহারা সে বন্যা দেখিয়াছে, তাহারা তো ভুলিবেই না, যাহারা দেখে নাই, তাহারা সে বানের গল্প শুনিয়াছে; সে গল্পও ভুলিবার কথা নয়। রতন বাগ্দীর পক্ষে তো আঠারো সালের বন্যা তাহার জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা। আঠারো সালের বন্যা আসিয়াছিল গভীর রাত্রে এবং আসিয়াছিল অতি অকস্মাৎ। তখন রতনের ঘর ছিল গ্রামের প্রান্তে—ময়ূরাক্ষীর অতি নিকটে! গভীর রাত্রে এমন অকস্মাৎ বান আসিয়াছিল যে, রতন স্ত্রী-পুত্র লইয়া শুধু হাতে-পায়েও ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, অগত্যা আপনার ঘরের চালে উঠিয়া বসিয়াছিল। ভোরবেলায় ঘর ধ্বসিয়া চালাখানা ভাসিল, ভাসিয়া চলিল বন্যার স্রোতে! দুর্দান্ত স্রোত। রতন নিজে সাঁতার দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া সে স্রোতে সাঁতার দিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। সেদিন তিনকড়ি এবং ওই রামভল্লা অনেকগুলি লাঙ্‌লাদড়ি বাঁধিয়া এক এক করিয়া সাঁতার দিয়া আসিয়া চালে দড়ি বাঁধিয়াছিল। শুধু তাই নয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই রতনের স্ত্রী টলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল বন্যার জলে। রামভল্লা ও তিনকড়ি ঝাঁপ দিয়া বন্যার জলে পড়িয়া তাহাকেও টানিয়া তুলিয়াছিল। সে কথা কি রতন ভুলিতে পারে? সেই অন্ধকারেই রতন হাত

বাড়াইয়া তিনকড়ির পা ছুঁইয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—সে কথা ভুলতে পারি মোড়লমশাই? আপুনি তো—

—আমার কথা নয়। রামার কথা বলছি। যদি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।

রত্ন বলিল—ওই দেখুন, আল্‌পথ ধরে ওই কালো কালো সব গাঁ ঢুকছে।

সাত

শ্রীহরি ঘোষ বাড়ি ফিরিয়া বাকী রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইয়া দিল। কিছুতেই ঘুম আসিল না. জমাট-বস্তি দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হইতেছে—এই পঞ্চগ্রামের সমস্ত লোক তাহার বিরুদ্ধে কঠিন আক্রোশে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। তাহারা তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়। পরশ্রীকাতর হিংসুক লোভীর দল সব! পূর্ব জন্মের পুণ্যফলে, এ জন্মের কর্মফলে মা লক্ষ্মী তাহার উপর কৃপা করিয়াছেন—তাহার ঘরে আসিয়া পায়ের ধুলা দিয়াছেন, সে অপরাধ কি তাহার? সে কি লক্ষ্মীকে অপরের ঘরে যাইতে বারণ করিয়াছে? সে এই অঞ্চলের জন্য তো কম কিছু করে নাই? প্রাইমারী ইস্কুলের ঘর করিয়া দিয়াছে, রাস্তা করিয়াছে, কুয়া করিয়াছে, পুকুর কাটাইয়াছে, মাটির চণ্ডীমণ্ডপও সে-ই পাকা করিয়া দিয়াছে লোকের পিতৃ-মাতৃদায়ে, কন্যাদায়ে, অভাব অনটনে সে-ই টাকা ঋণ দেয়, ধান 'বাড়ি' দেয়। অকৃতজ্ঞের দল সে কথা মনেও করে না। তাহার বিরুদ্ধে কে কি বলে—সে সব খবর রাখে।

অকৃতজ্ঞেরা বলে—ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুল-ঘর, বোর্ডই তৈরী করে দিত। আমরাও তো ট্যাক্স দি।...

ওরে মূর্খের দল—ট্যাক্স থেকে কটা টাকা ওঠে?...

বলে—নইলে ছেলেরা আমাদের গাছতলায় পড়ত।...

তাই উচিত ছিল।

রাস্তা সম্বন্ধেও তাহাদের ওই কথা।

চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে বলে—ওটা তো শ্রীহরি ঘোষের কাছারী।

কাছারী নয়—শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়ি। চণ্ডীমণ্ডপ যখন জমিদারের, আর সে যখন গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব কিনিয়াছে—তখন একশোবার তাহার। আইন যখন তাহাকে স্বত্ব দিয়াছে, সরকার যখন আইনের রক্ষক, তখন সে স্বত্ব উচ্ছেদ করিবার তোরা কে? দেবু ঘোষের বাড়ির মজলিশে মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাতি নাকি বলিয়াছে—চণ্ডীমণ্ডপের সৃষ্টিকালে জমিদারই ছিল না,

তখন চণ্ডীমণ্ডপ তৈয়ারী করিয়াছিল গ্রামের লোকে,—গ্রামের লোকেরই সম্পত্তি ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবতুল্য ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার এই নাতিটির পাখনা গজাইয়াছে। পুলিশ তাহার প্রতি-পদক্ষেপের খবর রাখে। চণ্ডীমণ্ডপ যদি গ্রামের লোকেরই ছিল, তবে জমিদারকে তাহারা দখল করিতে দিল কেন?

পুকুর কাটাইয়াছে শ্রীহরি; লোকে পুকুরের জল খায়, অথচ বলে—জল তো ঘোষের নয়, জল মেঘের। শ্রীহরি মাছ খাবার জন্যে পুকুর কাটিয়াছে, আম-কাঁঠাল খাবার জন্যে চারিদিকে বাগান লাগিয়েছে—আমাদের জন্যে নয়। বারণ করে, খাব না পুকুরের জল।...

বারণই তাহার করা উচিত। না; তাহা সে কখনও করিবে না। আবার পরজন্ম তো আছে। জন্মান্তরেও সে এই পুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আগামী জন্মে সে রাজা হইবে।

ঋণের জন্য তাহারা বলে—ঋণ দেয়, সুদ নেয়।

আশ্চর্য কথা, অকৃতজ্ঞের উপযুক্ত কথা! ওরে, সেই বিপদের সময় দেয় কে? ঋণ লইলেই সুদ দিতে হয়—এই আইনের কথা, শাস্ত্রের কথা। উঃ পাষণ্ড অকৃতজ্ঞের দল সব!...

চিন্তা করিতে করিতে শ্রীহরি তিন কল্কে তামাক খাইয়া ফেলিল। আজকাল তামাক তাহাকে নিজে সাজিতে হয় না, তাহার স্ত্রীও সাজে না বাড়িতে এখন শ্রীহরি চাকর রাখিয়াছে, সেই সাজিয়া দেয়।

সকালে উঠিয়াই সে জংশন-শহরে রওনা হইল। গতরাত্রে জমাট-বস্তির কথা থানায় ডায়রি করিবে; লোক পাঠাইয়া কাজটা করিতে তাহার মন উঠিল না। কর্মচারী ঘোষ অবশ্য পাকা লোক, তবুও নিজে যাওয়াই সে ঠিক মনে করিল। সংসারে অনেক জিনিসই ধারে কাটে বটে, কিন্তু ভার না থাকিলে অনেক সময়ই শুধু ধারে কাজ হয় না ক্ষুদ্র পোঁচ দিয়ে নালী কাটা যায়, কিন্তু বলিদান দিতে হলে গুরু-ওজনের দা চাই। সে নিজে গেলে দারোগা-জমাদার বিষয়টার উপর যে মনোযোগ দিবে, ঘোষ গেলে তাহার শতাংশের একাংশও দিবে না।

টাপর বাঁধিয়া গরুর গাড়ি সাজান হইল। জংশন-শহরে আজকাল পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া-আসা সে বড় একটা করে না। গাড়ির সঙ্গে চলিল কালু শেখ। কালু শেখ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়াছে। গাড়ির মধ্যে শ্রীহরি লইয়াছে কিছু ডাব, এককাঁদি মর্তমান কলা, দুইটি ভাল কাঁঠাল। বড় আকারের হৃষ্টপুষ্ট বলদ দুইটা দেখিতে ঠিক একরকম, দুইটার রঙই সাদা, গলায় কড়ির মালার

সঙ্গে পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। টুং-টাং ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ি কাঁধে বলদ দুইটা জোর কদমে চলিল।

শ্রীহরি ভাবিতেছিল—ডায়রির ভিতর কোন্ কোন্ লোকের নাম দিবে সে? তিনকড়ির নাম তো দিতেই হইবে। থানার দারোগা নিজেই ও নামটার কথা বলিবে। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ নাকি পুনরায় তিনকড়ির বিরুদ্ধে বি-এল কেসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দারোগা নিজে বলিয়াছে, লোকটা যদি নিজে ডাকাত না হয়, ডাকাতির মালও যদি না সামলায়, তবু ও যখন ভল্লাদের কেসের তদ্বির করে, তখন যোগাযোগ নিশ্চয় আছে!

ভল্লাদের মধ্যে রামভল্লা নেতা। অন্য ভল্লাদের নাম তদন্ত করিয়া পুলিশই বাহির করিবে। আর কাহার নাম? রহম শেখ? ও লোকটাও পুলিশের সন্দেহভাজন ব্যক্তি। ভল্লা না হইলেও—ভল্লা-প্রধান ডাকাতের দলে না থাকিতে পারে এমন নয়। প্রজা-ধর্মঘটের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে ওই লোকটার প্রচণ্ড উৎসাহ এবং লোকটা পাশণ্ডও বটে! সুতরাং ধর্মঘটিদের মধ্যে দুর্ধর্ষ পাষণ্ড যাহারা, তাহারা যদি এই সুযোগে তাহার বাড়িতে ডাকাতির মতলব করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে রহমের সংস্রব থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ভল্লা-প্রধান ডাকাত-দলের মধ্যে মুসলমানও থাকে; মুসলমান-প্রধান দলে দু-একজন ভল্লার সন্ধানও বহুবার মিলিয়াছে। তিনকড়ি, রহম—আর কে?

অকস্মাৎ গাড়িখানার একটা ঝাঁকিতে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল; আঃ বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই সে দেখিল—গাড়িখানা রাস্তার মোড়ে বাঁক ফিরিতেছে, ডাইনের সতেজ সবল গরুটা লেজে মোচড় খাইয়া লাফ-দিয়া বাঁক ফিরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, ভাল তেজী গরুর লক্ষণই এই! টাকা তো কম লাগে নাই, সাড়ে তিনশো টাকা জোড়াটার দাম দিতে···। মনের কথাও তাঁহার শেষ হইল না। সম্মুখেই অনিরুদ্ধর দাওয়া, দাওয়াটার উপর কামার-বউ একটা নয়-দশ বছরের ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, ছেলেটা প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় একহাতে কামার-বউয়ের চুল ধরিয়া টানিতেছে, অন্য হাতে তাহাকে ঠেলিতেছে। কামার-বউয়ের মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, দেহের আবরণও বিস্রস্ত, চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে যেন থম্ থম্ করিতেছে।

শ্রীহরির বুকের ভিতরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া প্রচণ্ডবেগে লাফাইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের মধ্যে পূর্বতন ছিরু উঁকি মারিল, তাহার

বহুদিনের নিরুদ্ধ বাসনা উল্লাসে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি আপনাকে সংযত করিল। সে জমিদার, সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাছাড়া পাপ সে আর করিবে না! পাপের সংসারে লক্ষ্মী থাকেন না। কিন্তু তবু সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল বিস্রস্তবাস অনবগুণ্ঠিতা পদ্মের দিকে।

সহসা পদ্মের দৃষ্টিও পড়িল তাহার দিকে। বলদের গলায় ঘণ্টার শব্দে গাড়ির দিকে চাহিয়া সে দেখিল শ্রীহরি ঘোষ, সেই ছিরু পাল, তাহার দিকে চাহিয়া আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিল। ছেলেটা সেই উচ্চিংড়ে। সকাল বেলাতেই সে জংশন হইতে গ্রামে আসিয়াছে। আজ ছিল লুণ্ঠন-ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর দিন মা-মণিকে তাহার মনে পড়িয়াছিল। পড়িবার কারণও ছিল—পূর্বে ষষ্ঠীর দিন মা-মণি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিত প্রচুর। কিন্তু এবার কোনও আয়োজনই নাই দেখিয়া সে পলাইয়া যাইতেছে। মুখে কিছু বলে নাই। বোধ হয় লজ্জা হইয়াছে। নজরবন্দী যতীনবাবু যখন এখানে পদ্মের বাড়িতে থাকিত—তখন যতীনবাবু পদ্মকে বলিত 'মা-মণি'; উচ্চিংড়েও তখন যতীনবাবুর কাছে পেট পুরিয়া ভাল খাইতে পাইত বলিয়া এইখানেই পড়িয়া থাকিত, পদ্মকে সে-ও মা-মণি বলিত। আজ মা-মণি তাহাকে বারবার অনুরোধ করিল—এইখানে থাকিতে, অবশেষে পাগলের মত তাহাকে এমনিভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

ছাড়া পাইয়া উচ্চিংড়ে দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বোঁ-বোঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল। পদ্ম আপনাকে সম্বৃত করিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। গাড়ীখানাও কামার-বাড়ি পার হইয়া গেল।

শ্রীহরির অনেক কথা মনে হইল। অনিরুদ্ধ কামার শয়তান, তাহার ঠিক হইয়াছে। জেল খাটিতে হইয়াছে, দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে। সে সময় ওই কামারণীটির উপর তাহার লুব্ধদৃষ্টি ছিল, আজও বোধ হয়···কিন্তু মেয়েটার চলে কেমন করিয়া? দেবু ধান দেয় বলিয়া শুনিয়াছে সে। কেন? দেবু ধান দেয় কেন? মেয়েটাই বা নেয় কেন? সে-ও তো দিতে পারে ধান; অনেক লোককেই সে ধান দান করে। কিন্তু কামার-বউ তাহার ধান কখনই লইবে না। শুধু তাহার কেন—দেবু ছাড়া বোধ হয় অন্য কাহারও কাছে ধান লইবে না।

গ্রাম পার হইয়া, কঙ্কণা ও তাহাদের গ্রামের মধ্য-পথে একটা বড় নালা; দুইখানা গ্রামের বর্ষার জল ওই নালা বাহিয়া ময়ূরাক্ষীতে গিয়া পড়ে। বেশী বর্ষা হইলে নালাটাই হইয়া উঠে একটা ছোট-খাটো নদী। তখন এই নালাটার

জন্য তাহাদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া একটা দুর্ঘট ব্যাপার হইয়া উঠে। সম্প্রতি জংশন-শহরের কলওয়ালারা এবং গদীওয়ালারা ইহার উপর একটা সাঁকো বাঁধিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে বলিয়াছে। তাহারা যথেষ্ট সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছে। সাঁকোটা বাঁধা হইলে—বর্ষার সময়েও এদিককার ধান-চাল—রেলওয়ে ব্রীজের উপর দিয়া জংশনে যাইতে পারিবে।

শ্রীহরি আপন মনেই বলিল—আমি বাধা দেব। দেখি কি করে সাঁকো হয়। এ গাঁয়ের লোককে আমি না-খাইয়ে মারব।

আজও নালাটায় এক কোমর গভীর জল খরস্রোত বহিতেছে! গতকাল বোধহয় সাঁতার-জল হইয়াছিল। নালাটার দুইধারে পলির মত মাটির স্তর পড়িয়াছে। গাড়ি নালায় নামিল। পলি-পড়া জায়গাগুলিতে একহাঁটু কাদা। কিন্তু শ্রীহরির বলদ দুইটা শক্তিশালী জানোয়ার, তাহারা অবলীলাক্রমে গাড়িটা টানিয়া ও-পারে লইয়া উঠিল ; এই কাদায় বেটা চাষাদের হাড় পাঁজরা বাহির করা বলদ-বাহিত বোঝাই গাড়ি যখন পড়িবে—তখন একটা বেলা অন্ততঃ এইখানেই কাটিবে। নিজেরাও তাহারা চাকায় কাঁধ লাগাইয়া গাড়ি ঠেলিবে, পিঠ বাঁকিয়া যাইবে ধনুকের মত ; কাদায়, ঘামে ও জলে ভূতের মত মূর্তি হইবে। শ্রীহরির মুখখানা গাম্ভীর্য-পূর্ণ ক্রোধে থম্ থম্ করিতে লাগিল।

নালাটার পরে খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়াই রেলওয়ে ব্রীজ। শ্রীহরির গাড়ি ব্রীজে আসিয়া উঠিল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা—পুরনো কালের খিলান-করা ব্রীজ। একদিকে রাশি-রাশি বেলে-পাথর-কুচির বন্ধনীর মধ্যে দিয়া চলিয়া গিয়াছে রেলের লাইন—লাইনের পাশ দিয়া অন্য দিকে মানুষ যাইবার পথ। শ্রীহরির যোয়ান গরু দুইটা লাইন দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিল—কোঁস-কোঁস শব্দে বার বার ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। কচি বয়স হইতে তাহারা অজ-পাড়াগাঁয়ে কোন গরীব চাষীর ঘরে, মেটে ঘর, মেঠো নরম মাটির পথ, শান্ত স্তব্ধ পল্লীর জনবিরলতার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছে ; মাত্র কয়েক মাস হইল আসিয়াছে শ্রীহরির ঘরে। এই ইট-পাথরের পথ, লোহার চক-চকে রেল-লাইন—এ সব তাহাদের কাছে বিচিত্র বিস্ময় ; অজানার মধ্যে বিস্ময়ে ভয়ে গরু দুইটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রীজ পার হইয়া খেয়া-ঘাট পার হইতে হইবে।

শ্রীহরি গাড়োয়ানকে বলিল—হুঁশ করে চালা।—বলিয়া সে হাসিল। জংশন-শহর তাহাদের কাছেও বিস্ময়। তাহার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হইল। মূল রেল-লাইনটা অবশ্য অনেক দিনের, স্টেশনটা তখন একটা ছোট স্টেশন ছিল। গ্রামটাও ছিল নগণ্য পল্লীগ্রাম। তাহার বয়স যখন বারো-তেরো

বৎসর, তখন স্টেশনটা পরিণত হইল বড় জংশনে। দুই দুইটা ব্রাঞ্চ লাইন বাহির হইয়া গেল। সে-সব তাহার বেশ মনে আছে। পূর্বকালে শ্রীহরি মূল লাইনের গাড়িতে চড়িয়া কয়েকবার গঙ্গাস্নানে গিয়াছে—আলিমগঞ্জ, খাগড়া প্রভৃতি স্থানে। তখন ঐ স্টেশনটায় কিছুই মিলিত না। স্টেশনের পাশে মিলিত শুধু মুড়ি-মুড়কি-বাতাসা। তখন এ অঞ্চলের বাবুদের গ্রাম, ওই কঙ্কণা ছিল—তখনকার বাজারে-গ্রাম। ভাল মিষ্টি, মনিহারীর জিনিস, কাপড় কিনিতে লোকে কঙ্কণায় যাইত। তারপর ব্রাঞ্চ লাইন পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনটা হইল জংশন। বড় বড় ইমারত তৈয়ারী হইল, বিস্তীর্ণ মাঠ ভাঙ্গিয়া রেল-ইয়ার্ড হইল, সারি সারি সিগ্‌নালের স্তম্ভ বসিল, প্রকাণ্ড বড় মুসাফিরখানা তৈয়ার হইল। কোথা হইতে আসিয়া জুটিল দেশ-দেশান্তরের ব্যবসায়ী,—বড় বড় গুদাম বানাইয়া এই অঞ্চলটার ধান, চাল, কলাই, সরিষা আলু কিনিয়া বোঝাই করিয়া ফেলিল। আমদানীও করিল কত জিনিস—হরেক রকমের কাপড়, যন্ত্রপাতি, মশলা, দুর্লভ মনিহারী বস্তু। হারিকেন লণ্ঠন ও জংশনের দোকানেই তাহারা প্রথম কিনিয়াছেন ; হারিকেন, দেশলাই, কাচের দোয়াত, নিবের হোল্‌ডার কলম, কালির বড়ি, হাড়ের বাঁটের ছুরি, বিলাতি কাঁচি, কারখানায়-তৈয়ারী ঢালাই-লোহার কড়াই, বালতি, কাল-কাপড়ের ছাতা, বার্নিশ করা জুতা, এমন কি কারখানার তৈয়ারী চাষের সমস্ত সরঞ্জাম ; টামনা,—বিলাতি গাঁইতি, খন্তা, কুড়ুল, কোদাল, ফাল পর্যন্ত। বড় বড় কল তৈয়ারী হইল—ধান-কল, তেল-কল, ময়দা-কল। ভানাড়ী কলু মরিল—ঘরের জাঁতা উঠিল। ছোটলোকের আদর বাড়িল—দলে দলে আশ-পাশের গ্রাম খালি করিয়া সব কলে আসিয়া জুটিয়াছে।

শ্রীহরির গাড়ি স্টেশন-কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়া চলিয়াছিল। অদ্ভুত গন্ধ উঠিতেছে ; তেল-গুড়-ঘি, হরেক রকম মশলা—ধনে, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, লবঙ্গের গন্ধ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ; তাহার মধ্যে হইতে চেনা যাইতেছে—তামাকের উগ্র গন্ধ। অদূরে ধান-কল হইতে ইহার সঙ্গেই আবার ভাসিয়া আসিয়া মিশিতেছে—সিদ্ধ ধানের গন্ধ। স্টেশন-ইয়ার্ড হইতে মধ্যে মধ্যে এক এক দমকা কয়লার ধোঁয়াও আসিয়া মিশিতেছে তাহার শ্বাসরোধী গন্ধ লইয়া। রেল-গুদামের চারিটা পাশে—ওই সমস্ত জিনিস পড়িয়া চারিদিকের মাটি ঢাকিয়া গিয়াছে।

গাড়োয়ানটা সহসা বলিয়া উঠিল—ওরে বাপ্‌স্ রে গাঁট কত রে ?

শ্রীহরি মুখ বাড়াইয়া দেখিল—সত্যই দশ-বারোটা কাপড়ের বড় গাঁট পড়িয়া আছে। পাশে পড়িয়া আছে প্রায় পঞ্চাশটা চটের গাঁট। গাড়োয়ানটা

সবগুলোকেই কাপড় মনে করিয়াছে। এক পাশে পড়িয়া আছে—কতকগুলো কাঠের বাক্স। নূতন কাপড় এবং চটের গন্ধের সঙ্গে—ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ উঠিতেছে ; তাহার সহিত মিশিয়াছে—চায়ের পাতার গন্ধ।

গুদামটায় দুমাদুম শব্দ উঠিতেছে, মালগাড়ী হইতে মাল খালাস হইতেছে। রেল-ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের ষ্টীমের শব্দ, বাঁশীর শব্দ, দ্রুত চলন্ত বিশ-পঞ্চাশ-শত-দেড়শত জোড়া লোহার চাকার শব্দ, কলগুলার শব্দ, মোটরবাসের গর্জন,—মানুষের কলরবে চারিদিকে মুখরিত।

দিন দিন শহরটা বাড়িতেছে ? রাস্তার দুপাশে পাকাবাড়ির সারি বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফটকে নাম লেখা হরেক ছাঁদের একতলা দোতলা বাড়ি ; দোকানের মাথায় বিজ্ঞাপন ; দেওয়ালে বিজ্ঞাপন।

গাড়োয়ানটা বলিয়া উঠিল—ওঃ, পায়রার ঝাঁক দেখো দেখি!···প্রায় দুইশতখানেক পায়রা রাস্তার উপর নামিয়া শস্যকণা খুঁটিয়া খাইতেছে। লোক কিংবা গাড়ি দেখিয়াও তাহারা ওড়ে না, অল্প-স্বল্প সরিয়া যায় মাত্র। জংশন-শহর তাহাদের কাছেও এখন বিস্ময়ের বস্তু। সহসা শ্রীহরির একটা কথা মনে হইল,—এখনকার কলওয়ালা কয়েকজন এবং গদীওয়ালা মহাজনগুলি তাহাদের অর্থাৎ জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষ লইয়া কতখানি উস্কানী দিতেছে, সন্ধান লইতে হইবে। সে তাহাদের জানে। উহাদের জন্য চাষী-প্রজারা এতখানি বাড়িয়াছে। ছোটলোকগুলা তো কলের কাজ পাইয়াই চাষের মজুরি ছাড়িয়াছে। তাহাদের শাসন করিতে গেলে—বেটারা পলাইয়া আসিয়া কলে ঢুকিয়া বসে। কলের মালিক তাহাদের রক্ষা করে। কত জনের কাছে তাহার ধানের দাদন এইভাবে পড়িয়া গেল তাহার হিসাব নাই। চাষ-বাস করা ক্রমে ক্রমে কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চাষীদের দাদন দেয় ইহারাই, জমিদারের সঙ্গে বিরোধে তাহাদের পক্ষ লইয়া আপনার লোক সাজে। মূর্খেরা গলিয়া গিয়া দাদন নেয় ; ফসলের সময় পাঁচ টাকা দরের মাল তিন টাকায় দেয় —তবু মূর্খদের চৈতন্য নাই! এখনও একমাত্র ভরসার কথা—মিলওয়ালারা গদীওয়ালারা ধান ঋণ দেয় না, দেয় টাকা। ধানের জন্য চাষী-বেটাদের এখনও জমিদার-মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়।

গাড়িটা রাস্তা হইতে মোড় ঘুরিয়া থানা-কম্পাউণ্ডের ফটকে ঢুকিল।

দারোগা হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন—আরে, ঘোষমশাই যে! কি খবর ? এদিকে কোথায় ?

শ্রীহরি বিনয় করিয়া বলিল—হুজুরের দরবারেই এসেছি। আপনারা রক্ষে করেন তবেই, নইলে তো ধনে-প্রাণে যেতে হবে দেখছি।

—সে কি!

—খবর পেয়েছেন নাকি কাল রাত্রে জমাট-বস্তি হয়েছিল—মৌলকিনীর বটতলায়? ভূপাল-রতন আসে নাই?

—কই না—বলিয়া পরমুহূর্তেই হাসিয়া দারোগা বলিলেন—আর মশাই, থানা-পুলিশের ক্ষমতাই নাই তো আমরা করব কি? এখন তো মালিক আপনারাই—ইউনিয়ন-বোর্ড। ভূপাল-রতনের আজ ইউনিয়ন-বোর্ডে কাজের পালি। কাজ সেরে আসবে।

—আমি কিন্তু বারবার করে সকালেই আসতে বলেছিলাম।

—বসুন, বসুন। সব শুনছি।

শ্রীহরি কালু শেখকে বলিল—কালু, ও-গুলো নামা।

কালু নামাইল—কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি।

দারোগা বক্রভাবে সেগুলির উপর চকিতে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন,—চা খাবেন তো? তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তার ও-পারের চায়ের দোকানীকে হাঁকিয়া বলিলেন—এই, দু কাপ চা, জল্দি!

শ্রীহরিকে লইয়া তিনি অফিসে গিয়া বসিলেন। চা খাইয়া বলিলেন—সিগারেট বের করুন। সিগারেট ধরিয়ে শোনা যাক্ কালকের কথা।

শ্রীহরি বাড়িতেও সিগারেট খায় না, কিন্তু রাখে; দারোগা হাকিম প্রভৃতি ভদ্র লোকজন আসিলে বাহির করে। বাহিরে গেলে সঙ্গে লয়, আজও সঙ্গে আনিয়াছিল। সে সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিল। দারোগা দ্বাররক্ষী কনেস্টবলকে বলিলেন—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শ্রীহরি থানার অফিস-ঘর হইতে বাহির হইল। দারোগাও বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—ও আপনি ঠিক করেছেন, কোন ভুল হয়নি—অন্যায়ও হয়নি। ঠিক করেছেন!

শ্রীহরি একটু হাসিল—শুষ্ক-হাসি।

সে গত রাত্রের জমাট-বস্তির কথা ডায়রি করিয়া, ঐ সঙ্গে তাহার যাহাদের উপর সন্দেহ হয়, তাহাদের নামও দিয়াছে। রামভল্লা, তিনকড়ি মণ্ডল, রহম শেখ-এর নামগুলি তো বলিয়াছে-ই, উপরন্তু সে দেবু ঘোষের নামও উল্লেখ করিয়াছে। তাহাকে তাহার সন্দেহ হয়। গোটা-ব্যাপারটাই যদি প্রজা-ধর্মঘটের ফেঁকড়া হয়, তবে দেবুকে বাদ দেওয়া যায় না; দেবুই সমস্তের মূল—সে-ই সমস্ত মাথায় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, পিছন হইতে প্রেরণা যোগাইতেছে।

দারোগা প্রথমটা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—তা কি সম্ভব ঘোষমশায়? দেবু ঘোষ—ডাকাতির ভেতর?

শ্রীহরি তখন বাধ্য হইয়া গতকাল গভীর রাত্রে সে দুর্যোগের মধ্যেও গ্রামপ্রান্তে দেবুর প্রতি দরদী দুর্গা মুচিনীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল—দেবু ছোঁড়ার পতন হয়েছে দারোগাবাবু।

—বলেন কি!

—শুধু দুর্গাই নয়; দেবু ঘোষ এখন অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রীর ভরণপোষণের সমস্ত ভার নিয়েছে তা খবর রাখেন?

দারোগা কিছুক্ষণ শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া খস্ খস্ করিয়া সমস্ত লিখিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন—তবে আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন।

শ্রীহরি চমকিয়া উঠিয়াছিল—আপনি লিখলেন নাকি দেবুর নাম?

—হ্যাঁ। চরিত্রদোষ যখন ঘটেছে, তখন অনুমান ঠিক।

—না—না। তবু ভাল করে জেনে লিখলেই ভাল হত—

দারোগা হাসিয়া বারবার তাহাকে বলিলেন—কোন অন্যায় হয়নি আপনার। ঠিক ধরেছেন আর ঠিক করেছেন আপনি।

ফিরিবার পথে দুই চারিজন গদীওয়ালা মহাজন ও মিল-মালিকদের ওখানেও সে গেল। কিন্তু কোন সঠিক সংবাদ মিলিল না। কেবল একজন মিলওয়ালা বলিল—টাকা আমরা দোব ঘোষমশায়। জমি হিসেব করে টাকা দোব। আপনাদের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ বেধেছে, আমাদের লাভের এই তো মরসুম।—সে দর্পের হাসি হাসিল।

শ্রীহরি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইল—কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। সে-ও একটু হাসিল।

মিলওয়ালা ভদ্রলোকটি বেঁটে-খাটো মানুষ, বড়লোকের ছেলে; জংশন-শহরে তাহার দুইটা কল—একটা ধানের, একটা ময়দার। অনেকটা সায়েবী চালের ধারা-ধরণ; কথাবার্তা পরিষ্কার স্পষ্ট, তাহার মধ্যে একটু দাম্ভিকতার আভাস পাওয়া যায়। সে-ই আবার বলিল—কলের মজুর নিয়ে আপনারা তো আমাদের সঙ্গে হাঙ্গামা কম করেন না। কথায় কথায় আপন আপন এলাকার মজুরদের আটক করেন। প্রজাদের বলেন—কলে খাটতে যাবিনে, গদীওয়ালার দাদন নিতে পারবিনে, তাদিকে ধান বেচতে পারবিনে। এখন আপনাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেধেছে, এই তো আমাদের পক্ষে সুবিধের সময় তাদের আরো আপনার করে নেবার।

শ্রীহরির অন্তরটা গর্তের ভিতরকার খোঁচা-খাওয়া ক্রুদ্ধ আহত সাপের মত পাক খাইতেছিল, তবুও সে কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল ও নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল।

মিলওয়ালা বলিল—কিছু মনে করবেন না, স্পষ্ট কথা বলেছি আমি।

শ্রীহরি ঘাড় নাড়িয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

মিলওয়ালা বাহিরে আসিয়া আবার বলিল—আপনি কোন্‌টা চাচ্ছেন? আমরা টাকা না দিলে প্রজারা টাকার অভাবে মামলা করতে পারবে না, তা হলেই বাধ্য হয়ে মিটমাট করবে! না তার চেয়ে আমরা টাকা দিই প্রজাদের? মামলা করে যাক্ তারা আপনাদের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত তারা তো হারবেই; একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে হারবে! তখন আপনাদের আরও সুবিধে। লোকটি বিজ্ঞতার হাসি হাসিতে লাগিল।

শ্রীহরি কোন উত্তর না দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—কঙ্কণায় চল্।

মিলওয়ালা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—জমিদার কনফারেন্স নাকি?

শ্রীহরি চকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার মিলওয়ালার দিকে চাহিল, তারপর সে ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠিল। তেজীবলদ দুইটা লেজে মোচড় খাইয়া লাফাইয়া গাড়িখানাকে লইয়া ঘুরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মিলের বাঁধানো উঠানো মেয়ে-মজুরদের কয়েকজন তাহাকেই দেখিতেছিল। শ্রীহরি দেখিল—তাহারাই গ্রামের একদল মুচি ও বাউড়ীর মেয়ে। মিলের বাঁধানো প্রাঙ্গণে মেয়ে-মজুরেরা পায়ে পায়ে সিদ্ধ ধান ছড়াইয়া চলিয়াছে—আর মৃদুস্বরে একসঙ্গে গলা মিলাইয়া গান গাহিতেছে।

শ্রীহরি আসিয়া উঠিল মুখুয্যেদের কাছারীতে।

মুখুয্যেবাবুরা লক্ষপতি ধনী। বৎসরে লক্ষ টাকার উপর তাঁহাদের আয়। শুধু এ অঞ্চলের নয়, গোটা জেলাটার অন্যতম প্রধান ধনী। কঙ্কণা অবশ্য বহুকালের প্রাচীন ভদ্রলোকের গ্রাম; কিন্তু বর্তমান কঙ্কণার যে রূপ এবং জেলার মধ্যে যে খ্যাতি, সে এই মুখুয্যেবাবুদের কীর্তির জন্যই। বড় বড় ইমারত, নিজেদের জন্য বাগান-বাড়ি, সাহেব-সুবার জন্য অতিথি-ভবন, সারি সারি দেবমন্দির, স্কুল, হাসপাতাল, বালিকা-বিদ্যালয়, ঘাটবাঁধানো বড় বড় পুকুর ইত্যাদি—মুখুয্যেবাবুদের অনেক কীর্তি। জমিদারী সম্পত্তি সবই প্রায় দেবোত্তর। দেবোত্তর হইতেই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ভার নির্বাহ হয়। সাহেবদের জন্য মুর্গি কেনা হয়, মদ কেনা হয়, বাবুর্চির বেতন দেওয়া হয়, খেমটা-নাচওয়ালী বাইজী আসে, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতির দল আসে। বাবুদের ছেলেরাও রঙ-চঙ মাখিয়া থিয়েটার করে। দেবোত্তরের আয়ও প্রচুর। ন্যায্য আয়ের উপরেও আবার উপরি আয় আছে। দেবোত্তরের সকল আদান-প্রদানেই টাকায় এক পয়সা হিসাবে দেবতার পার্বণী আছে; টাকা নিতে গেলে টাকায় এক পয়সা বাড়তি দিতে হয় দেনাদারকে-টাকা নিতে গেলে টাকায় এক পয়সা

কম নিতে হয় পাওনাদারকে। মুখুয্যে-কর্তা হিসেবী বুদ্ধিমান লোক। শ্রীহরি মুখুয্যে-কর্তার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

মুখুয্যে কর্তা বলিলেন—তাই তো হে, তুমি হঠাৎ এলে ? আমি ভাবছিলাম একটা দিন ঠিক করে আরও সব যাঁরা জমিদার আছেন, তাঁদের খবর দোব। সকলে মিলে কথাবার্তা বলে একটা পথ ঠিক করা যাবে।

শ্রীহরি বলিল—আমি এসেছি আপনার কাছে উপদেশ নিতে। অন্য জমিদার যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে কিছু হবে না বাবু ; অবস্থা তো সব জানেন !

মুখুয্যে-কর্তা হাসিয়া বলিলেন—সেইজন্যেই তো।

শ্রীহরি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কর্তা বলিলেন—ওঁরা সব বনেদী জমিদার। জেদ চাপলে বুদ্ধির মামলা করবেন বই কি। জেদ চাপিয়ে দিতে হবে।

শ্রীহরি হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—প্রজারা ধর্মঘট করে খাজনা বন্ধ করলে—ক'দিন মামলা করবেন সব ?

—টাকা ঠিক করে রাখ তুমি। ছোটখাটো যারা তাদের তুমি দিয়ো। বড় যারা তাদের ভার আমার উপর রইল। টাকা-আদায় সম্পত্তি থেকেই হবে।

শ্রীহরি অবাক হইয়া গেল।

কর্তা বলিলেন—এতে করবার বিশেষ কিছু নাই ; এক কাজ কর। তুমি তো ধানের কারবার কর ? এবার ধান দাদন বন্ধ করে দাও। কোন চাষীকে ধান দিয়ো না।—বলিয়া তিনি হাঁকিয়া গদী-ঘরের কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—কে আছ, পাঁজীটা দিয়ে যাও তো হে।

পাঁজী দেখিয়া তিনি বলিলেন—হুঁ। মুসলমানদের রমজানের মাস আসছে। রোজার মাস। রোজা ঠাণ্ডার দিন ইদল্‌ফেতর পরব। ধান দিয়ো না, মুসলমানদের কায়দা করতে বেশী দিন লাগবে না—আবার তিনি হাসিয়া বলিলেন—পেটে খেতে না পেলে বাঘও বশ মানে।

শ্রীহরি প্রণাম করিয়া বলিল—যে আজ্ঞে, তাহলে আজ আমি আসি।

কর্তা হাসিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—মঙ্গল হোক তোমার! কিছু ভয় করো না। একটু বুঝে-সমঝে চলবে। ঘরে টাকা আছে, ভয় কি তোমার ? আর একটা কথা। শিবকালীপুরের পত্তনীর খাজনা কিস্তি-কিস্তি দিচ্ছ নাকি তুমি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ পাই-পয়সা দিয়ে দিয়েছি।

—গভর্নমেণ্ট রেভিন্যু তুমি দাও—না, জমিদার দেয় ?

শ্রীহরি এবার বুঝিয়া লইল। হাসিয়া বলিল—আশ্বিন কিস্তিতে আর দেব না।

পথে আসিতে শ্রীহরি দেখিল পথের পাশেই বেশ একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি মণ্ডল একটা পাচন-লাঠি হাতে লইয়া ক্রুদ্ধবিক্রমে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখে নতমুখে বসিয়া আছে একজন অল্পবয়সী ভল্লা। ভল্লাটির পিঠে পাচন-লাঠির একটা দাগ লম্বা মোটা দড়ির মত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—কি হয়েছে ? ওকে মেরেছ কেন অমন করে ?

তিনকড়ি বলিল—কিছু হয় নাই। তুমি যাচ্ছ যাও।

শ্রীহরি ভল্লাটিকে বলিল—এই ছোকরা কি নাম তোর ?

সে এবার উঠিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা ভল্লারা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ! কি নাম তোর ?

—আজ্ঞে, ছিদাম ভল্লা !

—কে মেরেছে তোকে ?

—ছিদাম মাথা চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে না। মারে নাই তো কেউ।

—মারে নাই ? পিঠে দাগ কিসের ?

—আজ্ঞে না। উ কিছু লয়।

—কিছু নয় ?

—আজ্ঞে না।

তিনকড়ি নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই আবার বলিল—যাও—যাও, যাচ্ছ কোথা যাও। হাকিমী করতে হবে না তোমাকে। মেরে থাকি বেশ করেছি। সে বুঝবে ও—আর বুঝব আমি।

শ্রীহরি বাড়ি ফিরিয়াই বৃত্তান্তটি লিখিয়া কাঠি শেখকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

আট

যে তরুণ ভল্লা-যোয়ানটিকে তিনকড়ি ঠেঙাইয়াছিল, সে গত রাত্রিতে গ্রামে অনুপস্থিত ভল্লাদের একজন। রাত্রির অন্ধকারে আল-পথে কালো কালো ছায়ামূর্তির মত যাহারা ফিরিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে ছিদামও ছিল। ওই ছেলেটা যে উহাদের সঙ্গে জুটিতে পারে—এ ধারণা তিনকড়ির ছিল না। রাম ভল্লা প্রৌঢ় হইয়াছে, এ অঞ্চলে তাহার মত শক্তিশালী লাঠিয়াল, ক্ষিপ্রগামী

পুরুষ নাই। একবার সে সন্ধ্যায় শহর হইতে রওনা হইয়া এখানে আসিয়া মধ্যরাত্রে ডাকাতি করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট ঘণ্টাচারেক সময়ের মধ্যে গিয়া হাজির হইয়াছিল সদর শহরে। সে জীবনে বার তিনেক জেল খাটিয়াছে। তারিণী, বৃন্দাবন, রঙলাল, ইহারাও কম যায় না। সকলেই রামের যৌবনের সহচর। এখনও প্রৌঢ়ত্ব সত্ত্বেও তাহারা বাঘ। তাদের সঙ্গে ওই ছোঁড়াটা জুটিয়াছিল জানিয়া তিনকড়ির বিস্ময় ও ক্রোধের আর সীমা ছিল না। হিল্‌হিলে লম্বা—কচি চেহারার ছেলেটা দু'বছর আগেও মনসা ভাসানের দলে বেহুলা সাজিয়া গান গাহিত—

"কাক ভাই, বেউলার সম্বাদ লইয়া যাও।"

দুই বৎসরের সেই ছেলের এমন পরিবর্তন! বাল্যকালে ছোঁড়ার বাপ মরিয়াছিল, মা তাহাকে বহু কষ্টেই মানুষ করিয়াছে। সে সময় তিনকড়িই ছোঁড়াকে 'গাঁইটে' গরুর পাল করিয়া দিয়াছিল। 'গাঁইটে-পালে'র কাজটা হইল দশ-বারো ঘরের ভাগের রাখালের কাজ। সকলের গরু লইয়া ছোঁড়া মাঠে চরাইয়া আনিত, প্রত্যেক গরু-পিছু বেতন পাইত মাসিক দু'পয়সা। দশ-বারো ঘরে ত্রিশ-চল্লিশটা গরু চরাইয়া মাসে এক টাকা, পাঁচ সিকা নগদ উপার্জন হইত। এছাড়া পাইত প্রতিঘরে দৈনিক মুড়ির বদলে একপোয়া চাল; পূজায় প্রতিঘরে একখানা কাপড়। সেই ছিদামের এই পরিণতি দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে তিনকড়ি ছিদামকে ধরিতে পারে নাই। তিনকড়ির সাড়া পাইবামাত্র সে সেই রাত্রেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল।...

রাম এবং অন্য সকলের সঙ্গে রাত্রেই তার একচোট বচসা হইয়া গিয়াছে। বচসা বলিলে ভুল হইবে। বকিয়াছে সে নিজেই। হাজার ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে—ছি! ছি! ছি! এত সাজাতেও তোদের চেতন হল না রে? রাম, এই সে-দিন তুই খালাস পেয়েছিস্, বোধহয় গত বছর কার্তিক মাসে,—আর এ হল শ্রাবণ মাস; এরই মধ্যে আবার? রামা, কি বলব তোকে বল্? ছি! ছি! ছি!

রাম মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—ওঃ, বড় রেগেছ মোড়ল। বস—বস। ওরে, তেরে, আন্ একটা বোতল বার করে আন্।

—না—না—না। তোদের যদি আর আমি মুখ দেখি, তবে আমাকে দিব্যি রইল।...তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে ফিরিয়াছিল।

—মোড়ল, যেয়ো না, শোন। ও মোড়ল!

—না, না।

—না নয়, শোন! মোড়ল ফিরলে না? বেশ, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ।

এবার তিনকড়ি না ফিরিয়া পারে নাই। অত্যন্ত রাগের সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল—কি বলছিস্ শুনি? বলি. বল্‌বি কি? বলবার আছে কি তোর?

রাম বলিয়াছিল—তোমার সর্বস্ব তো জমিদারের সঙ্গে মামলা করে ঘুচাইছ। এখন কার দোরে যাই—কি খাই বল দেখি?

—মরে যা, মরে যা, তোরা মরে যা।

—তার চেয়ে জ্যাল খাটা ভাল।—রামের উচ্চকণ্ঠের হাসিতে দুর্যোগের অন্ধকার রাত্রি শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

—তাই বলে ডাকাতি করবি!

রাম আবার খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিল—তা না করে আর কি করব বল? গোটা ভল্লা-পাড়ায় এক ছটাক ধান নাই কারুর ঘরে। তুমি বরাবর দিয়ে এসেছ—এবার তোমার ঘরেও নাই। গোবিন্দের ঘরে তিন দিন হাঁড়ি চাপে নাই। বেন্দার বেটার বউ বাপের বাড়ি পালিয়েছে; বলে গিয়েছে—না খেয়ে ভাতারের ঘর করতে লারব। মাথার উপরে চাষের সময়। তোমরা ধর্মঘট জুড়েছ—জমিদারে ধান 'বাড়ি' দেবে না। মহাজনদের কাছে গিয়েছিলাম —তারা বলেছে—জমিদারের খাজনার রসিদ আন, তবে দোব। এখন আমরা করি কি?

তিনকড়ি এবার আর কথার উত্তর দিতে পারে নাই।

রাম হাসিয়াই বলিয়াছিল—কদিন গেলাম এলাম শিবকালীপুর দিয়ে; দেখলাম—ছিরু পালের ঘরে ধান-ধন মড়্ মড়্ করছে। আবার কেলে স্যাখকে পাইক রেখেছে; বেটা গোঁফে তা দিয়ে লাঠি-হাতে বসে আছে। তাই সব আপনার মধ্যে বলাবলি করতে করতে মনে করলাম—দিই, ওই বেটার ঘরই মেরে দি। আমাদেরও পেট ভরুক; আর ধর্মঘটেরও একটা খতম করে দি।

—তারপর?—তিনকড়ি এবার ব্যঙ্গপূর্ণ তিরস্কারের সুরে বলিয়াছিল—তারপর?

—তারপর তুমি সবই জান! বেটা ঘা খেলে মামলা-মকর্দমা আর করত না; করতে পারত?

—ওরে শুয়ার, তার যা হত তাই হত। তোদের কি হত একবার বল্ দেখি?

—সে তখন দেখা যেত।—রাম বে-পরোয়ার হাস হাসিতে লাগিল।

তিনকড়ি এবার গাল দিয়াছিল—শুয়ার, তোরা সব শুয়ার। একবার অখাছি খেলে শুয়ার যেমন জীবনে তার স্বাদ ভুলতে লারে, তোরাও তেমনি শুয়ার, আস্ত শুয়ার।

এবার সকলেই সশব্দে হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'শুয়ার' গাল তিনকড়ির নরম মেজাজের গালাগাল।

রাম বলিয়াছিল—তেরে, তোকে বললাম না একটা বোতল আনতে—হল কি শুনি ?

—না না, থাক্।···তিনকড়ি বাধা দিয়াছিল।

—থাকবে কেনে ?

—তোদের ঘরে এমন করে ধান ফুরিয়েছে, খেতে পাচ্ছিস্ না, আমাকে বলিস্ নাই কেনে ? সত্যিই গোবিন্দের বাড়িতে তিন দিন হাঁড়ি চড়ে নাই ?

গোবিন্দ ঝুঁকিয়া দেহখানা অগ্রসর করিয়া তিনকড়ির পায়ে হাত দিয়া বলিয়াছিল—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বৃন্দাবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—বেটার বউটা পালিয়ে গেল মোড়ল ; বেটাকে পাঠিয়েছিলাম আনতে, তা বলেছে—উপোস করে আধপেটা খেয়ে থাকতে পারব। এমন ভাতারের ঘরে আমার কাজ নাই।

তিনকড়িও এবার প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল। মনে মনে ধিক্কার দিয়াছিল নিজেকে। একটা পাথরের মোহে সে সব ঘুচাইয়া বসিল ! শিব-ঠাকুরকে সে এখন পাথর বলে। যতবার ওই পথ দিয়া যায় আসে—শিব-ঠাকুরকে সে আপনার বুড়ো-আঙুল দেখাইয়া যায়। পাথর নয় তো কি ? জমিদার তাহার সম্পত্তির মূল্যের টাকাটা আত্মসাৎ করিল—পাথর তাহার কি করিল ? আর সে গিয়াছিল পাথরের উপর দেউল তুলিতে—তাহারই জমি বিকাইয়া গেল !

নহিলে আজ তাহার ভাবনা কি ছিল ? নিজের পঁচিশ বিঘা জমিতে বিঘা প্রতি চার বিশ হারে একশত বিশ অর্থাৎ আড়াইশো মণ ধান প্রতি বৎসর ঘরে উঠিত। তাহার জমি ডাকিলে সাড়া দেয়—এমন জমি ; শুষ্ক-হাজা ছিল না। তাহারই ধানে তখন গোটা ভল্লা-পাড়ার অভাব পূরণ হইত। কুক্ষণে সে দেবোত্তরের টাকা উদ্ধারের জন্য জমিদারের সঙ্গে মামলা জুড়িয়াছিল। আর, মামলা এক মজার কল বটে ! হারিলে তো ফতুর বটেই—জিতিলেও তাই। উকীল-মোক্তার-মুহুরী-আমলা-পেশকার-পেয়াদা—মায় আদালতের সামনের বটগাছটা পর্যন্ত সকলেরই এক রব—টাকা, টাকা, সিকি,

সিকি !···বটগাছটার তলায় পাথরে সিঁদুর মাখাইয়া বসিয়া থাকে এক বামুন—মাদুলি বেচে। ওই মাদুলিতে নাকি মামলার জয় অনিবার্য। যে জেতে সে-ও মাদুলি নেয়, যে হারে সে-ও মাদুলি ধারণ করে। তিনকড়িও একটি লইয়াছিল। প্রতি মামলার দিন একটি করিয়া পয়সা দিয়া সিঁদুরের কৌটাও লইয়াছিল ; তবু হারিয়াছে। হারিয়া সে দুরন্ত ক্রোধে বামুনের কাছে গিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিল। বামুন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—অশুদ্ধ কাপড়ে মাদুলি পরলে কি ফল হয় বাবা ? কই, দিব্য করে বল দেখি—অশুদ্ধ কাপড়ে মাদুলি পরনি তুমি ?

তিনকড়ি হলফ করিয়া বলিতে পারে নাই। কিন্তু বামুনের ধাপ্পাবাজি সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ গেল না।

আজ তাহার ঘরে ধান অতি সামান্য। যাহা আছে তাহাতে তাহার সংসারেরই বৎসর—অর্থাৎ নূতন-ধান-উঠা পর্যন্ত—চলিবে না। তাহার উপর আবার মাথার উপর বৃদ্ধির মামলা আসিতেছে। মামলা না করিয়া উপায় নাই ! জমিদার বলিতেছে—উৎপন্ন ফসলের মূল্য বাড়িয়াছে, সুতরাং আইন অনুসারে সে বৃদ্ধি পাইবেই। প্রজা বলিতেছে—মূল্য যেমন বাড়িয়াছে, চাষের খরচও তেমনি বাড়িয়াছে ; তা ছাড়া অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির জন্য ফসল নষ্ট হইতেছে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী, সুতরাং জমিদার বৃদ্ধি তো পাইবেই না, প্রজাই খাজনা কম পাইবে। দুই-ই আছে আইনে।···চুলায় যাক আইন। ভাবিয়াও গোলক-ধাঁধার কূল-কিনারা নাই ! যাহা হইবার হইবে ! সে নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়াছিল—রাম, কাল বিকেলের দিকে যাস্, এক টিন করে ধান দোব। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব।

রাম বলিয়াছিল—দেবো বলছ, দিয়ো। কিন্তু এর পর তুমি নিজে কি করবে ?

—তার লেগে এখন থেকে ভেবে কি করবে ? যা হয় হবে।

—তবে আমার ধানটা আধা-আধি করে গোবিন্দকে বেন্দাকে দিয়ো।

—কেনে, তোর চাই নাই ?

হাসিয়া রাম বলিয়াছিল—আমার এখন চলবে।

—চল্‌বে ? তা হলে তুই বুঝি—

—তোমার দিব্য। এবার জ্যাল থেকে এসে কখনও কিছু করি নাই। বলছি, আগেকার ছিল।

—আগেকার ছিল ? আমাকে ন্যাকা পেলি রামা ? তিন বছর মেয়াদ খেটে বেরিয়েছিস্ আজ আট-ন'মাস—সেই টাকা এখনও আছে ?

—গুরুর দিব্যি। ছেলে-পোতা বাঁধের তালগাছ-তলায় পুঁতে রেখেছিলাম কুড়ি টাকা; বলে গিয়েছিলাম মাগীকে ইশেরাতে যে, যদি খুব অভাব হয় কখনও তবে আষাঢ় মাসে জংশনের কলে যখন দশটার ভোঁ বাজবে, বাঁধের একানে তালগাছটার মাথা খুঁজে দেখিস্। নেহাৎ বোকা, তালগাছে উঠে মাথা খুঁজেছে। আষাঢ় মাসে দশটার ভোঁ বাজলে—গাছের মাথার ছায়াটা যেখানে পড়েছিল—ঠিক সেইখানে পুঁতেছিলাম। বুঝতে পার নাই। আষাঢ় মাসে সেদিন খুঁড়ে দেখলাম ঠিক আছে; আমার এখন চলবে কিছুদিন।

তিনকড়ি এবার খুশি না হইয়া পারে নাই। বলিয়াছিল—তুমি চোরা ভাই একটি বাস্তুঘুঘু!—বলিয়া সে উঠিয়াছিল; আসিবার সময়েও বলিয়াছিল—তুই কাল যাস্—গোবিন্দ, বেন্দা তেরে—যাস্ কাল বিকেলে। কিন্তু—খবরদার! এসব আর নয়। ভাল হবে না আমার সঙ্গে।

আজ তিনকড়ি কঙ্কণার মাঠে হঠাৎ ছিদামকে পাইয়া গেল। সকালে তিনকড়িকে সে নিজ-গ্রামের মাঠে চাষ করিতে দেখিয়া মহগ্রাম, শিবকালীপুর, কুসুমপুর পার হইয়া কঙ্কণার দিকে আসিয়াছিল মজুরীর সন্ধানে। কঙ্কণা ভদ্রলোক-প্রধান গ্রাম। তাহারা কেবল জমির মালিক। অনেকে ঘরে হাল, বলদ ও কৃষাণ রাখিয়া চাষ করায়, অনেকে আশপাশের গ্রামের চাষীকে জমি বর্গা-ভাগে দিয়া থাকে। চাষ করিয়া ধান কাটিয়া চাষী ঘাড়ে করিয়া বাহিয়া বাবুদের ঘরে মজুত করে; অর্ধেক ভাগ মালিক পায়, অর্ধেক পায় চাষী। এমনি এক বর্গায়েৎ-চাষীর কাছে ছিদাম জন খাটিতেছিল। এমন সময় তিনকড়ি সেখানে আবির্ভূত হইল।

তাহার গরুর পালের মধ্যে একটা অত্যন্ত বদ্ স্বভাবের বক্‌না আছে। সেটা সমস্তদিন বেশ শান্ত-শিষ্ট থাকে, কিন্তু সন্ধ্যায় গোয়ালে পুরিবার সময় হইবামাত্র লেজ তুলিয়া হঠাৎ ঘোড়ার ছার্তক চালের মত চালে—চার পায়ে লাফ দিয়া ছুটিয়া পালায়। সমস্ত রাত্রি স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া আবার ভোরবেলা গৃহে ফিরিয়া শিষ্টভাবে শুইয়া পড়ে অথবা দাঁড়াইয়া রোমন্থন করে। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় পলাইয়াও সে আজ পর্যন্ত ফেরে নেই। এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। জলখাবার বেলার সময় সে খবর পাইয়াছে সেটা নাকি কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে বাঁধা পড়িয়াছে। ফুলগাছ-খাওয়ার জন্য তাহারা গরুটাকে নাকি এমন প্রহার দিয়াছে যে, চার-পাঁচ জায়গায় চামড়া ফাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে; তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে চাষ ছাড়িয়া পাচন হাতে কঙ্কণায় চলিয়াছে। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িয়া গেল ছিদাম। পলাইবার আর পথ ছিল না। একে বাবুদের উপর রাগে সে গর্-গর্ করিতেছিল, তাহার উপর অপরাধী ছিদামকে

কাল রাত্রে ডাকিয়া বাড়িতে পায় নাই; কাজেই ছিদাম ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিতেই সে তাহার পিঠে হাতের পাচন লাঠিটা বেশ প্রচণ্ড বেগেই ঝাড়িয়া দিল—হারামজাদা!

ছিদাম দুই হাতে তাহার পা দুইটা ধরিল। মুখে যন্ত্রণাসূচক এতটুকু শব্দ করিল না বা কোন প্রতিবাদ করিল না।

তিনকড়ি আরও এক লাঠি ঝাড়িয়া দিল—পাজী শুয়ার!

ঠিক এই সময়ে শ্রীহরি ঘোষের গাড়ি আসিয়া পৌছিল।···

ছোঁড়াটাকে খানিকটা দূর সঙ্গে আনিয়া সে সহসা তাহার কব্জিটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ছাড়িয়ে নে দেখি।

ছিদাম অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ধমক দিয়া তিনকড়ি বলিল—নে, ছাড়িয়ে নে, দেখি। হারামজাদা, শুয়ার তুমি যে রামা ভল্লার সঙ্গে রাত্রে বের হতে শিখেছ, কত জোর হয়েছে বেটার দেখি। নে, ছাড়িয়ে নে।

ছোঁড়াটার মুখে সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল—তাই পারি?

—তবে শুয়ারের বাচ্চা?

—কি করব বলেন?—ছিদাম এবার বলিল—ঘরে খেতে নাই। গাঁইটে পালের চাল উঠিয়ে দিয়েছে লোকে। তা ছাড়া—মা বিয়ের সম্বন্ধ করছে, টাকা লাগবে। বললাম রাম কাকাকে, তা রাম কাকা বললে—কি আর করবি, আমাদের সঙ্গে বেরুতে শেখ্।

—হুঁ। তিনকড়ি এবার তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিল।

ওদিক হইতে কে হাঁকিতেছে—হো—ই। হো—ই। ও তিনু—ভা—ই।

কি? তিনকড়ি ও ছিদাম চাহিয়া দেখিল, রাস্তার মাঝখানের সেই নালাটায় একখানা গাড়ি পড়িয়াছে, শিবপুরের দোকানী বৃন্দাবন দত্ত হাঁকিতেছে। তাহারা দুজনেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। বোঝাই গাড়িখানার চাকা দুইটা কাদায় বসিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন জংশন হইতে মাল লইয়া আসিতেছে। পনের ষোল মণ মাল, গরু দুইটা বুড়া—একটা তো কাদায় বসিয়া পড়িয়াছে। তিনকড়ি বৃন্দাবনের উপর ভয়ানক চটিয়া গেল। বলিল—খুব ব্যবসা করিতে শিখেছ যা হোক। বেনেরা যে হাড়কিপ্পিন—তা তুমিই দেখালে দত্ত। এই বুড়ো গরু দুটোকে বাদ দিয়ে দুটো ভাল গরু কিনিতে পার না? না—টাকা লাগবে?

দত্ত বলিল—কিনব রে কিনব। নে—নে, এখন একবার ধর্ ভাই ওরে—কি নাম তোর—ওরে বাবা—তুই বরং ওই গরুটির জায়গায় জোয়ালটা ধর।

হারামজাদা গরু এমন বজ্জাত—কাদায় শুয়েছে দেখ না। বেটার খাওয়া যদি দেখিস! নে নে বাবা! ওই ভাই তিনু।

বিরক্তির সঙ্গেই তিনু বলিল—ধর্‌ ছিদেম, ধর্‌? জোয়াল ধরতে পারবি তুই? তুই বরং চাকাতে হাত দে।

—না, আজ্ঞে আপনি চাকাতে ধরেন।—বলিয়া ছিদাম হাত ভাঁজিয়া সেই হাতের ভাঁজে বোঝাই গাড়ির জোয়াল তুলিয়া বুক দিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল। তিনকড়ি অবাক হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ছিদামের চেহারা যেন পাথরের চেহারা হইয়া উঠিল। নিজে সে চাকা ঠেলিতে গিয়া বুঝিল—কি প্রচণ্ড শক্তিতে ছিদাম আকর্ষণ করিতেছে। অথচ ঠেলিতেছে খাড়া সোজা হইয়া, পায়ের গোড়ালী হইতে মাথা পর্যন্ত যেন একখানা পাকা বাঁশের খুঁটির মত সোজা। ওপাশে ঠেলিতেছে—গরু, গাড়োয়ান এবং দত্ত স্বয়ং। তবুও এই দিকটাই আগে উঠিল।

দত্ত ট্যাঁক হইতে দুটি পয়সা বাহির করিয়া ছিদামের হাতে দিল, বলিল—একদিন আসিস্‌—বাড়ি থেকে চারটি মুড়ি নিয়ে যাস্‌।

তিনকড়ি ছিদামের হাত হইতে পয়সা দুইটা কাড়িয়া লইয়া দত্তের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। ছিদামকে বলিল—বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করিস। আর খবরদার, ওই কিপ্‌টের দুটো পয়সা নিবি না।

হন্‌ হন্‌ করিয়া পথ চলিতে চলিতে সে ছিদামের কথাই ভাবিতেছিল, ছোঁড়া যদি পেট পুরিয়া খাইতে পাইত, তবে সত্যই একটা অসুর হইত!

কথায় আছে "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর"। গরুটাকে প্রহার করা এবং আটকাইয়া রাখার জন্য ঝগড়া করিতে তিনকড়ি একাই একশ' ছিল, আবার হঠাৎ পথে রহমও তাহার সঙ্গে জুটিয়া গেল।

রহম ফিরিতেছিল জংশন হইতে। শ্রাবণের রৌদ্রে এক গা ঘামিয়া—কাঁধের চাদরখানা দিয়া বাতাস দিতেছিল আপনার গায়ে। তিনকড়ির একেবারে খাঁটি মাঠের পোশাক;—পরনে পাঁচহাতি মোটা সুতার কাপড়, সর্বাঙ্গে কাদা তো ছিলই, তাহার উপর দত্তের গাড়ির চাকা ঠেলিয়া দেহখানা হইয়া উঠিয়াছে পঙ্ক-পল্বলচারী মহিষের মত—হাতে পাচনী।

রহমই বলিল—ওই, তিনু-ভাই, এমন করা্যা কুথাকে যাবা হে? একারে মাঠ থেকে মালুম হচ্ছে?

তিনকড়ি বলিল—যাব কঙ্কণায়। বাবু-বেটাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আমার একটা বকনাকে বেটারা নাকি মেরে খুন করে ফেলাল্‌ছে।

—খুন করে ফেলাল্‌ছে!—রহম উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

—বাবুদের ফুলের গাছ খেয়েছে। ফুলের মালা পরবে বেটারা! তাই বলি দেখে আসি একবার।

—চল। আমিও যাব তুমার সাথে। চল।

এতক্ষণে তিনকড়ি প্রশ্ন করিল—তুমি আজ হাল জুড়লে না?

চাষের সময় চাষী হাল জুড়ে নাই—এ একটা বিস্ময়ের কথা। এখন একটা দিনের দাম কত! একই জমিতে আজিকার পোঁতা ধানের গুচ্ছ আগামী কালের পোঁতা গুচ্ছ হইতে অন্ততঃ বিশ-পঁচিশটা ধান বেশী ফলন দিবে।

রহম বলিল—আর বুলিস্ কেনে ভাই! আল্লার দুনিয়া শয়তানে দখল কর্যা নিলে। "যে করবে ধরম-করম—তার মাথাতেই বাঁশ মারণ"। চাষের সময় ঘরে ধান ফুরাল্ছে, যা আছে শাঙন্টা চলবে টেনে-হেঁচিড়ে। ইহার উপর পরব এসেছে। খরচ আছে। ছেলে-পিলাকে কাপড়-পিরানটা দিতে হবে। মেয়েগুলিকে দিতে হবে। কি করি বল! তাই গেছিলাম সন্ধ্যায়।

তিনকড়ি বলল—হ্যাঁ, তোমাদের রোজা চলছে বটে। একমাস রোজা, নয়?

—হঁ্যা তামান্ রমজানের মাস। মাঝে পুন্নিমে যাবে—তা বাদে অমাবস্তে। অমাবস্তের পর চাঁদ দেখা যাবে, রোজা ঠাণ্ডা হবে। ইদল্ফেতর পরব।

তিনকড়ি এ পর্বের কথা জানে, তাই বলিল—এ তো তোমাদের মস্ত বড় পরব।

—হঁ্যা। ইদলফেতর বড় পরব। খানা-পিনা আছে, গরীব-দুঃখীতে খয়রাত করতে হয়, সাধু-ফকির-মেহমানদের খাওয়াতে হয়। অনেক খরচ ভাই তিনকড়ি। অথচ দেখ কেনে—আভদ্রা বর্ষাকাল—ঘরে ধান নাই, হাতে পয়সা নাই।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওকথা আর বল কেন রহম ভাই, চাকলার লোকের ও এক অবস্থা। কারুর ঘরে খাবার নাই। জমিদার ধান দেবে না। বলে, বৃদ্ধি দিলে তবে দেবে। মহাজন বলছে—জমির খাজনার হাল-ফিল্ রসিদ আন; পাকা খত লেখ।

—আমাদের আবার ইয়ার উপরে পরব।

তিনকড়ি একথার কি উত্তর দিবে, সে নীরবেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

রহম বলিল—তুদের পরবগুলা কিন্তক বেশ ধান-পানের মুখে। দুগ্গা পূজা সেই ঠিক আশ্বিনে হবেই। আমাদের মাসগুলান্ পিছায়ে পিছায়ে বড় গোল বাধায়।

তিনকড়ি বলিল—হ্যাঁ, তোমাদের মাসগুলান্ পিছিয়ে পিছিয়ে যায় বটে।

—হ। বড় পেঁচ্‌ ভাই। এক-এক বছর এমন দুখ হয় তিনকড়ি, কি বুলব? এই দেখ, আমার যা কিছু দেনা তার অর্ধেক পরবের দেনা। মান ইজ্জৎ আছে; ঈদল্‌ফেতর—মহরম—ই দুটি পরবে দশ টাকা খরচ না করলে—মানবে কেনে লোকে?

তিনকড়ি বলিল—তা বটে হঁ্যা! আমাদের দুগ্‌গা-পুজো কালীপুজোতে খরচা না করলে চলে? যে যেমন—তেমনি খরচ করতে তো হবেই।

অভাবের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে দুজনেরই মন কেমন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কঙ্কণায় বাবুদের বাড়িতে তাহারা যখন গিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই ভারাক্রান্ত মনের কারণেই রাম-সুগ্রীবের মত প্রথমেই একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া বসিল না। সামনে যে চাকরটা ছিল তাহাকে বলিল—তোমাদের বাবু কোথা? বল—দেখুড়ের তিনকড়ি মোড়ল এসেছে। ক্রোধোন্মত্ততা না থাকিলেও বেশ গম্ভীরভাবেই কথাটা সে বলিল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—বাড়ির মালিক—তরুণ একটি ভদ্রলোক। তিনি বেশ মিষ্টি কথাতেই বলিলেন—তুমিই তিনকড়ি মোড়ল?

—হঁ্যা। আমার গরু আপনি মেরে জখম করেছেন কেন? ধরেই বা রেখেছেন কোন্‌ আইনে?—তিনকড়ি কিছু কিছু করিয়া মনে উত্তাপ সঞ্চয় করিতেছিল।

রহম বলিল—গরুটাকে মেরে জখম কর্‍্যা খুন বার কর্‍্যা দিছ শুনলাম? হিন্দু-বেরাম্ভন্‌ তুমি?

ভদ্রলোকটি সবিনয়ে বলিলেন—দেখ আমি দোষ স্বীকার করছি। তবে এইটুকু বিশ্বাস কর—আমার হুকুমে হয়নি ব্যাপারটা। একজন নতুন হিন্দুস্থানী মালী রাগের বশে মেরে ফেলেছে, আমি তাকে জবাবও দিয়েছি।

তিনকড়ি রহম দুজনেই অবাক হইয়া গেল। কঙ্কণার ভদ্রলোক এমন মোলায়েম ভদ্রভাবে চাষীর সঙ্গে কথা কয়—এ তাহাদের বড় আশ্চর্য মনে হইল।

ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন দেখ গরুটি জখম হয়েছিল; যদি আমার ইচ্ছে থাকত ব্যাপারটা স্বীকার না করার, তাহলে গরুটাকে ওই অবস্থাতেই তাড়িয়ে দিতাম—বেঁধে রেখে সেবা-যত্ন করতাম না।

সত্য সত্যই গরুটির যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হইয়াছে। রক্তপাত হইয়াছিল একটা শিঙ্‌ ভাঙিয়া। ঔষধ দিয়া কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে আহত স্থানটি; ডাবাটায় তখনও মাড়, ভূষি, খইলের অবশেষ রহিয়াছে।

দেখিয়া তিনকড়ি এবং রহম দুজনেই খুশী হইল। ইহার জন্য আর কোন কটু কথাও তাহারা বলিতে পারিল না।

ভদ্রলোকটি অনুরোধ করিয়া বলিলেন—মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল খেয়ে যাও।

তিনকড়ি অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না; রহম হাসিয়া বলিল আমার রোজা।

তিনকড়ি প্রশ্ন করিল—আপনারা তো কলকাতায় থাকেন?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—

রহম মাথা নাড়িয়া বলিল—হুঁ!—অর্থাৎ ব্যবহারটা সেইজন্যেই এমন।

তিনকড়ি বাতাসা চিবাইয়া জল খাইয়া বলিল—কবে এলেন দেশে?

—দিন পাঁচেক হল।

—এখন থাকবেন?

—নাঃ। ধান বেচতে এসেছি, ধান বেচা হয়ে গেলেই চলে যাব।

—ধান বেচবেন? বেচে দেবেন?

হ্যাঁ—দরটা এই সময়ে উঠেছে, বেচে দেব। আমরা কলকাতায় থাকি। সেখানে চাল কিনে খাই। এখানে মজুত রেখে কি করব? প্রতি বৎসরই আমরা বেচে দিই।

বেচে দেন? তা—তিনকড়ি কথা শেষ করিতে পারিল না।

রহম বলিল—তা আমাদিগে দাদন দেন না কেনে? ধান উঠলে 'বাড়ি' সমেত শোধ দিব।

তিনকড়ি বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু আমরা কেনে—এ চাকলাটা তা হলে খেয়ে বাঁচবে, দুহাত তুলে আপনাকে আশীর্বাদ করবে।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—না বাবু, ও-সব ফেসাদের মধ্যে নেই আমি।

ব্যগ্রতাভরে রহম বলিল—একটি ছটাক ধান আপনার ডুবরে না।

—না। আমি কারুর উপকার করতেও চাই না, সুদেও আমার দরকার নেই। রহম বলিল—শুনেন, বাবু শুনেন—

তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—না-না। এসবের মধ্যে আমি নেই।

তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছিল। এ ধারার মানুষের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় নাই। এ দেশের সুদখোর মহাজনকে তাহারা বুঝে, অত্যাচারী জমিদারকেও জানে, কিন্তু শহরবাসী এই শ্রেণীর মানুষ তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য। সুদও লইবে না, উপকারও করিতে চায় না। ইহাকে তাহারা বলিবে কি? ভাল না মন্দ? কঙ্কণায় এই শ্রেণীর লোক নেহাত কম নয়, তাহাদের সহিত

ইহার পূর্বে এমনভাবে তিনকড়ি-রহমের পরিচয় হয় নাই। ইহারা ধান এমনি করিয়াই বৎসর বৎসর বিক্রয় করিয়া দিয়া যায়।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওই ধরনের মানুষ—ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই।

রহম বুঝিতে পারিল না এই লোকটি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করা উচিত। গরু জখম করার অপরাধে মালীকে বরখাস্ত করে, ধনী ভদ্রলোক হইয়া চাষীদের কাছে দোষ স্বীকার করে; অথচ এত ধান থাকিতেও লোককে দিতে চায় না, সুদের প্রলোভন নাই!—এ লোককে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে বলিল—মরুক গে? লে আয়, ঘর আয়। আমাদের আবার ইরসাদের বাড়িতে মজলিশ হবে, পা চলিয়ে চল ভাই।

—মজলিশ! সেদিন শুনলাম—দেবু পণ্ডিত এসেছিল, মজলিশ হয়েছিল তোমাদের। আবার মজলিশ? ধর্মঘটের নাকি?

ইবার মজলিশ—প্যাটের। ধানের ব্যবস্থা চাই তো। দৌলত ছিরুর সঙ্গে ভিতরে ভিতরে ফয়সালা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধূয়া ধরেছে—ধান দিবে না। তাই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ইদিকে মাথার উপর পরব!

—তবে তুমি সকাল বেলায় গিয়েছিলে কোথা?

—জংসনে। মজলিশের লেগ্যা তো একবেলার বাদে চাষ কামাই হবেই। তাই গিয়েছিলাম জংশনে। মিলওয়ালা কলকাতার বাবু ঘর বানাইছে, তা ভাল তালগাছ খুঁজছে। সেই ধন্ধে গেছিলাম। এই যি—মাঠের মধ্যি হাড়া গাছটা। বাবার হাতের গাছ—ওটাই দিব বুললাম।

দূর হইতে আজানের শব্দ আজিতেছিল। রহম ব্যস্ত হইয়া বলিল—তু আয় ভাই আমি যাই। জুম্মার নামাজ আজ!

ইরসাদের বাড়িতে মজলিশ বসিয়াছিল। সমগ্র মুসলমান চাষী সম্প্রদায়ই আসিয়া জুটিয়াছে। সকলের মুখেই চিন্তার ছাপ। ঘরে সকলেরই ধান নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আউশ ধান উঠিতে এখনও পুরা দুইটা মাস। দুই মাসের খাদ্য চাই। খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিবারও অবকাশ নাই। মাঠে জল থৈ-থৈ করিতেছে, চাষের সময় বহিয়া যাইতেছে। জলের তলায় সার খাওয়া চষা-মাটি গলিয়া ঘষা-চন্দনের মত হইয়া উঠিয়াছে, গোটা মাঠময় উঠিতেছে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বীজ-ধানের চারাগুলি প্রতিদিন এখন আঙুলের এক পর্বের সমান বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন কি চাষীর বসিয়া থাকিবার সময়?

তিনকড়িও গরুটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া মজলিশের অদূরে বসিল।

তাহাকে আবার এইভাবে ধানের জন্য ঘুরিতে হইবে। চাষ বন্ধ থাকিবে। শ্রাবণের দশদিন পার হইয়া গেল। চাষ করিবার সময় অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। "শাওনের পুরো, ভাদ্রের বারো, এর মধ্যে যত পারো।" পুরা শ্রাবণ মাসটাই চাষের সেরা সময়—ও-দিকে ভাদ্রের বারো দিন পর্যন্ত কোন রকমে চলে। তাহার পর চাষ করা আর বেগার খাটা সমান। "থোড় তিরিশে, ফুলোয় বিশে, ঘোড়া মুখ তের দিন জান, বুঝে কাট ধান।" আশ্বিনের তিরিশে ধানের চারাগুলির বৃদ্ধি একেবারে বেশ হইয়া যাইবে, ভিতরে শস্য-শীর্ষ সম্পূর্ণ হইয়া কুড়ি দিনের মধ্যে সেগুলি বাহির হইয়া পড়িবে। তারপর ধানগুলি পরিপুষ্ট হইতে লাগে তের দিন। ধানগাছগুলির বৃদ্ধি তিরিশে আশ্বিনের মধ্যেই শেষ; এখন এক একটা দিনের দাম যে লক্ষ টাকা।

বিপদটা এবার তাহাদের চেয়েও রহম ভাইদের বেশী। ঘরে খাবার নাই, ভরা চাষের সময়, তাহার উপর তাহাদের পরব লাগিয়াছে। আশ্বিনের প্রথমে যেবার দুর্গাপূজা হয়—সেবার তাহাদের যে নাকাল হয় সে কথা বলিবার নয়। তবু তো তখন কিছু কিছু আউশ উঠিয়া থাকে। তিনকড়ি মনে মনে বলিল—হায় ভগবান, এমনি করেই কি পালি-পার্বণের দিন করতে হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই চাষীশ্রেণীর মানুষগুলি তাহাদের পবিত্র 'ঈদলফেতর' পর্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছে না, সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

চান্দ্র বৎসর গণনায় ইসলামীয় পর্বগুলি নির্ধারিত হয় বলিয়া—সৌর প্রভাবে আবর্তিত ঋতুচক্রের সঙ্গে পর্বগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। আরব দেশে উদ্ভূত ইসলামীয় ধর্মে চন্দ্রমাস গণনায় কোন অসুবিধা ছিল না। উত্তপ্ত মরু-ভূমিতে সৌর সম্বন্ধ বর্জন করিয়া সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মধ্যে জীবন স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে বেশী। মানুষের অর্থনীতিক সঙ্গতির উপর পশুপাল-অধ্যুষিত-পাহাড়ে ঘেরা, বালু-কঙ্কর-প্রস্তরপ্রধান মৃত্তিকাময় আরবে কৃষির প্রাধান্য—এমন কি প্রভাব, মোটেই নাই। সুতরাং অগ্নিবর্ষী সূর্য এবং বৈচিত্র্যহীন ঋতুচক্রের সঙ্গে সম্বন্ধহীন বর্ষ-গণনায় কোন অসুবিধা হয় নাই। প্রখরতম গ্রীষ্মের মধ্যে কয়েকদিনের জন্য অল্প কয়েক পশলা বর্ষণ আর কয়েক দিনের কুয়াশায় শীতের আবির্ভাব জীবনে ঋতু-মাধুর্যের এবং সম্পদের কোন প্রভাব আনিতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক। একমাত্র ফল-সম্পদ খেজুর; সে সারা বৎসরই থাকে শুকাইয়া। খাদ্য-ব্যবস্থায় যেখানে শস্যের অপেক্ষা মাংসের স্থান অধিক; আবার খাদ্যোপযোগী পশুর জীবনের সঙ্গেও ঋতুচক্রের কোন সম্বন্ধ নেই। সেখানে চান্দ্র-গণনায় মাস পিছাইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে অধিক

সঙ্গতির তারতম্য হয় না; সেখানে পর্বগুলি চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ রশ্মির মধ্যে তারতম্যহীন সমারোহে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠে। কিন্তু কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষির উপর পূর্ণ-নির্ভরশীল মুসলমান চাষী সম্প্রদায় স্থানোপযোগী কাল গণনার অসঙ্গতিতে মহা অসুবিধায় পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুনে যখন ঈদল্‌ফেতর মহরম হয়, তখন তাহারা যে আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেও খানিকটা আতিশয্যময়। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে নিষ্ঠুর অভাবের মধ্যে—চাষের অবসরহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে পর্বগুলি ম্রিয়মাণ হইয়া চলিয়া যায়—পৌষ-মাঘের উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তাহারই খানিকটা প্রতিক্রিয়ার ফলও বটে। এবার 'রমজান' মাস পড়িয়াছে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে, শেষ হইবে ভাদ্রের শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে। এদিকে ভরা চাষের সময়, চাষীর ঘরে পৌষের সঞ্চিত খাদ্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, ওদিকে জমিদারের সঙ্গে খাজনা-বৃদ্ধি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে, তাহার উপর ইদল্‌ফেতর পর্ব। পর্বের দিন দান-খয়রাত করিতে হয়, সাধু-সজ্জন-আত্মীয়দিগকে আহারে পরিতৃপ্ত করিতে হয়; ছেলে-মেয়েদের নূতন কাপড়-পোশাক চাই; জরীর টুপি, রঙিন জামা, নক্সীপাড় কাপড়, বাহারে একখানা রুমাল পাইয়া কচি মুখগুলি হাসিতে ভরিয়া উঠিবে—তবে তো। তবে তো পর্ব সার্থক হইবে, জীবন সার্থক হইবে!

মক্তবের মৌলবী ইরসাদ মিয়া ইহাদের নেতা! সে ভাবিতেছিল—এতগুলি লোকের কি উপায় হইবে? মধ্যে মধ্যে সে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কথা ভাবিতেছিল।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক! এখানকার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান—কঙ্কণার লক্ষপতি মুখুয্যেবাবুর বড় ছেলে; সেক্রেটারীও কঙ্কণার অন্য বাবুদের একজন। তাহাদের গ্রামের চামড়ার ব্যবসায়ী ধনী দৌলত হাজী, শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষ—ইহার মেম্বার।

ইরসাদ তবুও বলিল—দেখি একখানা দরখাস্ত করে।

রহম বলিল—শুন, ইরসাদ বাপ—ই-দিকে শুন একবার।

রহম একটা কথা তিনকড়িকে বলে নাই। আপনাদের কথা ভাবিয়াই কথাটা বলে নাই। ওপারের জংসনের কলওয়ালা কলিকাতার বাবুটি বলিয়াছেন টাকা আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে পাকা এগ্রিমেণ্ট করতে হবে—যারা টাকা নেবে, তাদের আমার টাকার পরিমাণের ধান আগে শোধ করতে হবে। আর আমি যখন অসময়ে টাকা দেব, তখন হলফ করে বলতে হবে তোমাদের, যখন যা ধান বেচবে আমাকেই বেচবে।

—দর?

—সি বাপ তুমি না হলে হবে না। পাঁচজনাকে নিয়া একদিন চল সাঁঝবেলাতেই যাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে কথাটা কানাকানি হইতে আরম্ভ করিল। তিনকড়ি শুনিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠিল।

ওই সংবাদটা পাইয়াই সে বাড়ি ফিরিল বেশ খুশী মনে। যাক, উপায় তাহা হইলে একটা মিলিয়াছে। দাদন মিলিলে আর চাই কি? সোনা-ফলানো জমি, তাহার হাতের চাষ, ভাবনা কি তাহার? ওঃ নিজের সব জমি আজ যদি তাহার থাকিত! পাথরের দায়ে সর্বস্ব গেল। যাক্! আবার সে সব গড়িয়া তুলিবে। এবারেই সে কয়েকজন ভদ্রলোকের জমি ভাগে লইয়াছে। কার্তিকে নদী নামিয়া গেলে এবার বাপ-বেটায় মিলিয়া ময়ূরাক্ষীর চরের জায়গাটা বেশ করিয়া কাটিয়া দস্তুর মত জমি করিয়া ফেলিবে। অগ্রিম আলু, কপি, মটরশুঁটির চাষ করিবে। টাকা একদফা তাহাকে উপার্জন করিতেই হইবে। গৌরকে সে দিয়া যাইবে কি? গৌরের চেয়েও ভাবনা তার স্বর্ণ মায়ের জন্য। সোনার প্রতিমা মেয়ে, স্বর্ণময়ী নাম তো সে মিথ্যা দেয় নাই। তাহারই ভাগ্যে মেয়েটা সাত বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। উহার একটা উপায় করিতে হইবে। তাহার জন্য কিছু জমি পাকাপাকিভাবে লেখা-পড়া করিয়া দেওয়া তাহার সব চেয়ে বড় কাজ।

বাড়িতে ফিরিতেই স্বর্ণ তাহাকে তিরস্কার করিল—বাবা, এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু। মাঠে হাল-গরু রেখে—ওই ঠেঁটি কাপড় পরে তুমি কঙ্কণা চলে গেলে! বেলা গড়িয়ে গেল খাওয়া নাই দাওয়া নাই—

হা-হা করিয়া হাসিয়া তিনকড়ি বলিল—ওরে বাপ্‌রে, বুড়ো মা হলি দেখছি।

—বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করে এলে তো?

—না রে না। লোকটি ইদিকে ভাল! কলকাতায় থাকে তো! মিষ্টি করেই বললে—অন্যায় হয়ে গিয়েছে। গরুটাকে খুব যত্ন করেছে। আমাকে জল খেতে দিলে। তবে টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না। উঃ, ওদের ধান কত স্বন্ন! সব ধান বেচে দেবে!

স্বর্ণ চুপ করিয়া রহিল; আপনার ধান সে যদি বেচিয়া দেয়, তবে কাহার কি বলিবার আছে? তাহাদের নাই—কিন্তু তাহাতে সে বাবুর কি?

স্বর্ণের মা বলিল—ওগো, শিবকালীপুরের দেবু পণ্ডিত এসেছিল।

—দেবু পণ্ডিত?

—হ্যাঁ।

—কেনে ? কিছু বলে গিয়েছে ?

—আমি তো কথা বলি নাই স্বন্ন কথা বললে। কি বলেছে বল্‌-না স্বন্ন !

স্বর্ণ বলিল—বলে গিয়েছে, আবার আসবে, সে কথা তোমাকেই বলবে।

মা বলিল—তবে যে অনেকক্ষণ কথা বললি লো ?

স্বর্ণ আবার সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল—আমাকে পড়ার কথা বলছিল।

তিনকড়ি উৎসাহিত হইয়া উঠিল।—পড়ার কথা ? তোকে পড়া ধরেছিল নাকি ? বলতে পেরেছিলি ?

সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া নীরবে স্বর্ণ জানাইল—সব বলিতে পারিয়াছে সে। তারপর বলিল—আমাকে বলছিল ইউ-পি বৃত্তি পরীক্ষা দাও না কেনে তুমি ?

—তা দে-না কেনে তুই স্বন্ন।—তিনকড়ির উৎসাহের আর সীমা রহিল না। কঙ্কণার মেয়ে-ইস্কুলে বাবুদের মেয়েরা পড়ে, স্বর্ণও পড়ুক-না কেন ! ভাল, দেবু তো আসিবেই বলিয়াছে, তাহার সঙ্গেই সে পরামর্শ করিবে।

নয়

আগামী কল্য ঝুলনযাত্রা আরম্ভ। আজ শ্রাবণের শুক্লা দশমী তিথি, কাল একাদশী। একাদশীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় বিষ্ণুর দ্বাদশযাত্রার অন্যতম 'হিন্দোল-যাত্রা' শেষ হইবে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে ঝুলনের বিশেষ উৎসব নাই। শুধু পূর্ণিমার দিন হল-কর্ষণ নিষিদ্ধ। আকাশে আবার মেঘ জমিয়াছে। গরমও খুব। বর্ষণ হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এবার বর্ষণ শুক্লপক্ষে বাংলার চাষীদের এদিকে বৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ! আষাঢ় মাস হইতেই তাহারা লক্ষ্য করে, বর্ষণ এ বৎসর কোন্ পক্ষে ! প্রতি বৎসরই বর্ষণের একটা নির্দিষ্ট সময় পরিলক্ষিত হয়। যেবার কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ হয়, সে বার কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি আরম্ভ হইয়া পূর্ণতিথিতে অর্থাৎ অমাবস্যায় প্রবল বর্ষণ হইয়া যায়। আর শুক্লপক্ষের প্রথম কয়েকদিন মৃদু বর্ষণের পর আকাশের মেঘ কাটে, দশ-পনরো বা আঠারো দিন অ-বর্ষণের পর আবার ঘটা করিয়া বর্ষা নামে ! অতিবৃষ্টিতে অবশ্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কারণ ও দুইটাও ঋতুচক্রের প্রাকৃতিক গতির অস্বাভাবিক অবস্থা, নিয়মের মধ্যে অনিয়ম—ব্যতিক্রম।

এবার বর্ষা নামিয়াছে শুক্লপক্ষে। দশমীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দুই-চারি ফোটা বৃষ্টিও হইতেছে ; পূর্ণিমায় প্রবল বর্ষণ হইবে হয়তো। বর্ষা এবার কিছু প্রবল হইলেও মোটের ওপর ভালই বলিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে জলে প্রায় ছিরকুট করিয়া দিল। কর্কট রাশির মাস শ্রাবণ ; সূর্য এখন কর্কট রাশিতে।

বচনে আছে "কর্কট ছরকট, সিংহ (অর্থাৎ ভাদ্রে) শুকা, কন্যা (অর্থাৎ আশ্বিনে) কানে-কানে, বিনা বায়ে তুলা, (অর্থাৎ কার্তিকে বর্ষে) কোথায় রাখিবি ধান।"

ধানের গতিতে অর্থাৎ লক্ষণ এবার ভাল। জলের গুণও ভাল। এক এক বৎসর জল সচ্ছল হইলেও দেখা যায় ধানের চারা বেশ সতেজ জোরালো হইয়া উঠে না, খুব উর্বর জমিতেও না। এবার কিন্তু ধানের চারায় বেশ জোর ধরিয়াছে কয়েকদিনের মধ্যেই। এমন বর্ষা চাষীদের সুখের বর্ষা। মাঠ-ভরা জল, ক্ষেত-ভরা লক্‌লকে চারা, দলদলে মাটি—আর চাই কি। প্রকৃতির আয়োজন প্রাচুর্যের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রম-শক্তিটুকু যোগ করিতে পারিলেই হইল।

এমন বর্ষায় চাষী মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়ে পাউশের মাছের মত। অন্ধকার থাকিতে মাঠে যাইবে; জলখাবার বেলা, অর্থাৎ দশটা বাজিলে, একবার হাল ছাড়িয়া জমির আলের উপর বসিয়া পিতৃপুরুষের পাঁচসেরি ধোয়া-বাটিতে মুড়ি গুড় খাইবে, তারপর এক ছিলিম কড়া তামাক খাইয়া আবার ধরিবে হালের মুঠা। একটা হইতে দুইটার মধ্যে হাল ছাড়িয়া আরও ঘণ্টা তিনেক, অর্থাৎ পাঁচটা পর্যন্ত কোদাল চালাইবে। পাঁচটার পর বাড়ি আসিয়া স্নানাহার করিয়া আবার মাঠে যাইবে বীজ চারা তুলিতে; জলে কাদায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে চারা তুলিবে, প্রকাণ্ড চারার বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ি ফিরিবে রাত্রি দশটায়। এমন বর্ষায় ভোর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত গ্রামের মাঠ হাসি-তামাসা-আনন্দে মুখর হইয়া উঠে; ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের প্রতিটি চাষী—তাহার কণ্ঠস্বর যেমনই হউক না কেন—গলা ছাড়িয়া প্রাণ খুলিয়া গান গায়। সন্ধ্যার পর এই গান শোনা যায় বেশী এবং শোনা যায় হরেক রকমের গান।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এবার এমন বর্ষাতেও মাঠে গান নাই। এমন বর্ষাতেও প্রতি চাষীরই এক বেলা করিয়া কাজ বন্ধ থাকিতেছে। চাষীর ঘরে ধান নাই। দেবুর বয়সের অভিজ্ঞতায় বর্ষায় চাষীর ঘরে ধান কোন বৎসরই থাকে না; তবে সে শুনিয়াছে, আগে থাকিত। যতীনবাবুকে একদিন বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী যাহা বলিয়াছিল সেই কথা তাহার মনে পড়িল।

"—সেকালে গাই বিয়োলে দুধ বিলাতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, সরোবর-দীঘি কাটাতাম, দেবতার প্রতিষ্ঠা করতাম।—"

ছেলে-ঘুমপাড়ানী ছড়ায় আছে—"চাঁদো-চাঁদো, পাত ঘুমের ফাঁদো, গাই বিয়োলে দুধ দেবো, ভাত খেতে থালা দেবো—।" ভাত না থাকলে ভাত

খাইবার থালা দিবে কোন্ হিসাবে? আর দিবে কোন্ ধন হইতে? ধানের বাড়া ধন নাই।

"গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গাই, পুকুরভরা মাছ, বাড়ির পাঁদাড়ে গাছা, বড় বেটির কোলে বাছা, গাইয়ের কোলে নই, লক্ষ্মী বলেন ওখানেই রই।" আগেকার কালে এ সব ছিল ঘরে ঘরে। যদি না ছিল, তবে কথাটা আসিল কোথা হইতে? আজ এই পঞ্চগ্রামের মধ্যে এমন লক্ষণ শুধু শ্রীহরির ঘরে। কঙ্কণার বাবুদের লক্ষ্মী আছেন, কিন্তু এ সব নাই। জংশনে লক্ষ্মী আছেন, কিন্তু সেখানকার লক্ষ্মীর লক্ষণ একেবারে স্বতন্ত্র। কঙ্কণার বাবুদের তবু জমি আছে, জমিদারি আছে। জংশনে আছে গদী, কল,—ক্ষেত-খামারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ধান সেখানে লক্ষ্মীই নয়, গাদা হইয়া পড়িয়া আছে, জুতা দিয়া উছলাইয়া ধান পরখ হয়, অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথি বৃহস্পতিবার সকাল সন্ধ্যায় বিক্রয় হইতেছে। অথচ লক্ষ্মী সেখানে দাসীর মত খাটিতেছেন। চৈত্রলক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে—লক্ষ্মী একবার এক ব্রাহ্মণের জমি হইতে দুইটি তিলফুল তুলিয়া কানে পরিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাকে তিলস্থনা খাটিতে হইয়াছিল ব্রাহ্মণের ঘরে। এই গদীওয়ালা কলওয়ালাদের কি ঋণ লক্ষ্মী করিয়াছেন কে জানে!…

একদল মাঠ-ফেরত চাষী কলরব করিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল। কলরব রোজই করে, আজ যেন কলরব কিছু বেশী। দেবু লণ্ঠনের আলোর শিখাটা কিছু বাড়াইয়া দিল। চাষীর দল দেবুর দাওয়ার সম্মুখে আসিয়া নিজেরাই দাঁড়াইল।

—পেনাম পণ্ডিতমশাই—পেনাম।

—বশে আছেন?—সতীশ জিজ্ঞাসা করিল।

—হ্যাঁ।—দেবু বলিল- আজ গোল যেন বেশী মনে হল? ঝগড়া-টগড়া হল নাকি কারুর সঙ্গে?

—আজ্ঞে না।

—ঝগড়া নয় আজ্ঞে।

—সতীশ আজ খুব বেঁচে গিয়েছে আজ্ঞে।—উত্তেজিত স্বরে বলিল পাতু।

পাতু দুর্গার ভাই, সর্বস্বান্ত হইয়াছে, পেট ভরে না বলিয়া জাতি-ব্যবসা ছাড়িয়াছে। সে এখন মজুর খাটে। আজ ওই সতীশেরই ভাগের জমিতে মজুর খাটিতে গিয়াছিল।

—বেঁচে গিয়েছে? কি হয়েছিল?

—আজ্ঞে সাপ। কালো কস-কসে আলান। তা হাত দুয়েক হবে।

সতীশ হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। কি করে, বুয়েচেন, মুখ ঢুকিয়েছিল বীজচারার খোলা আঁটির মধ্যে। আমি জানি না। আঁটিটা বাঁধবার লেগে ধরেছি চেপে, কষে চেপে ধরেছিলাম—বুয়েচেন কিনা—লইলে ছাড়ত না। মুখে ধরেছি তো—হাতে সটান্ করে মেলে পাক। দিলাম কাস্তেতে করে পেঁচিয়ে, কি করব ?

ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ ভীষণ নয়, মাঠে কাল-কেউটে যথেষ্ট। প্রতি বৎসরই দুই-চারিটা মারা পড়ে। মারা পড়ে অবশ্য এমনিধারা একটা সাক্ষাৎ অনিবার্য সংঘর্ষ বাধিলে, নতুবা যাহারা মাঠের আলের ভিতর থাকে। মাঠে চাষী চাষ করে, কেহই কাহাকেও অযাচিতভাবে আক্রমণ করে না। মারা পড়ে সাপই বেশী, কদাচিৎ মানুষ পরাজিত হয় দ্বন্দ্বের অসতর্ক মুহূর্তে।

পাতু বলিল—সতীশ দাদাকে এবার মা মনসার থানে পাঁঠা একটা দিতে হয়। কি বলেন ?

সতীশ বলিল—সি হবে। চল্ চল্ তোরা এগিয়ে চল্ দেখি ! আমি যাই। দলটি আগাইয়া চলিয়া গেল। সতীশ দাওয়াতে বসিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—কিছু বলছ নাকি সতীশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে না বললে আর কাকে বলি।

—বল।

—বলছিলাম আজ্ঞে, ধানের কথা।

দেবু বলিল—সেই তো ভাবছি সতীশ।

—আর তো আজ্ঞে, চলে না পণ্ডিতমশায়।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ বলিল—এক-আধজনা লয়। পাঁচখানা গেরামের তামাম লোক। কুসুমপুরের শেখদের তো ইয়ার উপর পরব। আজ দেখলাম—একখানা হাল মাঠে আসে নাই।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—উপায় তো একটা করতেই হবে সতীশ। দিন-রাত্রি ভাবছি আমি। বেশী ভেবো না, যা হয় একটা উপায় হবেই।

সতীশ প্রণাম করিয়া বলিল—ব্যস্, তবে আর ভাবনা কি ? আপনি অভয় দিলেই হল।···সে চলিয়া গেল।

দেবু সন্ধ্যা হইতেই ভাবিতেছিল। সন্ধ্যা হইতে কেন, কয়েকদিন হইতে এ ভাবনার তাহার বিরাম নাই। ঐ জমাট-বস্তির রাত্রির পরদিন হইতেই সে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ জমাট-বস্তির উদ্যোক্তা ভল্লরাই হউক বা

হাড়িরাই হউক অথবা মুসলমান সম্প্রদায়ের অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিরাই হউক, এই উদ্যোগের মধ্যে তাহাদের অপরাধ-প্রবণতা যেমন সত্য, উদরান্নের নিষ্ঠুর একান্ত অভাব তাহার চেয়ে বড় সত্য। অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিগুলি সমাজের স্থায়ী বাসিন্দা, তাহারা বারো মাসই আছে ; দুর্যোগ, অন্ধকার—তাহাও আছে। কিন্তু এই অপরাধ তাহারা নিয়মিত করে না, বিশেষ করিয়া কার্তিক মাস হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত ডাকাতি হয় না। কার্তিক হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত এ দেশে সকলেরই সচ্ছল অবস্থা। তখন ইহারা এ নৃশংস পাপ করা দূরে থাক্—ব্রত করে, পুণ্য কামনা করিয়া স্বেচ্ছায় সানন্দে উপবাস করে, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয় ; ডাকাতের নাতি, ডাকাতের ছেলে—এই সব ডাকাতেরা তখন তো ডাকাতি করে না। অপরাধ-প্রবণতা হইতেও অভাবের জ্বালাটাই বড়। মনে মনে সে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বলিল—মা, তুমি রহস্যময়ী, তুমি থাকিলেও বিপদ না থাকিলেও বিপদ। কঙ্কণায় তুমি বাঁধা আছ। সেখানে তোমারই জন্য বাবুদের ওই বাবু-মূর্তি! ওরা গরীবদের সর্বস্ব গ্রাস করে নানা ছলে—খাজনার সুদে, ঋণের সুদে, চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে ; এমন কি মানুষকে অন্যায়ভাবে শাসন করিবার জন্য—মিথ্যা মামলা-মকদ্দমা করিতে তাহারা দ্বিধা করে না. এগুলোকে অধর্ম বলিয়া মনে করে না ; তাহার মূলেও তুমি। আবার ফল্লারা ডাকাতি করে—যাহারা কোন পুরুষে কেহ ডাকাতি করে নাই, তেমন নূতন মানুষও ডাকাতের দলে যোগ দেয়, তাহার কারণ তোমার অভাব। মাগো, তোমার অভাবেই হতভাগ্যদের পাপ-বৃত্তি এমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! জাগিয়া যখন উঠিয়াছে, তখন রক্ষা নাই। কোন্ দিন কোন্ গ্রামে ডাকাতি হইল বলিয়া। এইজন্যই সে সেদিন তিনকড়ির বাড়ি গিয়েছিল। তিনকড়ির সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখা হইয়াছে তাহার মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি যেমন শ্রীমতী, তেমনি বুদ্ধিমতী।

তিনকড়ির সঙ্গে দেখা না হইলেও দেখুড়িয়ার নিদারুণ অভাবের ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। শুধু দেখুড়িয়ায় নয়—অভাব সমগ্র অঞ্চলটায়। অথচ এমন সুবর্ষায় চাষীদের ধানের অভাব হওয়ার কথা নয় ; মহাজন যাচিয়া ধান ঋণ দেয়। এবার ধর্মঘটের জন্য মহাজনরা ধান-'বাড়ি' দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। শ্রীহরির তো বন্ধ করিবারই কথা। ভাতে মারিয়া প্রজাদের কায়দা করিতে চায়। কঙ্কনার বাবুদের বন্ধ করিবার কারণও তাই। অন্য মহাজনে বন্ধ করিয়াছে জমিদারের ভয়ে এবং কায়দা করিয়া বেশী সুদ আদায়ের জন্য। তাহা ছাড়া দাদন পড়িয়া যাইবার ভয়ও আছে। সকল গ্রাম হইতেই চাষীরা আসিতেছে—কি করা যায় পণ্ডিত?

দেবু কি উত্তর দিবে ?

তাহারা তবু বলে—একটা উপায় কর, নইলে চাষও হবে না, ছেলেমেয়ে-গুলান্‌ও না খেয়ে মরবে।

সতীশকে আজ সে অভয় দিয়া ফেলিল অকস্মাৎ। সতীশ খুশী হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দেবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। দায়িত্ব যেন আরও গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল তাহার।

হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত সবল কোন ব্যক্তি সশব্দ পদক্ষেপে অদূরের বাঁকটা ফিরিয়া দেবুর দাওয়ার সম্মুখে দাঁড়াইল। মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি থাকিলেও তিনকড়িকে চিনিতে দেবুর বিলম্ব হইল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তিনু-কাকা! আসুন, আসুন।

তিনু দাওয়ার উঠিয়া সশব্দে তক্তাপোশটার উপর বসিল, তারপর বলিল—হ্যাঁ, এলাম। স্বর্ন বলছিল, তুমি সেদিন গিয়েছিলে। তা কদিন আর সময় করতে কিছুতেই পারলাম না।

দেবু বলিল—হ্যাঁ কথা ছিল একটু।

—বল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

দেবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—সেদিন জমাট-বস্তির কথা জানেন ?

—হ্যাঁ জানি। বেটাদিগে আমি খুব শাসিয়ে দিয়েছি। তোমার কাছে বলতে বাধা নাই, এ ওই ভল্লা বেটাদের কাজ।

—শ্রীহরি থানাতে আপনার নামেও বোধহয় ডায়রি করেছে।

তিনকড়ি হা-হা করিয়া হাসিয়া সারা হইল; হাসি খানিকটা সংবরণ করিয়া বলিল—আমার উ কলঙ্কিনী নাম তো আছেই বাবাজী, উ আমি গেরাহ্যি করি না। ভগবান আছেন। পাপ যদি না করি আমি, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না।

দেবু একটু হাসিল; তারপর বলিল—সে কথা ঠিক; কিন্তু তবু একটু সাবধান হওয়া ভাল।

—সাবধান আর কি বল ? চাষবাস করি, খাটি-খুটি, খাই-দাই ঘুমোই। এর চেয়ে আর কি সাবধান হব ?

এ কথায় উত্তর দেবু দিতে পারিল না, সত্যিই তো, সৎপথে থাকিয়া যথানিয়মে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি তাহার উপর সন্দেহের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে সে কি করিবে ? সৎপথে সংসার করার চেয়ে আর বেশী সাবধান কি করিয়া হওয়া যায়!

—উ বেটা ছিরে যা মনে লাগে করুক। না হয় জেলই হবে। বেটারা

বি-এল করার তালে আছে, সে আমি জানি। উ জন্যে আমি ভাবি না। গৌর আমার বড় হয়েছে; দিব্যি সংসার চালাতে পারবে। জেলের ভাতই না হয় খেয়ে আসব কিছুদিন।—বলিয়া তিনকড়ি আবার হা-হা করিয়া পরুষ হাসি হাসিয়া উঠিল।

দেবু বুঝিল, তিনকড়ি কিছু উত্তেজিত হইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও একটু হাসিল।

হঠাৎ তিনকড়ির হাসি থামিয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—ভগবান-টগবান একদম মিছে কথা দেবু। নইলে তোমার সোনার সংসার এমনি করে ভেঙে যায়? না—আমার স্বন্নর মত সোনার পিতিমে সাত বছরে বিধবা হয়? আমি ওই পাথরটার লেগে কি কম করলাম? কি হল? আমারই টাকাগুলান গেল—জমি গেল। আমি বেটা গাধা বনে গেলাম। ভগবান মিছে কথা, শুধু ফাঁকি, ফাঁকি!

দেবু শ্রদ্ধার সঙ্গে তিরস্কার করিয়া বলিল—ছিঃ তিনু-কাকা, আপনার মত লোকের ও-কথা মুখ দিয়ে বের করা উচিত;

—কেনে?

—ভগবানকে কি ওই সামান্য ব্যাপারে চেনা যায়? দুঃখ দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন।

—আহা-হা! তোমার ভগবান তো বেশ রসিক লোক হে! কেনে, সুখ দিয়ে পরীক্ষে করুন-না কেনে? দুখ দিয়ে পরীক্ষে করার শখ কেনে?

—তাও করেন বই কি। ওই কঙ্কণার বাবুদিগে দেখুন। সুখ দিয়ে পরীক্ষা করছেন সেখানে।

—তাতে তাদের খারাপটা কি হয়েছে?

—কিন্তু আপনি কি কঙ্কণার বাবুদের মত হতে চান? ওই সব বাবুদের মতন—শয়তান, চরিত্রহীন, পাষণ্ড? দেশের লোকে গাল দিচ্ছে। মরণ তাকিয়ে রয়েছে। যারা মলে দেশের লোকে বলবে—পাপ বিদেয় হল, বাঁচলাম। তিনু-কাকা, মরলে যার জন্যে লোকে কাঁদে না—হাসে, তার চেয়ে হতভাগা কেউ আছে! কানা, খোঁড়া—দুনিয়াতে যার কেউ নাই, সে পথে পড়ে মরে, তাকে দেখেও লোকের চোখে জল আসে। আর যাদের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা জমিদারী, তেজারতি, লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া, তারা মরে গেলে লোকে বলে—বাঁচলাম। এইবার ভেবে দেখুন মনে।

তিনকড়ি এবার চুপ করিয়া রহিল। দেবুর তীক্ষ্ণস্বরের ওই কথাগুলো অন্তরে গিয়া তাহার অভিমান-বিমুখ ভগবৎপ্রীতিকে তিরস্কারে সান্ত্বনার আবেগে

অধীর করিয়া তুলিল! কিন্তু আবেগোচ্ছ্বাসে সে অত্যন্ত সংযত মানুষ। স্বর্ণ যেদিন বিধবা হয় সেদিনও তাহার চোখে একফোঁটা জল কেহ দেখে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—তোমার ভাল হবে বাবাজী, তোমার ভাল হবে। ভগবান তোমাকে দয়া করবেন।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

তিনকড়ি বলিল—শোন, তোমার কাছে কি জন্যে এসেছি, শোন।

—বলুন।

—ধানের কথা।

দেবু ম্লান হাসিয়া বলিল—ধানের উপায় তো এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছি না তিনু-কাকা। দু-চারজন নয়, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক।

—কুসুমপুরের মুসলমানেরা ধানের যোগাড় করেছে। ধান নয়, টাকা। টাকা দাদন নিয়ে ধান কিনে নিয়ে এল। আজ মাঠে শেখেদের একখানা হালও আসে নাই।

দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল—জংশনের কলওয়ালারা টাকা দিলে, ধান কিনলে গদীওয়ালাদের কাছে। কলওয়ালারা চাল দিতেও রাজী আছে। তবে তাতে ভানাড়ীর খরচ বাদ যাবে তো; তা ছাড়া তুষ, কুঁড়ো। আর তোমার ধর—কলের চাল কেমন জল-জল, উ আমাদের মুখে রুচবে না। তার চেয়ে টাকাই ভাল।

দেবু বলিল—কুসুমপুরের সব কলে দাদন নিলে?

—হ্যাঁ। দশ-পনেরো, বিশ-পঁচিশ যে যেমন লোক। আজ ক'দিন থেকেই ঠিক করেছে, কাউকে বলে নাই। তা আমি সেদিন ওদের মজলিশে ছিলাম। শুনে এসেছিলাম।

দেবু বলিল—তাই তো! সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—আমিও গিয়েছিলাম বাবাজী, কথাবার্তা বলে এলাম। তুমি বরং চলো কাল-পরশু। আমি বলে এসেছি তোমার নাম। তা বললে—তার দরকার কি? তোমাদের কথা তোমরা নিজেরাই বল। দেবু পণ্ডিত টাকা নেবে না। সে একা লোক—তার ঘরে ধানও আছে।

—আমার সঙ্গে কলওয়ালাদের দেখা হয়েছে তিনু-খুড়ো। আমার কাছে তো লোক পাঠিয়েছিল।

—তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে?

—হয়েছে। আমি রাজী হতে পারি নি।

—কেন ?

—হিসেব করে দেখেছেন, কি দেনা ঘাড়ে চাপছে ? আমি হিসেব করে দেখেছি। দেড়া সুদে ধান-'বাড়ি'র চেয়ে ঢের বেশী। দাদনের টাকায় যে ধান কিনবেন, পৌষে ধান বিক্রি করবার সময় ঠিক তার ডবল ধান লাগবে।

—কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি বল ?

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভেবে কিছু ঠিক করতে পারিনি তিনু-কাকা।

—কিন্তু ই-দিকে যে পেটের ভাত ফুরিয়ে গেল! মুনিব-মান্দের—ধান-ধান করে মেরে ফেললে! ভল্লা বেটাদেরই বা রাখি কি করে ?

—আজ আপনাকে কিছু বলতে পারলাম না তিনু-কাকা। কাল একবার আমি ন্যায়রত্ন মশায়ের কাছে যাব। তারপর যা হয় বলব।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। জংশন হইতে সে খুব খুশী হইয়াই আসিতেছিল। সে খুশীর পরিমাণটা এত বেশী যে, এই রাত্রেই কথাটা সে দেবুকে জানাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—তবে আজ আমি উঠি।

দেবু নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিনকড়ি দাওয়া হইতে নামিয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আর একটা কথা বাবাজী।

—বলুন।

—আবার মেয়ে স্বন্নর কথা। তুমি দেখেছ তাকে সেদিন ?

—হ্যাঁ। বড় ভাল লাগল আমার, ভারি ভাল মেয়ে।

—পড়া-টড়া একটুকুন ধরেছিলে নাকি ? বলতে-টলতে পারলে ?

দেবু অকপট প্রশংসা করিয়া বলিল—মেয়েটি আপনার খুব বুদ্ধিমতী; নিজেই যা পড়াশুনো করেছে দেখলাম, তাতেই ইউ-পি পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় বৃত্তি পায়।

তিনু উদাসকণ্ঠে বলিল—আমার অদৃষ্ট বাবা, ওকে নিয়ে যে আমি কি করব, ভেবে পাই না। তা স্বন্ন যদি বিত্তি-পরীক্ষে দেয় ক্ষতি কি ?

—কিসের ক্ষতি ? আমি বলছি তিনু-কাকা, তাতে মেয়ের আপনার ভবিষ্যৎ ভাল হবে।

তিনু তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল।—তা হলে বাবা, মাঝে মাঝে গিয়ে একটুকুন দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

—বেশ, মধ্যে মধ্যে যাব আমি।

তিহু খুশী হইয়া বলিল—ব্যস্ —ব্যস্ ! স্বন্ন তা হলে ফাস্টো হবে—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি।

তিহু চলিয়া গেল। লণ্ঠনটা স্তিমিত করিয়া দিয়া দেবু আবার ভাবিতে বসিল। রাজ্যের লোকের ভাবনা। খাজনা বৃদ্ধির ব্যাপারটা লইয়া দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তিনকড়ি আজ যে পথের কথা বলিল, সে পথে লোকের নিশ্চিত সর্বনাশ ! সে চোখের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। এ সর্বনাশের নিমিত্তের ভাগী হইতে হইবে তাহাকে।

পাতু যথানিয়মে সস্ত্রীক শুইতে আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা আসে নাই পণ্ডিত ?

—কই, না।

—আচ্ছা বজ্জাত যাহোক্। সেই সন্ধে বেলায় বেরিয়েছে—

ঘোমটার ভিতর হইতে পাতুর বউ বলিল—রোজগেরে বুন রোজকার করতে গিয়েছে।

পাতু একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বলিল—হারামজাদী, তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি ? ঘোষালের কাণ্ড বুঝি কেউ জানে না—না ?

দেবু বিরক্ত হইয়া ধমক দিল—পাতু !

—পণ্ডিতমশাই—মৃদুস্বরে কে অদূরস্থ গাছতলাটা হইতে ডাকিল।

—কে ?

—আমি তারাচরণ !—মৃদুস্বরেই তারাচরণ উত্তর দিল।

—তারাচরণ ? কি রে ?—দেবু উঠিয়া আসিল।

তারাচরণ নাপিতের কথাবার্তার ধরনই এইরূপ। কথাবার্তা তাহার মৃদুস্বরে। যেন কত গোপন কথা সে বলিতেছে। গোপন কথা শুনিয়া ও বলিয়াই অবশ্য অভ্যাসটা তাহার এইরূপ হইয়াছে। সে নাপিত, প্রত্যেক বাড়িতেই তাহার অবাধ গতি! এই যাতায়াতের ফলে প্রত্যেক বাড়িরই কিছু গোপন তথ্য তাহার কানে আসে। সেই তথ্য সে প্রয়োজন মত অন্যের কাছে বলিয়া, মানুষের ঈর্ষাশাণিত কৌতূহল-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া আপনার কার্যোদ্ধার করিয়া লয়। আবার তাহারও গোপন মনের কথা জানিয়া লইয়া অন্যত্র চালান দেয়। এ অঞ্চলটার সকল গোপন তথ্য সর্বাগ্রে জানিতে পারে সে-ই। থানার দারোগা হইতে ছিরু ঘোষ, আবার দেবু ঘোষ হইতে তিনকড়ি মণ্ডল—এমন কি মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও সুখ-দুঃখের বহু গোপন কথা তাহার জানা আছে। তাহাকে সকলেই সন্দেহের চক্ষে

দেখে—তারচরণ হাসে; সন্দেহের চোখে দেখিয়াও ধুর্ত তারাচরণের কাছে আত্মগোপন তাহারা করিতে পারে না। কিন্তু সারা অঞ্চলটার মধ্যে দুইটি ব্যক্তিকে তারাচরণ শ্রদ্ধা করে—একজন মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়, অপর জন পণ্ডিত দেবু ঘোষ।

দেবু কাছে আসিতেই তারাচরণ মৃদুস্বরে বলিল—রাঙাদিদির শেষ অবস্থা। একবার চলুন।

—রাঙাদিদির শেষ অবস্থা। কে বললে?

—গিয়েছিলাম আজ্ঞে, ঘোষমশায়ের কাছারিতে। ফিরছি—পথে দুগ্‌গার সাথে দেখা হল। বললে—রাঙাদিদির নাকি ভারি অসুখ। আপনাকে একবার যেতে বললে।

—রাঙাদিদি নিঃসন্তান, চাষী সদ্‌গোপদের কন্যা। এখন সে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধা। দেবুদের বয়সীরা তাহাকে রাঙাদিদি বলিয়া ডাকে, সেই বৃদ্ধা মরণাপন্ন। দেবু পাতুকে বলিল—পাতু, তুমি শুয়ে পড়। আমি আসছি।

রাঙাদিদির সঙ্গে তাহার একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল। সে যখন চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা করিত, তখন বৃদ্ধা স্নানের সময় নিয়মিত একগাছি ঝাঁটা হাতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপটি পরিষ্কার করিয়া দিত। এই ছিল তাহার পারলৌকিক পুণ্য-সঞ্চয়ের কর্ম। বৃদ্ধার সঙ্গে তাহার সুখ-দুঃখের কত কথাই হইত। সেটেলমেণ্টের হাঙ্গামার সময় সে যেদিন গ্রেপ্তার হয়, সেদিন বৃদ্ধার ভাবাবেগে তাহার মনে পড়িল। সে জেলে গেলে, বিলুর খোঁজ খবর সে নিয়মিতভাবে লইয়াছে। নিকটতম আত্মীয়জনের মত গভীর অকপট তাহার মমতা, বিলুর মৃত্যুর পর সমস্ত দিন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার ঘোলা চোখের সেই সজল বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

পিছন হইতে তারাচরণ বলিল—একটুকুন ঘুরে যাওয়াই ভাল পণ্ডিত মশায়।

—কেন?

—ঘোষের কাছারির সামনে দিয়ে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে।

—গোলমাল?—দেবু বিস্মিত হইয়া গেল। একটা মানুষ মরিতেছে, সেখানে গোলমালের ভয় কিসের? আত্মীয়-স্বজনহীনা বৃদ্ধা মরিতে বসিয়াছে—তাহার আজ কত দুঃখ, সে কাহাকেও রাখিয়া যাইতেছে না। মৃত্যুর পর এ সংসারে কেহ তাহার নাম করিবে না, তাহার জন্য এককোঁটা চোখের জল ফেলিবে না। আজ তো সারা গাঁয়ের লোকের ভিড় করিয়া তাহার

মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে আসা উচিত; বুড়ী দেখিয়া যাক—গোটা গ্রামের লোকই তাহার আপনার ছিল। সে বলিল—এর মধ্যে লুকোচুরি কেন তারাচরণ? গোলমালের ভয় কিসের?

একটু হাসিয়া তারাচরণ বলিল—আছে পণ্ডিতমশাই। বুড়ীর তো ওয়ারিশ নাই। মলেই শ্রীহরি ঘোষ এসে চেপে বসবে, বলবে—বুড়ী 'ফৌত' হয়েছে; ফৌত প্রজার বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি সমস্ত কিছুরই মালিক হল জমিদার। আসুন, এই গলি দিয়ে আসুন।

কথাটায় দেবুর খেয়াল হইল। তারাচরণ ঠিক বলিয়াছে—খাঁটি মাটির মানুষ সে, অদ্ভুত তাহার হিসাব, অদ্ভুত তাহার অভিজ্ঞতা। ওয়ারিশহীন ব্যক্তির সম্পত্তি জমিদার পায় বটে। আসলে প্রাপ্য রাজার বা রাজশক্তির; কিন্তু এদেশে জমিদারকে রাজশক্তি এমনভাবে তাহার অধিকার, সমর্পণ করিয়াছে যে, হক-হুকুম, অধঃ-ঊর্ধ্ব সবেরই মালিক জমিদার। জমি চাষ করে প্রজা, সেই প্রজার নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ করিয়া দেয় জমিদার। কাজ সে এইটুকু করে। কিন্তু জমির তলায় খনি উঠিলে জমিদার পায়, গাছ জমিদার পায়, নদীর মাছ জমিদার পায়। জমিদার খায়-দায়, ঘুমায় অনুগ্রহ করিয়া কিছু দানধ্যান করে। কেহ নদীর বন্যা-রোধের জন্য বাঁধ বাঁধিতে খরচ দেয়, সেচের জন্য দীঘি কাটাইয়া দেয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দাবী করে, খাজনা-বৃদ্ধি তাহার প্রাপ্য হইয়াছে!

যাহার ওয়ারিশ নাই—তাহার সম্পত্তির আসল মালিক দেশের লোক। দেশের লোকের সকল সাধারণ কাজের ব্যবস্থা করে তাহাদেরই প্রতিনিধি-হিসাবে রাজশক্তি; সেই কারণে সকল সাধারণ সম্পত্তির মালিক ছিল রাজা। সেইজন্য চণ্ডীমণ্ডপ সাধারণে তৈয়ারী করিয়াও বলিত, রাজার চণ্ডীমণ্ডপ, সেইজন্য দেবতার সেবাইত ছিলেন রাজা, সেইজন্য ফৌত প্রজার সম্পত্তি যাইত রাজসরকারে। এসব কথা দেবু ন্যায়রত্ন এবং বিশ্বনাথের কাছে শুনিয়াছে। তাহাদের কপাল! আজ রাজা জমিদারকে তাঁহার সমস্ত অধিকার দিয়া বসিয়া আছেন। জমিদার দিয়াছে পত্তনি দারকে। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু আজ সে এমন গোপনে যাইবে কোন্ অধিকারে? সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

তারাচরণ বলিল—পণ্ডিত, আসুন।

গলিটার ও-মাথা হইতে কে বলিল—পরামানিক, পণ্ডিত আসছে?—দুর্গার কণ্ঠস্বর।

তারাচরণ বলিল—দাঁড়ালেন কেন গো?

—আরও দু-চারজনকে ডাক তারাচরণ।

—ডাকবে পরে। আগে তুমি এস জামাই—দুর্গা আগাইয়া আসিল।

দেবু বলিল—কিন্তু তুই জুটলি কি করে?

মৃদুস্বরে দুর্গা বলিল—কামার-বউয়ের বাড়ি এসেছিলাম। ক'দিন থেকেই একটুকুন করে জ্বর হচ্ছিল রাঙাদিদির; কামার বউ যেত-আসত, মাথার গোড়ায় এক ঘটি জল ঢেকে রেখে আসত। রাঙাদিদিও কামার-বউয়ের অসময়ে অনেক করেছে। আমি দুধ দুয়ে দিতাম দিদির গরুর, বউ জ্বাল দিয়ে দিয়ে আসত। বাকিটা আমি বেচে দিতাম। আজ দুপুরে গেলাম তো দেখলাম বুড়ীর হুঁশ নাই জ্বরে। কামার-বউ কপালে হাত দিয়ে দেখলে—খুব জ্বর। বিকেলে যদি দুজনায় দেখতে গেলাম তো দেখি—দাঁতি লেগে বুড়ী পড়ে আছে। চোখ-মুখে জল দিতে দিতে দাঁতি ছাড়ল, কিন্তু 'বিগার' বকতে লাগল। এখন গল্‌গলিয়ে ঘামছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

দেবু বলিল—ডাক্তারকে ডাকতে হত। তারাচরণ, তুমি যাও, জগন-ভাইকে ডেকে আন আমার নাম করে।

—না—বাধা দিয়া দুর্গা বলিল—আমরা বলেছিলাম, তা রাঙাদিদি বারণ করলে।

—বারণ করলে? এখন জ্ঞান হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ, খানিক আগে থেকে জ্ঞান হয়েছে। বললে—ডাক্‌তার-কোবরেজে কাজ নাই দুগ্‌গা, তুই আর ছেনালি করিস না। ডাকবি তো—দেবাকে ডাক্। তা—কামার-বউকে একা ফেলে যেতেও পারি না, লোকও পাই না তোমাকে ডাকতে। শেষে পরামানিককে ডেকে বললাম।

দেবু একটু চিন্তা করিয়া বলিল—না। তারাচরণ, তুমি ডাক্তারকে ডাক একবার।

বুড়ীর শেষ অবস্থাই বটে। হাত-পায়ের গোড়ার দিকটা বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘোলা চোখ দুইটি আরও ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। মাথার শিয়রে তাহার মুখের দিকে পদ্ম বসিয়াছিল; দেবুকে দেখিয়া সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তাহার জীবনেও এই বৃদ্ধা অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ছিল। প্রায়ই খোঁজ-খবর করিত; গালি-গালাজও দিত, আবার নুন, তেল, ডাল—পদ্মর যখন যেটার হঠাৎ অভাব পড়িত, আসিয়া ধার চাহিলেই দিত; শোধ দিলে লইত, কিন্তু বিলম্ব হইলে কখনও কিছু বলিত না। নিজের বাড়িতে শশা, কলা, লাউ যখন যেটা হইত—বুড়ী তাহাকে দিত। বুড়ীর যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা করিত—তাহার উপকরণগুলি আনিয়া পদ্মের দাওয়ায় রাখিয়া

দিয়া বলিত—আমাকে তৈরী করে দিস্। উপকরণগুলি তাহার একার উপযুক্ত নয়; দুই-তিনজনের উপযুক্ত উপকরণ দিত। বৃদ্ধা আজীবন দুধ বেচিয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, ছাগল-গরু পালন করিয়া, বেচিয়া বেশ-কিছু সঞ্চয় করিয়াছে। অবস্থা তাহার মোটেই খারাপ নয়। লোকে বলে—বুড়ীর টাকা অনেক। হায়দর শেখ পাইকার হিসাব দেয়—আমি রাঙাদির ঠেনে পাঁচ-পাঁচটা বলদ-বাছুর কিনেছি। পাঁচটাতে তিনশো টাকা দিছি। ছাগল—বক্‌না তো হামেসাই কিনেছি। উয়ার টাকার হিসাব নাই।

দেবু আসিয়া পাশে বসিয়া ডাকিল—রাঙাদিদি!

দুর্গা বলিল—জোরে ডাক, আর শুনতে পাচ্ছে না।

দেবু জোরেই ডাকিল—রাঙাদিদি! রাঙাদিদি!

বুড়ী স্তিমিতদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিয়া দেবু বলিল—আমি দেবু। বুড়ীর দৃষ্টিতে তবু কোন পরিবর্তন ঘটিল না। দেবু এবার কানের কাছে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া বলিল—আমি দেবা, রাঙাদিদি! দেবা!

—এবার বুড়ী ক্ষীণ মৃদুস্বরে থামিয়া-থামিয়া বলিল—দেবা! দেবু-ভাই!

—হ্যাঁ।

বুড়ী মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি চললাম দাদা।

পরক্ষণেই তাহার পাণ্ডুর ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতে লাগিল, ঘোলাটে চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল; সে বলিল—আর তোদিকে দেখতে পাব না।··· একটু পরে বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—বিলুকে—তোর বিলুকে কি বলব বল্; সেখানেই তো যাচ্ছি!

দশ

পদ্ম মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুড়ী রাঙাদিদির জন্য কাঁদিতেছিল। বুড়ী সত্যই তাহাকে ভালবাসিত। পদ্ম অনেকদিন ভাল করিয়া কাঁদিবার কোন হেতু পায় নাই। সংসারে তাহার থাকিবার মধ্যে ছিল অনিরুদ্ধ—সে তাহাকে কবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহার জন্য কান্না আর আসেও না। যতীন-ছেলে দিন কয়েকের জন্য আসিয়াছিল—সে চলিয়া গেলে কয়েক দিন পদ্ম কাঁদিয়াছিল। তাহাকে মনে পড়িলে এখনও চোখে জল আসে, কিন্তু বেশ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারে না।

বুড়ী শেষরাত্রেই মরিয়াছে। মরিবার আগে জগন ডাক্তার প্রভৃতি পাঁচজনে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দিদি, তোমার শ্রাদ্ধশান্তি আছে।

টাকা-কড়ি কোথায় রেখেছ বল, আমরা শ্রাদ্ধ করব। আর যাতে যেমন খরচ করতে বলবে, তাতেই তেমন করব।

বুড়ী উত্তর দেয় নাই। পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্বেই দেবুকে বুড়ী বলিয়াছিল—তখন সেখানে ছিল কেবল সে ও দুর্গা। বলিয়াছিল—দেবা, ষোল কুড়ি টাকা আমার আছে, এই আমার বিছানা-বালিশের তলায় মেজেতে পোঁতা আছে। কোনমতে আমার ছেরাদ্দটা করিস, বাকীটা তুই নিস্—আর পাঁচ কুড়ি দিস্ কামারণীকে।

যে কথা বুড়ী তাহাকে একরূপ গোপনে বলিয়াছিল, সেই কথা দেবু ঘোষ ভোরবেলা সকলকে ডাকিয়া একরকম প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিল। শ্রীহরি ঘোষকে পর্যন্ত ডাকিয়া সে বলিয়া দিল—রাঙাদিদি এই বলিয়া গিয়াছে এবং টাকাটার গুপ্তস্থানটা পর্যন্ত দেখাইয়া দিল।

ফলে, যাহা হইবার হইয়াছে। জমিদার শ্রীহরি—তখন পুলিশে খবর দিয়া ওয়ারিশহীন বিধবার জিনিস-পত্র, গরু-বাছুর, টাকা-কড়ি সব দখল করিয়া বসিয়াছে। দেবুর কথা কানেই তোলে নাই। দুর্গা অযাচিতভাবে দেবুর কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া সাক্ষ্য দিতে আগাইয়া আসিয়াছিল—জমাদার এবং শ্রীহরি ঘোষ তাহাকে একরূপ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। পুনরায় ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করিয়াছে। সে তিরস্কারের ভাগ পদ্মকেও লইতে হইয়াছে।

জমাদার দুর্গাকে পুনরায় ডাকাইয়া বলিয়াছিল—তুই মুচির মেয়ে, আর বুড়ী ছিল সদ্‌গোপের মেয়ে; তুই কি রকম তার মরণের সময় এলি? তোকে ডেকেছিল সে?

দুর্গা ভয় করবার মেয়ে নয়, সে বলিয়াছিল—মরণের সময় মানুষ ভগবানকে ডাকতেও ভুলে যায়, তা বুড়ী আমাকে ডাকবে কী? আমি নিজেই এসেছিলাম।

শ্রীহরি পুরুষকণ্ঠে বলিয়াছিল—তুই যে টাকার লোভে বুড়ীকে খুন্ করিস্ নাই, তার ঠিক কি?

দুর্গা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল—তারপর হাসিয়া একটি প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—তা বটে, কথাটা তোমার মুখেই সাজে পাল।

জমাদার ধমক দিয়া বলিয়াছিল—কথা বলতে জানিস্ না হারামজাদী? ঘোষমশায়কে 'পাল' বলছিস্, 'তোমার' বলছিস?

দুর্গা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল—লোকটি যে এককালে আমার ভালবাসার নোক ছিল, তখন পাল বলেছি, তুমি বলেছি, মাল খেয়ে তুইও বলেছি। অনেক

দিনের অভ্যেস কি ছাড়তে পারি জমাদারবাবু? এতে যদি তোমাদের সাজা দেবার আইন থাকে—দাও।

শ্রীহরির মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। জমাদারও আর ইহা লইয়া ঘাঁটাইতে সাহস করে নাই। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—সদ্গোপের মেয়ের মৃত্যুকালে তার জাত-জ্ঞাত কেউ এল না, তুই এলি, আর ওই কামার-বউ এল, ওর মানে কি? কেন এসেছিলি বল?

পদ্মর বুকটা এবার ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়াছিল।

দুর্গাকে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই জমাদার বলিয়াছিল—কামার-বউকে জিজ্ঞাসা করছি—উত্তর দাও না গো।

সমবেত সমস্ত লোক এই অপ্রত্যাশিত সন্দেহে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। উত্তর দিয়াছিল দেবু পণ্ডিত; সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবার সামনে আসিয়া বলিল—মশায়, পথের ধারে মানুষ পড়ে মরছে, সে হয়তো মুসলমান—কোন হিন্দু দেখে যদি তার মুখে জল দেয়, কি কোন মুমূর্ষু হিন্দুর মুখেই কোন মুসলমান জল দেয়—তবে কি আপনারা বলবেন—লোকটাকে খুন করেছে? তাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন—ওর কোন স্বজাতকে না ডেকে, তুই কেন ওর মুখে জল দিলি?

জমাদার বলিয়াছিল—কিন্তু বুড়ীর টাকা আছে।

—পথের ধারে যারাই মরে—তারাই ভিখারী নয়, পথিক হতে পারে, তাদের কাছেও টাকা থাকতে পারে।

—সে ক্ষেত্রে আমরা সন্দেহ করব বই কি, বিশেষ টাকা যদি না পাওয়া যায়।

—টাকার কথা তো আমি বলেছি আপনাদের।

—আরও টাকা ছিল না তার মানে কি?

—ছিল, তারই বা মানে কি?

—আমাদের মনে হয়, ছিল। লোকে বলে···বুড়ীর টাকা ছিল হাজার দরুণে।

—পরের ধন, আর নিজের আয়ু—এ মানুষ কম দেখে না, বেশীই দেখে। সুতরাং বুড়ীর টাকা হাজার দরুণেই তারা বলে থাকে।

শ্রীহরি বলিল—বেশ কথা। কিন্তু যখন দেখলে বুড়ীর শেষ অবস্থা, তখন আমাকে ডাকলে না কেন?

—কেন? তোমাকে ডাকব কেন?

আমাকে ডাকবে কেন?—শ্রীহরি আশ্চর্য হইয়া গেল।

জমাদার উত্তর যোগাইয়া দিল—কেন-না, উনি গ্রামের জমিদার।

—জমিদার খাজনা আদায় করে সরকারের কালেক্টারিতে জমা দেয়। মানুষের মরণকালেও তাকে ডাকতে হবে—এমন আইন আছে নাকি? না—ধর্মরাজ, যমরাজ, ভগবান এদের দরবার থেকেও তাকে কোন সনন্দ দেওয়া আছে? কামার-বউ প্রতিবেশী, দুর্গা কামার-বউয়ের বাড়ী এসেছিল, এসে রাঙাদিদির খোঁজ করতে গিয়ে—

—তাই তো বলছি, জাত-জ্ঞাত কেউ খোঁজ করলে না—শ্রীহরি ঘোষ মশায় জানলেন না, ওরা জানলে—ওরা খোঁজ করলে কেন?

—জাত-জ্ঞাত খোঁজ করলে না কেন—সেকথা জাত-জ্ঞাতকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার ঘোষমশাই বা জানলেন না কেন সে কথা বলবেন আপনার ঘোষ। অন্যের জবাবদিহি ওরা কেমন করে করবে? ওরা খোঁজ করেছে সেটা ওদের অপরাধ নয়। আর অপরে খোঁজ কেন করলে না, সে কৈফিয়ৎ দেবার কথা তো ওদের নয়।

—তোমাকে খবর দিলে—ঘোষমশাইকে খবর দিলে না কেন?

—আইনে এমন কিছু লেখা আছে নাকি যে, ঘোষকে অর্থাৎ জমিদারকেই এমন ক্ষেত্রে খবর দিতেই হবে? ওরা আমাকে খবর দিয়েছিল আমি ডাক্তার ডেকেছিলাম, মৃত্যুর পর ভূপাল চৌকীদারকে দিয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছি। এর মধ্যে বার বার ঘোষমশাই আসছে কেন?

জগন ডাক্তার এবার আগাইয়া আসিয়া বলিয়াছিল—আমি রাঙাদিদির শেষ সময়ে দেখেছি। মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু। বৃদ্ধ বয়স—তার ওপর জ্বর। সেই জ্বরে মৃত্যু হয়েছে। আপনাদের সন্দেহ হয়—লাস চালান দিন। পোস্ট মর্টেম্ হোক, আপনারা প্রমাণ করুন অস্বাভাবিক মৃত্যু। তারপর এসব হাঙ্গামা করবেন। ফাঁসী, শূল,—দ্বীপান্তর যা হয়—বিচারে হবে।

শ্রীহরি বলিয়াছিল—ভাল, তাই হোক। না—জমাদারবাবু?

জমাদার এতটা সাহস করে নাই। অনাবশ্যকভাবে এবং যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুটাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া চালান দিয়া থানার কাজ বাড়াইতে গেলে তাহাকেই কৈফিয়ৎ খাইতে হইবে। তবুও সে নিজের জেদ একেবারে ছাড়ে নাই। শ্রীহরিকে বলিয়া—জংশনের পাস-করা এম-বি ডাক্তারকে 'কল' পাঠাইয়াছিল এবং হাঙ্গামাটা আরও খানিকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিয়াছিল।

জংশনের ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিয়াছিল—আনন্যাচারাল ডেথ ভাববার কারণটা কি শুনি?

শ্রীহরি উত্তর দিতে পারে নাই। উত্তর দিয়াছিল—জমাদার।—মানে

বুড়ীর টাকা আছে কিনা। দেবু ঘোষ, দুর্গা মুচিনী বল্‌ছে—সে টাকার একশো টাকা দিয়ে গেছে কামার-বউকে, আর বাকীটা দিয়ে গেছে দেবু ঘোষকে।

ডাক্তার ইহাতেও অস্বাভাবিক কিছুর সন্ধান পায় নাই। সে বলিয়াছিল—বেশ তো!

—বেশ তো নয়, ডাক্তারবাবু। এর মধ্যে একটু লট্‌-খটি ব্যাপার আছে। মানে—দেবু ঘোষই আজকাল অনিরুদ্ধের স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করে। তার মধ্যে আছে দুর্গা মুচিনী। এখন বুড়ীর মৃত্যুকালে এল কেবল দুর্গা মুচিনী আর কামার-বউ। তারা এসেই ডাকলে দেবু ঘোষকে। দেবু এল, ডাক্তারকে খবর পাঠালে। বুড়ীর মুখে-মুখে উইল কিন্তু হয়ে গেল ডাক্তার আসবার আগেই। সন্দেহ একটু হয় না কি?

হাসিয়া ডাক্তার বলিয়াছিল—সেটা তো উইলের কথায়। তার সঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে—ব্যাপারটাকে অনাবশ্যক—আমার মতে অনাবশ্যক-ভাবেই ঘোরালো করে—তুলছেন আপনারা।

—অনাবশ্যক বলছেন আপনি?

—বলছি। তা ছাড়া জগনবাবু নিজে ছিলেন উপস্থিত।

—বেশ। তা হলে—মৃতদেহের সৎকার করুন। টাকাকড়ি, জিনিসপত্র গরু-বাছুর আমি থানায় জিম্মা রাখছি। পরে যদি দেবু পণ্ডিত আর কামারণীর হক্ পাওনা হয়—বুঝে নেবে আদালত থেকে।

রাঙাদিদির সৎকারে দেবু শ্রীহরিকে হাত দিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল—রাঙাদিদির দেহখানির ভেতর সোনা-দানা নাই। রাঙাদিদির দেহখানা এখন আর কারও প্রজা নয়, খাতকও নয়। জমিদার হিসাবে তোমাকে সৎকার করতে আমরা দোব না। আর যদি তুমি আমাদের স্বজাত হিসেবে আসতে চাও, তবে এস—যেমন আর পাঁচজনে কাঁধ দিচ্ছে, তুমিও কাঁধ দাও। মুখে আগুন আমি দোব। সে আমাকে বলে গিয়েছে। তার জন্যে কোন সম্পত্তি বা তার টাকা আমি দাবী করব না।

শ্রীহরি উঠিয়া পড়িয়া বলিয়াছিল—কালু, বস্ ঐখানে। জমাদারবাবু নমস্কার, আমি এখনই যাই। আপনি সব জিনিস-পত্রের লিষ্টি করে যাবেন তা হলে। আর, যাবার সময় চা খেয়ে যাবেন কিন্তু।

শ্রীহরি এই চলিয়া যাওয়াটাকে—লোকে তাহার পলাইয়া যাওয়াই ধরিয়া লইল। জগন ঘোষ খুশী হইয়াছিল সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু তার চেয়েও খুশী হইয়াছিল পদ্ম নিজে। ওই বর্বর চেহারার লোকটাকে দেখিলেই সে শিহরিয়া উঠে! সেদিনকার সেই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাপের মত চাহিয়া

থাকার কথাটা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সে দেবুর প্রতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। লোকে যখন দেবুর প্রশংসা করিতেছিল, তখন সে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ঠোঁট বাঁকাইয়াছিল। জীবনে দেবুর প্রতি বিরাগ তাহার সেই প্রথম। পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কৃতজ্ঞতা করুণার তার সীমা ছিল না। কিন্তু দেবুর সেদিনকার আচরণে সে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কেন সে সকলের কাছে টাকার কথাটা প্রকাশ করিয়া দিল? দুর্গা বলে—জামাই আমাদের পাথর। পাথরই বটে। পণ্ডিতের টাকার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পদ্মর তো প্রয়োজন ছিল। তাহার স্বামী তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এককণা খাইবার সংস্থান নাই; তাহাকে যদি দয়া করিয়া একজন টাকা দিয়া গেল তো দেবু ধার্মিক বৈরাগী সাজিয়া তাহাকে সে প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত কবিয়া দিল! দেবুর খাইয়া-পরিয়া সে আর কতদিন থাকিবে? কেন থাকিবে? দেবু তাহার কে?

রাঙাদিদি ছিল সেকালের সিধা মানুষ। সে কতদিন পদ্মকে বলিয়াছে—ওলো, দেবাকে একটুকুন্ ভাল করে যত্ন-আত্যি করিস্। ও বড় অভাগা, ওকে একটু আপনার করে নিস্।

পদ্মর সামনেই দেবুকে বলিয়াছে—দেবা, বিয়ে-থাওয়া না করিস্ তো একটা যত্ন-আত্যির লোক তো চাই ভাই। পদ্মকে তুই তো বাঁচিয়ে রেখেছিস—তা ওই তোর সেবা-যত্ন করুক। ওকে বরং তুই ঘরেই নিয়ে যা। মিছে কেনে দুটো জায়গায় রান্না-বান্না, আর তুই-ই বা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাস্ কেনে!

দেবু পণ্ডিত, পণ্ডিতের মতই গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল—না দিদি! মিতেনী নিজের ঘরেই থাকবে।

বুড়ী তবু হাল ছাড়ে নাই, পদ্মকে বলিয়াছিল—তুই একটুকুন বেশ ভাল করে যত্ন-আত্যি কর্‌বি, বুঝ্‌লি?

যত্ন-আত্মীয়তা করিবার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে তাহা করিতে পায় নাই। দেবুই তাহাকে সে সুযোগ দেয় নাই। সে-ই বা কেন দেবুর দয়ার অন্ন এমন করিয়া খাইবে? বুড়ী রাঙাদিদির টাকাটা পাইলে—সে এখান হইতে কোথাও চলিয়া যাইত। তাই সে বুড়ীর জন্য এমন করিয়া কাঁদিতেছে।

দুর্গা উঠান হইতে ডাকিল—কামার-বউ কোথা হে!

পদ্ম উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সাড়া দিল—এই যে আছি।

দুর্গা কাছে আসিয়া বলিল—কাঁদছিলে বুঝি? তাহলে শুনেছ নাকি?

পদ্ম সবিস্ময়ে বলিল—কি?—হঠাৎ এমন কি ঘটিল যাহা শুনিয়া সে আরও

খানিকটা কাঁদিতে পারে? অনিরুদ্ধের কি কোন সংবাদ আসিয়াছে? যতীন-ছেলের কি কোন দুঃসংবাদের চিঠি আসিয়াছে দেবু পণ্ডিতের কাছে? উচ্চিংড়ে কি জংশন শহরে রেলে কাটা পড়িয়াছে?

দুর্গার মুখ উত্তেজনায় থম্ থম্ করিতেছে।

—কি দুর্গা? কি?

—তোমাকে আর দেবু পণ্ডিতকে পতিত করছে ছিরু পাল!—দুর্গা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল। উত্তেজনায় রাগে ঘৃণায় সে শ্রীহরিকে সেই পুরানো ছিরু পাল বলিয়াই উল্লেখ করিল।

—পতিত করবে? আমাকে আর পণ্ডিতকে?

—হ্যাঁ। পণ্ডিত আর তোমাকে।—হাসিয়া দুর্গা বলিল—তা তোমার ভাগ্যি ভাল ভাই। তবে আমিও বাদ যাব না।

একদৃষ্টে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া পদ্ম প্রশ্ন করিল—তাই বলছে? কে বলছে!

—ঘোষমশায়—ছিরে পাল গো, এককালে মুচির মেয়ের এঁটো মদ খেয়েছে, মুচির মেয়ের ঘরে রাত কাটিয়েছে, মুচির মেয়ের পায়ে ধরেছে। রাঙাদিদির ছেরাদ্দ হবে, সেই ছেরাদ্দে পঞ্চগেরামী জাত-জ্ঞাত আসবে, বামুন-পণ্ডিত আসবে, সেইখানে তোমাদের বিচার হবে। পতিত হবে তোমরা।

মৃদু হাসিয়া পদ্ম বলিল—আর তুই?

—আমি!—দুর্গা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।—আমি!—দুর্গার সে হাসি আর থামে না। দুই দিকে পাড় ভাঙিয়া বর্ষার নদী খল্-খল্ করিয়া অবিরাম যে হাসি হাসে—সেই হাসির উচ্ছ্বাস। তাহার মধ্যে যত তাচ্ছিল্য তত কৌতুক ফেনাইয়া উঠিতেছে। খানিকক্ষণ হাসিয়া সে বলিল—আমি সেদিন সভার মাঝে একখানা ঢাক কাঁধে নিয়ে বাজাব আর নাচব: আমার যত নষ্ট কীর্তি সব বলব। সতীশ দাদাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে লোব। বামুন, কায়েত, জমিদার, মহাজন—সবারই নাম ধরে বলব। ছিরু পালের গুণের কথা হবে আমার গানের ধুয়ো।

দুর্গা যেন সত্য সত্যই নাচিতেছে। পদ্মরও এমনই করিয়া নাচিতে ইচ্ছা হয়। সে বলিল—আমাকেও সঙ্গেও নিস্ ভাই, আমি কাঁসি বাজাব তোর ঢাকের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পর দুর্গা বলিল—যাই ভাই, একবার জামাই পণ্ডিতকে বলে আসি।—বলিয়া সে তেমনি ভাবে প্রায় নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত শুনিয়া কি বলিবে! পদ্মরও বড় কৌতূহল হইল—সঙ্গে সঙ্গে সে

অপরিমেয় কৌতুকও বোধ করিল। যাক্ আজ দেখা হইল না, নাই-বা হইল। দেখিতে তো সে পাইবে পঞ্চগ্রামের সমাজপতিগণের সম্মুখে যেদিন বিচার হইবে, সেদিন সে দেখিবে। কি বলিবে দেবু পণ্ডিত, কি করিবে সে? তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করিবে লম্বা ওই মানুষটি আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছে মনে হইবে। কিন্তু পাঁচখানা গাঁয়ের জাত-জ্ঞাতি, নবশাখার মাতব্বরবর্গ তাহাতে কি বাগ মানিবে? পদ্ম জোর করিয়া বলিতে পারে—মানিবে না। এ চাকলার লোকে শ্রীহরি ঘোষের চেয়ে পণ্ডিতকে বহুগুণে বেশী ভালবাসে, এ কথা খুব সত্য; তবু তাহারা দেবুর কথা সত্য ব'লয়া মনিবে না; লোককে চিনিতে তো তাহার বাকি নাই! প্রতিটি মানুষ তাহার দিকে যখন চাহিয়া দেখে, তখন তাহাদের চোখের চাউনি যে কি কথা বলে সে তা জানে। তাহারা এমন একটি অনাত্মীয়া যুবতী মেয়েকে অকারণে ভরণ-পোষণ করিবার মত রসালো কথা শুনিয়া, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে-নাতে পাইয়াও বিশ্বাস করিবে না—এমন কখনও হয়? আকাশ হইতে দেবতারাও যদি ডাকিয়া বলেন—কথাটা মিথ্যা, তবু মিথ্যাই বিশ্বাস করিবে! তাহার উপর শ্রীহরি ঘোষ করিবে লুচি-মণ্ডার বন্দোবস্ত! বিশেষ করিয়া পাকামাথা বুড়াগুলি ঘন ঘন ঘাড় নাড়িবে আর বলিবে—"উঁহু! বাপু হে, শাক দিয়া মাছ ঢাকা যায় না!" তখন পণ্ডিত কি করিবে? তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে! কে জানে? পণ্ডিতের সম্বন্ধে ও কথাটা ভাবিতে তাহার কষ্ট হইল।

পণ্ডিত তাহাকে পরিত্যাগ না করুক, সে এইবার পণ্ডিতের সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিবে। তাহার সহিত কোন সংস্রব সে রাখিবে না। ওই পঞ্চায়েতের সামনেই সে-কথা সে মুখের ঘোমটা খুলিয়া—দুর্গার মত ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিবে—পণ্ডিত ভাল মানুষ গো, তোমরা যেমন—সে তেমন নয়। তার চোখের উপর চাইনিতে কেরোসিনের ডিবের শীষের মত কালি পড়ে না! আমাকে নিয়েও তোমরা ঘোঁট পাকিয়ো না। আমি চলে যাব; যাব নয়, যাচ্ছি—এ গাঁ থেকে চলে যাচ্ছি। কারুর দয়ার-ভাত আমি আর খাব না। তোমাদের পঞ্চায়েতকে আমি মানি না, মানি না।

কেন সে মানিবে? কিসের জন্য মানিবে? ঘোষ যখন চুরি করিয়া তাহাদের জমির ধান কাটিয়া লইয়াছিল—তখন পঞ্চায়েৎ তাহার কি করিয়াছে? ঘোষের অত্যাচারে তাহার স্বামী সর্বস্বান্ত হইয়া গেল—তাহার কি করিয়াছে পঞ্চায়েৎ। তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—কে তাহার খোঁজ করিয়াছে! সে খাইতে পায় নাই, পঞ্চায়েৎ কয় মুঠা অন্ন তাহাকে দিয়াছে? তাহাকে রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছে? তাহারা তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া আনুক—তবে বুঝি।

তাহাদের যে সব সম্পত্তি শ্রীহরি ঘোষ লইয়াছে সেগুলি ফিরাইয়া দিক—তবেই পঞ্চায়েতকে মানিবে। নতুবা কেন মানিতে যাইবে?

দেবু পণ্ডিত পাথর। দুর্গা বলে সে পাথর। নহিলে সে আপনাকে তাহার পায়ে বিকাইয়া দিত! তাহাকে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে, এই বর্ষাকালের রাত্রির জোনাকি-পোকা-ভরা গাছের মত জল্‌-জল্‌ করিয়া জলিয়া উঠে; কিন্তু পরক্ষণেই নিভিয়া যায়। আজ সে সব ঝরিয়া যাক, ঝরিয়া যাক। দেবুর ভাত সে আর খাইবে না। সে আবার মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

দুর্গা আসিয়া দেখিল—পণ্ডিত নাই। দরজার তালা বন্ধ। বাহিরের তক্তাপোশের উপর একটা কুকুর শুইয়া আছে! রোঁয়া-ওঠা একটা ঘেয়ো কুকুর। পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া ওইখানেই বসিবে, বেশী ক্লান্ত হইয়া আসিলে—হয়তো ওইখানেই শুইয়া পড়িবে। তাহার বিলু-দিদির সাধের ঘর। একটা ঢেলা লইয়া কুকুরটাকে সে তাড়াইয়া দিল। সেই রাখাল ছোঁড়া খামারের মধ্যে একা মনের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া একেবারে সপ্তম সুরে গান ধরিয়া দিয়াছে—

"কেঁদো নাকো পান-পেয়সী গো,
তোমার লাগি আনব ফাঁদি নৎ।"

মরণ আর কি ছোঁড়ার! কতই বা বয়স হইবে? পনরো পার হইয়া হয়তো ষোলয় পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাণ-প্রেয়সীর কান্না থামাইবার জন্য ফাঁদি নৎ কিনিবার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে! দুর্গা ছোঁড়াকে কয়েকটা শক্ত কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে খামার বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়া তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছে আর খস খস করিয়া ঝাঁটিখড় কাটিতেছে। দুর্গার পায়ের শব্দ তাহার কানেই ঢুকিল না। দুর্গা হাসিয়া ডাকিল—ওরে ওই! ও পান পেয়সী!

ছোঁড়া মুখ ফিরাইয়া দুর্গাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। গান বন্ধ করিয়া আপন মনেই খুক্‌ খুক্‌ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তোর কাছে এলাম ফাঁদি নতের জন্য। দিবি আমাকে?

ছোঁড়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিল—ধেৎ!

—কেনে রে? আমাকে সাঙা কর না কেনে! শুধু ফাঁদি নৎ দিলেই হবে।
ছোঁড়া এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

দুর্গা বলিল—মরণ তোমার! গলা টিপলে দুধ বেরোয়, একবার গানের ছিরি দেখ।

ছোঁড়া এবার ভ্রূ নাচাইয়া বলিল—মরণ লয়! এইবার সাঙা করব আমি।

—কাকে রে?

—হুঁ। দেখ্‌বা এই আশ্বিন মাসেই দেখ্‌বা।

—ভোজ দিবি তো?

—মুনিবকে টাকার লেগে বলেছি।

—মুনিব গেল কোথা তোর?

ছোঁড়া এবার সাহসী হইয়া ন্যাকামির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—একবার দেখে পরানটো জুড়াতে আইছিলি বুঝি?

দেবুর প্রতি দুর্গার অনুরাগের কথা গোপন কিছু নয়; সে মুখে বলে না, কিন্তু কাজে-কর্মে ব্যবহারে তাহার অনুরাগের এতটুকু সঙ্কোচ নাই—দ্বিধা নাই; সেটা সকলের চোখেই পড়ে। তাহার উপর দুর্গার-মা কন্যার এই অনুরাগের কথা লইয়া আক্ষেপের সহিত পাড়াময় প্রচার করিয়া ফেরে। এই অযথা অনুরাগের জন্যই তাহার হতভাগী মেয়ে যে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতেছে—এ দুঃখ সে রাখিবে কোথায়? কঙ্কণার বাবুদের বাগানের মালীগুলো এতদিন আসা-যাওয়া করিয়া এইবার হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, আর আসে না। কন্যার উপার্জনে তাহার অবশ্য কিছু স্বার্থ নাই, তাহার একমুঠা করিয়া ভাত হইলেই দিন যায়—তবু তাহার দেখিয়া সুখ হইত। তাই তাহার এত আক্ষেপ! দুর্গার মায়ের সেই আক্ষেপ-পীড়িত কাহিনা ছোঁড়াটাও শুনিয়াছে। দুর্গার রসিকতার উত্তরে সে এইবার কথাটা বলিয়া শোধ লইল।

দুর্গা কিন্তু রাগ করিল না—উপভোগ করিল। হাসিয়া বলিল—ওরে মুখপোড়া! দাঁড়া, পণ্ডিত আসুক ফিরে এলেই আমি বলে দোব—তুই এই কথা বলেছিস।

এবার ছোঁড়ার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—মুনিব নাই। মুনিব গিয়েছে কুসুমপুর, সেঁথা থেকে যাকে যাবে কঙ্কণা।

—ফিরবে তো?

ছোঁড়া বলিল—কঙ্কণা থেকে হয়ত জংশন যাবে। হয়ত সদরে যাবে। আজ-কাল হয়ত ফিরবে না। পরশুও ফিরবে কিনা কে জানে।

দুর্গা সবিস্ময়ে বলিল—জংশনে যাবে, সদরে যাবে, পরশুও হয়ত ফিরবে না! কেন রে? কি হয়েছে?

দুর্গাকে চিন্তিত দেখিয়া ছোঁড়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এইবার দুর্গা

সেকথাটা ছাড়িয়াছে। সে খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—মুনিবের করণ মুনিবকেই ভাল। কে জানে বাপু! হেঁথা ঝগড়া হল লোকে লোকে, ছুটল মনিব। হোঁথা দাঙ্গা হল রামায় শামায় মুনিব আমার ছুটল! কুসুমপুরে স্যাখেদের সাথে কঙ্কণার বাবুদের দাঙ্গা হয়েছে না কি হয়েছে—মুনিব গেল ছুটতে ছুটতে।

—কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে কুসুমপুরের শেখদের দাঙ্গা হয়েছে? কোন্ বাবু? কোন্ শেখদের? কিসের দাঙ্গা রে?

—কঙ্কণার বড়বাবুদের সাঁতে আর রহম শেখ—সেই যি সেই গাঁট্টা-গাঁট্টা চেহারা এ্যাই চাপ দাড়ী—স্যাখজী, তারই সাঁতে।

—দাঙ্গা কিসের শুনি?

—কে জানে বাপু! স্যাখ বাবুদের তালগাছ কেটে নিয়েছে, না কি কেটে নিয়েছে, বাবুরা তাই স্যাখকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, থাম্বার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। স্যাখেরা সব দল বেঁধে গেইছে কঙ্কণা। দেখুড়ের তিনকড়ি পাল—বানের আগু হাদি সেই আইছিল; মুনিবও চাদরটা ঘাড়ে ফেলে ছুটল।

—জংশন যাবে, সদর যাবে, তোকে কে বললে?

—দেখুড়ার সেই পাল বললে যি! বললে—কঙ্কণার থানায় নেকাতে হবে সব। তারপরে সদরে গিয়ে লালিশ করতে হবে।

বহুক্ষণ দুর্গা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বাড়ি আসিয়া ডাকিল—বউ!

পাতুর বউ বাহির হইয়া আসিল।

—দাদা কোন মাঠে খাটতে গিয়েছে?

—অমর-কুড়োর মাঠে।

দুর্গা অমর-কুণ্ডার মাঠের দিকে চলিল। মাঠে গিয়া পাতুকে বলিল—তুই একবার দেখে আয় দাদা। ধান পোঁতার কাজ আমি করতে পারব।

পাতু সতীশের মজুর খাটিতেছিল, সে কোন আপত্তি করিল না। দুর্গা আপনার ফর্সা কাপড়খানা বেশ আঁট করিয়া কোমরে জড়াইয়া—ধান পুঁতিতে লাগিয়া গেল। মেয়েরাও ধান পোঁতে, লঘু ক্ষিপ্র হাতে তাহারা পুরুষদের সঙ্গে সমানেই কাজ করিয়া যায়। দুর্গাও এককালে করিয়াছে, অল্প বয়সে সে তাহার দাদার জমিতে ধান পুঁতিত। এখন অবশ্য অনেকদিনের অনভ্যাস। প্রথম কয়েকটা গুচ্ছ কাদায় পুঁতিতে খানিকটা আড়ষ্টতা বোধ করিলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাবটা কাটিয়া গেল। জমিভরা জলে তাহার রেশমী চুড়িপরা হাত ডুবাইয়া জলের ও চুড়ির বেশ একটা মিঠা শব্দ তুলিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সারবন্দী ধানের গুচ্ছ পুঁতিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

সে একা নয়, মাঠে অনেক মেয়ে ধান-চারা পুঁতিতেছে। কোলের ছেলেগুলিকে মাঠের প্রশস্ত আলোর উপর শোয়াইয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘলা আকাশ হইতে ফিন ফিনে ধারায় বৃষ্টি ঝরিতেছে। ছেলেগুলির উপর আচ্ছাদন দিয়া তালপাতার ছাতা ভিজা মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছে। অপরিমেয় আনন্দের সহিত নিরবসর কাজ করিয়া চলিয়াছে কৃষক-দম্পতি। স্বামী করিতেছে হাল, স্ত্রী পুঁতিতেছে ধানের গুচ্ছ প্রচণ্ড বিক্রমে স্বামী ভারী কোদাল চালাইয়া চলিয়াছে, স্ত্রী পায়ের চাপে টিপিয়া বাঁধিতেছে আল। বৃষ্টির জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়াছে, কাদায় ভরিয়া গিয়াছে সর্ব-দেহ। মধ্যে মধ্যে রোদ উঠিয়া গায়ের জল-কাদা শুকাইয়া দরদর ধারে ঘাম বহাইয়া দিতেছে, শ্রাবণ-শেষের পুবালী বাতাসে মাথার চুলের গুচ্ছ উড়িতেছে। পুরুষদের কণ্ঠে মেঠো দীর্ঘ স্বরের গান দূর-দূরান্তে গিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

মেয়েরা ধান পুঁতিতে পুঁতিতে এক পা করিয়া পিছাইয়া আসিতেছে—একতালে পা পড়িতেছে, হাতগুলিও উঠিতেছে-নামিতেছে একসঙ্গে, এক সঙ্গেই বাজিতেছে রূপদস্তার কাঁকন ও চুড়ি। পুরুষেরা ক্লান্ত হইয়া গান বন্ধ করিলে তাহারা ধরিতেছে সেই গানেরই পরের কলি, অথবা ওই গানের উত্তরে কোন গান। পঞ্চগ্রামের সুবিস্তীর্ণ মাঠে শত শত চাষী এবং শ্রমিক চাষীর মেয়ে—বিশেষভাবে সাঁওতাল মেয়েরা চাষ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মিশিয়া দুর্গা ধান পুঁতিতে মধ্যে মধ্যে চাহিতেছিল কঙ্কণার পথের দিকে।

এগার

সমগ্র অঞ্চলটা একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উত্তেজনায় চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া উঠিল। সামান্য চাষী প্রজারও যে মান-মর্যাদার অনেকখানি দাবি আছে, দেশের শাসনতন্ত্রের কাছে জমিদার ধনী মহাজন এবং তাহার মান-মর্যাদার কোন তফাত নাই—এই কথাটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাহারা না-বুঝিলেও আভাসে অনুভব করিল। ব্যাপারটা ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে—কুসুমপুরের পাঠশালার মৌলভী ইরসাদ এবং দেবু।

রহম তিনকড়িকে সেদিন একটা তালগাছ বিক্রয়ের কথা বলিয়াছিল। আসন্ন ঈদলফেতর পর্ব এবং শ্রাবণ-ভাদ্রের অনটনে বিব্রত হইয়া যখন সে ধান বা টাকা ঋণের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরিতেছিল, তখনই সে শুনিয়াছিল জংশন শহরে কলিকাতার কলওয়ালার কলে নূতন শেড্ তৈয়ারী হওয়ার কথা। শেডের জন্য ভাল পাকা তালগাছের প্রয়োজন—এ খবর সে তাদের গ্রামের করাতীদের কাছে শুনিয়াছিল। করাতী আবু শেখ বলিয়াছিল—বড় ভাই,

সোনা-ডাঙ্গালের মাঠে আউশেরক্ষ্যাতের মাথার গাছটারে দাও না কেনে বেচ্যা। মিলের মালিক দাম দিচ্ছে একারে চরম। কুড়ি টাকা তো মিলবেই ভাই!

গরু-ছাগলের পাইকার ব্যবসায়ীরা যেমন কোথাও কাহার ভাল পশু আছে খোঁজ রাখে, কাঠ-চেরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত এই করাতীরাও তেমনি কোথায় কাহার ভাল গাছ আছে খোঁজ রাখে। অভ্যাসও বটে এবং প্রয়োজনও আছে। কাহারও নূতন ঘর-দুয়ার তৈয়ারী হইতেছে সন্ধান পাইলেই সেখানে গিয়া হাজির হয়। ঘরের কাঠ চিরিবার কাজ ঠিক করিয়া লয়; গাছের অভাব পড়িলে তাহারাই সন্ধান বলিয়া দেয় কোথায় তাহার প্রয়োজনমত ঠিক গাছটি পাওয়া যাইবে। কলওয়ালার শেডটা প্রকাণ্ড বড়, তার চালকাঠামোর জন্য তালগাছ চাই—সাধারণ গাছ অপেক্ষা অনেক লম্বা গাছ, শুধু লম্বা হইলেই হইবে না—সোজা গাছ চাই এবং আগাগোড়া পাকা অর্থাৎ সারসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। লোহার 'টি' এবং 'এ্যাঙ্গেলের' কাজ চালাইতে হইবে—এই কাঠগুলিকে। লোহা এবং কাঠের দাম হিসাব করিয়া কলওয়ালা দেখিয়াছে—ওখানে গাছ যে দরে কেনা বেচা হয়, তাহা অপেক্ষা তিনগুণ দাম দিলেও তাহার খরচ অর্ধেক কমিয়া যাইবে। সে চলতি দর অপেক্ষা দ্বিগুণ দাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। যে গাছটির দিকে আবুর দৃষ্টি পড়িয়াছিল—এখানকার দরে সে গাছটির দাম পনরো টাকার বেশী হয় না; তাই সে কুড়ি টাকা বলিয়াছিল।

অন্য সময় কেহ এ প্রস্তাব করিলে—রহম তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকাইয়া দিত—প্যাটে কি আমার আগুন লেগেছে না লক্ষ্মী ছেড়েছে যে ঐ গাছটা বেচতি যাব? ভাগ্, ভাগ্ বুলছি শয়তান কুথাকার।

গাছটা তাহাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তাহার দাদু গাছটা লাগাইয়া গিয়াছিল। কোথায় কোন্ মেহমান অর্থাৎ কুটুম্ব বাড়ি গিয়া সেখানে হইতে একটা প্রকাণ্ড বড় পাকা তাল আনিয়াছিল। তালটার মাড়ি অর্থাৎ ঘন-রস যেমন মিষ্ট তেমনি সুগন্ধ। সাধারণ তালের তিনটা আঁটি, এ তালটার আঁটি ছিল চারিটি। সোনা-ডাঙ্গালের উঁচু ডাঙ্গায় তখন সে সদ্য মাটি কাটিয়া জমি তৈয়ারী করিয়াছে। সেই জমির আলে সে ওই চারিটি আঁটিই পুঁতিয়া দিয়াছিল। গাছ হইয়াছিল একটা। আজ তিনপুরুষ ধরিয়া গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়াছে। সার তাহার আগাগোড়া। তা ছাড়া খোলা সমতল মাঠের উপর জন্মিবার সুযোগ পাইয়া গাছটা একেবারে সোজা তীরের মত উপর দিকে উঠিয়াছিল। এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকায় ঠেকিয়াছিল; এই সময় পনরো টাকার স্থলে

কুড়ি টাকা দামও প্রলুব্ধ করিবার মত ; আবুর কথায় তাই প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়াই ছিল। আরও একটা কথা তাহার মনে হইয়াছিল।—আবু যখন কুড়ি বলিয়াছে, তখন সে নিশ্চয় কিছু হাতে রাখিয়াছে। তাই সে সেদিন নিজেই গিয়াছিল কলওয়ালায় আছে। কলওয়ালাও পূর্বেই গাছটির সন্ধান করিয়াছিল। সে এক কথাতেই নিজের হিসাব মত বলিয়াছিল—যদি গাছ বেচ, আমি ত্রিশ টাকা দাম দিব।

তিরিশ টাকা? রহম অবাক হইয়া গিয়াছিল।

—রাজী হও যদি, টাকা নিয়ে যাও। দর-দস্তর আমি করি না। এর পর আর কোন কথা আমি বলব না।

রহম আর রাজী না হইয়া পারে নাই। চাষের সময় চলিয়া যাইতেছে, ঘরে ধান-চাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। মুনিষ-জনকে ধান দিতে হয়, তাহারা খোরাকী ধানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ধান না পাইলেই বা কি খাইয়া চাষে খাটিবে? তাহার উপর রমজানের মাস ; রোজা উদ্‌যাপনের দিন দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে ; তাহার ছেলেমেয়েরা ও স্ত্রী-দুইটি কত আশা করিয়া রহিয়াছে—কাপড়-জামা পাইবে। এ সময় রাজী না হইয়া তাহার উপায় কি? এক উপায় জমিদারের কাছে মাথা হেঁট করিয়া বুদ্ধি দেওয়া ; কিন্তু সে তাহা কোন মতেই পারিবে না। 'বাৎ' যখন দিয়াছে তখন জাতের হলফ করিয়াছে ; সে বাৎ-খেলাপী হইলে—তাহার ইমান্ কোথায় থাকিবে? রমজানের পবিত্র মাস, সে রোজা রক্ষা করিয়া যাইতেছে, আজ ইমান্-ভঙ্গের গুণাহ্ করিতে পারিবে না।

এইখানেই কলওয়ালার সঙ্গে তাহার দাদনের কথাও হইয়াছিল। মিলের গুদাম-ঘরে ও বাহিরের উঠানে রাশি-রাশি ধান দেখিয়া রহম আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, বলিয়াছিল—আমাদের কিছু ধান 'বাড়ি', মানে দাদন ছ্যান কেনে? পৌষ মাঘ মাসে লিবেন। সুদ সমেত পাবেন।

কলওয়ালা তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—ধান না, টাকা দাদন দিতে পারি।

—টাকা নিয়ে কি করব গো বাবু? আমাদের ধান চাই। আমরা বুঝি ধান।

—ধানেই টাকা, টাকাতেই ধান। টাকার দাদন নিয়ে ধান কিনে নেবে।

—তা—আপনার কাছেই কিনব তো—

—না। আমি ধান বেচি না। চাল বেচি। তাও দু' মণ চার মণ দশ মণ না! দুশো-চারশো মণের কম হলে বেচি না। তোমরা টাকা নিয়ে এখানকার গদিওয়ালার কাছে কিনে নাও।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া রহম বলিয়াছিল—সুদ কত নেবেন টাকায় ?

—সুদ নেব না ; পৌষ-মাঘ মাসে—কিস্তির মুখে টাকার পরিমাণে ধান দিতে হবে। যে দর থাকবে, দরে টাকায় এক আনা কম দরে কিনে দিতে হবে। আর একটি শর্ত আছে।

—বলেন। কি শর্ত ?

—তোমরা যারা দাদন নেবে, তারা অন্য কাউকে ধান বেচতে পারবে না। এর অবিশ্যি লেখাপড়া নাই, কিন্তু কথা দিতে হবে। তোমরা মুসলমান—ইমানের উপর কথা দিতে হবে।

রহম সেদিন বলিয়াছিল—আমরা শলা-পরামর্শ কর‍্যা বলব।

—বেশ।—মিলওয়ালা মনে মনে হাসিয়াছিল।—তালগাছের টাকাটা আজই নিয়ে যেতে পার।

—আচ্ছা, পরশু আসব। সব ঠিক কর‍্যা যাব।

মজলিশে টাকা দাদন লওয়া স্থির হইয়াছিল, রহম তালগাছ বিক্রি করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহার দুই স্ত্রীই কিন্তু গাছের শোকে চোখের জল ফেলিয়াছিল—এমন মিঠা তাল ! তিন পুরুষের গাছ ! কত লোকে তাহাদের বাড়িতে তাল চাহিতে আসে। ভাদ্র মাসে তাল পাকিয়া আপনি খসিয়া পড়ে, ভোর রাত্রি হইতে নিম্ন শ্রেণীব ছেলেমেয়েরা তাল কুড়াইয়া লইয়া যায়। খসিয়া পড়া তালে এ অঞ্চলে কাহারও স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই। তাই রহম তালগুলিতে পাক ধরিলে—খসিয়া পড়িবার পূর্বেই কাটিয়া ঘরে আনে। দুঃখ তাহারও যথেষ্ট হইতেছিল ; কিন্তু তবুও উপায় কি ? সেদিন গিয়া সে গাছ বিক্রি করিয়া টাকা লইয়া আসিল ; এবং টাকা দাদন লওয়ারও পাকা কথা দিয়া আসিল।

একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেইটাই আসল কথা। ওই গাছটার স্বামিত্বের কথা। তিন পুরুষের মধ্যে স্বামিত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই। তাহার পিতামহ জমিদারের কাছে ডাঙ্গা বন্দোবস্ত লইয়া নিজ হাতে জমি কাটিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুয্যেবাবুকে। মুখুয্যেবাবুরা মস্ত মহাজন—লক্ষপতি লোক। এমনি ধারার ঋণের টাকায় এ অঞ্চলের বহু জমির স্বামিত্ব তাহাদিগকে অর্শিয়াছে। হাজার হাজার বিঘা জমি তাহাদের কবলে। এত জমি কাহারও নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করানো অসম্ভব। আর তাহারা চাষীও নয় ; আসলে তাহারা মহাজন জমিদার। তাই সকল জমিই তাহাদের চাষীদের কাছে ভাগে বিলি করা আছে। তাহারা চাষ

করে ; ফসল উঠিলে বাবুদের লোক আসে। দেখিয়া-শুনিয়া প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া যায়। রহমের বাপ জমি বিক্রি করিবার পর—বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে, রহমও চষিতেছে। কোন দিন একেবারের জন্য তাহাদের মনে হয় নাই, যে জমিটা তাহাদের নয়। খাজনার পরিবর্তে ধানের ভাগ দেয় এই পর্যন্ত। সেই মতই সে জমিগুলির তদ্বির-তদারক করিতেছে। মজুর নিযুক্ত করিয়া, উন্নতিসাধনের প্রয়োজন হইলে—সেই করিয়াছে ; বাবুদের নিকট হইতে সেই বাবদ টাকা চাহিবার কথা কোন দিন মনে উঠে নাই ! মুখে বরাবর দশের কাছে বলিয়া আসিয়াছে—আমার বাপুতি জমি। মনে মনে জানিয়া আসিয়াছে—আমার জমি। ওই জমির ধান কাটিয়াই নবান্ন পর্ব করিয়াছে। তাই তালগাছটা যখন সে বেচিল, তখন তাহার একেবারের জন্যও মনে হইল না—সে অন্যের গাছ বেচিতেছে, একটা অন্যায় কাজ করিতেছে।

গাছটা কাটিয়া মিলওয়ালা তুলিয়া লইয়া যাইবার পর, হঠাৎ আজ সকালে রহমের বাড়িতে ভোরবেলায় একজন চাপরাশী আসিয়া হাজির হইল ! বাবুর তলব. এখনি চল তুমি।

রহম বলদ-গরু দুইটিকে খাইতে দিয়া তাহাদের খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল—উ বেলায় যাব বলিয়ো, বাবুকে হে।

—উঁহু ! এখুনি যেতে হবে।

রহম মাতব্বর চাষী, গোঁয়ার লোক—সে চটিয়া গেল ; বলিল—এখুনি যেতে হবে মানে ? আমি কি তুর বাবুর খরিদ-করা বান্দা গোলাম ?

লোকটা রহমের হাত চাপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী দুর্ধর্ষ রহম তাহার গালে কষাইয়া দিল প্রচণ্ড একটা চড়।—আস্পর্ধা বটে, আমার গায়ে হাত দিস !

লোকটা জমিদারের চাপরাশী। ইন্দ্রের ঐরাবতের মতই তাহার দম্ভ. তেমনি হেলিয়া-দুলিয়াই চলা-ফেরা করে। তাহাকে এ অঞ্চলে কেহ এমনি করিয়া চড় মারিতে পারে—এ তাহার ধারণার অতীত ছিল। চড় খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গেলেও—সামলাইয়া উঠিয়া সে একটা হুঙ্কার ছাড়িল। রহম সঙ্গে সঙ্গে কষাইয়া দিল অন্য গালে আর একটা চড় ; এবং দাওয়ার উপর হইতে লাঠি লইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

এবার চাপরাশীটার হুঁশ হইল। কোন কিছু না বলিয়া সে ফিরিয়া গিয়া জমিদারের পায়ে গড়াইয়া পড়িল। রহমের চপেটচিহ্নাঙ্কিত বেচারার স্ফীত ব্যথিত গাল দুইটা চোখের জলে ভাসিয়া গেল—আর আপনার চাকরি করতে পারব না হুজুর ! মাপ করুন আমায়।

ব্যাপার শুনিয়া বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে গেল পাঁচ-পাচজন লাঠিয়াল। রহমকে চাষের ক্ষেত হইতে তাহারা উঠাইয়া লইয়া গেল। সম্রাট আলমগীর যেমন আপনার শক্তি ও ঐশ্বর্যের চরম প্রদর্শনীর মধ্যে বসিয়া 'পার্বত্য মূষিক' শিবাজীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন—বাবুও ঠিক তেমনি ভাবে রহমের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহার খাস বৈঠকখানার বারান্দায় রহমকে হাজির করা হইল। সেখানে পাইক-চাপরাশী-পেশ্কার-গোমস্তা গিস্ গিস্ করিতেছিল; বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়া ফরাসী টানিতেছিলেন।

রহম সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বাবু কথাও বলিলেন না।

সে ক্ষুব্ধ হইয়া একটা বসিবার কিছু খুঁজিতেছিল, কিন্তু খানকয়েক চেয়ার ছাড়া আর কোন আসনই ছিল না। শুধু মাটির উপর বসিতেও তাহার মন চাহিতেছিল না। তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান চাষী—যাহাদের জমি-জেরাত আছে, তাহাদের সবারই এ আত্মাভিমানটুকু আছে। কতক্ষণ মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া তাহাকে কেহ একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত করিল না। চারিদিকের এ নীরব উপেক্ষা ও বাবুর এই একমনে তাম্রকূট সেবন যে তাহাকে শুধু অপমান করিবার জন্যই—ইহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না।

সে এবার বেশ দৃঢ়স্বরেই বলিল—সালাম।…নিজের অস্তিত্বটা সে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল।

রহম বলিল—আমাদের চাষের সময়, ইটা আমাদের বস্যা থাকবার সময় লয় বাবু। কি বলছেন বলেন?

বাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—আমার চাপরাশীকে চড় মেরেছ তুমি?

উঁ—আমার হাতে ধরেছিল কেনে? আমার ইজ্জৎ নাই! চাপরাশী আমার গায়ে হাত দিবার কে?

ঘাড় ফিরাইয়া বক্রহাস্যে বাবু বলিলেন—এইখানে যত চাপরাশী আছে, সবাই যদি তোমাকে দুটো করে চড় মারে, কি করতে পার তুমি?

রহম রাগে কথা বলিতে পারিল না। দুর্বোধ্য ভাষায় শুধু একটা শব্দ করিয়া উঠিল।

একটা চাপরাশী ধাঁ করিয়া তাহার মাথায় একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিল—চুপ বেয়াদপ্।

রহম হাত তুলিয়াছিল; কিন্তু তিন-চারজন একসঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চুপ! বস্—ওইখানে বস্।

তাহারা পাঁচজনে মিলিয়া চাপ দিয়া তাহাকে মাটির উপর বসাইয়া দিল।

সে এবার বুঝিল তাহার শক্তি যতই থাক্, এতজনের কাছে তাহা নিষ্ফল—মূল্যহীন। ক্ষুব্ধ রোষে চাপরাশীর দিকে সে একবার চাহিল। পনরোজন চাপরাশী ; তাহার মধ্যে দশজন তাহার স্বধর্মী স্বজাতি, মুসলমান। রমজানের মাসে সে রোজা করিয়া উপবাসী আছে ; তবু তাহাকে অপমান করিতে তাহাদের বাধিল না! রমজানের ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে ইহাদের সঙ্গেই আলিঙ্গন করিতে হইবে! মাটির দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবু ঘোষের রাখালটা দুর্গাকে তিনকড়ির প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—'বানের আগু হাদি ; অর্থাৎ বন্যার অগ্রগামী জলস্রোতের মাথায় নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাওয়া বস্তুসমূহ। 'হাদি' বলিতে প্রায়ই জঞ্জাল বুঝায়। তিনকড়ি জঞ্জাল কি না জানি না—তবে সর্বত্র সর্বাগ্রে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু তাহাকে কেহ ভাসাইয়া লইয়া যায় না, সেই অন্যকে ভাসাইয়া লয়। বন্যার অগ্রগামী জলস্রোত বলিলেই বোধ হয় তিনকড়িকে ঠিক বলা হয়। মুখে মুখে সংবাদটা সর্বত্র ছড়াইয়াছে। কুসুমপুরের আরও কয়েকজন মুসলমান চাষী রহমের জমির কাছাকাছি চাষ করিতেছিল। তাহারা ব্যাপারটা দেখিয়াও কিন্তু হাল ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। তিনকড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত দূরে! সে ব্যাপারটা দূর হইতে দেখিয়া ঠিক ঠাওর করিতে পারে নাই। কয়েকজন লোক আসিল, রহম-ভাই হাল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু লোকগুলি মাথার লাল পাগড়ি তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। সে তৎক্ষণাৎ কৃষাণটার হাতে হালখানা দিয়া আগাইয়া আসিল। সমস্ত শুনিয়া সে ছুটিয়া গেল কুসুমপুর। ইরসাদকে সমস্ত জানাইয়া বলিল—দেখ, খোঁজ কর।

ইরসাদ চিন্তিত হইয়া বলিল—তাই তো!

ভাবিয়া চিন্তিয়া ইরসাদ একজন লোক পাঠাইয়া দিল। লোকটা আসিয়া প্রকৃত সংবাদ দিতেই ইরসাদ যেন ক্ষেপিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ গ্রামের চাষীদের খবর পাঠাইল। তাহারা আসিবামাত্র ইরসাদ বলিল—যাবে তুমরা আমার সাথে। ছিনায়ে নিয়ে আসব রহম-ভাইকে!

পঞ্চাশ-ষাটজন চাষী সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া উঠিল।

মুসলমানদের সাহস জিনিসটা অনেকাংশে সম্প্রদায়-গত সাধনায়ত্ত জিনিস। তাহার উপর অজ্ঞতা-অসামর্থ্য-দারিদ্র্য-নিপীড়িত জীবনের বিক্ষোভ, যাহা শাসনে-পেষণে লুপ্ত হয় না—সুপ্ত হইয়া থাকে অন্তরে অন্তরে, সেই বিক্ষোভ তাহাদিগকে স্বতঃই সম্মিলিত করে একই সমবেদনার ক্ষেত্রে। ইহাদের সদ্যজাগ্রত বিক্ষোভ

কিছুদিন হইতে জমিদারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের মুক্তি-পথে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল—আগ্নেয়গিরির গহ্বরমুখ-মুক্ত অগ্নিধূমের মত।

তাহারা দল বাঁধিয়া চলিল, রহমকে তাহারা ছিনাইয়া আনিবে। তাহাদের স্বজাতি, স্বধর্মী—তাহাদের পাঁচজনের একজন, তাহাদের মধ্যে গণ্যমান্য—তাহাদের রহম ভাই! তাহারা ইরসাদকে অনুসরণ করিল। তিনকড়ি সেই মুহূর্তে ছুটিল শিবকালীপুরের দিকে। এ সময় দেবুকে চাই। সে সত্য সত্যই জোর কদমে ছুটিল।

এইভাবে দল বাঁধিয়া তাহারা ইহার পূর্বেও জমিদার-কাছারিতে কতবার আসিয়াছে। ক্ষেত্রও অনেকটা একই ভাবের। জমিদারের কাছারিতে জমিদার কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির মুক্তির জন্য গ্রামসুদ্ধ লোক আসিয়া হাজির হইয়াছে। সবিনয় নিবেদন—অর্থাৎ বহুত সেলাম জানাইয়া দণ্ডিতের কসুর গাফিলতি স্বীকার করিয়া হুজুরের দরবারে মাফ করিবার আরজ পেশ করিয়াছে। আজ কিন্তু তাহারা অন্য মূর্তিতে, ভিন্ন মনোভাব লইয়া হাজির হইয়াছে।

জমিদারের কাছারি-প্রাঙ্গনে দলটি প্রবেশ করিল—তাহাদের সর্বাগ্রে ইরসাদ। বারান্দায় জমিদার চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—নিঃশব্দে নিজের চেহারাখানা দেখাইয়া দিলেন। তিনি জানেন—তাঁহাকে দেখিলে এ অঞ্চলের লোকেরা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। চাপরাশীরা বেশ দম্ভ সহকারে যেন সাজিয়া দাঁড়াইল—যাহার পাগড়ি খোলা ছিল, সে পাগড়িটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া মাথায় পরিল।

দলটি, মুহূর্তে বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

জমিদার গম্ভীরস্বরে হাঁকিয়া বলিলেন—কে? কোথাকার লোক তোমরা? কি চাই?…প্রত্যাশা করিলেন—মুহূর্তে দলটির মধ্যে সম্মুখে আসিবার জন্য ঠেলাঠেলি বাধিয়া যাইবে, সকলেই আপন-আপন সেলাম তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে চাহিবে; একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক নত হইবে—মাটিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাদের কথা তাঁহার দাওয়ার উপর আসিয়া উঠিবে সসম্ভ্রমে—সালাম হুজুর।

দলটি তখন স্তব্ধ। অল্প খানিকটা স্তিমিত ভাবের চাঞ্চল্যও যেন পরিলক্ষিত হইল।

জমিদার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাঁকিলেন—কি চাই সেরেস্তায় গিয়ে বল।

ইরসাদ এবার সোজা উপরে উঠিয়া গেল; নিতান্ত ছোট একটি সেলাম করিয়া বলিল—সালাম! দরকার আপনার কাছেই।

—একসঙ্গে অনেক আর্জি বোধ হয়? এখন আমার সময় নাই। দরকার থাকলে—

এবার কথার মাঝখানেই প্রতিবাদ করিয়া ইরসাদ বলিল—রহম চাচাকে এমন করে চাপরাশী পাঠিয়ে ধরে এনেছেন কেন? তাকে বসিয়ে রেখেছেন কেন?

জমিদার এবং রহম এবার একসঙ্গে ক্ষুব্ধ রোষে গর্জন করিয়া উঠিল।

জমিদার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—চাপরাশী! কিষাণ সিং! জোবেদ আলি।

রহম উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার মাথায় চড় মারছে; আমারে ঘাড়ে ধরে বস্ করিয়া দিছে! আমার ইজ্জতের মাথার পরে পয়জার মারছে!

চাপরাশী কিষণ সিং হাঁকিয়া উঠিল—এ্যও রহম আলি, বইঠ্ রহো।

জোবেদ আগাইয়া আসিল খানিকটা, অন্য চাপরাশীরা আপন-আপন লাঠি তুলিয়া লইল।

ইরসাদও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার!

তাহার পিছনের সমগ্র জনাও এবার চীৎকার করিয়া উঠিল—নানাকথায়; কোন একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেল না, নানাশব্দ-সমন্বিত বিপুল ধ্বনি শুধু জ্ঞাপন করিল এক সবল প্রতিবাদ।

পরের মুহূর্তটি আশ্চর্য রকমের একটি স্তব্ধ মুহূর্ত। দুই পক্ষই দুই পক্ষের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথম কথা বলিলেন জমিদার। তিনি প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রজার দল, দরিদ্র মানুষগুলো এমন হইল কেমন করিয়া? পর মুহূর্তে মনে হইল—কুকুরও কখনও কখনও পাগল হয়। ওটা উহাদের মৃত্যু-ব্যাধি হইলেও ওই ব্যাধি-বিষের সংক্রমণ এখন উহাদের দন্তে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহাদের দাঁত অঙ্গে বিদ্ধ হইলে মালিককেও মরিতে হইবে। তিনি সাবধান হইবার জন্যই বলিলেন, কিষণ সিং, বন্দুক নিকালো।

—তারপর জনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমরা দাঙ্গা করিতে চাইলে বাধ্য হয়ে আমি বন্দুক চালাবো।

একটা 'মার মার' শব্দ সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ধ্বনিটা উঠিবার প্রারম্ভ-মুহূর্তেই পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—না ভাই সব দাঙ্গা করিতে আমরা আসি নাই। আমরা আমাদের রহম চাচাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। এস রহম চাচা, উঠে এস।

সকলে দেখিল—নীচের সমবেত জনতার পাশ দিয়া আসিয়া জনতাকে

অতিক্রম করিয়া দেবু ঘোষ প্রথম সিঁড়িতে উঠিতেছে। সমস্ত জনতা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—উঠে এস! উঠে এস! চাচা! বড়-ভাই! রহম-ভাই! এস উঠে এস।

সমস্ত চাপরাশীরা জমিদারের মুখের দিকে চাহিল। এমন ক্ষেত্রে তাহারা তাহার মুখ হইতে প্রচণ্ড একটা ধমক বা তাহাদের প্রতি একটা জোরালো, বেপরোয়া হুকুম জারির প্রত্যাশা করিল। কিন্তু বাবু শুধু বলিলেন—রহম আমার তালগাছ বিক্রি করেছে চুরি করে, আমি তাকে থানায় দোব।

দেবু বলিল—থানায় আপনি খবর দিন, ধরে নিয়ে যেতে হয় দারোগা এসে ধরে নিয়ে যাবে। থানায় খবর না দিয়ে আপনার চাপরাশী দিয়ে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা আপনার নাই। আপনার কাছারিটা গভর্নমেণ্টের থানাও নয়, হাজতও নয়। উঠে এস চাচা! এস! এস!

রহম দাঁড়াইয়াই ছিল। দেবু তাহার হাত ধরিয়া বারান্দা হইতে নামিতে আরম্ভ করিল। ইরসাদ তাহার সঙ্গ ধরিল। দেবু জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—চল ভাই। বাড়ি চল সব।

বন্য কুকুর ও মৃগ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু গণ্ডার, বাঘ বা সিংহ থাকে না। ওটা জীবধর্ম। শক্তি যেখানে অসমান আধিক্যে একস্থানে জমা হয়, সেখানে নির্ভয়ে একক থাকিবার প্রবৃত্তি তাহার স্বাভাবিক। আদিম মানুষের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ জনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই দুর্বল মানুষেরা জোট বাঁধিয়া তাহাকে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিল। পরে আবার শক্তিশালীকেই দলপতি করিয়া সম্মানের বিনিময়ে তাহার স্কন্ধে দলের সকলের প্রতি কর্তব্যের বোঝা চাপাইয়া দিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু তবুও দলের মধ্যে শক্তিশালীদের প্রতি ঈর্ষা চিরকাল প্রচ্ছন্ন ছিল এবং আছে। ধনশক্তি আবিষ্কারের পর—ধনপতিদের কাছে শৌর্যশালী মানুষ হার মানিয়াছে। ধনপতিদের ইঙ্গিতেই আজ এক দেশের শৌর্যশক্তি অপর দেশের শৌর্যশক্তির সহিত লড়াই করে, বন্ধুত্ব করে। কিন্তু একই দেশের ছোট-বড় ধনপতিদের পরস্পরের মধ্যেও সেই ঈর্ষা পুরাতন নিয়মে বিদ্যমান। একের ধ্বংসে তাহাদের অন্যেরা আনন্দ পায়! বর্তমান ক্ষেত্রে সেইরূপ ঈর্ষান্বিত এক ব্যক্তির প্রতিনিধি আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কঙ্কণারই একজন মধ্যবিত্ত জমিদারের নায়েব আসিয়া দেবু এবং ইরসাদকে ডাকিল। লোকটা পথে তাহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল—আমাদের বাবু পাঠালেন আমাকে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিরা দেবু বলিল—কেন—কেন?

বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। ছি! ছি! এই কি মানুষের কাজ। পয়সা হলে কি এমনি করে মানুষের মাথায় পা দিয়ে চলে!

ইরসাদ বলিল—বাবুকে আমাদের সালাম দিয়ো।

—বাবু বলে দিলেন, থানায় ডায়েরি করতে যেন ভুল না হয়। নইলে এর পর তোমাদেরই ফ্যাসাদে ফেলবে। এই পথে তোমরা থানায় চলে যাও।

ইরসাদ দেবুর মুখের দিকে চাহিল। দেবুর মনে পড়িল যতীনবাবু রাজবন্দীর কথা। আরও একবার গাছ কাটার হাঙ্গামার সময় যতীনবাবু থানায় ডায়েরি করিতে বলিয়াছিল; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, কমিশনার সাহেবকে দুখানা টেলিগ্রাম করে দাও। এইভাবে ডায়েরি করো—চাপরাশীরা গলায় গামছা বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে, কাছারিতে মারপিট করেছে, থামে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তোমরা গেলে বন্দুকের গুলি ছুঁড়েছে, ভাগ্যক্রমে কাউকে লাগে নাই।

দেবু অবাক হইয়া নায়েবটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই নায়েবের মনিব ক্ষুদে জমিদারটির সঙ্গেও তাহাদের কর-বৃদ্ধির কিছু কিছু বিরোধ আছে। বৃদ্ধির ব্যাপার লইয়া ইনিও মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে দল পাকাইয়াছেন, আবার সেই লোকই গোপনে গোপনে মুখুয্যেদের শত্রুতা করিতেছে তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়া!

ইরসাদ এবং অন্য সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; ইরসাদ বলিল—নায়েব মশায় মন্দ বলেন নাই দেবু-ভাই।

নায়েব বলিল—আমি চললাম। কে কোথায় দেখবে। হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা আছে তো! তবে যা বললাম—তাই করো যেন।···সে চলিয়া গেল।

ইরসাদ বলিল—দেবু ভাই! তুমি কিছু বল্‌ছ নাই যে?

দেবু শুধু বলিল—নায়েব যা বললে, তাই কি করতে চাও ইরসাদ-ভাই?

রহম বলিল—হ্যাঁ, বাপজান। নায়েব ঠিক বুলেছে।

—ডায়রি করতে আমার অমত নাই। কিন্তু গলায় গামছা দেওয়া, দড়ি দিয়ে থামে বাঁধা; গুলি ছোড়া—এই সব লিখাবে নাকি?

—হাঁ কেসটা জোর হবে তাতে।

—কিন্তু এ যে মিথ্যে কথা রহম-চাচা!

রহম ও ইরসাদ অবাক হইয়া গেল। রহম মামলা-মকদ্দমায় অভ্যস্ত লোক, ইরসাদ নিজে মামলা না করিলেও দৌলত হাজীর সঙ্গে পাড়াপ্রতিবেশীর মকদ্দমায় সলা-পরামর্শ দেয়, তদ্বির-তদারক করে। পুরাপুরি সত্য কথা বলিয়া যে দুনিয়ায় মামলা-মকদ্দমা হয় না—এ তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ

নিছক বাস্তব জ্ঞান। রহম বলিল—দেবু-চাচা আমাদের ছেল্যা মানুষই থেকে গেল হে!

দেবু বলল—তাহলে তোমরাই যা হয় করে এস চাচা। ইরসাদ-ভাইও যাচ্ছে। আমি এই পথে বাড়ি যাই!

—বাড়ি যাবা?

—হ্যা! অন্য সময় আমি রইলাম তোমাদের সঙ্গে। এ কাজটা তোমরাই করে এসো।

ইরসাদ-রহম মনে মনে খানিকটা চটিয়া গেল, বলিল—বেশ! তা যাও।

কয়েকদিন পর। টেলিগ্রাম এবং ডায়রি দু-ই করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজনটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজনটা এই আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে অভাবনীয় রকমে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ইহাতে খাজনা-বৃদ্ধির হিসাব-নিকাশের আঙ্কিক ক্ষতিবৃদ্ধি একেবারেই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে প্রজাদের কাছে। ইহা অকস্মাৎ তাহাদের জীবনের ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশের অতিরিক্ত একটা বস্তু আছে—সেটার নাম জেদ। এই জেদটা তাহাদের আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দলগত স্বার্থ ও নীতির খাতিরে।

এই উত্তেজিত জীবন-প্রবাহের মধ্য হইতে দেবু যেন অকস্মাৎ নিষ্প্রবাহের একপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। সে আপনার দাওয়ায় তক্তাপোশখানির উপর বসিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিল। দুর্গা তাহাকে পঞ্চায়েতের কথাটা বলিয়া গিয়াছে। সে প্রথমটা উদাসভাবে হাসিয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক-দিনের মধ্যেই তাহাকে এবং পদ্মকে লইয়া নানা আলোচনা গ্রামের মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নানা জনের নানা কথার আভাস তাহার কানে পৌঁছিতেছে।

আজ আবার তিনকড়ি আসিয়া বলিয়া গেল—লোকে কি বলচে জান, দেবু-বাবা?

লোকে যাহা বলিতেছে দেবু তাহা জানে। সে নীরবে একটু হাসিল।

তিনকড়ি উত্তেজিত হইয়া বলিল—হেসো না বাবা। তোমার সব তাতেই হাসি। ও আমার ভাল লাগে না।

দেবু তবুও হাসিয়া বলিল—লোকে বললে তার প্রতিবিধান আমি কি করব বলুন?

কি প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, সে কথা তিনকড়ি জানে না। কিন্তু সে অধীরভাবেই বলিল—লোকের নরকেও ঠাঁই হবে না। সে কথা আমি কুসুমপুরওয়ালাদের বলে এলাম।

—কুসুমপুরওয়ালারাও এই কথা আলোচনা করছে নাকি?

—তারাই তো করছে। বলছে—দেবু ঘোষ মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে তলায় তলায় 'ষড়্' করছে। নইলে ডায়েরি করতে তার করতে সঙ্গে গেল না কেন?

শুনিয়া দেবুর সর্বাঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল—আরও বলছে—দেবু ঘোষ যখন কাছারিতে ওঠে, তখুনি বাবু ইশারায় দেবুকে চোখ টিপে দিয়েছিল। তাতেই দেবু—মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে।

দেবু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে; কোন উত্তর দিল না, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

বার

সংবাদটা আরও বিশদভাবে পাওয়া গেল তারাচরণ নাপিতের কাছে। পাঁচখানা গ্রামেই তাহার যজমান আছে। নিয়মিত যায় আসে। সে বিবৃতির শেষে মাথা চুলকাইয়া বলিল—কি আর বলব বলুন, পণ্ডিত!

দেবু চুপ করিয়া ভাবিতেছিল—মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা।

তারাচরণ আবার বলিল কলিকালে কারুর ভাল করতে নাই!...তারাচরণ এ সব বিষয়ে নির্বিকার ব্যক্তি, পরনিন্দা শুনিয়া শুনিয়া তাহার মনে প্রায় ঘাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু দেবনাথের প্রসঙ্গে এই ধারার ঘটনায় সে ব্যথা অনুভব না করিয়া পারে নাই।

দেবু বলিল—এর মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ি গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম; ঠাকুরমশাইও শুনেছেন।

—শুনেছেন?

—হ্যাঁ। ঘোষ একদিন ঠাকুরমশায়ের কাছেও গিয়েছিল কিনা।

—কে? শ্রীহরি?

—হ্যাঁ। ঘোষ খুব উঠে পড়ে লেগেছে। কাল দেখবেন একবার কাণ্ডখানা।

—কাণ্ড?

—পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে কঙ্কণা-কুসুমপুরের কথা বাদ দেন। বাদবাকী গাঁয়ের মাতব্বর মোড়লদের কাণ্ড-কারখানা দেখবেন। ঘোষ কাল ধানের মরাই খুলবে।

—শ্রীহরি ধান দেবে তা হলে ?

—হ্যাঁ। যারা এই পঞ্চগেরামী মজলিশের কথায়, ঘোষের কথায় সায় দিয়েছে, তাদিকে ঘোষ ধান দেবে। অবশ্যি অনেক লোক রাজী হয় নাই, তবে মাতব্বরেরা সবাই চলেছে। মোড়লদের মধ্যে কেবল দেখুড়ের তিনকড়ি পাল বলেছে—আমি ও-সবের মধ্যে নাই।

দেবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আজ তাহার মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নানা উন্মত্ত ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। মনে হয়—দেখুড়িয়ায় ওই দুর্দান্ত ভল্লাদের নেতা হইয়া এ অঞ্চলের মাতব্বরগুলোকে ধ্বংস করিয়া দেয়। সর্বাগ্রে ওই শ্রীহরিকে। তাহার সর্বস্ব লুঠতরাজ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া, তাহার ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দেয়।

তারাচরণ বলিল—চাষের সময় এই ধানের অভাব না হ'লে কিন্তু ব্যাপারটা এমন হত না, ধর্মঘট করে মাতব্বরেরাই ক্ষেপেছিল। আপনাকে ওরাই টেনে নামালে। কিন্তু ধান বন্ধ হতেই মনে মনে সব হায়-হায় করছিল। এখন ঘোষ নিজে থেকে যেই মজলিশ করে আপনাকে পতিত করবার কথা নিয়ে মোড়লদের বাড়ি গেল, মোড়লরা দেখলে—এই ফাঁক ; সব একেবারে ঢলে পড়ল। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া—? স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেবু প্রশ্ন করিল।

—তা ছাড়া—তারাচরণ আবার একটু থামিয়া বলিল—একালের লোকজনকে তো জানেন গো ; স্বভাব চরিত্ত কটা লোকের ভাল বলুন ? কামার-বউয়ের, দুর্গার কথা শুনে লোকে সব রসস্থ হয়ে উঠেছে।

—হুঁ। এ সম্বন্ধে ন্যায়রত্নমশায় কি বলেছেন জান ? শ্রীহরি গিয়েছিল বললে যে ?

হাত দুইটি যুক্ত করিয়া তারাচরণ প্রণাম জানাইয়া বলিল—ঠাকুরমশায় ? সে হাসিল, হাসিয়া বলিল—ঠাকুরমশায় বলেছেন,—আহা—বেশ কথাটি বলেছেন গো! পণ্ডিত লোকের কথা তো! আমি মুখস্থ করেছিলাম, দাঁড়ান মনে করি।

একটু ভাবিয়া সে হতাশভাবে বলিল—নাঃ, আর মনে নাই। হ্যাঁ, তবে বলছেন—আমাকে ছাড়ান দাও। তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ, তুমিই তো মস্ত পণ্ডিত হে! যা হয় কঙ্কণার বাবুদের নিয়ে করগে।

ন্যায়রত্ন শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন—আমার কাল গত হয়েছে ঘোষ। আমি তোমাদের বাতিল বিধাতা। আবার বিধি তোমাদের চলবে না। আর

বিধি-বিধানও আমি দিই না।...তারপর হাসিয়া বলিয়াছেন— কঙ্কণার বাবুদের কাছে যাও তাঁরাই তোমাদের মহামহোপাধ্যায়; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ—নিজেই তো একজন উপাধ্যায় হে!

দেবু সান্ত্বনায় যেন জড়াইয়া গেল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের উন্মত্ততাকে সে শাসন করিল।—ছি! ছি! সে একি কল্পনা করিতেছে?

তারাচরণ বলিল—কঙ্কণার বাবুদের কথা উঠল তাই বলছি; কুসুমপুরের শেখদের ব্যাপারে আপনাকে নিয়ে কথাটা কে রটিয়েছে জানেন? ওই বাবুরাই!

—বাবুরা? কি রটিয়েছে?

—হ্যাঁ; বাবুদের নায়েব নিজে বলেছে ইরসাদকে। বলেছে—দেবু ঘোষ কাছারিতে উঠেই বাবুকে চোখ টিপে ইশেরা করেছিল যে, হাঙ্গামা বেশী বাড়বে না—আমি ঠিক করে দিচ্ছি।...তা নইলে বাবু রহমকে ছেড়ে দিতেন না। বাবুও বুঝে দেবুকে ইশেরা করে একহাত দেখিয়ে দিয়েছেন—আচ্ছা, মিটিয়ে দাও; তা হলে পাঁচশো টাকা দোব।

দেবু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। বাবুদের নায়েব এই কথা বলিয়াছে!

দেবু অবাক হইয়া গেলেও কথাটা সত্য। মুখুয্যেবাবুর মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি সত্যই বিরল। মুসলমানেরা যখন দল বাঁধিয়া আসিয়াছিল, তখন তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন, একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ভয় পান নাই। বরং তিনি এমন ক্ষেত্রে তাহাই চাহিয়াছিলেন, তাহা হইলে মারলে মরিত কয়েকজন দারোয়ান-চাপরাশী এবং জনকয়েক মুসলমান চাষী; তিনি সর্বপশ্চাতে আগ্নেয়াস্ত্রের আড়ালে অক্ষত থাকিতেন। তারপর মামলা-পর্বে—তাঁহার বাড়ি চড়াও করিয়া লুঠ্‌তরাজ এবং দাঙ্গার অভিযোগে এই চাষীকুলকে তিনি নিষ্পেষিত করিয়া দিতেন। কিন্তু দেবু আসিয়া ব্যাপারটা অন্য রকম করিয়া দিল। দেবুর জীবনের কাহিনীও তিনি শুনিয়াছেন; সে কাহিনী দেবুকে এমন একটি মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব দিয়াছে, যাহার সম্মুখে তাঁহার মত ব্যক্তিকেও সঙ্কুচিত হইতে হয়। কারণ দেবু জীবনে যাহা পারিয়াছে, তিনি পারেন নাই। দেবু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া জনতাকে শান্ত রাখিয়া নিমেষে রহমকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত অপরাধ এখন তাঁহার ঘাড়ে।

ঠিক এই সময় তাঁহার কানে আসিল—কঙ্কনার অপর কোন বাবুর নায়েব যে পরামর্শ দিয়াছে—সেই কথা; আরও শুনিলেব—দেবু মিথ্যা ডায়রি করিতে এবং তার পাঠাইতে চায় না বলিয়া থানায় যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে

তাঁহার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ইশারায় একটা কথা খেলিয়া গেল। মনুষ্য-প্রকৃতি তিনি ভাল করিয়াই জানেন। দেবুর কথা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু পাঁচশো টাকার লোভ ইহাদের অন্য কেহ সংবরণ করিতে পারে না, ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। তখন অপবাদটা রটাইয়া তাহার জনপ্রিয়তাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে কেমন হয়? তিনি তাঁহার নায়েবকেও তৎক্ষণাৎ পাল্টা একটা ডায়রি করিতে থানায় পাঠাইলেন এবং মিথ্যা কথাটা ইরসাদ-রহমের কানে তুলিতে বলিয়া দিলেন। উত্তেজনায় অধীর জনতা সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বিশ্বাস করিয়া লইল। রহম-ইসরাদের প্রথমটা দ্বিধা হইলেও কথাটা তাহারা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিল না!

হাফ-হাতা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া দেবু সেই আসন্ন দ্বিপ্রহর মাথায় করিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। তারাচরণ অনুমান করিল পণ্ডিত কোথায় যাইবে, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল—এই দুপুরে কোথায় যাবেন গো?

—ঠাকুরমশাইকে একবার প্রণাম করে আসি তারু-ভাই। নইলে মনের আগুন আমার নিভবে না।···দেবু রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

তারাচরণ আপনার ছাতাটা তাহার হাতে দিয়া বলিল—ছাতা নিয়ে যান। বেজায় কড়া রোদ।

কথা না বলিয়া দেবু ছাতাটা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়া পথ। শ্রাবণ সদ্য শেষ হইয়াছে। ভাদ্রের প্রথম। চাষের ধান পোঁতার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বিশেষ করিয়া যাহারা সচ্ছল অবস্থার লোক, তাহাদের রোয়ার কাজ কয়দিন আগেই শেষ হইয়াছে। ধান ধান করিয়া তাহাদের কাজ বন্ধ হয় নাই, তাহার উপর প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ মজুর লাগাইয়াছে! যাহাদের জমির ধান ইহারই মধ্যেই জমিয়া উঠিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে চলিতেছে নিড়ানের কাজ। বিস্তীর্ণ মাঠে ধানের সবুজ রঙে গাঢ়তার আমেজ আসিয়াছে। দেবু কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া আজ চলিল।

একটা অতি বিস্ময়কর ঘটনাও আজ তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিল না। এত বড় মাঠে—চাষ এখনও অনেক লোকে করিতেছে; পূর্বে মাঠের প্রতিটি জন তাহার সহিত দু-একটা কথা বিওয়া তবে তাহাকে যাইতে দিত! দূরের ক্ষেতের লোক—ডাকিয়া তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া—কাছে আনিয়া সম্ভাষণ করিত। আজ কিন্তু অতি অল্প লোকই তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিল! আজ কথা বলিল—সতীশ বাউড়ী, দেখুড়িয়ার জনকায়ক ভল্লা আর দুই-একজন

মাত্র। তাহাদের জ্ঞাতি-গোত্রীয়দের সকলে—দেবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া নিবিষ্টমনে চাষেই ব্যস্ত হইয়া রহিল। তিনকড়ি আজ এ মাঠে নাই।

দেবুর সেদিকে খেয়ালই হইল না। প্রথমটা দুরন্ত ক্রোধে মনের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আদিমযুগের ভয়াবহতা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সান্ত্বনা-বাণীর আভাস পাইয়া, তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিযোগ শীতলবায়ু-প্রবাহ-স্পৃষ্ট কালবৈশাখীর মেঘের মত ঝর ঝর ধারায় গলিয়া গিয়াছে। সে মুহূর্তে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল; তারাচরণের সম্মুখে সে বহুকষ্টে চোখের জল সংবরণ করিয়াছে। পথেও সে আজ চলিয়াছিল একনিবিষ্টচিত্তে—আত্মহারার মত। হাতের ছাতাটাও খুলিয়া মাথায় দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।…

ন্যায়রত্ন মহাশয় পূজার্চনা সবে শেষ করিয়া গৃহদেবতার ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন। দেবুকে দেখিয়া, স্মিতমুখে তাহাকে আহ্বান করিলেন—এস, পণ্ডিত এস।

দেবুর ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবীর হৃদয়হীন অবিচারের সকল বেদনা এই মানুষটিকে দেখিবামাত্র যেন ফেনিল আবেগে উথলিয়া উঠিল—শিশুর অভিমানের মত।

ন্যায়রত্ন সাগ্রহে বলিলেন—বস—। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে রৌদ্রে, ঘেমে নেয়ে গেছে যেন।…দেবুর হাতেই বন্ধ ছাতাটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ছাতাটা এখনও ভিজে রয়েছে দেখ্‌ছি! বেশ বৃষ্টি হয়েছিল সকালে। তারপর প্রহরখানেক তো সূর্যদেব ভাস্কররূপ ধারণ করেছেন। মনে হচ্ছে তুমি ছাতাটা মাথায় দাওনি পণ্ডিত! একটু ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এলে পারতে।

দেবু এতক্ষণ আত্মসংবরণ করিয়াছিল, ঠাকুর মহাশয়ের যুক্তি ও মীমাংসা শুনিয়া এবার একটু বিনম্র হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে নতজানু হইয়া বলিল—পায়ের ধুলো নেব কি?

—অর্থাৎ আমায় ছোঁবে কিনা জিজ্ঞাসা করছ? সম্মুখে আমাকে দেখছ, আমার পূজার্চনা শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি পণ্ডিত মানুষ, সিদ্ধান্ত তুমি করে নাও।

দেবু কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। সে ঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবতার নির্মাল্য সমেত হাতখানি দেবুর মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন—আমার পায়ের ধুলোর আগে —ভগবানের আশীর্বাদ নাও। পণ্ডিত, তাঁর সেবা করি বলেই সংসারের ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার করি। যে বস্তু যত নির্মল, তাতে স্পর্শদুষ্টি তত শীঘ্র

সংক্রামিত হয় কিনা। তাই সাবধানে থাকি। নইলে—আমি তোমাকে স্পর্শ করব না এমন স্পর্ধা আমার হবে কেন?

দেবু ন্যায়রত্নের পায়ের উপর মাথা রাখিল।

ন্যায়রত্ন সস্নেহে বলিলেন—ওঠ, পণ্ডিত ওঠ।···বলিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন ভো—ভো—রাজন্! দাদু হে!

দেবু ব্যস্তভাবে বলিল—বিশু-ভাই এসেছে নাকি?

—হ্যাঁ। ন্যায়রত্ন হাসিলেন।

—কি দাদু?···বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল বিশ্বনাথ। এবং দেবুকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—একি, দেবু-ভাই! এই রৌদ্রে?

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—দেখছ পণ্ডিত? রাজ্ঞীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপমগ্ন রাজচিত্ত অসময়ে আহ্বানের জন্য কেমন বিক্ষুব্ধ হয়েছে—দেখছ?

বিশ্বনাথ লজ্জিত হইল না, বলিল—আপনার ঠাকুর মাতবেন ঝুলনে, রাজ্ঞী সেই নিয়ে ব্যস্ত। এ বেচারার দিকে চাইবার তাঁর অবকাশ নাই মুনিবর!

—আমার দেবতার প্রসাদে এই পূর্ণিমারাত্রে তুমিও হিন্দোলায় দুল্‌বে রাজন্। তুমি ঘরে ঝুলনার দড়ি টাঙিয়েছ—আমি উঁকি মেরে দেখেছি। আমার ঠাকুরের ঝুলনের অজুহাতেই তুমি কলকাতা থেকে আসবার সুযোগ পেয়েছ, সেটা ভুলে যেয়ো না। আমি অবশ্য, তুমি সাতদিন পরে এলেও কিছু বলি না। কিন্তু তুমি তো প্রতিবারেই আমার ঠাকুরের প্রতি ভক্তির ছলনা করে কৈফিয়ৎ দিতে ভোল না রাজন্।

বিশ্বনাথ এবার হাসিতে লাগিল। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বিলুকে তাহার মনে পড়িয়া গেল। ঝুলনে তাহারাও একবার দোল খাইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—জয়া যদি ব্যস্ত থাকে, তবে তুমিই পণ্ডিতের জন্য এক গ্লাস সরবৎ প্রস্তুত করে আন দেখি।

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—না—না—না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—গৃহস্থকে আতিথ্য-ধর্ম পালনে ব্যাঘাত দিতে নাই।··· তারপর বিশ্বনাথকে বলিলেন—যাও ভাই পণ্ডিতের বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। বড় শ্রান্ত-ক্লান্ত ও।···

কিছুক্ষণ পরে ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি সব শুনেছি পণ্ডিত।

দেবু তাঁহার পায়ে হাত দিয়াই বসিয়াছিল; সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি কি করব বলুন।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বিশ্বনাথ পাশেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল— জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

দেবু আবার প্রশ্ন করিল—বলুন আমি কি করব ?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—বলবার অধিকার নিজে থেকেই অনেকদিন ত্যাগ করেছি। শশীর মৃত্যুর দিন উপলব্ধি করেছিলাম—কাল পরিবর্তিত হয়েছে, পাত্রেরাও পূর্ব কাল থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে ; দৈবক্রমে আমি ভূতকালের মন এবং কায়া সত্বেও ছায়ার মত বর্তমানে পড়ে রয়েছি। সেদিন থেকে আমি শুধু যাই। বিশ্বনাথকে পর্যন্ত কোন কথা বলি না।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। দেবু চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যেমন বসিয়াছিল—তেমনি বসিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—দেখ, বলবার অধিকার আমার আর সত্যিই নাই। শশীর কালেও যাদের দেখেছি, একালের মানুষ তাদের চেয়েও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে।

বিশ্বনাথ এবার বলিল—তাদের যে সত্যিই দেহের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে দাদু, নৈতিক মেরুদণ্ড সোজা থাকবে কি করে ? অভাব যে অনিয়ম ; নিয়ম না থাকলে নীতি থাকবে কোন্ অবলম্বনে, বলুন ? চুরিতে লুটতরাজের যার সব যায়, সে বড় জোর নীতি মেনে চুরি না-করতে পারে, কিন্তু ভিক্ষে না-করে তার উপায় কি বলুন ? ভিক্ষার সঙ্গে হীনতার বড় নিকট সম্বন্ধ, আর হীনতার সঙ্গে নীতির বিরোধকে চিরন্তন বলা চলে।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন, বলিলেন—তাই-ই কালক্রমে সত্য হয়ে দাঁড়াল বটে। হয় তো মহাকালের তাই অভিপ্রায়। নইলে দীনতা—সে হোক্ না কেন নিষ্ঠুরতম দীনতা—তার মধ্যে থেকেও হীনতার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার সাধনাই তো ছিল মহদ্ধর্ম। কৃচ্ছ্রসাধনায়, সর্বস্বত্যাগে—ভগবানকে পাওয়া যাক—না-যাক—পার্থিব দৈন্য এবং অভাবকে মালিন্য-মুক্ত করে মনুষত্ব একদিন জয়যুক্ত হয়েছিল।

বিশ্বনাথ বলিল—যে শিক্ষায় আপনার পূর্ববর্তীরা এটা সম্ভবপর করেছিলেন—সে শিক্ষা যে তাঁরাই সার্বজনীন হতে দেননি দাদু। এ তারই প্রতিফল। মণি পেয়ে মণি ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু মণি যে পায়নি—সে মনি ফেলে দেবে কি করে ? লোভই বা সংবরণ করবে কি করে ?

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—কথা তুমি বেশ চিন্তা করে বলে থাক দাদু। অসংযত বা অর্থহীনভাবে কথা তো বল না তুমি !

বিশ্বনাথ দেখিল—পিতামহের দৃষ্টিকোণে প্রখরতা অতি ক্ষীণ আভায় চমকিয়া উঠিতেছে। দেবুও লক্ষ্য করিয়াছিল, সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু বিশ্বনাথের কোন্ কথায় ন্যায়রত্ন এমন হইয়া উঠিয়াছেন—অনুমান করিতে পারিল না।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আমার পূর্ববর্তী সম্মুখে বর্তমান ; আমি এখন রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যে অবস্থান করছি। সেইজন্যই বললাম—আপনার পূর্বগামী।

ন্যায়রত্নও হাসিলেন—নিঃশব্দ বাঁকাহাসি ; বলিলেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের দিব্যাস্ত্রের সম্মুখে পার্থ-সারথি রথের ঘোড়া দুটোকে নতজানু করে রথীর মান বাঁচিয়েছিলেন। অর্জুনকে পেছন ফিরতেও হয়নি, কর্ণের মহাস্ত্রও ব্যর্থ হয়েছিল। বাগ্‌যুদ্ধে তুমি কৌশলী বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ এবার খানিকটা শঙ্কিত হইয়া উঠিল ; ইহার পর ন্যায়রত্ন যাহা বলিবেন, সে হয় তো বজ্রের মত নিষ্ঠুর, অথবা ইচ্ছামৃত্যুশীল শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের অন্তিম মৃত্যু-ইচ্ছার মত সকরুণ মর্মান্তিক কিছু। ন্যায়রত্ন কিন্তু তেমন কোন কিছুই বলিলেন না, ঘাড় নিচু করিয়া তবু আপনার ইষ্টদেবতাকে ডাকিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

পরমুহূর্তে তিনি সোজা হইয়া বলিলেন—যেন আপনার সুপ্ত শক্তিকে টানিয়া সোজা করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। তারপর দেবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—বিবেচনা করে দেখ পণ্ডিত। আমার উপদেশ নেবে অথবা তোমাদের এই নবীন ঠাকুর মশায়ের উপদেশ নেবে?

বিশ্বনাথও সোজা হইয়া বসিল, বলিল—আমি যে সমাজের ঠাকুরমশায় হব দাদু, সে সমাজে আপনার দেবু পণ্ডিত হবে আপনাদেরই মত পূর্বগামী। সে সমাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ; হয় দেবু কাশীবাস করবে অথবা আপনার মত দ্রষ্টা হয়ে বসে থাকবে।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—তা হলে আমার পাঁজি-পুঁথি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ ফেলে দিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করে ফেলি, বল? আমার ঠাকুরের তা হলে মহাভাগ্য! পাকা নাটমন্দির হবে! তুমিই সেদিন বলছিলে—যুগটা বণিকের এবং ধনিকের যুগ ; কথাটা মহাসত্য। এ অঞ্চলের নব সমাজপতি—মুখুয্যেদের প্রতিষ্ঠা তার জলন্ত প্রমাণ।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—আপনি রেগে গেছেন দাদু। কথাগুলো আপনার যুক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে ; সেদিন আরও কথা বলেছিলাম—সেগুলো আপনি ভুলে গেছেন।

ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—ভুলি নাই। তোমার সেই ধর্মহীন—ইহলোক-সর্বস্ব সাম্যবাদ।

—ধর্মহীন নয়। তবে আপনারা যাকে ধর্ম বলে মেনে এসেছেন—সে ধর্ম নয়। সে আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়, ন্যায়নিষ্ঠ সত্যময় জীবনধারা। আপনাদের

বাহ্যানুষ্ঠান ও ধ্যানযোগের পরিবর্তে বিজ্ঞানযোগে পরমারহস্যের অনুসন্ধান করব আমরা। তাকে শ্রদ্ধা করব—কিন্তু পূজা করব না।

ন্যায়রত্ন গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন—বিশ্বনাথ!

—দাদু!

—তা হলে আমার অন্তে তুমি আমার ভগবানকে অর্চনা করবে না?

বিশ্বনাথ বলিল—আগে আপনি দেবু পণ্ডিতের সঙ্গে কথা শেষ করুন।

ন্যায়রত্ন দেবুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্নের জাবনে আবার একি আগুন জলিয়া উঠিল? কুড়ি-বাইশ বৎসর পূর্বে নীতির বিতর্কে এক বিরোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে সংসারটা ঝল্‌সিয়া গিয়াছে; ন্যায়রত্নের একমাত্র পুত্র—বিশ্বনাথের পিতা ক্ষোভে অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

দেবুকে নীরব দেখিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—পণ্ডিত!

দেবু বলিল—আমি আজ যাই ঠাকুরমশায়!

—যাবে? কেন?

—অন্যদিন আসব।

—আমার এবং বিশ্বনাথের কথা শুনে শঙ্কিত হয়েছ?...ন্যায়রত্ন হাসিলেন। না-না ওর জন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না। বল, তুমি কি জানতে চাও! বল?

দেবু বলিল—আমি কি করব? শ্রীহরি পঞ্চায়েৎ ডেকে আমাকে পতিত করতে চায়। অন্যায় অপবাদ দিয়ে—

হ্যাঁ, এইবার মনে হয়েছে। ভাল, পঞ্চায়েৎ তোমাকে ডাকলে—তুমি যাবে, সবিনয়ে বলবে—আমি অন্যায় কিছু করিনি। তবু যদি শাস্তি দেন—নেব; কিন্তু নিরাশ্রয়া বন্ধুপত্নীকে পরিত্যাগ করতে পারব না। তাতে যা পারে পঞ্চায়েৎ করবে। ন্যায়ের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে।

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন প্রশ্ন করলেন—হাসলে যে বিশ্বনাথ? তোমাদের ন্যায় অনুসারে কি মেয়েটাকে ত্যাগ করা উচিত?

—আমাদের উপর অবিচার করছেন আপনি। আমাদের ন্যায়কে আপনাদের ন্যায়ের উল্টো অর্থাৎ অন্যায় বলেই ধরে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আপনি যা বলছেন—আমাদের ন্যায়ও তাই বলে। তবে আমি হাসলাম—পঞ্চায়েৎ পতিত করবে এবং তাতে দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে।

—তার মানে তুমি বলছ—পঞ্চায়েৎ পতিত করবে না বা পতিত করলেও দুঃখ কষ্ট নাই।

—পঞ্চায়েৎ পতিত করবেই। কারণ তার পিছনে রয়েছে ওদের সমাজের ধনী সমাজপতি শ্রীহরি ঘোষ এবং তার প্রচুর ধন-ধান্য। তবে দুঃখ যতখানি অনুমান করেছেন ততখানি নাই।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিশ্বনাথ।

—বৃদ্ধত্বের দাবি করি না দাদু, তাতে আমার রুচিও নাই। তবে ভেবে দেখুন না পঞ্চায়েৎ কি করতে পারে? আপনি সে যুগের কথা ভেবে বলছেন। সে যুগে সমাজ পতিত করলে—তার পুরোহিত, নাপিত, ধোবা, কামার, কুমোর বন্ধ হত। কর্মজীবন দুই-ই পঙ্গু হয়ে যেত। সমাজের বিধান লঙ্ঘন করে তাকে কেউ সাহায্য করলে—তারও শাস্তি হত। গ্রামান্তর থেকেও কোন সাহায্য পাওয়া যেত না। এখন ধোপা-নাপিত-কামার-পুরুতই সমাজের নিয়ম মেনে চলে না। পয়সা দিলেই ওগুলো এখন মিলবে! সে যুগে ধোপা-নাপিত সমাজের হুকুম অমান্য করলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হত। এখন ঠিক উল্টো। ধোপা-নাপিত-ছুতোর-কামাররা যদি বলে যে তোমাদের কাজ আমি করব না—তাহলে আমরাই জব্দ হয়ে যাব। আর বেশী পেড়াপীড়ি করলে হয় তারা অন্যত্র উঠে যাবে, নতুবা জাত-ব্যবসা ছেড়ে দেবে। ভয় কি দেবু, জংশন থেকে ক্ষুর কিনে নিয়ো একখানা, আর কিছু সাবান। তা যদি না পারো তো জংশন শহরেই বাসা নিও; তোমাকে দাড়িও রাখতে হবে না—ময়লা কাপড়ও পরতে হবে না। জংশন পঞ্চায়েতের এলাকার বাইরে।

দেবু অবাক হইয়া বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্নও তাহার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া শেষে হাসিলেন; বলিলেন—তুমি আর রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে নেই দাদু, তুমি আবির্ভূত হয়েছ। আমিই বরং প্রস্থান করতে ভুলে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে অযথা মঞ্চে অবস্থান করছি।

বিশ্বনাথ বলিল—অন্তত মহাগ্রামের মহামান্য সমাজপতি হিসেবে আপনার কাছে লোকে এলে তখন কথাটা অতি সত্য বলে মনে হয়। দেশে নতুন পঞ্চায়েত সৃষ্টি হল—ইউনিয়ন-বোর্ড, ইউনিয়ন-কোর্ট, বেঞ্চ; তারা ট্যাক্স নিয়ে বিচার করছে, সাজা দিচ্ছে। তবু লোকে যখন সমাজপতির বংশ বলে আমাদের, তখন যাত্রার দলের রাজার কথা মনে পড়ে।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ওরে বিদূষক! না, যাত্রার দলের রাজা নই! সত্যকারের রাজ্যভ্রষ্ট রাজা আমি। আমার রাজ্যভ্রষ্টতা সম্বন্ধে আমি সচেতন। এখানে রয়েছি ভ্রষ্ট রাজ্যের মমতায় নয়; সে আর ফিরবে না—সে কথাও জানি। তবু রয়েছি, আমার কাছে যে গচ্ছিত আছে গুপ্তসম্পদ! কুলমন্ত্র,

কুলপরিচয়, কুলকীর্তির প্রাচীন ইতিহাস। তোরা যদি নিস্—হাসিমুখে মরব। না নিস্ তাও দুঃখ করব না। সব তাঁকে সমর্পণ করে চলে যাব।

ঠিক এই সময়েই ভিতর-বাড়ির দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল জয়া। সে বলিল—দাদু, একবার এসে দেখে শুনে নিন, তখন যদি কোন্‌টা না পাওয়া যায়, তবে কি হবে বলুন তো? তা ছাড়া, আপনার-আমার না হয় উপোস, কিন্তু অন্য সবার খাওয়া-দাওয়া আছে তো। টোলের ছোট ছাত্রটি এরই মধ্যে ছুতো-নাতা করে দু-তিনবার রান্নাঘর ঘুরে গেল! মুখখানা বেচারার শুকিয়ে গেছে।

—চল যাই।

—কি এত কথা হচ্ছে আপনাদের?

—শিবকালীপুরের পণ্ডিত এসেছেন, তাঁরই সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ন্যায়রত্নের আড়ালে তাঁহার পায়ের তলায় দেবু বসিয়াছিল, জয়া তাহাকে দেখিতে পায় নাই। দাদা-শ্বশুরের কথায় দেবুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া জয়া মাথার কাপড়টা অল্প টানিয়া বাড়াইয়া দিল। তারপর বলিল—পণ্ডিতকে বলুন, এইখানেই দুটি প্রসাদ পেয়ে যাবেন। বেলা অনেক হয়েছে।

দেবু মৃদুকণ্ঠে বলিল—আমার আজ পূর্ণিমার উপবাস।

—বেশ, তবে এখন বিশ্রাম কর। ও-বেলায় রাত্রে ঝুলন দেখে, ঠাকুরের প্রসাদ পাবে। রাত্রে বরং এইখানেই থাকবে।

দেবুর মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পিতামহ-পৌত্রের কথায় জটিলতার মধ্যে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে; তাছাড়া বাড়িতে কাজও আছে, রাখাল কৃষাণেরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি ও-বেলায় আবার আসব। রাখালটার ঘরে খাবার নাই; কৃষাণদেরও তাই। ধান দিই-দিই করে দেওয়া হয় নাই। আজ আবার পূর্ণিমা, ধার-ধোরও পাবে না বেচারারা। বলেছি খাবার মত চাল দোব। তারা আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে।

পথে নামিয়া দেবু বিভ্রান্ত হইয়া গেল। আপনার কথা ভাবিয়া নয়, ন্যায়রত্নের এবং বিশ্বনাথের কথা ভাবিয়া। বারবার সে আপনাকে ধিক্কার দিল,—কেন সে আবেগের বশবর্তী হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল? তাহার ইচ্ছা হইল সে এই পথে-পথেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়! এমন সোনার সংসার ঠাকুরমশায়ের! বিশ্বনাথের মত পৌত্র, জয়ার মত পৌত্র-বধূ, অজয়-মণির মত প্রপৌত্র, কত সুখ—সব হয় তো অশান্তির আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। নতুবা ঠাকুর মহাশয় হয়ত ঘর-দুয়ার

ছাড়িয়া কাশী চলিয়া যাইবেন, অথবা বিশ্বনাথ স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! কিংবা হয় তো একাই সে ঘর ছাড়িবে। সঠিক না জানিলেও সে তো আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়াছে—বিশু-ভাই কোন্ পথে ছুটিয়াছে। তাহার পরিণাম যে কি, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। এই দ্বন্দ্বের আঘাতে বিশু-ভাই আরও সেই পথে ছুটিবে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্যের মত। তারপর হয়ত আন্দামান নয়ত কারাবাস! আহা, এমন সোনার প্রতিমার মত স্ত্রী—এমন চাঁদের মত ছেলে…!

—ওই! পণ্ডিতমশায় যে গো। এই ভত্তি দুপুরে ই-দিক পানে—কোথায় যাবেন গো?

দেবু সচকিত হইয়া লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিল, বক্তা দেখুড়িয়ার রাম ভল্লা। দেবু হাসিয়া বলিল—রামচরণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এত বেলায় যাবেন কোথা গো?

—গিয়েছিলাম মহাগ্রামে ঠাকুরমশায়ের বাড়ি। বাড়ি ফিরছি।

—তা ই-ধার পানে কোথা যাবেন?

দেবু এবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাই তো! অন্যমনস্কভাবে সে ভুল-পথেই আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই ময়ূরাক্ষীর বন্যা-রোধী বাঁধ। মাঠে বাঁ দিকে পথে না-ঘুরিয়া সে বরাবর সোজা চলিয়া আসিয়াছে। বাঁধের ওপারেই শ্মশান। শিবকালীপুর, মহাগ্রাম এবং দেখুড়িয়া—তিনখানা গ্রামের শবদাহ হয় এখানে। তাহার বিলু, তাহার খোকা—বিশ্বনাথের জয়া, অজয়-মণির চেয়ে তাহারা দেখিতে বেশি খারাপ ছিল না, গুণেও খাটো ছিল না—বিলু খোকা তাহার ওই শ্মশানে মিশিয়া আছে। কোন চিহ্ন আর নাই, ছাইগুলাও কবে ধুইয়া গিয়াছে, তবু স্থানটা আছে। সে ওইখানে একবার বসিবে! অনেক দিন সে তাহাদের জন্য কাঁদে নাই। পাঁচখানা গ্রামের হাজারো লোকের কাজের বোঝা ঘাড়ে লইয়া মাতিয়াছিল। মান-সম্মানের প্রলোভনে—হ্যাঁ, মান-সম্মানের প্রলোভনেই বই কি!—সে সব ভুলিয়া—মস্ত বড় কাজ করিতেছি ভাবিয়া—প্রমত্ত মানুষের মত ফিরিতেছিল। আজ সম্মান-প্রতিষ্ঠার বদলে লোকে সর্বাঙ্গে অপমান-কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই আজ বিলু-খোকাই তাহাকে পথ ভুলাইয়া আনিয়াছে। তাহার চোখের উপর বিলু ও খোকার মূর্তি জ্বল্-জ্বল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

রাম আবার জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবেন আজ্ঞা?—দিবা দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মানুষ গ্রামের পথ ভুল করিয়াছে, একথা সে ভাবিতেই পারিল না।

দেবু বলিল—একটু শ্মশানের দিকে যাব।

—শ্মশানে ?

—হ্যাঁ। দরকার আছে।

রাম অবাক্ হইয়া গেল।

দেবু বলিল—তুমি আমার একটু কাজ করবে ?

—বলুন আজ্ঞা ?

পকেট হইতে দড়িতে বাঁধা কয়েকটা চাবি বাহির করিয়া বলিল—এই চাবি নিয়ে তুমি—তাই তো কাকে দেবে ও ?···ক্ষণিক চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল—চাবিটা তুমি কামার-বউ—অনিরুদ্ধ কামারের বউকে দিয়ে বলবে—যে, ভাঁড়ার থেকে আট সের চাল নিয়ে আমার রাখাল ছোঁড়াকে ছু'সের আর কৃষাণ ছু'জনকে—তিন সের করে ছ' সের দিয়ে দেয় যেন। আমার ফিরতে দেরি হবে। এখনি যেতে হবে না, চাষের কাজ শেষ করে যেয়ো।

রাম বলিল—আজকের কাজ হয়ে গিয়েছে। আজ পুন্নিমে, হাল বন্ধ, আগাম্ পোতা-জমিগুলোতে নিড়েন দিচ্ছিলাম। তা যে রোদ, আর পারলাম না। আমি এখুনি না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আপনি শ্মশানে গে কি করবেন গো ?

—একটু কাজ আছে। দেবু বাঁধের দিকে অগ্রসর হইল।

রাম তবু সন্তুষ্ট হইল না। দেবুর গতিবিধি তাহার কাছে বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। দেবুকে লইয়া যে সমস্ত কথা উঠিয়াছে—সে সবই জানে। পদ্ম সংক্রান্ত কথাও জানে, রহম ও কঙ্কণার বাবুদের মধ্যে বিবাদ-প্রসঙ্গে যে কথা উঠিয়াছে—তাহাও জানে। পদ্মের কথা সে অপরাধের মধ্যেই গণ্য করে না। বিপত্নীক জোয়ান লেখাপড়া জানা ভাল ছেলে, তার যদি ওই স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েটিকে ভালই লাগিয়া থাকে—সে যদি ভালই বাসিয়া থাকে তাহাকে, তাহাতে দোষ কোথায় ? কঙ্কণার বাবুদের দেওয়া অপবাদ সে বিশ্বাস করে না। এ সম্বন্ধে তিনকড়ি হলফ করিয়া বলিয়াছে ! তিনকড়ি অবশ্য পদ্মের কথাও বিশ্বাস করে না।

তাই সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও দেবুকে আরও খানিকটা আটকাইয়া কথা প্রসঙ্গে ভিতরের কথাটা জানিবার জন্যই বলিল—কুসুমপুরের মিটিংয়ে যান নাই আপনি ?

—কুসুমপুরের মিটিং ! কিসের মিটিং ?

—মস্ত মিটিং আজ কুসুমপুরে গো। তিনু-দাদা গিয়াছে। বাবুদের সঙ্গে রহমের হাঙ্গামার কথা—ধর্মঘটের কথা—

মৃদু হাসিয়া দেবু বলিল—আমি আর ওসবের মধ্যে নাই, রাম-ভাই।

রাম চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—শ্মশানে কি করবেন আপনি? এই দুপুর বেলা, খান্ নাই—দান্ নাই। চলুন, ঘর চলুন।

ঠিক এই সময়েই একটা হাঁক ভাসিয়া আসিল। চাষীর হাঁক, চড়া গলায় লম্বা টানা ডাক। রাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—ডাকটার শেষ—অ-আ ধ্বনিটা স্পষ্ট। রাম কানের পিছনে হাতের আড়াল দিয়া শুনিয়া বলিল—তিনু-দাদা আমাকেই ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মুখের দুই পাশে হাতের তালুর আড়াল দিয়ে সাড়া দিল—এ—এঃ!

তিনু হন-হন করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দেবুও যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল।···ব্যাপারটা কি।

তিনু অত্যন্ত উত্তেজিত। কাছে আসিয়া এমন জায়গায় রামের সঙ্গে দেবুকে দেখিয়া সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করিল না। বিস্ময়-প্রকাশের মত মনের অবস্থাই নয় তাহার। সে বলিল—ভালই হয়েছে, দেবু বাবাও রয়েছে। তোমার বাড়ি হয়েই আসছি আমি। পেলাম না তোমাকে। কুসুমপুরের শেখেরা বড় গোল পাকিয়ে তুললে বাবা। রামা, তোরা সব লাঠি-সড়কি বার কর।

দেবু সবিস্ময়ে বলিল—কেন? আবার কি হল?

—আর বলো না বাবা। আজ মিটিং ডেকেছিল। তোমাকে বাদ্ দিয়ে ডেকেছিল—আমি যেতাম না। কিন্তু ভাবলাম—যাই, কড়া-কড়া কটা কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। গিয়ে দেখি—সে মহা হাঙ্গামা! শুনলাম কঙ্কণার বাবুরা নাকি বলেছে, কুসুমপুর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে; আগে কুসুমপুর ছিল হিঁদুর গা—আবার হিঁদু বসাবে বাবুরা। এইসব শুনে শেখেরা ক্ষেপে উঠেছে, তারা বলছে—আমাদের গাঁ ছারখার করলে আমরাও হিঁদুর গাঁ ছারখার করে দোব।

—বলেন কি! তারপর?

—তারপর সে অনেক কথা। তা আমার বাড়িতে এস কেনে, সব বলব। তেষ্টায় বুক আমার শুকিয়ে গিয়েছে!

কথাটা বলিতে বলিতে সে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবু এবং রামও আগাইয়া চলিল।

তিনকড়ি বলিল—গাঁয়ের জগন-টগন সব ধর্মঘটের মাতব্বরেরা মিটিংয়ে গিয়েছিল। যায় নাই কেবল—পঞ্চায়েতের মোড়লরা। শুনেছ তো—তোমাকে পতিত করা নিয়ে—ছিরে বেটার সঙ্গে খুব এখন পীরিত। ছিরে ধান দেবে কিনা

—শুনেছি। কিন্তু কুসুমপুরে কি হল ?

—আমরা বললাম—বাবুরা তোমাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, তোমরা বাবুদের সঙ্গে বোঝ! অন্য হিঁদুরা তার কি করবে ? তারা বললে—বাবুরা বলেছে—হিঁদু বসাবে, তখন সব হিঁদুই একজোট হবে!—আসবার সময় আবার শুনলাম—।...স্বন্ন মা রে!

তিনকড়ির বাড়ির দরজায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—আর কি শুনলেন ?

—বলি। দাঁড়াও বাবা, আগে জল খাই একঘটি।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল স্বর্ণ, তিনকড়ির বিধবা মেয়েটি। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, চমৎকার মুখশ্রী, গৌরবর্ণ দেহ। পনেরো-ষোল বছরের মেয়েটিকে দেখিয়া কে বলিবে সে বিধবা! কিশোরী কুমারীর মত স্বপ্নবিভোর দৃষ্টি তাহার চোখে; মুখের কোথাও কোন একটি রেখার মধ্যে এতটুকু বেদনা বা—উদাসীনতা লুকাইয়া নাই। সে বাহির হইয়া আসিল—তাহার হাতে একখানি বই। দেবুকে দেখিয়া লজ্জিতভাবে চকিতে সে বইখানি পিছনের দিকে লুকাইল।

জটিল চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও দেবু হাসিয়া বলিল—এই লুকোচ্ছ কেন? কি বই পড়ছিলে ?

তিনকড়ি ঘরের ভিতর যাইতে যাইতে বলিল—মা স্বন্ন, দেবু-বাবাকে একটুকু সরবৎ করে দে তো।

—না—না। আমার আজ পূর্ণিমার উপবাস। একবার সরবৎ আমি খেয়েছি।

—তবে একটুকু হাওয়া কর্। যে গরম। গলগল করে ঘামছে!

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিল। দেবু বলি—পাখাটা আমাকে দাও।

—না, আমি হাওয়া করছি।

—না, না। দাও, আমাকে দাও। তুমি বরং বইখানা নিয়ে এস। কি পড়ছিলে দেখি ? যাও নিয়ে এস।

কুণ্ঠিতভাবেই স্বর্ণ বইখানা আনিয়া দেবুর হাতে দিল।

বইখানি একখানি স্কুলপাঠ্য সাহিত্য-সঞ্চয়ন। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের ছাত্রোপযোগী লেখা চয়ন করিয়া সাজানো হইয়াছে। প্রবন্ধ গল্প, জীবনী, কবিতা।

দেবু বলিল—কোনটা পড়ছিলে বল!

স্বর্ণ নতমুখে বলিল— ও একটা পদ্য পড়ছিলাম।

দেবু হাসিয়া বলিল—পদ্য বলে না, কবিতা বলতে হয়। কোন কবিতা পড়ছিলে?

স্বর্ণ একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা।

দেবু বইখানার কবিতার দিকটা খুলিতেই একটা কবিতা যেন আপনিই বাহির হইয়া পড়িল; অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা পাতা খোলা থাকিলে বই খুলিতে গেলে আপনা-আপনিই সেই পাতাটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দেবু দেখিল কবিতাটির শেষে লেখকের নাম লেখা রহিয়াছে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাটির নামের দিকে চাহিয়া দেখিল—'স্বামীলাভ'। তাহার নিচে ব্র্যাকেটের ভিতর ছোট অক্ষরে লেখা 'ভক্তমাল'। সে প্রশ্ন করিল—এইটে পড়ছিলে বুঝি!

স্বর্ণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, ওইটাই সে পড়িতেছিল।

দেবু স্নিগ্ধস্বরে বলিল—পড় তো, আমি শুনি।—বইখানা সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

রাম ভল্লা বলিল—স্বন্ন মা যা সুন্দর রামায়ণ পড়ে পণ্ডিতমশায়। আহা-হা পরান জুড়িয়ে যায়।

দেবু হাসিয়া বলিল—পড় পড়, শুনি।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—বাবাকে খেতে দিতে হবে, আমি যাই।—বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। লজ্জিতা মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেবু সস্নেহে হাসিল। তারপর সে কবিতাটি পড়িল—

"একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে নির্জন শ্মশানে
... ...
হেরিলেন, মৃত পতি-চরণের তলে বসিয়াছে সতী;
তারি সনে একসাথে এক চিতানলে মরিবারে মতি।
... ...
তুলসী কহিল, "মাত যাবে কোন্‌খানে এত আয়োজন?
... ...
কহে করজোড় করি, "স্বামী যদি পাই স্বর্গ দূরে যাক।"
তুলসী কহিল হাসি, "ফিরে চল ঘরে কহিতেছি আমি,
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে আপনার স্বামী!"
রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায় শ্মশান তেয়াগি;
তুলসী জাহ্নবী-তীরে নিস্তব্ধ নিশায় রহিলেন জাগি।
... ...

একমাস পরে প্রতিবেশীরা আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল—তুলসীর মন্ত্রে কি ফল হইয়াছে? মেয়েটি হাসিয়া বলিল—পাইয়াছে, সে তাহার স্বামীকে পাইয়াছে!

শুনি' ব্যগ্র কহে তারা, "কহ তবে কহ, আছে কোন্ ঘরে?"
নারী কহে, "রয়েছেন প্রভু অহরহ আমারি অন্তরে।"

কবিতাটি শেষ করিয়া দেবু স্তব্ধ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। স্বর্ণকে দেখিয়া যে কথা তাহার মনে হয় নাই, সেই কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—স্বর্ণ বিধবা, সাত বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে। নীরবে নতমুখে সে চলিয়া গেল, তখন তাহার ওই নতমুখের ভঙ্গির মধ্যে—শান্ত পদক্ষেপের মধ্যে যাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহাই সে এখন স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার গোপন-পোষিত সুগভীর বিরহ-বেদনা। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তুলসীদাসের মন্ত্রের মত কোন মন্ত্র যদি তাহার জানা থাকিত, তবে স্বর্ণকে সেই মন্ত্র সে দিত। তিনকড়ি কাকা আক্ষেপ করিয়া বলে—স্বর্ণ আমার সোনার প্রতিমা—সে কথা মিথ্যা নয়। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল।

তিনকড়ি এই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিল; বাহির হইতেই সে কথা আরম্ভ করিয়াছিল—এই পাকৃটি, বুঝলে বাবাজী, বেশী করে লাগালে তোমার গে দৌলত শেখ। দৌলত গিয়েছিল মুখুয্যেবাবুদের বাড়ি, বাবুরা নাকি তাকেই কথাটা বলেছে।...

তের

কঙ্কণার মুখুয্যেবাবু ঠিক ওই কথাটা বলেন নাই।

দৌলত শেখকে তিনিই ডাকিয়াছিলেন। শেখজী অর্থশালী লোক; বর্তমানে তাহার চামড়ার ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বেশ সমৃদ্ধ। স্বজাতি স্বসম্প্রদায়ের লোক না-হইলেও বর্তমান সমাজে ধনীতে-ধনীতে একটি লৌকিকতার সম্বন্ধ আছে; সেই সূত্রে মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে, শ্রীহরির সঙ্গে এবং অন্য জমিদার, মহাজনের সঙ্গে হাজী সাহেবের সৌহার্দ্য আছে। এ ছাড়া শেখজী মুখুয্যেবাবুদের একজন বিশিষ্ট প্রজা; তাঁহাদের সেরেস্তায় দৌলত শেখের নামে খাজনার অঙ্কটা বেশ মোটা। ধনী দৌলতের সঙ্গে গ্রামের সাধারণ লোকের মনের অমিলের কথাও মুখুয্যেবাবুরা জানেন। তাই শেখজীকে তাঁরা ডাকিয়াছিলেন।

জংশন শহরে থানার দারোগাবাবু ও জমিদারবাবু ক্রমবর্ধমান পাথরের মত ভারী এবং মূক হইয়া উঠিতেছেন। ডায়রি করিতে গেলে ডায়রি করিয়া

লন—কোন কথা বলেন না। মুখুয্যেবাবুদের বাড়ি হইতে একটা দশ-পনরো সের মাছ পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহারা ফেরত দিয়াছেন। নায়েবকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন—হাওয়া যে রকম গরম, তাতে হজম হবে না মশায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছে, কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছে। বাপ রে! আবার শুনছি নাকি মিনিস্টারের কাছেও যাবে টেলিগ্রাম! ওসব আর আনবেন না দয়া করে।

পরশু তারিখে সার্কেল অফিসার সফরে আসিয়াছিলেন—ইউনিয়ন-বোর্ড পরিদর্শনে! তিনি—শুধু তিনি কেন, সরকারী কর্মচারীমাত্রই—এস্‌-ডি-ও, ডি-এস-পি, মধ্যে মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব পর্যন্ত এ অঞ্চলে আসিলেই কঙ্কণার বাবুদের ইংরাজী-কেতায় সাজানো দেবোত্তরের গেস্ট-হাউসে উঠিয়া আতিথ্য-স্বীকার করিয়া থাকেন। সরকারের ঘরে বাবুদের নামডাক যথেষ্ট, লোকহিতকর কাজও তাঁহাদের যথেষ্ট আছে, স্কুল—হাসপাতাল—বালিকা বিদ্যালয় তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। সরকারী কাজে চাঁদার খাতায় তাঁহাদের নাম সর্বদাই উপরের দিকেই থাকে। তাঁহারা যে পথে চলিয়া থাকেন, সে পথটি বাহ্যতঃ স্পষ্ট আইনের পথ। টাকা ধার দেন, সুদ লন। খাজনা বাকি পড়িলে, অমার্জনীয় কঠোরতার সঙ্গে সুদ আদায় করেন, নালিশ করেন। বৃদ্ধির ব্যাপারেও মুখুয্যেবাবুরা আদালতের মধ্য দিয়া চলিতেছেন। বে-আইনী আদায় হয়ত কিছু আছে, কিন্তু সেও এমনভাবে আইনের গঙ্গাজল প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া যায় যে, সে আদায়ের অসিদ্ধতা অশুদ্ধতার কথা কখনও উঠিতেও পায় না। যেমন—দেবোত্তরের পার্বণী আদায়, খারিজ-ফি বাবদ উদ্বৃত্ত আদায় ইত্যাদি। এই আদায়ের জন্য বাবুদের জবরদস্তি নাই। শুধু পার্বণী না দিলে টাকা আদায় লনও না, দেনও না। না-লওয়া বা-দেওয়াটা ইচ্ছাধীন, বে-আইনী নয়। এবং পরিশেষে বাধ্য হইয়া আদালতে যান এবং অন্যকে যাইতে বাধ্য করেন; তাহাও বে-আইনের নয়। সুতরাং আইনের ক্ষুরধারে যাঁহারা চলিয়া থাকেন—তাঁহাদের নিকট মাথা কামাইতে আসিয়া দুই-একবিন্দু রক্তপাত সকলে মানিয়া লইয়াছে। ইহার উপর সরকারের প্রতি বাবুদের ভক্তিশ্রদ্ধার কথা লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল হইতে আজ পর্যন্ত এ জেলার প্রত্যেক সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই রাজভক্ত বাবুদের অতিথি-নিকেতনে আতিথ্য স্বীকার করাকে তাঁহারা কিছু অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরশু তারিখে সার্কেল-অফিসার এখানে আসিয়াও বাবুদের অতিথি-নিকেতনে আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। মুখুয্যেবাবু দুইটা কারণে সচকিত হইয়া উঠিলেন। দেশ-কালের কোথাও কি

যেন পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পারেন নাই। প্রজাদের টৌলগ্রামের মূল্য যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মামলার কূট-কৌশল প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে আজ যেন অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া মনে হইতেছে। অথচ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এখান হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী গ্রামের জমিদার প্রজাদের জনতার উপর গুলি চালাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় করিয়া সদরে গিয়া সাহেবকে সেলাম দিয়া প্রমাণ করিলেন—তিনি ঘটনার সময় সদরে ছিলেন। প্রজাদের মামলা ফাঁসিয়া গিয়াছিল। ঘরে বসিয়া তিনি অনুভব করিলেন রাজশক্তি যেন এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাদের তার পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

দেবুকে ইহাদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই। একেবারে হয় নাই তা নয়, তবে যেটুকু হইয়াছে তাহার মূল্য খুব বেশি নয় অন্ততঃ তাঁহার তাই মনে হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দৌলত শেখকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

শেখজীর বয়স ষাট বৎসর পার হইয়া গেলেও এখন দেহ বেশ সমর্থ আছে। মাঝারি আকারে একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া এখনও যাওয়া-আসা করেন; সেই ঘোড়াটায় চড়িয়া শেখজী বাবুদের কাছারিতে উঠিলেন। বাবু সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

দৌলত শেখও রহম এবং ইরসাদকে ভাল চোখে দেখেন না। তিনি বলিলেন—ভুল খানিকটা করেছেন কর্তা। চুরি করে তালগাছটা বেচলে—একটা চুরির চার্জে নালিশ করে দিলেই ঠিক হত।

কর্তা বলিলেন—সে তো করবই—এখন তোমায় ডেকেছি, তুমি কুসুমপুরের মাতব্বর লোক। তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও গে, ব্যাপারটা ভাল করছে না। আমার কিছুই হবে না এতে। সাহেব তদন্তে এলেও বিনা মামলায় কিছু করতে পারবে না। মামলা—হাইকোর্ট পর্যন্ত চলে। মিথ্যে নালিশ হাইকোর্টে টি কবে না। তা ছাড়া হাইকোর্টের মামলা ধান বেচে হয় না।

দাড়িতে হাত বুলাইয়া শেখ বলিল—দেখেন কর্তা, আমাকে বলা আপনার মিছা। রহম শেখ হল বদমাস বেতমিজ লোক; ইরসাদ দু'কলম লিখাপড়া শিখে নামের আগে লিখে মৌলভী; ফরজ্ জানে না কলেমা জানে না,—নিজেরে বলে মোমেন। আমি হাজী হজ করে আসছি—বয়স হল ষাট, আমাকে বলে—বুড়ো স্থদ খায়, লোকেরে ঠকায়—উ হাজী নয় কাফের। আমি বললে শুনবেই না!

কর্তা বলিলেন—ভাল। তুমি গ্রামের মাতব্বর লোক—আমাদের সঙ্গে

অনেক দিনের স্থবাদ তোমার ; তাই তোমাকে বললাম। এর পর আমাকে তুমি দোষ দিয়ো না। রহম-ইরসাদ আর তার দলে যারা আছে, এ অঞ্চল থেকে আমি তাদের বাস তুলে ছাড়ব।– বলিয়াই মুখুয্যে-কর্তা উঠিয়া গেলেন। দৌলত শেখের সঙ্গে আর বাক্যালাপও করিলেন না। তাঁহার মনে হইল হাজী ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটা হইতে সরিয়া থাকিতে চাহিতেছে। কঙ্কণার তাঁহার ছোটখাটো সমধর্মীদের মত শেখজীও বোধ হয়, তিনি বিব্রত হওয়ায় আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

দৌলত শেখ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিল। অবহেলাটা তাহার গায়ে বড় লাগিল। বুড়া ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিবার পথে বারবার তাহার ইচ্ছা হইল সে-ও রহম এবং ইরসাদদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে জীবনে নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে বড় হইয়াছে। বহু পরিশ্রম করিয়াছে, বহু লোকের সহিত কারবার করিয়াছে ; বহুজনের মন তাহাকে রাখিতে হইয়াছে। মানুষকে বুঝিবার একটা ক্ষমতা তাহার জন্মিয়া গিয়াছে। সে বেশ বুঝিল—আজ রহম এবং ইরসাদ তাহাকে মানে না—সে তাহাদিগকে মানাইতে পারে না—ওই সত্যটা জানিবার পর মুখুয্যেবাবু আর তাহাকে মান্য করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। আজ একটা বিপাকের সৃষ্টি করিয়া সামান্য রহম ও ইরসাদ বাবুর কাছে তাহার চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল—রহম এবং ইরসাদকে সে যদি বাগ মানাইয়া আপনার আয়ত্তে আনিতে পারে, তবে এ অঞ্চলের এই ধুরন্ধর কর্তাটিকে ছিপে-গাঁথা হাঙরের মত খেলাইয়া লইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাসি আসিল। মুখুয্যেবাবু শের ছিল হঠাৎ যেন শিয়াল বনিয়া গিয়াছে। যখন তাহাকে বলিল—রহম ইরসাদ আর তার দলে যারা আছে এ অঞ্চল থেকে তাদের বাস তুলে ছাড়ব—বাবুর তখনকার গলার আওয়াজটা পর্যন্ত হাল্কা হইয়াছিল! শাসানিটা নিতান্তই মৌখিক। মুখুয্যেবাবুর মুখখানা পর্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। আরে—হায় রে, হায়-রে মুখুয্যেবাবু! তুমি দেখিতেছি বাঘের খাল (চামড়া) পড়িয়া থাকে—আসলে তুমি ভেড়া! রহম আর ইরসাদকে ভয় কর তুমি? ফুঃ-ফুঃ!

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আপন মনে হাজী সাহেব বারকয়েক ফুঃ-ফুঃ শব্দ করিল। ইরসাদ—রহম? তাদের মুরদ কি? মুখুয্যেবাবুদের মত তাহার যদি টাকা থাকিত, তবে সে কোনদিন ওই অসভ্য বেতমিজ দুইটাকে সাফ করিয়া দিত। মানুষের খাল (চামড়) দাগাবাত পরিষ্কার) করিতে নাই, নইলে উহাদের খাল ছাড়াইয়া দাগাবাত করিয়া তাহার কারবারের চামড়ার সঙ্গে মিশাইয়া দিত! ইরসাদ-রহমের মুরদ কি?

গ্রামে ঢুকিয়া দৌলত শেখ অবাক হইয়া গেল। গ্রামে লোকে-লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। শিবকালীপুর, মহাগ্রাম, দেখুড়িয়ার হিন্দু চাষীরা আসিয়া জমিয়াছে, গ্রামের মুসলমান চাষীরা সকলে হাজির আছে; মাঝখানে—ইরসাদ, রহম, শিবকালীপুরের জগন ডাক্তার, দেখুড়িয়ার তিনকড়ি। সে ঘোড়ার লাগামটা টানিয়া ধরিল। দেবু ঘোষ নাই। মুখুয্যেবাবু ও-চালটা মন্দ চালে নাই। ওদিকে শ্রীহরি ঘোষও চালিয়াছে ভাল চাল; ছোঁড়াটা বসিয়া গিয়াছে।

জগন ডাক্তার মুখফোঁড় লোক—ধনীর উপর তাহার অত্যন্ত আক্রোশ, সে দৌলতকে দাঁড়াইতে দেখিয়া হাসিয়া রহস্য করিয়াই বলিল—শেখজা কঙ্কণা গিয়াছিলেন নাকি হাওয়া খেতে? মুখুয্যে-বাড়ি? বেশ! বেশ!

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটি হাসির কানাকানি পড়িয়া গেল।

শেখের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এই উদ্ধত ডাক্তারটির কথাবার্তার ধরনই এই রকম। কিন্তু এই সব নগণ্য চাষী—যাহারা সেদিনও ধান-ধান করিয়া কুত্তার মত তাহার দুয়ারে আসিয়া লেজ নাড়িয়াছে—তাহারাও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া হাসিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল মুখুয্যেবাবুর সংকল্পের কথাটা একবার হতভাগ্যদের শুনাইয়া দেয়!

রহম এবার হাসিয়া বলিল—কি বড়-ভাই, কথা বলছেন না যি গো?

জগন ডাক্তার বলিল—শেখজী দেখছেন কে কে আছে এখানে। কাল আবার যাবেন তো, গিয়ে নামগুলো বলতে হবে বাবুকে। রিপোর্ট করতে হবে।

দৌলতের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে হাজী, হজ্ করিয়া আসিয়াছে, মুসলমান সমাজে তাহার একটা সম্মান পাপ্য আছে। রহম-ইরসাদ এতদিন তাহাকে অমান্য করিত; বলিত—টাকা থাকলেই জাহাজের টিকিট কেটে মক্কা শরীফ যাওয়া যায়। হজ্ করে এসেও যে সুদ খায়, লোকের সম্পত্তি ঠকিয়ে নেয়—হজ্বের পুণ্যি তার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাকে মানি না। তাহাদের সেই অবজ্ঞা সমস্ত লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। সে সঞ্চরণ তাহাকে কোন স্তরে টানিয়া নামাইতে চাহিতেছে, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল সে। চাকলার হিঁদুরা সমেত তাহাকে উপহাস করে, অশ্রদ্ধা করে!

ইরসাদ বলিল—কি চাচা, গরিবানদের সাথে কথাই বলেন যি গো!

দৌলত বলিল—কি বুলব ইরসাদ, বুলতে শরম লাগছে আমার!

জগন বলিয়া উঠিল—আরে বাপরে! শেখজীর শরম লাগছে যখন—তখন না-জানি সে কি কথা!

দৌলত বলিল—তুমার সাথে আমার কোন বাত নাই ডাক্তার। আমি বলছি রহমকে আর ইরসাদকে—আমার জাতভাইদিগে। আমাদিগের বড়ো সর্বনাশ। এখানে কি সাধে দৌড়াইছি? শুন হে রহম, তুমিও, শুন ইরসাদ, আজ মুখুয্যেবাবু আমাকে বুললে—তুমি বলিয়ো দৌলত, তুমাদের জাত-ভাইদিগে—হাঙ্গাম সহজে মিটিয়ে না নিলে, তামাম কুসুমপুর আমি ছারখার করে দিব।

'গ্রামের লোকে'র পরিবর্তে 'জাতভাই' এবং 'যাহারা হাঙ্গামা করবে' তাহাদের পরিবর্তে 'তামাম কুসুমপুর' বলিয়া দৌলত নিজেও রহম-ইরসাদের আত্মীয় হইবার চেষ্টা করিল।

রহম গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক—সে সঙ্গে সঙ্গে বলিল—তামাম কুসুমপুর ছারখার করে দিবে?

ইরসাদ হাসিয়া বলিল—আপনি তো মিয়া মোকাদিম লোক, বাবুদের সঙ্গে দহরম-মহরম—তামাম কুসুমপুর গেলেও আপনি থাকবেন। আপনার ভয় কি?

—না। আমিও থাকব না। আমারেও বাদ দিবে না রে! আমি বুললাম—আমি বুড়া হলাম কর্তা, আমার আর কয়টা দিন? মুসলমান হয়ে মুসলমানের সর্বনাশ আমি দেখতে পারব না।··বাবু বুললে—তবে তুমিও থাকবা না, দৌলত, কুসুমপুরে আমি হিঁদুর গাঁ বসাব। ওই জগন ডাক্তারই তখুনই গাঁয়ে এসে ভিটে তুলবে। দেবু ঘোষও আসবে। দেখুড়ার তিনুও আসবে।—ব্যাপারটা বুঝেছ?

সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কী খেলিয়া গেল।

সঙ্ঘবদ্ধ জনতা দুইভাগ হইয়া পরস্পরের দিকে প্রথমটা চাহিল বেদনাতুর দৃষ্টিতে তারপর চাহিল সন্দেহপূর্ণ নেত্রে।

জগন প্রতিবাদ করিয়া একবার কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শুধু 'কক্ষণও না'—এই কথাটি ছাড়া আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

রহম উঠিয়া দাঁড়াইল। দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি, উদ্ধত কোপন স্বভাব—তাহার উপর রমজানের রোজার উপবাসে মস্তিষ্ক উষ্ণ ও স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া আছে—সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সদম্ভে বলিল—তা হলে চাকলার হিঁদুর গাঁগুলানও আমরা ছারখার করে দিব।

দারুণ হট্টগোলের মধ্যে মিটিং ভাঙ্গিয়া গেল।

রমজানের পবিত্র মাস। 'রমজে'র অর্থ জলিয়া যাওয়া। রমজানের মাসে রোজার উপবাসের কৃচ্ছ্রসাধনের বহ্নিতে মানুষের পাপ পুড়িয়া ভস্ম

হইয়া যায়। আগুনে পুড়িয়া লোহার যেমন জংমরিচার কলঙ্ক নষ্ট হয়—তেমনি ভাবেই ক্ষুধার আগুনে পুড়িয়া মানুষ খাঁটি হইবে—এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সময়টিতে উপবাসক্লিষ্ট মুসলমানদের নামে দৌলতের ওই কথাটা বারুদখানার অগ্নিসংযোগের কাজ করিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তেজনা নেহাত অল্প হইল না। গ্রামে গ্রামে লোক জটলা পাকাইতে আরম্ভ করিল।

ইহার উপর দিন দিন নূতন নূতন গুজব রটিতে লাগিল—ভীষণ আশঙ্কাজনক গুজব। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব—তাহার সন্ধান কেহ করিল না; সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিয়া দেখিল না। উত্তেজনার উপর উত্তেজনায়—দুই সম্প্রদায়ই মাতিয়া উঠিল।

থানায় ক্রমাগত ডায়রি হইতেছে। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যাইতেছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে, কমিশনারের কাছে, মুসলিম লীগের অফিসে, হিন্দুমহাসভায়। বাবুদের মোটর গাড়িটা এই বর্ষার দিনেও কাদাজল ঠেলিয়া গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া বেড়াইতেছে। গাড়িতে ঘুরিতেছে—বাবুদের নায়েব ও বাবুদের উকীল। সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায় বিপন্ন। প্রকাণ্ড এক মিটিং হইবে বাবুদের নাটমন্দিরে। কুসুমপুরের মসজিদে মুসলমানেরা মজলিশ করিতেছে। আশপাশের গ্রামে যেখানে মুসলমান আছে—খবর পাঠানো হইয়াছে। দৌলত শেখ রহমকে পাশে লইয়া বসিয়াছে।

একা ইরসাদ কেবল ক্রমশ যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। সে কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলে না। নীরবে বসিয়া শুধু দেখে আর শোনে। আর অবসর সময়ে আপনার বাড়িতে বসিয়া ভাবে। ইরসাদ সংসারে একা মানুষ। তাহার স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসে না। ইরসাদের বিবাহ হইয়াছে কয়েক মাইল দূরবর্তী গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবারে। শ্যালকেরা কেহ উকীল, কেহ মোক্তার। তাহাদের ঘরের মেয়ে আসিয়া ইরসাদের দরিদ্র সংসারে থাকিতে পারে না। তাহার এবং তাহার বাপ-ভাইয়ের দাবি ছিল—ইরসাদ আসিয়া শ্যালকদের কাহারও মুহুরীর কাজ করুক। শহরে তাহাদের বাসাতেই থাকিবে—রোজগারও হইবে। কিন্তু ইরসাদ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই। মেয়েটি সেই কারণেই আসে না। ইরসাদও যায় না। তালাক দিতেও তাহার আপত্তি নাই। তবে সে বলে তালাকের দরখাস্ত সে করিবে না, করিতে হয় তাহার স্ত্রী করিতে পারে। আপনার ঘরে একা বসিয়া সে সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে। রহম চাচা আজও বুঝিতে পারিতেছে না—কি হইতে কি ঘটিয়া গেল। সমস্ত গ্রামটা গিয়া পড়িয়াছে দৌলত শেখের মুঠার মধ্যে।

দৌলত অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে। রমজানের উপবাসের সময় গৃহস্থকে দান করিতে হয়, দীন-দুঃখী মুসলমানকে গম, ময়দা, কিসমিস, বা তাহারা মূল্যের পরিমাণ চাল কলাই দান করিয়া—ঈশ্বরের দরবারে 'ফেতরা' আদায় দিতে হয়। সম্পদশালী ব্যক্তিদের উপর শাস্ত্রের নির্দেশ—তাহার সোনারূপা দান করিয়া 'ফেতরা' আদায় দিবে। ধনী দৌলত—'ফেতরা' আদায় দিত—তাহার রাখাল কৃষাণ মারফত। সেরখানেক করিয়া চাল দিয়া সে এক ঢিলে দুই পাখী মারিত। পর্ব উপলক্ষে রাখাল কৃষাণদের বক্‌শিশ দেওয়াও হইত, আবার খোদাতালার দরবারে পুণ্যের দাবিও জানানো হইত। এই লইয়া গ্রামে প্রতিজনে দৌলতের সমালোচনা করিয়াছে, তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। সে সবই দৌলতের কানে যাইত। কিন্তু এতকালের মধ্যে সে এসব গ্রাহ্যও করে নাই। এবার সেই দৌলত ঘোষণা করিয়াছে লোকেরা সেই কথা নির্লজ্জের মত সগৌরবে বলিয়া বেড়াইতেছে—শেখজী এবার খাটি আমিরের মত 'ফেতরা' আদায় দিবে। শেখের দলিজা হইতে অর্থী-প্রার্থী শুধুহাতে ফিরিবে না। রমজানের সাতাশ রাত্রিতে "শবে কদর" উপলক্ষে সে সমস্ত রাত্রি জাগিবে, গোটা গাঁয়ের লোককে সমাদর করিয়া খাওয়াইবে। বুদ্ধিহীন লোকগুলি হাঁ করিয়া আছে সেই রাত্রির অপেক্ষায়। রহম চাচা পর্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছে—শেখের এতদিনে মতি ফিরিয়াছে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। দৌলত শেখ রহমকে বলিয়াছে—মামলা হয়—টাকা লাগে—আমি দিব তুয়াদিগে!

ইরসাদের হাসি আসিল। মনে পড়িল—ছেলেবেলায় সে একখানা ছবিওয়ালা ছেলেদের বইয়ে পড়িয়াছিল– কুমীরের বাড়ির নিমন্ত্রণের গল্প। গল্পের শেষের ছবিটা তাহার চোখের উপর জল্-জল্ করিয়া ভাসিতেছে, নিমন্ত্রিতদের খাইয়া স্ফীতোদর কুমীর বসিয়া গড়গড়ার নল টানিতেছে।

—ইরসাদ! বাপজান? ইরসাদ!···উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল রহম!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইরসাদ সাড়া দিল—আসুন, ভিতরে আসুন, চাচা!

—আরে বাপজান—তুমি বাইরিয়া এস। জল্‌দি এস। দেখ! দেখ!

—কি? ইরসাদ ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল!

—দেখ!

ইরসাদ কিছু দেখিতে পাইল না। শুধু বহুজনের সমবেত পদধ্বনির মত একটা শব্দ কানে আসিল। পরক্ষণেই রাস্তার বাঁকে ঘুরিয়া আবির্ভূত হইল—খাকী পোশাক-পরা আর্মড কনস্টেবল। দুই-চারিজন নয়—প্রায় জন পঁচিশ। তাহারা মার্চ করিয়া পথের ধুলা উড়াইয়া চলিয়া গেল; কঙ্কণার জমাদারও

তাহাদের সঙ্গে ছিল—সে ইরসাদ এবং রহমকে দেখিয়া আর্মড কনস্টেবলের নেতাকে কি বলিল।

রহম বলিল—আমাদিগে দেখায়ে কি বুললে বল তো?

ইরসাদ ঈষৎ হাসিল, কিছু বলিল না।

রহম বলিল—পঞ্চাশ জনা ফৌজ আসছে বাপজান। সঙ্গে ডিপুটি আসছে একজনা। দেখ কি হয়!

হইল না বিশেষ কিছু।

ডেপুটি-সাহেবের মধ্যস্থতায় বিবাদটা মিটিয়া গেল। কঙ্কণার মুখুয্যেবাবু পঞ্চাশ টাকার মিঠাই পাঠাইয়া দিলেন কুসুমপুরের মসজিদে। রহমকে ডাকিয়া তাহাকে সম্মুখে বেঞ্চিতে বসাইয়া বলিলেন—কিছু মনে করো না রহম।

দৌলত শেখও গিয়াছিল। সে বলিল—দেখেন দেখি, জমিদার আর প্রজা—বাপ আর বেটা। বেটার কসুর হলে বাপ শাসন করে, যুগ্যি বেটা হলে—তার গোসা হয়। বাপ আবার পেয়ার করলি পরেই—সে গোসা ছুটে যায়।

রহমও এ আদরে গলিয়া গেল; সেও বলিল—হুজুরকে অনেক সালাম আমার। আমাদের কসুরও হুজুর মাপ করেন।

ইরসাদকে ডাকা হয় নাই, ইরসাদ যায়ও নাই; রহম অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ইরসাদ বলিয়াছিল—মুরুব্বি শেখজী যাচ্ছেন—তুমি যাচ্ছ; আমার শরীরটা ভাল নাই চাচা।

দৌলত এবং রহম চলিয়া গেল।

খানিক পরে ইরসাদের ডাক আসিল। একজন কনস্টেবল থানা হইতে জরুরী তলব লইয়া আসিল। ইরসাদ একটু চকিত হইয়া উঠিল! পরক্ষণেই সে জামাটা গায়ে দিয়া, মাথায় টুপিটি পরিয়া কনস্টেবলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

থানায় গিয়া দেখিল—আরও একজনকে ডাকা হইয়াছে। দেবু থানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে!

—দেবু-ভাই!···থানার বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচে সে দেবুকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিল! সেদিনের কথা মনে করিয়াও তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না।

দেবু হাসিয়া বলিল—এস ভাই।

ইরসাদ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সব ঝুট হয়ে গেল দেবু-ভাই, সব বরবাদ গেল।

দেবু বলিল—তার আর করবে কি বল? উপায় কি?

ইরসাদ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার কাছে আমার কসুর হয়ে আছে, দেবু-ভাই—

দেবু তাহার হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিল—আমাদের শাস্ত্রে কি আছে জানো ভাই ? সুখে, দুঃখে, রাজার দরবারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে যারা পাশাপাশি থাকে তারাই হল প্রকৃত বন্ধু ! বন্ধুর কাছে বন্ধুর ভুলচুক হয় বই কি ; তার জন্যে মাপ চাইতে নাই !···দেবু তাহার স্বভাবসুলভ প্রীতির হাসি হাসিল !

ইরসাদও তাহার মুখের দিকে চাহিল। ঠিক এই সময়েই তাহাদের ডাক পড়িল।

ডেপুটি সাহেব দুজনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—লীডারি হচ্ছে বুঝি ?

দেবু আপত্তির স্বরে কি দুই-এক কথা বলিতে গেল।

ডেপুটি বলিলেন—থাম।

তারপর বলিলেন—এবার খুব বেঁচে গেলে। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান !

দুজনে একসঙ্গেই থানা হইতে বাহির হইল। থানার ব্যাপারটা দুই জনের অন্তরেই আঘাত দিয়াছিল। কথাবার্তা ওই কঠিন শানবাক্য ছাড়া আর কিছুই হয় নাই, কিন্তু যে বিচিত্র দৃষ্টিতে ডেপুটি সাহেব তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল—সেই দৃষ্টি দারোগাবাবু, জমাদার, কনস্টেবল, এমন কি চৌকিদারদের চোখেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নীরবেই দুজনে পথে চলিতেছিল। ক্ষুদ্র শহরের জনাকীর্ণ কলরব-মুখর পথ নীরবেই অতিক্রম করিয়া তাহারা আসিয়া উঠিল ময়ূরাক্ষীর রেলওয়ে ব্রীজে। ব্রীজ পার হইয়া তাহারা ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের পথ ধরিল। নির্জন পথ। বাঁধের দুই পাশে বর্ষার জল পাইয়া শরবন ঘন সবুজ প্রাচীরের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ ইরসাদ উপরের দিকে মুখ তুলিয়া—হাত বাড়াইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল—খোদা, তুমি তো সব জানছ, সব দেখছ ! বিচার করো—তুমি এর বিচার করো। অন্যায় যদি আমার হয়, হে খোদাতালা, তুমি আমাকে সাজা দিয়ো—আমার চোখের দৃষ্টি নিয়ো ; আমি যেন পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়াই। লা-ইলাহা-ইল্লা-ল্লাহ্ ! তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই। তুমি বিচার করো ! রোজা করে তোমার গেলাম—আমি—তোমার কাছে হাত জোড় করে বলছি—তুমি এর বিচার করো ! তোমার ইন্‌সাফে দোষী সাব্যস্ত হবে যারা, সেই বেইমানদের মাথায়—

ইরসাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

দেবু পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ইরসাদ ভাইয়ের মর্মদাহের জ্বালা সে অনুভব করিয়াছিল। মর্মদাহ তাহারও কম নয়। কিন্তু তাহার যেন সব সহিয়া গিয়াছে। কানুনগোর অপমান, জেল, বিলু এবং খোকন-মণির মৃত্যু, সদ্য-সদ্য তাহার দুই দুইটা জঘন্য অপবাদ, ছিরু ঘোষের চক্রান্ত—তাহাকে ক্রমশঃ যেমন সংবেদন শূন্য, তেমনি সহনশীল করিয়া তুলিয়াছে। এই সেদিনও তাহার মনে আগুন উঠিয়াছিল অকস্মাৎ নিষ্ঠুর প্রজ্বলনে; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহা নিভিয়া গিয়াছিল। সেদিন হইতে সে যেন আরও প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। দেবু বুঝিল—ইরসাদ বিপক্ষদিগকে নিষ্ঠুর অভিসম্পাতে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে—সে তাহার পিঠে হাত দিয়া গাঢ় স্নেহস্পর্শ জানাইয়া স্নিগ্ধস্বরে বাধা দিয়া বলিল—থাক, ইরসাদ-ভাই, থাক্।

ইরসাদ তাহার মুখের দিকে তাকাল।

দেবু বলিল—কাউকে শাপ-শাপান্ত করতে নেই, ইরসাদ-ভাই।

ইরসাদের চোখ দুইটা দপ-দপ করিয়া জ্বলিতেছিল।

দেবু হাসিয়া বলিল—নিজে যদি ভগবানের কাছে অপরাধ করি—সংসারে পাপ করি, তবে ভগবানকে বলতে হয়—আমাকে সাজা দাও! সে সাজা মাথা পেতে নিতে হয়। কিন্তু অন্য কেউ যদি পাপ করে সংসারে, আমার অনিষ্ট করে, তবে ভগবানকে বলতে হয়—ভগবান, ওকে তুমি ক্ষমা কর, মাফ কর।

ইরসাদ স্থিরদৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল; এবার দুইটি তপ্ত অশ্রুর ধারা তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল।

দেবু বলিল—এস। মাথার ওপর রোদ চড়ছে। রোজার সময়। পা চালিয়ে এস।

চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া ইরসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—আমাদের গাঁ হয়ে চল। আমার বাড়িতে একটু বসবে, জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি যাবে, কেমন?

ইরসাদ এবার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—চল।

গ্রামের মধ্যে তাহারা দুইজনে যখন ঢুকিল, তখন গ্রামের পথ লোকজনে পরিপূর্ণ। পল্লীপথের জনবিরলতাই স্বাভাবিক রূপ! এমন অস্বাভাবিক জনতা দেখিয়া দেবু ও ইরসাদ দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। ইরসাদ বলিল—ব্যাপার কি দেবু-ভাই?

দেবু ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিয়াছে। ভিড় শুধু মানুষেরই নয় রাস্তার

ধারে, গাছতলায় গাড়িরও ভিড় জমিয়া গিয়াছে। দেবু বলিল—দেখবে চল। বিপদ কিছু নয়।—সে একটু হাসিল।

ইরসাদও চাষী মুসলমানের ঘরের ছেলে। সুস্থ অবস্থা হইলে ব্যাপারটা সে মুহূর্তে বুঝিতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার চিত্ত ও মস্তিষ্ক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।

পথের ভিড় অতিক্রম করিয়া অল্প খানিকটা আসিয়াই শ্রীহরি ঘোষের বাড়ি। তাহার খামারবাড়ির প্রবেশের দরজাটা সম্প্রতি পাকা ফটকে পরিণত করিয়াছে শ্রীহরি। প্রশস্ত ফটকটা দিয়া বাড়ি পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। ফটকটার মুক্ত পথে আঙুল বাড়াইয়া দেবু বলিল—ওই দেখ!

তকতকে খামারের উঠানে একখানা ঘরের সমান উচ্চ স্তূপ বাঁধিয়া রাশিরাশি ধান ঢালা হইয়াছে। ভাদ্রের নির্মেঘ আকাশে প্রখর সূর্যের আলোতে শরতের শুভ্রতা। সেই শুভ্র উজ্জ্বল রৌদ্রের প্রতিফলনে পরিপুষ্ট সিঁদুরমুখী ধানের রাশি ঠিক যেন পাকা-সোনার বর্ণে ঝলমল করিতেছিল।

শ্রীহরি একখানা চেয়ারে বসিয়া আছে—একটা লোক একটা ছাতা ধরিয়াছে তাহার মাথার উপর। মধ্যস্থলে বাঁশের তে-কাটায় প্রকাণ্ড এক দাঁড়ি-পাল্লায় সেই ধান ওজন হইতেছে।—রাম-রাম রাম-রাম, রামে-রামে দুই-দুই ; দুই রামে তিন-তিন!

আশ-পাশ ফিরিয়া বসিয়া আছে গ্রাম-গ্রামান্তরের মোড়ল-মাতব্বরেরা। বাহিরে পাঁচিলের গায়ে ঘরের দেওয়ালে পাশে সঙ্কীর্ণ চালের ছায়ায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে সাধারণ চাষীরা লুব্ধ প্রত্যাশায়। তাহারা সকলেই দেবুকে দেখিয়া মাথা নত করিল।

দেবু কাহাকেও কোন কথা বলিল না। ইরসাদকে লইয়া সে আপনার দাওয়ায় গিয়া উঠিল। সেখান হইতে শুনিল জগন ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে লোক-গুলিকে গালি-গালাজ করিতেছে।—বড়লোকের পা-চাটা কুত্তার দল! বেইমান বিশ্বাসঘাতক সব! ইতর ছোটলোক সব!

বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা। ইরসাদকে দেখিয়া সে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—ওই, কুসুমপুরের পণ্ডিত মিয়া যি গো!

ইরসাদ বলিল—হ্যাঁ। ভাল আছ তুমি?

দুর্গা বলিল—হ্যাঁ ভাল আছি।...তারপর সে দেবুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—পথ দিয়ে এলে, দেখে এলে?

—কি?

—ঘোষের দুয়ারে ভিড়?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ নয়। ইহার ঠেলা তোমাকে সামলাতে হবে। এ সব হচ্ছে তোমার লেগে।

দেবু হাসিল।

দুর্গা বলিল—হাসি লয়। রাঙাদিদির ছেরাদ্দ 'নিকটিয়ে' এসেছে। পঞ্চায়েৎ বসবে।

দেবু আরও একটু হাসিল। তারপর ভিতর হইতে এক বালতি জল ও একটি ঘটি আনিয়া ইরসাদের সামনে নামাইয়া দিয়া বলিল—মুখ হাত-পা ধুয়ে ফেল। রোজার উপোস, জল খাবার তো জো নাই!

ইরসাদ বলিল—কুল্লি করবার পর্যন্ত হুকুম নাই।

দেবু একখানা পাখা লইয়া নিজের গায়ে—সঙ্গে সঙ্গে ইরসাদের গায়েও বাতাস দিতে আরম্ভ করিল।

দুর্গা বলিল—আমাকে দেন পণ্ডিত, আমি দুজনাকেই বাতাস করি!

চোদ্দ

পঞ্চগ্রামের জীবন-সমুদ্রে একটা প্রচণ্ড তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। সেটা শতধা ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সমুদ্রের গভীর অন্তরে অন্তরে যে স্রোত-ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তরঙ্গবেগটা অস্বাভাবিক স্ফীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই স্রোতের ধারায় টান দিয়াছিল; একটা প্রকাণ্ড আবর্তনের আলোড়নের টানে নিচের জলকে উপরে টানিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। সমুদ্রের অন্তঃস্রোত-ধারার আকর্ষণেই সে উচ্ছ্বাস ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরুৎসাহ নিস্তেজ জীবনযাত্রায় আবার দিনরাত্রিগুলি কোন রকমে কাটিয়া চলিল। মাঠে রোয়ার কাজে লাগে। হাতখানেক উঁচু ধানের চারাগুলির ভিতর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আগাছা তুলিয়া ধান ঠেলিয়া আগাইয়া যায়; এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, আবার ও-প্রান্ত হইতে এ-প্রান্তের দিকে আগাইয়া আসে। মাঠের আলের উপর দাঁড়াইয়া মনে হয় মাঠটা জনশূন্য!

মাথার উপর ভাদ্রের প্রখর রোদ্র। সর্বাঙ্গে দরদরধারে ঘাম ঝরে, ধানের ধারালো পাতায় গা-হাত চিরিয়া যায়। তবু অন্তর তাহাদের আশায় ভরিয়া থাকে, মাঠের ঐ সতেজ ধানের গাঢ় সবুজের প্রতিচ্ছায়াই যেন অন্তরে প্রতিফলিত হয়। আড়াই প্রহর পর্যন্ত মাঠে খাটিয়া বাড়ি ফেরে। স্নানাহার সারিয়া ছোট ছোট আড্ডায় বিভক্ত হইয়া বসিয়া তামাক খায়, গল্পগুজব করে। গল্পগুজবের মধ্যে বিগত হাঙ্গামার ইতিহাস, আর দেবু ঘোষ ও পদ্ম-

সংবাদ। দুইটাই অত্যন্ত মুখরোচক এবং উত্তেজনাকর আলাপ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এমন বিষয়বস্তু লইয়া আলাপ-আলোচনা যেন জমে না। কেন জমে না, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। সীতাকে অযোধ্যার প্রজারা জানিত না—চিনিত না এ কথা নয়, কিন্তু তবু সীতার অশোকবনে বন্দিনী অবস্থার আলোচনার নানা কুৎসিত কল্পনায় তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছিল—ওই মাতিয়া উঠার আনন্দেই। কিন্তু লঙ্কায় রাক্ষসেরা মাতে নাই। অবশ্য তাহারা সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। মন্দোদরীর কথা লইয়া রাক্ষসেরা মাতে নাই। কারণ মাতনের আনন্দ অনুভব করিবার মত তাহাদের মানসিকতা লঙ্কার যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছিল। তেমনি ভাবেই বোধ হয় এ অঞ্চলের লোকের মনের কাছে কোন আলোচনাই জমিয়া উঠে না। আষাঢ়ের রথযাত্রার দিন হইতে ভাদ্রের কয়েকদিন তাহাদের জীবনে একটা অদ্ভুত কাল। দিন যেন হাওয়ায় চড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামের এতবড় মাঠে গোটা চাষটা হইয়া গেল—হাজার দু-হাজার লোক খাটিল, একদিন একটা বচসা হইল না, মারপিট হইল না। আরও আশ্চর্যের কথা—এবার বীজধানের আঁটি কদাচিৎ চুরি গিয়াছে। চাষের সময় সে কি উৎসাহ! সে কত কল্পনা-রঙীন আশা। মাঠে এবার চার-পাঁচখানা গানই শোনা গিয়েছে এই লইয়া। বাউড়ীর কবি সতীশের গানখানাই সব চেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল—

"কলিকাল ঘুচল অকালে!
দুখের ঘরে সুখ যে বাসা বাঁধলে কপালে॥
কারু ভুঁয়ে কেউ জল না কাটে, মাঠের জল রইচে মাঠে,
(পরে) দেয় পরের কাটে আলের গোড়ালে॥
ভুলল লোকে গালাগালি, ভাই বেরাদার-গলাগলি,
অঘটনের ঘটন খালি— কলিতে কে ঘটালে।
দীন সতীশ বলে—কর জোড়ে— তেরশো ছত্রিশ সালে॥"

সতীশের কল্পনা ছিল আবার চাষ হইয়া গেলে, ভাসানের দলের মহড়ার সময় সে এই ধরনের আরও গান বাঁধিয়া ফেলিবে। কিন্তু রোয়ার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখনও বাউড়ী-ডোমপাড়ায় ভাসানের দল জমিয়া উঠে নাই। ছোট ছেলেদের দল বকুলতায় সাজার হ্যারিকেনের আলোটা জ্বালাইয়া ঢোলক লইয়া বসে—কিন্তু বয়স্কেরা বড় আসে না। সমস্ত অঞ্চলটার মানুষগুলির মধ্যে একটা অবসন্ন ছত্রভঙ্গের ভাব।

অন্ধকার-পক্ষ চলিয়াছে। দেবু আপনার দাওয়ায় তক্তাপোশের উপর হ্যারিকেন জ্বালাইয়া বসিয়া থাকে। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে। কুসুমপুরের লোকে তাহাকে ঘৃণ্য ঘুষ লওয়ার অপবাদ দিয়াছিল। ইরসাদ-ভাই সত্য-মিথ্যা বুঝিয়াছে—তাহার কাছে ইহা স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছে;—সে অপবাদের গ্লানি তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সেজন্য তাহার দুঃখ নাই! শ্রীহরি ঘোষ তাহার সহিত পদ্মকে ও দুর্গাকে জড়াইয়া জঘন্য কলঙ্ক রটনা করিয়াছে, পঞ্চায়েতের বৈঠক বসাইবার উদ্যোগে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে—সেজন্যও তাহার কোন দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, রাগ নাই। স্বয়ং ঠাকুর মহাশয় তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। পঞ্চায়েৎ যদি তাহাকে পতিতও করে, তবুও সে দুঃখ করিবে না, কোন ভয়ই সে করে না। কিন্তু তাহার গভীর দুঃখ—ধর্মের নামে শপথ করিয়া যে ঘট এ অঞ্চলের লোকে পাতিয়াছিল; সেই ঘট তাহারাই চুরমার করিয়া ভাঙিয়া দিল! ইরসাদ-রহম কি ভুলটাই করিল! সামান্য ভুলটা যদি তাহারা না করিত! তাহাকে যাহা বলিয়াছিল—তাতেও ক্ষতি ছিল না। তাহাকে বাদ দিয়াও কাজ চলিত। কিন্তু এক ভুলেই সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

লণ্ডভণ্ডই বটে। এই হাঙ্গামা মিটমাটের উপলক্ষে—কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে কুসুমপুরের শেখদের বৃদ্ধির ব্যাপারটাও চুকিয়া গিয়াছে। দৌলত এবং রহমকে মধ্যস্থ রাখিয়া বৃদ্ধির কাজ চলিতেছে। টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি। সেদিকে হয়ত খুব অন্যায় হয় নাই। কিন্তু জমি বৃদ্ধিরও বৃদ্ধি দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। কথাটা শুনিতে বা প্রস্তাবটা দেখিতে অন্যায় কিছু নাই। পাঁচ বিঘা জমির দশ টাকা খাজনা দেয় প্রজারা; সেখানে জমি ছয় বিঘা হইলে এক বিঘার বাড়্‌তি খাজনা প্রজারা দেয় এবং জমিদারের ন্যায্য প্রাপ্য—ইহা তো আইনসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, ধর্মসঙ্গত, বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অনেক গোলমাল আছে ইহার মধ্যে। জমিদার-সেরেস্তায় বহুক্ষেত্রে জমি-জমার অঙ্ক ঠিক নাই। মাপের গোলমাল তো আছেই। সেকালের মাপের মান একাল হইতে পৃথক ছিল।

দৌলতের বৃদ্ধি কি হারে হইয়াছে বা হইবে তাহা কেহ এখনও জানে না। রহম ওই হারেই বৃদ্ধি দিয়াছে। সে গোমস্তার পাশে বসিয়া মধ্যস্থতা করিবার সম্মান পাইয়াই সব ভুলিয়া গিয়াছে।

কুসুমপুরে বৃদ্ধি অস্বীকার করিয়াছে একা ইরসাদ।

শিবকালীপুরে শ্রীহরি ঘোষের সেরেস্তাতেও বৃদ্ধির কথা-বার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ওই মুখুয্যেবাবুদের দাগেই দাগা বুলাইবে সকলে। এ গ্রামে জগন

এবং আর দুই-একজন মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী কোন দিন ধর্মঘটে নাই, কিন্তু প্রাচীনকালের আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধি দিতে রাজী হয় নাই। সে আপনার সংকল্পে অবিচলিত আছে।

দেখুড়িয়ায় আছে কেবল তিনকড়ি। ভল্লারাও আছে, কিন্তু তাহাদের জমি কতটুকু? কাহারও দুই বিঘা—কাহারও বড় জোর পাঁচ, কাহারও-বা মাত্র দশ-পনের কাঠা।

শ্রীহরি ঘোষের বৈঠকখানায় মজলিশ বসে। একজন গোমস্তার স্থলে এখন দুইজন গোমস্তা। সাময়িকভাবে একজন গোমস্তা রাখিতে হইয়াছে। বৃদ্ধির কাগজপত্র তৈয়ারী হইতেছে। ঘোষ বসিয়া তামাক খায়। হরিশ, ভবেশ প্রভৃতি মাতব্বরেরা আসে। মধ্যে মধ্যে এ অঞ্চলের পঞ্চায়েত মণ্ডলীর মণ্ডলেরাও আসে। দু-চারিজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও পায়ের ধূলা দেন। শাস্ত্র-আলোচনা হয়। শ্রীহরির উৎসাহের অন্ত নাই। সে নিজের গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা দশের সম্মুখে সগর্বে প্রকাশ করিয়া বলে—

দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞ—আগামী বৎসর চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসব করিবে। সকলে শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠে। গ্রামে দশভুজার আবির্ভাব—সে তো গ্রামেরই মঙ্গল। গ্রামের ছেলেদের লইয়া যাইতে হয় দ্বারকা চৌধুরীর বাড়ি মহাগ্রামে ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি, কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ি।

—সেই তো! শ্রীহরি উৎসাহভরে বলে—সেইজন্যেই তো। চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হবে; আপনারা দশজনে আসবেন, বসবেন, পূজা করাবেন। ছেলেরা আনন্দ করবে, প্রসাদ পাবে। একদিন গ্রামের জাত-জ্ঞাত খাবে। একদিন হবে ব্রাহ্মণ-ভোজন। অষ্টমীর দিন রাত্রে লুচি-ফলার। নবমীর দিন গাঁয়ের যাবতীয় ছোটলোক, খিচুড়ী যে যত খেতে পারে। বিজয়ার বিসর্জনের রাত্রে বারুদের কারখানা করব।

লোকজন আরও খানিকটা উৎসাহিত হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেহ উপস্থিত থাকিলে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া—ঘোষের পরিকল্পনাকে রাজকীর্তির সহিত তুলনা করিয়া বলে—দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ, যজ্ঞ করবার ভারই তো রাজার! করবে বই কি। ভগবান যখন তোমাকে এ গ্রামের জমিদারী দিয়েছেন, মা লক্ষ্মী যখন তোমার ঘরে পা দিয়েছেন—তখন এ যে তোমাকেই করতে হবে। তিনিই তোমাকে দিয়ে করাবেন।

শ্রীহরি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়, বলে—তিনি করাবেন, আমি করব—সে তো বটেই। করতে আমাকে হবেই। তবে কি জানেন, মধ্যে মধ্যে মনে হয়—করব না, কিছু করব না আমি গাঁয়ের জন্যে। কেন করব বলুন?

কিছুদিন ধরে আমার সঙ্গে সব কি কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি? আরে বাপু, রাজার রাজ্য। তাঁর রাজ্যে আমি জমিদারী নিয়েছি। তিনি বৃদ্ধি নেবার একতিয়ার আমাকে দিয়েছেন—তবে আমি চেয়েছি—দোব না—দোব না করে নেচে উঠল সব—গেঁয়ো পণ্ডিত—একটা চ্যাংড়া ছোঁড়ার কথায়। মুসলমানদের নিয়ে জোট বেঁধে—শেষ পর্যন্ত কি কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি।

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। সব মনে পড়িয়া যায়। সুস্থ জীবনোচ্ছ্বাসের আনন্দ-আস্বাদ, সুস্থ আত্মশক্তির ক্ষণিক নির্ভীক প্রকাশের ঘুমন্ত স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কেহ মাথায় নামায়, কাহারও দৃষ্টি শ্রীহরির মুখ হইতে নামিয়া মাটির উপর নিবদ্ধ হয়।

শ্রীহরি বলিয়া যায়—যাক্, ভালয় ভালয় সব চুকে গিয়েছে—ভালই হয়েছে! ভগবান মালিক, বুঝলেন, তিনিই বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

—নিশ্চয়ই। ভগবান মালিক বই কি!

—নিশ্চয়! কিন্তু ভগবান তো নিজে কিছু করেন না। মানুষকে দিয়েই করান। এক একজনকে তিনি ভার দেন! সে ভার পেয়ে তাঁর কাজ না করে, সে হল আসল স্বার্থপর—অমানুষ; জন্মান্তরে তার দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। তাদের অবহেলায় সমাজ ছারখার হয়।

ব্রাহ্মণেরা এ কথায় সায় দেয়, বলে নিশ্চয়, রাজা, রাজকর্মচারী, সমাজপতি —এরা যদি কর্তব্য না করে—প্রজা দুঃখ পায়, সমাজ অধঃপাতে যায়। কথায় বলে, রাজা বিনে রাজ্য-নাশ!

শ্রীহরি বলে—এ গ্রামে বদমায়েসি করে কেউ আর রেহাই পাবে না, দুষ্ট বদমাস যারা—তাদের আমি দরকার হলে গাঁ থেকে দূর করে দোব।

সে তাহার বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা বলিয়া যায়।—এ অঞ্চলে নবশাখা সমাজের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডীর সে পুনর্গঠন করিবে; কদাচার, ব্যভিচার, ধর্মহীনতাকে দমন করিবে। কোথাও কোন দেবকীর্তি রক্ষা করিবার জন্য জন্য করিবে পাকা আইনসম্মত ব্যবস্থা। দেবতা, ধর্ম এবং সমাজের উদ্ধারের ও রক্ষার একটি পরিকল্পনা সে মুখে ছকিয়া যায়।

সে বলে—আপনারা শুধু আমার পিছনে দাঁড়ান। কিছু করতে হবে না আপনাদের! শুধু পেছনে থেকে বলুন—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমরা আছি। দেখুন আমি সব সায়েস্তা করে দিচ্ছি। ঝড়-ঝঞ্ঝাট আসে সামনে থেকে মাথা পেতে নোব! টাকা খরচ করতে হয় আমি করব। পাঁচ-সাত কিস্তি উপরি উপরি নালিশ করলে—যত বড়লোক হোক জিভ বেরিয়ে যাবে এক হাত। স্ত্রী-পুত্র যায় আবার হয়। কত দেখবেন?—

সে আঙুল গণিয়া বলিয়া যায়—কাহার কাহার স্ত্রী-পুত্র মরিয়াছে—আবার বিবাহ করিয়া তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে ; সত্যই দেখা গেল, এ গ্রামের ত্রিশজনের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার মধ্যে আটাশ জনেরই বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র দুই-ই গিয়াছে পাঁচজনের, তাহার মধ্যে চারজনেরই আবার স্ত্রী-পুত্র দুই-ই হইয়াছে—হয় নাই কেবল দেবু ঘোষের। সে বিবাহ করে নাই।

—কিন্তু—শ্রীহরি হাসিয়া বলিল - সম্পত্তি লক্ষ্মী, গেলে আর ফেরেন না! বড় কঠিন দেবতা! আর প্রজা যত বড় হোক—কিস্তি কিস্তি বাকী খাজনার নালিশ হলে—সম্পত্তি তার যাবেই।

স্তিমিত স্তব্ধ লোকগুলি মাটির পুতুলের মত হইয়া যায়। শ্রীহরি তাহাদের সহায়, তাহারা ঘোষেরই সমর্থনকারী। শ্রীহরি বলিতেছে—তাহাদের জোরেই তাহার জোর, তবু তাহাদের মনে হয় তাহাদের মত অসহায় দুঃখী এ সংসারে আর নাই। উপরের দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ গভীর স্বরে ভবেশ ভগবানকে ডাকিয়া উঠে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! তুমিই ভরসা!

শ্রীহরি বলে—এই কথাটিই লোকে ভুলে যায়! মনে করে আমিই মালিক! হামসে দিগর নাস্তি। আরে বাপু—তাহলে ভগবান তো তোকে রাজার ঘরেই পাঠাতেন!

সকলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হয়, আপন আপন কাজের কথাগুলি যথাসাধ্য সংক্ষেপে করিয়া সবিনয়ে ব্যক্ত করে।

—আমার ওই জোতটার পুরানো খরিদা দলিল খুঁজে পেয়েছি শ্রীহরি। জমি যে বাড়ছে তার মানে হল গিয়ে—ওতে আবাদী জমি তোমার বারো বিঘেই ছিল ; তা ছাড়া ঘাস-বেড় ছিল—পাঁচ বিঘে। এখন বাবা ঘাস-বেড় ভেঙ্গে-ওটাকে সুদ্ধ আবাদী জমি করেছে। তাতেই তোমার সতেরোর জায়গায় কুড়ি বিঘে হচ্ছে।

—আচ্ছা সুবিধেমত একদিন দেখাবেন দলিল।

ব্রাহ্মণরা বলেন—আমার দুবিঘে বেহ্মত্তোর—মালের জমির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।

—বেশ, নমুদ আনবেন।

সকলে উঠিয়া যায়। শ্রীহরি সেরেস্তার কাজ খনিকটা দেখে, তারপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া কল্পনা করে—এবার সে লোকাল-বোর্ডে দাঁড়াইবে। লোকাল-বোর্ডে না দাঁড়াইলে—এ অঞ্চলের পথঘাটগুলি সংস্কার করা অসম্ভব। শিবকালীপুর এবং কঙ্কণার মধ্যবর্তী সেই খালটার উপর এবার

সাঁকোটা করিতেই হইবে। আর এই লোকগুলার উপর রাগ করিয়া কি হইবে? নির্বোধ হতভাগার দল সব। উহাদের উপর রাগ করাও যা—ঘাসের উপর রাগ করাও তাই।

হঠাৎ একটা জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়! নিত্যই আকৃষ্ট হয়। জানালা দিয়া দেখা যায়—অনিরুদ্ধের বাড়ি। সে নিত্যই জানালা খুলিয়া দিয়া চাহিয়া দেখে। অন্ধকারের মধ্যে কিছু ঠাওর হয় না। তবে এক একদিন দেখা যায়—কেরোসিনের ডিবে হাতে দীর্ঘাঙ্গী কামারণী এ-ঘর হইতে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দেখুড়িয়ার তিনকড়ি আপন দাওয়ার উপর বসিয়া গোটা অঞ্চলটার লোককে ব্যঙ্গভরে গাল দেয়। তিনকড়ির গালিগালাজের মধ্যে অভিসম্পাত নাই, আক্রোশ নাই, আছে শুধু অবহেলা আর বিদ্রূপ! সে বৃদ্ধি দিবে না। ভূপাল তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল; বেশ সম্মান করিয়া নমস্কার করিয়া বলিয়াছিল—যাবে একবার মণ্ডল মশায়। বৃদ্ধির মিটমাটের কথা হচ্ছে, মোড়লরা সব আসবে! আপনি একটু—

হঠাৎ ভূপাল দেখিল তিনকড়ি অত্যন্ত রূঢ়দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে; সে থমকিয়া থামিয়া গেল এবং কয়েক পা পিছাইয়া আসিল। হঠাৎ মণ্ডল মহাশয়ের চিতাবাঘের মত ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া মোটেই আশ্চর্য নয়।

তিনকড়ির মুখের পেশীগুলি এবার ধীরে ধীরে নড়িতে লাগিল। নাকের ডগাটা ফুলিয়া উঠিল—দুইপাশে জাগিয়া উঠিল অর্ধ-চন্দ্রাকারে দুইটা বাঁকা রেখা;—উপরের ঠোঁটটা খানিকটা উল্টাইয়া গেল; দুরন্ত ঘৃণাভরে প্রশ্ন করিল—কোথায় যাব?

—আজ্ঞে?

—বলি—কোথায় যেতে হবে?

—আজ্ঞে—ঘোষ মহাশয়ের কাছারিতে।

—ওরে বেটা, ব্যাঙাচির লেজ খসলে ব্যাঙ হয়, হাতি হয় না। ছিরে পাল, ঘোষ হয়েছে—বেশ কথা! তার আবার মশায় কিসের রে ভেমো বাগ্দা? কাছারিই বা কিসের?

ভূপালের আর উত্তর করিতে সাহস হইল না!

তিনকড়ি হাত বাড়াইরা—আঙুল দিয়া পথ দেখাইয়া বলিল—যা, পালা।

ভূপাল চলিয়াই যাইতেছিল—হঠাৎ দাঁড়াইল, খানিকটা সাহস করিয়া বলিল—আমার কি দোষ বলেন? আমি হুকুমের গোলাম, আমাকে বললেন—আমি এসেছি। আমার উপর ক্যানে—

তিনকড়ি এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—হুকুমের গোলাম্‌। বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার, বেরো বলছি, বেরো।

ভূপাল পলাইয়া বাঁচিল। তিনকড়ির কথায় কিন্তু তাহার রাগ হইল না। বিশেষ করিয়া ভল্লা, বাগ্দী, বাউড়ী, হাড়ি—ইহাদের সঙ্গে তিনকড়ির বেশ একটি হৃদ্যতা আছে। তিনকড়ির বাছ-বিচার নাই; সকলের বাড়ি যায়, বসে, গল্প করে, কল্কে লইয়া হাতেই তামাক খায়। এককালে সে মনসার গানের দলেও ইহাদের সঙ্গে গান গাহিয়া ফিরিত। আজও রসিকতা করে, গালি-গালাজও করে, তাহাতে বড় একটা কেহ রাগ করে না। ভূপাল বরং পথে আপন মনেই পরম কৌতুকে খানিকটা হাসিয়া লইল। গালাগাল-খানি বড় ভাল দিয়েছে মোড়ল। 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে'—অর্থাৎ ঘোষ মহাশয় ছুঁচো। তাহার নিজের চামচিকে হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু ঘোষ মহাশয়কে ছুঁচো বলিয়াছে—এই কৌতুকেই সে হাসিল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি! মাঝে মাঝে মেঘ আসে, উতলা ঠাণ্ডা বাতাস দেয়, গাছপালার ঘন পত্রপল্লবে শন্‌-শন্‌ শব্দে সাড়া জাগিয়া উঠে; খানাডোবায় ব্যাঙগুলা কলরব করে; অশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক উঠে, মধ্যে, মধ্যে ফিন্‌ফিনে ধারায় বৃষ্টি নামে; তিনকড়ি দাওয়ার উপর অন্ধকারে বসিয়া তামাক টানে আর গালিগালাজও করে। বসিয়া শোনে রাম ভল্লা—তারিণী ভল্লা।

—শেয়াল, শেয়াল! বেটারা সব শেয়াল, বুঝলি রাম, শেয়ালের দল সব।

রাম ও তারিণী অন্ধকারের মধ্যেই সমঝদারের মত জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে, বলে—তা বৈ কি!

তিনকড়ির কোন গালিগালাজই মনঃপূত হয় না—সে বলিয়া উঠে—বেটারা শেয়ালও নয়! শেয়ালে তো তবু ছাগল-ভেড়াও মারতে পারে। ক্ষেপে কামড়ায়। বেটারা সব খেঁকশেয়াল।

ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়া পড়ে গৌর আর স্বর্ণ। তাহারা বাপের উপমা শুনিয়া হাসে।

—ভল্লুকের বাচ্চা বেটারা সব উল্লুকের দল!

এবার স্বর্ণ আর থাকিতে পারে না—সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

তিনকড়ি ধমকাইয়া উঠে—গৌর বুঝি ঢুলছিল?

গৌর হাসিয়া বলে—কৈ না।

—তবে? তবে সন্ন হাসছিল কেন?

গৌর বলে—তোমার কথা শুনে হাসছে সন্ন।

—আমার কথা শুনে ?—তিনকড়ি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—হাসির কথা নয় মা। অনেক দুঃখে বলছি মা। অনেক তিতিক্ষেতে! ছেলে-মানুষ তোরা, কি বুঝ্‌বি!

স্বর্ণ অপ্রস্তুত হইয়া বলে—না বাবা, সেজন্য নয়।—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচভরেই আবার বলে—তুমি বললে না—ভল্লুকের বাচ্চা উল্লুক—তাই। ভল্লুকের পেটে উল্লুক হয়?

এবার তিনকড়িও হাসিয়া উঠে। ও, তা বটে! ওটা আমারই ভুল বটে।

রাম আর তারিণীও এবার হাসে! ঘরের মধ্যে গৌর-স্বর্ণও আর একচোট হাসে; তিনকড়ি স্বর্ণের তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা ভাবিয়া খুশিও হয় খানিকটা। উৎসাহিত হইয়া বলে—খানিক মনসার পাঁচালী পড়্‌ সন্ন! আমরা শুনি। এই প্রসঙ্গেই সে আবৃত্তি করে—

"দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে,
না ভজিনু রাধা-কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।"

দিনরাত যত বেটা ভেড়ার কথা ভেবে কি হবে? ভেড়া—ভেড়া, সব ভেড়া। বুঝলি রামা—শেয়াল দেখলে—ভেড়াগুলা চোখ বুজে দেয়। ভাবে—আমরা যখন শেয়ালটাকে দেখতে পাচ্ছি না, শেয়ালটাও তখন আমাদের দেখ্‌তে পাচ্ছে না। বেটা শেয়ালের তখন পোয়াবারো হয়ে যায়, কঁ্যাক্‌ করে ধরে আর নলীটি ছিঁড়ে দেয়। এ হয়েছে ঠিক তাই। ব্যাটা ছিরে পাল, শুধু ছিরে পাল ক্যানে—কঙ্কণার বাবুরা পর্যন্ত ধুত্ত শেয়াল। আর এ বেটারা হল সব ভেড়া। মটামট ঘাড় ভাঙছে।

এবার জুৎসই উপমা-সম্মত গালাগালি পাইয়া তিনকড়ি খুশি হইয়া উঠে।

স্বর্ণ ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করে—কোন জায়গাটা পড়ব বাবা?

মনসার পাঁচালী তিনকড়ির মুখস্থ। এককালে সে ভাসানের গানের মূল গায়েন ছিল। সেই সময়েই কলিকাতা হইতে ছাপা বইখানা সে আনাইয়া ছিল। সেকালে ভাসানের দল ছিল—পাঁচালীর দল; তিনকড়িই তাহাকে যাত্রার ঢঙে রূপান্তরিত করিয়াছিল। তখন সে সাজিত 'চান্দোবেনে'; মধ্যে মধ্যে 'গোধা'র ভূমিকাতেও অভিনয় করিত। চন্দ্রধর সাজিয়া আঁকড়ের একটা এব্‌ড়ো-খেবড়ো ডালের লাঠিকে 'হেমতালের লাঠি' হিসাবে আস্ফালন করিয়া বীররসের অভিনয়ে আসর মাত করিয়া দিত। যতবার সে আসরে প্রবেশ করিত, বলিত—

"যে হাতে পূজিনু আমি চণ্ডিকা জননী,
সে হাতে না পূজিব কভু চ্যাঙ্‌-মুড়ি কানি!"

তারপর সনকার সম্মুখে গম্ভীরভাবে বলিত—চন্দ্রধরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবেছে, ছয়-ছয় বেটা আমার বিষে কাল হয়ে অকালে কালের মুখে গিয়েছে, ওই—ওই চ্যাঙ্-মুড়ি-কানির জন্য। আমার মহাজ্ঞান হরণ করছে। বন্ধু ধন্বন্তরিকে বধ করেছে! আর যা আছে তাও যাক্। তবু—তবু আমি তাকে পূজব না। না—না—না!

আজ সে বলিল—পড় না এক জায়গা।

রাম বলিল—সন্ন মা. সেই ঠাঁইটে পড়। কলার মাকাসে করে বেউলো জলে ভেসেছে মরা নবীন্দরকে নিয়ে; বেশ সুর করে পড় মা।

তিনকড়ি বলিয়া দিল—ওইখান থেকে পড় সন্ন। ওই যে—যেখানে চন্দ্রধর বলছে—

"যদিরে কানির লাইগ পাই একবার।
কাটিয়া সুদিব আমি মরা পুত্রের ধার॥"

স্বর্ণ বই খুলিয়া সুর করিয়া পড়িল—

"যে করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিয়া গাঙ্গে।
শ্বশুরের শুনিয়া বেউলা নিষ্ঠুর বচন।
বিষাদ ভাবিয়া পাছে করয়ে ক্রন্দন॥"

তারপর সুর করিয়া ত্রিপদী ছন্দে আরম্ভ করিল—

"মালি নাগেশ্বর থানিক উপকার করহ বেউলারে!
তুমি বড় গুণমণি তোরে ভাল আমি জানি
হের, আইস বুলি হে তোমারে!
যাও তুমি সাধু পাশ খুঁজিয়া লও রাম-কলার গাছ
বান্ধ ভুরা যেমন প্রকারে,
হাতে কঙ্কণ ধর, খোলের মাঞ্জস গড়
অমূল্য রতন দিমু তোরে॥"

বেহুলা বিলাপ করে আর আপনার বিবাহের বেশ খুলিয়া ফেলে, হাতের কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিল—বাজু-বন্ধ, জসম খুলিল—কানের কুণ্ডল, নাকের বেসর ফেলিয়া দিল; সিঁথির সিন্দুর মুছিল, বাসর-ঘরে সোনার বাটা ভরা ছিল পানের খিলি, বেহুলা সে সব ফেলিয়া লখীন্দরের মৃতদেহ কোলে করিয়া এক অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে ভাসিয়া চলিল। মৃত লখীন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া খেদ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল—

"জাগরে প্রভু গুঞ্জড়ি সাগরে।
তোমারে ভাসায়ে মাও চলিয়া যায় ঘরে।
বাপ মোগদ তাস পাষাণে বাঁধে হিয়া।
ছাড়িল তোমার দয়া সাগরে ভাসাইয়া ॥"

বেহুলা ভাসিয়া যায়। কাক কাঁদে, সে বেহুলার সংবাদ লইয়া যায় তাহার মায়ের কাছে, অন্য পাখীরা কাঁদে। পশুরা কাঁদে, শিয়াল আসে লখীন্দরের মৃতদেহের গন্ধে, কিন্তু বেহুলার কান্না দেখিয়া সেও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যায়।...

তিনকড়ি, রাম, তারিণী ইহারাও কাঁদে। স্বর্ণের গলাও ভারী হইয়া আসে, সেও মধ্যে মধ্যে চোখের জল মোছে! সেই অধ্যায়টা শেষ হইতেই তিনকড়ি বলিল—আজ আর থাক্ মা সন্ন।

স্বর্ণ বইখানি বন্ধ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া তুলিয়া রাখিয়া বাড়ির ভিতর গেল; গৌর খানিক আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তারিণী এবং রামও উঠিল।

—আজ উঠলাম মোড়ল।

—হ্যাঁ।—অন্যমনস্ক তিনকড়ি একটু চকিতভাবেই বলিল—হ্যাঁ।

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল। মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে বিছানায় শুইয়াও তাহার ঘুম আসে না। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি, রিমি-ঝিমি বৃষ্টি। চারিদিক নিস্তব্ধ—গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকজন সব অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহারা পেটের দায়ে মান বলি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শ্রীহরি ঘোষের গোলা খুলিয়াছে, কঙ্কণার বাবুদের গোলা খুলিয়াছে, দৌলত শেখের গোলা খুলিয়াছে—তাহাদের জন্য। কিন্তু তাহাকে কেহ দিবে না। সে শহরে কলওয়ালার কাছে টাকা লইয়া একবার কিনিয়াছিল। সেই ধানের কিছু কিছু সে ভল্লাদের দিয়াছে। আবার ধান চাই। বড়লোকের—ওই জমিদারের সঙ্গে বাদ করিয়াই চৌদ্দ ডিঙা মধুকর ডুবিয়া গেল। পৈতৃক পঁচিশ বিঘা জমির বিশ বিঘা গিয়াছে, অবশিষ্ট তার পাঁচ বিঘা। বেহুলার মত তার স্নেহের স্বর্ণময়ী বাসরে বিধবা হইয়া অথৈ সাগরে ভাসিতেছে। এ কালে লখীন্দর বাঁচে না। উপায় নাই। কোন উপায় নাই। তাহার মনে পড়ে, সদর শহরে ভদ্রলোকের ঘরেও আজ কাল বিধবা-বিবাহ হইতেছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সেকথা একবার সে তাহার স্ত্রীর কাছে তুলিয়াছিল; কিন্তু স্বর্ণ তাহার মাকে বলিয়াছিল—না—মা! ছি!...আর এক উপায়—স্বর্ণকে লেখাপড়া শেখানো। জংশনে সে মেয়ে-ডাক্তারকে দেখিয়েছে, মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারণীদের দেখিয়াছে।

লেখাপড়া শিখিয়া এমনই যদি স্বর্ণ হইতে পারে!···সে বারান্দায় শুইয়া ভাবে।

কৃষ্ণপক্ষের আকাশে চাঁদ উঠিল। মেঘের ছায়ায় জ্যোৎস্না-রাত্রির চেহারা হইয়াছে ঠিক ভোররাত্রির মত। মধ্যে মধ্যে ভুল করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিতেছে—বাসা হইতে মুখ বাড়াইয়া পাখার ঝাপট মারিতেছে।

তিনকড়ি মনের সংকল্পকে দৃঢ় করিল! বহুদিন হইতেই তাহার এই সংকল্প; কিন্তু কিছুতেই কাজে পরিণত করিতে সে পারিতেছে না; কালই দেবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবে।

—মণ্ডল মশায়! ও মণ্ডল মশায়! মণ্ডল মশায় গো!

তিনকড়ির নাসিকাধ্বনির সাড়া না পাইয়া চৌকিদারটা আজ তাহাকে ডাকিতেছে।

কুসুমপুরের মুসলমানেরা দৌলত শেখের কাছে ধান ঋণ পাইয়াছে। সারাটা দিন রমজানের রোজার উপবাস করিয়া ও সারাটা দিন মাঠে খাটিয়া জমিদারের সেরেস্তায় বৃদ্ধির জটিল হিসাব করিয়াছে। সূর্যাস্তের পর 'এফতার' অর্থাৎ উপবাস ভঙ্গ করিয়া অসাড়ে ঘুমাইতেছে।

ইরসাদ প্রতি সন্ধ্যায় রোজার উপবাস ভঙ্গ করিবার পূর্বে—তাহার একজন গরীব জাতভাইকে কিছু খাইতে দিয়া তবে নিজে খায়। তাহার মনে শক্তি নাই, অহরহ একটা অব্যক্ত জ্বালায় সে জ্বলিতেছে। দেবু-ভাই তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল—সে কথা মনে করিয়াও সে মনকে মানাইতে পারে না।

সে স্পষ্ট চোখের উপর দেখিতে পাইতেছে—কি হইতেছে। শুধু কি হইতেছে নয়, কি হইবে—তাহাও তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। দৌলতের ঋণ সর্বনাশা ঋণ! তাহার কাছে টাকা কর্জ লইয়া কলওয়ালার দেনা শোধ করা হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ঋণের দায়ে সম্পত্তি সমস্ত গিয়া ঢুকিবে দৌলতের ঘরে। কলওয়ালার ঋণে যাইত ধান; দৌলতের ঋণ সুদে-আসলে যুক্ত হইয়া প্রবালদ্বীপের মত দিন দিন বাড়িবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই গোটা গ্রামটার জমির মালিক হইবে দৌলত। শিবকালী-পুরের শ্রীহরি ঘোষের মত···সে-ই হইবে তামাম জমির মালিক। রহম-চাচাকেও খাজনা দিতে হইবে দৌলতকে।

অন্ধকার রাত্রের মধ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া সে ঈশ্বরকে ডাকে। 'আল্লাহ্-নূর্‌ইয়াহ্'—তুমি এর বিচার কর। প্রতিকার কর! গরীবদের বাঁচাও।

এ প্রার্থনা তার নিজের জন্য নয়। সে ঠিক করিয়াছে—এ গ্রাম ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইবে। তাহার শ্বশুর-বাড়ির আহ্বানকে সে আর অগ্রাহ্য করিবে না! সে যাইবে। কাজ করিবার সঙ্গে পড়িবে, ম্যাট্রিক পাস করিয়া সে মোক্তারি পড়িবে! মোক্তার হইয়া তবে সে দেশে ফিরিবে। তার আগে নয়। তারপর সে যুদ্ধ করিবে। দৌলত, কঙ্কণার বাবু, শ্রীহরি ঘোষ—প্রতিটি দুশ্‌মনের সঙ্গে সে জহাদ্ করিবে।

মহাগ্রামে ন্যায়রত্ন বসিয়া ভাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপে হ্যারিকেন জ্বলে, কুমারেরা দুর্গাপ্রতিমায় মাটি দেয়, অজয় বসিয়া থাকে। ওইটুকু ছোট ছেলে—উহার চোখেও ঘুম নাই। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে প্রতিমা-গঠন দেখে। শশীশেখরও এমনি ভাবে দেখিত; বিশ্বনাথও দেখিত; অজয়ও দেখিতেছে। পাড়ার ছেলেপিলেরা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিরকাল থাকে! কিন্তু এ দাঁড়াইয়া থাকা সে দাঁড়াইয়া থাকা নয়—অর্থাৎ তাঁহারা ছেলেবেলায় সে মন লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন—এ তাহা নয়।

জম্‌জমাট মহাগ্রাম—ধন-ধানে ভরা সচ্ছল পঞ্চগ্রাম—অথচ উৎসব-সমারোহ কিছুই নাই। প্রাণধারা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। সম্পদ গিয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্য গিয়াছে; বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা আজ বিনষ্টপ্রায়; জাতিগত কর্মবৃত্তি মানুষের হস্তচ্যুত—কেহ হারাইয়াছে, কেহ ছাড়িয়াছে। আজই সকালে আসিয়াছিল কয়েকটি বিধবা মেয়ে। তাহারা ধান ভানিয়া অন্নের সংস্থান করিত, কিন্তু ধান-কল হইয়াছে জংশনে, তাহাদের কাজ এত কমিয়া গিয়াছে যে তাহাতে আর তাহাদের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইতেছে না। তিনি শুধু শুনিলেন। শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু উপায় কিছু তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারিলেন না। এখনও ভাবিয়া পান নাই।

এ বিষয়ে তিনি অনেকদিন হইতেই সচেতন! এককালে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বৈদেশিক মনোভাবকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের উৎসাহে আপন পুত্রই বিদ্রোহী হইয়াছিল। তারপরও তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন হোক্ বিশৃঙ্খল-সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম যদি অক্ষুণ্ণ থাকে—তবে আবার একদিন সব ফিরিবে। আজ স্বয়ং ঈশ্বরই বুঝি হারাইয়া যাইতেছেন।

তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথ কালধর্মে আজ নাস্তিক, জড়বাদী।

বিশ্বনাথ চলিয়া গিয়াছে। দেবুর সহিত কথা-প্রসঙ্গে সেদিন যে কথা

উঠিয়াছিল—সেই আলোচনার পরিণতিতে সে বলিয়াছিল—আমার জীবনের পথ, আদর্শ, মত—আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি আমার জন্যে শুধু কষ্ট পাবেন দাদু। তার চেয়ে—জয়া আর অজয়কে নিয়ে—

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—না ভাই! সে যেয়ো না। হোক আমাদের মত ও পথ ভিন্ন। তা বলে কি এক জায়গায় দুজনে বাসও করতে পারব না?

বিশ্বনাথ পায়ের ধুলা লইয়া বলিয়াছিল—বাঁচালেন দাদু! জয়া, অজয় আপনার কাছে থাক, আর আমি—

—আর তুমি? তুমি কি—

—আমি?—বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল;—আমার কর্মক্ষেত্র দিন দিন যেমন বিস্তৃত—তেমনি জটিল হয়ে উঠছে দাদু।

—এইখানে—তোমার দেশে থেকে কাজকর্ম কর তুমি।

—আমার কর্মক্ষেত্র গোটা দেশটাতে দাদু। আমি আপনার মত মহা-মহোপাধ্যায়ের পৌত্র, আমার কর্মক্ষেত্র বিরাট তো হবেই। এখানে কাজ করবে দেবু, দেবুর সঙ্গে আরও লোক আসবে ক্রমশ, দেখবেন আপনি। মানুষ চাপা পড়ে মরে, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব পুরুষানুক্রমে মরে না। তার অন্তরাত্মা উঠতে চাচ্ছে—উঠবেই। আপনাদের সমাজ-ব্যবস্থা কোটি কোটি লোককে মেরেছে—তাই তাদের মাথা-চাড়ায় সে চৌচির হয়ে ফেটেছে। সে একদিন ভাঙবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজের কল্যাণ চিন্তাই করতে চেয়েছিলেন, তাতে আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু কালক্রমে তার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুল ঢুকেছে। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই আমরা এ সমাজকে ভাঙব—ধর্মকে বদলাব।

প্রাচীন কাল হইলে ন্যায়রত্ন আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদ্গার করিতেন। কিন্তু শশীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি শুধু নিরাসক্ত দ্রষ্টা ও শ্রোতা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি শুষ্ক হাসি হাসিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ বলিয়া গিয়াছে—একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন আসন্ন, দাদু। আমার কলকাতা ছাড়লে চলবে না; জয়াকে কোন কথা বলবেন না। আর আপনার দেব-সেবার একটা পাকা বন্দোবস্ত করুন। কোন টোলের ছেলেকে দেবতা বা সম্পত্তি আপনি লেখাপড়া করে দিন।

ন্যায়রত্ন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—যদি জয়াকে ভার দি বিশ্বনাথ? তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিয়াছিল—দিতে পারেন, কারণ জয়া আমার ধর্ম গ্রহণ করতে কোনদিনই পারবে না।

ন্যায়রত্ন অন্ধকার দিগন্তের দিকে চাহিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিলেন আর বিদ্যুচ্চমকের আভাস দেখিতেছিলেন। কোন অতি দূর-দূরান্তের বায়ুস্তরে মেঘ জমিয়া বর্ষা নামিয়াছে, সেখানে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে ; তাহারই আভাস দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মেঘ-গর্জনের কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। শব্দতরঙ্গ এ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আসিতে ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া শেষে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। ভাদ্র মাস হইলেও এখনও সময়টা বর্ষা। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রবল বর্ষা নামিয়াছিল ; জলঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুচ্চমক এবং মেঘগর্জনের বিরাম ছিল না। আবার আজ মেঘ দেখা দিয়াছে ; খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের আনাগোনা চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। দিগন্তে এ সময়ে মেঘের রেশ থাকেই এবং চিরদিনই এ সময় দূর-দূরান্তের মেঘভারের বিদ্যুৎ-লীলার প্রতিচ্ছটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তসীমায় ক্ষণে ক্ষণে আভাসে ফুটিয়া উঠে। সমস্ত জীবনভোরই ন্যায়রত্ন এ খেলা দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ তিনি এই ঋতুরূপের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক অসাধারণ কিছু দেখিলেন যেন। তাঁহার নিজের তাই মনে হইল।

গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু তিনি। বাস্তব জগতের বর্তমান এবং অতীত কালকে আঙ্কিক হিসাবে বিচার করিয়া, সেই অঙ্ক-ফলকেই ধ্রুব, ভবিষ্যৎ, অখণ্ড সত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তাহারও অধিক কিছু—অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ; মধ্যে মধ্যে তিনি তাহাকে যেন প্রত্যক্ষ করেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, সমস্ত মন দিয়া পর্যন্ত অনুভব করেন। আকস্মিকতার মত অপ্রত্যাশিতভাবে জটিল রহস্যের আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সে আসে ; বাস্তববাদের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া অঙ্কফল ওলট-পালট বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া যায়।

বিশ্বনাথ বলে—অঙ্ক কষিয়া আমরা সূর্যের আয়তন বলিতে পারি, ওজন বলিতে পারি।

হয় তো বলা যায়। জ্যোতিষীরা অঙ্ক কষিয়া গ্রহ-সংস্থান নির্ণয় করে। পুরাতন কথা। নূতন করিয়া সূর্যের এবং অন্যান্য গ্রহের আয়তন তোমরা বলিয়াছ ; কিন্তু ওই অঙ্কটাই কি সূর্যের আয়তন—ওজন ? কোটী কোটী মণ—। ন্যায়রত্ন হাসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—যে লোক দু-মণ বোঝা বইতে পারে, চার মণ তার ঘাড়ে চাপালে তার ঘাড় ভেঙে যায়, দাদু। সুতরাং দু-মণের দ্বিগুণ চারমণ অঙ্ক কষে বললেও—সেটা যে কত ভারী সে জ্ঞান তার

নেই। অনুভূতি দিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। যার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নেই—নির্ভুল হলেও সর্বতত্ত্বের অঙ্কফল তার কাছে নিষ্ফল। যার আছে, সে বুঝতে পারে আজকের অঙ্কফল কাল পাল্টায়—সূর্য ক্ষয়িত হয়, বৃদ্ধি পায়। অঙ্কাতীতকে এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়।

বিশ্বনাথ উত্তর দেয় নাই।

বিশ্বনাথ বুঝিয়াছিল—নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের সংস্কার-বশেই ন্যায়রত্ন এ কথা বলিতেছেন। তাঁহার সে সংস্কার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার মত তর্কযুক্তিও তাহার ছিল, কিন্তু স্নেহময় বৃদ্ধের হৃদয়, বেশী আঘাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সে চুপ করিয়াই ছিল, কেবল একটু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ন্যায়রত্নও আর আলোচনা বাড়ান নাই। বিশ্বনাথ স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন তিনি শুধু দ্রষ্টা।···অন্ধকার রাত্রে একা বসিয়া ন্যায়রত্ন ওই কথাই ভাবেন! ভাবেন অজয় আবার কেমন হইবে কে জানে!

একটা বিপর্যয় যেন আসন্ন, ন্যায়রত্ন তাহার আভাস মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করেন। নূতন কুরুক্ষেত্রের ভূমিকা এ। অভিনব গীতার বাণীর জন্য পৃথিবী যেন উন্মুখ হইয়া আছে।

তবু তিনি বেদনা অনুভব করেন বিশ্বনাথের জন্য। সে এই বিপর্যয়ের আবর্তে ঝাঁপ দিবার জন্য যোদ্ধার আগ্রহ হইয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

জয়ার মুখ, অজয়ের মুখ মনে করিয়া তাঁহার চোখের কোণে অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু জমিয়া উঠে। পরমুহূর্তেই তিনি চোখ মুছিয়া হাসেন।

ধন্য সংসারে মায়ার প্রভাব! মহামায়াকে তিনি মনে মনে প্রণাম করেন।

পনের

আরও একজন জাগিয়া থাকে। কামার-বউ, পদ্ম। অন্ধকার রাত্রে ঘরের মধ্যে অন্ধকার স্পর্শসহ, গাঢ়তর হইয়া উঠে। পদ্ম অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলিয়া জাগিয়া থাকে।—এলোমেলো চিন্তা। শুধু এক বেদনার একটানা স্বরে সেগুলি গাঁথা।

উঃ—কি অন্ধকার! নিস্তেজ হাতখানা চোখের সামনে ধরিয়াও দেখা যায় না!

গ্রামখানায় লোক অঘোরে ঘুমাইতেছে। সাড়া-শব্দ নাই, শুধু ব্যাঙের শব্দ, বোধ হয় হাজার ব্যাঙ এক সঙ্গে ডাকিতেছে। দুইটা বড় ব্যাঙ—এখানে বলে হাঁড়া-ব্যাঙ—পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে। এটা ডাকিতেছে ওটা থামিয়া

আছে, এটা থামিলেই ওটা ডাকিবে! যেন কথা বলিতেছে। একটা পুরুষ অন্যটা তাহার স্ত্রী।...বেঙা চলিয়াছে জলে, পরমানন্দে জলে সাঁতার কাটিয়া আহারের সন্ধানে, পূর্ণ বেগে—তীরের মতন। বেঙী ছানাগুলি লইয়া পিছনে পড়িয়া আছে—কচি কচি পায়ে এত জোরে জল কাটিয়া যাইবার তাহাদের শক্তি নাই, বেঙী তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পারে না; সে ডাকিতেছে—

"যেও না যেও না বেঙা—আমাদিগে ছেড়ে,
মুই নারী অভাগিনী ভাসি যে পাথরে—
ও-হায় কচি-কাচা নিয়ে!"

বেঙা গম্ভীর গলায় শাসন করিয়া বলে—

"মর্—মর্—একি জ্বালা—পিছে ডাকিস্ কেনে?
কেতাথ করেছ আমায়—ছেলে পিলে এনে—
মরতে কেন করলাম বিয়ে!"

পুরুষগুলা এমনি বটে। প্রথম প্রথম কত্ত ভালবাসা! তারপর ফিরিয়াও চায় না।...অনিরুদ্ধ গেল—বলিয়া গেল না—কাকের মুখে একটা বার্তাও পাঠাইল না। একখানা পোস্টকার্ড, কিই বা তাহাদের দাম! হঠাৎ মনে হয় সে কি বাঁচিয়া আছে? না, মরিয়া গিয়াছে? সে নাই—নিশ্চয় মরিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে একটা খবরও সে কখনও-না-কখনও দিত। বেঙারা এমনি করিয়াই মরে। শোলমাছের পোনার ঝাঁকের লোভে, কাঁকড়াবাচ্চার ঝাঁকের লোভে বেঘোরে ছুটিয়া যায়—কালকেউটে যম ওৎ পাতিয়া থাকে—সে খপ করিয়া ধরে।...সে দুঃখের মধ্যেও হাসে। তখন বেঙার কি কাতরানি!

"ও বেঙী—ও বেঙী—আমায় যমে ধরেছে।"

এবার সে অন্ধকারের মধ্যে হাসিয়া সারা হয়।

বাহিরে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; বিদ্যুতের ছটা জানালা দরজায় ফাঁক দিয়া—দেওয়ালের ফটক দিয়া—চালের ফুটা দিয়া ঘরের ভিতর চক্-চক্ করিয়া খেলিয়া গেল।—উঃ! কি ছটা!

ঘরের ভিতরে অন্ধকার পরমুহূর্তেই হইয়া উঠিল দ্বিগুণিত। পদ্ম ঘরের চারিদিক সেই অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া দেখিল। আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বিদ্যুতের এক চমকেই সব দেখা গিয়াছে। শিবকালীপুরের কর্মকারের ঘর ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে, চালে অজস্র ফুটা—এইবার ধসিয়া গিয়া ঢিপিতে পরিণত হইবে। কর্মকার মরিল—তাহার ঘর ভাঙিল, এখন শুধু টিকিয়া রহিল কামারের বউ! কিন্তু কর্মকার মরিয়াছে, এমন কথাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

সকল বেঙাই কি মরে ? তাহারা শোলের পোনা খাইয়া আরও আগাইয়া চলে—শেষে গাঙে গিয়া পড়ে ; সেখানে পায়—রুই কাতলের ডিম, পোনার ঝাঁক। সেই ঝাঁকের সঙ্গে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। গাঙের ধারের বেঙীর দেখা হয়, সেইখানে জমিয়া যায়। আবার এমনও হয় যে, বেঙা সারারাত্রি খাইয়া-দাইয়া সকালে ফেরে, ফিরিয়া দেখে—বেঙী-ই নাই ; তাহাকে ধরিয়া খাইয়াছে গ্রামের গোখুরা। ছেলেগুলারও কতক খাইয়াছে কতকগুলা চলিয়া গিয়াছে কোথায় কে জানে। আবার কত বেঙী ছেলে ফেলিয়া পলাইয়া যায়। ওই উচ্চিংড়ের মা তারিণীর বউ! ওই উচ্চিংড়ে ছেলেটা। আবার তাহাদের মিতেকে—দেবু পণ্ডিতকে দেখ না কেন! মিতেনী মরিয়াছে, মিতে কাহারও দিকে কি ফিরিয়া চাহিল।

হঠাৎ মনে পড়ে রাঙাদিদিকে। রাঙাদিদি কতই না রসিকতা করিত। কত কথা বলিত। তাহাকে গাল দিয়া বলিত—মরণ তোমার। মর তুমি! ভাল করে যত্ন-আত্তি করতে পারিস না?

পদ্ম একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—আমি পারব না! তুমি বরং চেষ্টা করে দেখ দিদি।

—ওলো আমার বয়েস থাকলে—রাঙাদিদি তাচ্ছিল্যভরে একটা পিচ্ কাটিয়া বলিয়াছিল—দেখ্‌তিস দেবা আমার পায়ে গড়াগড়ি যেতো। দেখ্ না—এই বুড়ো বয়সে আমার রঙের জৌলুসটা দেখ না!…ওই একজন ছিল তাহার দরদী জন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় দুর্গাকে! ওই এক দরদী আছে তার! দুর্গা বলে—জামাই পণ্ডিত পাথর! পাথর হাসে না, পাথর কাঁদে না, পাথর কথা বলে না, পাথর গলে না। পাথর সে অনেক দেখিল। বকুল-তলার ষষ্ঠী-পাথরকে দেখিয়াছে, শিবকে দেখিয়াছে, কালীকে দেখিয়াছে,—অনেক মাথা কুটিয়াছে। তাহার গলায় হাতে এখনও এক বোঝা মাদুলি!

পণ্ডিতও পাথর। বেশ হইয়াছে—লোকে পাথরের গায়ে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিয়াছে—বেশ হইয়াছে! খুশি হইয়াছে সে!…

বাহিরে পাথর ঝাপটের শব্দ উঠিল ; কাক ডাকিতেছে। সকাল হইয়া গেল কি? আঃ—তাহা হইলে বাঁচে! পদ্ম বিছানার পাশের জানালাটা খুলিয়া অবাক হইয়া গেল। আহা, এ কি রাত্রি! আকাশে কখন চাঁদ উঠিয়াছে। পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদের আলো ফুট ফুট করিতেছে—ফিনফিনে নীলাম্বরী শাড়ী-পরা ফর্সা বউয়ের মত।

সে দরজা খুলিয়া মাঠ-কোঠার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিক নিঝুম। উপরের বারান্দা হইতে দেখিয়া অদ্ভুত মনে হইতেছে।

বাড়িটা যেন হাঁ করিয়া গিলিতে চাহিতেছে। মাটির উঠান জলে ভিজিয়া নরম হইয়া আছে, কিন্তু তবু রুপালী জ্যোৎস্নায় তক্ তক্ করিতেছে ; কোথাও একমুঠা জঞ্জাল, কোথাও একটা পায়ের দাগ নাই! দক্ষিণ-দুয়ারী বারান্দাটা পড়িয়া আছে—কোথাও একটা জিনিস নাই। বারান্দাটা মনে হইতেছে কত বড়! পোড়ো বাড়ি জঞ্জালে ময়লায় ভরিয়া পড়িয়া থাকে—মরা মানুষের মত। চালে খড় থাকে না, দেওয়াল ভাঙিয়া যায়, দুয়ার জানালা খসিয়া যায়—মড়ার মাথায় যেমন চুল থাকে না, মাংস থাকে না, চোখের গর্ত মুখের গহ্বর হাঁ হইয়া থাকে, তেমনি ভাবে। আর এ বাড়িটা ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে, চাল আজও খড়ে ঢাকা, দরজা জানালা জীর্ণ হইলেও ঠিক আছে। শুধু নাই কোথাও মানুষের কোন চিহ্ন। না আছে পায়ের ছাপ, আছে জিনিসপত্র, জামা—জুতা—ছড়ি—হুঁকা—কল্কে—কল্কে-ঝাড়া গুল ; সব থাকিত দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটার দাওয়ায়! লোকের বাড়ির উঠানে থাকে—ছেলের খেলাঘর ; যতীন-ছেলে থাকিতে উচ্চিংড়ে, গোবরা ছিল—তখন উঠানটায় ছড়াইয়া থাকিত কত জিনিস, কত উদ্ভট সামগ্রী! এখন কিছুই নাই আর কিছুই নাই। মনে হইতেছে—বাড়িটা নিঃসাড়ে মরিতেছে ক্ষুধার জ্বালায়—যেন হাঁ করিয়া আছে খাদ্যের জন্য ; মানুষের কর্ম-কোলাহলে—মানুষের জিনিসপত্রে পেটটা তাহার ভরিয়া দাও। একা পদ্মকে নিত্য চিবাইয়া চুষিয়া তাহার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাক—সে বাঁচিয়া থাকিলেও পরিতেছে না। উঠানের একপাশে কাহার পায়ের দাগ পড়িয়াছে যেন! দুর্গার পায়ের দাগ। সন্ধ্যাতে সে আসিয়াছিল। অন্যদিন সে এইখানে শোয়। আজ আসে নাই।

হয়তো—! ঘৃণায় পদ্মের মনটা রি-রি করিয়া উঠিল। হয়তো কঙ্কণা গিয়াছে। অথবা জংশনে! কাল জিজ্ঞাসা করিলেই অবশ্য বলিবে। লজ্জা বা কুণ্ঠা তাহার নাই, দিব্য হাসিতে হাসিতে সবিস্তারে সব বলিবে। দম্ভ করিয়াই সে বলে—পেটের ভাত—পরনের কাপড়ের জন্য দাসীবিত্তিও করতে নারব ভাই, ভিক্ষেও করতে নারব।

ভিক্ষা কথাটা তাহার গায়ে বাজিয়াছিল। মনে করিলেই বাজে। ছিঃ, সে ভিক্ষার অন্ন খায়! হ্যাঁ! ভিক্ষার ভাত ছাড়া কি? পণ্ডিতের কাছে এই সাহায্য লইবার তাহার অধিকার কি? নিজের ভাগ্যের উপর একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আক্রোশ আকাশ-ছাওয়া মেঘের মত গিয়া পড়িল প্রথমটা অনিরুদ্ধের উপর, পরে শ্রীহরির উপর, তারপর সে আক্রোশ গিয়া পড়িল দেবুর উপর। সেই বা কেন এমন-ভাবে করে তাকে? কেন?

দুর্গা বলে মিথ্যা নয়; বলে—পণ্ডিতকে দেখে আমার মায়া হয়। আহা বিলু-দিদির বর! নইলে ওর ওপর আবার টান! ও কি মরদ, কামার-বউ ওর কি আছে বল?…তারপর তাচ্ছিল্যভাবে পিচ্ কাটিয়া বলে—ও আক্ষেপ আমার নাই ভাই। বামুন, কায়েত, সদ্গোপ—জমিদার, পেসিডেন, হাকিম দারোগা—কত—কামার-বউ—।…সে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে বলে—ওলো, আমি মুচীর মেয়ে; আমাদের জাতকে পা ছুঁয়ে পেন্নাম করতে দেয় না, ঘরে ঢুকতে দেয় না;—আর আমারই পায়ে গড়াগড়ি সব। পাশে বসিয়ে আদর করে—যেন স্বগ্‌গে তুলে দেয় বলব কি ভাই।—সে আর বলিতেই পারে না; হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

দুর্গা আজও হয়তো অভিসারে গিয়াছে। হয়তো তাহার পায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে—কোন মান্যগণ্য ধনী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কঙ্কণায় গিয়াছে হয়তো। বাবুদের বাগানের কত অভিজ্ঞতা দুর্গা বলিয়াছে। বাগানে জ্যোৎস্নার আলোয় বাবুদের শখ হয় দুর্গার হাত ধরিয়া বেড়াইতে! গ্রীষ্মের সময় ময়ূরাক্ষীর জলে স্নান করিতে যায়! আজও হয়তো—তেমনি কোন নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিবে। কালই তার পরণে দেখা যাইবে নূতন ঝলমলে শাড়ী, হাতে নূতন কাচের চুড়ি। অবশ্য এ সন্দেহ সত্য না হইতেও পারে। কারণ আজকাল দুর্গা আর সে দুর্গা নাই। আজকাল দুর্গা আর বড় একটা অভিসারে যায় না। বলে—ওতে আমার অরুচি ধরেছে ভাই। তবে কি করি, পেটের দায় বড় দায়! আর আমি না বললেই কি ছাড়ে সব? কামার-বউ, বলব কি—ভদ্দনোকের ছেলে—সন্দে বেলায় বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। জানলায় ঢেলা মেরে সাড়া জানায়। জান্‌লা খুলে দেখি—গাছের তলায় অন্ধকারের মধ্যে ফটফটে জামা-কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। আবার রাত দুপুরে—ভাই কি বলব—কোঠার জান্‌লায় উঠে—শিক ভেঙে—ডাকাতের মতও ঘর ঢোকে।

—বাপ রে! পদ্ম শিহরিয়া উঠে! সর্বাঙ্গ তাহার থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল মুহূর্তের জন্য। উঃ, পশুর জাত সব! পশু! পর মুহূর্তেই তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার শিয়রে আছে বগি-দা, সে নির্ভয়ে রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া মেঘাচ্ছায়া-মলিন জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল। ভাদ্রের গুমোট গরমে—ওই ঘরে জানলা-দরজা বন্ধ করিয়া কি শোয়া যায়? মিঠে মৃদু হাওয়া বেশ লাগিতেছে। শরীর জুড়াইয়া যাইতেছে! চাঁদের উপর দিয়া সাদা-কালো—খানা-খানা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে! কখনও আলো, কখনও আঁধার!

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। ও কে! ওই যে দক্ষিণ-দুয়ারীর দাওয়ার উপর এক কোণে সাদা ফটফটে কে দাঁড়াইয়া আছে চোরের মত। কে ও?—পদ্মের বুকের ভিতরটা দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া—দাখানা হাতে লইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছিরু পাল? সে হইলে কি এমন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত? লম্বা মানুষটি। কে? পণ্ডিত—হ্যাঁ, পণ্ডিত বলিয়াই মনে হইতেছে। তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। স্পন্দন হ্রাস হইল না, কিন্তু ভয়-বিহ্বলতা তাহার চলিয়া গেল। পাথর গলিয়াছে। হাজার হউক তুমি বেতার জাত। আহা! বেচারা আসিয়াও কিন্তু সঙ্কোচভরে দাঁড়াইয়া আছে।

পদ্ম ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। পণ্ডিত স্থির হইয়া তেমনি ভাবেই দাড়াইয়া আছে। পদ্ম অগ্রসর হইল। চাপা গলায় ডাকিল—মিতে?—

না। মিতে নয়। পণ্ডিত নয়। মানুষই নয়। দাওয়াটার ওই কোণটার মাথার উপরে চালে একটা বড় ছিদ্র হইয়াছে। সেই ছিদ্রপথে চাঁদের আলো পড়িয়াছে দীর্ঘ রেখায়, ঠিক যেন কোণে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি লম্বা মানুষ!

দরজায় ধাক্কা দেয় কে? দরজা ঠেলিতেছে। হ্যাঁ! বেশ ইঙ্গিত রহিয়াছে আঘাতের মধ্যে। কামার-বউ আসিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল। তারপর ডাকিল—কে?···

কে?—কে?

দেবু বিছানায় শুইয়া জাগিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল। হঠাৎ সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া নজরে পড়িল—তাহার বাড়ির কোলের রাস্তাটার ওপরে শিউলি গাছটার তলায় ফটফটে সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া কে দাঁড়াইয়া আছে। কে! দেবু উঠিয়া বসিল। সে চমকিয়া উঠিল, এ যে স্ত্রীলোক! আকাশের একস্থানে মেঘ ঘন হইয়া আসিয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইয়াছে। গাছের পাতায় টুপ-টাপ শব্দ শোনা যায়। এই গম্ভীর রাত্রে মেঘজল মাথায় করিয়া কে দাঁড়াইয়া আছে এখানে?

দুর্গা? এক তাহাকেই বিশ্বাস নাই। সে সব পারে। কিন্তু সত্যই কি সে? সে সব পারে, তবু দেবু এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না যে—সে তাহার জানালার সম্মুখে আসিয়া এমনভাবে বিনা প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া থাকিবে। সে ডাকিল—দুর্গা?

মূর্তিটি উত্তর দিল না, নড়িল না পর্যন্ত।

কে? দুর্গা হইলে কি উত্তর দিত না? তবে? তবে কে?

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—একি তাহলে তাহার পরলোকবাসিনী বিলু? শিউলি-তলায় ঝরা ফুলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছে! হয়তো নিত্যই দেখিয়া যায়। নানা পার্থিব চিন্তায় অন্যমনস্ক দেবু তাহাকে লক্ষ্য করে না। সে কাঁদে; কাঁদিয়া চলিয়া যায়। দেবুর আর সন্দেহ রহিল না। সে ডাকিল—বিলু! বিলু।

মূর্তিটি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল—ঈষৎ, মুহূর্তের জন্য।

দেবুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা ভরিয়া উঠিল। এক অনির্বচনীয় আবেগে। পার্থিব অপার্থিব দুই স্তরের কামনার আনন্দে অধীর হইয়া, সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া দাওয়া হইতে পথে নামিল—পথ অতিক্রম করিয়া, শিউলি-তলায় আসিয়া মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া মূর্তির হাত ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভ্রম ভাঙিয়া গেল। রক্ত-মাংসের স্থূল দেহ, স্নিগ্ধ উষ্ণতাময় স্পর্শ—স্পর্শের মধ্যে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক প্রবাহ; হাতখানার মধ্যে নাড়ীর গতি দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে,—এ কে!—সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে তুমি?

আকাশ একখানা ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে; জ্যোৎস্না প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে—চারিদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেবু আবার প্রশ্ন করিল—কে? আভাসে ইঙ্গিতে মনের চেতনায় তাহাকে চিনিয়াও তবু প্রশ্ন করিল—কে?

পদ্ম আপনার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আমি।

—কামার-বউ?

—হ্যাঁ, তোমার মিতেনী—পদ্ম হাসিল।

দেবুর শরীরের ভিতর একটা কম্পন বহিয়া গেল, কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

চাপা গলায় ফিস-ফিস করিয়া পদ্ম বলিল—আমি এসেছি মিতে।

দেবু স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

পদ্মের কণ্ঠস্বর সঙ্কোচ-লেশশূন্য—তাহার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কামনার আবেগ স্নায়ু-মণ্ডলীতে অধীর উত্তেজনা—শিরায় শিরায় প্রবহমান রক্তধারায় ক্রম-বর্ধমান জর্জর উষ্ণতা। সে বলিল—আমি এসেছি মিতে। ও-ঘরে আর আমি থাকতে পারলাম না। তোমার ঘরে থাকব আমি। দু-জনায় নতুন ঘর বাঁধব। তোমার খোকন আবার ফিরে আসবে আমার কোলে। যে যা বলে বলুক। না-হয় আমরা চলে যাব দু-জনায়—দেশান্তরে!

এই কয়টা কথা বলিয়াই সে হাঁপাইয়া উঠিল।

দেবু তেমনি মূঢ়-স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া দেবুকে জিজ্ঞাসুভাবে ডাকিল—মিতে!

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—সে সচেতন হইবার চেষ্টা করিল; তারপর সহজভাবে বলিল—চেপে জল আসছে, বাড়ি যাও কামার-বউ।

সে আর দাঁড়াইল না, সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া, দরজাটা বন্ধ করিয়া, খিলটা আঁটিয়া দিবার জন্য উঠাইল—

সেই অবস্থায় হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কতক্ষণ সে খিলে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার নিজেরই খেয়াল ছিল না, খেয়াল হইল—বিদ্যুতের একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চমকে নীলাভ দীপ্তি যখন চোখ ধাঁধিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রগর্জনে চারিদিক থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরের বর্ষণের প্রবল ধারাপাতে গাছের পত্র-পল্লবে ঝর্ ঝর্ শব্দে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। সত্যই বৃষ্টি নামিয়াছে প্রবল বেগে। দেবু সচকিত হইয়া দরজা খুলিয়া আবার বাহির হইল। দাওয়ায় দাঁড়াইয়া রাস্তার ওপারের শিউলিগাছটার দিয়া চাহিয়া দেখিল—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না, গাছটাকেও পর্যন্ত দেখা যায় না। ঘন প্রবল বৃষ্টিধারায়, গাঢ় কাল মেঘের ছায়ায় সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মিতেনির অবশ্য চলিয়া যাওয়ারই কথা; আর কি সে দাঁড়াইয়া থাকে, না থাকিতে পারে? তবুও সে দাওয়া হইতে নামিয়া ছুটিয়া গেল শিউলি-তলার দিকে। শিউলি-তলা শূন্য। কিছুক্ষণ সে সেই বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল! একবার কয়েক পা অগ্রসরও হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। ঘরে আসিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভিজা কাপড় বদলাইয়া সে চুপ করিয়া বসিল। হতভাগিনী মেয়ে! ইহার প্রতিবিধান করার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু কি প্রতিবিধান? তাহার মনে পড়িল—স্বর্ণ সেদিন যে কবিতাটি পড়িতেছিল—সেই কবিতাটির কথা—'স্বামীলাভ'। যে মন্ত্র তুলসীদাস সেই বিধবাকে দিয়াছিল—সে মন্ত্র সে কোথায় পাইবে?

বাহিরে মুষলধারে বর্ষণ চলিয়াছে।

সকালে ঘুম ভাঙিল অনেকটা বেলায়! অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত তাহার ঘুম আসে নাই। বোধ হয় শেষ রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া ছিল সে। এখনও বর্ষণ থামে নাই। আকাশে ঘোর ঘনঘটা। উতলা এলোমেলো বাতাসও আরম্ভ হইয়াছে! একটা বাদল নামিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে! দেবু ওই শিউলি গাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রির কথাগুলি তাহার

মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। হতভাগিনী মেয়ে। সংসারে এমনি ভাগ্যহতা কতকগুলি মেয়ে থাকে যাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিবিধান নাই। যে প্রতিবিধান করিতে যায়, সে পর্যন্ত, দুর্ভাগিনীর অনিবার্য দুঃখে আগুনের আঁচে ঝলসিয়া যায়। অনিরুদ্ধ দেশত্যাগী হইয়াছে, তাহার জমিজেরাত সব গিয়াছে—সে বোধহয় ওই মেয়েটির ভাগ্যফলের তাড়নায়। সে তাহাকে আশ্রয় দিল—তাহার দিকেও আগুনের আঁচ আগাইয়া আসিতেছে। শ্রীহরি তাহার চারিদিকে পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর শাস্তির বেড়া-আগুন জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছে! পরশু পঞ্চায়েত বসিবে, চারিদিকে খবর গিয়াছে। উদ্যোগ-আয়োজন ঘোষ প্রচুর করিয়াছে। রাঙাদিদির এক উত্তরাধিকারী খাড়া করিয়াছে—সে-ই শ্রাদ্ধ করিবে। সেই উপলক্ষে পঞ্চায়েত বসিবে। পরশু রাঙাদিদির শ্রাদ্ধ। মেয়েটা নিজে তামাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিবার জন্য পাপের আগুন জ্বালাইয়াছে বারুদের রঙীন বাতির মত। আপনার আদর্শ অনুযায়ী—সংস্কার অনুযায়ী—দেবু পদ্মকে কঠিন শুচিতা সংযমে অনুপ্রাণিত করিবার সংকল্প করিল। কোনমতেই আর আর কামার-বউয়ের বাড়ি যাইবে না! ছাতা মাথায় দিয়া সে মাঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রে প্রবল বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের নালায় হুড়্ হুড়্ করিয়া জল চলিতেছে। কয়েকটা স্থানে নালার জল রাস্তা ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। পুকুর-গড়েগুলি পূর্ব হইতেই ভাবিয়াছিল, তাহার উপর কাল রাত্রে জলে এমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে যে, জল-প্রবেশের নালা দিয়া এখন পুকুরের জল বাহির হইয়া আসিতেছে। জগন ডাক্তারের বাড়ির খিড়কি-গড়েটার ধারে জগন দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পুকুর হইতে জল বাহির হইতেছে; ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া মাহিন্দারটাকে নিয়া নালার মুখে বাঁশের তৈরী বার পোঁতাইতেছে। জগনও আজকাল তাহার সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলে না। সে পঞ্চায়েতের মধ্যে নাই, থাকিবার কথাও নয়, ডাক্তার কায়স্থ—নবশাখা সমাজের পঞ্চায়েতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? তবুও গ্রাম্য সমাজে—গ্রামবাসী হিসাবে তাহার মতামত—সহযোগিতা—এ সবের একটা মূল্য আছে; বিশেষ যখন সে ডাক্তার, প্রাচীন প্রতিপত্তিশালী ঘরের ছেলে—তখন বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু ডাক্তার শ্রীহরির নিমন্ত্রিত পঞ্চায়েতের মধ্যে নাই। আবার দেবুর সঙ্গেও সম্বন্ধ সে প্রায় ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারও কামার-বউয়ের কথাটা বিশ্বাস করিয়াছে। নেহাৎ চোখাচোখি হইতে ডাক্তার শুষ্কভাবে বলিল—মাঠে চলেছ?

হাসিল দেবু বলিল—হ্যাঁ। বার পৌতাচ্ছ বুঝি ?

—হ্যাঁ। পোনা আছে, বড় মাছও ক'টা আছে, এবারও পোনা ফেলেছি। তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—আকাশ হা হয়েছে, যে রকম 'আওলি-বাউলি' (এলোমেলো বাতাস) বইছে—তাতেও তো মনে হচ্ছে—বাদলা আবার নামল। এর ওপরে জল হলে—বার পুঁতেও কিছু হবে না।

দেবুও একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—হুঁ।

প্রায় সকল গৃহস্থই, যাহাদের পুকুর-গড়ে আছে—তাহারা সকলেই জগনের মত নালার মুখে বেড়ার আটক দিতে ব্যস্ত। পল্লী-জীবনে, মাঠে—ধান, কলাই, গম, আলু, আখ; বাড়িতে—শাক-পাতা লাউ, কুমড়া; গোয়ালে—গাইয়ের দুধের মত পুকুরের মাছও অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ। বারো মাস তো খায়ই, তাহা ছাড়া কাজ-কর্মে, অতিথি-অভ্যাগত-সমাগমে ঐ মাছই তাহাদের মানরক্ষা করিয়া থাকে। "পেটের বাছা, ঘরের গাছা, পুকুরের মাছা"—পল্লী-গৃহস্থের সৌভাগ্যের লক্ষণ।

সদ্‌গোপ-পাড়া পার হইয়া বাউড়ী ডোম ও মুচিপাড়া। ইহাদের পাড়াটা গ্রামের প্রান্তে এবং অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে। গ্রামের সমস্ত জলই এই পাড়ার ভিতর দিয়া নিকাশ হয়। পল্লীটার ঠিক মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে একটা বালুময় প্রস্তর পথ বা নালা;—সেই পথ বাহিয়া জল গিয়া পড়ে পঞ্চগ্রামের মাঠে। পাড়াটা প্রায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও এক হাঁটু, কোথাও গোড়ালি-ডোবা জল। পাড়ার পুরুষেরা কেহ নাই, সব মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবল বর্ষণে ধানের ক্ষতি তো হইবেই, তাহার উপর জলের তোড়ে আল ভাঙিবে, জমিতে বালি পড়িবে; সেই সব ভাঙনে মাটি দিতে গিয়াছে। মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা হাত-জালি—ঝুলি লইয়া মাছ ধরিতে ব্যস্ত। ছোট ছেলেগুলার উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। কেহ সাঁতার কাটিতেছে—কেহ লাফাইতেছে; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কয়টা ছেলে কাহার একটা কাটা তালগাছে অসার ডগার অংশ জলে ভাসাইয়া নৌকা-বিহারে মত্ত। ইহারই মধ্যে কয়েক জনের ঘরের দেওয়ালও ধ্বসিয়াছে।

দেবুর মন তাহাকে এ পথে টানিয়া আনিয়াছিল—দুর্গার উদ্দেশ্যে। দুর্গাকে দিয়া কামার-বউয়ের সন্ধান লইবার কল্পনা ছিল তাহার। দুর্গাকে কিছু প্রকাশ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় ছিল না। ইঙ্গিতে কতকগুলা কথা জানাইবার এবং জানিবার আছে তাহার। সে সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল—রাত্রির ঘটনাটার ঘুণাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া সে শুধু কামার-বউয়ের মন্ত্রদীক্ষা লওয়ার প্রস্তাব করিবে। বলিবে—দেখ, মানুষের ভাগ্যের

উপর তো মানুষের হাত নাই। ভাগ্যফলকে মানিয়া লইতে হয়। ভগবানের বিধান। মানুষের স্ত্রী-পুত্র যায়, স্ত্রীলোকের স্বামী-পুত্র যায়, থাকে শুধু ধর্ম। তাহাকে মানুষ না ছাড়িলে সে মানুষকে ছাড়ে না। যে মানুষ তাহাকে ধরিয়া থাকে—সে দুঃখের মধ্যেও সুখ না হোক শান্তি পায়; পরকালের গতি হয়, পরজন্মে ভাগ্য হয় প্রসন্ন। তুমি এবার মন্ত্রদীক্ষা লও। তোমাদের গুরুকে সংবাদ দিই, তুমি মন্ত্র লও, সেই মন্ত্র জপ কর; বার কর, ব্রত কর। মনে শান্তি পাইবে।

দুর্গার বাড়িতে আসিয়া সে ডাকিল—দুর্গা!

দুর্গার মা একটা খাটো কাপড় পরিয়া ছিল—তাহাতে মাথায় ঘোমটা দেওয়া যায় না; সে তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া গামছা মাথার উপর চাপাইয়া বলিল—সি তো সেই ভোরে উঠেই চলে যেয়েছে বাবা। কাল রেতে মাথা ধরেছিল; কাল আর কামার-মাগীর ঘরে শুতে যায়নি। উঠেই সেই ভাবী-সাবির লোকের বাড়িই যেয়েছে।

পাতুর বিড়ালীর মত বউটা ঘরের মেঝে হইতে খোলায় করিয়া জল সেচিয়া ফেলিতেছে। চালের ফুটা দিয়া জল পড়িয়া মাটির মেঝেয় গর্ত হইয়া গিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকটা দিয়া গ্রামে ঢুকিল। গ্রামের এই দিকটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। এদিকটায় কখনও জল জমে না, কিন্তু আজ এই দিকটাতেই জল জমিয়া গিয়াছে—পায়ের গোড়ালি ডুবিয়া যায়। ওদিকে রাঙাদিদির ঘরের দেওয়ালের গোড়াটা বেশ ভিজিয়া উঠিয়াছে। কারণটা সে ঠিক বুঝিল না। সে কামার-বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—দুর্গা—দুর্গা রয়েছিস?

কেহ সাড়া দিল না। সে আবার ডাকিল। এবারও কোন সাড়া না পাইয়া সে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। বাড়ির মধ্যেও কাহারও কোন সাড়া নাই। উপরের ঘরের দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করিতেছে। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের একটা কোণে চালের ছিদ্র দিয়া অজস্র ধারায় জল পড়ায় দেওয়ালের একটা কোণ ধসিয়া পড়িয়াছে, কাদায় মাটিতে দাওয়াটা একাকার হইয়া গিয়াছে! সে আরও একবার ডাকিল; এবার ডাকিল—মিতেনী রয়েছ? মিতেনী!

মিতেনী বলিয়াই ডাকিল—হতভাগিনী মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথাও যে সে না-ভাবিয়া, পারে না। এ-দেশের বালবিধবাদের মত কামার-বউ হতভাগিনী। সংযম যে শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের বঞ্চনার দিকটাও যে বড় সকরুণ। যে যুগে দেবু জন্মিয়াছে এবং তাহার জীবনে যে

সংস্কার ও শিক্ষা সে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাতে তাহার কাছে দুইটা দিকই গুরুত্বে প্রায় সমান মনে হয়! বিশেষ করিয়া কিছুদিন আগে সে শরৎচন্দ্রের বইগুলি পড়িয়া শেষ করিয়াছে, তাহার ফলে এই ভাগ্যহতা মেয়েগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পাল্টাইয়া গিয়াছে। কাল রাত্রে সংযমের দিকটাই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তখন সে তাহাকে বিচার করিতে চাহিয়াছিল কঠিন বিচারকের মত প্রাচীন বিধান অনুসারে। আজ এই মুহূর্তে করুণার দিকটা যেমন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে ডাকিল—মিতেনী রয়েছ? মিতেনী!

এ ডাকেও কোন সাড়া মিলিল না। বোধ হয় দুর্গার সঙ্গে মিলিয়া মিতেনী ঘাটের দিকে গিয়াছে গা ধুইতে। সে ফিরিল। পথের জল ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পথের দু-পাশে যাহাদের ঘর—তাহাদের মধ্যে জন-কয়েক আপন আপন দাওয়ায় বসিয়া আছে নিতান্ত বিমর্ষভাবে। অদূরে হরেন ঘোষাল শুধু ইংরেজীতে চিৎকার করিতেছে। প্রথমেই দেখা হইল—হরিশ ও ভবেশখুড়োর সঙ্গে। দেবু প্রশ্ন করিল—আপনাদের পাড়ায় এত জল খুড়ো।

তাহারা কোন কিছু বলিবার পূর্বেই হরেন ঘোষাল তাহাকে ডাকিল—কাম্ হিয়ার, সি, সি—সি উইথ ইয়োর ওন আইজ। দি জমিণ্ডার—শ্রীহরি ঘোষ এস্কোয়ার—মেম্বার অব দি ইউনিয়ন-বোর্ড—হ্যাজ্ ডান—ইট।

দেবু আগাইয়া গেল। দেখিল—নালা দিয়া জল শ্রীহরির পুকুরে ঢুকিবার আশঙ্কায় শ্রীহরি নালায় একটা বাঁধ দিয়াছে। জলের স্রোতকে ঘুরাইয়া দিয়াছে উঁচু পথে। সে পথে জল মরিতেছে না, জমিয়া জমিয়া গোটা পাড়াটাকেই ডুবাইয়া দিয়াছে।

দেবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া ভাবিল। তারপর বলিল—ঘরে কোদাল আছে ঘোষাল?

—কোদাল?—ব্যাপারটা অনুমান করিয়া কিন্তু ঘোষালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—হ্যাঁ, কোদাল—কি টামনা। যাও নিয়ে এস।

বিবর্ণমুখে ঘোষাল বলিল—বাঁধ কাটলে ফৌজদারি হবে না?

—না। যাও নিয়ে এস।

—বাট, দেয়ার ইজ কালু শেখ—হি ইজ এ ডেঞ্জারাস্ ম্যান।

—নিয়ে এস ঘোষাল, নিয়ে এস। না হয় বল—আমি আমার বাড়ি থেকে নিয়ে আসি।—দেবু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দীর্ঘ দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ঘোষাল এবার ঘর হইতে একটা টামনা আনিয়া দেবুর হাতে আগাইয়া দিল। দেবু মাথার ছাতাটা বন্ধ করিয়া ঘোষালের দাওয়ার

উপর ফেলিয়া দিয়া কাপড় সাঁটিয়া টামনা হাতে বাঁধের উপর উটিয়া দাঁড়াইল। চিৎকার করিয়া বলিল—আমাদের বাড়ি-ঘর ডুবে যাচ্ছে। এ বে-আইনী বাঁধ কে দিয়েছে বল—আমি কেটে দিচ্ছি।

শ্রীহরির ফটক হইতে কালু শেখ বাহির হইয়া আসিল। কালুর পিছনে নিজে শ্রীহরি। দেবু টামনা উঠাইয়া বাঁধের উপর কোপ বসাইল—কোপের পর কোপ।

শ্রীহরি হাঁকিয়া বলিল—দিচ্ছে, দিচ্ছে—আমারই লোক কেটে দিচ্ছে। দেবু-খুড়ো, নাম তুমি। আমার পুকুরের মুখে একটা বড় বাঁধ দিয়ে নিলাম—তাই জলটা বন্ধ করেছি। হয়ে গেছে বাঁধ। ওরে যা—যা—কেটে দে, বাঁধ। যা—যা, জল্‌দি যা।

পাঁচ-সাতজন মজুর ছুটিয়া আসিল। এই গ্রামেরই মজুর, দেবুকে আর সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা করে নাই। একজন শ্রদ্ধাভরে বলিল—নেমে দাঁড়ান পণ্ডিতমশায়, আমরা কেটে দি।

ঘোষালের দাওয়ায় টামনাটা রাখিয়া দিয়া দেবু আপনার ছাতাটা তুলিয়া লইয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। শ্রীহরির পাশ দিয়াই যাইবার পথ। শ্রীহরি হাসিমুখে বলিল—খুড়ো।

দেবু দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল।

শ্রীহরি তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—অনিরুদ্ধের বউটার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে না-কি?

দেবুর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—চোখ দুটিতে যেন ছুরির ধার খেলিয়া গেল। তবুও সে আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল—মানে?

—মানে, কাল রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা কি দুটো। বৃষ্টিটা মুষলধারে এসেছে; ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে ছাট আসছিল, গেলাম জানালা বন্ধ করতে। দেখি রাস্তার উপরেই কে দাঁড়িয়ে। ডাকলাম কে? মেয়ে-গলায় উত্তর এল—আমি। কারও কিছু হয়েছে মনে করে তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। দেখি কামার-বউ দাঁড়িয়ে। আমাকে বললে—আপনার ঘরে তো দাসী বাঁদি আছে পাঁচটা—আমাকে একটু ঠাঁই দেবেন আপনার ঘরে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বল দেখি? দেবু খুড়োর কাছে ছিলে, সে তো তোমাকে আদর-যত্ন না করে এমন নয়। সে কথার উত্তর দিলে না, বললে—যদি ঠাঁই না দেন, আমি চলে যাব—যে দিকে দুই চোখ যায়।—কি করব বাবা? বললাম—তা—এস।

শ্রীহরি সগর্বে হাসিতে লাগিল। দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রীহরি আবার বলিল—ভালই হয়েছে বাবা। পেত্নী নেমেছে তোমার ঘাড় থেকে। এখন ঐ মুচি ছুঁড়িটাকে বলে দিয়ো—যেন বাড়ি-টাড়ী না আসে। পঞ্চায়েতকে আমি একরকম করে বুঝিয়ে দোব। একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল। বিয়ে-থাওয়া কর, ভাল কনে দেখে দিচ্ছি!

দেবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্রীহরির সব কথা শুনিতেছিল না, বিস্ময় এবং ক্রোধের উত্তেজনা সংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া সে হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি চললাম।

ষোল

পদ্মর জীবনের নিরুদ্ধ কামনা—যাহা এতদিন শুধু তাহার মনের মধ্যেই আলোড়িত হইত, সেই কামনা অকস্মাৎ তাহারই মনের ছলনায় গোপন দ্বার-পথে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে কামনা আসিল সহস্রমুখী হইয়া। মানুষ যাহা চায়, নারী যাহা চায়; যে পাওনার তাগিদ নারীর প্রতি দেহ-কোষে—প্রতি লোমকূপে—চেতনার প্রতি স্তরে স্পন্দিত হয়—সেই দাবি তাহার। দেহের তৃপ্তি—উদরের তৃপ্তি; স্বামী-সন্তান—অন্ন-বস্ত্র-সম্পদ, ঘর-সংসারের দাবি। একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে শুধু তাহার নিজস্ব করিয়া এইগুলি সে পাইতে চায়। ঐ কামনাগুলিকে কৃচ্ছ্রসাধনের নিগ্রহে নিগৃহীত সে অনেক করিয়াছে। বারব্রত করিয়াছে, উপবাস করিয়াছে; কিন্তু তাহার প্রাণশক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস কিছুতেই দমিত হয় নাই। গোপন মনে অনেক কল্পনা—অনেক সংকল্প মৃত্তিকাতলস্থ বীজাঙ্কুরের মত উপ্ত হইতেছিল, অকস্মাৎ তাহারা সেদিন—জীবনের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রের উপর চাপানো সামাজিক সংস্কারের পাথরখানার একটা ফাটল দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আলোর রেখাকে মানুষ ভাবিয়া সে নিচে নামিয়া আসিয়াছিল। তারপর বাতাসে দরজা নড়িয়া উঠিতে সে তাহার মধ্যে শুনিয়াছিল—কাহার আহ্বানের ইঙ্গিত। দা-খানা হাতে করিয়াই সে দরজা খুলিয়াছিল। দরজার সামনে কেহ ছিল না, কিন্তু তাহার মনে হইয়াছিল—কে যেন সট্ করিয়া সরিয়া গেল। তাহার অনুসন্ধানে সে পথে নামিয়াছিল। সে যত আগাইয়াছিল—মরুভূমির মরীচিকার মত তাহার কল্পনার আগন্তুকও তত সরিয়া সরিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল—ওই শিউলি-তলায়। অদূরে দেবুর ঘরখানা নজরে পড়িবামাত্র তাহার অজ্ঞাতসারেই দা-খানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দেবুর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাহার চেতনা ফিরিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহার জীবনের সযত্ন-পোষিত নিরুদ্ধ কামনা গুহানির্মুক্ত নির্ঝরের মত শতধারায় মাটির বুকে নামিবার উপক্রম করিয়াছে। উথলিত বাসনায় ভয় নাই—সঙ্কোচ নাই; তাহার সর্বাঙ্গে লক্ষ লক্ষ জৈব-দেহকোষে খল খল হাসি উঠিয়াছে, শিরায় শিরায় উঠিয়াছে কলস্বরা গান; অজস্র অপার সুখে সাধে আনন্দে প্রাণ উচ্ছ্বসিত; ঘর-সংসার-সন্তানের মুকুলিত কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। সে দেবুকে বলিল তাহার কথা—যে কথা এতদিন তাহার গোপন মনের আগল্ খুলিয়া ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলে নাই—আভাসে-ইঙ্গিতেও জানায় নাই।

দেবুর নিরাসক্ত নির্মম উপদেশে তাহার চমক ভাঙিল—'চেপে জল আসছে—বাড়ি যাও কামার-বউ!'

নিরুচ্ছ্বসিত নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের অপমানে সে যেন অধীর হইয়া গেল। বাধার আক্রোশে আবর্তময়ী স্রোতধারার মত কূল ভাঙিয়া দেবুকে ছাড়িয়া লাফ দিয়া শ্রীহরির অবজ্ঞাত জীবন-তটের দিকে ছুটিয়া চলিল। বিচার করিল না—শ্রীহরির মরুভূমির মত বিশাল বালুস্তর, সেখানে জলস্রোত কল-কলনাদে ছুটিতে পায় না—বালুস্তরের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একবার ভবিষ্যৎ ভাবিল না, ভালমন্দ বিচার করিল না—পদ্ম সরাসরি শ্রীহরির ঘরে গিয়া উঠিল।

সে গিয়া দাঁড়াইল শ্রীহরির কোঠাঘরের পিছনে। শ্রীহরির কথা সত্য—সে জাগিয়াই ছিল। কিন্তু তখন হইতেই পদ্ম ঘুমাইতেছিল। অঘোরে অবচেতনের মত ঘুমাইতেছিল। দেবুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সহসা তাহার নিদ্রাতুর চেতনার মধ্যে জাগরণের স্পন্দন তুলিল। জাগিয়া উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল—দেবু ও শ্রীহরি মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল; এতক্ষণে উপলব্ধি করিল—সে কোথায়! রাত্রের কথাটা একটা দুঃস্বপ্নের মত ধীরে ধীরে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।—কিন্তু আর উপায় কি?

দুর্গা দেবুর ঘরেই বসিয়াছিল। সে সংবাদ দিতেই আসিয়াছিল যে, কামার-বউ বাড়িতে নাই।

দেবু শুনিয়া সংক্ষেপে বলিল—জানি।

দেবুর মুখ দেখিয়া দুর্গা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবু বলিল—তুই এখন বাড়ি যা দুর্গা, পরে সব বলব।

দুর্গা উঠিল।

দেবু আবার বলিল—না। বস, শোন্‌। তোর যদি অসুবিধে না হয় দুর্গা, তবে তুই আমার বাড়িতেই থাক্ না!

দুর্গা অবাক হইয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।—জামাই-পণ্ডিত এ কি বলিতেছে!

দেবু বলিল—ঘর-দোরগুলোয় ঝাঁট পড়ে না, নিকোনো হয় না; রাখাল ছোঁড়া যা পাজী হয়েছে! তুই এসব কাজকর্মগুলো কর। এখানেই খাবি। মাইনে যদি নিস, তাও দোব!

অকস্মাৎ চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত দুর্গা সচকিত হইয়া উঠিল। বলিল—ঝিয়ের কাজ তো আমি করতে পারি না, জামাই-পণ্ডিত। আমার বাড়িঘর ঝাঁটপাটের জন্যে দাদার বউকে দিন এক সের করে চাল দি।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ঝি, কেন? তুই তো বিলুকে দিদি বলতিস্। আমার শালীর মত থাকবি; মাইনে বলাটা আমার ভুল হয়েছে। হাত-খরচও তো মানুষের দরকার হয়!

দুর্গা তাহার মুখের দিকে মূঢ়ের মত স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দেবু বলিল—পরশু পঞ্চায়েত বসবে দুর্গা, অন্তত এ ক'দিন তুই আমার এখানে থাক্!

দুর্গা এবার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া হাসিয়া ফেলিল। পরম কৌতুক অনুভব করিল সে। পঞ্চায়েতের মজলিশে জামাই-পণ্ডিতের সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া মজার আলোচনা হইবে।

দেবু গম্ভীরভাবেই বলিল—কি বলছিস বল্?

—চাবিটা দাও, ঘর-দোর ঝাঁট দি।—দুর্গা চাবির জন্য হাত বাড়াইল।

দেবু চাবিটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। বলিল—দেখ্, কলসীতে জল আছে কিনা?

—জল! দুর্গা বলিল—সে আমি দেখব কি গো? তুমি দেখ!

দেবু বলল—তুই-ই দেখ। না থাকে নিয়ে আসবি; যতীনবাবু তোকে বলেছিল—মনে আছে? তা ছাড়া তুই আমাকে যে মায়া-ছেদ্দা করিস সে তো কারুর মা-বোনের চেয়ে কম নয়। তোর হাতে আমি জল খাব। জাত আমি মানি না। পঞ্চায়েতের কাছে আমি সে কথা খুলেই বলব।

—না। সে আমি পারব না জামাই-পণ্ডিত! আমার হাতের জল—কঙ্কণার বামুন-কায়েত বাবুরা লুকিয়ে খায়, মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিই, মুখে গ্লাস তুলে ধরি—তারা দিব্যি খায়। সে আমি দি—কিন্তু তোমাকে দিতে

পারব না।—দুর্গার চোখে জল আসিয়াছিল—গোপন করিবার জন্যই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সে ঘুরিয়া দরজার চাবি খুলিতে আরম্ভ করিল।

দেবু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

সম্মুখেই রাস্তার ওপারে সেই শিউলিগাছটা। একা বসিয়া কেবলই মনে হইতেছে গতরাত্রির কথা! ছি—ছি—ছি! পদ্ম একি করলি? কোনমতেই আর সে পদ্মের প্রতি এককণা করুণা করিতে পারিতেছে না।

আকাশের মেঘটা এতক্ষণে কাটিতেছে। এক ঝলক রোদ উঠিল। আবার মেঘে ঢাকিল। আবার মেঘ কাটিয়া রোদ উঠিল। বৃষ্টি ধরিয়াছে।

—পেন্নাম গো পণ্ডিতমশায়।—প্রণাম করিল সতীশ বাউড়ী; সঙ্গে আছে আরও কয়েকজন বাউড়ী মুচি চাষী মজুর। সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, ভিজিয়া ভিজিয়া কাল রঙও ফ্যাকাসে হইয়া উঠিয়াছে, পায়ের পাতার পাশগুলা—আঙুলের ফাঁক—হাতের তেলো—মড়ার হাতের মত সাদা এবং আঙুলের ডগাগুলি চুপসিয়া গিয়াছে।

প্রতিনমস্কার করিয়া দেবু কেবলমাত্র কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিল—জল কেমন?

—ভাসান বইছে মাঠে। ধান-পান সব ডুবে গিয়েছে। গুছি-টুছি খুলে নিয়ে যাবে। বড়ো ক্ষেতি করে দিলে পণ্ডিতমশায়!

পণ্ডিতকে এই দুঃখের কথা কয়টি বলিবার জন্য সতীশের ব্যগ্রতা ছিল। পণ্ডিতমশায়কে না বলিলে তাহার যেন তৃপ্তি হয় না।

দেবু সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আবার দুদিন রোদ পেলেই ধান তাজা হয়ে উঠবে। ভাসান মরে যাক, যেসব জায়গায় গুছি খুলে গিয়েছে—নতুন বীজের 'পরিনে' লাগিয়ে দিও।

সতীশ কিন্তু সান্ত্বনা পাইল না, বলিল—ভেবেছিলাম এবার দুমুঠো হবে। তা—ভাসানের যে রকম গতিক!

—তা হোক। ভাসান মরে যাবে। কতক্ষণ? এবার বর্ষা ভাল। দিনে রোদ রেতে জল—ফসল এবার ভাল হবে; জলও শেষ পর্যন্ত হবে।

—তা বটে। কিন্তু এত জলও যি ভাল নয়।

হঠাৎ দেবুর মনে একটা কথা চকিতের মত খেলিয়া গেল। নদী! ময়ূরাক্ষী! সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—নদী কেমন বল দেখি?

—আজ্ঞে, নদী দু-কানা। তবে ফেনা ভাসছে। ওই দেখেন, ইয়ের ওপর ময়ূরাক্ষী যদি পাথার হয়—বান যদি ঢোকে, তবে তো সব ফরসা হয়ে যাবে।

—বাঁধের অবস্থা কি? দেখেছ?—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু প্রশ্ন করিল।

মাথা চুলকাইয়া সতীশ বলিল—গেল বার বান হয় নাই কি না! উ-বারেও বান হয় নাই!—তারপর নিজেই একটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—বাঁধ আপনার ভালই আছে। তা ছাড়া ইদিকে বাঁধ ভেঙে বান আসবে না। সে হলে পিথিবীই থাকবে না মশায়।—বলিয়া সতীশ একটু পারমার্থিক হাসি হাসিল।

দেবু উত্তর দিল না। বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। নিজ হইতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহারা কোন কাজ করে না—করিবে না।

সতীশ প্রণাম করিয়া বলিল—যাই এখন পণ্ডিতমশায় সেই ভোরবেলা থেকে—বলিতে গিয়া সে হাসিয়া ফেলিল—হাসিয়া বলিল চৌপর রাতই ভিজেছি মশায়। তার ওপর ভোরবেলা থেকে ভাসান ভেঙে—হালুনি লেগে গিয়েছে। বাড়ী যাই। ইয়ের পর একবার পলুই নিয়ে বেরুবে। উঃ—মাছে মাঠ একেবারে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে।

অন্য একজন বলিল—কুসুমপুরের জনাব স্থাখ আপনার কোঁচে গেঁথে একটা সাত সের কাতলা মেরেছে।

আর একজন বলিল—কঙ্কণার বাবুদের লারান (নারায়ণ) দীঘি ভেসেছে।

দেবু উঠিয়া পড়িল।

পদ্মের এই অতি শোচনীয় পরিণতিতে সে একটা নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়াছে। তাহার নিজের শিক্ষা-সংস্কার-জ্ঞান-বুদ্ধি-মত অপরাধ ষোল আনা পদ্মেরই, সে নিজে নির্দোষ। সে তাহাকে স্নেহ করিয়াছে—আপনার বিধবা ভ্রাতৃবধুর মত সসম্মানে তাহার অন্নবস্ত্রের ভার সাধ্যমত বহন করিয়াছে। গতরাত্রে সে যেভাবে আপনাকে সংযত রাখিয়া অতি মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে—তাহাতে অন্যায় কোথায়? মিথ্যা অপবাদ দিয়া শ্রীহরি পদ্মের জন্যই সমাজকে ঘুষ দিয়া তাহাকে পতিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাও সে গ্রাহ্য করে নাই; নির্ভয়ে পঞ্চায়েতের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার দোষটা কোন্‌খানে?

তবুও কিন্তু মন মানিতেছে না! মানুষের ভগ্নী বা কন্যার এমন পরিণামের জন্য গভীর বেদনা-দুঃখ-লজ্জার সঙ্গে থাকে যে নিরুপায় অক্ষমতার অপরাধ-বোধ, পদ্মের জন্য দুঃখ-বেদনা-লজ্জার সঙ্গে সেই অক্ষমতার অপরাধ-বোধও অনাবিষ্কৃত ব্যাধির পীড়নের মত তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। দুঃখ-বেদনা-লজ্জা—সবই ওই অক্ষমতার অপরাধ-বোধের বিভিন্ন রূপান্তর। তাহার মন—শত যুক্তিতর্কসম্মত নির্দোষিতা সত্ত্বেও সেই পীড়নে পীড়িত হইতেছিল। দুর্গাকে বাড়িতে থাকিতে বলিয়া—তাহার হাতে জল খাইতে

চাহিয়া বিদ্রোহের উত্তেজনায় মনকে উত্তেজিত করিয়াও সে ওই দুঃখ-বেদনা হইতে মুক্তি পাইল না। উপস্থিত বন্যারোধী বাঁধের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া দেবু বাঁধ দেখিতে বাহির হইয়া পড়িল—সে কেবল ওই আত্মপীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। দুর্গাকে ডাকিয়া বলিল—দুর্গা, আমি এসে রান্না চড়াব। তুই বাড়ি-টাড়ি যাস্ তো একবার ঘুরে আয় ততক্ষণ।

বিস্মিত হইয়া দুর্গা বলিল—কোথা যাবে এখন? পিথিমীতে আবার কার কোথা দুঃখু ঘটল?

গম্ভীরভাবে দেবু বলিল—ময়ূরাক্ষীতে বান বাড়ছে। বাঁধটা একবার দেখে আসি।

দুর্গা অবাক হইয়া গালে হাত দিল।

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি?

—কি? "কাঁদি-কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আশ্মি মিটেছে, রাজাদের হাতী মরেছে, একবার তার গলা ধরে কেঁদে আসি"—সেই বিত্তান্ত। আচ্ছা, বাঁধ ভেঙে বান কোন কালে ঢুকছে শুনি?

—বকিস্ নে। আমি আসি—দেবু ছাতাটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

দুর্গা মিথ্যা কথা বলে নাই। প্রকাণ্ড চওড়া বাঁধের দুই পাশে ঘন শরবনের শিকড়ের জালের জটিল বাঁধনে মাটি একেবারে জমিয়া এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দশ-বিশ বৎসর অন্তর হড়পা-বান আসে—বা খুব প্রবল বান হয়, তখন অবশ্য একটু-আধটু বাঁধ ভাঙে; পরে সেখানে মাটি ফেলিয়া মেরামত করা হয়। কিন্তু বর্ষার আগে হইতে কোথাও বাঁধ দুর্বল হইয়া আছে—এ ভাবনা কেহ ভাবে না।

আগে কিন্তু ভাবিত। এই বাঁধ-রক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল।

দেবু মনে মনে সেই কথাগুলিকেই খুব বড় করিয়া তুলিল। ওই বাঁধের ভাবনাকেই একমাত্র ভাবনার কথা করিয়া তুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

অর্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত এই পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠখানার প্রান্তে ধনুকের ছিলার মত বহিয়া গিয়াছে পাহাড়িয়া নদী ময়ূরাক্ষী। পাহাড়িয়া মেয়ের মতই প্রকৃতি। সাধারণতঃ বেশ থাকে। জল বাড়ে কমে। কিন্তু বন্য প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের মত বন্যা আসে অকস্মাৎ হু-হু করিয়া—আবার তেমনি দ্রুতবেগেই কমিয়া যায়। তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না। পঞ্চগ্রামের মাঠের

প্রান্তে বন্যারোধী বাঁধ আছে—তাহাতেই বন্যাবেগ প্রতিহত হয়। বাঁধটি মাত্র পঞ্চগ্রামের সীমাতেই আবদ্ধ নয়; নদী-কূলের বহুদূর পঞ্চগ্রামের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কবে কে এই বাঁধ বাঁধিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। লোকে বলে 'পাঁচের জাঙাল' বা পঞ্চজনের জাঙাল। লোকে ব্যাখ্যা করিয়া বলে—পঞ্চজন মানে পঞ্চপাণ্ডব। মা কুন্তীকে লইয়া যখন তাহারা আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছিল—তখন এ অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর বন্যা আসিয়াছে, দেশ ঘাট ভাসিয়া গিয়াছে, ধান ডুবিয়াছে, ঘর ভাঙিয়াছে, দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশার আর সীমা নাই। রাজার মেয়ে রাজার রানী, পঞ্চপাণ্ডব-জননীর চোখে জল আসিল লোকের এই দুর্দশা দেখিয়া। ছেলেরা বলিল—কাঁদ কেন মা? মা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন লোকের দুর্দশা। যুধিষ্ঠির বলিল—এর জন্য কাঁদ কেন? তোমার চোখে যেখানে জল আসিয়াছে, সেখানে কি লোকের দুর্দশা থাকে, না থাকিতে পারে? এমন প্রতিকার আমরা করিতেছি, যাহাতে আর কখনও বন্যায় এ অঞ্চলের লোকের ক্ষতি না হয়। বলিয়াই পাঁচ ভাই বাঁধ বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। বাঁধ বাঁধা হইল। পঞ্চপাণ্ডব চাষীদের ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—দেখ বাপু, বাঁধ বাঁধিয়া দিলাম। রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের রহিল। প্রতিবৎসর বর্ষার প্রারম্ভে রথযাত্রা, অম্বুবাচী, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি হল-কর্ষণের নিষিদ্ধ দিনগুলিতে প্রত্যেকে কোদাল ঝুড়ি লইয়া আসিবে—আপন আপন গ্রামের সীমানার বাঁধে প্রত্যেকে পাঁচ ঝুড়ি করিয়া মাটি দিয়া যাইবে; তিন দিনে, তিন-পাঁচ পনের ঝুড়ি মাটি দিবে।

সেইপ্রথাই প্রচলিত ছিল আবহমানকাল যখন হইতে জমিদার হইল গ্রামের সর্বময় কর্তা—হাসিল-পতিত-খাল-বিল-খানা-খন্দ, ঘাসকর, বনকর, জলকর, ফলকর, পাতামহল, লতামহল, এমন কি উর্ধ্ব-অধঃ-দরবস্ত হক-হুকুমের মালিক—তখন হইতেই বাঁধ হইয়াছে জমিদারের খাস সম্পত্তি; জমিদারের বিনা হুকুমে কাহারও বাঁধের গায়ে মাটি দিবার বা কাটিবার অধিকার রহিল না। যখন এ প্রথা উঠিয়া গেল, তখন জমিদার বেগার ধরিয়া বাঁধ মেরামত করাইতেন। হাল আমলে বাঁধ ভাঙিলে সেই রেওয়াজ অনুযায়ী বাঁধ বাঁধিবার খরচের কতক দেয় জমিদার, কতক দেয় প্রজা। বৎসরে বাঁধে মাটি দেওয়ার দায়িত্ববোধ লোকের চলিয়া গিয়াছে। বাঁধ ভাঙিলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত যাইবে, তদন্ত হইতে, এষ্টিমেট হইবে—জমিদার প্রজাকে নোটিস্ হইবে, তারপর ধীরে-সুস্থে বাঁধ মেরামত হইতে থাকিবে।

বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ জলে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। দেবু ঠাহর করিয়া

আল-পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। রাত্রে আকাশে যে ঘনঘটা জমিয়াছিল—সে ঘনঘটা এখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। প্রথম রৌদ্র উঠিয়াছে। রৌদ্রের ছটা জলে পড়িয়া বিস্তীর্ণ মাঠখানা আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ধানের চারাগুলি বড় দেখা যায় না।

জল কোথাও এক-হাঁটু—কোথাও এক-কোমর। বর্ষার জল নিকাশের যে দুইটা নালা আছে সেখানে জল এক-বুক স্রোতও প্রচণ্ড। বাকী মাঠের মধ্যে জলস্রোত মন্থর, প্রায় স্থির রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; মধ্যে মধ্যে সেই মন্থর জলস্রোত চিরিয়া একটি রেখা অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই রেখার পিছনে পিছনে লোক ছুটিয়াছে—হাতে পলুই অথবা কোঁচ। ওগুলি মাছ, বড় মাছ। মাঠে মৎস্য-সন্ধানী লোক অনেক। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ।

দেবু সমস্ত মাঠটা অতিক্রম করিয়া বাঁধের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল; মনে পড়িয়া গেল, যেখানটায় সে উঠিবে, ওপাশে তাহারই নিচে ময়ূরাক্ষীর চরভূমির উপর শ্মশান; তাহার বিলু ও খোকার চিতা। বিলু আজ থাকিলে ঠিক এমনটা হইত না। পদ্মের এ পরিণাম হইতে পারিত না। যে মন্ত্র সে জানে না—সে মন্ত্র তাহার বিলু জানিত। বিলু থাকিলে, কামার-বউকে দেবু নিজের বাড়িতেই রাখিতে পারিত। বিলু হাসিমুখে তাহার কোলে খোকাকে তুলিয়া দিত। সকাল-সন্ধ্যায় তাহার কানে মন্ত্র দিত। সকালে দুর্গানাম স্মরণ করিতে শিখাইত—"সকালে উঠিয়া যে বা দুর্গানাম স্মরে, সূর্যোদয়ে তার সব পাপ-তাপ হরে।" শিখাইত কৃষ্ণের শতনাম। শিখাইত পুণ্যশ্লোক নাম স্মরণ করিতে, পুণ্যশ্লোক নলরাজা, পুণ্যশ্লোক ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, পুণ্যশ্লোক জনার্দন নারায়ণ সর্বপুণ্যের আধার। সন্ধ্যায় গল্প বলিত, পরে সতীর গল্প, সীতার গল্প, সাবিত্রীর গল্প। কামার-বউয়ের সব ক্ষুধা, সব ক্ষোভ, সব লোলুপতার নিবৃত্তি হইত।

সে বাঁধের উপরে উঠিল। শরবনে—উতলা বাতাসে সর্‌-সর্‌-সন্‌-সন্ শব্দ উঠিয়াছে। তাহারই সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে একটা একটানা ক্ষীণ গোঙানির শব্দ। নদীর ডাক। নদীর বুকে ডাক উঠিয়াছে। এ ডাক তো ভাল নয়! ওপাশের ঘন শরবনের আড়াল ঠেলিয়া দেবু নদীর বুকের দিকে চাহিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। এ যে ময়ূরাক্ষী ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, ভয়ঙ্কর বেশে সাজিয়াছে! এপারে বাঁধের কোল হইতে ওপারে জংশনের কিনারা পর্যন্ত ভাসিয়া উঠিয়াছে। জলের রঙ গাঢ় গিরিমাটির মত। দুই তটভূমির মধ্যে ময়ূরাক্ষী কুটিল আবর্তে পাক্ খাইয়া—তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। গেরুয়া রঙের জলস্রোতের বুক ভরিয়া ভাসিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা। পশ্চিম

হতেই পূর্বদিকে যতদূর দেখা যায়—ততদূর শুধুই ফেনা। তাহার উপর ময়ূরাক্ষীর বুকে জাগিয়াছে ডাক, ওই অস্ফুট গোঙানি। দেবু বন্যার কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া বাঁধের বুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল—শরবনের গায়ে জমাট বাঁহিয়া রহিয়াছে পিঁপড়ে এবং পোকার পুঞ্জ; বড় বড় গাছগুলির কাণ্ড বাহিয়া লক্ষ লক্ষ পঙ্গ উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—মাত্র পায়ের পাতাটা ডুবিয়া ছিল—ইহারই মধ্যে জল প্রায় গোড়ালির কাছ পর্যন্ত উঠিয়াছে। দেবু আবার বাঁধের উপর উঠিল। বাঁধটার অবস্থা দেখিতে সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ময়ূরাক্ষীতে এখন যে বন্যা, সে বন্যায় বেশী আশঙ্কার কারণ নাই। বর্ষায় নদীর বন্যা স্বাভাবিক। তবে এটা ভাদ্র মাস; ভাদ্রে বন্যা হইলে মড়ক হয়। ডাকপুরুষের কথায় আছে—"চৈত্রে কুয়া ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।" ভাদ্রের বন্যায় ফল পচিয়া অজন্মা হয়, গরীব গুণায় না-খাইয়া মরে। আর হয় বন্যার পরেই সংক্রামক ব্যাধি—যত জ্বর-জ্বালা—কাল ম্যালেরিয়া। ছোট খাটো বন্যার ফলও কম অনিষ্টকর নহে। কিন্তু দেবু আজ যে বন্যার কথা ভাবিতেছে—সে বন্যা ভীষণ ভয়ঙ্কর। হড়পা-বান, কেহ কেহ বলে ঘোড়া বান। হড়্ হড়্ শব্দে, উন্মত্ত হ্রেষাধ্বনি তুলিয়া প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান একপাল বন্য ঘোড়ার মতই এ বান ছুটিয়া আসে। কয়েক ফিট উঁচু হইয়া এক বিপুল উন্মত্ত জলরাশি আবর্তিত হইতে হইতে দুই কূল আকস্মিকভাবে ভাসাইয়া, ভাঙিয়া, দুই পাশের প্রান্তর, গ্রাম, ক্ষেত খামার, বাগান, পুকুর তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সেই হড়পা-বান বা ঘোড়া-বান আসিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ময়ূরাক্ষীতে অবশ্য এ বন্যা একেবারে নূতন নয়। পাহাড়িয়া নদীতে কচিৎ কখনও এ ধারায় বন্যা আসে। যে পাহাড়ে নদীর উদ্ভব, সেখানে আকস্মিক প্রবল প্রচণ্ড বর্ষণ হইলে সেই জল পাহাড়ের ঢালুপথে বিপুল বেগ সঞ্চয় করিয়া এমনিভাবে নিম্নভূমিতে ছুটিয়া আসে। ময়ূরাক্ষীতেই ইহার পূর্বে আসিয়াছে।

একবার বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। সে বন্যার স্মৃতি আজও লোকে ভুলিয়া যায় নাই। নবীনেরা, যাহারা দেখে নাই, তাহারা সে বন্যার বিরাট বিক্রমচিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠে। দেখুড়িয়ার নিচেই মাইলখানেক পূর্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ঘুরিয়াছে। সেই বাঁকের উপর বপুল-বিস্তার বালুস্তূপ এখনও ধূ ধূ করিতেছে। একটা প্রকাণ্ড আমবাগান

দেখা যায়—ওই বন্যার পর হইতে এখন বাগানটার নাম হইয়াছে গলা-পোঁতার বাগান; বাগানটার প্রাচীন আমগাছগুলির শাখা—প্রশাখার বিশাল মাথার দিক্‌টাই শুধু জাগিয়া আছে বালুস্তূপের উপর। সেই বন্যায় ময়ূরাক্ষী বালি আনিয়া গাছটার কাণ্ড ঢাকিয়া আকণ্ঠ পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছে। বাগানটার পরই 'মহিষডহরে'র বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি; এখনও বালিয়াড়ির উপর ঘাস জন্মে নাই। 'মহিষডহর' ছিল তৃণশ্যামল চরভূমির উপর একখানি ছোট গোয়ালার গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর উর্বর চরভূমির সতেজ সরস ঘাসের কল্যাণে গোয়ালাদের প্রত্যেকেই পুষিত মহিষের পাল। 'মহিষডহর' গ্রামখানা সেই বন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর দুকূলভরা বন্যায় গোয়ালার ছেলেদের পিঠে লইয়া যে মহিষগুলা এপার ওপার করিত, সেবারের সেই হড়পা-বানে মহিষগুলা পর্যন্ত নিতান্ত অসহায়ভাবে কোনরূপে নাক জাগাইয়া থাকিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল।

এবার কি আবার সেই বন্যা আসিতেছে? শিবকালীপুরের সম্মুখে বাঁধের গায়ে বান বাঁধের বুক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। পিঁপড়েগুলা চাপ বাধিয়া গাছের উপরে উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মুখে তাহাদের লক্ষ লক্ষ ডিম। শুধু পিঁপড়েই নয়, লাখে-লাখে কত বিচিত্র পোকা। বাঁধের গায়ে ছিল উহাদের বাসা। বন্যা আসিবার আগেই ইহারা কেমন বুঝিতে পারে। বৃষ্টি আসন্ন হইলে উহারা যেমন নিম্নভূমির বাসা ছাড়িয়া উঁচু জায়গায় উঠিয়া আসে, বন্যা আসিবার পূর্বেও তেমনি করিয়া উহারা বুঝিতে পারে এবং উপরে উঠিয়া আসে। সাধারণতঃ বাঁধের মাথায় গিয়া আশ্রয় লয়। এবার উহারা গাছের উপরে আশ্রয় লইতেছে। আরও আশ্চর্য—পিঁপড়েরা ডিম লইয়া উপরে উঠিলেই অন্য পিঁপড়ের দল তাহাদের আক্রমণ করে; ডিম কাড়িয়া লয়; এবার সে রকম যুদ্ধ পর্যন্ত নাই; এতটা পথ আসিতে সে মাত্র দুইটা স্থানে এ যুদ্ধ দেখিয়াছে। এখানে যাহারা আক্রমণ করিয়াছে—তাহারা গাছেই থাকে, বিষাক্ত হিংস্র কাঠ-পিঁপড়ের দল। যাহারা নিচে হইতে উপরে উঠিয়াছে—তাহারা যেন অতিমাত্রায় বিপন্ন। বন্যার জলে ভাসমান চালায় মানুষ ও সাপ যেমন নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে, উহাদের তেমনি নির্জীব অবস্থা।

বাঁধের অবস্থাও ভাল নয়। দীর্ঘকাল কেহ লক্ষ্য করে নাই। বাঁধের গায়ে অজস্র ছোট গর্ত দিয়া জল ঢুকিতেছে। ইঁদুরে গর্ত করিয়াছে। এ গর্ত রোধ করিবার উপায় নাই। সর্বনাশা জাত। শস্যের আপদ—ঘরের আপদ, পৃথিবীর কোন উপকারই করে না। বাঁধের ভিতরটা মনে হয় সুড়ঙ্গ কাটিয়া ফোঁপরা

করিয়া দিয়াছে। বাঁধটা প্রকাণ্ড চওড়া এবং ওই শরবনের শিকড়ের জালের বাঁধনে বাঁধা বলিয়া সাধারণ বন্যায় কিছু হয় না! কিন্তু প্রমত্ত স্রোতের মুখে যে ডাক জাগিয়াছে—সে যদি তাহার মনের ভ্রম না হয়—তবে ময়ূরাক্ষীর বুকের মধ্যে হইতে ঘুমন্ত রাক্ষসী জাগিয়া উঠিবে। এবার ঘোড়া বানই, আসবে। সে বন্যার মুখে এই সংস্কার-বঞ্চিত প্রাচীন বাঁধ কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

আবার আকাশে মেঘ করিয়া আসিল।

বাতাস বাড়িতেছে; ফিন-ফিনে ধারায় বৃষ্টি নামিল। বাতাসের বেগে ফিন-ফিনে বৃষ্টি কুয়াশার-পুঞ্জের মত ভাসিয়া যাইতেছে। এ বাদলা সহজে ছাড়িবে বলিয়া মনে হয় না! দুর্ভাগ্য—এ শুধু তাহাদেরই দুর্ভাগ্য। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তৈয়ারী-করা বুকের রক্ত-সেচা—মাঠ-ভরা ধান পচিয়া যাইবে, গ্রাম ভাসিয়া যাইবে, ঘর-দুয়ার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে, সমগ্র দেশটায় হাহাকার উঠিবে। মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত—; সহসা তাহার একটা কথা মনে হইল,—লোকে বলে সেকালের লোক পুণ্যাত্মা ছিল। কিন্তু সেকালেও তো এমনি ভাবে এই হাড়পা-বান আসিত! এমনি ভাবেই শস্য পচিত, ঘর ভাঙিত! লোকে হাহাকার করিত!···ভাবিতে ভাবিতে মহাগ্রামের সীমানা পার হইয়া সে দেখুড়িয়ার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাঁধের উপর দুটি লোক দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় ছাতা নাই, সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। একজনের হাতে একটা লাঠির মত একটা-কিছু, অন্য জনের হাতে একটা কি—বেশ ঠাওর করা গেল না। কুয়াশা-পুঞ্জের মত বৃষ্টিধারার মধ্যে তাহাদের স্পষ্ট পরিচিতিকে ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেবু চিনিল—একজন তিনকড়ি, অন্যজন রাম ভল্লা, তিনকড়ির হাতে কোঁচ, রামের হাতে পলুই। তাহারা বাহির হইয়াছে মাছের সন্ধানে।

দেবু আসিয়া বলিল—মাছ ধরতে বেরিয়েছেন?

নদীর দিকে অখণ্ড মনোযোগের সহিত চাহিয়া তিনকড়ি দাঁড়াইয়াছিল; দৃষ্টি না-ফিরাইয়া সে বলিল—বেরিয়েছিলাম। নদীর কাছ বারবার এসেই যেন কানে গেল গোঁ গোঁ শব্দ। নদী ডাকছে।

রাম বলিল—পর পর তিনটে লাঠি পুঁতে দিলাম, দুটো ডুবেছে, ওই দেখেন—শেষটার গোড়াতে উঠেছে বান। গতিক ভাল লয় পণ্ডিতমশায়।

দেবু বলিল—আমিও সেই কথা ভাবছি। ডাক আমিও শুনেছি। ভাবছিলাম আমার মনের ভুল।

—উঁহু। ভুল নয়? ঠিক শুনেছ তুমি!

—বাঁধের অবস্থা দেখেছেন? ইঁদুরে কোঁপরা করে দিয়েছে!—

রাম বলিল—ওতে—কিছু হবে না। ভয় আপনার কুসুমপুরের মাথায়—কঙ্কণার গায়ে বাঁধ ফেটে আছে।

—ফেটে আছে?

—একেবারে ইমাথা-উমাথা ফাটল। সেই যে শিমুলগাছটা ছিল—বাবুরা কেটে নিয়েছে, তখুনি ফেটেছে। পাহাড়ের মত গাছটা বাঁধের ওপরেই পড়েছিল তো, তার ওপর এইবার শেকড়গুলা পচেছে। লোকে কাঠ করতে শেকড় বার করে নিয়েছে। ভয় সেই জায়গায়; সেখানটা মেরামত না করলে, ও মাটি ময়ূরাক্ষী তো ভুয়োর মতন চেটে মেরে দেবে।

দেবু বলিল—যাবেন তিনু-কাকা?

তিনু তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত, সে যেন এতক্ষণ বল পাইতেছিল না। লোকে তাহাকে বলে 'হেপো'। হই-হই করা নাকি তাহার অভ্যাস। রামাও সেই কথা বলিয়াছে, কথাটা তাহাদের মধ্যে আগেই হইয়াছে। তিনকড়ি তখনই যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু রামা বলিয়াছিল—যাবা তো! যেতে বলছ—যাচ্ছি—চল। কিন্তুক—যেয়ে করবা কি শুনি? কেউ আসবে বাঁধ বাধতে?

—আসবে না?

—তুমি যেমন, আসবে! তার চেয়ে লোকে খপর পেলে ঘর-দুয়ার সামলাবে, ঘরে মাচান বাঁধবে। চুপ করে বসে থাক। চল বরং নিজেদের ঘর সামলাই গিয়ে, মাচান বেঁধে রাখি। হরি করে—রাতারাতি বান আসে—সব শালাকে ভাসিয়ে লিয়ে যায়!

তিনকড়ি তাহাতে গররাজি নয়! উৎফুল্ল হইয়া বলিল—মন্দ বলিস নাই রামা, ঠিকই বলেছিস! সেই হলেই শুয়োরের বাচ্চাদের ভাল হয়। শুয়োরের বাচ্চা, সব শুয়োরের বাচ্চা। ঘুরে-ফিরে পেট ভরণের জন্যে হুড়মুড় করে সব শালা সেই ছিড়ে পালের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ল!

দেবু তাগিদ দিল—চলুন কাকা, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দেখুড়িয়ার সীমানার পর মহাগ্রাম তারপর শিবকালীপুর, তারপর কুসুমপুর। গোটা কুসুমপুর সীমানাটা পার হইয়া কঙ্কণার সীমানার সঙ্গে সংযোগ স্থলে বাঁধের গায়ে বেশ একটি ফাটল দেখা গিয়েছে। পূর্বে এখানে ছিল প্রকাণ্ড একটা শিমূলগাছ। সে-কালে দেবু যখন ইস্কুলে পড়িত তখন গাছটাকে দেখিলেই মনে পড়িত—"অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু।"···গাছটায় অসংখ্য বনটিয়ার বাস ছিল। দেবুর বয়স তো অল্প, এমন

কি তিনকড়ি এবং রামও বাল্যকালে এই গাছে উঠিয়া বনটিয়ার বাচ্চা পাড়িয়াছে।

শিমুলের তক্তা ওজনে খুব হাল্কা এবং তক্তাগুলিকে যথেষ্ট পাতলা করিয়া চিরিলেও ফাটে না ; সেই হিসাবে পালকী তৈয়ারীর পক্ষে শিমুল-তক্তাই প্রশস্ত। কঙ্কণার বাবুদের জমিদারী অনেক—দুর্গম পল্লীগ্রাম অঞ্চলেও বিস্তৃত। এই বিংশ-শতাব্দীর উনত্রিংশ বৎসর চলিয়া গেল, এখন সব গ্রামে গরুর গাড়ী যাইবারও পথ নাই। পূর্বকালে বরং পথ ছিল, কাঁচা মেঠো পথ ; মাঠের মধ্য দিয়া একখানা গাড়ী যাইবার মত রাস্তা। বর্ষায় কাদা হইত, শীতে কাদা শুকাইয়া গাড়ীর চাকায় গরুর খুরে গুঁড়া হইয়া ধূলা উড়িত—নামই ছিল গো-পথ। ওই পথে মাঠ হইতে ধান আসিত, গ্রামান্তরে যাওয়া চলিত। পঞ্চায়েৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কিন্তু জমিদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—গো-চরের পতিতভূমির সঙ্গে গো-পথও প্রজাবিলি করিয়াছে। ভূমিলোভী চাষীরাও অনেক ক্ষেত্রে আপন জমির পাশে যেখানে গো-পথ হইয়াছে সেখানে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজকাল ইউনিয়ন-বোর্ড পাকা রাস্তা লইয়া ব্যস্ত, এদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশও নাই। কাজেই এই মোটর-ঘোড়া-গাড়ীর যুগেও জমিদারের পালকির প্রয়োজন আছে ; সেই পালকির জন্যই শিমুলগাছটা কাটা।

দীর্ঘকালের সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বনস্পতি যখন মাটিতে পড়িল, তখন তাহারই বত্রিশ নাড়ীর টানে—মাটির বাঁধটার উপরেই খানিকটা ফাটিয়া বসিয়া গেল। সেই তখন হইতেই বাঁধটার এইখানটায় ফাট ধরিয়া আছে। উপরের অর্ধাংশে ফাটল, নিচেটা ঠিকই আছে। বন্যা সচরাচর বাঁধের উপরের দিকে উঠে না। তাই-ওদিকে কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। এবার বন্যা হু-হু করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। দেবু, তিনকড়ি ও রাম তিনজনে ফাটল-জীর্ণ বাঁধটাকে দেখিয়া একবার পরস্পরের দিকে চাহিল। তিনজনের দৃষ্টিতেই নীরব শঙ্কিত প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনকড়ি বলিল—এ তো দু-চারজনের কাজ নয় বাবা!

রাম হাসিয়া বলিল—বান যে রকম বাড়ছে, তাতে লোক ডাকতে ডাকতেই বাঁধ বেসজ্জনের মা কালীর মত 'কেতিয়ে' পড়বে।

তিনকড়ি গাল দিয়া উঠিল—হারামজাদা, হাসতে তোর লজ্জা লাগে না?

রাম প্রবলতর কৌতুক অনুভব করিল, সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার ঘর বলিতে একখানা কুড়ে ; সম্পদ বলিতে কয়েকখানা থালা-কাঁসা একটা টিনের পেঁটরা, কয়েকখানা কাঁথা, একটা হুঁকো আর কয়েকখানা লাঠি ও সড়কী। নিজে সে এই প্রৌঢ় বয়সেও ভীমের মত শক্তিশালী,

সাঁতারে সে কুমির ; তাহার শঙ্কাও কিছু নাই—গ্রাম্য গৃহস্থদের উপরেও মমতা কিছু নাই। তাহারা তাহাকে ভয় করে, ঘৃণা করে, নির্যাতনে সাহায্য করে—বি-এল কেসে সাক্ষ্য দেয় ; তাই তাহাদের চরমতম দুর্দশা হইলেও সে ফিরিয়া চায় না। তাহাদের দুর্দশায় রামের মহা-আনন্দ। সে হাসিয়া সারা হইল।

দেবু ফাটল-ভরা বাঁধটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল।

দুরন্ত প্লাবনে পঞ্চগ্রাম ভাসিয়া যাইবে। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল দুর্দশা-গ্রস্ত অঞ্চলটার ছবি। রাক্ষসী ময়ূরাক্ষী যুগে যুগে এমনি করিয়া পঞ্চগ্রামের শস্য সম্পদ, ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু সেকালে মানুষের অবস্থা ছিল আলাদা। মানুষের দেহে ছিল অসুরের মত শক্তি। সেকালের চাষীর হাতে থাকিত সাত আট সের ওজনের কোদালি, গ্রামের মধ্যে ছিল একতা। ময়ূরাক্ষী বাঁধ ভাঙিয়া সব ভাসাইয়া দিয়া যাইত, শক্তিশালী চাষীরা আবার বাঁধ বাঁধিত ; জমির বালি ঠেলিয়া ফেলিত। সেকালের বলদগুলাও ছিল ওই চাষীদের মত সবল—সেই বলদে হাল জুড়িয়া আবার জমি চষিত, পর বৎসরেই পাইত অফুরন্ত ফসল। আবার ঘর-দুয়ার হইত, নূতন সুন্দরতর ঘর গড়িত মানুষ। গ্রামগুলি নূতন সাজে সাজিয়া গড়িয়া উঠিত, সংসারে বৃদ্ধা গিন্নীর অন্তর্ধানের পর নূতন গিন্নীর হাতে-সাজানো সংসারের মত চেহারা হইত গ্রামের। কিন্তু এ কাল আলাদা। অনাহারে চাষীর দেহে শক্তি নাই, গরুগুলাও না খাইয়া শীর্ণ দুর্বল। এখন জমিতে বালি পড়িলে মাঠের বালি মাঠেই থাকিবে, ক্ষেত হইবে বালিয়াড়ি ; ভাঙা ঘর মেরামত করিয়া কুড়ে হইবে, মানুষ মরিবার দিনের দিকে চাহিয়া কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিবে, এই পর্যন্ত। এই বিপদের মুখে ডাক দিলে তবু মানুষ আসিবে, কিন্তু বিপদ ঘটিয়া গেলে—তারপর বাঁধ বাঁধিতে আর কেহ আসিবে না। মানুষের একতার বোঁটা কোথায় কে কাটিয়া দিয়াছে—আর বাঁধা যায় না! তবু এই সময়—এই সময় ডাক দিলে, মানুষ আসিলেও আসিতে পারে।

সে বলিল—তিনু-কাকা, লোক যোগাড় করতেই হবে। আপনি দেখুড়ে আর মহাগ্রাম যান। আমি কুসুমপুর আর শিবকালীপুরে যাই।

তিনু বলিল—রমা, তোর নাগরা নিয়ে এসে পেট্।

রাম বলিল—মিছে—নাগরা পিটিয়ে আমার হাত বেথা করাবে মোড়ল। কেউ আসবে না।

তিনু বলিল—তুই সব জানিস্। ভল্লারাও আসবে না?

রাম বলিল—দেখো। আমাদের গাঁয়ের ভল্লাদের কথা ছাড় ; তারা আসবে। কিন্তুক আর এক মামুও আসবে না—তুমি দেখো।

সতের

রামের কথাই সত্য হইল। অবস্থাপন্ন চাষী কেহ আসিল না, আসিল শুধু দরিদ্রের দল। আর মাত্র দু-একজন। তাহাদের মধ্যে প্রধান ইরসাদ।

দেবু কুসুমপুরে ছুটিয়া গিয়াছিল। ইরসাদ বাড়ি হইতে বাহির হইতেছিল। কাল অমাবস্যা,- রমজান মাসের শেষদিন, পরশু হইতে শওয়াল মাসের আরম্ভ। শওয়ালের চাঁদ দেখিয়া ঈদ মোবরক ঈদল-ফেতর পর্ব। রোজার উপবাস-ব্রতের উদ্‌যাপন। এ পর্বে নূতন পোশাক চাই, সুগন্ধি চাই, মিষ্টান্ন চাই। জংশনের বাজারে যাইবার জন্য সে বাহির হইতেছিল। দেবু ছুটিয়া গিয়া পড়িল। বাজার করা স্থগিত রাখিয়া ইরসাদ দেবুর সঙ্গে বাহির হইল। গ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী মুসলমানেরা কেহই প্রায় বাড়িতে নাই। সকলেই গিয়েছে জংশনের বাজারে। ওই বাঁধের উপর দিয়াই গিয়াছে, বন্যার অবস্থা দেখিয়া চিন্তাও তাহাদের হইয়াছে, কিন্তু আসন্ন উৎসবের কল্পনায় আচ্ছন্ন চিন্তাটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। ইরসাদ দুয়ারে দুয়ারে ফিরিল। গরীবেরা বাড়িতে ছিল, টাকা পয়সার অভাবে তাহাদের বাজারে যাওয়া হয় নাই; তাহারা সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

ওদিকে বাঁধের উপর বসিয়া রাম নাগরা পিটিতেছে—দুম্—দুম্—দুম্—

শিবকালীপুর হইতে বাহির হইয়া আসিল—সতীশ, পাতু ও তাহাদের দলবল। চাষীরা কেহ আসে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীহরির ওখানে নাকি মজলিশ বসিয়াছে।

দেখুড়িয়ার ভল্লারা পূর্বেই আসিয়া জুটিয়াছে। মহাগ্রামেরও জনকয়েক আসিয়াছে। মোটমাট প্রায় পঞ্চাশজন লোক। এদিকে বন্যার জল ইতিমধ্যেই প্রায় হাত-খানেকের উপর বাড়িয়া গিয়াছে। বাঁধের গায়ে ফাটলটার নিচেই একটা গর্তের ভিতর দিয়া বন্যার জল সরীসৃপের মত মাঠের ভিতর ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের উপর পঞ্চাশজন লোক বুক দিয়া পড়িল।

এই ধারার সুড়ঙ্গের মত গর্তের গতি অত্যন্ত কুটিল। বাঁধের ওপারে কোথায় তাহার মুখ, সেই মুখ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কোন-মতেই বন্ধ হইবে না। পঞ্চাশ জোড়া চোখ ময়ূরাক্ষীর বন্যার জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—বাঁধের গায়ে কোথায় জল ঘুরপাক খাইতেছে—ঘূর্ণীর মত।

ঘূর্ণী একটা নয়—দশ-বারোটা। অর্থাৎ গর্তের মুখ দশ-বারোটা। এ

পাশেও দেখা গেল জল একটা গর্ত দিয়াই বাহির হইতেছে না—অন্তত দশ জায়গা দিয়া জল বাহির হইতেছে। বাঁধের ফাটলের মাটি গলিয়া ঝুপ-ঝুপ করিয়া খসিয়া পড়িতেছে; ফাটলটা বাড়িতেছে; বাঁধের মাটি নিচের দিকে নামিয়া যাইতেছে।

তিনকড়ি বলিল—দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হবে না।

জগন—লেগে যাও কাজে।

হরেন উত্তেজনায় আজ হিন্দী বলিতেছিল—জলদি! জলদি!

দেবু নিজে গিয়া ফাটলের গায়ে দাঁড়াইয়া বলিল—ইরসাদ-ভাই, গোটা-কয়েক খুঁটো চাই। গাছের ডাল কেটে ফেল। সতীশ, মাটি আন।

মাঠের সাদা জলের উপর দিয়া পাটল রঙের একটা অজগর যেন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বিসর্পিল গতিতে ক্ষুধার্ত উদ্যত গ্রাসে।

বাঁধের গায়ে গর্তটার মুখ কাটিয়া, গাছের ডালের খুঁটো পুঁতিয়া, তালপাতা দিয়া তাহারই মধ্যে ঝপাঝপ মাটি পড়িতেছিল—ঝুড়ির পর ঝুড়ি। পঞ্চাশজন লোকের মধ্যে জগন ও হরেন মাত্র দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আটচল্লিশ জনের পরিশ্রমের মধ্যে একটুকু ফাঁকি ছিল না। কতক লোক মাটি কাটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিতেছিল—কতক লোক বহিতেছিল; দেবু, ইরসাদ, তিনকড়ি এবং আরও জনকয়েক—বন্যার ঠেলায় বাঁকিয়া যাওয়া খুঁটাগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

—মাটি—মাটি—মাটি!

বন্যায় বেগের মুখে তালপাতার আড় দেওয়া বেড়ার খুঁটাগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিতে হাতের শিরা ও মাংসপেশীসমূহ কঠিন হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে; এইবারে বোধ হয় তাহারা ফাটিয়া যাইবে। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া দেবু চীৎকার করিয়া উঠিল—মাটি, মাটি, মাটি!

রাম ভল্লার মূর্তি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে; নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্র হাতে তাহার যে মূর্তি হয়—সেই মূর্তি। সে তিনকড়িকে বলিল—একবার ধর।...সে চট করিয়া পিছন ফিরিয়া মাটিতে পায়ের খুঁট দিয়া—পিঠ দিয়া বেড়াটাকে ঠেলিয়া ধরিল। তারপর বলিল ফেল মাটি!

ইরসাদ হাঁপাইতেছিল। রমজানের মাসে সে একমাস যাবৎ উপবাস করিয়া আসিতেছে। আজও উপবাস করিয়া আছে। দেবু বলিল—ইরসাদ-ভাই, তুমি ছেড়ে দাও। উপরে গিয়ে একটু বরং বস।

ইরসাদ হাসিল, কিন্তু বেড়া ছাড়িল না। ঝপ্ ঝপ্ মাটি পড়িতেছে। আকাশে মেঘ একবার ঘোর করিয়া আসিতেছে, আবার সূর্য উঠিতেছে।

একবার সূর্য উঠিতেই ইরসাদ সূর্যের দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল—একবার ধর, আমি এখুনি আসছি। নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে ভাই।

বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছে। মানুষের আকারের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘ হইয়া ছায়া পড়িয়াছে। জোহরের নামাজের সময় চলিয়া যাইতেছে। দেবু রাম ভল্লার মত পিছন ফিরিয়া পিঠ দিয়া বলিল—যাও তুমি।

শ্রমিকের দল কাদা ও জলের মধ্যে প্রাণপণে দ্রুতগতিতে আসিয়া ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি ফেলিতেছিল। মাটি নয় কাদা। ঝুড়ির ফাঁক দিয়া কাদা তাহাদের মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত লিপ্ত করিয়া গলিয়া পড়িতেছে। ওই কাদার মত মাটিতে বিশেষ কাজ হইতেছে না। বানের জলের তোড়ে কাদার মত মাটি মুহূর্তে গলিয়া যাইতেছে। ওদিকে ময়ূরাক্ষী ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। বান বাড়িতেছে, উতলা, বাতাসে প্রবহমান বন্যার বুকে শিহরণের মত চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছে।

নদীর বুকের ডাক এখন স্পষ্ট। খরস্রোতের কল্লোল-ধ্বনি ছাপাইয়া একটা গর্জন-ধ্বনি উঠিতেছে।

জলস্রোত যেন রোলারের মত আবর্তিত হইয়া চলিতেছে। নদীর বুক রাশি রাশি ফেনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ফেনার সঙ্গে আবর্জনার স্তূপ—শুধু আবর্জনাই নয়—খড়, ছোটখাটো শুকনা ডালও ভাসিয়া চলিয়াছে।

সহসা হরেন আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—Doctor, look, one চালা!—একটা ছোট ঘরের চাল ভাসিয়া চলিয়াছে।

—There—There—ওই একটা—ওই একটা। ওই আর একটা By God—a big গাছের গুঁড়ি।

ঘরের চালা, কাটা গাছের গুঁড়ি, বাঁশ, খড়, ভাসিয়া চলিয়াছে; নদীর উপরের দিকে গ্রাম ভাসিয়াছে।

জগন ডাক্তার আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—গেল! গেল!

তিনকড়ি এতক্ষণ পর্যন্ত পাথরের মানুষের মত নির্বাক হইয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বেড়াটা ঠেলিয়া ধরিয়াছিল। এবার সে দেবুর হাত ধরিয়া বলিল—পাশ দিয়ে সরে যাও। থাকবে না, ছেড়ে দাও। রামা, ছাড়্! মিছে চেষ্টা। দেবু পাশ দিয়ে সর। নইলে জলের তোড়ে মাটির মধ্যে হয় তো গুঁজে যাবে! গেল—গেল—গেল!

গিয়াছে! দ্রুত প্রবর্ধমান বন্যার প্রচণ্ডতম চাপে বাঁধের ফাটলটা গলিয়া সশব্দে এপাশের মাঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। রাম পাশ কাটিয়া সরিয়া

দাঁড়াইল। তিনকড়ি সুকৌশলে ওই জলস্রোতের মধ্যে ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল। দেবু জলস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেল।

জগন চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু! দেবু!

রাম ভল্লা মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলস্রোতের মধ্যে!

ইরসাদ নামাজ সবে শেষ হইয়াছিল; সে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু-ভাই!

মজুরদের দল হায় হায় করিয়া উঠিল। সতীশ বাউড়ী, পাতু বায়েনও জলস্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পিছনে বন্যারোধী বাঁধের ভাঙন ক্রমশ বিস্তৃততর হইতেছে, গৈরিক বর্ণের জলস্রোত ক্রমবর্ধিত কলেবরে হুড়-হুড় শব্দে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; মাঠের সাদা জলের উপর এবার গৈরিক বর্ণের জল—কালবৈশাখীর মেঘের মত ফুলিয়া ফুলিয়া চারপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁটুজল বাড়িয়া প্রায় এক-কোমর হইয়া উঠিল। ইরসাদও এবার জলের স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

বন্যার মূল স্রোতটি ছুটিয়া চলিয়াছে—পূর্ব মুখে। ময়ূরাক্ষীর স্রোতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। পাশ দিয়া ঠেলিয়া চলিয়াছে গ্রামগুলির দিকে। মূল স্রোত মাঠের সাদা জল চিরিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়াছে কুসুমপুরের সীমানা পার হইয়া শিবকালীপুর, শিবকালীপুরের পর মহাগ্রাম, মহাগ্রামের পর দেখুড়িয়া দেখুড়িয়ার সীমা পার হইয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠ পার হইয়া, বালুময় মহিষডহর—গলাপোঁতা বাগানের পাশ দিয়া ময়ূরাক্ষীর বাঁকের মুখে ময়ূরাক্ষীর নদীস্রোতে গিয়া পড়িবে।

রাম ওই জলস্রোতের সঙ্গেই চলিয়াছে, এক একবার মাথা তুলিয়া উঠিতেছে —আবার ডুব দিতেছে। তিনকড়িও চলিয়াছে। সে যখন মাথা তুলিয়া উঠিতেছে তখন চিৎকার করিয়া উঠিতেছে—হায় ভগবান্!

বন্যার জলে মাটির ভিতরের জীব-পতঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে। একটা কালকেউটে জলস্রোতের উপর সাঁতার কাটিয়া তিনকড়ির পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তিনকড়ি মুহূর্তে জলের মধ্যে ডুব দিল। জল-প্লাবনে মাঠের গর্ত ভরিয়া গিয়াছে, সাপটা খুঁজিতেছে একটা আশ্রয়স্থল, কোন গাছ অথবা এক টুকরা উচ্চভূমি। এ সময়ে মানুষকে পাইলেও মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিতে চাহিবে। কীট-পতঙ্গের তো অবধি নাই। খড়-কুটা-ডাল-পাতার উপর লক্ষ কোটি পিঁপড়া চাপ বাঁধিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা ডিম, ডিমের মমতা এখনও ছাড়িতে পারে নাই।

কুসুমপুরের কোলাহল উঠিতেছে—বান গ্রামের প্রান্তে গিয়া উঠিয়াছে। শিবকালীপুরেও বান ঢুকিয়াছে। বাউড়ী-পাড়া মুচী-পাড়ায় জল জমিয়াই ছিল, বন্যার জল ঢুকিয়া এখন প্রায় এক-কোমর জল হইয়াছে। সতীশ ও পাতু ছাড়া সকলেই পাড়ায় ফিরিল। প্রতি-ঘরে মেয়েরা ছেলেরা কলরব করিতেছে। ইহারই মধ্যে অনেকের ঘরে জল ঢুকিয়াছে। তৈজসপত্র হাঁড়িকুড়ি মাথায় করিয়া, গরু-ছাগলগুলাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহারা পুরুষদেরই অপেক্ষা করিতেছিল; উহারা ফিরিতেই সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল—চল—চল—চল।

গ্রামও আছে—নদীও আছে চিরকাল। বানও আসে, গ্রামও ভাসে। কিন্তু সর্বাগ্রে ভাসে এই হরিজন-পল্লী। ঘর ডুবিয়া যায়, অধিবাসীরা এমনিভাবেই পলায়, কোথায় পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইবে—সেও তাহাদের ঠিক হইয়া থাকে। তাহাদের পিতৃপিতামহ ওইখানেই আশ্রয় লইত। গ্রামের উত্তর দিকের মাঠটা উঁচু—ওই মাঠের মধ্যে আছে পুরানো কালের মজা দীঘি। ওই উত্তর-পশ্চিমে কোণটায় প্রকাণ্ড সুবিস্তৃত একটা অর্জুন গাছ আছে, সেই গাছের তলায় গিয়া আশ্রয় লইত; আজও তাহারা সেইখানেই চলিল।

দুর্গার মা অনেকক্ষণ হইতেই চিৎকার করিতেছিল। দুর্গা সকাল হইতে দেবুর বাড়িতে ছিল। দেবু বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিল না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া উপরে উঠিয়াছে, আর নামে নাই। রঙ্গিণী বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া জানালা দিয়া বান দেখিতেছে। শুধু বান দেখা নয়, গানও গাহিতেছে।—

"কলঙ্কিনী রাইয়ের তরে কানাই আজ লুটায় ধুলাতে।
ছিদ্রকুম্ভে আনিবে বারি—কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ভুলাতে।"

দুর্গার মা বার বার ডাকিতেছে—দুগ্‌গা বান আসছে। ঘর-দুয়োর সামলিয়ে নে। চল বরং দীঘির পাড়ে যাই।

দুর্গা বারকয়েক সাড়াই দেয় নাই। তারপর একবার বলিয়াছে—দাদা ফিরে আসুক। তারপর সে আবার আপন মনে গানের পর গান গাহিয়া চলিয়াছে। এখন সে গাহিতেছিল—

"এ পারেতে রইলাম আমি, ও পারেতে আর একজনা—
মাঝেতে পাথার নদী পার করে সেই ভাবনা,
কোথায় তুমি কেলে সোনা?"

হঠাৎ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল—মাঠ হইতে প্রত্যাগত লোকগুলির কোলাহল। সে বুঝিল পণ্ডিতের ব্যর্থ উত্তেজনায় লোকগুলি অনর্থক বানের

সঙ্গে লড়াই করিয়া হার মানিয়া বাড়ি ফিরিল। সে একটু হাসিল। পণ্ডিতের যেন খাইয়া-দাইয়া কাজ নাই, এই বান আটক দিতে গিয়াছিল!...দুর্গার মা নিচে হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—দুগ্‌গা! অ—দুগ্‌গা!

—যা-না তু দীঘির পাড়ে। মরণের ভয়েই গেলি হারামজাদী?

—ওলো, না!

—তবে এমন করে চেঁচাইছিস কেনে?

দুর্গার মা এবার কাঁদিয়া বলিল—ওলো, জামাই-পণ্ডিত ভেসে যেয়েছে লো!

দুর্গা এবার ছুটিয়া নামিয়া আসিল—কে? কে ভেসে যেয়েছে?

—জামাই-পণ্ডিত। বানের তোড়ের মুখে পড়ে—!

দুর্গা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পথে জল থৈ থৈ করিতেছে, এই জল ভাঙিয়া সে কোথায় যাইবে? যাইয়াই বা কি করিবে? মনকে সান্ত্বনা দিল—দেবু শক্তিহীন পুরুষ নয়, সে সাঁতারও জানে। কিন্তু বাঁধভাঙা বানের জলের তোড়—সে যে ভীষণ! বড় গাছ সম্মুখে পড়িলে শিকড়সুদ্ধ টানিয়া ছিঁড়িয়া পাড়িয়া ফেলে—জমির বুক খাল করিয়া চিরিয়া ফাঁড়িয়া দিয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতেই সে পথের জলে নামিয়া পড়িল। এক কোমরের বেশী জল। ইহারই মধ্যে পাড়াটা জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কেবল মুর্গীগুলা ঘরের চালায় বসিয়া আছে। হাঁসগুলা বন্যার জলে ভাসিতেছে। গোটাকয়েক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে একটা ভাঙা পাঁচিলের মাথায়। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—একটা লোক জল ঠেলিয়া এক বাড়ি হইতে বাহির হইয়া অন্য একটা বাড়িতে গিয়া ঢুকিল। দুঃখের মধ্যে সে হাসিল। রতনা বাউড়ী। লোকটা ছিঁচকে চোর। কে কোথায় কি ফেলিয়া গিয়াছে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। সে অগ্রসর হইল। তাই তো পণ্ডিত—জামাই-পণ্ডিত ভাসিয়া গেল!

যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে মাকে ডাকিয়া বলিল—দাদা না-ফেরা পর্যন্ত ওপরে উঠে বস্ মা। বউ, তুইও ওপরে যা। জিনিস-পত্তরগুলো ওপরে তোল্।

মা বলিল—ঘর পড়ে মরব নাকি?

—নতুন ঘর! এত শীগ্‌গিরি পড়বে না।

—তুই কোথা চললি?

—আসি আমি।

সে আর দাঁড়াইল না। অগ্রসর হইল।

দিনের আলো পড়িয়া আসিতেছে। দুর্গা পথের জল ভাঙিয়া অগ্রসর

হইল। নিজেদের পাড়া ছাড়াইয়া ভদ্র-পল্লীতে আসিয়া উঠিল। ভদ্র-পল্লীর পথে জল অনেক কম, কোমর পর্যন্ত জল কমিয়া হাঁটুতে নামিয়া আসিল। কিন্তু কম থাকিবে না। বান বাড়িতেছে। ভদ্র-পল্লীর ভিটাগুলি আবার পথ অপেক্ষাও উঁচু জমির উপর অবস্থিত, পথ হইতে মাটির সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে হয়। আবার ঘরগুলির মেঝে-দাওয়া আরও খানিকটা উঁচু। সিঁড়িগুলা ডুবিয়াছে—এইবার উঠানে জল ঢুকিবে। গ্রামের মধ্যে প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে। স্ত্রী-পুত্র, গরু-বাছুর, জিনিসপত্র লইয়া ভদ্র গৃহস্থেরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ওই বাউড়ী-হাড়ী-ডোম-মুচীদের মত সংসারটিকে বস্তা-ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটা ইহারই মধ্যে মেয়েছেলেতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা চিরকাল বন্যার সময় এই চণ্ডীমণ্ডপেই আসিয়া আশ্রয় লয়। এবারও লইয়াছে।

পূর্বকালে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল মাটির, ঘর-দুয়ারগুলিও তেমন ভাল ছিল না। এবার বিপদের মধ্যেও সুখ—চণ্ডীমণ্ডপ পাকা হইয়াছে, খটখটে পাকা মেঝে; ঘর-দুয়ারগুলিও ভাল হইয়াছে। কিন্তু তবুও লোকে ভরসা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকিতে পারে নাই। ঘোষ কি বলিবেন—এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীহরি নিজে সকলকে আহ্বান করিয়াছে; গায়ে চাদর দিয়া সকল পরিবারগুলির সুখ-সুবিধার তদ্বির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মিষ্টভাষায় সকলকে আহ্বান করিয়া, অভয় দিয়া বলিতেছে—ভয় কি, চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমার বাড়ি রয়েছে সমস্ত আমি খুলে দিচ্ছি।

শ্রীহরি ঘোষের এই আহ্বানের মধ্যে একবিন্দু কৃত্রিমতা নাই, কপটতা নাই। গ্রামের এতগুলি লোক যখন আকস্মিক বিপর্যয়ে ধন-প্রাণ লইয়া বিপন্ন—তখন সে অকপট দয়াতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। শুধু চণ্ডীমণ্ডপই নয়, সে তাহার নিজের বাড়ি-ঘর-দুয়ারও খুলিয়া দিতে সংকল্প করিল। শ্রীহরির বাপের আমলেই ঘর-দুয়ার তৈয়ারি করিবার সময় বন্যার বিপদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াই ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছিল। প্রচুর মাটি ফেলিয়া উঁচু ভিটাকে আরও উঁচু করিয়া তাহার উপরে আরও এক বুক দাওয়া উঁচু শ্রীহরির ঘর। ইদানিং শ্রীহরি আবার ঘরগুলির ভিতরের গায়ে পাকা দেওয়াল গাঁথাইয়া মজবুত করিয়াছে, দাওয়া, মেঝে, এমন কি উঠান পর্যন্ত সিমেন্ট দিয়া বাঁধাইয়াছে! নূতন বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়া তো প্রায় একতলার সমান উঁচু। সম্প্রতি শ্রীহরি একটা প্রকাণ্ড গোয়াল-ঘর তৈয়ারি করাইয়াছে, তাহার উপরেও কোঠা করিয়া দোতলা করিয়াছে। সেখানে বহু লোকের স্থান হইবে, সে ঘরখানার ভিতরও বাঁধানো। তাহার এত স্থান থাকিতে গ্রামের লোকগুলি বিপন্ন হইবে?

শ্রীহরির মা—ইদানিং শ্রীহরির গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য দেখিয়া পূর্বের মত গালিগালাজ বা চিৎকার করিতে সাহস পায় না; এবং সে নিজেও যেন অনেকটা পাল্টাইয়া গিয়াছে, মান-মর্যাদা-বোধে সে-ও যেন অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তবুও এক্ষেত্রে শ্রীহরির সংকল্প শুনিয়া সে প্রতিবাদ করিয়াছিল—না বাবা হরি, তা হবে না—তোমাদের আমি ও করতে দোব না। তা হলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

শ্রীহরির তখন বাদ-প্রতিবাদ করিবার সময় ছিল না। এতগুলি লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তা ছাড়া গোপন মনে সে আরও ভাবিতেছিল—ইহাদের আহারের ব্যবস্থার কথা। যাহাদের আশ্রয় দিবে—তাহাদের আহার্যের ব্যবস্থা না-করাটা কি তাহার মত লোকের পক্ষে শোভন হইবে? মায়ের কথার উত্তরে সংক্ষেপে সে বলিল—ছিঃ মা!

—ছিঃ কেন বাবা, কিসের ছিঃ? তোমাকে ধ্বংস করতে যারা ধর্মঘট করেছে—তাদিগে বাঁচাতে তোমার কিসের দয়া, কিসের গরজ!

শ্রীহরি হাসিল, কোন উত্তর দিল না। শ্রীহরির মা ছেলের সেই হাসি দেখিয়াই চুপ করিল—সন্তুষ্ট হইয়াই চুপ করিল, পুত্র-গৌরবে সে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিল। জমিদারের মা হইয়া তাহারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এতগুলি লোকের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক তাহারা এ কি কম গৌরব? লোকে তাহাকে বলে রাজার মা। সে মনে মনে স্পষ্ট অনুভব করিল—যেন ভগবানের দয়া-আশীর্বাদ তাহার পুত্র-পৌত্র, তাহার পরিপূর্ণ সম্পদ-সংসারের উপর নামিয়া আসিয়া আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। শ্রীহরিও ঠিক তাই ভাবিতেছিল!

ময়ূরাক্ষী চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; তাহাতে বন্যাও আসিবে। লোকেরা বিব্রত হইলে—তাহার পুত্র-পৌত্ররাও এমনি ভাবেই সকলকে আশ্রয় দিবে। সকলে আসিয়া বলিবে—শ্রীহরি ঘোষমশায় ভাগ্যে চণ্ডীমণ্ডপ করে গিয়েছিলেন! সেদিনও তাহার নাম হইবে।

তাই শ্রীহরি নিজে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সকলকে মিষ্টভাষায় আহ্বান জানাইল, অভয় দিল—ভয় কি চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমরা বাড়ি-ঘর রয়েছে, সমস্ত খুলে দিচ্ছি আমি।

চাষী গৃহস্থেরা সপরিবারে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। শ্রীহরির গুণগান করিতেছে। একজন বলিতেছিল—ভাগ্যিমান পুরুষ যে গাঁয়ে জন্মায়—সে গাঁয়ের মহাভাগ্যি। সেই ধুলোয়-ধুলোকীর্ন্নি হয়ে থাকত; আর এ হয়েছে দেখ দেখি! যেন রাজপুরী!

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—তোমরা তো আমার পর নও গো। সবই জাত জ্ঞাত। আপনার জন। এ তো সব তোমাদেরই।

তুর্গা পথের জলের উপরেই দাঁড়াইয়াছিল। এ-পাড়া পার হইয়াই আবার মাঠ। জল ইহারই মধ্যে হাঁটু ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। মাঠে সাঁতার জল। এদিকে বেলা নামিয়া পড়িতেছে। জামাই-পণ্ডিতের খবর লইয়া এখনও কেহ ফিরিল না। জামাই-পণ্ডিত তবে কি ভাসিয়া গেল? চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। তাহার জামাই-পণ্ডিত, পাঁচখানা গ্রাম যাহার নাম লইয়া ধন্য-ধন্য করিয়াছিল, পরের জন্য যে নিজের সোনার সংসার ছারখার হইতে দিল, গরীব তুঃখীর আপনার জন, অনাথের আশ্রয়, ন্যায্য ছাড়া অন্যায্য কাজ যে কখনও করে না, সেই মানুষটা ভাসিয়া গেল—আর এই লোকগুলা একবার তাহার নামও করে না!

সে জল ভাঙিয়া অগ্রসর হইল। গ্রামের ও-মাথায় পথের উপরে সে দাঁড়াইয়া থাকিবে। প্রকাণ্ড বড় মাঠ। তবুও তো দেখা যাইবে—কেহ ফিরিতেছে কি না। জামাই-পণ্ডিত ভাসিয়া গেলে—এই পূর্বদিকেই গিয়াছে। মানুষগুলা তো ফিরিবে! দূর হইতে ডাকিয়াও তো খানিকটা আগে খবর পাইবে! তুর্গা গ্রামের পূর্ব মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। নির্জনে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল, বারবার মনে মনে গাল দিতে লাগিল কামার-বউকে। সর্বনাশী রাক্ষসী যদি এমন করিয়া পণ্ডিতের মুখে কালি মাখাইয়া—মাথাটা হেঁট করিয়া দিয়া চলিয়া না যাইত, তবে জামাই-পণ্ডিত এমনভাবে তখন মাঠের দিকে যাইত না। সে তো জামাই-পণ্ডিতের ভাবগতিকে জানে। সে যে তাহার প্রতি পদক্ষেপের অর্থ বুঝিতে পারে।

কে একটা লোক দ্রুতবেগে জল ঠেলিয়া গ্রামের ভিতর হইতে আসিতেছে। তুর্গা মুখ ফিরাইয়া দেখিল। কুসুমপুরের রহম সেখ আসিতেছে। রহমই প্রশ্ন করিল—কে, তুগ্‌গা নাকি?

—হ্যাঁ।

—আরে, দেবু-বাপের খবর কিছু পালি?—সেখের কণ্ঠস্বরে গভীর উদ্বেগ। দেবুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। রহম আজ জমিদারের লোক। এখনও সে জমিদারের পক্ষে থাকিয়াই কাজকর্ম করিতেছে; দৌলতের সঙ্গেও তাহার যথেষ্ট খাতির। দেবুর প্রসঙ্গ উঠিলে সে তাহার বিরুদ্ধ-সমালোচনাই করিয়া থাকে। কিন্তু দেবুর এই বিপদের সংবাদ পাইয়া কিছুতেই সে স্থির থাকিতে পারে নাই, ছুটিয়া আসিয়াছে। সে বাড়িতে ছিল না; থাকিলে হয়তো বাঁধ-ভাঙার খবর পাইবামাত্র দেবুদের সঙ্গেই আসিত।

সেই গাছ-বেচা টাকা লইয়া সে সকালে উঠিয়াই গিয়াছিল জংশনের বাজারে রেলের পুল পার হইবার সময়েই বান দেখিয়া সে খানিকটা ভয় পাইয়াছিল। বাজারে বসিয়াই সে বাঁধ-ভাঙার সংবাদ পায়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন গ্রামে আসিয়া পৌছিল—তখন তাহাদের গ্রামেও জল ঢুকিয়াছে। তাহার বাড়ির ছেলেমেয়েরা দৌলতের দলিজায় আশ্রয় লইয়াছে। গ্রামের মাতব্বরদের পরিবারবর্গ প্রায় সকলেই সেখানে। সাধারণ চাষীরা মেয়েছেলে লইয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে আশ্রয় লইয়াছে। মজুর খাটিয়া, চাকরি করিয়া যাহারা খায়—তাহারা গিয়াছে গ্রামের পশ্চিম দিকে উঁচু ডাঙায়, এ গ্রামের প্রাচীনকালের মহাপুরুষ গুল্ মহম্মদ সাহেবের কবরের ওখানে। কবরটির উপর প্রকাণ্ড একটা বকুল-গাছের ছায়াছত্র-তলে আশ্রয় লইয়াছে। রহম তাহাদের খবর করিতে গিয়াই দেবুর বিপদের সংবাদ পাইয়াছে। সংবাদটা পাইবামাত্র সে যেন কেমন হইয়া গেল।

মুহূর্তে তাহার মনে হইল—সে যেন কত অপরাধ করিয়াছে দেবুর কাছে। উত্তেজনার মুখে—লোকাপবাদের আকারে প্রচারিত দেবুর ঘুষ লওয়াটা বিশ্বাস করিলেও—রহমের মনের কোণে একটা সন্দেহ ছিল দেবুকে সে যে ছোট হইতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাহাকে সে ভালবাসিয়াছে। ওই জানা এবং ভালবাসাই ছিল সেই সন্দেহের ভিত্তি। কিন্তু সে সন্দেহও এতদিন মাথা তুলিবার অবকাশ পায় নাই। দাঙ্গা মিটমাটের ফলে—জমিদার তরফ হইতে তাহাকে সম্মান দিল—সেই সম্মানটাই পাথরের মত এতদিন সে সন্দেহকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আজ এই সংবাদ অকস্মাৎ যেন পাথরটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, মুহূর্তে সন্দেহটা প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। দেবু—যে এমন করিয়া জীবন দিতে পারে, সে কখনও এমন শয়তান নয়। দেবু-বাপ কখনও বাবুদের টাকা লয় নাই। তেমন প্রকৃতির লোক নয়। ওটা বাবুদের ধাপ্পাবাজি। সে যদি বাবুদের লোক হইত, তবে এই এতবড় বুদ্ধির ব্যাপারে একদিনের জন্যও কি তাহাকে বাবুদের কাছারিতে দেখা যাইত না? সে যদি তেমন স্বার্থপর লোকই হইবে—তবে কেন অসম-সাহসিকতার সহিত বাঁধের ভাঙনের মুখে গিয়া দাঁড়াইল? রহম সেইখান হইতেই ছুটিয়া আসিতেছে!

রহমের প্রশ্নে দুর্গার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল বহিয়া গেল। এতক্ষণে একটা লোক তাহার জামাই-পণ্ডিতের খবর করিল!

রহম অধিকতর ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রশ্ন করিল?

দুর্গা কথা বলিতে পারিল না, সে ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—না, কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

রহম সঙ্গে সঙ্গে মাঠের জলে নামিয়া পড়িল। দুর্গা বলিল—দাঁড়ান শেখজী আমিও যাব।

রহম বলিল—আয়। পানি সাঁতার! এতটা সাঁতার দিতে পারবি তো?

দুর্গা কাপড় সাঁটিয়া অগ্রসর হইল।

রহম বলিল—দাঁড়া। হুই দেখ্ কতকগুলা লোক বেরিয়েছে—মহাগ্রাম থেকে।

বানে-ডোবা নিচু মাঠকে বাঁয়ে রাখিয়া মহাগ্রামের পাশে-পাশে কতকগুলি লোক আসিতেছে। গ্রামের ধারে মাঠের অপেক্ষা জল অনেক কম। মাঝ-মাঠে সাঁতার-জল স্রোতের বেগে বহিয়া চলিয়াছে।

রহম সেইখান হইতেই হাঁক দিতে শুরু করিল। চাষীর হাঁক। হাঁক কিন্তু জোর হইল না। সারাটা দিন রোজার উপবাস করিয়া গলা শুকাইয়া গিয়াছে। নিজের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা বুঝিয়া রহম বলিল—দুগ্‌গা, তু সমেত হাঁক্ পাড়।

দুর্গাও প্রাণপণে রহমের সঙ্গে হাঁক দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরও বারবার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যদি তাহারা অর্থাৎ পাতু, সতীশ, জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষালই হয়! যদি তাহারা আসিয়া বলে—না, পাওয়া গেল না!

তাহারই বটে! হাঁকের উত্তর আসিল; শুনিয়াই রহম বলিল—হাঁ! উয়ারাই বটে। ইরসাদের কথা মালুম হচ্ছে।

সে এবার নাম ধরিয়া ডাক দিল—ই-র-সা-দ!

উত্তর আসিল—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোক কয়টি আসিয়া উপস্থিত হইল—ইরসাদ, সতীশ, পাতু, হরেন ও দেখুড়িয়ার একজন ভল্লা।

রহম প্রশ্ন করিল—ইরসাদ,—পণ্ডিত? দেবু-বাপকে পেয়েছো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইরসাদ বলিল—পাওয়া গিয়েছে। জলের তোড়ের মুখে পড়ে মাথায় কিছু ঘা লেগেছে। জ্ঞান নাই।

দুর্গা প্রশ্ন করিল—কোথায়? ইরসাদ মিয়ে—কোথা জামাই-পণ্ডিত?

—দেখুড়েতে। দেখুড়ের ধারে গিয়ে রাম ভল্লা টেনে তুলেছে।

—বাঁচবে তো?

জগন ডাক্তার রয়েছে। দুজন ভল্লা গিয়েছে কঙ্কণা—যদি হাসপাতালের ডাক্তার আসে। ছিদেম ভল্লা এসেছে—জগন ডাক্তারের বাক্স নিয়ে যাবে।

চণ্ডীমণ্ডপ লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা কলরব করিতেছিল। আপন আপন জিনিসপত্র গুছাইয়া—রাত্রির মত জায়গা করিয়া লইবার জন্য ছোটখাটো

কলহও বাধিয়া উঠিয়াছে। ছেলেগুলা চ্যাঁ-ভ্যাঁ লাগাইয়া দিয়াছে। কাহারও অন্যের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর নাই। আগন্তুক দলটি চণ্ডীমণ্ডপের কাছে উপস্থিত হইতেই কিন্তু কয়েকজন ছুটিয়া আসিল। কয়েকজনের পিছনে পুরুষেরা প্রায় সকলেই আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঘোষাল, পণ্ডিতের খবর কি? পণ্ডিত? আমাদের পণ্ডিত?

—সতীশ—অ সতীশ?

—পাতু? বল্ কেনে রে?

চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হইয়া কাজকর্ম বন্ধ করিয়া স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হরেন উত্তেজিতভাবে বলিল—হোয়াট্ ইজ্ দ্যাট্ টু ইউ? সে খবরে তোমাদের কি দরকার! সেল্‌ফিশ পিপ্‌ল সব!

ইরসাদ বলিল—পণ্ডিতকে বহুকষ্টে পাওয়া গিয়েছে। তবে অবস্থা খুব খারাপ।

চণ্ডীমণ্ডপের মানুষগুলি যেন সব পাথর হইয়া গেল। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এক প্রৌঢ়া মা-কালীর মন্দিরের বারান্দায় প্রায় মাথা ঠুকিয়া ঐকান্তিক আর্তস্বরে বলিল—বাঁচিয়ে দাও মা, তুমি বাঁচিয়ে দাও। দেবুকে তুমি বাঁচিয়ে দাও। দেবু আমাদের সোনার দেবু! মা-কালী! তুমি মালিক, বাঁচাও তুমি।

স্তব্ধ মানুষগুলির মধ্য হইতে আত্ম-প্রার্থনার গুঞ্জন উঠিল—মা! মা! বাঁচাও! মা-কালী!

মেয়েরা বারবার চোখ মুছিতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। জগন ডাক্তারের ওষুধের বাক্স লইয়া ভল্লা জোয়ানটি চলিয়াছিল, পিছনে পিছনে দুর্গা। সে-ও অহরহ মনে মনে বলিতেছিল—বাঁচাও মা, বাঁচিয়ে দাও। মা-কালী, তুমিই মালিক। জামাই-পণ্ডিতকে বাঁচিয়ে দাও। এবার পুজোয় আমি ডাইনে-বাঁয়ে জোড়া পাঁঠা দোব মা!

বারবার তাহার চোখে জল আসিতেছিল—মনকে সে প্রবোধ দিতেছিল—আশায় সে বুক বাঁধিতে চাহিতেছিল—জামাই-পণ্ডিত নিশ্চয় বাঁচিবে! এতগুলি লোক, গোটা গ্রাম-সুদ্ধ লোক যাহার জন্য দেবতার পায়ে মাথা কুটিতেছে, তাহার কি অনিষ্ট হয়? কিছুক্ষণ আগে যখন তাহারা ঘোষের তোষামোদ করিতেছিল—কই, তখন তো তাহাদের বুক চিরিয়া এমন দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হয় নাই, চোখ দিয়া জল আসে নাই। সে শুধু দায়ে পড়িয়া বড়লোকের আশ্রয়ে মাথা গুঁজিয়া—লজ্জার মাথা খাইয়া মিথ্যা তোষামোদ

করিয়াছে। সে তাহাদের প্রাণের কথা নয়। কখনও নয়। এইটাই তাহাদের প্রাণের কথা! দরদর করিয়া চোখ দিয়া জল কি শুধুই পড়ে? মানুষের কদর্যপনার সঙ্গেই দুর্গার জীবনের—পরিচয় ঘনিষ্ঠ। মানুষকে সে ভাল বলিয়া কখনও মনে করে নাই। আজ তাহার মনে হইল—মানুষ ভাল—মানুষ ভাল। বড় বিপদে, বড় অভাবে পড়িয়া তাহারা খারাপ হয়। তবুও তাহাদের বুকের ভিতর থাকে ভালত্ব। মানুষের সঙ্গে স্বার্থের জন্য ঝগড়া করিয়াও তাহার মন খারাপ হয়। পাপ করিয়া তাহার লজ্জা হয়।

মানুষ ভাল। জামাই-পণ্ডিতকে তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। জামাই-পণ্ডিত তাহার বাঁচিবে!

—কে যায় গো? কে যায়?—পিছন হইতে ভারী গলায় কে ডাকিল।

ভল্লা জোয়ানটি মুখ না ফিরাইয়া বলিল—আমরা।

—কে তোমরা?

এবার ছোকরা চটিয়া উঠিল। সে বলিল—তুমি কে?

শাসন-দৃপ্ত কণ্ঠে পিছন হইতে হাঁক আসিল—দাঁড়া ওইখানে।

—না।

—এ্যাই।

ছোকরা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু চলিতে বিরত হইল না। দুর্গা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পিছনের লোকটি হাঁকিয়া বলিল—এই শালা!

ছোকরা এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এগিয়ে এস বুনুই, দেখি তোমাকে একবার।

—কে তুই?

—তুই কে?

—আমি কালু শেখ, ঘোষ মহাশয়ের চাপরাশী। দাঁড়া ওইখানে।

—আমি জীবন ভল্লা! তোমার ঘোষ মশায়ের কোন ধার ধারি না আমি।

—তোমার সঙ্গে কে? মেয়ে নোক—? কে বটে?

—দুর্গা তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল—আমি দুগ্‌গা দাসী!

—দুগ্‌গা?

—হ্যাঁ।

কালু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা যাও।

কালু বাহির হইয়াছে পদ্মর সন্ধানে। পদ্ম শ্রীহরির বাড়িতে নাই। বানের

গোলমালের মধ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেহ লক্ষ্য করে নাই। সন্ধ্যার মুখে শ্রীহরি তথ্যটা আবিষ্কার করিয়া রাগে ক্ষোভে একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কালুকে পাঠাইয়াছে, ভূপালকে পাঠাইয়াছে পদ্মর সন্ধানে।

পদ্ম পলাইয়াছে। গতরাত্রে এক অসুস্থ মুহূর্তে তৃষ্ণার্ত পাগলে যেমন করিয়া পঙ্কপল্বলের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি ভাবেই শ্রীহরির দরজার সম্মুখে আসিয়া তাহার বাড়িতেই ঢুকিয়াছিল। আজ সকাল হইতে তাহার অনুশোচনার সীমা ছিল না। তাহার জীবনের কামনা শুদ্ধমাত্র রক্তমাংসের দেহের কামনাই নয়, পেটের ভাতের কামনাই নয়, তাহার মনের পুষ্পিত কামনা--সে ফলের পরিণতির সফলতায় সার্থক হইতে চায়। অন্ন সে শুধু নিজের পেট পুরিয়া চায় না—অন্নপূর্ণা হইয়া পরিবেশন করিতে চায়—পুরুষের পাতে, সন্তানের পাতে; তাহার কামনা অনেক। শ্রীহরির ঘরে থাকার অর্থ উপলব্ধি করিয়া সকাল হইতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে এবং বন্যার বিপদে এই জন-সমাগমের সুযোগে কখন তাহাদের মধ্য দিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে! গ্রামের দক্ষিণে বন্যা, পূর্বে বন্যা, পশ্চিমেও তাই, সে উত্তর দিকের মাঠ ধরিয়া অন্ধকারের আবরণে চলিয়াছে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে—যেখানে হোক্।

ভল্লাটির পিছনে দুর্গা চলিয়াছিল।

মাঠের বন্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে—যেখানে বৈকালে এক-কোমর জল ছিল, সেখানে জল এখন বুক ছাড়াইয়াছে! শিবকালীপুরে চাষীপাড়াতেও এবার ঘরে জল ঢুকিতেছে। তাহারা মহাগ্রামের ভিতর দিয়া চলিল। মহাগ্রামের পথেও হাঁটুর উপর জল। বন্যার যে রকম বৃদ্ধি, তাহাতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই চাষীদের ঘরে বান ঢুকিবে। মহাগ্রাম এককালের সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম—অনেক পড়ো ভিটায় ভাঙা ঘরের মাটির স্তূপ জমিয়া আছে—সেখানে গৃহস্থের পোঁতা গাছগুলির ছায়াকে আশ্রয় করিয়া সেই মাটির স্তূপের উপর সব গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ও বাড়িতে যত লোক ধরিয়াছে, তিনি আশ্রয় দিয়াছেন।

দেখুড়িয়ায় একমাত্র ভরসা তিনকড়ির বাড়ি; তিনকড়ির বাড়িটা খুব উঁচু। সেখানেই অধিকাংশ লোক আশ্রয় লইয়াছে। অনেকে গ্রামান্তরে পলাইয়াছে। ভল্লাদের অনেকে এখনও বাঁধের উপর বসিয়া আছে। কাঠ ভাসিয়া গেলে ধরিবে। গরু ভাসিয়া গেলে ধরিবে। রাম তারিণী প্রভৃতি কয়েকজন রাত্রে থাকিবে স্থির করিয়াছে। কত বড়লোকের ঘর ভাঙিবে;

কাঠের সিন্দুক আসিতে পারে। অলঙ্কার-পরা বড়লোকের মেয়ের মৃতদেহও ভাসিয়া আসিতে পারে। বড়লোক বাবু ভাসিয়া আসিতে পারে—যাহার জামায় থাকিবে সোনার বোতাম, আঙুলে হীরার আংটি, পকেটে থাকিবে নোটের তাড়া—কোমরে গেঁজলে-ভরা মোহর। কেবল এক-একজন পালা করিয়া তিনকড়ির বাড়িতে থাকিবে। পণ্ডিতের অসুখ—কখন্ কি দরকার লাগে কে জানে!

জগন ডাক্তার তিনকড়ির দাওয়ায় বসিয়াছিল।

জীবন বাক্সটা নামাইয়া দিল।

দুর্গা ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল—ডাক্তারবাবু, জামাই-পণ্ডিত কেমন আছে?

ডাক্তার ওষুধের বাক্স খুলিয়া ইন্‌জেকশনের সরঞ্জাম বাহির করিতে করিতে বলিল—গোলমাল করিস নে, বস।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে দেবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে?—কে?

দুইজনেই ছুটিয়া গেল ঘরের মধ্যে; দেবু চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে; তাহার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল তিনকড়ির মেয়ে স্বর্ণ। রাঙা চোখে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া—অকস্মাৎ সে দুই হাতে স্বর্ণের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার মুখখানা আপনার চোখের সম্মুখে টানিয়া বলিতেছে—কে?—কে?

স্বর্ণের চুলগুলি যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য তাহার। সে নীরবে দেবুর হাত দুইখানা ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

দেবু আবার প্রশ্ন করিল—বিলু? বিলু? কখন এলে তুমি? বিলু!

জগন দেবুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া স্বর্ণকে মুক্ত করিয়া দিল।

দুর্গা ডাকিল জামাই-পণ্ডিত!

জগন মৃদুস্বরে বলিল—ডাকিস না। বিকারে বকছে।

আঠার

ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা বন্যার ভীষণ প্লাবনে অঞ্চলটা বিপর্যস্ত হইয়া গেল। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কালবন্যা—ষোড়া-বান আসে নাই। পঞ্চগ্রামের সুবিস্তীর্ণ মাঠখানায় শস্যের প্রায় চিহ্ন নাই। জলস্রোত কতক উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। বাকী যাহা ছিল, তাহা হাজিয়া পচিয়া গিয়াছে; একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। মাঠের জল পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে সবুজ। বাঁধের ধারে যেদিক দিয়া জলস্রোত প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল—সেখানকার জমিগুলির উপরের মাটিটুকু চাষীরা চষিয়া খুঁড়িয়া, সার ঢালিয়া চন্দনের মত মোলায়েম

এবং সন্তানবতী জননীর বুকের মত খাদ্যরস-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল—তাহার আর কিছুই নাই ; স্রোতের টানে খুলিয়া গলিয়া ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া গিয়াছে। জমিগুলার বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে কঠিন অনুর্বর এঁটেল মাটি ; কতক কতক জমির উপর জমিয়া গিয়াছে রাশিকৃত বালি।

গ্রামের কোলে কোলে—যেখানে জলস্রোত ছিল না—সে জমিগুলি শেষে ডুবিয়াছিল এবং আগেই বন্যা হইতে মুক্ত হইয়াছে—সেখানে কিছু কিছু শস্য আছে। কিন্তু সে শস্যের অবস্থাও শোচনীয় ; দুর্ভিক্ষ মহামারীর শেষে যে মানুষগুলি কোনমতে বাঁচিয়া থাকে—ঠিক তাহাদেরই মত ব্যবস্থা। এখন আবার পল্লীগুলির ঘর ধ্বসিয়া পড়িবার পালা পড়িয়াছে। কতক ঘর অবশ্য বন্যার সময়েই ভাঙিয়াছে ; কিন্তু বন্যার পর ধ্বসিতেছে বেশী। বন্যায় ঘর এইভাবেই বেশী ভাঙে। জলে যখন ডুবিয়া থাকে তখন দেওয়ালের ভিত ভিজিয়া নরম হয়, তারপর জল কমিলে—রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলেই ফুলিয়া গিয়া ধসিয়া পড়ে। প্রায় শতকরা পঞ্চাশখানা ঘর ভাঙিয়াছে। খড়বিচালি ভাসিয়া গিয়াছে, বন্যায় ডুবিয়া গোচর-ভূমির ঘাস পচিয়া গিয়াছে—গাই-বলদ-ছাগল-ভেড়াগুলোর অনাহার শুরু হইয়াছে। তাহারা সুযোগ পাইবামাত্র ছুটিয়া চলিয়াছে উত্তর দিকে। পূর্ব পশ্চিমে বহমান ময়ূরাক্ষীর তারবর্তী গ্রামগুলির উত্তর দিকে সব মাঠ উঁচু ; চিরকাল অবহেলার মাঠ ; ওই মাঠ জলে ডোবে নাই ! এবার অতি-বৃষ্টিতেও মাঠের ফসল বেশ ভাল—গরু-ছাগল-ভেড়া ওই মাঠেই ছুটিয়া যাইতে চায়। এবার ওই উত্তরের মাঠেই মানুষের ভরসা ; কিন্তু ও-দিকে জমির পরিমাণ অতি সামান্য।

শ্রীহরি ঘোষ আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। তাহার কর্মচারী দাসজীর সঙ্গে এই সব কথাই সে বলিতেছিল। দাস আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল—বৃদ্ধির ব্যাপারটা আপোষে মিটমাট করা ভারি অন্যায় হয়েছে—ভারি অন্যায়।

তাহার বক্তব্য—আপোষে মিটমাট না করিরা মামলার সংকল্পে অবিচলিত থাকিলে আজ মামলাগুলি অনায়াসে এক তরফা ডিক্রি—অর্থাৎ প্রজাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হইয়া ডিক্রি হইয়া যাইত। এই অবস্থায় আদালতের মারফতে আপোষ করিলেও অনেক ভাল হইত। আদালতকে ছাড়িয়া আপোষে বৃদ্ধি—টাকায় দুই আনার বেশী হয় না, আদালত তাহা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু মামলায় অথবা মামলা করিয়া আদালতের মারফতে আপোষ করিলে বৃদ্ধি অনেক বেশী হইতে পারে। এমন কি টাকায় আট আনা পর্যন্ত বৃদ্ধির নজির আছে।

শ্রীহরির কথাটা মনে হইয়াছে! কিন্তু কঙ্কণার বড়বাবু যে ব্যাপারটা মাটি করিয়া দিলেন। কি কুক্ষণেই রহমের সঙ্গে হাঙ্গামাটা বাধাইলেন!

দাস বলিল—ধর্মঘটের ঘট বানের জলে ভেসে যেত। পেটের জন্যেই তখন এসে গড়িয়ে পড়ত আপনাদের দরজায়। কলের মালিক তখন টাকা দাদন দিতে চেয়েছিল মাঠের ধান দেখে। কিন্তু এই বানের পরে যে একটি আধলাও কাউকে দিত না।

শ্রীহরি একটু হাসিল—পরিতৃপ্তির হাসি! সে কথা সে জানে। তাহার শান্-বাঁধানো উঁচু বাড়িতে বন্যার জলে ক্ষতি করিতে পারে নাই। ধানের মরাইগুলি অক্ষত পরিপূর্ণ অবস্থায় তাহার আঙিনা আলো করিয়া রহিয়াছে; সে কল্পনা করিল—পাঁচখানা-সাতখানা গ্রামের লোক তাহার খামারে ওই ফটকের সম্মুখে ভিক্ষুকের মত করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। ধান চাই। তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ অনাহারে রহিয়াছে, মাঠে একটি-বীজধানের চারা নাই।

ভাদ্র মাসের এখনও পনের দিন আছে, এখনও দিনরাত্রি পরিশ্রম করিলে অল্পসল্প জমি চাষ হইতে পারিবে। 'আছাড়ো' করিয়া বীজ পড়িলে কয়েক দিনের মধ্যেই বীজের চারা উঠিয়া পড়িবে। সেই বীজ লইয়া যে যতখানি পারে চাষ করিতে পারিলে তবুও কিছুটা পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ প্রতি চারিটিতে একটি করিয়াও ধানের শীষ হইবে। শ্রীহরির নিজের জমি অনেক—অমরকুণ্ডার মাঠের সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলি প্রায় সবই তাহার। সে-সব জমিতে যতখানি সম্ভব চাষ করিবার আয়োজন সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছে। যতটুকু হয়—সেটুকুই লাভ। "আষাঢ়ে রোপণ ধানকে"—অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত জল খুব কমই হয় এবং রোয়ার কাজও খুব কম হয়—আষাঢ়ের চাষ নামেই আছে, কার্যত হয় না; হইলেও শস্য অপেক্ষা পাতাই হয় বেশী। "শাঙনে রোপণ ধানকে"—শ্রাবণের চাষে শস্য হয় ভাল এবং সাধারণতঃ শ্রাবণেই উপযুক্ত বৃষ্টি এদেশে হয়। শ্রাবণের চাষই বাস্তব এবং ফলপ্রদ। "ভাদুরে রোপণ শীষকে",—অর্থাৎ শ্রাবণ পর্যন্ত বৃষ্টি না হইয়া ভাদ্রে বৃষ্টি নামিলে, সে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির; ফসল হইবার তেমন কথাও নয়, এবং ভাদ্রে রোয়া ধানগাছগুলি ঝাড়ে-গোছে বাড়িবার সময় পায় না। ফলে—যে কয়েকটা চারা পোতা হয়, সেই চারাগুলিতেই একটি করিয়া শীষ হয়। আর "আশ্বিনে রোপণ কিস্‌কে"? অর্থাৎ—আশ্বিনে চাষ কিসের জন্য?··· এটা ভাদ্র মাস—এখনও ভাদ্রের পনেরটা দিন অবশিষ্ট; এখনও ধানের চারা রুইতে পারিলে, এক শীষ করিয়া ধান মিলিবে। চাষীদের বীজের ধান চাই, খাইবার ধান চাই।

শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইবে না। সে তাহাদের ধান দিবে। সমস্ত মরাই উজাড় করিয়া ধান দিবে। কল্পনা-ক্ষেত্রে সে দেখিল—লোকে অবনত মুখে ধান ঋণের খতে সই করিয়া দিল। মুক্তকণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়া তাহারা আরও একখানি অদৃশ্য খত লিখিয়া দিল,—তাহার নিকট আনুগত্যের খত। অকস্মাৎ সে এই সমস্তের মধ্যে অমোঘ বিচারের বিধান দেখিতে পাইল। গভীরভাবে সে বলিয়া উঠিল—হরি-হরি-হরি। তুমিই-সত্য।

ভগবানের প্রতিভূ রাজা, সকল দেবতার অংশে রাজার জন্ম। ভগবানের পৃথিবী, ভগবানের প্রতিভূ রাজা পৃথিবী শাসন করেন। পৃথিবীর ভূমি তাঁহার, সকল সম্পদ তাঁহার। রাজার প্রতিভূ জমিদার। রাজাই জমিদারকে রাজার বিধানই দিয়াছেন—তুমি কর আদায় করিবে, তাহাদের শাসন করিবে। তাঁহারই নিয়মে প্রজা ভূমির জন্য কর দেয়, রাজার মতই রাজার প্রতিভূকে মান্য করে। সে বিধানকে ইহারা অমান্য করিয়াছিল বলিয়াই এতবড় বন্যার শাস্তি তিনিই বিধান করিয়াছেন। এখন তাহার পরীক্ষা। প্রজার বিপর্যয়ে রাজার কর্তব্য তাহাদিগকে রক্ষা করা। রাজার প্রতিভূ হিসাবে সে কর্তব্য তাহার উপর আসিয়া বর্তিয়াছে। সে যদি সে-কর্তব্য পালন না করে, তবে তিনি তাহাকেও রেহাই দিবেন না। সে তাহাদিগকে ধান দিবে। তাহার কর্তব্যে সে অবহেলা করিবে না।

দুই হাত জোড় করিয়া সে ভগবানকে প্রণাম করিল। তিনি তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। দিতে বাকী রাখিয়াছেন কি?—জমি, বাগান, পুকুর, বাড়ি;—শেষ পর্যন্ত তাহার কল্পনাতীত বস্তু জমিদারি—সেই জমিদারিও তিনি তাহাকে দিয়াছেন। গোয়াল-ভরা গরু, খামার-ভরা মরাই, লোহার সিন্দুক-ভরা টাকা, সোনা, নোট—তাহাকে দুহাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহার জীবনের সকল কামনাই তিনি পরিপূর্ণ করিয়াছেন; পাপকামনা পূর্ণ করিয়াও অত্যাশ্চর্যভাবে সেই পাপ-প্রভাব হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অনিরুদ্ধের সঙ্গে যখন তাহার প্রথম বিরোধ বাধে, তখন হইতেই তাহার কামনা ছিল—অনিরুদ্ধের জমি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেশান্তরী করিবে এবং তাহার স্ত্রীকে সে দাসী করিয়া রাখিবে। অনিরুদ্ধের জমি সে পাইয়াছে—অনিরুদ্ধ দেশত্যাগী। অনিরুদ্ধের স্ত্রীও তাহার ঘরে স্বেচ্ছায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল! যাক্, সে যে পলাইয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে, ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

এইবার দেবু ঘোষকে শায়েস্তা করিতে হইবে। আরও কয়েকজন আছে,—জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, তিনকড়ি পাল, সতীশ বাউড়ী, পাতু

বায়েন, দুর্গা মুচিনী। তিনকড়ির ব্যবস্থা হইয়াছে। সতীশ, পাতু—ওগুলা পিঁপড়ে; তবে দুর্গাকে ভালমত সাজা দিতে হইবে। জগন, হরেনকে সে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। কোন মূল্যই নাই ও-দুটার। আর দেবুকে শায়েস্তা করিবার আয়োজনও আগে হইতেই হইয়া আছে। কেবল বন্যার জন্যই হয় নাই; পঞ্চগ্রামের সমাজের পঞ্চায়েত-মণ্ডলীকে এইবার একদিন আহ্বান করিতে হইবে। দেবু অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, আরও একটু সুস্থ হউক। দেখুড়িয়া হইতে বাড়িতে আসুক। চণ্ডীমণ্ডপে তাহাকে ডাকিয়া, পঞ্চগ্রামের লোকের সামনে তাহার বিচার হইবে।

কালু শেখ আসিয়া সেলাম করিয়া একখানা চিঠি, গোটাদুয়েক প্যাকেট ও একখানা খবরের কাগজ আনিয়া নামাইয়া দিল। কঙ্কণার পোস্টাপিসে এখন শ্রীহরির লোক নিত্য যায় ডাক আনিতে। এটা সে কঙ্কণার বাবুদের দেখিয়া শিখিয়াছে। খবরের কাগজ দেখিয়া, সে চিঠি লিখিয়া ক্যাটালগ আনায়; চিঠিপত্রের কারবার সামান্যই—উকিল-মোক্তারের নিকট হইতে মামলার খবর আসে। আর আসে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র। চিঠিখানায় একটা মামলার দিনের খবর ছিল, সেখানা দাসজীকে দিয়া শ্রীহরি খবরের কাগজটা খুলিয়া বসিল। কাগজটার মোটা-মোটা অক্ষরের মাথার খবরের দিকে চোখ বুলাইতে গিয়া হঠাৎ সে একটা খবর দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা—"ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রবল বন্যা।"...রুদ্ধনিশ্বাসে সে সংবাদটা পড়িয়া গেল।...

দেবুও অবাক হইয়া গেল।

সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, তবে শরীর এখনও দুর্বল। কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারের চিকিৎসায়, জগন ডাক্তারের তদ্বিরে এবং স্বর্ণের শুশ্রূষায়—সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। গতকল্য সে অন্নপথ্য করিয়াছে। আজ সে বিছানার উপর ঠেস দিয়া বসিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল নিজের কথা। একেবারে গেলেই ভাল হইত। আর সে পারিতেছে না। রোগশয্যায় দুর্বল ক্লান্ত শরীরে শুইয়া তাহার মনে হইতেছিল—পৃথিবীর স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ সব ফুরাইয়া গিয়াছে। কেন? কিসের জন্য তাহার বাঁচিয়া থাকা? বাঁচার কথা মনে হইলেই তাহার মনে পড়িতেছে তাহার নিজের ঘর। নিস্তব্ধ, জনহীন ধূলায় আচ্ছন্ন ঘর!... তিনকড়ির ছেলে গৌর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে প্রবেশ করিল—পণ্ডিত-দাদা!

—গৌর? দেবু বিস্মিত হইল—কি গৌর? ইস্কুল থেকে ফিরে এলে?

গৌর জংশনের ইস্কুলে পড়ে; এখন ইস্কুলের ছুটির সময় নয়। গৌর একখানা খবরের কাগজ তাহার সামনে ধরিয়া বলিল—এই দেখুন!

—কি ?···বলিয়াই সে সংবাদটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। "ময়ূরাক্ষী নদীতে ভীষণ বন্যা"! সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদ-দাতা কেহ লিখিয়াছে। বন্যার ভীষণতা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছে, "শিবকালীপুরের দেশপ্রাণ তরুণ কর্মী দেবনাথ ঘোষ বন্যার গতিরোধের জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নাই। উপরন্তু তিনি বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যান। বহু কষ্টে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।" ইহার পরেই স্থানীয় ক্ষতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে—"এখানকার অধিবাসীরা আজ সম্পূর্ণ রিক্ত ও গৃহহীন। শতকরা ষাটখানি বাড়ি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত খাদ্য-শস্য বন্যার প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে, সংসারিক সকল সম্বল নিশ্চিহ্ন, ভবিষ্যতের আশা কৃষিক্ষেত্রের খাদ্য-সম্পদ বন্যায় পচিয়া গিয়াছে; অনেকের গরুবাছুরও ভাসিয়া গিয়াছে। এই শেষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের চিরসঙ্গী মহামারীরও আশঙ্কা করা যাইতেছে। তাহাদের জন্য বর্তমানে খাদ্য চাই, ভবিষ্যতে বাঁচিবার জন্য বীজ-ধান চাই, মহামারী হইতে রক্ষার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা চাই; নতুবা দেশের এই অংশ শ্মশানে পরিণত হইবে। এই বিপন্ন নরনারীগণকে রক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর উপর ন্যস্ত; সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাইতেছি। এই স্থানে অধিবাসীগণের সাহায্য-কল্পে একটি স্থানীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের একনিষ্ঠ সেবক—উপরোক্ত শ্রীদেবনাথ ঘোষ সম্পাদক হিসাবে সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশবাসীর যথাসাধ্য সাহায্য—বিধাতার আশীর্বাদের মতই গৃহীত হইবে।"

দেবু অবাক হইয়া গেল। এ কি ব্যাপার খবরের কাগজে এ সব কে লিখিল? দেশপ্রাণ—দেশের একনিষ্ঠ সেবক! দেশময় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ বার্তা কে ঘোষণা করিয়া দিল?—খবরের কাগজটা একপাশে সরাইয়া, সে খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল।

গৌর কাগজখানা লইয়া বহুজনকে পড়িয়া শুনাইল। যে শুনিল সেই অবাক হইল। দেশের গেজেট দেবু পণ্ডিতের নামে জয়জয়কার করিয়াছে—ইহাতে তাহারা খুশী হইল। শ্রীহরি দেবুকে পতিত করিবার আয়োজন করিতেছে, দায়ে পড়িয়া শ্রীহরির মতেই তাহাদিগকে মত দিতে হইবে; তবুও তাহারা খুশী হইল। বারবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল—হ্যাঁ, তা বটে। ঠিক কথাই লিখেছে। এর মধ্যে মিথ্যা কিছু নাই। দশের দুঃখে দুঃখী, দশের সুখে সুখী—দেবু তো আমাদের সন্নেসী!

তিনকড়ি আস্ফালন করিয়া নির্মম নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে গালাগালি

দিল—থাম্‌-থাম্‌ তুমুখো সাপের দল, থাম্‌ তোরা। নেড়ী কুত্তার মতন যার কাছে যখন যাবে—তারই পা চাটবে আর ন্যাজ নাড়বে। দেবুর প্রশংসা করবার তোরা কে? যা ছিরে পালের কাছে যা, দল পাকিয়ে পতিত করগে দেবুকে। যা বেটারা, বল গিয়ে তোদের ছিরেকে—গেজেটে কি লিখেছে দেবুর নামে।

তিনকড়ির গালিগালাজ লোকে চুপ করিয়া শুনিল—মাথা পাতিয়া লইল। একজন শুধু বলিল—মোড়ল, পেট হয়েছে তুষমন—কি করব বল? তুমি যা বলছ তা ঠিক বটে।

—পেট আমার নাই? আমার ইস্তিরি-পুত্তু- কন্যে নাই?

এ কথার উত্তর তাহারা দিতে পারিল না। তিনকড়ি পেট-তুষমনকে ভয় করে না, তাহাকে সে জয় করিয়াছে—এ কথা তাহারা স্বীকার করে; এজন্য তাহাকে তাহারা প্রশংসা করে। আবার সময় বিশেষে—নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিতে তিনকড়ির এই যুদ্ধকে বাস্তববোধহীনতা বলিয়া নিন্দা করিয়া আত্মগ্লানি হইতে বাঁচিতে চায়। কতবার মনে করে—তাহারাও তিনকড়ির মত পেটের কাছে মাথা নিচু করিবে না। অনেক চেষ্টাও করে; কিন্তু পেট-তুষমনের নাগপাশের এমনি বন্ধন যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার পেষণে এবং বিষ-নিশ্বাসে জর্জরিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে হয়। তাই অত সাহস হয় না।

বাপ, পিতামহ, তাহাদেরও পূর্বপুরুষ ওই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে সন্তান সন্ততিকে বারবার সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে—"—পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়, মাথা ঠুকিয়ো না।" পেটের চেয়ে বড় কিছু নাই, অনাহারের যাতনার চেয়ে অধিকতর যাতনা কিছু নাই; উদরের অন্নকে বিপন্ন করিও না—তাহাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান। শ্রীহরির ঘরেই যে তাহাদের পেটের অন্ন,—কেমন করিয়া তাহারা শ্রীহরিকে অমান্য করিবে? তবুও মধ্যে মধ্যে তাহারা লড়াই করিতে চায়! বুকের ভিতর কোথায় আছে আর একটা গোপন ইচ্ছা—অন্তরতম কামনা, সে মধ্যে মধ্যে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়া বলে—না আর নয়, এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল!

এবার ধর্মঘটের সময়—সেই ইচ্ছা একবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যেটুকু সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত, পারিবার কথা—তাহার চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া কোথা দিয়া শেখেদের সঙ্গে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইল; সদর হইতে আসিল সরকারী

ফৌজ। পুরুষানুক্রমে সঞ্চয়-করা ভয়ে তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি দেখাইল দানার লোভ। আর তাহারা থাকিতে পারিল না। থাকিয়াই বা কি হইত? কি করিত? এই বন্যার পর যে শ্রীহরি ভিন্ন তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। কি করিবে তাহারা? শ্রীহরির কথায় সাদাকে কালো —কালোকে সাদা না বলিয়া তাহাদের উপায় কি? পেট-দুষমনের ভার কেহ নাও, পেট পুরিয়া খাইতে পাইবার ব্যবস্থা কর,—দেখ তাহারা কি না পারে!

তিনকড়ির গালিগালাজের আর শেষ হয় না।—ভীতু শেয়াল, লোভী গরু, বোকা ভেড়া, পেটে ছোরা মার্ গিয়ে। মরে যা তোরা! মরে যা! ঢোঁড়া সাপ—এক কোঁটা বিষ নেই! মরে যা তোরা, মরে যা!

দেখুড়িয়ার অধিবাসী তিনকড়ির এক জ্ঞাতি-ভাই হাসিয়া বলিল—মরে গেলে তো ভালই হয় ভাই তিনু। কিন্তু মরণ হোক বললেই তো হয় না— আর নিজেও মরতে পারি না! তেজের কথা—বিষের কথা বলছিস? তেজ, বিষ কি শুধুই থাকে রে ভাই! বিষয় না থাকলে বিষও থাকে না, তেজও থাকে না!

তিনকড়ি মুখ খিঁচিয়া উঠিল—বিষয়! আমার বিষয় কী আছে? কত আছে? বিষয়—টাকা—।

সে বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনুদাদা বিষয়—টাকা। তেজ বিষ আমারও একদিন ছিল। মনে আছে—তুমি আর আমি কঙ্কণার নিতাইবাবুকে ঠেঙিয়েছিলাম? রাত্রে আসত—দেঁতো গোবিন্দের বোনের বাড়ি! তাতে আমিই তোমাকে ডেকেছিলাম। আগে ছিলাম আমি। নিতাইবাবু মার খেয়ে ছ'মাস ভুগে শেষটা মরেই গেল—মনে আছে? সে করেছিলাম গাঁয়ের ইজ্জতের লেগে। তখন তেজ ছিল—বিষ ছিল। তখন আমাদের জম্‌জমাট সংসার। বাবার পঞ্চাশ বিঘে জমির চাষ, তিনখানা হাল; বাড়িতে আমরা পাঁচ ভাই—পাঁচটা মুনিষ; তখন তেজ ছিল বিষ ছিল। তারপর পাঁচ ভাইয়ে ভিন্ন হলাম; জমি পেলাম দশ বিঘে, পাঁচটা ছেলে মেয়ে; নিজেই বা কি খাই—ছেলেমেয়েদিগের মুখেই বা কি দিই? শ্রীহরি ঘোষের দোরে হাত না পেতে করি কি বল? আর তেজ, বিষ থাকে?

আবার একটু হাসিয়া বলিল—তুমি বলবে—তোমারই বা কি ছিল? ছিল কিনা—তুমিই বল? আর জমিও তোমার আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। তোমার তেজ-বিষ মরে নাই, আছে। তাও তো তেজের দণ্ড অনেক দিলে গো। সবই তো গেল। রাগ করো না, সত্যি কথা বলছি। ঠিক আগেকার তেজ কি তোমারই আছে?

তিনকড়ি এতক্ষণে শান্ত হইল। কথাটা নেহাত মিথ্যা বলে নাই। আগেকার তেজ কি তাহারই আছে? আজকাল সে চিৎকার করিলে লোকে হাসে। আর ওই ছিল—ছিরে আগে চিৎকার করিলে লোকে—সকলেই তো তাহার উত্তর করিত—সামনা-সামনি দাঁড়াইত। কিন্তু আজ ছিরে শ্রীহরি হইয়াছে! তাহার তেজের সম্মুখে মানুষ—আগুনের সামনে কুটার মত কাঁপে; কুটা কাঁচা হইলে শুকাইয়া যায়, শুক্‌না হইলে জ্বলিয়া উঠে।

লোকটি এবার বলিল—তিনু-দাদা, শুনলাম নাকি গেজেটে নিকেছে—দেবুর কাছে টাকা আসবে—সেইসব টাকা-কাপড় বিলি হবে।

তিনকড়ি এতটা বুঝিয়া দেখে নাই; সে এতক্ষণ আস্ফালন করিতেছিল—গেজেটে শ্রীহরিকে বাদ দিয়া কেবল দেবুর নাম প্রকাশিত হইয়াছে—এই গৌরবে সে যে-কথাটা শ্রীহরিকে বারবার বলে—সেই কথাটা গেজেটেও বলিয়াছে—সেই জন্য। সে বলে—তুই বড়লোক আছিস্ আপনার ঘরে আছিস, তারজন্যে তোকে খাতির করব কেন? খাতির করব তাকেই যে খাতিরের লোক। স্বর্ণের পাঠ্যপুস্তক হইতে কয়েকটা লাইন পর্যন্ত সে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে—

"আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয় বড় গুণ যার।"

ধনী শ্রীহরিকে বাদ দিয়া গেজেট গুণী দেবুর জয়-জয়কার ঘোষণা করিয়াছে—সেই আনন্দেই সে আস্ফালন করিতেছিল। হঠাৎ এই কথাটা শুনিয়া তাহারও মনে হইল হ্যাঁ, গেজেট তো লিখিয়াছে। যে যাহা সাহায্য করিবেন, বিধাতার আশীর্বাদের মতই তাহা লওয়া হইবে।

তিনকড়ি বলিল—আসবে না? নিশ্চয় আসবে। নইলে গেজেটে নিখলে ক্যান?…তিনকড়ির সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে ওই কথাটা প্রচার করিবার জন্যই ভল্লা পাড়ায় চলিয়া গেল। রামা, ও রামা… তেরে! গোবিন্দে! ছিদমে! কোথা রে সব?

দেবু তখনও ভাবিতেছিল। এ কে করিল? বিশু-ভাই নয় তো? কিন্তু বিশু বিদেশে থাকিয়া ও সব জানিবে কেমন করিয়া? ঠাকুরমশায় লিখিয়া জানাইলেন? হয়তো তাই। তাই সম্ভব। কিন্তু এ কী করিল বিশু-ভাই? এ বোঝা আর সহিতে পারিবে না! সে মুক্তি চায়। জীবন তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। ক্লান্তি, অরুচি, তিক্ততায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। আর দুই-তিনটা দিন গেলেই সে তিনকড়ি-কাকার বাড়ি হইতে চলিয়া যাইবে!

তিনকড়ির ঋণ তাহার জীবনে শোধ হইবার কথা নয়! রাম ভল্লা তাহাকে বন্যার স্রোত হইতে টানিয়া তুলিয়াছে। কুসুমপুরের ও-মাথা হইতে তিনখানা গ্রাম পার হইরা দেখুড়িয়ার ধার পর্যন্ত সে ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর হইতে তিনকড়ি তাহাকে নিজের ঘরে আনিয়া গোষ্ঠীসুদ্ধ মিলিয়া যে সেবাটা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। কিনকড়ির স্ত্রী ও স্বর্ণ, নিজের মা-বোনের মত সেবা করিয়াছে; গৌর সেবা করিয়াছে সহোদর ভাইয়ের মত। তিনকড়ি তাহাকে আপনার খুড়ার মত যত্ন করিয়াছে। কিন্তু এও তাহার সহ্য হইতেছে না, কোন রকমে আপনার পা-ত্নইটার উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইবার বল পাইলেই সে চলিয়া যাইবে। এই অকৃত্রিম স্নেহের সেবাযত্ন তাহাকে অস্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিয়াছে। এও তাহার ভাল লাগিতেছে না। খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে লোকের ভাঙা ঘর, বন্যার জলে হাজিয়া-যাওয়া শাক-পাতার ক্ষেত, পথের ত্ব'ধারে পলি-লিপ্ত ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা, গ্রাম্য পথখানি যেখানে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে পড়িয়াছে সেইখান দিয়া পঞ্চগ্রামের মাঠের লম্বা একটা ফালি অংশ কাদায় জলে ভরা—শস্যহীন মাঠ। কিন্তু এসবের কোন প্রতিফলন তাহার চিন্তার মধ্যে চাঞ্চল্য তুলিতেছে না। সে আর পারিতেছে না। সে আর পারিবে না।

—দেবু-দা! গৌর আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে সেই কাগজখানা। দেবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—বল!

—এটা কেন লিখেছে দেবু-দা? এই যে—?

—কি?

—এই যে, এইখানটা। খবরের কাগজটা দেবুর বিছানার উপর রাখিয়া গৌর বলিল—এই যে।

দেবু হাসিয়া বলিল—কি কঠিন যে বুঝতে পারলে না? কই দেখি।

গৌর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আমি না। আমিও তো বললাম—ও আবার কঠিন কি? স্বন্ন বল্ছে।

—কোন্ জায়গাটা?

—এই যে, "এই সমস্ত বিপন্ন নরনারীকে রক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর উপর ন্যস্ত। সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাইতেছি। তা স্বন্ন বলছে,—ওই যে স্বন্ন দাঁড়িয়ে আছে। আয়-না স্বন্ন, আয়-না এখানে!

দেবুও সস্নেহে আহ্বান করিল—এস স্বর্ণ, এস!

স্বর্ণ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দেবু বলিল—এর মানে তো কিছু কঠিন নয়।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—দায়িত্ব লিখেছে কেন তাই শুধোলাম দাদাকে। এ তো লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়া। যার দয়া হবে দেবে—না হয় দেবে না। সে তো দায়িত্ব নয়।

কথাগুলি দেবুর মস্তিষ্কে গিয়া অদ্ভুতভাবে আঘাত করিল।…তাই তো!

স্বর্ণ বলিল—আর আমাদের এখানে বান হয়েছে, তাতে অন্য জায়গার লোকের দায়িত্ব হতে যাবে কেন?

দেবু অবাক হইয়া গেল। সে বুদ্ধিমতী মেয়েটির অর্থ-বোধের সূক্ষ্ম তারতম্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবুর সে দৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ কিন্তু একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল—আমি বুঝতে পারি নাই…সে লজ্জিত হইয়াই চলিয়া গেল।…দেবু তখনও অবাক হইয়া ভাবিতেছিল এ কথাটা তো সে ভাবিয়া দেখে নাই। সত্যই তো—নাম-না-জানা এই গ্রাম কয়খানির দুঃখ-দুর্দশার জন্য দেশ-দেশান্তরের মানুষের দয়া হইতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব তাহাদের কিসের? দায়িত্ব? ওই কথাটা গুরুত্বে ও ব্যাপ্তিতে তাহার অনুভূতির চেতনায় ক্রমশঃ বিপুল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই পঞ্চগ্রামও পরিধিতে বাড়িয়া বিরাট হইয়া উঠিল।

সে ডাকিল—স্বর্ণ।

গৌর বসিয়া তখনও ওই লাইন কয়টি পড়িতেছিল। তাহার মনেও কথাটা লাগিয়াছে। সে বলিল—স্বর্ণ চলে গিয়েছে তো!

—ও। আচ্ছা, ডাক তো তাকে একবার।

ডাকিতে হইল না, স্বর্ণ নিজেই আসিল। গরম দুধের বাটি ও জলের গেলাস হাতে করিয়া আসিয়া, বাটিটা নামাইয়া দিয়া বলিল—খান!

দেবু বলিল—তুমি ঠিক ধরেছ স্বর্ণ। তোমার ভুল হয় নাই। তোমার বুদ্ধি দেখে আমি খুশী হয়েছি।

স্বর্ণ লজ্জিত হইয়া এবার মুখ নামাইল।

দেবু বলিল—তুমি রবীন্দ্রনাথের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটি পড়েছ?

"দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,—
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা'?"

—পড়েছ?

স্বর্ণ বলিল—না।

—গৌর, তুমি পড়নি ?

—না।

—শোন তবে।

স্বর্ণ বাধা দিয়া বলিল—আগে আপনি দুধটা খেয়ে নিন। জুড়িয়ে যাবে। দুধ খাইয়া, মুখে জল দিয়া দেবু গোটা কবিতাটা আবৃত্তি করিয়া গেল।

স্বর্ণ বলিল—আমাকে লিখে দেবেন কবিতাটি ?

দেবু বলিল—তোমাকে এই বই একখানা প্রাইজ দেব আমি !

স্বর্ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—পণ্ডিতমশায় আছেন ? কে বাহির হইতে ডাকিল।

গৌর মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল—ডাক-পিওন।

দেবু বলিল—এস। চিঠি আছে বুঝি ?

—চিঠি—মনি-অর্ডার।

—মনি-অর্ডার !

—পঞ্চাশ টাকা পাঠাচ্ছেন বিশ্বনাথবাবু।

বিশ্বনাথ চিঠিও লিখিয়াছে। তাহা হইলে এ সমস্ত বিশ্বনাথই করিয়াছে। লিখিয়াছে—দাদুর পত্রে সব জানিয়াছি ; পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম, আরও টাকা সংগ্রহ করিতেছি। তোমার কাছে অনেক মনি-অর্ডার যাইবে, আমরাও কয়েকজন শীঘ্র যাইব। কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।

টাকাটা লইয়া দেবু চিন্তিত হইয়া পড়িল। বিশ্বনাথ লিখিয়াছে—"কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।" পঞ্চাশ টাকায় সে কী কাজ করিবে ? গৌরকে প্রশ্ন করিল—কাকা কোথায় গেলেন দেখ তো গৌর !

"দশে মিলি করি কাজ—হারি জিতি নাহি লাজ।"

দেবু অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দশজনের পরামর্শ লইয়াই কাজ করিল। এই কাজে আজ সে একটি পুরানো মানুষের মধ্যে এক নূতন মানুষকে আবিষ্কার করিল। খুব বেশী না হইলেও, তবু সে খানিকটা আশ্চর্য হইল। তিনু-কাকার ছেলে গৌর। গৌর, সুস্থ সবল ছেলে, কিন্তু শান্ত ও বোকা। বুদ্ধি সত্যই তাহার কম। সেই গৌরের মধ্যে এক অপূর্ব গুণ সে আবিষ্কার করিল। সে স্কুলে পড়ে, স্কুলের ছাত্রদের দেবু ভাল করিয়াই জানে। নিজেও সে উৎসাহী ছাত্র ছিল, এবং পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া, গৌরের অপেক্ষা কমবয়সী হইলেও—অনেক ছেলে লইয়া কারবার করিয়াছে। এক ধারার ছেলে আছে যাহারা পাড়ার ভাল কাজ-কর্মেও উৎসাহী ; আর একধারার ছেলে আছে যাহারা পড়ায় ভাল নয় অথচ দুর্দান্ত, কাজ-কর্মে প্রচণ্ড উৎসাহ। এ

দুয়ের মাঝামাঝি ছেলেও আছে যাহাদের একটা আছে আর একটা নাই। আবার দুটাতেই পেছনে পড়িয়া থাকে, কচ্ছপের মত যাহাদের জীবনের গতি এমন ছেলেও আছে। গৌর ওই শেষের ধরনের ছেলে বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল। কিন্তু আজ সে নিজের অদ্ভুত পরিচয় দিল! এ পরিচয় অবশ্য তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; সে তিনকড়ির ছেলে। দশে মিলিয়া কাজ করার আয়োজনটায় সে একা যেন দশজনের শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

তিনকড়ি বলিয়াছিল আমাদের তাঁবের লোক যারা, তা'দিগেই দু-চার টাকা ক'রে নিয়ে কাজ আরম্ভ কর।

দেবু বলিল—দেখুন, পাঁচজনকে ডেকে যা হয় করা যাক। নইলে শেষে কে কি বলবে।

তিনকড়ি বলিল—বলবে কচু। বলবে আবার কে কি? কোন্ বেটার ধার ধারি আমরা? কারো বাবার টাকা? আর ডাকবেই বা কাকে?

দেবু হাসিল; তিনু-কাকার কথাবার্তা সে ভাল করিয়াই জানে। হাসিয়া বলিল—আমি বলছি জগন ডাক্তার, হরেন, ইরসাদ, রহম, এই জনকয়েককে।

রহম? না রহমকে ডাকতে পাবে না। যে লোক দল ভেঙে জমিদারের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে তাকে ডাকতে হবে না।

—না তিনু-কাকা, আপনি ভেবে দেখুন। মানুষের ভুল-চুক হয়। আর তা ছাড়া মানুষকে টেনে আপনার করে নিলেই মানুষ আপনার হয়, আবার ঠেলে ফেলে দিলেই পর হয়ে যায়।

তিনকড়ি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কথাটা তাহার মনঃপুত হইল না।

দেবু বলিল—কাকে তা হলে পাঠাই বলুন দেখি? রামকে একবার পাওয়া যাবে না?

গৌর বসিয়াছিল, সে উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমি যাব দেবুদা।

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ। রাম তো জাতে ভল্লা। রামকে ডাকতে গেলে কেউ যদি কিছু মনে করে?

তিনকড়ি গর্জিয়া উঠিল—মনে করবে? কে কি মনে করবে? কোন শালাকে খাবার নেমন্তন্ন করছি যে মনে করবে?···তাহার মনের চাপা-দেওয়া অসন্তোষটা একটা ছুতা পাইয়া ফাটিয়া পড়িল।

গৌর অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দেবু বলিল—না—না। গৌর ঠিকই বলেছে তিনু-কাকা।

—ঠিক বলেছে—যাক্, মরুক।...বলিয়াই সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। বাপের অমতে ছেলেকে যাইতে বলিতে দ্বিধা হইল তাহার।

গৌর বলিল—দেবুদা! আমি যাই?

—যাবে? কিন্তু তিনু-কাকা—

—বাবা তো যেতে বললে।

—না, যেতে বললেন কই? রাগ করে উঠে গেলেন তো।

স্বর্ণ ঘরে ঢুকিল, সে হাসিয়া বলিল—না, বাবা ওই ভাবেই কথা বলেন। মরগে যা, খালে যা—এসব—বাবার কথার কথা।

গৌর হাসিয়া বলিল—বলে না কেবল স্বন্নকে।...

গৌর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—সকলকেই খবর দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরীকেও খবর দিয়া আসিয়াছে। দেবু খুশি হইয়া বলিল—বেশ করেছ। বৃদ্ধ চৌধুরী পাকা লোক, অথচ তাহার কথাটাই দেবুর মনে হয় না। গৌর বলিল—মহাগ্রামের ঠাকুরমশায়কেও খবর দিয়ে এসেছি দেবুদা।

দেবু সবিস্ময়ে বলিল—সে কি! তাঁকে কি আসতে বলতে আছে? এ তুমি করলে কি? কি বললে তুমি তাঁকে?

গৌর বলিল—তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। ওঁদের বাড়িতে বললাম—আমাদের বাড়িতে মিটিং হবে আজ। বানের মিটিং। তাই বলতে এসেছি।

স্বর্ণ হাসিয়া সারা হইয়া গেল—বানের আবার মিটিং হল?

অপরাহ্ণে সকলেই আসিয়া হাজির হইল। জগন, হরেন, ইরসাদ, রহম এবং তাহাদের সঙ্গে আরও অনেক। সতীশ ও পাতু আসিয়াছে; দুর্গাও আসিয়াছে। সে নিত্যই আসে। তাহারই হাতে দেবুর বাড়ির চাবি। সে-ই ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে, দেখে শুনে। বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরীও আসিয়াছে। বৃদ্ধ হাঁটিয়া আসিতে পারে নাই, গরুর গাড়ী জুড়িয়া আসিয়াছে; মুশকিল হইয়াছে—তিনকড়ি নাই। সে যে সেই বাহির হইয়াছে, এখনও ফেরে নাই।

বৃদ্ধ বলিল—বাবা-দেবু, খোঁজ তো দু'বেলাই নি। নিজে আসিতে পারি নাই।...কথার মাঝখানে হাসিয়া বলিল—অন্য দিকে টানছে কিনা; এদিকে তাই পা বাড়াতে পারি না। তা তোমার তলব পেয়ে এ-দিক্‌কার টানটা বাড়ল, হাঁটতে পারলাম না—গরুর গাড়ী করেই এলাম।

দেবু বলিল—আমার শরীর দেখছেন, নইলে—

—হ্যাঁ, সে আমি জানি বাবা! তবে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

—এই যে কাজ সামান্যই। তিনকড়ি-কাকার জন্যে—। তা হোক আমরা বরং আরম্ভ করি ততক্ষণ।

সমস্ত জানাইয়া—কাগজ ও মনি-অর্ডারের কুপন দেখাইয়া টাকাটা সকলের সামনে রাখিয়া দেবু বলিল—বলুন, এখন কি করব?

জগন বলিল—গরীবদের খেতে দাও। যাদের কিছু নাই তাদের দাও।

হরেন বলিল—আই সাপোর্ট ইট।

দেবু বলিল—চৌধুরীমশায়?

চৌধুরী বলিল—কথা তো ডাক্তার ভালই বলেছেন। তবে আমি বলছিলাম—চাষের এখনপনের-বিশ দিনসময় আছে। টাকাটায় বীজধান কিনে দিতে পারলে—

রহম ও ইরসাদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—এ খুব ভাল যুক্তি।

জগন বলিল—গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে তো?

দেবু বলিল—পঞ্চাশ টাকাতে তাদের ক'দিন বাঁচাবে?

—এর পরেও টাকা আসবে!

—সেই টাকা থেকে দেবে তখন!

গৌর দেবুর কানের কাছে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—দেবুদা. আমরা সব ছেলেরা মিলে—যে-সব গাঁয়ে বান হয় নাই—সেই সব গাঁ থেকে যদি ভিক্ষে করে আনি!

গৌরের বুদ্ধিতে দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠিক এই সময়েই প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বাহির হইতে ডাক আসিল—পণ্ডিত রয়েছেন?

ন্যায়রত্ন মহাশয়। সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন ভিতরে আসিয়া, একটু কুণ্ঠার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমার আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল।

দেবু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমাকে মার্জনা করতে হবে! আমি আপনাকে খবর দিতে বলিনি। তিনকড়ি-কাকার ছেলে গৌর নিজে একটু বুদ্ধি খরচ করতে গিয়ে এই কাণ্ড করে বসেছে।

—তিনকড়ির ছেলেকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমরা দশের সেবায় পুণ্যার্জনের যজ্ঞ আরম্ভ করেছ; সে যজ্ঞভাগ দিতে আমাকে আহ্বান জানিয়ে এসে সে ভালই করেছে।

গৌর ঢিপ্ করিয়া তাঁহার পায়ে প্রণতঃ হইল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কই, তিনকড়ির কন্যাটি কই? বড় ভাল মেয়ে। আমার একটু জল চাই। পা ধুতে হবে।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি জলের বালতি ও ঘটি হাতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমি ধুয়ে দিচ্ছি চরণ।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি কিছু সাহায্য এনেছি পণ্ডিত। চাদরের খুঁট খুলিয়া তিনি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া তিনিও বলিলেন—প্রথমে বীজ-ধান দেওয়াই উচিত। বীজের জন্য ধানও আমি কিছু সাহায্য করব পণ্ডিত।

সকলে উঠিলে দুর্গা বলিল—কবে বাড়ি যাবে জামাই-পণ্ডিত। আমি আর পারছি না। তোমার বাড়ির চাবি তুমি নাও।

দেবু বলিল—কাল কিংবা পরশুই যাব দুর্গা। দু'দিন রাখ চাবিটা!

দুর্গা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিল। বলিল—বিলু-দিদির ঘর, বিলু-দিদি নাই, খোকন নাই—যেতে আমার মন হয় না। তার ওপর তুমি নাই। বাড়ি যেন হাঁ হাঁ করে গিলতে আসছে।

এতক্ষণে তিনকড়ি ফিরিল; পিঠে ঝুলাইয়া আনিয়াছে প্রকাণ্ড এক কাতলা মাছ। প্রায় আধমণ ওজন হবে। আঠারো সেরের কম তো কোনমতেই নয়। দড়াম করিয়া মাছটা ফেলিয়া বলিল—বাপরে, মাছটার পেছু পেছু প্রায় এক কোশ হেঁটেছি। যেয়ো না হে, যেয়ো না, দাঁড়াও; মাছটা কাটি, খানকতক করে সব নিয়ে যাবে। ডাক্তার, ইরসাদ, রহম! দাঁড়াও ভাই; দাঁড়াও একটুকুন!

উনিশ

পনের দিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল! দুইটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। শ্রীহরি ঘোষ পঞ্চায়েত ডাকিয়া দেবুকে পতিত করিল। অন্যদিকে বন্যা-সাহায্য-সমিতি বেশ একটি চেহারা লইয়া গড়িয়া উঠিল। সাহায্য-সমিতির জন্যই অঞ্চলটায় বেশী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের নাতি বিশ্বনাথবাবু নাকি গেজেটে বানের খবর ছাপাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহর হইতে চাঁদা তুলিতেছেন; শুধু শহর নয়, অনেক পল্লীগ্রাম হইতেও লোক টাকা পাঠাইতেছে। প্রায় নিত্যই দেবু পণ্ডিতের নামে কত নাম-না-জানা গ্রাম হইতে পাঁচ টাকা দশ টাকার মনি-অর্ডার আসিতেছে। পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই প্রায় পাঁচশো টাকা দেবুর হাতে আসিয়াছে। যাহাদের ঘর ভাঙিয়াছে, তাহাদের ঘরের জন্য সাহায্য দেওয়া হইবে। বীজধান ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মাঠে 'আছাড়ো'র বীজ চারা হইতে যে যেমন পারিয়াছে—সে তেমন জমি আবাদ করিতেছে।

ভাদ্রের সংক্রান্তি চলিয়া গেল; আজ আশ্বিনের পয়লা। "আশ্বিনের রোপ কিস্‌কে?" অর্থাৎ কিসের জন্য। তবু লোকে এখনও রোয়ার কাজ চালাইতেছে। মাসের প্রথম পাঁচটা দিন গতমাসের সামিল বলিয়া ধরা হয়। তাহার উপর এবার ভাদ্র মাসের একটা দিন কমিয়া গিয়াছে—উনত্রিশ দিনে মাস ছিল। তবে বিপদ হইয়াছে—লোকের ঘরে খাবার নাই; তাহার উপর আরম্ভ হইয়াছে কম্প দিয়া জ্বর—ম্যালেরিয়া। ভাগ্য তবু ভাল বলিতে হইবে যে কলেরা হয় নাই। ঘরে ঘরে শিউলি পাতার রস খাওয়ার এক নূতন কাজ বাড়িয়াছে। ভাদ্রের শেষে শিউলি গাছগুলা নূতন পাতায় ভরিয়া উঠে, ফুল দেখা দেয়, এবার গাছের পাতা নিঃশেষ হইয়া গেল—এ বৎসর গাছগুলার ফুল হইবে না। জ্বর আরম্ভ না হইলে আরম্ভ কিছু বেশী জমি আবাদ করা যাইত। কাল ম্যালেরিয়া! ম্যলেরিয়া প্রতি বৎসরেই, এই সময়টায় কিছু কিছু হয়, এবার বানের পর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে ভীষণভাবে। ওষুধ বিনা-পয়সায় পাওয়া যায় কঙ্কণার ডাক্তারখানায় আর জংশন শহরের হাসপাতালে; কিন্তু চাষ কামাই করিয়া এতটা পথ রোগী লইয়া যাওয়া সহজ কথা নয়। জগন ডাক্তার বিনা পয়সায় দেখে, কিন্তু ওষুধের দাম নেয়। না-লইলেই বা তাহার চলে কি করিয়া? তবে দেবু পণ্ডিত কাল বলিয়াছে—কলিকাতা হইতে কুইনাইন এবং অন্যান্য ওষুধ আসিতেছে। জেলাতেও নাকি দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে—একজন ডাক্তার এবং ওষুধের জন্য।

লোকের বিস্ময়ের আর অবধি নাই। বুড়া হরিশ সেদিন ভবেশকে বলিল—যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে।

ভবেশ বলিল—তা বটে হরিশ-খুড়ো। দেখলাম অনেক। বান তো আগেও হয়েছে গো।...

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। বর্ষা এখানে প্রবল ঋতু। জল-প্লাবন অল্পবিস্তর প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। পাহাড়িয়া নদী ময়ূরাক্ষীর বুকেও বিশ-ত্রিশ বৎসর অন্তর প্রবল বর্ষায় এইভাবেই সর্বনাশা রাক্ষসীর বন্যায় জল নামে। গ্রাম ভাসিয়া যায়, শস্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়—এ তাহারা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছে। তখনকার আমলে এমন বন্যার পর দেশের একটা দুঃসময় আসিত। সে দুঃসময়ে স্থানীয় ধনী এবং জমিদারেরা সাহায্য করিতেন। ধনীরা অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা গরীবদের খাইতে দিত; মহাজনেরা বিনা-সুদে বা অল্প-সুদে ধান ঋণ দিত চাষীদের। জমিদার সে সময় আশ্বিন-কিস্তির খাজনা আদায় বন্ধ রাখিত, সে বৎসরের খাজনা বাকি পড়িলে সুদ লইত না। দয়ালু জমিদার আংশিকভাবে খাজনা মাফ্ দিত, আবার দুই-একজন গোটা বৎসরটাই খাজনা

রেয়াত করিত। চাষীদের অবস্থা তখন অবশ্য এখনকার চেয়ে অনেক ভাল ছিল, এমন করিয়া সম্পত্তিগুলা টুকরা টুকরা হইয়া গৃহস্থেরা গরীব হইয়া যায় নাই। তাহারা কয়টা মাস কষ্ট করিত, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে সামলাইয়া উঠিত।

গরীব-দুঃখী অর্থাৎ বাউড়ী-ডোম-মুচিদের দুর্দশা তখনও যেমন, এখনও তেমনই। এই ধরনের বিপর্যয়ের পর—তাহাদের মধ্যেই মড়ক হয় বেশী। ভিক্ষা ছাড়া গতি থাকে না, দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। আবার দেশের অবস্থা ফিরিলে পিতৃপুরুষের ভিটার মমতায় অনেকেই ফেরে। এমন দুর্দশায় সম্পন্ন গৃহস্থেরা গভর্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত করিয়া তাকাবী ঋণ লইত, পুকুর কাটাইত, জমি কাটাইত, গরীবরা তাহাতে খাটিয়া খাইত।

হরিশ বলিল—ওদের কাল তো এখন ভাল হে। নদীর পুল পার হলেই ওপারে জংশন। বিশটা কলে ধোঁয়া উঠছে। গেলেই খাটুনি—সঙ্গে সঙ্গে পয়সা। তা তো বেটারা যাবে না!

ভবেশ বলিল—যায় নাই তাই রক্ষে খুড়ো! গেলে আর মুনিষ-বাগাল মিলত না!

হরিশ বলিল—তা বটে। তবে এবারে আর থাকবে না বাবা। এবার যাবে সব। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

ভবেশ বলিল—দেবু তো লেগেছে খুব! ইস্কুলের ছোঁড়ারা সব গাঁয়ে-গাঁয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে! চাল, কাপড়, পয়সা।

গৌর দেবুকে যে কথাটা কানে-কানে বলিয়াছিল, সে কথাটা কাজে পরিণত হইয়াছে। এক-একজন বয়স্ক লোকের নিয়ন্ত্রণে ছেলের দল যে-সব গ্রামে বন্যা হয় নাই। সেইসব গ্রাম ঘুরিয়া, গান গাহিয়া চাল, কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিতেছে। পনের-কুড়ি মণ চাউল ইহার মধ্যে জমা হইয়াছে। কোন এক ভদ্রলোকের গ্রামে—মেয়েরা নাকি গয়না খুলিয়া দিয়াছে। খুব দামী গয়না নয়; আংটি দুল, নাকছাবি ইত্যাদি। এ-সবই এই অঞ্চলের লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিতেছে। লোকের বাড়িতে গরীবেরা নিজে যখন ভিক্ষা চাহিতে যায়, তখন লোকে দেয় না, কটু কথা বলে। কত কাতরভাবে কাকুতি করিয়া তাহাদের ভিক্ষা চাহিতে হয়। অথচ এই ভিক্ষার মধ্যে—ওই ভিক্ষায় দীনতা নাই। আবার দেবুর বাড়িতে সাহায্য যাহারা লইতেছে, তাহাদের গায়েও ভিক্ষার দীনতার আঁচ লাগিতেছে না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অপূর্ব আত্মতৃপ্তির ভাব যেন লুকানো আছে। আগে নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলি দারিদ্র্যের জন্য ভিক্ষা করিতে গিয়া একটা মর্মান্তিক

অপরাধবোধের গ্লানি অনুভব করিত; সেই অপরাধ-বোধটা যেন ঘুচিয়া গিয়াছে।

ভবেশ বলিল—বেজায় বাড় কিন্তু বেড়ে গেল ছোটলোকের দল। ওই সাহায্য-সমিতির চাল পেয়ে বেটাদের বৃদ্ধি হয়েছে দেখেছ? পরশু আমাদের মান্দের (বড় রাখাল) ছোঁড়া এক বেলা এল না। তা গেলাম পাড়াতে। ভাবলাম অসুখ-বিসুখ হয়েছে, গিয়ে শুনলাম তিনকড়ির বেটা গৌরের সঙ্গে জংশনে গিয়াছে—কি কাজ আছে। আমার রাগ হয়ে গেল। রাগ হয় কিনা তুমিই বল? বললাম—তা হলে কাজকর্ম করে আর কাজ নাই—আমি জবাব দিলাম। ছোঁড়ার মা বললে কি জান? বললে—তা মশায় কি করব বল? পণ্ডিতমশায়রা খেতে দিচ্ছে লোককে এই বিপদে। তাদের একটা কাজ না করে দিলে কি চলে? যদি জবাবই দাও তো দিয়ো।

হরিশ হাসিয়া বলিল—ও হয়। চিরকালই ওই হয়ে আসছে। বুঝলে—আমরা তখন ছোট, এই তের-চৌদ্দ বছর বয়সে! তখন রামদাস গোঁসাই এসেছিল। নাম শুনেছ তো?

ভবেশ প্রণাম করিয়া বলিল—ওরে বাপ্‌রে! আমি দেখেছি যে!

হরিশ বলিল—দেখেছ?

—হ্যাঁ, ইয়া জটা। দেখি নাই। তখন অবিশ্যি আর এখানে থাকেন না। মধ্যে মধ্যে আসতেন।

—তাই বল। আমি যখনকার কথা বলছি, গোঁসাই বাবা তখন এখানেই থাকতেন। কঙ্কণার উদিকের মাথার ময়ূরাক্ষীর ধারে তাঁর আস্তানা। গোঁসাই লাগিয়ে দিলেন মচ্ছবের ধুম। লোকে নিজেরা মাথায় করে দু-মণ-দশমণ চাল দিয়ে আসত। গরীব-দুঃখী যে যত পারত খেতে পেত, কেবল মুখে বলতে হত "বলো ভাই রাম রাম, সীতারাম।" গরীব-দুঃখীর মা বাপ ছিলেন গোঁসাই। তখন এমনই বাড় হয়েছিল ছোটলোকের—জমিদার, গেরস্ত একটা কথা বললেই বেটারা গিয়ে দশখানা করে লাগাত গোঁসাইয়ের কাছে। গোঁসাইও সেই নিয়ে জমিদার-গেরস্তদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। শেষকালে লাগল কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে। তা গোঁসাই লড়েছিলেন অনেক দিন। শেষকালে একদিন এক ঘেমটাওয়ালী এসে হাজির হল। বাবুদের চক্রান্ত, বুঝলে? গোঁসাইকে ধরে বললে—শহরে গিয়ে তুমি আমার ঘরে ছিলে, টাকা বাকী আছে, টাকা দাও। নইলে···।—এই নিয়ে সে এক মহাকেলেঙ্কারি। গোঁসাই রেগে-মেগে চলে গেলেন, বলে গেলেন—কল্কি-মহারাজ না এলে—দুষ্টের দমন হবে না।···ব্যস, তারপর আবার যে-কে-সেই—সেই পায়ের তলায়। এও দেখো তাই হবে।

সেকালে রামদাস গোঁসাইয়ের কাছে ওই রূপ-পসারিণী আসিতেই লোকে গোঁসাইকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পর পর তিন-চারিদিন তৈয়ারী ভাত-তরকারী নষ্ট হইয়া গেল, কেহ আসিল না। যাহাদের হইয়া গোঁসাই জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন—তাহারাও আসে নাই, রামদাস গোঁসাই রোষে ক্ষোভে এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। একালে কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। দেবুর সঙ্গে কামার-বউ এবং দুর্গাকে জড়াইয়া অপবাদটা লইয়া আলোচনা লোকে যথেষ্ট করিয়াছে, পঞ্চায়েত দেবুকে পতিত করিয়াছে; তবু লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

দেবুর প্রতি ন্যায়রত্নের বিশ্বাস অগাধ। কিন্তু জনসাধারণকে তিনি সে বিশ্বাস করেন না; এই বিষয়টা লইয়া তিনিও ভাবিয়াছেন। তাঁহার এক-সময় মনে হয়—সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে, সমাজ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মবিশ্বাসও লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেইজন্য নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত শ্রীহরি ঘোষের নেতৃত্বে থাকিয়া দেবুকে পতিত করিবার সংকল্প করিলেও সেটা ঠিক কাজে পরিণত হইল না। ইহারই মধ্যে একদিন শিবকালীপুরের চণ্ডীমণ্ডপে—বর্তমানে শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়িতে—ঘোষের আহ্বানে নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় অবস্থাসম্পন্ন সংগৃহস্থ যাহারা, তাহাদের অনেকেই আসিয়াছিল। গরীবেরাও একেবারে না-আসা হয় নাই। দেবুকে ডাকা হইয়াছিল—কিন্তু সে আসেই নাই। বলিয়া দিয়াছিল—কামার-বউ শ্রীহরি ঘোষের বাড়িতে আছে; পূর্বে সে তাহাকে সাহায্য করিত নিরাশ্রয় বন্ধুপত্নী হিসাবে, কিন্তু এখন তাহার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। দুর্গা তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। দুর্গার মামার বাড়ি তাহার শ্বশুরের গ্রামে, সেই হিসাবে দুর্গা তাহার স্ত্রীকে দিদি বলিত, তাহাকে জামাই-পণ্ডিত বলে। সে দুর্গাকে স্নেহ করে। দুর্গা তাহার বাড়িতে কাজকর্ম করে এবং বরাবরই করিবে; সেও তাহাকে চিরদিন স্নেহ এবং সাহায্য করিবে; কোনদিন তাড়াইয়া দিবে না। এই তাহার উত্তর। এই শুনিয়া পঞ্চায়েত যাহা খুশি হয় করিবেন।

পঞ্চায়েত তাহাকে পতিত করিয়াছে।

পতিত করিলেও জনসাধারণ দেবুর সংস্রব ত্যাগ করে নাই। লোকে আসে যায়, দেবুর ওখানে বসে, পান-তামাক খায়। বিশেষ করিয়া সাহায্য-সমিতি লইয়া দেবুর সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। আবার সাধারণ অবস্থার লোকেদের মধ্যে কতকগুলি লোক তো পঞ্চায়েতের ঘোষণাকে প্রকাশ্যেই 'মানি না' বলিয়া দিয়াছে। তিনকড়ি তাহাদের নেতা।

ন্যায়রত্ন যেদিন দেবুকে উপদেশ দিয়াছিলেন—সেদিন কল্পনা করিয়াছিলেন অনুরূপ। কল্পনা করিয়াছিলেন—সমাজের সঙ্গে কঠিন বিরোধিতার মধ্যে পণ্ডিতের ধর্মজীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ধ্যান-ধারণা পূজার্চনার মধ্য দিয়া দেবুর এক নূতন রূপ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। দেবু ঘোষ সাহায্য-সমিতি লইয়া কর্মের পথে চলিয়াছে। কর্মের পথেও ধর্ম-জীবনে যাওয়া যায়। কিন্তু দেবুর সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়া বড় আঘাত পাইয়াছেন—দেবু নাকি দুর্গা মুচিনীর হাতে জল খাইতেও প্রস্তুত। দুর্গাকে সে অনুরোধও করিয়াছিল; কিন্তু দুর্গা রাজী হয় না।

কর্মকেই তিনি সামাজিক জীবনের সঞ্জীবনী-শক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সে কর্ম ধর্ম-বিবর্জিত কর্ম নয়। ধর্ম-বিবর্জিত কর্ম সঞ্জীবনী-সুধা নয়—উত্তেজক সুধা, অন্ন নয়—পচনশীল তণ্ডুলের মাদক রস।

ন্যায়রত্ন দেবুর জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। পণ্ডিতকে তিনি ভালবাসেন। পণ্ডিত মাদক-রসের উত্তেজনায় উগ্র উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। এটা তিনি আগে কল্পনা করেন নাই। সমাজে এমনি ভাবেই জোয়ার-ভাঁটা খেলিতেছে। এমনি ভাবেই মানুষগুলি এক-একবার জোয়ারের উচ্ছ্বাস লইয়া উঠিতেছে আবার সে উচ্ছ্বাস ভাঙিয়া পড়িয়া ভাঁটার টানের মত শান্ত স্তিমিত হইয়া যাইতেছে।

এ তো ক্ষুদ্র পঞ্চগ্রাম। সমগ্র দেশ ব্যাপ্ত করিয়া এমনি ভাবে উচ্ছ্বাস আসে যায়। তাঁহার জীবনেই তিনি দেখিয়াছেন ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন। অবশ্য ব্রাহ্মধর্মে সাধারণ মানুষের জীবন একবিন্দুও আকৃষ্ট হয় নাই। তারপর আসিল স্বদেশী আন্দোলন; সে আন্দোলনেও দুইটি উচ্ছ্বাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলনই—ধর্মসংস্রবহীন প্রথম আন্দোলন। এই আন্দোলন একটা কাজ করিয়াছে। না-থাক ধর্মের সংস্রব, কিন্তু একটা নৈতিক প্রভাব আনিয়া দিয়া গিয়াছে।

তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি যাহা দেখিয়াছেন—সে দৃশ্য তাঁহার মনে পড়িল। প্রথম সমাজপতির আসনে বসিয়া নিজে তিনি মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। নামে তিনি সমাজপতি হইলেও তখন হইতেই সত্যকার সমাজপতি ছিল জমিদার! জমিদারদের তখন প্রবল প্রতাপ। তাহারা তাঁহাকে মুখে সম্মান করিত, শ্রদ্ধা করিত; কিন্তু অন্তরে করিত উপেক্ষা! সাধারণ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার ক্ষেত্রে তাঁহাকে তাহারা আহ্বান করিত। কিন্তু নিজেদের ব্যভিচারের অন্ত ছিল না। মদ্যপান ছিল তন্ত্রশাস্ত্র-অনুমোদিত; জমিদারের বৈঠকে বসিত 'কারণ চক্র'। পথে-পথে তরুণ ধনী-

নন্দনেরা মত্ত পদবিক্ষেপে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া ফিরিত। রাত্রে অসহায় মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের দরজায় কামোন্মত্ত করাঘাত ধ্বনিত হইত। সাধারণ মানুষ ছিল বোবা জানোয়ারের মত। তাহাদের ঘরের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। এই স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সেইটাকে অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গিয়াছে; মানুষের একটা নীতি-বোধ জাগিয়াছে।

ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। এই আন্দোলনের ঢেউ তাঁহার শশীর বুকে লাগিয়াছিল। শশীর মধ্যে দুর্নীতি কিছু ছিল না। আন্দোলন তাহার ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিল। শশী উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফল ন্যায়রত্নের জীবনে ভীষণতম আকারে দেখা দিয়াছে। আবার সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছে বিশ্বনাথের বুকে। বিশ্বনাথ তাঁহার মুখের উপরেই বলিয়াছে—সে জাতি মানে না, ধর্ম মানে না, সমাজ ভাঙিতে চায়। সে তাঁহার বংশের উত্তরাধিকার পর্যন্ত অস্বীকার করিতে চায়। জয়ার মত স্ত্রী—তাহার প্রতিও তাহার মমতা নাই। এবারকার জোয়ার সর্বনাশা জোয়ার ··আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন ন্যায়রত্ন।

পঞ্চগ্রামের বুকেও সেই জোয়ার-ভাঁটা চলিয়াছে। নানা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মানুষগুলি এক এক সময় হৈ-চৈ করিয়া কলরব করিয়া উঠে, আবার এলাইয়া পড়ে—দল ভাঙিয়া যায়। আগে প্রতি হৈ-চৈ-এর ভিতরেই থাকিত সমাজ-ধর্ম। তাঁহার প্রথম জীবনে একটা হৈ-চৈ হইয়াছিল—তাঁহারই নেতৃত্বে কঙ্কণার চণ্ডীতলায় বাবুদের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে। পাঁচখানা গ্রামের মেয়েরা সেখানে যায়, বাবুদের ছেলেরা সেকালে চণ্ডীতলায় মদ খাইয়া বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিত। সাধারণ লোককে লইয়া তিনিই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তারপর রামদাস গোস্বামীর সময়ে হৈ-চৈ-এর ভিতরের ছিল—"বলো ভাই রাম নামে"র ধুয়া। তারপর সামাজিক ব্যাপার লইয়া অনেক হৈ-চৈ হইয়া গেল। এই দেবুকে উপলক্ষ করিয়াই হৈ-চৈ হইল তিনবার। সেটল্‌মেণ্ট লইয়া প্রথম। তারপর ধর্মঘট। তারপর এই বন্যার সাহায্য-সমিতি। প্রথমে তিনি দেবুর সম্বন্ধে আশা পোষণ করিয়াছিলেন। ধর্মঘটের সময়েও সে প্রভাব তাহার উপরে ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এই পঞ্চায়েত উপলক্ষ করিয়া সেটা যেন উবিয়া গেল।

কাল ধর্ম, যুগধর্ম! শশীর শোচনীয় পরিণাম তাঁকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া এ সম্বন্ধে চেতনা দিয়া গিয়াছে। তাই তিনি আর নিজেকে বিচলিত হইতে দেন না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া কালের লীলাপ্রকাশ শুধু দ্রষ্টার মত দেখিয়া যাইতে বদ্ধপরিকর। যাহার যে পরিণতি হয় হউক, কাল

যেরূপে আত্মপ্রকাশ করে করুক, তিনি দেখিবেন—শুধু নিশ্চেষ্টভাবে দেখিবেন।

নতুবা সেদিন বিশ্বনাথ যখন তাঁহার মুখের উপর বলিল—আপনার ঠাকুর এবং সম্পত্তির ব্যবস্থা আপনি করুন দাদু!—সেইদিন তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিতেন, কঠোর শাস্তি; পিতামহ হিসাবে তিনি দাবি করিতেন তাহার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুর মূল্য—যাহা তিনি দিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র শশিশেখরকে, শশী দিয়া গিয়াছে তাহাকে।

ন্যায়রত্নের খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া উঠিল। আপনার উত্তেজনা তিনি বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

বিশ্বনাথ কালকে পর্যন্ত স্বীকার করে না। সে বলে—কালের সঙ্গেই আমাদের লড়াই। এ কালকে শেষ করে আগামী কালকে নিয়ে আসারই সাধনা আমাদের

মূর্খ! তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তা হলে কালের সঙ্গে যুদ্ধ বলছ কেন? কাল অনন্ত। তার এক খণ্ডাংশের সঙ্গে যুদ্ধ! আজকের কালকে চাও না, আগামী কালকে চাও। এ শাক্ত-বৈষ্ণবের লড়াই। কালীরূপ দেখতে চাও না, কৃষ্ণরূপের পিপাসী! কিংবা ব্রজদুলালের পরিবর্তে দ্বারকানাথকে চাও।

বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—কোন নাথকেই আমি চাই না দাদু। তর্কের মধ্যে উপমার খাতিরে কাউকে চাই—একথা বললে আপনার লাভ কি হবে? নাথ আর সহ্য হচ্ছে না মানুষের, নাথের দল এই সুদীর্ঘকাল মানুষ যতবার উঠতে চেয়েছে—তাকে নাথত্বের চাপে নিষ্পেষিত করেছে। তাই আগামী কালের রূপ আমাদের অ-নাথের রূপ। নাথের উচ্ছেদেই হবে আজকের কালের অবসান।

কথাটা সত্য। পঞ্চগ্রামেও যতবার মানুষগুলি হৈ-চৈ করিয়া উঠিয়াছে, ততবার জমিদার ধনী সমাজ-নেতারা তাহাদের দমন করিয়াছে। এ দেখিয়াও কি তোমার চেতন হয় না বিশ্বনাথ যে, মানুষের জাবনোচ্ছাস এমন ভাবে আদিকাল হইতে ঐ অ-নাথত্বের কালকে আনিতে চায়—কিন্তু সে কাল আজও আসে নাই। কতকাল আজ অতীত হইয়া গেল—কত আগামী কাল আসিল, কিন্তু যে আগামী কালের কল্পনা তোমাদের—সে কাল আসিল না? কেন আসিল না জান? কালের সেই রূপে আসিবার কাল এখনও আসে নাই।

বিশ্বনাথ এইখানে যাহা বলে—তিনি তাহা কিছুতেই মানিতে পারেন না। তাহার সঙ্গে বিরোধ এইখানেই। গভীর বেদনায় নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের মন

আবার টন্-টন্ করিয়া উঠিল। আবার তিনি ডাকিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

পোস্টাপিসের পিওন আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।—চিঠি।

চিঠিখানি হাতে লইয়া ন্যায়রত্ন নাটমন্দির হইতে নামিয়া মুক্ত আলোকে ধরিলেন। বিশ্বনাথের চিঠি। ন্যায়রত্নের আজও চশমা লাগে না। তবে বৎসরখানেক হইতে আলোর একটু বেশী দরকার হয় এবং চোখ দুটি একটু সঙ্কুচিত করিয়া পড়িতে হয়। পোস্টকার্ডের চিঠি! ন্যায়রত্ন পড়িয়া একটু আশ্চর্য হইয়া গেলেন—কল্যাণীয়াসু!—কাহাকে লিখিয়াছে বিশু-ভাই? চিঠিখানা উল্টাইয়া ঠিকানা দেখিয়া দেখিলেন—জয়ার চিঠি। ন্যায়রত্ন অবাক হইয়া গেলেন। জয়াকে বিশ্বনাথ পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে! মাত্র কয়েক লাইন।...আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরাও ভাল আছ। কয়েক দিনের মধ্যেই একবার ওখানে যাইব। ঠিক বাড়ি যাইব না। বন্যার সাহায্য-সমিতির কাজে যাইব, সঙ্গে আরও কয়েকজন যাইবেন। দাদুকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিয়ো। তোমরা আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—

বিশ্বনাথ।

ন্যায়রত্ন চিন্তিতভাবেই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পোস্টকার্ডের চিঠিখানা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। সেদিন যখন বিশ্বনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল—জয়ার সঙ্গেও তাহার মতের মিল হইবে না, সেদিন তিনি এত বিচলিত হন নাই। মতের মিল তো নাই। জয়া তাঁহার হাতে-গড়া মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় বংশের গৃহিণী। সমাজ ভাঙিয়াছে,—ধর্ম বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে—সারা পৃথিবীর লোভ, অনাচার, অত্যাচার—এ দেশের মানুষ জর্জরিত হইয়া ভয়াবহ পরধর্ম বা ধর্মহীন বৈদেশিক জীবন-নীতি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে,—কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে আজও তাঁহার ধর্ম বাঁচিয়া আছে। জয়া অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম-শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার পৌত্র ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে—এই চিন্তায় যখন তিনি অধীর হন, তখন জয়ার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পান। বিশ্বনাথ যখন তাঁহার সঙ্গে তর্ক করে—কূটযুক্তিতে তাঁহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে, তখন তিনি গভীর তিতিক্ষায় নিজেকে সংযত করিয়া মহাকালের লীলার কথা ভাবিয়া নীরব হইয়া থাকেন—সেই নীরবতার মধ্যে মনে পড়ে জয়াকে। জয়ার জন্য দারুণ দুশ্চিন্তা হয়। আবার যখন বিশ্বনাথ নানা অজুহাতে পনের দিন, কুড়ি দিন অন্তর বাড়ি আসে, তখন ওই দুশ্চিন্তাই তাঁহার ভরসা হইয়া উঠে। বিশ্বনাথ গোবিন্দজীর ঝুলন

মানে না; কিন্তু সেই স্নেহের অজুহাতে জয়ার সঙ্গে স্নেহ খেলা খেলিতে আসে। তাই জয়ার সঙ্গে মতে মিলিবে না বলিলেও ন্যায়রত্নের গোপন অন্তরে ভরসা ছিল। বহ্নির সঙ্গে পতঙ্গের মিল আছে কি না কে জানে—প্রাণশক্তির সঙ্গে দাহিকা শক্তির সম্বন্ধটাই বিরোধী সম্বন্ধ—তবু পতঙ্গ আসে পুড়িয়া ছাই হইতে। জয়ার রূপের দিকে চাহিয়া তিনি আশ্বস্ত হন। কিন্তু আজ তিনি চিন্তিত হইলেন। বিশ্বনাথ জয়াকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—হলা রাজ্ঞী শউন্তলে!

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—ভাঁড়ার-ঘরে তালা ঝুলিতেছে, অন্য ঘরগুলির দরজাও বন্ধ, শিকল বন্ধ! ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইলেন। জয়া তো এ সময়ে কোথাও যায় না!

তিনি আবার ডাকিলেন—অজয়—অজু বাপি!

অজয় সাড়া দিল না—সাড়া দিল বাড়ির রাখালটা। যাই আজ্ঞেন, ঠাকুরমশাই!···ওদিকের চালা হইতে ছোঁড়াটা ঘুমন্ত অজয়কে কোলে করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। খোকন ঘুমুচ্ছে ঠাকুরমশাই!

—অজয়ের মা কোথায় গেল?

—আজ্ঞেন, বউ-ঠাকুরন যেয়েছেন আমাদের পাড়া।

—তোদের পাড়ায়?—ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইয়া গেলেন। জয়া বাউড়ী-পাড়ায় গিয়াছে?—তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ছোঁড়াটা বলিল—আজ্ঞেন,—নোটন বাউড়ীর ছেলেটা হাত-পা খিঁচছে—নোটনের বউ আইছিল—ঠাকুরের চরণামেত্তর লেগে। তাই গেলেন সেথা বউ-ঠাকুরন!

—হাত-পা খিঁচছে? কি হয়েছে?

—তা জেনে না। বা-বাওড় লেগেছে হয়তো।

বা-বাওড় অর্থে ভৌতিক স্পর্শ। দুঃখের মধ্যেও ন্যায়রত্ন একটু হাসিলেন। এ বিশ্বাস ইহাদের কিছুতেই গেল না!

ঠিক এই সময়েই জয়া বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ফিরিয়াছে। ন্যায়রত্ন চকিত হইয়া উঠিলেন—তুমি এই অবেলায় স্নান করলে?

জয়া ক্লান্ত উদাস স্বরে উত্তর দিল—ছেলেটি মারা গেল দাদু!

—মারা গেল?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছিল ?

—জ্বর। কিন্তু এ রকম জ্বর তো দেখিনি দাদু।

ন্যায়রত্ন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আগে তুমি কাপড় ছাড় ভাই। তারপর শুনব।

জয়া তবু গেল না ; বলিল—কাল বিকেল বেলা থেকে সামান্য জ্বর হয়েছিল। সকালে উঠেও ছেলেটা খেলা করেছে। বললে—জলখাবার-বেলা থেকে জ্বরটা চেপে এল। তারপরই ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। ঘণ্টাখানেক আগে তড়কার মত হয়! তাতেই শেষ হয়ে গেল। শুনলাম দেখুড়েতেও নাকি পরশু একটি, কাল একটি ছেলে এমনিভাবেই মারা গিয়েছে। এদের পাড়াতে আরও তিন-চারটি ছেলের এমনি জ্বর হয়েছে। এ কি জ্বর দাদু ?

কুড়ি

ম্যালেরিয়া এবার আসিয়াছে যেন মড়কের চেহারা লইয়া। চারিদিকে ঘরে ঘরে লোক জ্বরে পড়িয়াছে। কে কাহার মুখে জল দেয়—এমনি অবস্থা। বয়স্ক মানুষের বিপদ কম—তাহারা ভুগিয়া কঙ্কাল-সার চেহারা লইয়া সারিয়া উঠিয়াছে—পাঁচ দিন, সাত দিন, চৌদ্দ দিন পর্যন্ত জ্বরের ভোগ। মড়কটা ছেলেদের মধ্যে। পাঁচ-সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের জ্বর হইলে—মা-বাপের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিন দিন কি পাঁচ দিনের মধ্যেই একটা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। হঠাৎ জ্বরটা ময়ূরাক্ষীর ওই ঘোড়া-বানের মতই হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠে—ছেলেটা ক্রমাগত মাথা ঘুরায়—তারপর হয় তড়কার মত! ব্যস্ ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সব শেষ হইয়া যায়। দশটার মধ্যে বাঁচে দুইটা কি তিনটা, সাত-আটটাই মরে।

পরশু রাত্রে পাতু মুচির ছেলেটা মরিয়াছে। পাতুর স্ত্রীর অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান-সন্ততি হয় নাই—দুই বৎসর আগে ওই সন্তানটিকে সে কোলে পাইয়াছিল। পাড়াপ্রতিবাসীরা বলে—ওটি এ-গ্রামের বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের সন্তান। শুধু পাড়াপ্রতিবাসীরাই নয়—পাতুর মা, দুর্গা, ইহারাও বলে। ঘোষালের সঙ্গে স্ত্রীর গোপন প্রণয়ের কথা পাতুও জানে। আগে যখন পাতুর চাকরান জমি ছিল—ঢাকের বাজনা বাজাইয়া সে দু-পয়সা রোজগার করিত, তখন পাতু ছিল বেশ মাতব্বর মানুষ, তখন ইজ্জৎ-সম্ভ্রমের দিকে কঠিন দৃষ্টি ছিল। দুর্গার মন্দ স্বভাবের জন্য তখন সে গভীর লজ্জা-বোধ করিত—দুর্গাকে সে কত তিরস্কার করিয়াছে ; কখন কখন প্রহারও করিয়াছে। তখন তাহার স্ত্রীও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাতুর প্রতি ছিল তাহার

গভীর ভয়, আসক্তিও ছিল ; দিবারাত্রি হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী বিড়ালীর মত বউটা ঘরের কাজ করিয়া ঘুর-ঘুর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সে সময় তাহার শাশুড়ী— পাতুর-মা পুত্রবধূর যৌবন ভাঙাইয়া গোপনে রোজগার করিবার প্রত্যাশায় বউটিকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কিন্তু তখন বউটি কিছুতেই রাজী হয় নাই। তাহার পর পাতুর জীবনে শ্রীহরি ঘোষের আক্রোশে আসিল একটা বিপর্যয়। জমি গেল, পাতু বাজনার ব্যবসা ত্যাগ করিল, শেষে দিন-মজুরী অবলম্বন করিল। এই অবস্থার মধ্যে কেমন করিয়া যে পাতু বদলাইয়া গেল—সে পাতুও জানে না।

এখন ঘরে চাল না থাকিলে দুর্গার কাছে চাল লইয়া, পয়সা লইয়া— দুর্গাকে সে শাসন-করা ছাড়িল। তারপর একদিন তাহার মা বলিল—দুগ্‌গা কঙ্কণায় যায় এতে (রাতে) তু যদি সাঁতে যাস পাতু—তবে বশ্‌কিশ্‌টা বাবুদের কাছে তুই-ই তো পাস্। আর মেয়েটা যায়, কোনদিন আত (রাত) বিরেতে—যদি বেপদই ঘটে তবে কি হবে? মায়ের প্যাটের বুন তো বটে।

দুর্গাকে সঙ্গে করিয়া বাবুদের অভিনয়ের আসরে পৌছাইয়া দিতে গিয়া— পাতুর ওটাও বেশ অভ্যাস হইয়া গেল। এই অবসরের একদিন প্রকাশ পাইল, তাহার স্ত্রীও ওই ব্যবসায়ে রত হইয়াছে। ঘোষাল ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর পাড়ার প্রান্তে নির্জন স্থানে ঘুরিতে দেখা যায় এবং পাড়া হইতে পাতুর বউকেও সেইদিকে যাইতে দেখা যায়। একদিন পাতুর মা ব্যাপারটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হঠাৎ একটা কলরব তুলিয়া ফেলিল। দুর্গা বলিল—চুপ কর মা, চুপ কর, ঘরের বউ, ছিঃ!

পাতু মাকেও চুপ করিতে বলিল না—বউটাকেও তিরস্কার করিল না— নিজেই নীরবে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। বউটা—ভয়ে সেদিন বাপের বাড়ি পলাইয়া গিয়াছিল ; কয়েক দিন পরে পাতুই নিজে গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। কিছুদিন পর পাতুর স্ত্রী এই সন্তানটি প্রসব করিল।

পাড়ার লোকে বলাবলি করিল—ছেলেটা ঘোষাল ঠাকুরের মত হইছে বটে। রংটা এতটুকু কালো দেখাইছে!···

পাতু ছেলেটার দুষ্টবুদ্ধি দেখিয়া কতদিন বলিয়াছে—বামুনে বুদ্ধির ভেজাল আছে কিনা, বেটার ফিচ্‌লেমি দেখ ক্যানে!—বলিয়া সে সস্নেহে হাসিত।

ছেলেটাকে ভালবাসিত সে। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে ছেলেটা শেষ হইয়া গেল। দুর্গাও ছেলেটাকে বড় স্নেহ করিত ; সে ডাক্তার দেখাইয়াছিল। জগনকে যতবার ডাকিয়াছে—নগদ টাকা দিয়াছে, নিয়মিত ঔষধ খাওয়াইয়াছে তবু ছেলেটা বাঁচিল না।

আশ্চর্যের কথা—পাতুর স্ত্রী ততটা কাতর হইল না, যতটা কাতর হইল পাতু। পাতু তাহার মোটা গলায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া পাড়াটাকে পর্যন্ত অধীর করিয়া তুলিল।

বিপদের রাত্রে সতীশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল—সান্ত্বনা দিল। বাউড়ী ও মুচিপাড়ার মধ্যে সতীশ মোড়ল মানুষ, ঘরে তাহার হাল আছে—দুই মুঠা খাইবার সংস্থান আছে। সে-ই মনসার ভাসানের দলের মাতব্বর, ঘেঁটুর দলের মূল গায়েন—রকমারি গান বাঁধে; এজন্য হরিজনপল্লীর লোক তাহাকে মান্যও করে। সে-ই ছেলেটার সৎকারের ব্যবস্থা করিল। পরদিন সকালে সে পাতুকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল, তারপর দেবু পণ্ডিতের আসরে লইয়া গেল।

দেবুর আসর এখন সর্বদাই জমজমাট হইয়া আছে। নিজ গ্রামের এবং আশপাশ গ্রামের বারো-তেরো হইতে আঠারো-উনিশ বছরের ছেলের দল সর্বদা আসিতেছে-যাইতেছে, কলরব করিতেছে। তিনকড়ির ছেলে গৌর তাহাদের সর্দার। পাতুও কয়েকদিন এখানকার কাজে খাটিতেছে! ছেলেদের সঙ্গে সে বস্তা ঘাড়ে করিয়া ফিরিত। গ্রাম-গ্রামান্তরে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করিয়া বহিয়া আনিত। এই বিপদের দিনে সাহায্য-সমিতি হইতে পাতুর পরিবারের জন্য চালের বরাদ্দও হইয়া গেল। কথাটা তুলিল সতীশ।

দেবু কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিল। সতীশ কথাটা তুলিতেই সে সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চই পাতুর ব্যবস্থা করিতে হবে বৈকি! নিশ্চয়।

সাহায্য-সমিতি হইতে পাতুর খোরাকের চালের ব্যবস্থা দেবু করিয়া দিয়াছে। চালটা লইয়া আসে দুর্গা! সকালে উঠিয়াই জামাই-পণ্ডিতের বাড়ি যায়। বাহির হইতে ঘরকন্নার যতখানি মার্জনা এবং কাজকর্ম করা সম্ভব দেবুর বাড়িতে সে সেইগুলি করে; সাহায্য-সমিতির চাল মাপে! সকালে গিয়া দুপুরে খাওয়ার সময় ফেরে, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আবার যায়—ফেরে সন্ধ্যার পর। সে এখন সদাই ব্যস্ত। বেশ-ভূষার পরিপাট্যের দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ পর্যন্ত নাই।

সকালে উঠিয়াই সে দেবুর বাড়ি গিয়াছে। পাতুর মা দাওয়ায় বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া নাতির জন্য কাঁদিতেছে। পাতুর মায়ের অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধেই। সে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে,—দুর্গার পাপে তাহার এই সর্বনাশ ঘটিয়া গেল। ওই পাপিনী বউটা—ব্রাহ্মনের দেহে পাপ সঞ্চার করিয়া যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছে, সেই পাপে এত বড় আঘাত তাহার বুকে

বাজিল। গোঁয়ার-গোবিন্দ পাষণ্ড পাতু দেবস্থলে বাজনা বাজানো ছাড়িয়াছে, সেই দেব-রোষে তাহার নাতিটি মরিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা পাপে ভরিয়া উঠিয়াছে—তাই ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভাঙিয়া আসিল কালবন্যা—তাই দেশ জুড়িয়া মড়কের মত আসিয়াছে—এই সর্বনাশা জর;—গ্রামের পাপে সেই জ্বরে তাহার বংশধর গেল—তাহার স্বামী-কুল, পুত্র-কুল আজ নির্বংশ হইতে বসিল।

পাড়ায় এখানে-ওখানে আরও কয়েকটা ঘরে কান্না উঠিতেছে। পাতু বাড়ির পিছনে একা বসিয়া কাঁদিতেছিল। আজ সতীশ আসে নাই, অন্য কেহও ডাকে নাই, সে-ও কোথায় যায় নাই।

পাতুর মা হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া আসিল। পাতুর মুখের সামনে বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—আর সব্বনাশ করিস না বাবা, আর কাঁদিস না। পরের ছেলের লেগে আর আদিখ্যেতা করিস না! উঠ্! উঠে খান্‌কয়েক তালপাতা কেটে আন্—এনে দেওয়ালের ভাঙনে বেড়া দে। কাজকম্মো কর্।

বন্যায় পাতুর ঘরের একখানা দেওয়াল ধসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাতু এখন বাস করিতেছে দুর্গার কোঠা-ঘরখানার নিচেরতলার ঘরে। ওই ঘরখানা এতদিন নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করিত পাতুর মা।

পাতু কোন কথা বলিল না।

পাতুর মা বলিল—ওগে (রোগে)-শোকে আমার বুকের পাঁজ্‌রাগুলা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। এতে (রাতে) শোব—আর তোরা দুজনায় ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদবি—আমার ঘুম হয় না বাপু। তোরা আপনার ঘর করে লে। কত লোকের ঘর পড়েছে—সবাই যার যেমন তার তেমন মেরামত করলে—তোর আর হল না।

পাতুর মা মিথ্যা বলে নাই, ময়ূরাক্ষীর বানের ফলে এ-পাড়ায় একখানা ঘরও গোটা থাকে নাই, কাহারও বেশী—কাহারও কম ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও আধখানা—কাহারও একখানা—কাহারও বা দুইখানা দেওয়াল পড়িয়াছে, দুই-চারজনের গোটা ঘরই পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যেই সকলে যে যেমন আপনার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কেহ বা তালপাতার বেড়া দিয়াছে। যাহাদের গোটা ঘর পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা চাল তৈয়ার করিয়া তালপাতার চাটাই ঘিরিয়া মাথা গুঁজিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ঘোষ মহাশয়—শ্রীহরি ঘোষ অকাতরে লোককে সাহায্য করিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে—তালপাতা যাহার যত প্রয়োজন কাটিয়া লইতে পারে। দুইটা ও একটা হিসাবে বাঁশও সে অনেককে দিয়াছে। কিন্তু পাতু

শ্রীহরি ঘোষের কাছে যায় নাই। গেলেও ঘোষ তাহাকে দিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কারণ সতীশ বাউড়ীকেও ঘোষ কোন সাহায্য করে নাই। বলিয়াছে—তুমি তো বাবা গরীব নও।

সতীশ অবাক হইয়া গেল। সে বড়লোক হইল কেমন করিয়া?

শ্রীহরি বলিয়াছিল—তুমি আগে ছিলে পাড়ার মাতব্বর, এখন হয়েছ গাঁয়ের মাতব্বর। শুধু এ গাঁয়ের কেন—পঞ্চগ্রামের তুমি একজন মাতব্বর। সাহায্য-সমিতি তোমার হাতে। লোককে তুমি সাহায্য করছ, তোমাকে সাহায্য কি আমি করতে পারি?

সতীশ ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল।

ব্যাপারটা শুনিয়া পাতু কিন্তু হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল—সতীশ ভাই, উ বেটার আমি মুখ পর্যন্ত দেখি না। বেটার মুখ দেখলে পাপ হয়! মরে গেলেও আমি কখনও যাব না উয়ার দোরে!

পাতু যায় নাই, এদিকে দুর্গার ঘরে শুক্‌নো মেঝের রান্নাবান্নার জায়গা পাইয়া, নিজের ঘর মেরামতের জন্য এতদিন সে কোন চেষ্টাও করে নাই। রাত্রিতে শুইবার স্থান তাহাদের নির্দিষ্ট হইয়া আছে, দেবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই দুর্গা পাতুর জন্য ওই চাকরিটা স্থির করিয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ছেলেটা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেবুর বাড়ি শুইত। ছেলেটার মৃত্যুর পর কয়দিন তাহারা দুর্গার নিচের ঘরেই শুইতেছে। সুতরাং নিজের ঘর-মেরামতের বাস্তব প্রয়োজনের কোন তাগিদই আপাতত তাহার ছিল না। তাহার মনের যে তাগিদ—সে তাগিদও পাতুর ফুরাইয়া গিয়াছে বহুদিন। রান্নাবান্নার স্থান ও শুইবার আশ্রয় ছাড়া মানুষের যে কারণে ঘরের প্রয়োজন হয়—তা পাতুর নাই। কি রাখবে সে ঘরে? রাখিবার মত বস্তুই যে তাহার কিছু নাই। চাকরান জমি লইয়া ঘোষের সঙ্গে মামলায় তাহার সমস্ত পিতল-কাঁসা গিয়াছে। সে বাদ্যকর—আগে তাহার ঢাক ছিল দুইখানা, ঢোলও একখানা ছিল; তাহাও গিয়াছে বাদ্যকরের লাভহীন বৃত্তি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বে চামড়াও একটা সম্পদ ছিল—সেও আর নাই। জমিদার টাকা লইয়া ভাগাড় বন্দোবস্ত করিবার ফলে চামড়ার কারবারও গিয়াছে। কারবার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা পয়সা আনা বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঘরে সে রাখিবেই বা কি—আর ঘরখানাকে সাজাইবেই বা কি দিয়া? পৈতৃক শাল-দোশালা বিক্রয় করিবার পর পুরনো সিন্দুক তোরঙ্গের মতই ঘরখানা সেই হইতে যেন অকারণে তাহার জীবনের সবখানি জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া ছিল। বানে ঘরখানার একদিকের দেওয়াল ভাঙিয়াছে,—

যেন শূন্য তোরঙ্গের একটা দিক উই-পোকায় খাইয়া শেষ করিয়াছে। পাতু সেটাকে আর নাড়িতে বা ঝাড়িতে চায় না—বাকী কয়টা দিকও কোন রকমে উইয়ে শেষ করিয়া দিলে সে বোধ হয় বাঁচিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ভাবিয়াছে—ঘরখানা পড়িয়া গেলে, ওই বাস্তু ভিটার উপর একদফা লাউ-কুমড়া-ডাঁটাশাক লাগাইবে—তাহাতে প্রচুর ফসল পাওয়া যাইবে; কিছু খাইবে, কিছু বিক্রয় করিবে।...

মায়ের কথা শুনিয়া পাতুর শোকাতুর মন—দুঃখে-রাগে যেন বিষাইয়া উঠিল! কাটা ঘা যেমন তেল লাগিয়া বিষাইয়া ওঠে, তেমনি যন্ত্রণাদায়ক ভাবে বিষাইয়া উঠিল। মাকে সে কোন কথা বলিল না, সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যাইবেই বা কোথায়? এক সতীশের বাড়ি। কিন্তু সতীশ আজ আসে নাই বলিয়া অভিমান করিয়া সে সেখানে গেল না; আর এক দেবু পণ্ডিতের মজলিস। কিন্তু সেও পাতুর ভাল লাগিল না। দেশের কথা ছাড়া সেখানে অন্য কথা নাই। আজ সে একান্তভাবে তাহার নিজের কথা বলিতে, অপরের কাছে শুনিতে চায় তাহার দুঃখটা কত বড় মর্মান্তিক সেই কথা, তাহারা পাতুর দুঃখে কতখানি দুঃখ পাইয়াছে সেই তত্ত্ব সে জানিতে চায়। দশজনের কথা—বিশখানা গাঁয়ের কথা শুনিতে তাহার এখন ভাল লাগে না।

পাতু মাঠের পথ ধরিল।

মাঠেই বা কি আছে? গোটা মাঠখানাকে বানে ছারখার করিয়া দিয়া গিয়াছে। এখানে বালি ধূ-ধূ করিতেছে—ওখানে খানায় জল জমিয়া আছে; যে জমিগুলার ওপর ক্ষতি হয় নাই, সেইসব জমিগুলা শুকাইয়া ফাটিয়া যেন হাড়-পাঁজরা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। চারিপাশ অসমান উঁচু-নিচু, কতক জমিতে অবশ্য আবার ধান পোঁতা হইয়াছে। বন্যানীত পলির উর্বরতা সদ্যপোঁতা ধানের চারাগুলি আশ্চর্য রকমের জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। আরও অনেক জমি চাষ হইতে পারিত, কিন্তু লোকের বীজ নাই। বীজও হয়তো মিলিত—পণ্ডিত বীজের যোগাড় করিয়াছিল, ঘোষও দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু ম্যালেরিয়া আসিয়া চাষীর হাড়গুলো যেন ভাঙিয়া দিল।

হঠাৎ কাহার উচ্চ কণ্ঠের গান তাহার কানে আসিল। স্বরটা পরিচিত। সতীশের গলা বলিয়া মনে হইতেছে।...হ্যাঁ, সতীশই বটে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপর দিয়া আসিতেছে। কোথায় গিয়াছিল সতীশ? পরক্ষণেই সে হাসিল। সতীশের অবস্থা মোটামুটি ভাল—জমি হাল আছে, কত কাজ

তাহার! কোন কাজে গিয়াছিল, কাজ উদ্ধার করিয়া মনের আনন্দে গান ধরিয়া ফিরিতেছে। তাহার তো পাতুর অবস্থা নয়। জমিও যায় নাই—সর্বস্বান্তও হয় নাই—ছেলেও মরে নাই। সে গান করিবে বৈকি! পাতু একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না।

—"গরুর সেবা কর রে মন গরু পরম ধন"

ওঃ, সতীশ গোধন-মাহাত্ম্য গান করিতেছে!—

"দরিদ্রের লক্ষ্মী মাগো শিবের বাহন।
তুমি মাগো হলে রুষ্ট, জগতেরো অশেষ কষ্ট,
তুষ্ট হও মা ভগবতী বাঁচাও জীবন।
গরু পরম ধন—মন রে—গোমাতা গোধন।"

পাতুকে দেখিয়া সতীশ গান বন্ধ করিল—গভীর বেদনার্ত স্বরে বলিল—রহম শ্যাখের জোড়া-বলদ—আহা, জোড়াকে জোড়াই মরে গেলে রে!

পাতু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল—ভোর রেতে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু করতে পারলাম না। শ্যাখ বুক চাপ্‌ড়িয়ে কাঁদছে। আঃ কি বাহারের বলদ-জোড়া!—বলিতে বলিতে সতীশের চোখেও জল আসিল। সে চোখ মুছিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এতক্ষণে পাতু প্রশ্ন করিল—কি হয়েছিল?

ঘাড় নাড়িয়া সতীশ শঙ্কিতভাবে বলিল—বুঝতে পারলাম না। তবে মহামারণ কাণ্ড বটে। জ্বরে যেমন ছেলের বনেদ মেরে দিছে—এ রোগে গরুও বোধ হয় তেমনি ঝেড়ে পুঁছে দিয়ে যাবে। কাণ্ড খুব খারাপ!

সতীশ বাউড়ী এ অঞ্চলের মধ্যে বিচক্ষণ গো-চিকিৎসকও বটে। রহমের গরুর ব্যারাম হইতে সে তাহাকেই ডাকিয়াছিল।

রহম সত্যই বুক চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতেছিল।

চাষী রহমের অনেক শখের গরু। তাহার অবস্থার অতিরিক্ত দাম দিয়া গরু জোড়াটাকে সে প্রায় শৈশব অবস্থায় কিনিয়াছিল। সযত্নে লালন-পালন করিয়া, তাহাদিগকে 'আবড়' অর্থাৎ হাল-বহনে অনভ্যস্ত হইতে—'দোঁয়াইয়া' অর্থাৎ অভ্যস্ত করিয়াছিল! শক্ত-সমর্থ সুগঠিত গরু জোড়াটি—এ অঞ্চলের চাষীদের ঈর্ষার বস্তু ছিল। রহম গরু দুইটার নাম দিয়াছিল—একটার নাম 'পেল্লাদ' অপরটার নাম—'আকাই'। প্রহ্লাদ এবং আকাই এ অঞ্চলের একালের বিখ্যাত শক্তিশালী জোয়ান ছিল। গরু দুইটির গৌরবে রহমের অহঙ্কার ছিল কত! ভাল সড়কের উপর দিয়া সে যখন গাড়ী লইয়া যাইত, তখন

লোকজন দেখিলেই গরু দুইটার তলপেটে পায়ের বুড়া আঙুলের ঠোক্কর এবং পিঠে হাতের আঙুলের টিপ দিয়া নাকে একটা ঘড়াত শব্দ তুলিয়া গরু দুইটাকে ছুটাইয়া দিত। বলিত—শেরকে বাচ্চা রে বেটা—আরবী ঘোড়া!

কখনও পথিকদের হুঁশিয়ার করিয়া হাঁকিত—এ-ই সরে যাও ভাই, এই সরে যাও!

বর্ষার সময় কাদায় কাহারও গাড়ী পড়িলে—শীতে কাহারও ধান-বোঝাই গাড়ী খানা-খন্দকে পড়িলে, রহম তাহার প্রহ্লাদ ও আকাইকে লইয়া গিয়া হাজির হইত। তাহাদের গরু খুলিয়া দিয়া সে জুড়িয়া দিত প্রহ্লাদ ও আকাইকে। প্রহ্লাদ-আকাই অবলীলাক্রমে গাড়ী টানিয়া তুলিয়া ফেলিত। পরমগৌরবে নিঃশব্দে রহমের বড়-বড় দাঁতগুলি আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িত। এ অঞ্চলে শ্রীহরি ঘোষ ছাড়া এমন ভাল হেলে বলদ আর কাহারও ছিল না। শ্রীহরি নিজের বলদ জোড়াটার দাম দিয়াছে—সাড়ে তিন শো টাকা।

রহম বুক চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতেছে।

কাঁদিবে না? গরু যে রহমের কাছে উপযুক্ত ছেলের চেয়েও বেশী! বড় আদরের—বড় যত্নের ধন; তাহার কর্ম-জীবনের দুইখানা হাত। কাঁধে করিয়া সার বয়, বুক দিয়া ঠেলিয়া মাটি চষে, বুড়া বাপ-মাকে উপযুক্ত ছেলে যেমন ভাবে কোলে-কাঁধে করিয়া পাথর-চাপড়ির পীরতলা ঘুরাইয়া আনে, তেমনি ভাবে সপরিবার রহমকে গ্রাম-গ্রামান্তরে গাড়ীতে বহিয়া লইয়া যাইত, ক্ষেতের ফসল বোঝাই করিয়া ঘরে আনিয়া তুলিয়া দিত, যোগ্য শক্তিশালী বেটার মত। এই সর্বনাশা বানে জমির ফসল পচিয়া গেল, তবু রহম প্রহ্লাদ ও আকাইয়ের সাহায্যে অর্ধেকের উপর জমিতে হাল দিয়া বীজ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে। বাকী জমিটায় আশ্বিনের শেষেই বরখন্দের চাষ করিবে ঠিক করিয়াছে। এখন সে চাষ তাহার কি করিয়া হইবে? যে জমিটার ধান পোতা হইয়াছে—তাহারই ফসলই বা কেমন করিয়া ঘরে আনিবে?

একবার ইদুজ্জোহার সময় সে ইরসাদের কাছে একটা গল্প শুনিয়াছিল।—তাহাদের এক মহাধার্মিক মুসলমান চাষী কোরবানি করিবার জন্য দুনিয়ার মধ্যে তাহার প্রিয়তম বস্তু কি ভাবিয়া দেখিয়া—তাহার চাষের সবচেয়ে ভাল বলদটিকে কোরবানি করিয়াছিল! গল্পটি শুনিয়া তাহার বুক টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিতেছিল। বার বার মনে পড়িয়াছিল তাহার প্রহ্লাদ ও আকাইকে। দুই-তিন দিন সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই।

রহম গোঁয়ার লোক, বুদ্ধি তাহার তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু হৃদয়বেগ তাহার

অত্যন্ত প্রবল ; একেবারে ছেলেমানুষের মত সে কাঁদিতেছিল। অন্যান্য মুসলমান চাষীরাও আসিয়াছিল। তাহারাও সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছিল, আহা-হা—এমন চমৎকার জানোয়ার দুইটা মরিয়া গেল! তাহারাও যে অন্য গ্রামের চাষীদের কাছে তাহাদের গ্রামের গরু বলিয়া অহঙ্কার করিত।

হিন্দুদের দুর্গাপূজার পর দশমীর দিন—গরু লইয়া একটা প্রতিযোগিতা হয়। ঘোড়া-দৌড়ের মত গরুর দৌড়। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে আপন আপন গরু লইয়া গিয়া একটা জায়গা হইতে ছাড়িয়া দেয়, পিছনে প্রচণ্ড শব্দে ঢাক বাজে—চকিত হইয়া গরুগুলি ছুটিতে আরম্ভ করে। একটা নির্দিষ্ট সীমানা যে গরু সর্বাগ্রে পার হয়, সেই গরুই এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়, শ্রীহরির নূতন গরু-জোড়াটা সেবার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। পরবৎসর তিনকড়ি আসিয়া রহমের প্রহ্লাদ ও আকাইকে লইয়া গিয়াছিল। বলিয়াছিল—দে ভাই, আমাকে ধার দে! বেটা ছিরের দেমাকটা আমি একবার ভেঙে দি।

রহম আপত্তি করে নাই। সে মুসলমান, কিন্তু তাহার গরু দুইটা তো গরুই ; হিন্দুও নয়—মুসলমানও নয়। তাছাড়া শ্রীহরির দেমাক ভাঙিয়া তাহার আনন্দ তিনকড়ির চেয়ে কম হইবে না। সেবার রহমের প্রহ্লাদ সকলকে হারাইয়া দিয়াছিল। প্রহ্লাদের পর শ্রীহরির জোড়াটা পৌছিয়াছিল। তাহার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই রহমের আকাই।

ইরসাদ আসিয়া হাতে ধরিয়া রহমকে বলিল—উঠ! চাচা উঠ! কি করবে বল? মানুষের তো হাত নাই! নাও, এইবার আবার দেখে-শুনে কিনবে একজোড়া ভাল বলদ-বাছুর! আবার হবে। এ জোড়ার চেয়ে জিন্দা হবে—তুমি দেখিয়ো!

রহম বলিল—না, না, বাপ! তা হবে না। আমার পেল্লাদ-আকাইয়ের মতনটি আর হবে না রে বাপ! যেটি যায় তেমনটি আর হয় না। ইরসাদ বাপ, আর আমার হবে না! আর বাপ ইরসাদ—।···জলভরা উগ্র চোখ দুটি তুলিয়া রহম বলিল—ই হাড়ে আর আমার সে হবে না বাপ আমার আর কি আছে, কিসে হবে?

ইরসাদ বলিল আমি তুমার টাকার যোগাড় করে দিব চাচা। তুমাকে আমি বাত দিচ্ছি। উঠ, তুমি উঠ!

ঠিক এই সময়েই আসিয়া হাজির হইল তিনকড়ি। প্রহ্লাদ ও আকাইয়ের মৃত্যুর খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে। রহম তাহাকে দেখিয়া ফোঁপাইয়া

কাঁদিয়া উঠিল—তিনু-ভাই! দেখ ভাই দেখ, আমার কি সব্বনাশ হইছে দেখ।

তিনকড়ি নীরবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল মরা বলদ দুইটাকে। নীরবেই প্রহ্লাদের দেহটার পাশে আসিয়া বসিল—কয়েকবার দেহটার উপর হাত বুলাইল; তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—ওঃ, দুটো ঐরাবত রে! আঃ ইন্দ্রপাত হয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

চোখ মুছিয়া সে বলিল—মহাগেরামেও ক'টা গরুর ব্যামো হয়েছে শুনলাম। চাষীরা সকলে চকিত হইয়া উঠিল—মহাগেরাম?

—হ্যাঁ—তিনকড়ি চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ছেলে-মড়কের মত গো-মড়ক লাগল দেখছি। সতীশ বাউড়ী আমাকে বললে—কি ব্যামো বুঝতেই পারে নাই!

ইরসাদ এবং অন্য চাষীরা মহাচিন্তিত হইয়া উঠিল।

তিনকড়ি বলিল—দেবু তার করেছে জেলাতে গরুর ডাক্তারের জন্যে। —হ্যাঁ—হ্যাঁ, ইরসাদ চাচা, তোমাকে দেবু যেতে বলেছে বিশেষ করে। কাল রেতে কলকাতা থেকে বিশুবাবু আরও সব কে কে এসেছে। বারবার করে তোমাকে যেতে বলে দিয়েছে।

হঠাৎ খানিকটা বিচিত্র হাসি হাসিয়া আবার বলিল—মহাগেরামে দেখলাম রমেন চাটুয্যে আর দৌলতের লোক ঘুরছে মুচি-পাড়ায়। গিয়েছে বুঝলাম—পেল্লাদ-আকাইয়ের খাল (চামড়া) ছাড়াবার লেগে তাগিদ দিতে! একেই বলে—কারু সর্বনাশ, আর কারু পোষমাস!

রহম একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল।—আমি ভাগাড়ে দিব না। গেড়ে দিব—আমি মাটিতে গেড়ে দিব।—তারপর হঠাৎ ইরসাদের হাত ধরিয়া বলিল—ইরসাদ, ই তা হলি উদেরই কাম!

—কি? ইরসাদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—মুচিদিকে দিয়া উরাই বিষ দিছে।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না ভাই, বিষ-কাঁড় নয়, এ ব্যামোই বটে। মড়ক—গো-মড়ক। তবে ওরা ভাগাড় জমা নিয়েছে—লাভ তো ওদের হবেই।

ইরসাদ বলিল—তা হলে আমি এখন একবার যাই চাচা। ঘরে ভাত চাপিয়ে এসেছি পুড়ে যাবে হয়তো। উ বেলা একবার দেবু-ভাইয়ের কাছ

থেকে ঘুরে আসতে হবে। বিশুবাবু এসেছে, বললে তিনু-কাকা। দেখে আসি একবার কি বলে।···

ছমির শেখ নিতান্ত দরিদ্র, দিন-মজুরি করিয়া খায়; দেহ তার দুর্বল; রোগপ্রবণ বলিয়া মজুরিও বড় মেলে না। ছমিরের দুঃসহ দুরবস্থা আজন্মের,—ওটা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে ভিক্ষাও সে করে। বন্যার পর সাহায্য-সমিতি হওয়াতে বেচারা ইরসাদের অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। ইরসাদের পিছনে খানিকটা আসিয়া সে ডাকিল—মিয়া-ভাই!—ইরসাদ ফিরিয়া দেখিল ছমির!

—কি ছমির-ভাই?

—দেবু পণ্ডিতের কাছে যাবা? আমার লাগি, আর কবিলাটার লাগি—দুখানা কাপড় যদি বুলে দাও—পুরানো হলিও চলবে মিয়া—ভাই।

ইরসাদ বলিল—আচ্ছা।

ইরসাদ বিশুকে বহুবার দেখিয়াছে। কিন্তু তেমন আলাপ কখনও হয় নাই। কঙ্কণার ইস্কুলে বিশু যখন ফার্স্ট-ক্লাসে পড়িত সেই সময় ইরসাদ তাহার মামার বাড়ির মাইনর ইস্কুলের পড়া শেষ করিয়া আসিয়া ভর্তি হইয়াছিল। বয়সে তফাত ছিল না, ইরসাদই বয়সে বৎসর খানেকের বড়, কিন্তু ফার্স্ট-ক্লাস ও ফোর্থ-ক্লাসের পার্থক্যটা ইস্কুল-জীবনে এত বেশী যে কোনদিন ভাল করিয়া আলাপ জমাইবার সুযোগ হয় নাই। তারপর মক্তবের মৌলবীত্ব গ্রহণ করিয়া, নিজের ধর্ম লইয়া সে বেশ একটু মাতিয়া উঠিয়াছিল; ফলে—ইরসাদ ইদানীং বিশুর উপর বিরূপ হইয়া উঠে। কারণ বিশু বিন্দুদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের সন্তান। কিন্তু সম্প্রতি দেবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরে সে বিরূপতা তাহার মুছিয়া যাইতেছে। দেবুর কাছে বিশ্বনাথের গল্প শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। বিশুবাবুর এতটুকু গোঁড়ামি নাই। মুসলমান, খ্রীষ্টান, এমন কি হিন্দুদের অস্পৃশ্যজাতি কাহাকেও ছুঁইয়া সে স্নান করে না।

দেবু বলিয়াছিল—তোমাকে দেখবামাত্র দুহাতে জড়িয়ে ধরবে, তুমি দেখো ইরসাদ-ভাই!

বিশুর চিঠিগুলা পড়িয়া তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে। বন্যার পরে অকস্মাৎ সাহায্য-সমিতির খবর দিয়া যেদিন সে টাকা পাঠাইল, সেদিন সে বিস্মিত হইয়া গেল। বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও মনে হইল—এ এক নূতন ধরনের মানুষ, এমন ধরনের মানুষ কঙ্কণার বাবুদের

ছেলেদের মধ্যে নাই, তাহার পরিচিত মিয়া-মোকাদিমদের ঘরেও সে দেখে নাই, তাহাদের নিজেদের মধ্যে তো থাকিবার কথাই নয়। মনে হইল বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহাদের অমিল হইবার কিছু নহে। দেবুকে লেখা চিঠির মধ্যে—বিশ্বনাথের কথাবার্তার মধ্যেও চমৎকার দোস্তির স্বর আছে—যাহা মুহূর্তে অন্তত স্পর্শ করে। লোকটিকে দেখিবার জন্য সে আগ্রহভরেই চলিয়াছিল। ভাবিতেছিল—বিশ্বনাই তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে, সে তখন কি বলিবে?—বিশুবাবু? না—ভাই-সাহেব? না—বিশু-ভাই? দেবু বলে বিশু-ভাই। কিন্তু প্রথমেই কি তাহার বিশু-ভাই বলা ঠিক হইবে?

দেবুর বাড়ির খানিকটা আগেই জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানা। ডাক্তার একখানা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরভাবে বিড়ি টানিতেছিল। ইরসাদ একটু বিস্মিত হইল। ডাক্তারও সাহায্য-সমিতির একজন পাণ্ডা। বিশেষ করিয়া এই সর্বনাশা ম্যালেরিয়ার সময়ে—সাহায্য-সমিতির নামে যে ভাবে চিকিৎসা করিতেছে—তাহাতে তাহার সাহায্য একটা মোটা অঙ্কের টাকার চেয়ে কম নয়। আজ বিশু আসিয়াছে, অথচ সে এখানে বসিয়া রহিয়াছে। ইরসাদ বলিল—সেলাম গো ডাক্তার!

ডাক্তার বলিল—সেলাম!

হাসিয়া ইরসাদ বলিল—কি রকম, বসে রয়েছেন যে?

—কি করব। নাচ্‌ব?

ইরসাদ একটু আহত হইল। ব্যথিত বিস্ময়ে সে জগনের মুখের দিকে চাহিল। জগন বলিল—কোথায় যাবে? দেবুর ওখানে বুঝি?

ইরসাদ নীরসকণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ। বিশ্বনাথ এসেছে শুনলাম। তাই যাব একবার মহাগেরামে।

—মহাগেরামে সে আসে নাই জংশনের ডাক-বাংলোয় আছে। দেবুও সেইখানে!

—জংশনে?

হ্যাঁ!—বলিয়া ডাক্তার আপন মনে বিড়ি টানিতে আরম্ভ করিল। আর কথা বলিল না।

আরও খানিকটা আগে—হরেন ঘোষালের বাড়ি। ঘোষাল উত্তেজিত ভাবে বাড়ির সামনে ঘুরিতেছিল, আপন মনেই সংস্কৃত আওড়াইতেছিল—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভবাবহঃ।

ইরসাদ আরও খানিকটা আশ্চর্য হইয়া গেল। ঘোষালও যায় নাই। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—ঘোষাল, কাণ্ডটা কি?

ঘোষাল লাফ দিয়া নিজের দাওয়ায় উঠিয়া বলিল—যাও, যাও, বিশুবাবু খানা সাজিয়ে রেখেছে—খেয়ে এস গিয়ে—যাও!—বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

আরও খানিকটা আগে—গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়ি। সেই ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে বেশ একটি জনতা জমিয়া গিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতেছে। প্রাচীন বয়সীরা উদাসভাবে বসিয়া আছে। কথা বলিতেছে শুধু ঘোষের কর্মচারী দাসজী—কঙ্কণার বড়বাবু তো অজগরের মত ফুঁসছে—বুঝলেন কিনা? বলছে—আমি ছাড়ব না। মহামহোপাধ্যায়ই হোক—আর পীরই হোক, এর বিহিত আমি করবই।

ইরসাদের আর সন্দেহ রহিল না। কোন একটা গোলমাল হইয়াছে নিশ্চয়ই। সে ভাবিতেছিল—কোথায় যাইবে? ডাক্তার বলিল—বিশ্বনাথ জংশনের ডাক-বাংলোয় আছে! দেবু সেখানে আছে। জংশনে যাওয়াই বোধ হয় ভাল, কিন্তু তাহার আগে সঠিক সংবাদ কাহার কাছে পাওয়া যায়?

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—দেবুর দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে দুর্গা। ইরসাদ দ্রুতপদে আসিয়া দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা, দেবু-ভাই কোথায় বল দেখি!

দুর্গা ম্লানমুখে বলিল—মহাগেরামে—ঠাকুরমশায়ের বাড়ি গিয়েছে।

—মহাগেরামে? তবে যে ডাক্তার বললে—জংশনে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গা বলিল—সেখান থেকে মহাগেরামে গিয়েছে—ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে।

—কি ব্যাপার বল দেখি? সবাই দেখি হৈ চৈ করছে!

দুর্গার চোখে জল আসিয়া গেল। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুর্গা বলিল—সে এক সর্বনেশে কাণ্ড শেখমশায়। ঠাকুরমশায়ের নাতি নাকি পৈতে ফেলে দিয়েছে। কাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছে। ঠাকুরমশায় নাকি নিজের চোখে সব দেখেছেন। ঠাকুরমশায় নাকি থর্ থর্ করে কেঁপে মৌরাক্ষীর বালির ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। এ চাকলায় সবাই এই নিয়ে কল্ কল্ করছে। জামাই-পণ্ডিত ঠাকুরমশায়কে ধরে তুলে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়েছে।

একুশ

জীবনে এইটাই বোধহয় ন্যায়রত্নের পক্ষে প্রচণ্ডতম আঘাত।

প্রৌঢ়ত্বের প্রথম অধ্যায়ে—পুত্রের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে তিনি

এক প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। পুত্র শশিশেখর আত্মহত্যা করিয়াছিল। চলন্ত ট্রেনের সামনে সে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে মিলিয়াছিল শুধু একতাল মাংসপিণ্ড; ন্যায়রত্ন স্থির অকম্পিত ভাবে দাঁড়াইয়া সেই মৃত—পুত্রের সেই দেহাবশেষ মাংসপিণ্ড দেখিয়াছিলেন; সযত্নে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা একত্রিত করিয়া, তাহার সৎকার করিয়াছিলেন। পৌত্র বিশ্বনাথ তখন শিশু! পুত্রবধূকে দিয়া তিনি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। বাহিরে তাঁহার একবিন্দু চাঞ্চল্য কেহ দেখে নাই। আজ কিন্তু ন্যায়রত্ন থরথর করিয়া কাঁপিয়া ময়ূরাক্ষীগর্ভের উত্তপ্ত বালির উপর বসিয়া পড়িলেন! বিশ্বনাথের অনেক বিদ্রোহ সহ্য করিয়াছেন। সে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবনাদর্শের এবং পুণ্যময় কুলধর্মের বিপরীত মত পোষণ করে এবং সে-সবকে সে অস্বীকার করে—তাহা তিনি পূর্ব হইতেই জানেন। বহুবার পৌত্রের সঙ্গে তাঁহার তর্ক হইয়াছে। তর্কের মধ্যে পৌত্রের মৌখিক বিদ্রোহকে তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। মনে মনে নিজেকে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার আসনে বসাইয়া বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছুকে মহাকালের দুর্জ্ঞেয় লীলা ভাবিয়া সমস্ত কিছু হইতে লীলা-দর্শনের আনন্দ-আস্বাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পৌত্রের মৌখিক মতবাদকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়া তর্কের বিদ্রোহকে কর্মে পরিণত হইতে দেখিয়া, মুহূর্তে তাঁহার মনোজগতে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আজ ধর্মদ্রোহী, আচারভ্রষ্ট পৌত্রকে দেখিয়া, তীব্রতর করুণ ও রৌদ্র-রসে বিচলিত অভিভূত হইয়া, আপনার অজ্ঞাতসারে কখন দর্শকের নির্লিপ্ততার আসনচ্যুত হইয়া ন্যায়রত্ন অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে নামিয়া পড়িয়া নিজেই সেই মহাকালের লীলায় ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন।

কয়েক দিন তিনি বিশ্বনাথকে প্রত্যাশা করিতেছিলেন। তাহাকে সে একটা পোস্টকার্ডে চিঠিতে লিখিয়াছিল—সে এবং আর কয়েকজন ক'দিনে যাইবে। ন্যায়রত্ন লিখিয়াছিলেন—তোমরা কজন আসিবে লিখিবে। কাহারও কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা তাহাও জানাইবে।…সে পত্রের উত্তর বিশ্বনাথ তাঁহাকে দেয় নাই। গতকাল সন্ধ্যার সময় দেবু তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছিল যে রাত্রি দশটার গাড়িতে বিশু-ভাই কলিকাতার কয়েকজন কর্মী-বন্ধুকে লইয়া জংশনে নামিবে। কিন্তু সে লিখিয়াছে তাহারা 'জংশনের ডাক-বাংলোতেই থাকিবার ব্যবস্থা করিবে'।

ন্যায়রত্ন মনে-মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রিতে বাড়িতে আসিলে কি অসুবিধা হইত? বাড়িতে আশ্রিত রাত্রে দুইজন অতিথির মত খাদ্য রাখিবার নিয়ম আছে। অতিথি না আসিলে, সকালে সে খাদ্য বিলাইতে

ডাকিয়া দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে দরিদ্ররা আসিয়া এ-বাড়ির দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকে। বাসি হইলেও উপাদেয় উপকরণময় খাদ্য উচ্ছিষ্ট নয়; এই খাদ্যটির জন্য এ গ্রামের দরিদ্ররা সকলেই লোলুপ হইয়া থাকে। জয়া এখন পালা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই গৃহে বিশ্বনাথ রাত্রিতে অতিথি লইয়া আসিতে দ্বিধা করিল! বন্ধুরা হয়তো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বিশ্বনাথ হয়তো ভাবিয়াছে তাহাদের যথোপযুক্ত মর্যাদা এ গৃহের প্রাচীনধর্মী গৃহস্বামী দিতে পারিবেন না।

জয়া কিন্তু ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সহজ সরল করিয়া দিয়াছিল। বিশ্বনাথের প্রতি তাহার কোন সন্দেহ জন্মিবার কারণ আজও ঘটে তাই। পিতামহের সঙ্গে বিশ্বনাথ তর্ক করে, সে তর্কের বিশেষ কিছু সে বুঝিত না; তর্কের সময় সে শঙ্কিত হইত, আবার তর্কের অবসানে পিতামহ এবং পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবহার দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। কখনও স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বিশ্বনাথ হাসিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিত। বলিত—ওসব হলো পণ্ডিতি কচ্‌কচি আমাদের! শাস্ত্রে বলেছে—অজা-যুদ্ধ আর ঋষি-শ্রাদ্ধ আড়ম্বরে ও গুরুত্বে এক রকমের ব্যাপার। প্রথমটা খুব হৈ-হৈ তর্কাতর্কি—দেখেছ তো বিচার-সভা—এই মারে তো এই মারে কাণ্ড! তারপর সভা শেষ হল—বিদেয় নিয়ে সব হাসতে হাসতে যে যার বাড়ি চলে গেল! আমাদেরও তাই আর কি। সভা শেষ হল এইবার বিদেয় কর দিকি! তুমিই তো গৃহস্বামিনী! বলিয়া সে সাদরে স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইত। জয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের মেয়ে, আক্ষরিক লেখাপড়া তেমন না করিলেও অজা-যুদ্ধ, ঋষি-শ্রাদ্ধ উপমা সমন্বিত বিশ্বনাথের যুক্তি রস-সমেত উপভোগ করিত এবং তর্কের মূল তত্ত্বের কিছু গন্ধও যেন পাইত।

জয়া কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে—তুমি কি করতে চাও বল দেখি?

—মানে?

—মানে দাদুর সঙ্গে তর্ক করছ, বলছ—ঈশ্বর নাই—জাত মানি না। ছি, ওই আবার বলে না কি—এত বড় লোকের নাতি হয়ে?

—বলে না বুঝি?

—না। বলতে নাই।

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ হাসিত! অল্প বয়সে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন ন্যায়রত্ন। বিশ্বনাথের মা—ন্যায়রত্নের পুত্রবধূ—বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। ন্যায়রত্নের স্ত্রী—বিশ্বনাথের পিতামহী মারা যাইতেই জয়া ঘরের গৃহিণী-পদ গ্রহণ করিয়াছে। তখন তাহার বয়স ছিল সবে ষোলো। বিশ্বনাথ

সেবারেই ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। তখন সে-ও ছিল পিতামহের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। হোস্টেলে থাকিত; সন্ধ্যাআহ্নিক করিত নিয়মিত। তখন তাহার নিকট কেহ নাস্তিকতার কথা বলিলে—সে শিশু-কেউটের মত ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। এমনও হইয়াছে যে, তর্কে হারিয়া সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। তাহার পর কিন্তু ধীরে ধীরে বিরাট মহানগরীর রূপ-রসের মধ্যে এবং দেশদেশান্তরে রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে সে এক অভিনব উপলব্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহার এ পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইল, তখন জয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল—সে-ও জীবনে একটা পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহার কিশোর মন উত্তপ্ত তরল ধাতুর মত ন্যায়রত্নের ঘরের গৃহিণীর ছাঁচে পড়িয়া সেইরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে; শুধু তাই নয়—তাহার কৈশোরের উত্তাপও শীতল হইয়া আসিয়াছে। ছাঁচের মূর্তির উপাদান কঠিন হইয়া গিয়াছে; আর সে ছাঁচ হইতে গলাইয়া অন্য ছাঁচে ঢালিবার উপায় নাই। ভাঙিয়া গড়িতে গেলে—এখন ছাঁচটা ভাঙিতে হইবে। ন্যায়রত্নের সঙ্গে জয়া জড়াইয়া গিয়াছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। জয়াকে ভাঙিয়া গড়িতে গেলে, তাহার দাছকে আগে ভাঙিতে হইবে। তাই বিশ্বনাথ—স্ত্রীর সঙ্গে ছলনা করিয়া দিনগুলি কাটাইয়া আসিয়াছে।

স্বামীর হাসি দেখিয়া জয়া তাহাকে তিরস্কার করিত। তাহাতেও বিশ্বনাথ হাসিত! এ হাসিতে জয়া পাইত আশ্বাস। এ হাসিকে স্বামীর আনুগত্য ভাবিয়া, সে পাকা গৃহিণীর মত আপন মনেই বকিয়া যাইত।—

আজ জয়া দাছকে বলিল—আপনি বড় উতলা মানুষ দাছ? রাত্রে নেমে জংশনে ডাক-বাংলোয় থাকবে শুনে অবধি আপনি পায়চারি করছেন। থাকবে তো হয়েছে কি?

ন্যায়রত্ন ম্লান-হাসি হাসিয়া নীরবে জয়ার দিকে চাহিলেন। সে হাসির অর্থ পরিষ্কারভাবে না বুঝিলেও আঁচটা জয়া বুঝিল। সে-ও হাসিয়া বলিল—আপনি আমাকে যত বোকা ভাবেন দাছ, তত বোকা আমি নই। তারা সব জংশনে নামবে রাত্রি দেড়টা-ছুটোয়। তারপর জংশন থেকে—রেলের পুল দিয়ে নদী পার হয়ে—কঙ্কণা, কুসুমপুর, শিবকালীপুর—তিনখানা গ্রাম পেরিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে রাতটা ডাক-বাংলোয় থাকবে, ঘুমিয়ে-টুমিয়ে সকালবেলা দিব্যি খেয়া-ঘাটে নদী পার হয়ে—সোজা চলে আসবে বাড়ি।

ন্যায়রত্নকে কথার যুক্তিটা মানিতে হইল। জয়া অযৌক্তিক কিছু বলে

নাই। তা ছাড়া ন্যায়রত্নের আজ জয়ার বলটাই সকলের চেয়ে বড় বল। তাঁহার সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করিয়া বিশ্বনাথ যখন ন্যায়রত্ন-বংশের কুলধর্মপরায়ণা জয়ার আঁচল ধরিয়া হাসিমুখে বেড়াইত—তখন তিনি মনে মনে হাসিতেন। মহাযোগী মহেশ্বর উন্মত্তের মত ছুটিয়াছিলেন—মোহিনীর পশ্চাতে। বৈরাগী-শ্রেষ্ঠ তপস্বী শিব উমার তপস্যায় ফিরিয়াছিলেন কৈলাস-ভবনে। তাঁহার জয়া যে একধারে দুই,—রূপে সে মোহিনী, বিশ্বনাথের সেবায় তপস্যায় সে উমা। জয়াই তাঁহার ভরসা। জয়ার কথায় আবার তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সেখানে এক বিন্দু উদ্বেগের চিহ্ন নাই। ন্যায়রত্ন এবার আশ্বাস পাইলেন। জয়ার যুক্তিটাকে বিচার করিয়া মানিয়া লইলেন—জয়া ঠিকই বলিয়াছে।

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া আবার তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। জয়ার যুক্তি সহজ সরল—কোথাও এতটুকু অবিশ্বাসের অবকাশ নাই; কিন্তু বিশ্বনাথ সংবাদটা তাঁহাকে না দিয়া দেবুকে দিল কেন? বিশ্বনাথ আজকাল জয়াকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে কেন? তাহাদের দুইজনের সম্বন্ধের রঙ কি তাহার ওই চিঠির ভাষার মত ফিকে হইয়া আসিয়াছে? লৌকিক মূল্য ছাড়া অন্য মূল্যের দাবি হারাইয়াছে?—মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বাহিরে আসিলেন!

—কে দাদু?—জয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন। লক্ষ্য করিলেন—জয়ার ঘরের জানালার কপাটের ফাঁকে প্রদীপ্ত আলোর ছটা জাগিয়া রহিয়াছে। ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ, আমি! কিন্তু তুমি এখনও জেগে?

জয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। হাসিয়া বলিল—আপনার বুঝি ঘুম আসছে না? এখনও সেই সব উদ্ভট ভাবনা ভাবছেন?

ন্যায়রত্ন আপনাকে সংযত করিয়া হাসিয়া বলিলেন—আসন্ন মিলনের পূর্বক্ষণে সকলেই অনিদ্রা-রোগে ভোগে, রাজ্ঞি! শকুন্তলা যেদিন স্বামিগৃহে যাত্রা করেছিলেন, তার পূর্বরাত্রে তিনিও ঘুমোননি।

জয়া হাসিয়া বলিল—আমি গোবিন্দজীর জন্যে চাদর তৈরি করছিলাম।

—গোবিন্দজীর জন্যে চাদর তৈরি করছিলে? আমার গোবিন্দজীকেও তুমি এবার কেড়ে নেবে দেখছি। তোমার চারু-মুখ আর সুচারু-সেবায়—তোমার প্রেমে না পড়ে যান আমার গোবিন্দজী!

জয়া নীরবে শুধু হাসিল।

—চল, দেখি—কি চাদর তৈরি করছ।

চমৎকার একফালি গরদ। গরদের ফালিটির চারিপাশে সোনালী পাড়

বসাইয়া চাদর তৈয়ারি হইতেছে। ন্যায়রত্ন বলিলেন—বাঃ, চমৎকার সুন্দর হয়েছে ভাই।

হাসিয়া জয়া বলিল—আপনার নাতি এনেছিল রুমাল তৈরি করবার জন্যে। আমি বললাম, রুমাল নয়—এতে গোবিন্দজীর চাদর হবে। জরি এনে দিয়ো। আর খানিকটা নীলরংঙের খুব পাতলা ফিন্‌ফিনে বেনারসী শিল্কের টুকরো। রাধারানীর ওড়্‌না করে দেব। গোবিন্দজীর চাদর হল—এইবার রাধারানীর ওড়না করব।

ন্যায়রত্নের সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ভাগ্যে যাই থাক—জয়ার কখনও অকল্যান হইতে পারে না। না, কখনও না।

ভোরবেলায় উঠিয়াই কিন্তু ন্যায়রত্ন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রত্যাশা করিয়াছিলেন—বিশ্বনাথের ডাকেই তাঁহার ঘুম ভাঙিবে। সে আসিয়া এখান হইতে তাহার বন্ধুদের জন্যে গাড়ি পাঠাইবে। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন—টোল-বাড়ির সীমানার শেষ প্রান্তে। ওখান হইতে গ্রাম্য পথটা অনেকখানি দূর অবধি দেখা যায়।

কাহার বাড়িতে কান্নার রোল উঠিতেছে। ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। অকাল মৃত্যুতে দেশ ছাইয়া গেল। আহা, আবার কে সন্তানহারা হইল বোধ হয়!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ন্যায়রত্ন ফিরিয়া চাদরখানি টানিয়া লইয়া পথে নামিলেন। আসিয়া দাঁড়াইলেন গ্রামের প্রান্তে। পূর্বদিগন্তে জবাকুসুম-সঙ্কাশ সবিতার উদয় হইয়াছে। চারিদিক্ সোনার বর্ণ আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। দিগ্‌দিগন্ত স্পষ্ট পরিষ্কার। পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ শস্যহীন মাঠখানার এখানে ওখানে জমিয়া-থাকা-জলের বুকে আলোকচ্ছটার প্রতিবিম্ব ফুটিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপরে শরবন বাতাসে কাঁপিতেছে। ওই শিবকালীপুর। এদিকে দক্ষিণে বাঁধের প্রান্ত হইতে আল-পথ। কেহ কোথাও নাই। বহুদূরে—সম্ভবত শিবকালীপুরের পশ্চিম প্রান্তে সবুজ খানিকটা মাঠের মধ্যে কালো কালো কয়েকটি কাঠির মত কি নড়িতেছে। চাষের ক্ষেতে চাষীরা বোধ হয় কাজ করিতেছে!···ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে আল-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। উদ্বেগের মধ্যে তিনি মনে মনে বারবার পৌত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। মানুষের এই দারুণ দুঃসময়—মুখের অন্ন বন্যায় ভাসিয়া গেল, মানুষ আজ গৃহহীন, ঘরে ঘরে ব্যাধি, আকাশে-বাতাসে শোকের রোল;—এই দারুণ দুঃসময়ে বিশ্বনাথ যাহা করিয়াছে—করিতেছে, সে বোধ করি মহাযজ্ঞের সমান পুণ্যকর্ম। পূর্বকালে ঋষিরা এমন বিপদে যজ্ঞ করিয়া দেবতার

আশীর্বাদ আনিতেন মানুষের কল্যাণের জন্য। বিশ্বনাথও সেই কল্যাণ আনিবার সাধনা করিতেছে। মনে মনে তিনি বারবার পৌত্রকে আশীর্বাদ করিলেন—ধর্মে তোমার মতি হোক—ধর্মকে তুমি জান, তুমি দীর্ঘায়ু হও—বংশ আমাদের উজ্জল হোক্!

মাথার উপর শন্-শন্ শব্দ শুনিয়া ন্যায়রত্ন ঈষৎ চকিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মন শিহরিয়া উঠিল। গোবিন্দ! গোবিন্দ! মাথার উপর পাক দিয়া উঠিতেছে এক ঝাঁক শকুন। আকাশ হইতে নামিতেছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ওপাশে বালুচরের উপর শ্মশান, সেইখানে। ন্যায়রত্ন আবার শিহরিয়া উঠিলেন—মানুষ আর শব সৎকার করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না! শ্মশানে গোটা দেহটা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে!

বাঁধের ওপারে বালুচরের উপর নামিয়া দেখিলেন—শ্মশান নয়—ভাগাড়ে নামিতেছে শকুনের দল। তিনটা গরুর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। একটি তরুণ-বয়সী দুগ্ধবতী গাভী! পঞ্চগ্রামের গরীব গৃহস্থেরা সর্বস্বান্ত হইয়া গেল! সবাই হয়তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। থাকিবে শুধু দালান-কোঠার অধিবাসীরা।...

—ঠাকুরমশায়! এত বিয়ান বেলায় কুথা যাবেন?

অন্যমনস্ক ন্যায়রত্ন মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখেন—খেয়া নৌকার পাটনী শশী ভল্লা হালির উপর মাথা ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতেছে।

—কল্যাণ হোক। একবার ওপারে যাব।

শশী নৌকাখানাকে টানিয়া একেবারে কিনারায় ভিড়াইল।

ময়ূরাক্ষীর নিকটেই ডাক-বাংলো।

ন্যায়রত্ন তীরে উঠিয়া মনে মনে বিশ্বনাথকে আশীর্বাদ করিলেন।

তাহারা বন্ধুদের কল্পনা করিলেন। মনে তাঁহার জাগিয়া উঠিল শিবকালীপুরের তরুণ নজরবন্দীটির ছবি। প্রত্যাশা করিলেন—হয়তো সেই যতীন-বাবুটিকেও দেখিতে পাইবেন।

ডাক-বাংলোর ফটকে ঢুকিয়া তিনি শুনিলেন—উচ্ছ্বসিত হাসির কলরোল। হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত হাসি। এ হাসি যাহারা হাসিতে না পারে—তাহারা কি এই দেশব্যাপী শোকার্ত ধ্বনি মুছিতে পারে? হাঁ—উপযুক্ত শক্তিশালী প্রাণের হাসি বটে!

ন্যায়রত্ন ডাক-বাংলোর বারান্দায় উঠিলেন। সম্মুখের দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা দিয়া সব দেখা যাইতেছে। একখানা টেবিলের চারি ধারে পাঁচ-ছয়জন তরুণ বসিয়া আছে, মাঝখানে একখানা চীনামাটির রেকাবির

উপর বিস্কুট-জাতীয় খাবার! একটি তরুণী চায়ের পাত্র হাতে দাঁড়াইয়া আছে। ভঙ্গি দেখিয়া বুঝা যায়—সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কেহ একজন তাহার হাত ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে। যে ধরিয়াছিল—সে পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিলেও—ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন। ও কে? বিশ্বনাথ?—হ্যাঁ বিশ্বনাথই তো!!

মেয়েটি বলিল—ছাড়ুন। দেখুন, বাইরে কে একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইল বিশ্বনাথ।

—দাদু, এখানে আপনি!—বিশ্বনাথ উঠিয়া পড়িল—তাহার এক হাতে আধখাওয়া ন্যায়রত্নের অপরিচিত খাদ্যখণ্ড। পরমুহূর্তেই সে বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিল—আমার দাদু!…মেয়েটি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

তাহারা সকলেই সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরে মধ্যে দেবুও কোনখানে ছিল। সে দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ঠাকুরমশায়, বিশু-ভাই চা খেয়েই আসছে। চলুন, আমরা ততক্ষণ রওনা হই।

ন্যায়রত্ন দেবুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন বিশ্বনাথের দিকে। পাঁচ-জনের মধ্যে দুইজনের অঙ্গে বিজাতীয় পোশাক। বিশ্বনাথের বন্ধুরা সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিল।

বিশ্বনাথ বলিল—আমার বন্ধু এঁরা। আমরা সব একসঙ্গে কাজ করে থাকি, দাদু!

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমার বন্ধু ছাড়া এঁদের একটা করে বিশেষ পরিচয় আছে আসল, ভাই! সেই পরিচয়টা দাও। কাকে কি বলে ডাকব?

বিশ্বনাথ পরিচয় দিল—ইনি প্রিয়ব্রত সেন, ইনি অমর বসু, ইনি পিটার পরিমল রায়—

—পিটার পরিমল!

—হ্যাঁ, উনি ক্রিশ্চান।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শুধু একবার চকিতের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিলেন পৌত্রের দিকে।

—আর ইনি—আবদুল হামিদ।

ন্যায়রত্নের দৃষ্টি ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—আর ইনি জীবন বীরবংশী।

বীরবংশী অর্থাৎ ডোম। ন্যায়রত্ন এবার চাহিলেন টেবিলের দিকে; এক-

খানি মাত্র চীনামাটির প্লেটে খাবার সাজানো রহিয়াছে—এবং সে খাবার খরচও হইয়াছে। চায়ের কাপগুলি সবই টেবিলের উপর নামানো। সেই মুহূর্তেই সেই মেয়েটি ও-ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে ধোয়া জামা ও গেঞ্জি।

—আর ইনিও আমাদের সহকর্মী দাদু—অরুণা সেন, প্রিয়ব্রতের বোন!

মেয়েটি হাসিয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিল, বলিল—আপনি বিশ্বনাথ-বাবুর দাদু!

ন্যায়রত্ন শুধু বলিলেন—থাক্, হয়েছে।···অস্ফুট মৃদু কণ্ঠস্বর যেন জড়াইয়া যাইতেছিল।

মেয়েটি জামা ও গেঞ্জি বিশ্বনাথকে দিয়া বলিল—নিন, জামা-গেঞ্জি পাল্টে ফেলুন দিকি! সকলের হয়ে গেছে! চলুন বেরুতে হবে।

হামিদ একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল, বলিল—আপনি বসুন।

ন্যায়রত্নের সংযম যেন ফুরাইয়া যাইতেছে। সুখ, দুঃখ, এমন কি, দৈহিক কষ্ট সহ্য করিয়া, তাহার মধ্য হইতে যেন রসোপলব্ধির শক্তি তাঁহার বোধ হয় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। স্নায়ু শিরার মধ্য দিয়া একটা কম্পনের আবেগ বহিতে শুরু করিয়াছে; মস্তিষ্ক-মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে সে আবেগে। তবু হামিদের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাসি হাসিয়া তিনি বসিলেন।

বিশ্বনাথ জামা ও গেঞ্জি খুলিয়া ফেলিয়া, পরিষ্কার জামা-গেঞ্জি পরিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের অনাবৃত দেহের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! বিশ্বনাথের দেহ যেন বাল-বিধবার নিরাভরণ হাত দুখানির মত দীপ্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার গৌর দেহবর্ণ পর্যন্ত অনুজ্জ্বল; শুধু অনুজ্জ্বল নয় একটা দৃষ্টিকটু রূঢ়তায় লাবণ্যহীন। ওঃ তাই তো! উপবীত! বিশ্বনাথের গৌরবর্ণ দেহখানিকে তির্যক বেষ্টনে বেড়িয়া শুচি-শুভ্র উপবীতের যে মহিমা—যে শোভা ঝলমল করিত, সেই শোভার অভাবে এমন মনে হইতেছে। ন্যায়রত্নের দেহের কম্পন এবার স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি আপনার হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত! দেবু পণ্ডিত রয়েছ?

দেবু আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল! সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে?

—আমার শরীরটা যেন অসুস্থ হয়েছে মনে হচ্ছে। আমায় তুমি বাড়ি পৌঁছে দিতে পার?

সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অরুণা মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল—বিছানা করে দেব, শোবেন একটু?

—না।

বিশ্বনাথ অগ্রসর হইয়া আসিল, ডাকিল—দাত্ত!

নিষ্ঠুর-যন্ত্রণা-কাতর স্থানে স্পর্শোন্মত মানুষকে যে চকিত ভঙ্গিতে—যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক্ রোগী হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করে, তেমনি চকিতভাবে ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের দিকে হাত তুলিলেন।

অরুণা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল?

অন্য সকলেও গভীর উদ্বেগের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার কপালে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে কয়েকটি গভীর কুঞ্চন-রেখা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বনাথ তাঁহার বেদনাতুর পাণ্ডুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল! ন্যায়রত্নের অবস্থাটা সে উপলব্ধি করিতেছে।

কয়েক মিনিটের পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন চোখ খুলিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের কল্যাণ হোক্ ভাই? আমি তা হলে উঠলাম।

—সে কি! এই অসুস্থ শরীরে এখন কোথায় যাবেন?—বিশ্বনাথের বন্ধু পিটার পরিমল ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

—নাঃ, আমি এইবার সুস্থ হয়েছি!

বিশ্বনাথ বলিল—আমি আপনার সঙ্গে যাই?

—না।—বলিয়াই ন্যায়রত্ন দেবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি আমায় একটু সাহায্য কর পণ্ডিত! আমায় একটু এগিয়ে দাও।

দেবু সসম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া বলিল—হাত ধরব?

—না, না।—ন্যায়রত্ন জোর করিয়া একটু হাসিলেন—শুধু একটু সঙ্গে চল! ন্যায়রত্ন বাহির হইয়া গেলেন; ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া গেল। কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। ন্যায়রত্ন প্রাণপণ চেষ্টায় যে কথা গোপন রাখিয়া গেলেন—মনে করিলেন, সে কথা তাঁহার শেষের কয়েকটি কথায়, হাসিতে, পদক্ষেপের ভঙ্গিতে বলা হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ নীরবে বাহির হইয়া আসিল। ডাক-বাংলোর সামনের বাগানের শেষ প্রান্তে ন্যায়রত্ন দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ কাছে আসিবামাত্র বলিলেন—হ্যাঁ, জয়াকে—? জয়াকে কি পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে?

বিশ্বনাথ হাসিল, বলিল—সে আসবে না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—না, না। তাকে আসতে আমি বাধ্য করব।

—বাধ্য করলে অবশ্য সে আসবে। কিন্তু তাকে শুধু দুঃখ পেতেই পাঠাবেন।

—জয়াকেও তুমি দুঃখ দেবে ?

—আমি দেব না, সে নিজেই পাবে, সাধ করে টেনে বুকে আঘাত নেবে ; যেমন আপনি নিলেন। কষ্টের কারণ আপনার কাছে আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই কষ্ট স্বাভাবিকভাবে আপনাকে এতখানি কাতর করেনি। কষ্টটাকে নিয়ে আপনি আবার বুকের ওপর পাথরের আঘাতের মতন—আঘাত করেছেন। জয়াও ঠিক এমনি আঘাত পাবে। কারণ, সে এতকাল আপনার পৌত্রবধূ হবারই চেষ্টা করেছে—জেনে রেখেছে, সেইটাই তার একমাত্র পরিচয়। আজকে সত্যকার আমার সঙ্গে নূতন করে পরিচয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। আপনিও হয়তো চেষ্টা করলে পারেন, সে পারবে না।—

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন কুলধর্ম বংশপরিচয় পর্যন্ত তুমি পরিত্যাগ করেছ—উপবীত ত্যাগ করেছ তুমি। তোমার মুখে এ কথা অপ্রত্যাশিত নয়। অপরাধ আমারই। তুমি আমার কাছে আত্ম-গোপন করনি, তোমার স্বরূপের আভাস তুমি আমাকে আগেই দিয়েছিলে। তবু আমি জয়াকে—আমার পৌত্রবধূর কর্তব্যের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, তোমার আধ্যাত্মিক বিপ্লব লক্ষ্য করতে তাকে অবসর পর্যন্ত দিইনি। কিন্তু—

—বলুন।

—না। আর কিছু নাই আমার ; আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। অপরাধ—এমন কি, পাপও যদি হয় আমার হোক। জয়া আমার পৌত্র-বধূই থাক্। তোমাকে অনুরোধ—আমার মৃত্যুর পর যেন আমার মুখাগ্নি করো না। সে অধিকার রইল জয়ার।

বিশ্বনাথ হাসিল। বলিল—বঞ্চনাকেও হাসিমুখে সইতে পারলে, সে বঞ্চনা তখন হয় মুক্তি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন—আমি যেন এ হাসিমুখে সইতে পারি।···সে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিল।

ন্যায়রত্ন পিছাইয়া গেলেন, বলিলেন—থাক, আশীর্বাদ করি, এ বঞ্চনাও তুমি হাসিমুখে সহ্য কর। বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিয়া পথে অগ্রসর হইলেন। দেবু নতমস্তকে নীরবে তাঁহার অনুগমন করিল।

বিশ্বনাথ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল।···

ন্যায়রত্ন খেয়া-ঘাটের কাছে আসিয়া হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। পিছন ফিরিয়া হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিয়া আর্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—পণ্ডিত! পণ্ডিত!

আজ্ঞে!—বলিয়া দেবু ছুটিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই থর-

থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ন্যায়রত্ন আশ্বিনের রৌদ্রতপ্ত নদীর বালির উপর বসিয়া পড়িলেন।...

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচখানা গ্রামে কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। অভাবে রোগে-শোকে জর্জরিত মানুষেরাও সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সচ্ছল অবস্থার প্রতিষ্ঠাপন্ন কয়েকজন—এ অনাচারের প্রতিকারে হইয়া উঠিল বদ্ধপরিকর।

ইরসাদের সঙ্গে দেবুর পথেই দেখা হইয়া গেল।

দেবু গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় মাথা হেঁট করিয়া পথ চলিতেছে। ইরসাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইল; দেবু মুখ তুলিয়া ইরসাদের দিকে চাহিয়া ভাল করিয়া একবার চোখের পলক ফেলিয়া যেন নিজেকে সচেতন করিয়া লইল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল—ইরসাদ-ভাই!

—হ্যাঁ। শুনলাম, তুমি মহাগ্রামে গিয়েছ। দুর্গা বললে।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু বলিল—হ্যাঁ। এই ফিরছি সেখান থেকে।

—তোমাদের ঠাকুরমশায় শুনলাম নাকি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়াছিলেন; নদীর ঘাটে। কেমন রইছেন তিনি?

একটু হাসিয়া দেবু বলিল—কেমন আছেন, তিনিই জানেন। বাইরে থেকে ভাল বুঝতে পারলাম না। নদীর ঘাটে কেঁপে বসে পড়লেন। আমি হাত ধরে তুলতে গেলাম। একটুখানি বসে থেকে নিজেই উঠলেন। ময়ূরাক্ষীর জলে মুখ-হাত ধুয়ে, হেসে বললেন—মাথাটা ঘুরে উঠেছিল, এইবার সামলে নিয়েছি পণ্ডিত! বাড়ি এসে—আমাকে জল খাওয়ালেন, স্নান করলেন, পূজো করলেন। আমি বসেই ছিলাম; দেখে বললেন—এইখানেই খেয়ে যাবে পণ্ডিত। আমি যোড়হাত করে বললাম—না না, বাড়ি যাই। কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না। খেয়ে উঠলাম। আমাকে বলিলেন—আমার এক কাজ করে দিতে হবে। বললেন—আমার জমি-জেরাত বিষয়-আশয় যা কিছু আছে—তোমাকে ভার নিতে হবে। ভাগে—ঠিকে, যা বন্দোবস্ত করতে হয়, তুমি করবে। ফসল উঠলে আমাকে খাবার মত চাল পাঠিয়ে দেবে কাশীতে, আর উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করে টাকা।

ইরসাদ বলিল—ন্যায়রত্নমশায় তবে কাশী যাবেন ঠিক করলেন?

—হ্যাঁ, ঠাকুর নিয়ে, বিশু-ভাইয়ের স্ত্রীকে ছেলেকে নিয়ে কাশী যাবেন। হয় কাল—নয় পরশু।

—বিশুবাবু আসে নাই? একবার এসে বললে না কিছু?

—না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দেবু আবার বলিল—সেই কথাই ভাবছিলাম, ইরসাদ-ভাই!

—কি কথা বল দেখি?

—বিশু-ভাইয়ের সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখব না! টাকাকড়ির হিসেব-পত্র আজই আমি তাকে বুঝিয়ে দোব। ইরসাদ চুপ করিয়া রহিল।

দেবু বলিল—তোমাদের জাত-ভাই একজন এসেছেন—আবদুল হামিদ। তিনিও দেখলাম—ওই বিশু-ভাইয়ের মতন। নামেই মুসলমান, জাত-ধর্ম কিছু মানেন না।

বাইশ

কয়েক দিন পর।

মানুষ বন্যায় বিপর্যস্ত, রোগে জীর্ণ ও শোকে কাতর, অনাহার এবং অচিকিৎসার মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। গো-মড়কে তাহাদের সম্পদের একটা বিশিষ্ট অংশ শেষ হইয়া যাইতেছে। তাহাদের জীবনের সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে করাল মূর্তিতে। তবু সে কথা ভুলিয়া তাহারা এ সংঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল ···ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র ধর্ম মানে না জাতি মানে না, ঈশ্বর মানে না—সে উপবীত ত্যাগ করিয়াছে! ন্যায়রত্ন পৌত্রবধূ এবং প্রপৌত্রকে লইয়া দুঃখ লজ্জায় দেশত্যাগ করিয়াছেন।···সে দুঃখ—সে লজ্জার অংশ যেন তাহাদের। শুধু তাই নয়, ইহাকে তাহারা মনে করিল—পঞ্চগ্রামের পক্ষে মহা অমঙ্গলের সূচনা। তাহাদের ঘরে-ঘরে হায়-হায় করিয়া সারা হইল, আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। অনেকে চোখের জলও ফেলিল। বলিল—এক-পো ধর্ম হয় তো এইবার শেষ, চার-পো করি পরিপূর্ণ। সমস্ত কিছু সর্বনাশের কারণ যেন এই অন্যাচারের মধ্যে নিহিত আছে।

এই আক্ষেপ—এই আশঙ্কায় তাহারা মৃত্যু কামনা করিল কি না, তাহারাও জানে না; তবু তাহার কিছু একটার প্রেরণায় সাহায্য-সমিতির প্রতি বিমুখ হইল—যাহার ফলে মৃত্যু হয়তো অনিবার্য। এই নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অভাব এবং রোগের নির্যাতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ মৃত্যু-বিভীষিকা-সম্মুখে দেখিয়াও আহার এবং ঔষধ-প্রত্যাখ্যান অনিবার্য মৃত্যু নয় তো কি?

ন্যায়রত্ন চলিয়া যাওয়ার পরদিন সকাল বেলায় বিশ্বনাথ আসিয়াছিল। সে দিন দেবু তাহাকে হিসাব-পত্র বুঝিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ, দেবু-ভাই! আমাদের সঙ্গে সংস্রব রাখতে না চাও, রেখো না। কিন্তু এখানকার সাহায্যের নাম

করে দশজনের কাছে টাকা তুলে সাহায্য-সমিতি হয়েছে, তার অপরাধটা কি হল ?

দেবু হাত-যোড় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে মাফ্ কর, বিশু-ভাই !

আজ আবার বিশ্বনাথ আসিয়াছে। কয়দিন ধরিয়া সে নিজেই সাহায্য-সমিতি চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

আজও দেবু তাহাকে বলিল—আমাকে মাফ্ কর বিশু-ভাই ! তারপর হাসিয়া বলিল—দেখলে তো নিজেই এ-ক'দিন চেষ্টা করে. একজনও কেউ চাল নিতে এল না।

সত্যই কেহ আসে নাই। গ্রামে-গ্রামে জানানো হইয়াছে—সাহায্য-সমিতিতে শুধু চাল নয়, ওষুধও পাওয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তারও আসিয়াছে। কিন্তু তবুও কেহ ওষুধ লইতে আসে নাই।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।...

এ কয়দিন ধরিয়া বিশ্বনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মানুষগুলি অদ্ভুত। কাছিম যেমনভাবে খোলার মধ্যে তাহার মুখ-সমেত গ্রীবাখানি গুটাইয়া বসিলে তাহাকে আর কোনমতেই টানিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি ভাবেই ইহারা আপনাদিগকে গুটাইয়া লইয়াছে। ইহাকে জড়ত্ব বলিয়া বিশ্বনাথ উপহাস করিতে পারে নাই—ইহার মধ্যে সহনশক্তির যে এক অদ্ভুত পরিচয় রহিয়াছে -তাহাকে সে সসম্মানে শ্রদ্ধা করিয়াছে। এই সহন-শক্তি যাহারা আয়ত্ত করিয়াছে—রক্তের ধারায় বংশানুক্রমে যাহাদের মধ্যে এই শক্তি প্রবহমান—তাহারা যদি জাগে, তবে সে এক বিরাট শক্তির দুর্জয় জাগরণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ডাকে—যাহার ডাকে সে জাগিবে, কূর্মাবতারের মত সমস্ত ধরিত্রীর ভারবহনের জন্য সে জাগিয়া উঠিবে ; তেমন ডাক—সে দিতে পারিল না। তাই বোধ হয়, তাহার ডাকে তাহারা সাড়া দিল না।

সে ওই বীরবংশী—অর্থাৎ শিক্ষিত ডোম বন্ধুটিকে লইয়া গ্রামে গ্রামে হরিজন-পল্লীতে মিটিং করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। মিটিং করিতে পারিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু মিটিং হয় নাই। মিটিং করিতে দেয় নাই ভূমির স্বামী—ভূস্বামী-বর্গ ; যাহারা বিশ্বনাথের অনাচারের জন্য ন্যায়-রত্নকে সামাজিক শাস্তি দিবার সংকল্প করিয়াছিল—তাহারাই ; কঙ্কণার বাবুরা, শ্রীহরি ঘোষ। হাটতলা জমিদারের, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের, ধর্মরাজতলার বকুল গাছের তলদেশের মাটিও জমিদারের ; সেখানে যত পতিত ভূমি, এমন কি, ময়ূরাক্ষীর বালুময়-গর্ভও তাহাদের। বিশ্বনাথ এই

দেশেরই মানুষ—বাল্যকাল হইতে এই দেশের ধূলা-কাদা মাখিয়া মানুষ হইয়াছে ; সে-ও ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল—এত পরের ধূলা সে মাখিয়াছে, পঞ্চগ্রামের মানুষ বাঁচিয়া আছে—পথ চলিতেছে—পরের মাটিতে। নিজেদের বলিতে তাহাদের ঘরের অঙ্গনটুকু ছাড়া আর কিছুই নাই। ব্যবহারের অধিকার বলিয়া একটা অধিকারের কথা বরাবর শুনিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে অধিকারও জমিদার নাকচ করিয়া দিল আদালতের সীলমোহর-যুক্ত পরোয়ানার সাহায্যে। আদালতে দরখাস্ত করিয়া জমিদারেরা পরোয়ানা বাহির করিয়া আনিল—এই এই স্থানে মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রবেশ করিতে নিষেধ করা যাইতেছে ; অন্যথা করিলে অনধিকার-প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত হইবে।

এ আদেশ অমান্য করিবার কল্পনাও বিশ্বনাথের দল করিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া সে কল্পনা ত্যাগ করিয়াছে। দলের অন্য সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ দেবুর কাছে আসিয়াছে—সাহায্য-সমিতির ভার দিতে।···

দেবু বলিল—বিশু-ভাই, তুমি আমাকে রেহাই দাও। তুমি ঠাকুরমশায়ের পৌত্র—তুমি যাই কর, তোমার বংশের পুণ্যফল তোমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু আমি ফেটে মরে যাব।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—ওটা তোমার ভুল বিশ্বাস, দেবু-ভাই! কিন্তু সে যাক্ গে। এখন আমিই সাহায্য-সমিতির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য সকলে তো চলেই গেছেন, আমিও আজই চলে যাব! আমার সঙ্গে সংস্রব না থাকলে তো কারও আপত্তি হবে না।

দেবু কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—দেবু!

ম্লান-হাসি হাসিয়া দেবু বলিল—বিশু-ভাই!

বিশ্বনাথ বলিল—এতে আর তুমি অমত করো না।

—লোকে হয় তো তবু আর সাহায্য-সমিতেতে আসবে না, বিশু-ভাই!

—আসবে। ···বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—না আসে—তোমাকে বুঝিয়ে আনতে হবে। তুমি পারবে। টাকা পয়সা তো জাত মেনে হাত ঘোরে না, ভাই! চণ্ডালের ঘরের টাকা—বামুনের হাতে এলেই শুদ্ধ হয়ে যায়।

কাঁটার খোঁচার মত একটু তীক্ষ্ণ আঘাত দেবু অনুভব করিল ; সে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত বিশু-ভাইয়ের মুখখানি! কোনখানে এক বিন্দু এমন কিছু নাই—যাহা দেখিয়া অপ্রীতি জন্মে, রাগ করা যায়। বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া সে বলিল—কেন তুমি এমন কাজ করলে, বিশু-ভাই?

বিশ্বনাথ কথার উত্তর দিল না, অভ্যাস-মত নীরবে হাসিল।

দেবু বলিল—কঙ্কণার বাবুরা ব্রাহ্মণ হলেও সায়েবদের সঙ্গে এক-টেবিলে বসে খানা খায়—অখাদ্য খায়, মদ খায়, অজাত-কুজাতের মেয়েদের দিয়ে ব্যভিচার করে—তাদের আমরা ঘেন্না করি। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, পথের ভিখিরীরা পর্যন্ত ঘেন্না করে। ভয়ে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ঘেন্না করে। ওরা বামুনও নয়, ধর্মও ওদের তাই। কিন্তু রোগে, শোকে, দুঃখে বিশু-ভাই, মরণে পর্যন্ত আমাদের ভরসা ছিলে—তোমরা। ঠাকুরমশায়ের পায়ের ধূলো নিলে মনে হত সব পাপ আমাদের ধুয়ে গেল, সব দুঃখু আমাদের মুছে গেল। মনে মনে তখন ভাবতাম, একদিন ভগবান আসবেন, পৃথিবীর পাপীকে বিনাশ করে আবার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করবেন—তখন মনে পড়ত ঠাকুর মহাশয়ের মুখ। আজ আমরা কি করে বাঁচব বলতে পার? কার ভরসায় আমরা বুক বাঁধব?

বিশ্বনাথ বলিল—নিজের ভরসায় বুক বাঁধ, দেবু-ভাই! যেসব কথা তুমি বললে, সেসব নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। সে তোমার ভাল লাগবে না। শুধু একটা কথা বলে যাই। যে-কালে দাদুর মত ব্রাহ্মণেরা রাজার অন্যায়ের বিচার করতে পারত, চোখ রাঙালে বড় লোকে ভয়ে মাটিতে বসে যেত—সে-কালে চলে গেছে। এ-কালের অভাব হলে—হয় নিজেরাই দল বেঁধে অভাব ঘুচোবার চেষ্টা কর, নয় যারা আজ দেশরক্ষার ভার নিয়ে বসে আছে—তাদের কাছে দাবি জানাও। রোগ হলে, ওষুধের জন্যে—চিকিৎসার জন্যে তাদেরই চেপে ধর। অকালমৃত্যুতে তাদেরই চোখ রাঙিয়ে গিয়ে বল—কেন তোমাদের বন্দোবস্তের মধ্যে এমন অকাল-মৃত্যু? গভীর দুঃখে শোকে, অভিভূত যখন হবে—তখন ভগবানকে যদি ডাকতে ইচ্ছে হয়—নিজেরা ডেকো। ঠাকুর-মশায়দের কাজ আজ ফুরিয়ে গিয়েছে; তাই সেই বংশের ছেলে হয়েও আমি অন্য রকম হয়ে গিয়েছি। দাদু আমার—মন্ত্র-বিসর্জনের পর মাটির প্রতিমার মত বসেছিলেন, তাই তিনি চলে গেলেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বিশু-ভাই, তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ, তুমি আমাদের ঠাকুরমশায়ের বংশধর—তুমি আমাদের বাঁচাবে—এইটাই আমাদের সব চেয়ে বড় ভরসা ছিল। কিন্তু—

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—বলেছি তো, অন্যে তোমাদের আশীর্বাদের জোরে বাঁচাবে, এ ভরসা ভুল ভরসা, দেবু-ভাই! সে ভুল যদি আমা থেকে তোমাদের ভেঙে গিয়েই থাকে, তবে সে ভালই হয়েছে। আমি ভালই করেছি। আচ্ছা, আমি এখন চলি দেবু!

—কিন্তু বিশু-ভ —।

—যেদিন সত্যি ডাকবে, সেইদিন আবার আসব, দেবু ভাই! হয়তো বা নিজেই আসব।

বিশ্বনাথ দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া, খানিকটা আগে পথের বাঁকে মোড় ফিরিয়া মিলাইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ বিশ্বনাথ দাঁড়াইয়া গেল। কেহ যেন তাহার পথরোধ করিল। তাহার চোখে পড়িল—অদূরবর্তী মহাগ্রাম। ওই যে তাহাদের বাড়ির কোঠাঘরের মাথা দেখা যাইতেছে! ওই যে ঘনশ্যাম কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছটি। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখিয়া সে আবার মাথা নিচু করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কোন্ আকর্ষণে সে যে দাদু-জয়া-অজয়কে ছাড়িয়া, ঘর-দুয়ার ফেলিয়া, এমনভাবে জীবনের পথে চলিয়াছে—সে কথা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া যায়। অদ্ভুত অপরিমেয় উত্তেজনা এই পথ চলায়!

—ছোট্-ঠাকুর মশায়!

—কে?…চকিত হইয়া বিশ্বনাথ চারিপাশে চাহিয়া দেখিল।

পথের বাঁ দিকে মাঠের মধ্যে একটা পুকুরের পারের আমবাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে।

বিশ্বনাথ আবার প্রশ্ন করিল—কে? বহুকালের প্রাচীন গাছগুলি বাগানটার নিচের দিক্‌টা ঘন ছায়ায় প্রায় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর একটা নিচু গাছের ডালের আড়ালে মেয়েটির মুখের আড়াল পড়িয়া গিয়াছে, চেনা যাইতেছে না।

বাগানের ভিতর বাহির হইয়া আসিল দুর্গা।

বিশ্বনাথ বলিল—দুর্গা?

– আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানে?

—এসেছিলাম মাঠের পানে। দেখলাম—আপনি যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

—একবারে দেশ-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আপুনি?

বিশ্বনাথ দুর্গার মুখের দিকে চাহিল। দুর্গার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—দরকার হলেই আসব আবার।

দুর্গা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাসিল। বলিল—একটা পেনাম করে নি আপনাকে। আপনি তো এখানকার বিপদ-আপদ ছাড়া আসবেন না। তার

আগে যদি মরেই যাই আমি !·· সে আজ অনেকদিন পর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সে প্রণাম করিল খানিকটা সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব রাখিয়া। বিশ্বনাথ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ জানাইয়া বলিল—আমি জাত-টাত মানি না রে! আমার পায়ে হাত দিতে তোর এত ভয় কেন?

দুর্গা এবার বিশ্বনাথের পায়ে হাত দিল। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া হাসিয়া বলিল—জাত ক্যানে মানেন না ঠাকুরমশায়? এখানে এক নজরবন্দী বাবু ছিলেন—তিনিও মানতেন না! বলতেন—আমার খাবার জলটা না-হয় তুমিই এনে দিয়ো দুগ্‌গা।

বিশ্বনাথও হাসিল, বলিল—আমার তেষ্টা এখন পায়নি দুর্গা। না-হলে তোকেই বলতাম—আমি এইখানে দাঁড়াই—তুই এক গেলাস জল এনে দে আমায়।

দুর্গা আবার খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে না হয় আমাকে নিয়ে চলেন আপনার সঙ্গে। আপনার ঝিয়ের কাজ করব। ঘর-দোর পরিষ্কার করব, আপনার সেবা করব।

বিশ্বনাথ বলিল—আমার যে ঘরদোর নেই। এখানকার ঘরই পড়ে থাকল। তার চেয়ে এখানেই থাক্ তুই। আবার যখন আসব—তোর কাছে জল চেয়ে খেয়ে যাব।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেল; দুর্গা একটু বিষণ্ণ হাসি মুখে মাখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবু চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

বিশ্বনাথ চলিয়া যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই যে বসিয়াছিল—এখনও সেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ঠাকুরমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ চলিয়া গেল। তাহার মনে হইতেছে—সে একা। এ বিশ্বসংসারে সে একা! তাহার বিলু, তাহার খোকা যেদিন গিয়াছিল—সেদিন যখন তাহার বিশ্বসংসার শূন্য মনে হইয়াছিল, সেদিন গভীর রাত্রে আসিয়াছিলেন ঠাকুর মহাশয়। যতীনবাবু রাজবন্দী ছিল, অনেক দিন আগেই চলিয়া গিয়াছে। তাহার অভাবেও সে বেদনা অনুভব করিয়াছিল; কিন্তু তখন নিজেকে অসহায় বলে মনে হয় নাই। বিশ্বনাথ কয়েক দিন পরই আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সে সত্যই একা। আজ সে

একান্তভাবে সহায়হীন—আপনার জন কেহ পাশে দাঁড়াইতে নাই, বিপদে ভরসা দিতে কেহ নাই, সান্ত্বনার কথা বলে, এমন কেহ নাই। অথচ এ কি বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে? এ বোঝা যে নামিতে চায় না। চোখে তাহার জল আসিল। চারিদিকে নির্জন,—দেবু—চোখের জল সংবরণ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহার গাল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

এ-বোঝা যেন নামিবার নয়। শুধু তাই নয়—বোঝা যেন দিন দিন বাড়িতেছে; বোঝা আজ পাহাড়ের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। একখানা গ্রাম হইতে পাঁচখানা গ্রামের দুঃখের বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। খাজনা-বৃদ্ধির ধর্মঘট হইতে—শেখপাড়া কুসুমপুরের সঙ্গে বিরোধ, তারপর এই সর্বনাশা বন্যা, বন্যার পর কাল ম্যালেরিয়া—গো-মড়ক। পঞ্চগ্রামের অভাব-অনটন-রোগ-শোক আজ পাহাড়ের সমান হইয়া উঠিয়াছে। সে একা কি করিবে? কি করিতে পারে?

—জামাই-পণ্ডিত। তুমি কাঁদছ?

দেবু মুখ ফিরাইয়া দেখিল—দুর্গা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—ছোট-ঠাকুরমশায় চলে গেলেন—তাতেই কাঁদছ?···দুর্গা আঁচলের খুঁটে আপনার চোখ মুছিল। তারপর আবার বলিল—তা তুমি যদি যেতে না বলতে—তবে তো তিনি যেতেন না।

চাদরের খুঁটে চোখ-মুখ মুছিয়া দেবু বলিল—আমি তাকে যেতে বলেছি?

দুর্গা বলিল—আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম—তোমরা যখন কথা বলছিলে, সব শুনেছি আমি। লোকে আজ চাল নিতে আসে নাই। কাল আসত। কাল না আসত, পরশু আসত। জামাই, পেটের লেগে মানুষ কি না করে বল?···ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—জান তো, আমার দাদা ঘোষালের টাকা দিব্যি হাত পেতে নেয়।

দেবু নীরবে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা আবার বলিল—ছোট্-ঠাকুরমশায় পৈতা ফেলে দিয়েছে, জাত মানে না—বলছ, কিন্তু দ্বারিক চৌধুরীমশায়ের খবর শুনেছ?

—কি? চৌধুরীমশায়ের কি হল?···দেবু চমকিয়া উঠিল। দ্বারিক চৌধুরী কিছুদিন হইতে অসুখে পড়িয়া আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদায়ের দিন পর্যন্ত সে আসিতে পারে নাই। বৃদ্ধের অবশ্য বয়স হইয়াছে। তবুও তাহার মৃত্যু-সংবাদ দেবুর পক্ষে একটা বড় আঘাত হইবে! বৃদ্ধ মানুষ বড় ভাল। দেবুকে অত্যন্ত স্নেহ করে।

দুর্গা বলিল—চৌধুরীমশায় ঠাকুর বিক্রি করছে।

—ঠাকুর বিক্রি করছে!

—হ্যাঁ। ঠাকুরের সেবা আর চালাতে পারছে না। তার ওপরে বানে আর কিছু রাখে না। চৌধুরীমশায়কে পাল বলেছে—ঠাকুর আমাকে দাও, আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দোব। পাল নিজের বাড়িতে সেই ঠাকুর পিতিষ্ঠে করবে।

—শ্রীহরি?

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া একটু হাসিল?

দেবু আবার বলিল—চৌধুরী ঠাকুর বিক্রি করছেন?

—হ্যাঁ, বিক্রি করছেন। কথাটা এখন চাপা আছে। এখন হাজার হোক্ মানী লোক বটে তো চৌধুরীমাশায়। পালের হাতে ধরে বলেছে—এ কথা যেন কেউ না জানে পাল—অন্তত যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন বলো, অন্য কোন ঠাঁই থেকে এনেছ।···পাল কাউকে বলে নাই।

—বলতে যদি বারণই করেছে—শ্রীহরিও যদি বলে নাই কাউকে, তবে তুই জানলি কি করে? দেবু কথাটা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তর্কের কূটযুক্তিতে সে দুর্গার কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল। কথার শেষে সেই কথাই সে বলিল—ও তুই কার কাছে বাজে কথা শুনেছিস।

হাসিয়া দুর্গা বলিল – কি আর তোমাকে বলব জামাই-পণ্ডিত, বল?

– কেন?

—আমি বাজে কথা শুনি না।···দুর্গা হাসিল।—আমার খবর পাকা খবর। মনে নাই?

—কি?

—নজরবন্দীর বাড়িতে রেতে জমাদার এসেছিল—তোমাদের মিটিংয়ের খবর পেয়ে, সে খবর আমি আগে পেয়েছিলাম।

দেবুর মনে পড়িল। সেদিন দুর্গা খবরটা সময়মত না দিলে সত্যই অনিষ্ট হইত। অন্ততঃ ডেটিন্যু যতীনবাবুর জেল হইয়া যাইত।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—বিলু-দিদির বুন হয়েও আমি তোমার মন পেলাম না, আর লোকে সাধ্যি-সাধনা করে আমার মন পেল না।

দেবুর মুখে-চোখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; দুর্গার রসিকতা—বিশেষ করিয়া আজ মনের এই অবস্থায়—তাহার একেবারেই ভাল লাগিল না; সে বলিল—থাম্ দুর্গা। ঠাট্টা-তামাশার কথাও নয় এটা, সময়ও নয়। বল্ তুই কার কাছে শুনলি?

কয়েক মুহূর্তের জন্য দুর্গা মুখ ফিরাইয়া লইল। তার পরই সে আবার তাহার স্বাভাবিক হাসিমুখে বলিল—নিজের লজ্জার কথা আর কি করে বলি বল? চৌধুরীমশায়ের বড় বেটা আমাকে বলেছে। সে কিছুদিন থেকে আমার বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছে। আমি পরশু ঠাট্টা করেই বলেছিলাম—চৌধুরীমশায়, মালা-বদল করতে আমি সোনার হার নোব। বললে—তাই দোব আমি। বাবা ছিরু পালকে ঠাকুর বেচেছে—পাঁচশো টাকা দেবে। তোকে আমি হারই গড়িয়ে দোব।

দেবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা উঠিয়া পড়িল। বলিল—আমি এসে রান্না করব দুর্গা!

—কোথায়—? প্রশ্নটা করিতে গিয়া দুর্গা চুপ করিয়া গেল। কোথায় যাইতেছে জামাই-পণ্ডিত—সে বিষয়ে অস্পষ্টতার তো অবকাশ নাই। বারণ করিলেও সে শুনিবে না।

—আসছি! বেশী দেরী করব না।

দেবু হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

শিবপুর ও কালীপুরের মধ্যে ব্যবধান একটি দীঘি।

প্রকাণ্ড বড় দীঘি। এক সময়ে ওই চৌধুরীরাই কাটাইয়াছিল। দীঘিটা মজিয়া গিয়াছে। দীঘিটার পাড়েই চৌধুরীদের বাড়ি। এক সময়ে চৌধুরীদের বাঁধানো ঘাট ছিল, ঐ ঘাটে চৌধুরীদের গৃহ-দেবতা লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার স্নান-যাত্রা পর্ব অনুষ্ঠিত হইত। ঘাটটির নামই 'জনার্দনের ঘাট'। ঘাটটি এখন ভাঙিয়া গিয়াছে, দীঘিটা মজিয়া আসিয়াছে, পানায় সারা বৎসর ভরিয়া থাকে, তবুও ওইখানেই স্নান-যাত্রা পর্বের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান ঠিক বলা চলে কি না, দেবু জানে না। দেবুর বাল্যকালে চৌধুরীদের ভাঙা ঘাটে ফাটল-ধরা বাঁধা-ঘাটে স্নান-যাত্রার যে অনুষ্ঠান সে দেখিয়াছে, তাহার তুলনায় এখন যাহা হয়—তাহাকে বলিতে হয়—অনুষ্ঠানের অভিনয়, কোনমতে নিয়ম-রক্ষা।

মজা দীঘিটাতে যে জল থাকিত, তাহাতেও কার্তিক মাসের অনাবৃষ্টিতে অনেক উপকার করিত। অনেকটা জমিতে সেচ পাইত। এবার আবার ময়ূরাক্ষীর বন্যায় দীঘিটার একটা মোহনা ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই এই আশ্বিন মাসেই দীঘিটা নিঃশেষ জলহীন হইয়া পড়িয়া আছে। দীঘির ভাঙা ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দীঘিটার পরই চৌধুরীদের আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা খিড়কি। খিড়কির ছোট পুকুরটার ওপরেই ছিল চৌধুরীদের সেকালের পাকাবাড়ি।

এখনও ছোট পাতলা ইটের স্তূপ পড়িয়া আছে। পাকা বাড়ি-ঘরের আর এখন কিছুই অবশিষ্ট নাই, বহু কষ্টে কেবল চৌধুরী রথের ঘরের ফাট-ধরা পাকা দেওয়াল কয়খানি খাড়া রাখিয়াছিল; ছাদ গেলে খড়ের চাল করিয়াছিল; এবার বন্যায় সেখানাও পড়িয়া গিয়াছে। কাঠের রথখানাও ভাঙিয়াছে। সর্বাঙ্গে কাদামাখা রথখানা কাত হইয়া পড়িয়া আছে একটা গাছের গুঁড়ির উপর।

ভগ্নস্তূপ পার হইয়া দেবু চৌধুরীর বর্তমান মাটির বাড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের ঘরখানার সামনের বারান্দাটার চাল পচিয়া খসিয়া গিয়াছে। বারান্দার উপরে পাতা তক্তপোশটা জলে ভিজিয়া—রৌদ্রে শুকাইয়া, ফুলিয়া-ফাঁপিয়া-ফাটিয়া পড়িয়া আছে—জরা-জীর্ণ শোকরোগগ্রস্ত বৃদ্ধের মত।

বাড়ির ভিতর-মহলে বাইরের পাঁচিল ভাঙিয়া গিয়াছে—সেখানে তাল-পাতার বেড়া দেওয়া হইয়াছে। বেড়ার ফাঁক দিয়াই দেখা যাইতেছে, একদিকে একখানা ঘর ভাঙিয়া একটা মাটির স্তূপ হইয়া রহিয়াছে; চালের কাঠগুলা এখনও ভাঙিয়া পড়িয়া আছে অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কালের মত।

অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ দেবুর কণ্ঠনালী দিয়া আওয়াজ বাহির হইল না, তাহার পা উঠিল না; নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। চৌধুরীর বাড়ির এ দুরবস্থা সে কল্পনা করিতে পারে না। চৌধুরীর বাড়ি অনেক দিন ভাঙিয়াছে; পাকা ইমারত ইটের পাঁজায় পরিণত হইয়াছে, জমিদারী গিয়াছে, পুকুর গিয়াছে, যে পুকুর আছে, তাও মাজিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবুও চৌধুরীর মাটির কোঠা—মাটির বাড়িখানার শ্রী ও পরিপাট্য ছিল। চৌধুরীর জমিও কিছু আছে; বন্যার পরে যখন সাহায্য-সমিতির পত্তন হয়, তখনও চৌধুরী নগদ একটি টাকা দিয়াছে। দেবু অনেকদিনই এদিকে আসে নাই; সুতরাং অবস্থার এমন বিপর্যয় দেখিয়া সে প্রায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার উপর চৌধুরীর অসুখ। সে লুব্ধচিত্তে কঠোর কথা বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। দেবু একবার ভাবিল—ফিরিয়া যাই। চৌধুরী লজ্জা পাইবে, মর্মান্তিক বেদনা পাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ডাকিল—চৌধুরীমশায়! হরেকেষ্ট!

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু বাড়ির ভিতর সাড়া জাগিয়াছে বুঝা গেল। মেয়েরা ফিস ফিস্ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিতেছে। চৌধুরী-বাড়ি আজ সাধারণ চাষী গৃহস্থের বাড়ি ছাড়া কিছু নয়—তবুও পর্দার আভিজাত্য এখনও পূরা বজায় আছে।

দেবু আবার ডাকিল—হরেকেষ্ট বাড়ি আছ?

হরেকেষ্ট চৌধুরীর বড় ছেলে। সে এবার বাহির হইয়া আসিল ; সেই মুহূর্তেই চৌধুরীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের রেশ ভাসিয়া আসিল—আঃ! কে ডাকছেন দেখ-না হে!

হরেকেষ্ট নির্বোধ, গাঁজাখোর ; সে তাহার বড় বড় দাঁতগুলি বাহির করিয়া আপ্যায়িতের হাসি হাসিয়া বলিল—দেখ্‌বেন আর কি? বাবার আমার শেষ-অবস্থা, কবরেজ বলেছে—বড় জোর পাঁচ-সাতদিন।

দেবু বলিল—চল, একবার দেখব।

হরেকেষ্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এস! এস—সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের দিকে উদ্দেশ করিয়া হাঁকিল—সরে যাও সব একবার। পণ্ডিত যাচ্ছে। দেবু পণ্ডিত।

কুড়ি-পঁচিশ দিন পূর্বে চৌধুরী অসুস্থ অবস্থাতেও গাড়ি করিয়া সাহায্য সমিতির আসরে গিয়াছিল ; এই কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যেই চৌধুরী যেন আর এক মানুষে পরিণত হইয়াছে—মানুষ বলিয়া আর চেনাই যায় না। চামড়ায় ঢাকা হাড়ের মালা একখানা পড়িয়া আছে যেন বিছানার উপর। চোখ কোটরগত, নাকটা খাঁড়ার মত প্রকট, হনু দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়া চৌধুরীর মূর্তিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

চৌধুরী এই অবস্থাতেও হাসিয়া বলিল—এস, বস।···শীর্ণ হাতখানি দিয়া চৌধুরী অনতিদূরে পাতা একখানি মাদুর দেখাইয়া দিল! ইহারই মধ্যে চৌধুরী এই ব্যবস্থাটুকু করাইয়া রাখিয়াছে!

দেবু বসিল তাহার বিছানায়। বলিল—এমন কঠিন অসুখ করেছে আপনার? কই, কিছুই তো শুনিনি চৌধুরীমশায়?

চৌধুরী ম্লান হাসি হাসিল। বলিল—ফকিরে যায়-আসে, লোকের নজরে পড়বার কথা নয় পণ্ডিত। রাজা-উজীর যায়—লোক-লস্কর হাঁক-ডাক, লোকে পথে দাঁড়িয়ে দেখে। বুড়োর যাওয়াও ফকিরের যাওয়া!

দেবু চুপ করিয়া রহিল ; তাহার অনুশোচনা হইল—লজ্জা হইল যে, সে এতদিনের মধ্যে কোন খোঁজ-খবর করে নাই।

চৌধুরী বলিল—বাবা, তুমি ওই মাদুরটায় বস! আমার গায়ে বিছানায় বড় গন্ধ হয়েছে।

চৌধুরীর শীর্ণ হাতখানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া দেবু বলিল—না, বেশ আছি।

চৌধুরী বলিল—তোমাকে আশীর্বাদ করি—তোমার মঙ্গল হোক ; তোমার থেকে দেশের উপকার হোক—মঙ্গল হোক্।

দেবু প্রশ্ন করিল—কে চিকিৎসা করছে?

—চিকিৎসা ?…চৌধুরী হাসিল।—চিকিৎসা করাইনি। নিজেই বুঝতে পারছি—নাড়ী তো একটু-আধটু দেখতে জানি, আর খুব বেশী দিন নয়। একদিন মেয়েরা জিদ্ করে কবরেজ ডেকেছিল। ওষুধও দিয়ে গিয়েছে, তবে ওষুধ আমি খাই না। আর দিন নাই! কি হবে মিছামিছি পয়সা খরচ করে ? একটু জল দাও তো বাবা। ওই যে। হ্যাঁ।

সযত্নে জল খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দেবু বলিল—না, না। ওষুধ না-খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

—পয়সা নাই পণ্ডিত।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

চৌধুরী বলিল—অনেক দিন থেকেই ভেতর শূন্য হয়েছিল। এবার বন্যাতে সব শেষ করে দিলে। ধান যে কটা ছিল ভেসে গিয়েছে ; কদিন আগে ছুটো বলদের একটা মরেছে, একটা বেঁচেছে ; কিন্তু সেও মরারই সামিল। বড় ছেলেটাকে তো জান—গাঁজাখোর—নষ্টচরিত্র। ছেলেগুলো খেতে পায় না। কি করব ?

দেবু বলিল—কাল ডাক্তার নিয়ে আসব।

—না।

—না নয়। ডাক্তারকে না-চান, কবরেজ নিয়ে আসব আমি।

—না। চৌধুরী এবার বারবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, পণ্ডিত না। বাঁচতে আমি আর চাই না। একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল—ঠাকুর মশায় কাশী গেলেন—বিছানায় শুয়েই বৃত্তান্ত শুনলাম। ডুলি করে একবার শেষ দর্শন করিতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু লজ্জাতে তাও পারলাম না। পণ্ডিত আমি কি করেছি জান ?

দেবু, চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিল।

চৌধুরীর মুখের তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল ; বলিল—আমি আমাদের লক্ষ্মী-জনার্দন ঠাকুরকে বিক্রি করেছি! শ্রীহরি ঘোষ কিনলেন।

ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ হইয়া গেল। কথাটি বলিয়া চৌধুরী বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দেবুও কোন কথা বলিতে পারিল না।

বহুক্ষণ পরে চৌধুরী বলিল—লক্ষ্মী না থাকলে নারায়ণও থাকেন না, পণ্ডিত। ঠাকুর দেখলাম—সম্পদের ঠাকুর! গরীবের-ঘরে উনি থাকেন না! আমি স্বপ্ন দেখলাম পণ্ডিত! ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে তাই বললেন!

সবিস্ময়ে দেবু প্রশ্নের আকারে কথাটার শুধু পুনরুক্তি করিল—স্বপ্নে বললেন ?

—হ্যাঁ···বহুক্ষণ ধরিয়া বারবার থামিয়া—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চৌধুরী বলিয়া গেল—একদিন ঘরে কিছুই ছিল না। আতপ চালও একমুঠো ছিল না যে, নৈবেদ্য হয়। ভোগ তো দূরের কথা! নিরুপায় হয়ে বড় ছেলেটাকে পাঠালাম—মহাগ্রামে ঠাকুরমশায়ের কাছে! ওটা গাঁজা খায়—মধ্যে মধ্যে ঘোষের দরবারে আজকাল যায় তামাক খেতে, হয়তো ঘোষের ওখানে নেশাও পায়। ও ঠাকুরমশায়ের বাড়ি না গিয়ে, ঘোষের বাড়ি গিয়েছিল। ঘোষ আতপ চাল দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—তোমার বাবাকে বলো—ঠাকুরটি আমাকে দেন। আমার ইচ্ছে, ঠাকুর প্রতিষ্ঠে করি। না-হয় পাঁচশো টাকা দক্ষিণে আমি দোব।···হতভাগা আমাকে এসে সেই কথা বল্‌লে। বলব কি দেবু, মনে মনে বারবার ঠাকুরকে অন্তর কাটিয়ে বললাম,—ঠাকুর, তুমি আমাকে সম্পদ্ দাও, তোমার সেবা করি সাধ মিটিয়ে; এ অপমান থেকে আমাকে বাঁচাও। নইলে বল আমি কি করব?···রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—শ্রীহরির ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠে হচ্ছে। আমি টাকা নিচ্ছি শ্রীহরির কাছে। প্রথম দিন মনে হল—চিন্তার জন্যে এমন স্বপ্ন দেখেছি; বলব কি পণ্ডিত, দ্বিতীয় দিন দেখলাম···আমাদের পুরুতমশায় বলছেন—আপনি শ্রীহরির ঘরেই ঠাকুরকে দিয়ে আসুন। ঠাকুর রেখে আপনি কি করবেন?··· পরের দিন আবার দেখলাম—আমি নিজে শ্রীহরির হাতে ঠাকুরকে তুলে দিচ্ছি। বুঝলাম, ভেবেও দেখলাম—আমার মৃত্যুর পর ছেলেরা হয়তো নিত্যপূজাই তুলে দেবে।···চৌধুরী হাসিয়া বলিল, আর রাখবেই বা কি করে? নিজেদেরই যে অন্ন জুটবে না! যে জমিটুকু আছে, তাও বন্ধক ছিল ফেলারাম চৌধুরীর কাছে। এক শো টাকা—সুদে আসলে আড়াই শো হয়েছে। শ্রীহরিকে ডেকে—পাঁচ শো টাকা নিলাম পণ্ডিত। জমিটা ছাড়িয়ে নিলাম। কি করব, বল?

দেবু স্তম্ভিত, নির্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আচ্ছা, আজ আমি উঠি।

—উঠবে?

—হ্যাঁ। আজ যাই, আবার আসব।

—এস।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলিয়া চৌধুরী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া নিথর হইয়া সে-ও চোখ বুজিল।

দেবু আসিয়াছিল চৌধুরীর উপর ক্ষোভ লইয়া। অর্থের জন্য দেবতা—বংশের ঠাকুরকে বিক্রয় করিয়াছে শুনিয়া তাহার যে ক্ষোভ হইয়াছিল, সে

ক্ষোভ—সে দুঃখ ন্যায়রত্নের দেশত্যাগের জন্য ক্ষোভ-দুঃখের চেয়ে বড় কম নয়। তাহার প্রিয়তম বন্ধু, জীবনের একমাত্র ভরসার স্থল বিশু-ভাইকে সে যেমন ত্যাগ করিয়াছে, তেমনি ভাবে চৌধুরীকে পরিত্যাগের বার্তাই সে শুনাইতে আসিয়াছিল। দূর হইতে মনে মনে সংকল্প করিয়া তাহার ক্ষোভ মেটে নাই, তাই সে আসিয়াছিল—চৌধুরীকে সে কথা রূঢ়ভাবে শুনাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু সে ফিরিল নির্বাক বেদনার ভার লইয়া। চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তাহার আর নাই। মনে মনে বার বার সে দোষ দিল—অভিযুক্ত করিল দেবতাকে। এক্ষেত্রে চৌধুরী আর কি করিতে পারিত? স্বপ্নগুলি যদি তাহার মনের ভ্রমও হয়—তবুও সব দিক্ বিচার করিয়া দেখিয়া মনে হইল, চৌধুরী ঠিকই করিয়াছে। তাহার কর্তব্য সে করিয়াছে। চিরদিন সংসারের শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছে—ভোগ দিয়াছে; আজ নিঃস্ব অবস্থায় সেই দেবতার সেবাভোগ দিতে পারিবে না বলিয়া সে যদি সম্পদশালীর হাতেই দেবতাকে দিয়া থাকে—তবে সে অন্যায় করে নাই, তাহার কর্তব্যই করিয়াছে; কিন্তু দেবতা তাহার কি করিল? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—ঠাকুরমহাশয়ের গল্প। দুঃখ তাঁহার পরীক্ষা!

না—না! সে আপন মনেই বলিল—না। এই বিশ্ব-জোড়া দুঃখ তাঁহার পরীক্ষা বলিয়া আজ আর কিছুতেই সে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক দিয়া গোটা দেশটাকে ছন্নছাড়া করিয়া পরীক্ষা?

পথ দিয়া আসিতে আসিতে শুনিল—পাশেই শিবপুরের বাউড়ীপাড়ায় কয়েকটি নারী-কণ্ঠের বিনাইয়া-বিনাইয়া কান্নার সুর উঠিতেছে!

বাঁ দিকে আউশের মাঠ খাঁ-খাঁ করিতেছে। ধান নাই। সামনে আসিতেছে কার্তিক মাস, রবিফসল চাষের সময়, লোকের শক্তি-সামর্থ্য নাই, গরু নাই, সে চাষও হয় তো অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহারও আগে পূজা—দুর্গাপূজা। পূজাও বোধ হয় এবার হইবে না। ঠাকুরমহাশয়ের বাড়ির পূজা করিবে—তাঁহারই টোলের এক ছাত্র। তিনি তাহাকেই ভার দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুরমশায় না থাকিলে—সে কি পূজা হইবে? মহাগ্রামের দত্তদের পূজা গতবারেও তাহারা ভিক্ষা করিয়া করিয়াছিল। এবার আর হইবেই না। লোকের ঘরে নূতন কাপড়-চোপড়, ছেলেদের জামা-পোশাক—হইবে না।

সব শেষ হইয়া গেল! সব শেষ!

ঠাকুরমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন, চৌধুরী মৃত্যু-শয্যায়; মাতব্বর বলিতে পঞ্চগ্রামে আর কেহ রহিল না। ছেলেবেলায় প্রাচীন কালের লোকদের

কাছে শুনিয়াছিল—'তেমুণ্ডে'র পরামর্শ লইতে হয়; 'তেমুক্ত' অর্থাৎ তিনটা মুণ্ড যাহার, তাহার কাছে। প্রথমে তাহার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। তার পরই শুনিয়াছিল—'তেমুণ্ড' হইল অতি প্রাচীন বৃদ্ধ। উবু হইয়া বসিয়া থাকে, দুই পাশে থাকে হাঁটু দুইটা; মাঝখানে টাক-পড়া চক্‌চকে মাথাটি—দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় তিনমুণ্ডবিশিষ্ট মানুষ। তেমুণ্ড দূরে থাক্, আজ পরামর্শ দিবার কোন প্রবীণ লোকই রহিল না।

অন্নহীন দেশ, শক্তিহীন রোগজর্জরিত মানুষ, উদ্দেষ্টা-অভিভাবকহীন সমাজ দেবতারা পর্যন্ত নির্দয় হইয়া সেবা-ভোগের জন্য ধনীদের ঘরে চলিয়াছেন। এদেশের আর কি রক্ষা আছে?

কোন আশা নাই, সব শেষ।

গভীর হতাশায় দুঃখে দেবু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভিক্ষা করিলেও এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোককে বাঁচান কি তাহার সাধ্য! পরক্ষণেই মনে হইল—একজন পারিত; বিশু ভাই হয়তো পারিত! সে-ই তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।...

তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

কিসের ঢোল পড়িতেছে! ও কিসের ঢোল? ঢোল পড়ে সাধারণতঃ জমি-নিলামের ঘোষণায়—আজকাল অবশ্য ইউনিয়ন-বোর্ডের হাকিমদের হুকুমজারি ঢোল-সহযোগে হইয়া থাকে। ট্যাক্সের জন্য অস্থাবর ক্রোক, ট্যাক্স আদায়ের শেষ তারিখ, ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রভৃতির ঘোষণা—হরেক রকমের হুকুম। এ-ঢোল কিসের?...দেবু দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

চিরপরিচিত ভূপাল একজন মুচিকে লইয়া ঢোল-সহরত করিয়া চলিয়াছে!

—কিসের ঢোল, ভূপাল?

—আজ্ঞে, ট্যাক্স।

—ট্যাক্স? এই সময় ট্যাক্স?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর খাজনাও বটে।

দেবুর সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল। এই দুঃসময়—তবু ট্যাক্স চাই, খাজনা চাই।...কিন্তু সে কথা ভূপালকে বলিয়া লাভ নাই। সে দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে ভূপালদের পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

দুঃখে নয়—এবার ক্ষোভে ক্রোধে তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

কোন উপায়ই কি নাই? বাঁচিবার কি কোন উপায়ই নাই?

চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীহরির সেরেস্তা পড়িয়াছে। গোমস্তা দাসজী বসিয়া আছে।

কালু শেখ কাঠের ধুনি হইতে একটা বিড়ি ধরাইতেছে। ভবেশ ও হরিশ বসিয়া আছে, তাহাদের হাতে হুঁকা। মহাজন ফেলারাম ও শ্রীহরি বকুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে—কোন গোপন কথা। কাহারও সর্বনাশের পরামর্শ চলিতেছে বোধ হয়।

গতিবেগ আরও দ্রুততর করিল দেবু।

বাড়ির দাওয়ার উপর গৌর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ওই একটি ছেলে! বড় ভাল ছেলে! একেবারে বাড়ির সম্মুখে আসিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল! একটা লোক—তাহার তক্তাপোশের উপর শুইয়া ঘুমাইতেছে। লোকটার পরনে হাফ-প্যান্ট, গায়ে সস্তাদরের কামিজ ও কোট; পায়ে ছেঁড়া মোজা, জুতাজোড়াটা নূতন হইলেও দেখিলে বুঝা যায় কমদামী। হ্যাটও আছে, হ্যাটটা মুখের উপর চাপা দিয়া দিব্যি আরামে ঘুমাইতেছে, মুখ দেখা যায় না। পাশে টিনের একটা স্যুটকেস।

দেবু গৌরকে প্রশ্ন করিল—কে গৌর?

গৌর বলিল—তা তো জানি না। আমি এখুনি এলাম দেখলাম, এমনি ভাবেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

দেবু স-প্রশ্ন ভঙ্গিতে আবার লোকটার দিকে চাহিল।

গৌর ডাকিল—দেবু-দা!

—কি?

—ভিক্ষের বাক্সগুলো নিয়ে এসেছি! চাবি খুলে পয়সাগুলো নেন। আরও পাঁচ-ছটা বাক্স দিতে হবে। আমাদের আরও পাঁচ-ছজন ছেলে কাজ করবে।

দেবু মনে অদ্ভুত একটা সান্ত্বনা অনুভব করিল। তালাবন্ধ ছোট ছোট টিনের বাক্স লইয়া গৌরের দল জংশন-স্টেশনে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করে। সেই বাক্সগুলি পূর্ণ করিয়া সে পয়সা লইয়া আসিয়াছে। সংবাদ আনিয়াছে—তাহার দলে আরও ছেলে বাড়িয়াছে; আরও ভিক্ষার বাক্স চাই। পাত্রে ভিক্ষা ধরিতেছে না। আরও পাত্র চাই।

সে সস্নেহে গৌরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল।

গৌর বলিল—আজ একবার আমাদের বাড়ি যাবেন সন্ধ্যের সময়?

—কেন? দরকার আছে কিছু? কাকা ডেকেছেন নাকি?

—না, স্বর্ন এবার পরীক্ষা দেবে কিনা। তাই দরখাস্ত লিখে দেবেন। আর স্বর্ন তার পড়ার কতকগুলা জায়গা জেনে নেবে।

—আচ্ছা, যাব।…গভীর স্নেহের সঙ্গে দেবু সম্মতি জানাইল। গৌর আর

স্বর্ণ—ছেলেটি আর মেয়েটির কথা ভাবিয়া পরম সান্ত্বনা অনুভব করিল দেবু। আর ইহারা বড় হইলে এ অঞ্চলের অবস্থা আর একরকম হইয়া যাইবে।

বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা, সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—যাক্, ফিরতে পারলে! খাবে-দাবে কখন?

তাহার শাসনে দেবু না হাসিয়া পারিল না; বলিল—এই যে! চল।

দুর্গা একটু হাসিয়া বলিল—নাও, আবার কুটুম এসেছে।

—কুটুম?

—ওই যে! দুর্গা ঘুমন্ত লোকটিকে দেখাইয়া দিল।

দেবুর কথাটা নূতন করিয়া মনে হইল! সবিস্ময়ে সে বলিল—তাই বটে। ও কে রে?

—কর্মকার?

—কর্মকার?

—অনিরুদ্ধ গো! চাকরি করে সাহেব সেজে ফিরে এসেছে। মরণ আর কি!

—অনিরুদ্ধ গো? অনি-ভাই?

—হ্যাঁ।

কথাবার্তার সাড়াতেই, বিশেষ করিয়া বারবার অনিরুদ্ধ শব্দটার উচ্চারণে অনিরুদ্ধ জাগিয়া উঠিল। প্রথমে মুখের টুপিটা সরাইয়া দেবুর দিকে চাহিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—দেবু-ভাই! রাম-রাম!

তেইশ

দেবু অনিরুদ্ধকে বলিল—এতদিন কোথায় ছিলে অনি-ভাই?

উত্তরে অনিরুদ্ধ দেবুকে বলিল—কেয়া, পদ্ম ঘর ছোড়কে চলা গেয়া দেবু-ভাই?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথা হেঁট করিল। কোন কথা সে বলিতে পারিল না, পদ্মকে সে রক্ষা করিতে পারে নাই! গৃহত্যাগিনী কন্যার পিতা, পত্নীর স্বামী, ভগ্নীর ভাই সেই গৃহত্যাগের প্রসঙ্গ উঠিলে যেভাবে মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকে, তেমনি ভাবেই সে চুপ করিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ হাসিল; বলিল—সরম কাহে? তুমারা কেয়া কসুর ভাই?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ঘাড় নাড়িয়া—যেন মনে-মনে অনেক বিবেচনা করিয়া বলিল—উস্‌কা ভি কুছ কসুর নেহি! কুছ্‌ না! যানে দেও।

শেষে আপনার বুকে হাত দিয়া নিজেকে দেখাইয়া বলিল—কস্থর হামার; হাঁ; হামারা কস্থর।

দেবু এতক্ষণে বলিল—একখানা চিঠিও যদি দিতে অনি-ভাই!

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—আর কোন কথা বলিল না।

দুর্গা দেবুকে তাগিদ দিল—জামাই, বেলা দুপুর যে গড়িয়ে গেল! রান্না কর।...তারপর অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল—মিতেও তো এইখানে খাবে? না কি হে?

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, এইখানে খাবে বৈকি। তুই কথাবার্তা বলতে শিখলি না দুগ্‌গা।

দুর্গা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল—ও যে আমার মিতে! ওকে আবার কুটুম্বিতে কিসের? কি হে মিতে, বল না?

অনিরুদ্ধ অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল—সচ্‌ বোলা হ্যায় মিতেনী!

তাহার এই হাসিতে দেবু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। বলিল—তুমি মুখহাত ধোও অনি-ভাই। তেল-গামছা নাও, চান কর। আমি রান্না করে ফেলি।

বাড়ির ভিতর আসিয়া সে রান্নার উদ্যোগ আরম্ভ করিল।...অনিরুদ্ধ! হতভাগ্য অনিরুদ্ধ। দীর্ঘকাল পরে ফিরিল—কিন্তু পদ্ম আজ নাই! থাকিলে কি সুখের কথাই না হইত! আজ অনিরুদ্ধের হাতে তাহাকে সে সমর্পণ করিত মেয়ের বাপের মত—বোনের বড় ভাইয়ের মত। হতভাগিনী পদ্ম! সংসারের চোরাবালিতে কোথায় যে তলাইয়া গেল, কে জানে! তাহার কঙ্কালের একখানা টুকরাও আর মিলিবে না—তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য।

অনিরুদ্ধ বাহিরে বক্‌-বক্‌ করিতেছে। অনর্গল অশুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলিয়া চলিয়াছে। বাংলা যেন জানেই না। যেন আর-এক দেশের মানুষ হইয়া গিয়াছে সে।

খাইতে বসিয়া অনিরুদ্ধ তাহার নিজের কথা বলিল—এতক্ষণে সে বাংলায় কথা বলিল।...জেলখানাতেই মনে মনে বড় আক্ষেপ হয়েছিল দেবু-ভাই! নিজের ওপর ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবতাম, গাঁয়ে মুখ দেখাব কি করে? আর গাঁয়ে গিয়ে খাবই বা কি? কিছুদিন থাকতে থাকতে আলাপ হল একজন হিন্দুস্থানী মিস্ত্রীর সঙ্গে। লোকটার জেল হয়েছিল মারামারি করে। কারখানার আর একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে মারামারি করেছিল—একজন মেয়েলোকের জন্যে। সেই আমাকে বললে। আমার খালাসের

একদিন আগে তার খালাসের দিন। কলকাতায় তার জেল হয়েছিল—খালাস হবে সে সেইখানে। ক'দিন আগেই এ জেল থেকে চলে গেল। আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলে গেল—তুমি চলে এসো আমার কাছে। আমি তোমার কাজ ঠিক করে দোব।···জেল থেকে খালাস পেয়ে বের হলাম। ভাবলাম বাড়ি যাব না, জংশন থেকে খবর দিয়ে পদ্মকে আনিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।···তা—অনিরুদ্ধ হাসিল; কপালে হাত দিয়া বলিল হামারা নসীব দেবু-ভাই। আমাদের সেই বলে না—"গোপাল যাচ্ছ কোথা?···ভূপাল! কপাল? কপাল সঙ্গে!" আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জংশনের কলের একটা মেয়ের সঙ্গে। দুগ্‌গা জানে, সাবি—সাবিত্রী মেয়েটার নাম। মেয়েটা দেখতে-শুনতে খাসা; আমার সঙ্গে—। অনিরুদ্ধ আবার হাসিল। অনিরুদ্ধের সঙ্গে মেয়েটির আগে হতেই জানাশুনা; জানাশুনার চেয়েও গাঢ়তর পরিচয় ছিল। মেয়েটি ছিল কলের বৃদ্ধ খাজাঞ্চীর অনুগৃহীতা। বৃদ্ধের কাছে টাকা-পয়সা সে যথেষ্ট আদায় করিত, কিন্তু তাহার প্রতি অনুরক্তি বা প্রীতি এতটুকু ছিল না। সে সময়টায় বুড়ার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মেয়েটি সদর শহরে আসিয়া দেহ-ব্যবসায়ের আসরে নামিয়াছিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না আমাকে। নিয়ে গেল তার বাসায়। মদ-টদ খাওয়ালে। আর সেইদিনই এলো সেই বুড়ো খাজাঞ্চী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। মেয়েটা জ্বলে গেল। রাত্রেই আমাকে বললে—চল, আমরা পালাই।···দেবু-ভাই, মাতন কাকে বলে, তুমি জান না। মাতনে মেতে তাই চলে গেলাম। গিয়ে উঠলাম কলকাতায় মিস্ত্রীর ঠিকানায়। তারপর—।

তারপর অনিরুদ্ধ বলিয়া গেল এতদিনের দীর্ঘ কাহিনী···কলে কাজ ঠিক করিয়া দিল মিস্ত্রী! কামারশালায় মজুরের কাজ। কামারের ছেলে—তাহার উপর বুকে দারিদ্র্যের জ্বালা, কাজ শিখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। মজুর হইতে কামারের কাজ, কামারের কাজ হইতে ফিটার-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়া সে আজ পুরাদস্তুর একজন ফিটার। বার আনা হইতে দেড় টাকা—দেড় টাকা হইতে দুই টাকা—দুই হইতে আড়াই—আজ তাহার দৈনিক মজুরি তিন টাকা। তার উপর ওভারটাইম। ওভারটাইম ছাড়াও মধ্যে মধ্যে তাহার বাহিরে দুই চারিটা ঠিকার কাজ থাকে।

অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাই, পেট ভরে খেয়েছি—পরেছি—আবার মদ খেয়েছি, ফুর্তি করেছি—করেও আমি ছ'-শে পঁচাত্তর টাকা সঙ্গে এনেছি। ভেবেছিলাম—ঘর-দোর মেরামত করব—জমি কিনব। পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে

যাব।…তা…অনিরুদ্ধ দুটি হাতই উল্টাইয়া দিয়া বলিল—ফুড়ুৎ ধা হয়ে গেল! অনিরুদ্ধ চুপ করিল। দেবুও কোন উত্তর দিল না। এ সবের কি উত্তর সে দিবে? দুর্গা অদূরে বসিয়া সব শুনিতেছিল। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তারপর, সাবি কেমন আছে?

—ছিল ভালই। তবে—।…হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কদিন হল সাবি কোথা পালিয়েছে।

—পালিয়েছে?

—হাঁ।

—তাতেই বুঝি পরিবারকে মনে পড়ল?

অনিরুদ্ধ দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কাজে-কাজেই, তাই হল বৈকি। দোষ আমার, সে তো আমি স্বীকার করছি। তবে—

দুর্গা বলিল—তবে কি?

—তবে যদি ছিরের ঘরে না যেত, তবে আমার কোন দুঃখুই হত না।… কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তাও যে সে ছিরের ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে—এতেও আমি সুখী।

দেবু বলিল—তাহার একমাত্র অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করিল—তুমি যদি একখানা চিঠিও দিতে, অনি-ভাই?

অনিরুদ্ধ বলিল—বলেছি তো মাতন কাকে বলে, তুমি জান না দেবু-ভাই! আমি যেতে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া—মনে মনে কি ছিল জান? মনে মনে ছিল যে, রোজগার করে হাজার টাকা না নিয়ে আমি ফিরব না। ফিরে তোমাদিগকে সব তাক্ লাগয়ে দোব।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তা এখন এসে তোমারই তাক লেগে গেল!

—না—অনিরুদ্ধ অস্বীকার করিয়া বলিল—না। এ রকম একটা মনে মনে ভেবেই এসেছিলাম। খাবার নাই, পরবার নাই—স্বামী দেশ-ছাড়া, ছেলেপুলে নাই, জোয়ান বয়েস পদ্মর; এ আমি হাজারবার ভেবেছি দুগ্‌গা। তবে সবচেয়ে বেশী দুঃখ—।

—কি?

—না! সে আর বলব না।

—ক্যানে? তোর আবার লজ্জা হচ্ছে নাকি?

—লজ্জা?…দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাইয়ের ছেলে-পরিবার ছিল না, ওই তাকে খেতে-পরতে দিলে। হারামজাদী এসে ওর পায়ে গড়িয়ে পড়ল না কেন? আজ আমি দেবু-ভাইয়ের কাছে চেয়ে

নিয়ে যেতাম। সে যদি না যেতে চাইত, কি দেবু-ভাই যদি দুঃখু পেতো, আমি হাসি-মুখে চলে যেতাম।

দেবু বলিয়া উঠিল—আঃ—আঃ, অনি-ভাই!

সে খাবার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।···

সমস্ত বাকী দ্বিপ্রহরটাই দেবুর মনে পড়িল—সেদিনকার রাতের কথা। বাহিরের তক্তপোশের উপর বসিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে সেই শিউলি গাছটার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার একাগ্র চিন্তায় বাধা দিয়া দুর্গা তাহাকে ডাকিল—জামাই!

—এঁ্যা! আমাকে বলছিস্?

দুর্গা হাসিল; বলিল—বেশ যা হোক্। জামাই আর কাকে বলব?

—কি বলছিস্?

উ বেলায় গৌর এসেছিল। আমাকে বলে গিয়েছে, দেবু-দাদাকে একবার মনে করে যেতে বলো আমাদের বাড়ি। কি দরখাস্ত না কি লিখতে হবে। বার বার করে বলে গিয়েছে। তোমাকে বলে নাই?

দেবুর মনে পড়িয়া গেল। স্বর্ণ মাইনর পরীক্ষা দিবে। তাহার দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইবে। স্বর্ণকে একটু পড়াশুনা দেখাইয়া দিতে হইবে। স্বর্ণকেও যদি জীবনের পথ ধরাইয়া দিতে পারে, তবে সে-ও আমার পক্ষে একটা মহাধর্ম হইবে। বড় চমৎকার মেয়ে। গৌরেরই বোন তো! দেবু আশ্চর্য হইয়া যায়—কোথা হইতে কেমন করিয়া তাহারা এমনটি হইল?

তিনকড়ির বাড়িতে বেশ একটা জটলা বসিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি উপুড় হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে! ভল্লা বাগ্দীদের রামচরণ, তারিণী, বৃন্দাবন, গোবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন বসিয়া তামাক খাইতেছে। সকলেই চুপ করিয়া আছে। ইহাদের নিস্তব্ধতার একটা বিশেষ অর্থ আছে আস্ফালন, উচ্চহাসি—ইহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ! তিনকড়ির চারিত্রিক গঠনও অনেকটা ইহাদের মত। তিনকড়িকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের মজলিশ বসিলে, অন্তত সিকি মাইল দূর হইতে সমবেত অট্টহাসির শব্দ শোনা যায়। অথবা শোনা যায় বচসার উচ্চকণ্ঠের আস্ফালন। অথবা শোনা যায় ঈষৎ জড়িত কণ্ঠের সমবেত গান।

নিস্তব্ধ আসর দেখিয়া দেবু শঙ্কিত হইল। কি ব্যাপার তিনু-কাকা?

তিনকড়ি এতক্ষণে মুখ তুলিয়া দেবুকে লক্ষ্য করিল; বলিল—এস বাবা!

দেবু বলিল—এমন করে চুপচাপ কেন আজ?

রামভল্লা বলিল—মোড়ল-দাদার ভাল গাইটি আজ মরে গেল পণ্ডিত মশায়।

তিনকড়ি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুধু তাই নয় বাবা! হারামজাদা ছিদেম ঘোষপাড়াতে কাল রেতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পঞ্চাশ বার আমি বলেছিলাম—ওরে হারামজাদা ছিদেম, তোর বয়েস এখন কাঁচা, হাজার হলেও ছেলেমানুষ, যাস্‌নি। তা, শুনলে না!

—ঘোষপাড়ায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে? কই, ঘোষপাড়ায় ডাকাতি হয়েছে বলে কিছু শুনি নাই তো?

—এ ঘোষপাড়া নয়। মৌলিক-ঘোষপাড়া—মুরশিদাবাদের পাঁচহাটির ধারে। কেউ কেউ পাঁচহাটি-ঘোষপাড়াও বলে।

দেবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না! পাচহাটি সে নিজেই গিয়াছে। সপ্তাহে পাঁচদিন হাট বসে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত হাট। তরিতরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া চাল-দাল, মসলা-পত্র, এমন কি—গরু-মহিষ পর্যন্ত কেনা-বেচা হয়। মৌলিক-ঘোষপাড়াও সে একবার দেখিয়াছে, বনিয়াদী মৌলিক উপাধি-ধারী কায়স্থ জমিদারের বাস। প্রকাণ্ড বাড়ি! কায়দা-করণ কত! কিন্তু পাঁচহাটি যে এখান হইতে অন্ততঃ বারো ক্রোশ পথ—চব্বিশ মাইল। এখান হইতে সেখানে ডাকাতি করিতে গিয়াছে? ছিদাম ভল্লা? উনিশ-কুড়ি বছরের লিকলিকে সেই লম্বা ছোঁড়াটা।

সবিস্ময়ে দেবু বলিল—সে যে এখান থেকে বারো-চৌদ্দ ক্রোশ পথ!

অত্যন্ত সহজভাবে রাম বলিল—হ্যাঁ, তা' হবে বৈকি!

—এত দূর ডাকাতি করতে গিয়েছে? ছিদ্‌মে? সেই ছোঁড়াটা? কাল বিকেল বেলাতেও যে আমি তাকে দেখেছি। আমার সঙ্গে পথে দেখা হল।

—হ্যাঁ। সন্ধ্যের সময় বেরিয়েছে।

তিনকড়ি বলিল—হারামজাদা ধরা পড়ল,—এরপর গোটা গাঁ নিয়ে টানাটানি করবে। আমাকেও বাদ দেবে না, বাবা-দেবু।···সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

দেবু চমকাইয়া উঠিল। তিনকড়ির মত লোকের মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকার অর্থ এতক্ষণে তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে সংযত হইয়া বলিল—করে, তার উপায় নাই? সে অবশ্যই সহ্য করতে হবে। কিন্তু তাতেই বা ভয় কি? আদালত তো আছে। মিথ্যাকে সত্যি বলে চালাতে গেলে সে চলে না।

তিনকড়ি একটু হাসিল।

রাম হাসিয়া বলিল—পণ্ডিত বাজে কথা বলে নাই তিনু-দাদা। তুমি

ভেবো না কিছু। পুলিস হুজ্জোৎ করবে—মেজেস্টারও হয়তো দায়রায় ঠেলবে। কিন্তু দায়রাতে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি দেখো।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার যেন শিহরিয়া উঠিল; নিকটেই কোথায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল কাহার মর্মান্তিক দুঃখে বুকফাটা কান্না। সকলেই চমকিয়া উঠিল।

তিনকড়ি বলিল—কে রে রাম! কে কাঁদছে?

রামের চাঞ্চল্য ইহারই মধ্যে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে; সে বলিল—রতনের বেটাটা গেল বোধ হয়।

তারিণী বলিল—হ্যাঁ। তাই লাগছে!

হঠাৎ তিনকড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ আক্রোশে বলিয়া উঠিল—মানুষে মানুষ খুন করলে ফাঁসি হয়, কিন্তু রোগকে ধরে ফাঁসি দিক—দেখি! আয় রাম, দেখি। যা হবার সে তো হবেই—তার লেগে ভেবে কি করব?

সে হন্-হন্ করিয়া সকলের আগেই চলিয়া গেল। দেবু একটু বিস্মিত হইল। তিনু-কাকার এমন বিচলিত অবস্থা সে কখনো দেখে নাই! সকলে চলিয়া গেলে—সে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতেছিল, রতনের বাড়ি যাইবে কি না? গেলে, যে কাজের জন্য সে আসিয়াছে—সে কাজ আজ আর হইবে না। এদিকে স্বর্ণের পরীক্ষার জন্য অনুমতির আবেদন পাঠাইবার দিনও আর বেশী নাই। রতনের বাড়ি গিয়াই বা কি হইবে? কি করিবে সে? শুধু পুত্র-শোকাতুর মা-বাপের বুকফাটা আর্তনাদ শোনা, তাহাদের মর্মান্তিক আক্ষেপ চোখে দেখা ছাড়া আর কি-বাই করিতে পারে। নাঃ, আর সে দুঃখ দেখিতে পারিবে না। দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সে এখানে আসিবার পথে আনন্দ-আস্বাদনের প্রত্যাশা লইয়াই আসিয়াছিল। পরে সে অনেক কল্পনা করিয়াছে। বুদ্ধি-দীপ্তিমতী স্বর্ণকে সে কঠিন প্রশ্ন করিবে, স্বর্ণ প্রথম শূন্যদৃষ্টিতে ভাবিতে থাকিবে। হঠাৎ তার চোখ দুটি চেতনার চাঞ্চল্যে দীপশিখার মত জ্বলিয়া উঠিবে, মুখে স্মিত হাসি ফুটিবে, ব্যগ্র হইয়া বলিয়া দিবে সে প্রশ্নের উত্তর। আরও কঠিনতর প্রশ্ন করিবে সে—স্বর্ণ সে প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া পাইবে না। তখন তাহার স্তিমিত চোখের প্রদীপে জানার আলোক-শিক্ষা সে জ্বালাইয়া দিবে। বলিবে—শোন, উত্তর শোন। সে উত্তর বলিয়া যাইবে, স্বর্ণের চোখে দীপ্তি ফুটিবে; আর বুদ্ধিমতী মেয়েটির মুখে ফুটিয়া উঠিবে পরিতৃপ্ত কৌতূহলের তৃপ্তি ও শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়। গৌরও হয়তো স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিবে। গৌরের বুদ্ধি ধারালো নয়, কিন্তু অফুরন্ত তাহার প্রাণশক্তি। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রাণশক্তির স্ফুরণের স্পর্শ

সে পাইবে। সাহায্য-সমিতির জন্য হয় তো ইহারই মধ্যে সে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া বসিয়া আছে। পড়াশুনার অবসরের মধ্যে মৃদু কণ্ঠে বলিবে—দেবু-দা একটা বলছিলাম কি—।

কল্পনার মধ্যে সে যেন মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিল। দুঃখ হইতে মুক্তি, হতাশা হইতে মুক্তি—দুর্যোগময়ী অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির অবসান-ক্ষণে পূর্বাকাশের ললাট-রেখার প্রান্তে এ যেন শুকতারার উদয়-আশ্বাস। দুঃখ আর সে সহ্য করিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার ঘর! ঘরের কথা মনে করিলে তাহার হাসি পায়। বিলু-খোকনের সঙ্গেই তাহার ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। যেটা আছে, সেইটাতে এবং গাছতলাতে কোন প্রভেদ নাই। পৃথিবীর পথের ধারে গাছতলার অভাব নাই, এটা ছাড়িয়া আর-একটার আশ্রয়ে যাইতে বা ক্ষতি কি? কিন্তু এই কাজগুলা যেন তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। নেশাখোর যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াও নেশা ছাড়িতে পারে না—নেশার সময় আসিলেই যেমন নেশা করিয়া বসে, সেও তেমনি মনে করে—এই কাজটা শেষ করিয়া আর সে এ সবের মধ্যে থাকিবে না; এই শেষ। কিন্তু কাজটা শেষ হইতে না-হইতে আবার একটা নূতন কাজের মধ্যে আসিয়া মাথা গলাইয়া বসে।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে ভাগ্যবানের চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে—বর্ষার দিগন্তের বিদ্যুৎ, আলোর আভাস আসে, গর্জনের শব্দ আসিয়া পৌঁছায় না—ভাগ্যবান্ অন্ধকারের মধ্যেও নিশ্চিন্ত পথ দেখিয়া চলে। কিন্তু ভাগ্যহীনের হাতের আলো নিভিয়া যায়; তাহার ভাগ্যফলের দিগন্তের বিদ্যুতাভার পরিবর্তে আসে ঝড়ো হাওয়া। দেবু যে আনন্দের প্রদীপখানি মনে মনে জ্বালিয়াছিল—সে আলো তিনকড়িদের দুশ্চিন্তার দীর্ঘনিশ্বাস এবং সন্তান-বিয়োগে রতন বাগ্দীর বুকফাটা আর্তনাদের ঝড়ো হাওয়ায় নিমেষে নিভিয়া গেল।

দাওয়ায় উঠিয়া সে দেখিল—সামনের ঘরে যেখানে গৌর ও স্বর্ণ বসিয়া পড়ে, সেখানে কেহই নাই। শুধু একখানা মাদুর পাতা রহিয়াছে, পিলসুজে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। সে ডাকিল—গৌর!

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সে ডাকিল—গৌর রয়েছে? গৌর।

এবার ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল স্বর্ণ।

দেবু বলিল—স্বর্ণ!

স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না।

দেবু বলিল—গৌর কই? তোমার পরীক্ষার দরখাস্ত লেখবার কথা বলে এসেছিল সে, তোমার কি কি পড়া দেখিয়ে দেবার আছে বলেছিল।

স্বর্ণ এবারও কোন কথা বলিল না। প্রদীপটা স্বর্ণের পিছনে জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে অবয়বে ঘনায়িত ছায়া পড়িয়াছে; তবুও দেবুর মনে হইল—স্বর্ণের চোখ দিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। সে সবিস্ময়ে একটু আগাইয়া গেল, বলিল—স্বর্ণ!

চাপা কান্নার মধ্যে মৃদুস্বরে স্বর্ণ এবার বলিব—কি হবে দেবু-দা?

—কিসের স্বর্ণ? কি হয়েছে?

—বাবা—

—কি স্বর্ণ? বাবার কি? বলিতেই তাহার মনে পড়িল তিনকড়ির কথা। তিনকড়ি তাহাকে বলিতেছিল—"ঘোষগাঁয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে ছিদাম ধরা পড়েছে। হারামজাদা ধরা পড়ল, এর পর গোটা গাঁ নিয়ে টানা-টানি করবে! আমাকেও বাদ দেবে না বাবা।" দেবু বুঝিল, আলোচনাটা বাড়ির ভিতর পর্যন্ত পৌঁছিয়া মেয়েদের মনেও একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে।

অভয়ের সহিত সান্ত্বনা দিয়া সে বলিল—ছিদামের কথা বলছ তো? তা—তার জন্যে ভয় কি? মিছি-মিছি তিনু-কাকাকে জড়ালেই তো জড়ানো যাবে না। ভগবান্ আছেন। এখনও দিন রাত্রি হচ্ছে। সত্য মিথ্যা—কখনও ঢাকা থাকবে না। এ চাকলার লোক সাক্ষী দেবে—তিনু-কাকা সে রকম লোক নয়! এর আগেও তো পুলিস—দু-দু-বার বি-এল কেস করেছিল—কিন্তু কিছুই তো করতে পারেনি। চাকলার লোকের সাক্ষ্য জজসাহেব কখনও অমান্য করতে পারেন না।

স্বর্ণের কান্না বাড়িয়া গেল, বলিল—কিন্তু এবার যে বাবা সত্যি সত্যি ওদের দলে মিশেছে।

—এঁ্যা, বল কি!···দেবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

স্বর্ণ বলিল—কেউ আমরা জানতাম না, দেবু-দা! আজ সন্ধ্যের সময় রাম-কাকারা এসে চুপি চুপি বাবাকে বললে—সর্বনাশ হয়েছে মোড়ল-দাদা, ছিদমে ধরা পড়েছে। আমরা মনে করলাম, তাড়া খেয়ে ছোঁড়া কোনদিকে ছট্‌কে পড়েছে, কিন্তু না—হারামজাদা ধরাই পড়েছে।···বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে বললে—রামা, তোরাই আমাকে মজালি। তোরাই আমাকে এবার এ পাপ করালি।

দেবু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে, সে নির্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—কাল বিকেল বেলা বাবা বললে—আমি কাজে যাচ্ছি —ফিরব কাল সকালে; তার আগে যদি ফিরি তো অনেক শেষ রাত্তির হবে। পুলিসে যদি ডাকে তো বলে দিস—অসুখ করেছে, ঘুমিয়ে আছে।··· পুলিসে ডাকে নাই, কিন্তু বাবা ফিরল শেষরাত্রে। হাঁপাচ্ছিল। মদ খেয়েছিল। তা—বাবা তো মদ খায়। আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। আজ সন্ধ্যেবেলায় রাম-কাকারা যখন এল—

স্বর্ণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শেষ—সব শেষ! চৌধুরী ঠাকুর বিক্রয় করিয়াছে, তিনু-কাকা শেষে ডাকাতের দলে ভিড়িয়াছে!

কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া স্বর্ণ বলিল—এরা সব যখন ডাকাতির কথা বলছিল, দাদা তখন ঘরে বসেছিল—বাবা জানতো না। আমি ঘরে এলাম—দাদা ইশারা করে আমাকে চুপ করে থাকতে বললে। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম!

আবার একটা আবেগের উচ্ছ্বাস স্বর্ণের কণ্ঠে প্রবল হইয়া উঠিল, বলিল—দাদা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে দেবু-দা!

দেবু চমকিয়া উঠিল। বলিল—চলে গিয়েছে! কেন?

—হ্যাঁ। রাগে, দুঃখে, অভিমানে। যাবার সময় বললে—স্বর্ণ, বাবা খোঁজ করে তো বলিস, আমি বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। এ বাড়িতে আমি আর থাকব না।

চব্বিশ

তিনকড়ি নিজেই একদিন অকপটে দেবুর কাছে সব খুলিয়া বলিল। ঘর খানাতল্লাশ করিয়া কিছু মিলিল না। কিন্তু ছিদাম জীবনে প্রথম ডাকাতি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া পুলিসের কাছে আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, সে কবুল করিয়াছে। তাহার উপর মৌলিক-ঘোষপাড়ার যে গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ির দুজনে তিনকড়ি, রাম এবং তারিণীকে দেখিবামাত্র চিনিয়া ফেলিল। পুলিসের প্রশ্নের সম্মুখে—স্বর্ণও, যাহা শুনিয়াছিল, বলিয়া ফেলিল। তিনকড়ি পাথরের মূর্তির মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে, মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর বিচার-কালে—তিনকড়ি তখন হাজতে—দেবু একজন উকীল

লইয়া তিনকড়ির সঙ্গে যেদিন দেখা করিল, সেইদিন তিনকড়ি অকপটে দেবুর কাছে সব খুলিয়া বলিল।

সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও দেবুকে তিনকড়ি মামলার তদ্বির করিতে হইল। নিজের মনের সঙ্গে এই লইয়া যুদ্ধ করিয়া সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তিনু-কাকা ডাকাতের দলে মিশিয়া ডাকাতি করিয়াছে—পাপ সে করিয়াছে—তাহার পক্ষে থাকিয়া মকদ্দমার তদ্বির করা কোনমতেই উচিত নয়। কিন্তু অন্যদিকে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে কোনমতেই নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিতে পারিতেছে না। শুধু মমতার কথাই নয়, আজ যদি তিনকড়ির মেয়াদ হইয়া যায়, তবে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মাকে লইয়া তাহাকে আবার বিপদে পড়িতে হইবে। ত্রিসংসারের মধ্যে তাহাদের অভিভাবক কেহ নাই। গৌর সেইদিন সন্ধ্যায় যে কোথায় পলাইয়াছে—তাহার আর কোন উদ্দেশ নাই! জীবনে এমন জটিল অবস্থার মধ্যে সে কখনও পড়ে নাই।

প্রতিদিন রাত্রে একাকী বসিয়া শত চিন্তার মধ্যে তাহার মনে হয়—ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়। এখান হইতে চলিয়া গেলেই তাহার মুক্তি—সে জানে; কিন্তু তাহাও সে পারিতেছে না। সে ইতিমধ্যে স্বর্ণদের সংস্রব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিল; তিনদিন সে স্বর্ণদের বাড়ি গেল না। চতুর্থ দিনে মা এবং একজন ভল্লার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া স্বর্ণ ম্লানমুখে তাহার বাড়ির উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—দেবু-দা!

দেবু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, মনে মনে অপরাধের গ্লানি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে বাহিরে আসিয়া বলিল—স্বর্ণ! খুড়ীমা! আসুন—আসুন! ওরে দুর্গা ওরে কোথা গেলি সব। এই যে এই মাদুরখানায় বসুন!... বাহিরের তক্তাপোশের মাদুরখানা তাড়াতাড়ি টানিয়া আনিয়াই সে মেঝেতে পাতিয়া দিল।

স্বর্ণের মা পূর্বে দেবুর সঙ্গে কথা বলিত না। এখন কথা বলে ঘোমটার ভিতর হইতে। সে বলিল—থাক বাবা, থাক্।

স্বর্ণ দেবুর পাতা মাদুরখানা তুলিয়া ফেলিল!

দেবু বলিল—ও কি, তুলে ফেলছ কেন?

স্বর্ণ একটু হাসিয়া বলিল—উল্টো করে পেতেছেন। উল্টো মাদুরে বসতে নেই।...বলিয়া সে মাদুরখানা সোজা করিয়া পাতিতে লাগিল।

—ও! অপ্রতিভ হইয়া দেবু বলিল—আপনারা কষ্ট করে এলেন কেন বলুন তো? আমি তিন দিন যেতে পারিনি বটে। শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। আজই যেতাম।

স্বর্ণ বলিল—একটা কথা, দেবু-দা।

—কি, বল।

—দাদার জন্যে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না? কাল একটা পুরনো কাগজে দেখছিলাম একজনরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—'ফিরে এসো' বলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথাটা দেবুর মনেই হয় নাই। সে বলিল—হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছ। তাই দিয়ে দেখি। আজই লিখে বরং ডাকে পাঠিয়ে দোব।

স্বর্ণ আপনার আঁচলের খুঁট খুলিয়া দুইটি টাকা দাওয়ার উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—কত লাগবে, তা তো জানি না। দু' টাকায় হবে কি?

—টাকা তোমার কাছে রাখ। আমি সে ব্যবস্থা করব'খন।

ঘোমটার ভিতর হইতে স্বর্ণের মা বলিল—টাকা দুটি তুমি রাখ বাবা। তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ। মাঝে মাঝে টাকাও খরচ করছ জানি। এ দুটি আমি গৌরের নাম করে নিয়ে এসেছি।

দেবু টাকা দুটি তুলিয়া লইল। স্বর্ণের মায়ের কথা মিথ্যা নয়। তবে যে-কথা দেবু নিজে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে নাই! কেবল স্বর্ণের পরীক্ষার ফিয়ের কথাটাই তাহারা জানে। পরীক্ষা দেওয়া সংকল্প আজও স্বর্ণ অটুট রাখিয়াছে, মেয়েটির অদ্ভুত জেদ। সে তাহাকে বলিয়াছিল—দেবু-দা, বাবার তো এই অবস্থা! দাদা চলে গিয়েছে। যেটুকু জমি আছে, তাও থাকবে না। এর পর আমাদের কি অবস্থা হবে? শেষে লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করে খেতে হবে?

দেবু চুপ করিয়াই ছিল। এ কথার উত্তরই বা কি দিবে সে?

স্বর্ণ আবার বলিয়াছিল—সেদিন জংশনে গিয়েছিলাম, বালিকা-বিদ্যালয়ের দিদিমণির সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে বললেন—মাইনর পাস কর তুমি, তোমাকে আমাদের ইস্কুলে নেব। ছোট মেয়েদের পড়াবে তুমি। দশ টাকায় ভর্তি হতে হবে। তারপর বাড়িয়ে দেবেন।

দেবু নিজেও অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে। এ ছাড়া স্বর্ণের জন্য কোন পথ সে দেখিতে পায় নাই। আগেকার কালে অবশ্য এ পথের কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। বিধবার চিরাচরিত পথ—বাপ-মা অথবা ভাইয়ের সংসারে থাকা। কেহ না থাকিলে, অন্যের বাড়িতে চাকরি করা। যাহারা শূদ্র, বামুন-বাড়িতে ঝিয়ের কাজ, অথবা অবস্থাপন্ন স্বজাতীয়ের বাড়িতে পাচিকার কাজই ছিল দ্বিতীয় উপায়। আর এক উপায়—শেষ উপায়—সে উপায়ের কথা ভাবিতেও দেবু শিহরিয়া উঠে। মনে পড়ে শ্রীহরিকে, মনে পড়ে পদ্মকে।

সে মনে মনে বারবার স্বর্ণকে ধন্যবাদ দিয়াছে, সে যে এরূপ সাধু-সংকল্প করিতে পারিয়াছে, এজন্যও তাহাকে অনেক প্রশংসা করিয়াছে। ভাবিয়া আশ্চর্যও হইয়াছে,—মেয়েটি আবেষ্টনীর প্রভাব কাটাইয়া এমন সংকল্পের প্রেরণা কেমন করিয়া পাইল ?

প্রাচীন লোকে বলে—কাল-মাহাত্ম্য ! কলিকাল।

চণ্ডীমণ্ডপে, লোকের বাড়িতে, স্নানের ঘাটে এই কথা লইয়া ইহারই মধ্যে অনেক সবিদ্রূপ আলোচনা চলিতেছে।

দেবুকেও অনেকে বলিয়াছে—পণ্ডিত, এ কাজ ভাল হচ্ছে না। এর ফল পরে বুঝবে।...অনেক কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছে ইহার ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে।

—মেয়েতে বিবি সেজে জংশনে চাকরি করতে যাবে কি হে ? তখন তো সে যা মন চাইবে—তাই করবে।

দেবু যে কথা মানে না, এমন নয়। জংশনের বালিকা-বিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষয়িত্রী এখান হইতে ভীষণ দুর্নাম লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সদরের হাসপাতালের একজন লেডি-ডাক্তারকে লইয়া একজন হোমরা-চোমরা মোক্তার বাবুর কলঙ্কের কথা জেলায় জানিতে কাহারও বাকি নাই। কিন্তু পরের ঘরে ঝিয়ের কাজ করিলেও তো সে অপযশ, সে পাপের সম্ভাবনা হইতে পরিত্রাণ নাই ! জংশনের কলেও তো কত মেয়েছেলে কাজ করিতে যায়। সেখানে কি তাহারা নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে ? কিন্তু এসব যেন লোকের সহিয়া গিয়াছে। দেবুর মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ ছাড়াও স্বর্ণের উপর তাহার বিশ্বাস আছে, শিক্ষার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আছে। স্বর্ণ লেখাপড়া শিখিলে তাহার জীবন উজ্জ্বলতর হইবে তাহার দৃঢ় ধারণা।

তিনকড়িকেও সে স্বর্ণের সংকল্পের কথা বলিল—তিনকড়িও বলিল—ওর আর কথা নাই বাবা। তুমি তাই করে দাও। স্বন্নের জন্যে নিশ্চিন্ত হলে আর আমার কোন ভাবনাই রইল না। কালাপানি কি ফাঁসি হলেও আমি হাসতে হাসতে যেতে পারব।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। স্বর্ণের কথা-প্রসঙ্গে তিনকড়ি নিজের অপরাধের কথাটা তুলিতেই সে মনে অশান্তি অনুভব করিল।

তিনকড়ি মনের আবেগে অকপটে সব খুলিয়া বলিল।

বলিল—দেবু, এ আমার কপালের ফের বই কি ? চিরকালটা রামাদের এই পাপের জন্যে গাল দিয়েছি, মেরেছি, দু-মাস তিন মাস ওদের মুখ পর্যন্ত দেখিনি। বাবা, জীবনের মধ্যে পরের পুকুরের দুটো একটা মাছ ছাড়া—

পরের একটা কুটোগাছটা কখনও নিইনি। সেই আমার কপালের দুর্মতি দেখ! আমার অদেষ্ট আমাকে যেন ঘাড়ে ধরে এ পথে নিয়ে এলো। বানে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেল। দেবু, তোমাদিকে লুকিয়ে প্রথম-প্রথম থালা-কাঁসা বেচলাম, তারপর—অন্ধকার হল চারিদিক্। ভাবলাম তোমাদের সাহায্য-সমিতিতে যাই। কিন্তু লজ্জা হল। বীজ-ধান নিয়ে এলাম প্রথম, তাও অর্ধেকের উপর খেয়েই ফেললাম। তখন রামা একদিন এল। বললে—মোড়ল-দাদা, আমাদিগকে তুমি কিছু বলতে পাবে না! আমরা তোমার ওই সমিতির ভিক্ষে নিয়ে বেঁচে থাকতে লারব। বাগ্দী—লাঠিয়াল, আমরা ডাকাত, চিরকাল জোর করে খেয়েছি—আজ ভিক্ষে নিতে পারব না। ও মাগা চালের ভাত গলা দিয়ে নামছে না। আমাদের যা হয় হবে। তুমি আমাদের পানে চোখ বুঁজে থেকো। আমরা আমাদের উপায় করে নোব।… আমি বলেছিলাম—আমি ভিক্ষা নিতে পারলে তোরা পারবি না কেন? রামা বলেছিল—তোমাকেও ও ভাত খেতে দোব না। ভিখ্ মাঙ্তে দোব না তোমায়। তুমি মোড়ল—তুমি তোমার বাপ-পিতেমো চিরকাল মাথা উঁচু করে রয়েছ—পাঁচজনাকে খাইয়েছ, ভিক্ষে লিতে সরম লাগে না তোমার? বরং যার বেশি আছে, তার কেড়ে লিই—এস…তবু আমি বলেছিলাম পাপ! এ পাপ করতে নাই।…রামা বললে—আমরা কালীমায়ের আজ্ঞা নিয়ে যাই মোড়ল, পাপ হলে, মা আজ্ঞে দিবে কেন? বেশ, তুমি মায়ের মাথায় ফুল চড়াও, ফুল যদি পড়ে—তবে বুঝবে মায়ের আজ্ঞে তাই। আর না-পড়ে—তুমি যাবে না।…তা শ্মশানে কালীপূজো হল সেদিন রাত্রে। ফুল চড়ালাম মাথায়; ফুল পড়ল।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তারপর হাসিয়া বলিল—আমার কপালে এই ছিল বাবা। আমিই বা কি করব? তুমি উকিল দিলে—বেশ করলে। আর এ সব নিয়ে নিজেকে জড়িও না। এরপর পুলিস তোমাকে নিয়ে হাঙ্গামা করবে। তুমি বরং স্বন্নমায়ের একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিয়ো। তা হলেই আমি নিশ্চিন্তি! বল, আমাকে কথা দাও, স্বন্নের ব্যবস্থা করবে তুমি?

দেবুকে সমর্থন করিয়াছে—কেবল জগন ডাক্তার। ডাক্তার দোষেগুণে সত্যই বেশ লোক! যেটা তাহার ভাল লাগে, সেটা সে অকপটে সমর্থন করে। যেটা মন্দ মনে হয়—সেটার গতিরোধ করিতে পারুক আর নাই পারুক—আকাশ ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া বলে—না। না। এ অন্যায়—এ হতে পারে না।

আর সমর্থন করিয়াছে অনিরুদ্ধ।

মাস দেড়েক হইয়া গেল—অনিরুদ্ধ এখনও রহিয়াছে। চাকরির কথা বলিলে সে বলে—আমার চাকরির ভাবনা! হাতুড়ি পিটব আর পয়সা কামাব। পয়সা সব ফুরিয়ে যাক—আবার চলে যাব। কেয়া পরোয়া? মাগ-না-ছেলে, ঢেঁকি না-কুলো—শালা বোঝার মধ্যে শুধু একটা স্যুটকেস। হাতে ঝুলিয়ে নোব আর চলব মজেসে!

সে এখন আড্ডা গাড়িয়াছে দুর্গার ঘরে। দুর্গার ঘরে ঠিক নয়—থাকে সে পাতুর ঘরে। ওইখানেই তার আড্ডা। দেবু বঝিতে পারে—অনিরুদ্ধ দুর্গাকে চায়। কিন্তু দুর্গা অদ্ভুত রকমে পাল্টাইয়া গিয়াছে; ওধার দিয়াও ঘেঁষে না; দেবুর ঘরে কাজ-কর্ম করে, দুইটা খায়, রাত্রে গিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া শোয়। প্রথম প্রথম শ্রীহরির রটনায় দেবুকে জড়াইয়া যে অপবাদটা উঠিয়াছিল—সেটা ওই দুর্গার আচরণের জন্যই আপনি মরিয়া গিয়াছে সকালের আকাশে অকালের মেঘের মত। তাহার উপর বন্যায় পড়ে দেবু যখন সাহায্য-সমিতি গঠন করিয়া বসিল, দেশ-বিদেশ হইতে দেবুর নামে টাকা আসিল, দেবুকে কেন্দ্র করিয়া পাঁচখানা গ্রামের বালক-সম্প্রদায় আসিয়া জুটিল—চাষীর ছেলে গৌর হইতে আরম্ভ করিয়া জংশনের স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া দেবুর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিল এবং দেবুও যখন সকলকে সাহায্য দিল—ভিক্ষা দেওয়ার ভঙ্গিতে নয়—আত্মীয়-কুটুম্বের দুঃসময়ে তত্ত্ব-তল্লাশের মত করিয়া সাহায্য দিল, তখন লোকে তাহাকে পরম সমাদরের সঙ্গে মনে মনে গ্রহণ করিল; তাহার প্রতি অবিচারের ত্রুটি স্বীকার করিল। সমাজের বিধানে দেবু পতিত হইয়াই আছে। পাঁচখানা গ্রামের মণ্ডলদের লইয়া শ্রীহরি যে ঘোষণা করিয়াছে—তাহার প্রকাশ্য প্রতিবাদও কেহ করে নাই। কিন্তু সাধারণ জীবনে চলা-ফেরায়—মেলা-মেশায় দেবুর সঙ্গে প্রায় সকলেরই ঘনিষ্ঠতা বজায় আছে এবং সে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সবাই লক্ষ্য করে। দু-চারজনকে সে প্রশ্ন করিয়াছিল—দেবুর ওখানে যে এত যাওয়া-আসা কর—জান দেবু পতিত হয়ে আছে?

শ্রীহরি একদিন প্রশ্ন করিয়াছিল রামনারায়ণকে। সে তাহার তাঁবের লোক। অন্ততঃ শ্রীহরি তাই মনে করে। রামনারায়ণ ইউনিয়ন-বোর্ড-পরিচালিত প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। রামনারায়ণ শ্রীহরিকে খাতিরও করে; এক্ষেত্রে সে বেশ বিনয়ের সঙ্গেই উত্তর দিয়াছিল—তা যাই আসি—ভাই বন্ধুলোক, তার ওপর ধরুন সাহায্য-সমিতি থেকে এ দুর্দিনে সাহায্যও নিতে হয়েছে। দশখানা গাঁয়ের লোকজন আসে। যাই, বসি, কথাবার্তা শুনি! পতিত করেছেন

পঞ্চায়েত—দশখানা গাঁয়ের লোক যদি সেটা না মানে, তবে একা আমাকে বলে লাভ কি বলুন।

শ্রীহরি রাগ করিয়াছিল। দশখানা গাঁয়ের লোকের উপরই রাগ করিয়াছিল; কিন্তু সে রাগটা প্রথমেই পড়িয়াছিল—রামনারায়ণের উপর। ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর সে, কৌশল করিয়া অপর সভ্যদের প্রভাবান্বিত করিয়া রামনারায়ণের উপর এক নোটিশ দিয়াছিল। তোমার অনুপযুক্ততার জন্য তোমাকে এক মাসের নোটিশ দেওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেবু সে নোটিশের উত্তরে—ডিষ্ট্রীক্ট ইন্সপেক্টর অব্ স্কুল্‌স্-এর নিকট একখানা ও সার্কেল অফিসারের মারফত এস-ডি-ওর কাছে বহু লোকের সইযুক্ত একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া রামনারায়ণের উপযুক্ততা প্রমাণ করিয়া সে নোটিশ নাকচ করিয়া দিয়াছে।

তারা নাপিতকেও শ্রীহরি শাসন করিয়াছিল—তুই দেবুকে ক্ষৌরি করিস কেন বল্ তো?

ধূর্ত তারার আইন-জ্ঞান টন্‌-টনে; সে বলিয়াছিল—আজ্ঞে, আগের মতন ধান নিয়ে কামানো আজকাল উঠে গিয়েছে। ধরুন—যারা পতিত নয়—তাদের অনেকে—নিজে ক্ষুর কিনে কামায়, রেল জংশনে গিয়ে হিন্দুস্থানী নাপিতের কাছে কামিয়ে আসে; আমি পয়সা নিয়ে কত বাইরের লোককেও কামাই। পণ্ডিত পয়সা দেন—আমি কামিয়ে দি। আমার তো পেট চলা চাই। আপনি মস্ত লোক—যারা ক্ষুর কিনেছে, কি যারা অন্য নাপিতের কাছে কামায়, তাদের বারণ করুন দেখি; তখন একশো বার—ঘাড় হেঁট করে আমি হুকুম মানব; পতিতকে কামাবো না আমি।

শ্রীহরি ব্যাপারটা লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; কিন্তু সাক্ষাতে সে সমস্তই লক্ষ্য করিতেছে। তিনকড়ির মামলায় সে যথাসাধ্য পুলিস-কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতেছে। তিনকড়ি ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ায় সে মহাখুশী হইয়াছে,—সে কথা সে গোপনও করে না।

ঘটনাটা যখন সত্য, তখন পুলিসকে সাহায্য করায় দেবু শ্রীহরিকে দোষ দেয় নাই। কিন্তু আক্রোশবশে—শ্রীহরি তাহার ঝুনা গোমস্তা দাসজীর সাহায্যে মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে। দাসজী নিজে নাকি পুলিসকে বলিয়াছে যে, সে স্বচক্ষে তিনকড়ি ও রামভল্লাদের লাঠি হাতে ঘটনার রাত্রে—তিনটার সময় বাঁধের উপর দিয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছে। সে নিজে সেদিন জংশন রাত্রি দেড়টার ট্রেনে নামিয়া ফিরিবার পথে রাস্তা ভুল করিয়া দেখুড়িয়ার কাছে গিয়া পড়িয়াছিল।

এই কথা মনে করিয়া দেবুর মন শ্রীহরির উপর বিষাইয়া উঠে! ঘৃণাও হয়

যে—তিনকড়ির বিপদে শ্রীহরি হাসে, সে খুশী হইয়াছে। সে আরও জানে—অদূর ভবিষ্যতে তিনকড়ির জেল হইবার পর, শ্রীহরি আবার একবার পড়িবে স্বর্ণকে লইয়া। তাহার আভাসও সে পাইয়াছে। সে বলিয়াছে—জুতো পায়ে দিয়ে জংশনের ইস্কুলে মাস্টারি করবে বিধবা মেয়ে!···আচ্ছা, দেখি কেমন ক'রে করে! আমি তো মরি নাই এখনো!···

সন্ধ্যাবেলায় আপনার দাওয়ায় বসিয়া দেবু এই সব কথাই ভাবিতেছিল। আজ তাহার মজলিশে কেহ আসে নাই। দূরে ঢাক বাজিতেছে। আজ রাত্রে জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার বিসর্জন-উৎসব। কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে তিনখানি জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে। সে এক পূজার প্রতিযোগিতা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কে কত আগে খাওয়াইতে পারে এবং কাহার বাড়িতে কতগুলি মাছ-তরকারি, এই লইয়া প্রতিবারই পূজার পরও কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা চলে। বিসর্জন উপলক্ষে বাজী পোড়ানো লইয়া আর এক দফা প্রতিযোগিতা হয়।···সকলেই প্রায় বাজী পোড়ানো দেখিতে ছুটিয়াছে। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল পর্যন্ত গিয়াছে পাতুদের দলবল সহ। দুর্গাও গিয়াছে। শ্রীহরিও গিয়াছে সন্ধ্যার আগেই। শ্রীহরির বাহারের টাপর-চাপানো গাড়ীখানা দেবুর দাওয়ার সুমুখ দিয়াই গিয়াছে। গলায় ঘণ্টার মালা পরানো তেজী বলদ দুইটা হেলিয়া-দুলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর পাশে লালপাগড়ি বাঁধিয়া কালু শেখ এবং চৌকিদারী নীল উর্দি ও পাগড়ী আঁটিয়া ভূপাল বাগ্দীও গিয়াছে। সে জমিদার শ্রেণীর মানুষ এখন; তাহার বিশেষ নিমন্ত্রণ আছে।

গ্রামের মধ্যে আছে যাহারা, তাহারা বৃদ্ধ অক্ষম, অথবা রুগ্ন কিংবা সদ্য-শোকাতুর। শোকাতুর এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি মানুষ। বন্যার পর করাল ম্যালেরিয়া অঞ্চলটার প্রতিঘরেই একটা-না-একটা শেল হানিয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ লোক—ওই সদ্য-শোকার্তরা ছাড়া—সকলেই গিয়াছে। ভাসান দেখিতে আলো-বাজনা-বাজী পোড়ানোর আনন্দে মাটিতে এই পথে দেবুর চোখের উপর দিয়া সব গিয়াছে। তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন বুকে হাঁটিয়া মরীচিকার দিকে ছুটিয়া যায় জলের জন্য—তেমনি ভাবেই মানুষগুলি ছুটিয়া গেল—ক্ষণিকের মিথ্যা আনন্দের জন্য। কিছুক্ষণ আগে একা একটি লোক গেল—মাথায় কাপড় ঢাকিয়া, দেবু তাহাকেও চিনিয়াছে। সে ও-পাড়ার হরিহর—পরশু তাহার একটা ছেলে মারা গিয়াছে। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। উহাদের কথায় মনে পড়িল নিজের কথা—বিলুকে, খোকাকে। সেই-বা বিলুকে খোকাকে কতক্ষণ মনে করে?···তাহার মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল।···কতক্ষণ? দিনান্তে একবার স্মরণও করে না। হিসাব করিয়া

দেখিলে—মাসান্তে একদিন একবার হইবে কি না সন্দেহ! কেবল কাজ-কাজ-পরের কাজের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ভূতের ব্যাগার খাটিয়া চলিয়াছে সে। এ বোঝা কবে নামিবে কে জানে?—

তবে এইবার হয়তো নামিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

সাহায্য-সমিতির টাকা ও চাউল ফুরাইয়া আসিয়াছে। অন্য দিকেও সাহায্য-সমিতির প্রয়োজনও কমিয়া আসিল। আশ্বিন চলিয়া গিয়াছে—কার্তিকও শেষ হইয়া আসিল। এখানে-ওখানে দুই চারিটা আউস ইতিমধ্যেই চাষীরা ঘরে আসিয়াছে। 'ভাষা' ধানও কাটিয়াছে। অগ্রহায়ণের প্রথমেই 'নবীনা' ধান উঠিবে, তাহার পর ধান কাটিবে 'আমন'! পঞ্চগ্রামের মাঠেই এ অঞ্চলের মধ্যে প্রধান মাঠ—সেই মাঠে অবশ্য এবার কিছুই নাই। কিন্তু প্রতি গ্রামেরই অন্যদিকেও কিছু কিছু জমি আছে। সেই সব মাঠ হইতে ধান কিছু কিছু আসিবে। অন্ন অভাবটা ঘুচিবে। দু-মাসের মধ্যে ম্যালেরিয়া অনেকখানি সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাঁদের তেজ কমিয়াছে—আর সে মড়কের ভয়াবহতা নাই। ছেলে অনেক গিয়াছে; বয়স্ক মরিয়াছেও কম নয়। গরু-মহিষ প্রায় অর্ধেক উজাড় হইয়াছে। সেই অর্ধেক গরু-মহিষ লইয়াই লোক আবার চাষের কাজে নামিয়াছে। রামের একটা শ্যামের একটা লইয়া—রাম-শ্যাম দুজনে 'গাঁতো' করিয়া কিছু কিছু রবিফসল চাষের উদ্যোগ করিতেছে।

দেবু দেখে আর ভাবে—আশ্চর্য মানুষ! আশ্চর্য সহিষ্ণুতা। আশ্চর্য তাহার বাঁচিবার—ঘরকন্না করিবার সাধ-আকাঙ্ক্ষা! এই মহাবিপর্যয়—বন্যারাক্ষসীর কর্‌করে জিভের লেহন-চিহ্ন সর্বাঙ্গে অঙ্কিত; এই অভাব, এই রোগ, ওই মড়কের মধ্যে ঘরের ভাঙন, জমির বালি, ক্ষেতের গর্ত—সমস্তই মানুষ এক লহমায় মুছিয়া ফেলিল! কালই সে পঞ্চগ্রামের মাঠ দেখিয়া আসিয়াছে। দেখুড়িয়ায় গিয়াছিল—স্বর্ণদের তল্লাশ করিতে। পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্যে দিয়া আলপথের দুই ধারের জমিগুলিতে কিছু-কিছু চাষ হইয়াছে। এখন ছোলা মশুর, গম, যব, সরিষার বীজ সংগ্রহ করার দায়টাই সাহায্য-সমিতির শেষ দায়। এই কাজটা করিয়া ফেলিতে পারিলেই—সাহায্য-সমিতি সে বন্ধ করিয়া দিবে।

সাহায্য-সমিতির দায়ের বোঝা এইবার ঘাড় হইতে নামিবে।

আর এক বোঝা—তিনকড়ির সংসারের বোঝা। এই নূতন দায়টি লইয়াই তাহার চিন্তার অন্ত নাই। তিনকড়ির মামলার শেষ হইতে আর দেরী নাই শোনা যাইতেছে—শীঘ্রই—বোধহয় একমাসের মধ্যে দায়রায় উঠিবে।

দায়রার বিচারে তিনকড়ির সাজা অনিবার্য। তারপর স্বর্ণ ও তিনকড়ির স্ত্রীকে লইয়া সমস্যা বাধিবে। এ দায়—সত্যকার দায়, মহাদায়। শ্রীহরির শাসন-বাক্য সে শুনিয়াছে। কাহারও শাসন-বাক্যকে সে আর ভয় করে না। শাসন-বাক্য শুনিলেই তাহার মনের আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠে। তারা নাপিতের কাছে কথাটা শুনিয়া সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল—তিনকড়ির জেল হইলে সে স্বর্ণ এবং তাহার মাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখিবে। স্বর্ণ যে রকম পরিশ্রম করিতেছে এবং যে রকম তাহার ধারালো বুদ্ধি, তাহাতে সে এম-ই পরীক্ষায় পাস করিবেই। জংশনের ইস্কুলে সে নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার চাকরি করিয়া দিবে, এবং স্বর্ণ যাহাতে ম্যাট্রিক পাস করিতে পারে, তাহাও সে করিবে। শ্রীহরি বলিয়াছে—জুতা পায়ে দিয়া বিধবা মেয়ে চাকরি করিলে, সে সহ্য করিবে না। তবুও স্বর্ণকে সে রীতিমত আজকালকার শিক্ষিত মেয়ের মত সাজপোশাক পরাইবে। সাদা থান কাপড়ের পরিবর্তে সে তাহাকে রঙিন শাড়ি কাপড় পরিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। বিধবা! কিসের বিধবা স্বর্ণ? পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ—সাত বৎসর বয়সে বিধবা! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সব বিধবা বিবাহের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। আইন পর্যন্ত পাস হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা তাহার মনে পড়িল—

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে!...হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারে না।"...স্বর্ণের একটা ভালো বিবাহ দিয়া তাহাদের লইয়াই সে আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিবে।

এ সব তাহার উত্তেজিত মনের কথা। স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় স্বর্ণদের চিন্তাই এখন তাহার বড় চিন্তা হইয়াছে। অভিভাবকহীন স্ত্রীলোক দুটিকে লইয়া কি ব্যবস্থা সে যে করিবে—স্থির করিতে পারিতেছে না। গৌর থাকিলে সে নিশ্চিন্ত হইত। লজ্জায়-দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গেল—তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া ভাবিয়া উঠিল। উপায় সে পাইয়াছে।

দূরে দুম্-দাম ফট্-ফাট্ শব্দ উঠিতেছে। বোম-বাজি ফাটিতেছে। কদম গাছের ফুল ফাটিতেছে। ওই-যে আকাশের বুকে লাল-নীল রঙের ফুলঝুরি ঝরিতেছে, হাউই বাজি পুড়িতেছে।...

উপায় সে পাইয়াছে! সাহায্য-সমিতির দায় হইতে মুক্তি পাইলেই সে তাহার নিজের জমি-বাড়ি স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মাকে ভোগ করিতে দিয়া একদিন

রাত্রে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। স্বর্ণ এবং তাহার মায়ের বরং জংশনে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের কাছাকাছি কোথাও থাকিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবে। স্বর্ণ ইস্কুলে চাকরি করিবে, তাহার জমিগুলি সতীশ বাউড়ীর হাতে চাষের ভার দিবে; সে ধান তুলিয়া স্বর্ণদের দিয়া আসিবে। তারপর—গৌর কি কোনদিনই ফিরিবে না? ফিরিলে সে-ই এই সব ভার লইবে।

এই পথ ছাড়া মুক্তির উপায় নাই। হ্যাঁ, তাই সে করিবে। সংসার হইতে—বন্ধন হইতেই মুক্তিই সে চায়! প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আর সে পারিবে না। আর সে পরের বোঝা হইয়া ভূতের ব্যাগার খাটিতে পারিতেছে না। তাহার বিলু—তাহার খোকাকে মনে করিবার অবসর হয় না, রাজ্যের লোকের সঙ্গে বিরোধ মনান্তর করিয়া দিন কাটানো, কলঙ্ক-অপবাদ অঙ্গের ভূষণ করিয়া লওয়া—এ সব আর তাহার সহ্য হইতেছে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অতল শান্তির মধ্যে—নিরুদ্বেগ আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইতে চায় সে। সে তাহার বৈচিত্র্যময় ব্যথাতুর অতীতকে পিছনে ফেলিয়া সে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পড়িবে! প্রাণ ভরিয়া সে খোকনকে-বিলুকে স্মরণ করিবে—ভগবান্‌কে ডাকিবে—তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবে। যাইবার আগে সে অন্ততঃ একটা কাজ করিবে—খোকন এবং বিলুর চিতাটি সে পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দিবে। আর শ্মশান-ঘাটে একখানি ছোট টিনের চালা-ঘর করিয়া দিবে। জলে, ঝড়ে, শিলাবৃষ্টিতে, বৈশাখের রৌদ্রে শ্মশান-বন্ধুদের বড় কষ্ট হয়। একখানি মার্বেল ট্যাবলেটে লিখিয়া দিবে "বিলু ও খোকনের স্মৃতি-চিহ্ন।"

খোকন ও বিলু! আজ এই নির্জন অবসরে তাহারা যেন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে মনের মধ্যে। খোকন ও বিলু। সামনের ওই শিউলি গাছটার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—মনে হইতেছে বিলুই যেন দাঁড়াইয়া আছে, পদ্মের মত আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহার খোকন ও বিলু!

দেবু চমকিয়া উঠিল। মাত্র একটুখানি সে অন্যমনস্ক হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিল, শিউলিতলার পাশ হইতে কে বাহির হইয়া আসিতেছে। ধব্‌ধবে কাপড়-পরা নারীমূর্তি। বিলু—বিলু! হ্যাঁ···ওই যে তাহার কোলে খোকন! খোকনকে কোলে করিয়া সে দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। দেবুর সর্বশরীরে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। শিরায়-শিরায় যেন রক্তধারায় আগুন ছুটিতেছে। সে তক্তাপোশে বসিয়াছিল—লাফ দিয়া উঠিয়া গিয়া অন্ধ আবেগে দুই হাতে বিলুকে বুকে টানিয়া চাপিয়া ধরিল, মুখ-কপাল চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল। বাঁচিয়া উঠিয়াছে—বিলু তাহার বাঁচিয়া উঠিয়াছে!

—একি জামাই, ছাড় ছাড! ক্ষেপে গেলে নাকি?

দেবু চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে প্রশ্ন করিল—কে! কে?

—আমি দুগ্‌গা। তুমি বুঝি—

—এঁ্যা, দুর্গা?…দেবু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া যেন পাথর হইয়া গেল।

দুর্গা বলিল—ঘোষেদের ছেলেটা ভিড়ের ভেতর সঙ্গ হারিয়ে কাঁদছিল, নিয়ে এলাম কোলে করে। মরণ আমার—দিয়ে আসি বাড়িতে।

দেবু উত্তর দিল না। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত সে অসাড়ভাবে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। দুর্গা চলিয়া গেল।

দুর্গা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—দেবু তক্তাপোশের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে মৃদুস্বরে ডাকিল—জামাই-পণ্ডিত!

দেবু উঠিয়া বসিল—কে, দুর্গা।

—হঁ্যা।

—আমাকে মাফ্ করিস্ দুর্গা, কিছু মনে করিস্ না।

—কেন গো, কিসের কি মনে করব আবার?…দুর্গা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

—আমার মনে হ'ল দুর্গা, শিউলিতলা থেকে বিলু যেন খোকনকে কোলে করে বেরিয়ে আসছে। আমি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, থাকতে পারলাম না।

দুর্গা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—কোন উত্তর দিল না। নীরবেই ঘরের শিকল খুলিয়া ঘরের ভিতর হইতে লণ্ঠনটা আনিয়া তক্তাপোশের উপর রাখিয়া বলিল…আঁধারে কত কি মনে হয়। আলোটা নিয়ে বসলেই—।… কথা বলিতে বলিতেই সে আলোর শিখাটা বাড়াইয়া দিতেছিল; উজ্জলতর আলোর মধ্যে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া সে অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর সবিস্ময়ে বলিল—এর জন্যে তুমি কাঁদছ জামাই-পণ্ডিত!

দেবুর দুই চোখের কোণ হইতে জলের রেখা আলোর ছটায় চক্-চক্ করিতেছে। দেবু ঈষৎ একটু ম্লান হাসিয়া হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

দুর্গা বলিল—জামাই-পণ্ডিত! তুমি আমাকে ছুঁয়েছ বলে কাঁদছ?

দেবু বলিল—চোখ থেকে জল অনেকক্ষণ থেকেই পড়ছে দুর্গা; আজ মনে পড়ে গেল—খোকন আর বিলুকে। হঠাৎ তুই এলি ছেলে কোলে করে—

আমার কেমন ভুল হয়ে গেল।···দেবুর চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দুর্গা বলিল—তোমার মত লোক জামাই-পণ্ডিত—তোমাকে কি কাঁদতে হয় ?

হাসিয়া দেবু বলিল—কাঁদতেই তো হয় দুর্গা। তাদের কি ভুলে যেতে পারি ?

দুর্গা বলিল—তা বলছি না—জামাই! বল্‌ছি—তোমার মত লোক যদি কাঁদবে, তবে গরীব-দুঃখীর চোখের জল মোছাবে কে বল ?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওদিকে ময়ূরাক্ষীর তীরের বাজনা থামিয়া গিয়াছে। দূরে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, সাড়া আগাইয়া আসিতেছে।

দুর্গা বলিল—উনোনে আগুন দিই, জামাই! অনেক রাত হল, ওঠ।

—নাঃ, আজ আর কিছু খাব না।

—ছিঃ। তোমার মুখে ও কথা সাজে না। ওঠ, ওঠ। না উঠলে তোমার পায়ে মাথা ঠুকব আমি।

দেবু হাসিয়া বলিল—বেশ চল্‌।

হঠাৎ নিকটেই কোথাও ঢোল বাজিয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া দেবু বলিল—ও আবার কি ?

দুর্গা হাসিয়া বলিল—কর্মকার, আবার কে ?

—অনিরুদ্ধ ?

—হ্যাঁ। ভাসান দেখতে গিয়ে—যা হল্লোড় করলে! আজ আবার পাকী মদ এনেছিল। পাড়ার লোককে খাইয়েছে। এই রেতে আবার মঙ্গলচণ্ডীর গান হবে। তাই আরম্ভ হল বোধ হয়।

দেবু হাসিল। অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া ওই পাড়াটাকে বেশ জমাইয়া রাখিয়াছে। জমাইয়া রাখিয়াছেই নয়—অনেককে অনেক রকম সাহায্যও করিয়াছে।

দুর্গা—বলিল—দাদা যে কর্মকারের সঙ্গে কাজ করতে কলকাতা চললো, শুনেছ ?

—এমনি শুনেছি। অনিই একদিন বলছিল।

—আরও সব ক'জনা কম্মকারকে ধরেছে। তা কম্মকার বলেছে—সবাইকে নিয়ে কোথা যাব আমি ? পাতু আমার পুরনো ভাবের লোক, ওকে নিয়ে যাব। তোরা সব জংশনের কলে গিয়ে কাজ কর।

—তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আজই সব সন্ধ্যেবেলায়—ভাসান দেখতে যাবার আগে, খুব কল্‌কল্‌ করছিল সব। সতীশ দাদা বলছিল—কলে খাটতে যাবি কি! আর আর সবাই বলছিল—আলবৎ যাব, খুব যাব। কম্মকার ঠিক বলেছে।···সে সব লাফানি কি! মদের মুখে তো!

দেবু চুপ করিয়া রহিল। দুর্গার কথাটার মধ্যে দেবুর মন চিন্তার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছে। কলে খাটিতে যাইবে! ওপারে জংশনে কল অনেক দিন হইয়াছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত এ গ্রামের দীনদরিদ্র ও অবনত জাতির কেহই খাটিতে যায় নাই। সাঁওতাল এবং হিন্দুস্থানী মুচিরাই কলে মজুর খাটিয়া থাকে। কলের মজুরদের অবস্থাও সে জানে। পয়সা পায় বটে, মজুরিও বাঁধা বটে, কিন্তু কলে যে সব কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহাতে গৃহস্থের গৃহধর্ম থাকে না। গৃহও না—ধর্মও না। এতদিন ধরিয়া কলের লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক লোভ দেখাইয়াছে, কিন্তু তবুও গৃহস্থের একজনও ও-পথে হাঁটে নাই। কালবন্যায় গৃহস্থের ঘর ভাঙিয়াছে। অনিরুদ্ধ আসিয়া ধর্মভয়ও ফুৎকারে উড়াইয়া দিল নাকি?···

দুর্গা বলিল—নাও, আবার কি ভাবতে বসলে? রান্না চাপাও।

দেবু রান্নার হাঁড়িটা আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। দুর্গা বলিল—দাঁড়াও দাঁড়াও।

—কি?

—কাপড় ছাড়।

—কেন?

সলজ্জভাবেই দুর্গা হাসিয়া বলিল—আমাকে ছুঁলে যে!

—তা হোক!

উনানের উপর দেবু হাঁড়ি চড়াইয়া দিল।

বাউড়ী-পাড়ায় কলরব উঠিতেছে। উন্মত্তের মতই বোধ হয় সবাই মাতিয়া উঠিয়াছে। অনিরুদ্ধ একটা ঝড় তুলিয়াছে যেন। ঢোল বাজিতেছে, গান হইতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রি। গান স্পষ্ট শোনা যাইতেছে।

মঙ্গল-চণ্ডীর পালা-গানই বটে। বারমেসে গাহিতেছে—

"আষাঢ়ে পূরয়ে মহী নব মেঘে জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
সাহসে পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে। কিছু খুদকুঁড়া মিলে উদর না পূরে॥

বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥

দেবু আপন-মনেই হাসিল। সাপে খাইলে মরিয়া গরীবের হাড় জুড়ায়!… ভারি চমৎকার বর্ণনা কিন্তু!

তাহার আগাগোড়া—ফুল্লরার বারোমাস্যার বর্ণনা মনে পড়িয়া গেল!

“বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ-বাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর তালপাতের ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার খুঁটি তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ!
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁটের বসন॥”

দুর্গা বলিয়া উঠিল—উনোনের আগুন যে নিভে গেল গো! কাঠ দাও!

দেবু উনানের দিকে চাহিয়া বলিল—দে বাপু তুই একখানা কাঠ দে।

দুর্গা একখানা কাঠ ফেলিয়া দিয়া বলিল—না, তুমি দাও।

ওদিকে গান হইতেছে—

“দুঃখ কর অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আসে বান॥
ভাদ্রমাসেতে বড় দুরন্ত বাদল। নদ-নদী একাকার আট দিকে জল॥”

দেবুর মন কবির প্রশংসায় যেন শতমুখ হইয়া উঠিল; ‘আট দিকে জল’—কেবল উর্ধ্ব এবং অধঃ ছাড়া আর সব দিকে জল।

দুর্গা বলিল—আমাদের এবারকার মতন বান হলে মাগী আর বাঁচত না।

দেবুর মনে আবার একটা চকিত রেখার মত চিন্তার অনুমতি খেলিয়া গেল; যে ছেলেটা ফুল্লরার গান গাহিতেছে, তাহার কণ্ঠস্বর ঠিক মেয়েদের মত, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জোরালো! মনে হইতেছে, ফুল্লরাই যেন ওই পাড়ায় বসিয়া বারমেসে গান গাহিতেছে। ওপাড়ার যে-কোন ঘরই তো ফুল্লরার ঘর; কোন প্রভেদ নাই। তালপাতার ছাউনি, দেওয়ালও ভাঙা, খুঁটি শুধু ভেরেণ্ডার নয়—বাঁশের। দু-একজনের বটের ডালের গুঁটিও আছে।

গান চলিতেছে। ভাদ্রের পর আশ্বিন। দেশে দুর্গাপূজা। সকলের পরনে নূতন কাপড়। “অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।” আশ্বিনের পর কাতিক। হিম পড়িতেছে; ফুল্লরার গায়ে কাপড় নাই।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তা আমাদের চেয়ে ভাল ছিল ফুল্লরা। মালোয়ারী ছিল না।

দেবু হাসিল।

মাসের পর মাস দুঃখ-ভোগের বর্ণনা চলিয়াছে। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—।

"দুঃখ কর অবধান—দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ-মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥"

গান শেষ হইয়া আসিয়াছে। দেবু ওই গানেই প্রায় তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

"দারুণ দৈবরোষে, দারুণ দৈবরোষে।
একত্র শয়নে স্বামী যেন যোল কোশে॥"

গান শেষ হইল। দেবুর খেয়াল হইল—ভাত নামানো দরকার। সে বলিল—দুর্গা, ভাত হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। নামিয়ে ফেলি, কি বল্?

কেহ উত্তর দিল না।

দেবু সবিস্ময়ে ডাকিল—দুর্গা!

কেহ উত্তর দিল না। দুর্গা চলিয়া গিয়াছে? কখন গেলে? এই তো ছিল! —দুর্গা!

দুর্গা সত্যই কখন চলিয়া গিয়াছে।

পঁচিশ

কার্ত্তিকের শেষ। শীত পড়িবার সময় হইয়াছে। কিন্তু এবার শীত ইহারই মধ্যে বেশ কন্‌-কনে হইয়া উঠিয়াছে! সকাল বেলায় কাঁপুনি ধরে। শেষরাত্রে সাধারণ কাপড়ে বা স্থতা চাদরে শীত ভাঙে না। কার্তিক মাসে লোক লেপ গায়ে দেয় না। কারণ কার্তিক মাসে লেপ গায়ে দিলে মরিয়া পরজন্মে নাকি কুকুর হইতে হয়। তবুও লোকে লেপ-কাঁথা পাড়িয়াছে। বন্যার প্লাবনে দেশের মাটি এমনভাবে ভিজিয়াছিল যে, সে জল এখনও শুকায় নাই। ছায়া-নিবিড় আম-কাঠালের বাগানগুলির মাটি—জানালাহীন ঘরের মেঝে এখন স্যাঁৎস্যাঁৎ করিতেছে। বাউড়ী-পাড়ার লোকে মেঝের উপর গাছের ডাল পুঁতিয়া বাখারি দিয়া মাচা বাঁধিয়াছে। সতীশ গায়ে দেয় একখানা পাত্‌লা ও জরাজীর্ণ বিলাতী কম্বল, সে এখনও লেপ গায়ে দেয় নাই।

পাতু বলে—কুকুর হতে দুঃখু নাই সতীশ-দাদা! তবে যেন বড় বড় রোঁয়াওলা বিলিতি কুকুর হই। দিব্যি শেকলে বেঁধে বড়লোকে পুষবে। দুধ-ভাত-মাংস খেতে দেবে।

অনিরুদ্ধ বলিয়াছে—আরে শালা—রোঁয়াতে উকুন হবে, রোঁয়া উঠে গেলে মর্‌বি। ভাগিয়ে দেবে তখন।

—তখন ক্ষেপে গিয়ে যাকে পাব তাকে কামড়াব।

—ডাণ্ডার বাড়ি ঘা কতক দিয়ে না হয় গুলি করে মেরে ফেলবে।

—ব্যস্, তখন তো কুকুর জন্ম থেকে খালাস পাব!···পাতু আবার হাসিয়া বলে—আর যদি দিশি কুকুর হই, তবে তুমি পুষো আমাকে সতাশ-দাদা।

অনিরুদ্ধ আসিবার পর হইতে পাতুর কথাবার্তার ধারাটা এমনি হইয়াছে। খোঁচা দিয়া ছাড়া কথা বলিতে পারে না। পাতুর কথায় সতীশ একটু-আধটু আহত হয়।···

গত কাল রাত্রে ব্যাপারটা বেশ জট পাকাইয়া উঠিয়াছে। গোটা পাড়ার মেয়ে-পুরুষে মদ খাইয়াছে এবং হল্লা করিয়াছে। শেষে কলে খাটিবার মতলব প্রায় পাকা করিয়া ফেলিয়াছে। সতাশ ভোর বেলায় উঠিয়া বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া হাল জুড়িবার আয়োজন করিল। তাহাদের পাড়ায় সবসুদ্ধ পাঁচখানি হাল ছিল; পূর্বে অবশ্য আরও বেশি ছিল। ওই পাতুরই ছিল একখানা। এখন এই গো-মড়কের পর পাঁচখানা হালের দশটা বলদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে চারিটা। তাহারই শুধু দুইটা আছে—বাকী দুইজনের একটা একটা। তাহারাও দুইজনে মিলিয়া রবি-ফসলের চাষ করিবে ঠিক করিয়াছে। সতীশ তাহাদের একজনের বাড়িতে গিয়া তাগিদ দিল—আয়, সূয্যি উঠে গেল!

অটল বলিল—এই হয়েছে। লাও, তামাক একটুকুন্ ভালো করে খেয়ে নাও। আমি কালাচাঁদকে ডাকি, গরুটা নিয়ে আসি।

সতীশ তামাক খাইতে বসিল!

অটল ফিরিয়া আসিল একা। বলিল—সতীশ-দাদা, তুমি যাও, আমার আজ হল না।

—হল না?

অটল বলিল—যাবে না শালা কালাচেঁদে।

—যাবে না?

—যাবেও না, গরুও দেবে না। বলে—চাষবাস আমি করব না। আমার গরু আমি বেচে দোব। পার তো কিনে লাও।···শালার আবার রস কত। বলে—পয়সা ফেল মোয়া খাও, আমি কি তোমার পর?

—হ্যাঁ। ভূতে পেয়েছে শালাকে।

ভূতই বটে! নহিলে পিতৃপুরুষের কাজকর্ম, কুলধর্ম মানুষ ছাড়িবে কেন? আঃ, এমন সুখের এমন পবিত্র কাজ কি আর আছে? জমি-চাষ, গো-সেবা—পবিত্র কাজ; কাজগুলি করিয়া যাও—মুনিবেরও ঘরের ধান, মাইনে, কাপড়,

এই হইতেই তোমার চলিয়া যাইবে! বর্ষা-বাদলে কোথাও মজুরি করিয়া মরিতে হইবে না, অবশ্য আগের মত সুখ আর নাই। আগে অসুখ হইলে মুনিবেরা বৈদ্য সুদ্ধ দেখাইত। তা ছাড়া মুনিবের ঘর হইতে কাঠ-কুটা-খড় এগুলা তো মেলেই। পালে-পার্বণে, মুনিব-বাড়ির কাজ-কর্মে উপরি বক্‌শিশ আছে। সে সুখ ছাড়িয়া কলে খাটিবার জন্য সব নাচিয়া উঠিয়াছে। কর্মকার কতকগুলা টাকা আনিয়া মদ খাওয়াইয়া লোকের মাথা খারাপ করিয়া দিল। কর্মকারের দোষ কি? সে কোনদিন বলে নাই। ধুয়াটা তুলিয়াছে পাতু। পাতুই অনিরুদ্ধকে বলিয়াছে—আমাকে তুমি নিয়ে চল কম্মকার-ভাই। তোমার সঙ্গে আমি যাব।

অনিরুদ্ধ পাতুকে লইয়া যাইতে রাজী হইয়াছিল। সে তাহার অনেক দিনের ভাবের লোক। এক কালে পাতুর যখন হাল ছিল—তখন পাতুই তাহার জমি চাষ করিত। তা ছাড়া সে দুর্গার ভাই।

অনিরুদ্ধ পাতুকে লইয়া যাইতে রাজী হইয়াছে শুনিয়া সবাই আসিয়া নাচিতে লাগিল—আমাকে নিয়ে চলেন কম্মকার মশায়। আমিও যাব। আমিও, আমিও, আমিও!

কর্মকারের আমোদ লাগিয়াছে। সে বলিয়াছে—সবাইকে নিয়ে কোথা যাব বল্? তোরা এখানকার কলে গিয়ে খাট্।...কর্মকারের কি? না ঘর, না পরিবার, জমি, না কিছু; গাঁয়ে-মায়ে সমান কথা—সেই গ্রামকেই সে ত্যাগ করিয়াছে! কলে খাটিবার পরামর্শ সে দিয়া বসিল।

কলে খাটা! ভাবিতেও সতীশের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! হউক তারা গরীব, ছোট লোক, তবু তো তাহারা গৃহস্থ লোকে। গৃহস্থ লোকে কি কলে খাটে!

সতীশ অটলকে বলিল—না দিক্। আয়, তু আমার সঙ্গে আয়। তিনটে গরু নিয়ে আমরা দু-জনাতেই যতটা পারি করব—চল্।

অটল চুপ করিয়া বসিয়াছিল; সেও পাতুর মত কিছু ভাবিতেছিল—সে উত্তর দিল না, নড়িল না।

সতীশ ডাকিল—কি বলছিস যাবি?

অটল মাথা চুলকাইয়া এবার বলিল—তা পরে ভাগাটো কি রকম করবে বল?

—ভাগা?

—হ্যাঁ।

—যা পাঁচজনায় বলবে, তাই হবে।

—না ভাই। সে তুমি আগাম ঠিক কর লাও।

বেশ! চল্—যাবার পথে পণ্ডিতমাশায়ের কাছ হয়ে যাব। পণ্ডিতমাশায় যা বলবেন তাই হবে। পণ্ডিতের কথা মানবি তো?

পণ্ডিতের বাড়ির সম্মুখে বেশ একটি জনতা জমিয়া গিয়াছে। স্বয়ং শ্রীহরি-ঘোষ মহাশয় দাঁড়াইয়া আছে। সে-ই কথা বলিতেছে; খুব ভারী গলায় বেশ দাপের সঙ্গেই বলিতেছে—কাজটা তুমি ভাল করছ না দেবু!

আগে ঘোষ পণ্ডিতকে বলিত—দেবু-খুড়ো। আজ শুধু দেবু বলিতেছে। ঘোষ যে ভয়ানক চটিয়াছে—ইহাতে সতীশ এবং অটলের সন্দেহ রহিল না।

পণ্ডিত হাসিয়াই বলিল—সকাল বেলায় উঠেই তুমি কি আমাকে শাসাতে এসেছ শ্রীহরি?

শ্রীহরি এমন উত্তরের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর বলিল—তুমি গ্রামের কত বড় অনিষ্ট করছ—তুমি বুঝতে পারছ না।

পণ্ডিত বলিল—আমি গ্রামের অনিষ্ট করছি?

—করছ না? গ্রামের ছোটলোকগুলো সব চললো কলে খাটতে! তুমি তাদের উস্কে দিচ্ছ!

পণ্ডিত বলিল—না। আমি দিইনি।

—তুমি না দিয়েছ, তুমি অনিরুদ্ধকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। সে-ই এ সব করেছে।

—সে গ্রামের লোক, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সে দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, আমার ঘরে আছে। যতদিন ইচ্ছে সে থাকবে। সে কি করছে না-করছে—তার জন্যে আমি দায়ী নই।

শ্রীহরি বলিল—জান, সে ছোটলোকের সঙ্গে মদ খায়, ভাত খায়! সেই লোককে তুমি ঘরে ঠাঁই দিয়েছ?

দেবু বলিল—অতিথের জাত-বিচার করি না আমি। তার এঁটোও আমি খাই না। আর তা' ছাড়া—।···দেবু এবার হাসিয়া বলিল—আমিও তো পতিত, শ্রীহরি!

শ্রীহরি আর কথা বলিতে পারিল না। সে আর দাঁড়াইলও না, নিজের বাড়ির দিকে ফিরিল!

শ্রীহরির পশ্চাদ্‌বর্তিগণের মধ্য হইতে হরিশ আগাইয়া আসিয়া বলিল—শোন বাবা দেবু, শোন।

দেবু বলিল—বলুন।

—চল, তোমার দাওয়াতেই বসি। না, চল বাড়ির ভেতর চল।

দেবু সমাদর করিয়াই বলিল—আসুন। সে তো আমার ভাগ্য।

বাড়ির ভিতরে আসিয়া হরিশ বলিল—ও পতিত-এতিতের কথা ছাড়ান্ দাও। ও সব কথার কথা। কই, কেউ কোনদিন বলেছে যে দেবু পণ্ডিতের বাড়ি যাব না, সে পতিত? না—তোমার বাড়ি আসেনি? ওসব আমরা ঠিক করে দোব!

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

হরিশ বলিল—শ্রীহরি বলছিল, দেবুকে বলো হরিশ ঠাকুর-দাদা, ও রাজী হয় তো আমার শালার একটি কন্যে আছে, ডাগর মেয়ে—তার সঙ্গে সম্বন্ধ করি। পতিত। বাজে, বাজে ও সব।

দেবু বলিল—থাক্, হরিশ খুড়ো—বিয়ের কথা থাক্। এখন আর কি বলছেন বলুন।

হরিশ বলিল—এ কাজ থেকে তুমি 'নিবিত্ত' হও বাবা। এ কাজ করো না; গাঁয়ে মুনিষ মিলবে না, মান্দের মিলবে না, মহা কষ্ট হবে লোকের। নিজেদের গোবরের ঝুড়ি মাথায় করে ক্ষেত নিয়ে যেতে হবে। ওদের তুমি বারণ কর।

—বেশ তো আপনারাই ডেকে বলুন।

—না রে বাবা। তোমাকে ওরা দেবতার মত মান্যি করে।

দেবু বলিল—শুনুন হরিশ-খুড়ো আমি ওদের কিছু বলি নাই। বলছে অনিরুদ্ধ। আগে-আগে উড়ো-ভাসা শুনেছিলাম, ঠিক-ঠাক শুনেছি কাল রাত্রে। আমি সমস্ত রাত্রি ভেবে দেখেছি। কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব করে দেখলাম—গাঁয়ের যত গেরস্ত বাড়ি, তার পাঁচগুণ লোক ওদের পাড়ায়। ইদানীং গাঁয়ের গেরস্তদের অবস্থা এত খারাপ হয়েছে যে, লোক রাখবার মত গেরস্ত হাতের আঙুলে গুণতে পারা যায়। অন্য গাঁয়ের গেরস্ত-বাড়িতে কাজ করে এখন বেশির ভাগ লোক। বানের পর তাদের অনেককেও মুনিষ-মান্দেও ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন এ সব লোকে খাবে কি? খেতে দেবে কে বলুন দেখি?

হরিশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেবু চুপ করিয়া রহিল তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায়। উত্তর না পাইয়া সে বলিল—তামাক খাবেন? আন্‌ব সেজে?

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—না। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা, তা হলে আমি উঠলাম।

বাড়ির দুয়ারে আসিয়া বলিল—গাঁয়ের যে অনিষ্ট তুমি করলে দেবু, সে অনিষ্ট কেউ কখনও করেনি। সর্বনাশ করে দিলে তুমি।

দেবু বলিল—আমি ওদের একবারের জন্যেও কলে খাটবার কথা বলিনি, হরিশ-খুড়ো। অবিশ্যি আপনি বিশ্বাস না করেন, সে আলাদা কথা।

—কিন্তু বারণও তো করলে না।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা রাস্তার উপর দাঁড়াইল ; ঠিক সে মুহূর্তেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে শ্রীহরির উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠের কথা শোনা গেল—বলে দেবে, যারা কলে খাটতে যাবে—তারা আমার চাকরান্ জমিতে বাস করতে পাবে না। কলে খাটতে হ'লে গাঁ ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

তর্ তর্ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল কালু শেখ। লাঠি হাতে পাগড়ী মাথায় কালু শেখ তাহাদের সম্মুখ দিয়েই চলিয়া গেল।

শ্রীহরির হুকুম-জারি শুনিয়া দেবুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ওটা নিতান্ত বাজে হুকুম! সে জানে, লোকে ও-কথা শুনিবে না। সেট্‌লমেণ্ট কিন্তু একটা কাজ করিয়া গিয়াছে। পরচার ওই কাগজখানা দিয়া নিতান্ত দুর্বল ভীরু লোককেও জানাইয়া দিয়া গিয়াছে যে, এই জমিটুকুর উপর তোমার এই স্বত্ব আছে, অধিকার আছে। আগে গৃহস্থ লোকেরা—আপন আপন জমির উপর বাউড়ী, ডোম মুচিদের ডাকিয়া বসবাস করিবার জায়গা দিত। তাহারা গৃহস্থের এ অনুগ্রহকে অসীম-অপার করুণা বলিয়া মনে করিত। সেই গৃহস্থটির সুখ-দুঃখে তাহারা একটা করিয়া অংশগ্রহণ করিত—পবিত্র অবশ্য-কর্তব্যের মত। পৃথিবীতে তাহাদের জমি থাকিতে পারে বলিয়া ধারণাই পুরুষানুক্রমে এই সব মানুষের ছিল না। তাই যে বাস করিতে এক টুকরা জমি দিত—সে-ই ছিল তাহাদের সত্যকার রাজা। পারিবারিক পারস্পরিক কলহ বিবাদে এই রাজার কাছেই তাহারা আসিত। তাহার বিচার মানিয়া লইত, দণ্ড লইত মাথা পাতিয়া। বেগার খাটিত—উপঢৌকন দিত। আবার যেদিন রাজা বলিত—আমার—জমি হইতে চলিয়া যাও, সেদিন আসিয়া তাহারা পায়ে ধরিয়া কাঁদিত, করুণা-ভিক্ষা করিত ; ভিক্ষা না পাইলে—তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া আবার কোন রাজার আশ্রয় খুঁজিত। শিবকালীপুরে ইহাদের বাস—জমিদারের খাস-পতিত ভূমির উপর। শ্রীহরি জমিদারের স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া—আজ সেই পুরাতন কালের হুকুম জারি করিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কালের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে! তাহারা পূর্বকালের মত নিরীহ ভীরু নাই, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটলমেণ্ট আসিয়া সকলের হাতে পর্‌চা দিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে, এ জমিতে তোমাদের একটা লিখিত অধিকার আছে,

যেটা মুখের হুকুমে যাইবে না। কথায় কথায় তাহারা এখন পর্‌চা বাহির করে। শ্রীহরির এ হুকুমে কেহ ভয় পাইবে না—এ কথা দেবু জানে।···

গতরাত্রে সমস্ত রাত্রিটাই দেবুর ঘুম হয় নাই। তাহার শরীর অবসন্ন, চোখ জ্বালা করিতেছে। দুর্গাকে ছেলে কোলে করিয়া অকস্মাৎ শিউলিতলা হইতে বাহির হইতে দেখিয়া যে মারাত্মক ভ্রম করিয়া বসিয়াছিল, তাহার অনুশোচনায় এবং ইহাদের এই কলে খাটিতে যাওয়ার কথা শুনিয়া কি যে তাহার হইয়া গেল, সারারাত্রি আর কিছুতেই ঘুম আসিল না।

দুইটা চিন্তা একসঙ্গে তাহার মাথায় আসিয়া এমন ভাবে জট পাকাইয়া গেল যে, শেষটা দুইটাকে পৃথক্ বলিয়া চিনিবার উপায় পর্যন্ত ছিল না। সে মাথায় হাত দিয়া স্থিরভাবে ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিন্তা করিয়াছে। বিলু-খোকা! উঃ, সে আজ কি ভুলই না করিয়াছে! ছেলেটাকে কোলে করিয়া দুর্গা শিউলিতলার পাশ দিয়া আসিতেই তাহার মনে হইল—বিলু খোকাকে কোলে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এখনও পর্যন্ত সে সেই ছবিকে কিছুতেই ভ্রম বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। উঃ বিলু-খোকাহান এই ঘর—এই ঘরে সে কি করিয়া আছে? কোন্ প্রাণে আছে! বুক তাহার হু হু করিয়া উঠিয়াছিল। পরের কাজ, দশের কাজ, ভূতের ব্যাগার! স্বর্ণ, স্বর্ণের মায়ের ভাবনা, তাহাদের সংসারের কাজ-কর্মের বন্দোবস্ত স্বর্ণের পরীক্ষার পড়ার সাহায্য, তিনকড়ির অপ্রশংসনীয় ফৌজদারী মামলার তদ্বির, সাহায্য-সমিতি—এই সব লইয়াই তাহার আজ দিন কাটিতেছে। সে এ সব হইতে মুক্তি চায়! এ ভার সে বহিতে পারিতেছে না।

তিনকড়িদের বোঝা নামিতে আর বিলম্ব নাই! এই সময়ে অনি-ভাই আসিয়া বাউড়ী-পাড়া, মুচি-পাড়া, ডোম-পাড়ার লোকগুলি কলের কাজে ঢুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছে। যাক—উহারা কলেই যাক্। তাহার সাহায্য-সমিতির কাজের তিন ভাগ তো উহাদের লইয়াই। সমস্ত জীবনটাই তো সে উহাদের লইয়া ভুগিতেছে! তাহার মনে পড়িল—উহাদেরই ময়ূরাক্ষীর বাঁধের তালগাছের পাতা কাটার জন্য শ্রীহরির সঙ্গে বিরোধ বাধিয়াছিল।* শ্রীহরি উহাদের গরুগুলি খোঁয়াড়ে দিলে, সে উহাদের উপকার করিবার জন্যই তাহার খোকার হাতের বালা বন্ধক দিয়াছিল—ষষ্ঠীর দিন! মনে পড়িল—রাত্রে ন্যায়রত্নমহাশয় নিজে বালা দুইগাছি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি তাহাকে—ধার্মিক ব্রাহ্মণের গল্পের প্রথম অংশ বলিয়াছিলেন। তারপর উহাদের পাড়াতেই আরম্ভ হইল কলেরা। সে উহাদের সেবা করিতে

* গণদেবতা উপন্যাস।

গিয়াই ঘরে বহন করিয়া আনিল মহামারী রাক্ষসীর বিষদন্তের টুকরা; যে টুকরা বিদ্ধ হইল খোকনের বুকে—খোকন হইতে গিয়া বিঁধিল তাহার বুকে। উঃ, সেই সমস্ত সহ্য করিয়াও সে আজও ওই উহাদের বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে।

ন্যায়রত্নের গল্প মনে পড়িল—মেছুনীর ডালার শালগ্রাম শিলার গল্প। সে উহাদের গলায় বাঁধিয়া আজও ফিরিতেছে। কিন্তু হইল কি? তাহারই বা কি হইল? ওই হতভাগ্যদেরই বা কি করিতে পারিয়াছে সে? বন্যায় পরে অবশ্য সাহায্য-সমিতি হইতে উহাদেরই অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু উপকার লইয়া কতকাল উহারা বাঁচিয়া থাকিবে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, সংসারের কোন সংস্থান নাই, অন্য কেহ উপকার করিতেছে—সেই উপকারে বাঁচিয়া থাকা কি সত্যিকারের বাঁচা? আর পরের উপকারে বা কতদিন চলে? নাঃ, তার চেয়ে কলে-খাটা অনেক ভাল। অনি-ভাই তাহাদের বাঁচার উপায় বাহির করিয়াছে। চৌধুরীর লক্ষ্মী-জনার্দন শিলা বিক্রয় করিবার পর হইতে আর তাহার মেছুনীর ডালার শালগ্রামকে গলায় বাঁধিয়া ফেরার আদর্শে বিশ্বাস নাই! ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথায় তাহার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু মেছুনীর ডালার শালগ্রাম হইতে এইবার ঠাকুর হাত-পা লইয়া মূর্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসুন—এই সে চায়! তাহাতে তাহার হয় তো মুক্তি হইবে! কিন্তু তাহার মুক্তির পর শালগ্রাম শিলার সেবা করিবে কে? তার্কিক হয় তো বলিবে—দেবু, তুমি ছাড়া সংসারে কোটি কোটি সেবক আছে। সত্য কথা। কিন্তু এ পরীক্ষা পুরানো হইয়া গিয়াছে। আর ওই বাউড়া-ডোমেরাই যদি মেছুনীর ডালার শালগ্রাম হয়—তবে সেবকের চেয়ে দেবতার সংখ্যাই বাড়িয়া গিয়াছে। নাঃ, উহারা যদি নিজে হইতে বাঁচিবার পথ না পায়, তবে কাহারও সাধ্য নাই উহাদের বাঁচাইয়া রাখে। তাহার চেয়ে অনিরুদ্ধের পথই শ্রেয়ঃ। এ পথে অন্ততঃ তাহারা পেটে খাইয়া, গায়ে পরিয়া—এখানকার চেয়ে ভালভাবে থাকিবে। একটা বিষয়ে পূর্বে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল। কলে খাটিতে গেলে—মেয়েদের ধর্ম থাকিবে না; পুরুষেরাও মাতাল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। কিন্তু কাল সে ভাবিয়া দেখিয়াছে—ও আশঙ্কাটা অমূলক না হইলেও, যতখানি গুরুত্ব সে তাহার উপর আরোপ করিয়াছে ততখানি নয়। গাঁয়ে থাকিয়াও তো উহাদের ধর্ম খুব বজায় আছে! মনে পড়িয়াছে—শ্রীহরির কথা, কঙ্কণার বাবুদের কথা, হরেন ঘোষালের কথা; ভবেশ-দাদা; হরিশ-খুড়ার যৌবনকালের গল্পও সে শুনিয়াছে। এই সেদিন-শোনা দ্বারকা চৌধুরীর ছেলে হরেকৃষ্ণের কথা মনে

পড়িল। অনি-ভাই আগে যখন মাতামাতি করিয়াছিল—তখন সে গ্রামেরই মানুষ ছিল। ইহাদের মেয়েগুলি কঙ্কণার বাবুদের ইমারতে রোজ খাটিতে যায়, সেখানেও নানা কোথা শোনা যায়। কালই চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে যে, মানুষের এ পাপ যায় যে পুণ্যে সেই পুণ্যে যত দিন সব মানুষ পুণ্যবান না হইবে ততদিন সর্ব অবস্থায় এ পাপ থাকিবে। এ পাপ-প্রবৃত্তি গ্রামে থাকিলেও থাকিবে, গ্রামের বাহিরে গেলেও থাকিবে। চেহারার একটু বদল হইবে মাত্র।

যাক্ অনি-ভাইয়ের কথায় যদি উহারা কলে খাটিতে যায় তো যাক। সে বারণ করিবে না। উহাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারে ইহার অপেক্ষা বর্তমানে ভাল পথ আর নাই।

কলের মজুরও সে দেখিয়াছে। অনেকের সঙ্গে আলাপও আছে। তাহারা বেশ মানুষ। তবে একটু উচ্ছৃঙ্খল। ওই অনিরুদ্ধ সব চেয়ে ভাল নমুনা। তা হোক। উহারা যদি উপায় বেশী করে—কিছু বেশী পয়সার মদ গিলুক। কিন্তু অনিরুদ্ধের শরীরখানি কি সুন্দর হইয়াছে! কত সাহস তাহার! উহারা এমনই হোক। সে বারণ করিবে না। ঘাড়ের বোঝা নামিতে চাহিতেছে—সে বাধা দিবে না। সে মুক্তি চায়, তাহার মুক্তি আসুক।

সে আজ বাধা দিলেও তাহারা শুনিবে না। এ-কথা কাল রাত্রেই তাহারা তাহাকে বলিয়া দিয়াছে। গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল—হঠাৎ গান থামিয়া গিয়া একটা প্রচণ্ড কলরব উঠিল। আপন দাওয়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিল দেবু—কলরবের প্রচণ্ডতায় সে চমকিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। মদ বেশী খাইলে—হতভাগারা মারামারি করিবেই। সকলেই বীর হইয়া উঠে। রক্তারক্তি হইয়া যায়। মনের যত চাপা আক্রোশ অন্ধকার রাত্রে সাপের মত গর্ত হইতে বাহির হইয়া ফুঁসিয়া উঠে। অনেকে আবার মারামারি করিবার জন্যই মদ খায়।

দেবু গিয়া দেখিল—সে প্রায় এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। মদের নেশায় কাহারও স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই, লোকগুলা টলিতেছে; সেই অবস্থাতেও পরস্পরের প্রতি কিল-ঘুষি হানাহানি করিতেছে। শত্রু-মিত্র বুঝিবার উপায় নাই। একটা জায়গায় ব্যাপাটা সঙ্গীন মনে হইল। দেবু ছুটিয়া গিয়া দেখিল—সত্যই ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। পাতু নির্মম আক্রোশে একটা লোকের—ভদ্রলোকের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে; পাতু বেশ শক্তিশালী জোয়ান—তাহার হাতের পেষণে লোকটার জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেবু চিৎকার করিয়া বলিল—পাতু, ছাড়, ছাড়! ছাড়!

পাতু গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাও। না ছাড়ব না।

দেবু আর দ্বিধা করিল না, প্রচণ্ড, একটা ঘুষি বসাইয়া দিল—পাতুর কাঁধের উপর; পাতুর হাত খুলিয়া গেল। ছাড়া পাইয়া লোকটা বন্ বন্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু পাতু আবার ছুটিয়া আসিয়াই দেবুকেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। দেবু ধাক্কা দিয়া কঠিন-স্বরে বলিল—পাতু।

এবার পাতু থমকিয়া গেল; মত্ত-চোখের দৃষ্টি স্তিমিত করিয়া দেবুকে চিনিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—কে?

—আমি পণ্ডিত।

—কে, পণ্ডিতমশায়?···পাতু সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল—পেন্নাম। আচ্ছা, তুমি বিচার কর পণ্ডিত! বামুনের ছেলে হয়ে ও-বেটা মুচি-পাড়ায় যখন তখন ক্যানে আসে?···

ও-দিকে গোলমালটা তখন থামিয়া আসিয়াছে। সকলে চাপা গলায় বলিতেছে—এ্যাই চুপ। পণ্ডিত!···কেবল একটা নিতান্ত দুর্বল লোক তখন আপন মনেই দুই হাতে শূন্যে ঘুষি খেলিয়া চলিয়াছে। পাতু বলিতেছে—নেহি মাংতা হ্যায়। তুমি শালার বাত নেহি শুনে গা! যাও!

দেবু বলিল—কি হল কি? তোরা এ সব আরম্ভ করেছিস কি?

পাতু বলিল—আমাদের দোষ নাই। ওই সতীশ—সতীশ বাউড়ী। শালা আমার দানা না কচু।

—কি হল? সতীশ কি করলে?

—বললে—যাস্ না তোরা, যাস্ না।'

—কি বিপদ? যাস না কি?

পাতু হাত দুটি যোড় করিয়া বলিল—তুমি যেন বারণ ক'র না পণ্ডিত। তোমাকে যোড়হাত করছি।

—কি? কি বারণ করব?

—আমরা সব ঠিক করেছি কলে খাটব। কম্মকার সব ঠিক করে দেবে; আমি অবিশ্যি কম্মকারের সঙ্গে কলকাতা যাব! এরা সব এখানকার কলে খাটবে। তুমি যেন বারণ ক'র না।

দেবু হাসিল।

পাতু বলিল—আমরা কিন্তুক তা শুনতে লারব।

দেবু বলিল—সতীশ তার কি করলে?

—শালা বলছে—যাস না—যেতে পাবি না, গেরস্ত-ধম্ম থাকবে না। গেরস্ত-ধম্ম না কচু? পেটে ভাত নাই—বলে ধরমের উপোস করেছি। শালা, ভিখ মেগে খেতে হচ্ছে—গেরস্ত-ধম্ম!

একজন বলিল—উ শালার জমি আছে—হাল আজে, আমাদিগে দিক্ হাল-গরু-জমি, তবে বুঝি। তা না—শালা নিজে পেট ভরে খাবে, আর আমরা ভিখ মাগব আর ঘরে বসে গেরস্ত-ধম্ম করব।

পাতু বলিল—আর ওই শালা ঘোষাল।···জিভ্-কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—না-না। বেরাম্ভন। ঘোষালমাশায়! বলতো পণ্ডিত—আমার ঘরে আসে ঘোষাল—সবাই জানে। বেশ—আসিস, পয়সা দিস, ধান দিস, বেশ কথা। তা বলে তো, আমার একটা ইজ্জৎ আছে। গোপনে আয়, গোপনে যা। তা-না আমাদের মারামারি লেগেছে—আর ঘোষাল আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এল—তামাম লোকের ছামুতে। এসে মাতব্বরি করতে লেগে গেল! তাতেই ধরেছিলাম টুঁটি টিপে। তারপর আপন মনেই বলিল—দাঁড়া-দাঁড়া, যাব চলে কম্মকারের সঙ্গে—তোর পিরীতের মুখে ছাই দোব আমি।

দেবু—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কম্মকার কোথায়?

—ওই, শুয়ে রয়েছে।

অনিরুদ্ধ মদের নেশায় বকুল-তলাটাতেই পড়িয়া ছিল; ঘুমে ও নেশায় সে প্রায় চেতনাহীন। এত গোলমালেও ঘুম ভাঙে নাই।

দেবু সকলকে বাড়ি যাইতে বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তাহারা তাহাকে বলিয়াও দিয়াছে—পণ্ডিত, তুমি বারণ করিও না। অনিরুদ্ধের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা ওই পথ বাছিয়া লইতে চাহিতেছে। আর তাহারা ভিক্ষা মাগিয়া গৃহস্থ-ধর্ম পালনের অভিনয় করিতে চায় না। উপার্জনের পথ থাকিতে—পেট ভরিয়া খাইবার উপায় থাকিতে তাহারা ক্রীতদাসত্ব অথবা ভিক্ষা করিয়া আধপেটা খাইয়া থাকিতে চায় না। সে বারণ করিবে কেন? কোন্ মুখেই বা বারণ করিবে? তা ছাড়া তাহাদের বোঝা তাহার ঘাড় হইতে নামিতে চাহিতেছে, সে ধরিয়া রাখিবে কেন? মুক্তির আগমন-পথে সে বাধা দিবে না। মুক্তি আসুক। খোকন-বিলু-শূন্য জীবন—বাড়ি-ঘর তাহার কাছে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে। সে তাহাদেরই সন্ধানে বাহির হইবে। পরলোকের আত্মাও তো ইহলোকের রূপ ধরিরা আসিয়া প্রিয়জনকে দেখা দেয়! এমন গল্প তো কত শোনা যায়!

সকালে উঠিয়াই শ্রীহরি তাহাকে দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শাসন করিতে

আসিয়াছিল। বেচারা জমিদারত্ব জাহির করিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারে নাই।

দেবু স্থির করিল—সে নিজে কলে গিয়া মালিকদের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিবে—ইহাদের কাজের ব্যবস্থা করিয়া আসিবে—শর্ত ঠিক করিয়া দিবে। শ্রীহরি যদি উহাদের বসত বাড়ি হইতে জোর করিয়া উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করে, তবে ওই বাউড়ী-ডোমদের লইয়া সে খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাইবে।

পাতু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। গত রাত্রির সে পাতু আর নাই; নিরীহ শান্ত মানুষটি।

দেবু হাসিয়া বলিল—এস পাতু।

মাথা চুলকাইয়া পাতু বলিল—এলাম।

—কি সংবাদ বল?

—কাল রেতে—

হাসিয়া দেবু বলিল—মনে আছে?

—সব নাই। আপুনি যেয়েছিলেন—লয়?

—তোমার কি মনে হচ্ছে?

—যেয়েছিলেন বলেই লাগছে!

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম!

মাথা চুলকাইয়া পাতু বলিল—কি সব বলেছিলাম?

—অন্যায় কিছু বল নাই। তবে ঘোষালকে হয়তো মেরে ফেলতে আমি না গেলে।

পাতু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অন্যায় হয়ে গিয়েছে বটে। তা ঘোষালেরও অন্যায় হয়েছে; মজলিসের ছামুতে আমার ঘর থেকে বেরুন ঠিক হয় নাই মশায়।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। এ কথার উত্তর সে কি দিবে?

পাতু বলিল—পণ্ডিতমশায়?

—বল!

—কি বলছেন, বলেন?

—ও-কথায় আমি কি উত্তর দেব পাতু?

পাতু জিভ কাটিয়া বলিল—রাম-রাম-রাম! উ কথা লয়।

—তবে?

পাতু আশ্চর্য হইয়া গেল; বলিল—আপুনি শোনেন নাই? কলে খাটতে যাওয়ার কথা?

—শুনেছি !···দেবু উঠিয়া বসিল, বলিল—শুনেছি। যাও—তাই যাও। তা নইলে আর উপায়ও নাই ভেবে দেখেছি। আমি বারণ করব না।

পাতু খুশি হইয়া দেবুর পায়ের ধুলা লইল। বলিল—পণ্ডিতমশায়, কল তো উ-পারে অনেক কালই হয়েছে—এতদিন যাই নাই। দুঃখ-কষ্টে পড়েও যাই নাই। কিন্তু এ দুঃখ-কষ্ট আর সইতে লারছি !

দেবু জিজ্ঞাসা করিল—অনি-ভাই কোথা ?

—সে জংশনে গিয়েছে। কলের বাবুদের সঙ্গে পাকা কথাবার্তা বলতে।

—বেশ। তাই যাও তোমরা। তাই যাও।

পাতু চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর দেবুও উঠিল ! জগন ডাক্তারের বাড়িতে গিয়া ডাকিল—ডাক্তার !

ডাক্তারের দাওয়ায় এখনও অনেক রোগীর ভিড়। ম্যালেরিয়ার নূতন আক্রমণ অবশ্য কমিয়াছে ; মৃত্যু-সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু পুরানো রোগীও যে অনেক। জনকয়েক দাওয়ায় বসিয়াই কাঁপিতেছে ! একজন গান ধরিয়া দিয়াছে ; আপন মনেই গাহিয়া চলিয়াছে—"আমার কি হল বকুল ফুল ?"

ডাক্তার ঘরের মধ্যে ওষুধ তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত ছিল ! দেবুর গলার স্বর শুনিয়া সাড়া দিলে—কে ? দেবু-ভাই ? এস, এই ঘরের মধ্যে।

প্রকাণ্ড একটা কলাই-করা গামলায় ডাক্তার ওষুধ তৈয়ারি করিতেছিল ; হাসিয়া বলিল—পাইকারী ওষুধ তৈরি করছি। কুইনিন, ফেরিপার্ক্লোর, ম্যাগসাল্ফ্ আর সিন্কোনা। একটু লাইকার আর্সেনিক দিলে ভাল হত, তা পাচ্ছি কোথায় বল ? এই অমৃত—এক-এক শিশি গামলায় ডোবাব আর দেব। তারপর, কি খবর বল ?

দেবু বলিল—সাহায্য-সমিতির ভার তোমাকেই নিতে হবে। একবার সময় করে হিসেব-টিসেবগুলো বুঝে নাও। তাই বলতে এলাম তোমায়।

—সে কি !

—হ্যাঁ ডাক্তার। টাকা-কড়িও বিশেষ নাই, কাজও কমে এসেছে। তার ওপর বাউড়ী-মুচিরা কলে খাটতে চললো। আমি এইবার রেহাই চাই ভাই ! একবার তীর্থে বেরুব আমি।

—তীর্থে যাবে ? ডাক্তারের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। দেবুর মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল এক অদ্ভুত বিচিত্র দৃষ্টিতে ! সে দৃষ্টির সম্মুখে দেবু একটু অস্বস্তি বোধ করিল। ডাক্তারের চিবুক অকস্মাৎ থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল—রূঢ় অপ্রিয়ভাষী জগন ডাক্তার সে কম্পন সংযত করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

দেবু হাসিল,—গভীর প্রীতির সঙ্গে সে যেন আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ ভাই ডাক্তার। আমার ঘাড়ের বোঝা তোমরা নামিয়ে দাও।

ডাক্তার এবার আত্মসংবরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দেবু বলিল—তিনকড়ি-খুড়োর হাঙ্গামাটা মিটলেই আমি খালাস!

ছাব্বিশ

শীঘ্রই দেবুর ঘাড়ের বোঝা নামিল।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনকড়িদের দায়রায় বিচার শেষ হইয়া গেল। নিষ্কৃতির কোন পথই ছিল না তিনকড়ির। এক ছিদামের স্বীকৃতি—তাহার উপর স্বর্ণের সাক্ষ্য আরম্ভ হইতেই তিনকড়ি, নিজেই অপরাধ স্বীকার করিয়া বসিল। স্বর্ণকে অনেক করিয়া উকিল শিখাইয়াছিলেন—একটি কথা—'না'। 'জানি না' 'মনে নাই' এবং 'না'—এই তিনটি তার উত্তর। প্রথম এজাহারের কথা—জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—কি বলিয়াছে তার মনে নাই। রাম এবং তিনকড়ির মধ্যে কোন কথাবার্তা হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—না! এমন কথা শোনে নাই।···কিন্তু আদালতে দাঁড়াইয়া হলপ গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ যেন কেমন হইয়া গেল। সরকারী উকিলটি প্রবীণ, মামলা পরিচালনা করিয়া তাঁহার মাথায় টাকও পড়িয়াছে এবং অবশিষ্ট চুলে পাকও ধরিয়াছে; লোকচরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। কখন ধমক দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে হয়, কখন মিষ্ট কথায় কাজ হাসিল করিতে হয়—এসব তিনি ভাল রকমই জানেন। হলপ গ্রহণ করিবার পরই স্বর্ণের বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তিনি প্রথমেই গম্ভীরভাবে বলিলেন—ভগবানের নামে ধর্মের নামে তুমি হলপ করছ, বাছা। সত্য গোপন করে যদি মিথ্যা কথা বল তবে ভগবান তোমার উপর বিরূপ হবেন; ধর্মে তুমি পতিত হবে। তোমার বাপেরও তাতে অমঙ্গল হবে। তারপর তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন—এই কথা তুমি বলেছ এস্‌-ডি ওর আদালতে?

স্বর্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে উকিলের দিকে চাহিয়া রহিল।

উকিল একটা ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল? উত্তর দাও!

স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে তিনকড়ি কাঠগড়া হইতে বলিয়া উঠিল—আমি কবুল খাচ্ছি হজুর। আমার কন্যাকে রেহাই দিন। আমি কবুল খাচ্ছি।

সে আপনার অপরাধ স্বীকার করিল। হ্যাঁ, আমি ডাকাতি করেছি।

মৌলিক-ঘোষপাড়ায় দোকানীর বাড়িতে যে ডাকাত পড়েছিল—তাতে আমি ছিলাম। বাড়িতে আমি ঢুকি নাই, ঘাঁটি আগলেছি।

আপনার দোষই স্বীকার করিল—কিন্তু অন্য কাহারও নাম সে করিল না। বলিল—চিনি কেবল ছিদেমকে! ছিদেমই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল—তারই চেনা দল। আমার বাড়িতে সে অনেক কাল কাজ করেছে। বন্যের পর ভিক্ষে করেই একরকম খাচ্ছিলাম। সাহায্য-সমিতি থেকে চাল-ধান ভিক্ষে নিচ্ছি দেখে সে আমাকে বলেছিল—গেলে মোটা টাকা পাব। আমি লোভ সামলাতে পারিনি, গিয়েছিলাম। আর যারা দলে ছিল—তারা কোথাকার লোক, কি নাম—আমি কিছুই জানি না। রামভল্লার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল—রাম আমাকে বলেছিল—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে এই করলে? এই পর্যন্ত!

সকলের নাম করিয়া রাজসাক্ষী হইলে তিনকড়ি হয়তো খালাস পাইত। কিন্তু তাহা সে করিল না। তবু বিচারক তাহার নিজের দোষ স্বীকার করার জন্য অন্য আসামীদের তুলনায় তাহাকে কম সাজা দিলেন। চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল তিনকড়ির। রাম, তারিণী প্রভৃতির হইল কঠোরতর সাজা; পূর্বের অপরাধ, দণ্ড প্রভৃতির নজির দেখিয়া বিচারক তাহাদের উপর ছয় হইতে সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন।...

দেবু আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিল। যাক, সে একটা অপ্রীতিকর অস্বস্তিকর দায় হইতে অব্যাহতি পাইল। দুঃখের মধ্যেও তাহার সান্ত্বনা যে তিনকড়ি-খুড়া যেমন পাপ করিয়াছিল, তেমনি সে নিজেই যাচিয়া দণ্ড গ্রহণ করিয়াছে।

রায়ের দিন সে একাই আসিয়াছিল। স্বর্ণ বা তিনকড়ির স্ত্রী আসে নাই। দণ্ড নিশ্চিত এ কথা সকলেই জানে, কেবল দণ্ডের পরিমাণটা জানার প্রয়োজন ছিল—সেইটাই তাহাদিগকে গিয়া জানাইতে হইবে।

ফিরিবার পথে একবার সে ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুল্‌সের আপিসে গেল—স্বর্ণের পরীক্ষার খবরটা জানিবার জন্য। খবর বাহির হইবার সময় এখনও হয় নাই, তবু যদি কোন সংবাদ কাহারও কাছে পাওয়া যায় সেইজন্যই গেল।

স্বর্ণ এম-ই পরীক্ষা দিয়াছে; এবং ভালই দিয়াছে। প্রশ্নপত্রের উত্তরগুলি সে যাহা লিখিয়াছে, সে তাহাতে পাস হইবেই। অঙ্কের পরীক্ষায় সমস্ত অঙ্কগুলি স্বর্ণের নির্ভুল হইয়াছে!

দেবুর প্রত্যাশা স্বর্ণ বৃত্তি পাইবে। এম-ই পরীক্ষায় বৃত্তি মাসিক চারি

টাকা এবং পাইবে পূর্ণ চারি বৎসর। বৃত্তি পাইলে, স্বর্ণ জংশনের বালিকা বিদ্যালয়ে একটি কাজ পাইবে। শিক্ষয়িত্রীরা আশ্বাস দিয়াছেন, স্কুলের সেক্রেটারীও কথা দিয়াছেন। তাঁহাদের গরজও আছে। স্কুলটাকে তাঁহারা ম্যাট্রিক স্কুল করিতে চান। চাকরি দিয়াও স্বর্ণকে তাঁহারা ক্লাস সেভেনে ভর্তি করিয়া লইবেন। এ হইলে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হইতে পারিবে। যে মন্ত্র সে দিতে পারে নাই, স্বর্ণ সেই মন্ত্র খুঁজিয়া পাইবে জ্ঞানের মধ্যে—বিদ্যার মধ্যে। শুধু মন্ত্রই নয়—সসম্মানে জীবিকা-উপার্জনের অধিকার পাইয়া স্বর্ণ তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। কল্পনায় সে স্বর্ণের শুভ্র শুচি-স্মিত রূপও যেন দেখিতে পায়। বড় ভাল লাগে দেবুর। পরিচ্ছন্ন বেশভুষা পরিয়া, মুখে শিক্ষা এবং সপ্রতিভতার দীপ্তি মাখিয়া, স্বর্ণ যেন তাহার চোখের সম্মুখে দাঁড়ায় স্মিত হাসিমুখে।

স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের অপিসে আসিয়া সে অপ্রত্যাশিত রূপে সংবাদটা পাইয়া গেল। জেলা শহরের বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবং সেক্রেটারী বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন। সে অদূরে দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছিল কোন পরিচিত কেরানীকে। যখন সে গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, তখন কয়েকজনের সঙ্গে তাহার আলাপ ছিল। হঠাৎ তাহার কানে আসিল, শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন—আপনিই চিঠি লিখুন। আপনার চিঠির অনেক বেশী দাম হবে; স্কুলের সেক্রেটারী, নাম-করা-উকিল আপনি, আপনার কথায় ভরসা হবে তাদের। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো বৃত্তি পেলেও সহজে ঘর ছেড়ে শহরে পড়তে আসবে না। আপনি যদি লেখেন, কোন ভাবনা নেই, হোস্টেলে ফ্রি, স্কুল ফ্রি, এ ছাড়া আমরা হাত খরচাও কিছু দেব—আপনি নিজে অভিভাবকের মত দেখবেন, তবেই হয়তো আসতে পারে।

—বেশ, তাই লিখে দেব পামি।

—হ্যাঁ। মেয়েটি অদ্ভুত নম্বর পেয়েছে। খুব ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে।

—স্বর্ণময়ী দাসী। দেখুড়িয়া, পোস্ট কঙ্কণা।—এই ঠিকানা তো?

—হ্যাঁ, মেয়েটির বাপের নাম বুঝি তিনকড়ি মণ্ডল! শুনলাম লোকটা একটা ডাকাতি-কেসে ধরা পড়েছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন তো! বাপ ডাকাত, আর মেয়ে বৃত্তি পাচ্ছে।

দেবু আনন্দে প্রায় অধীর হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইয়া পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—তাঁহারা কি চান? কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেক্রেটারী বাবু বলিল—আচ্ছা, আমি শিবকালীপুরের জমিদারকে চিঠি লিখছি,—শ্রীহরি ঘোষকে। তাকে আমি চিনি।

দেবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল! তাহারা চলিয়া গেলে—তাহার দেখা হইল এক পরিচিত কেরানীর সঙ্গে। তাহাকে নমস্কার করিয়া সে বলিল—ওই মহিলাটি আর ওই ভদ্রলোকটি কে বলুন তো?

—কে?—ও, মহিলাটি এখানকার গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস আর উনি সেক্রেটারী রায়সাহেব স্বরেন্দ্র বোস—উকিল! কেন বলুন তো?

—না। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। বৃত্তির কথা বলছিলেন ওঁরা।

—হ্যাঁ। আজ বৃত্তির খবর জেনে গেলেন। ওঁরা বৃত্তি পাওয়া মেয়ে যাতে ওঁদের ইস্কুলে আসে সেই চেষ্টা করবেন। তাই আগে এসে প্রাইভেটে সব জেনে গেলেন। আমরা পাব সব দু-চার দিনের মধ্যেই। আপনি তো পণ্ডিতি ছেড়ে খুব মাতব্বরি করছেন। একটা ডাকাতি মামলার তদ্বির করলেন শুনলাম। কি রকম পেলেন?

দেবুর মনে হইল—কে যেন তাহার পিঠে অতর্কিতে চাবুক দিয়া আঘাত করিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া সে বলিল—তা বেশ, পাচ্ছিলুম বেশ, এখন হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।

—আমাদের কিছু খাওয়ান্-টাওয়ান্? লোকটি দাঁত মেলিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবু বলিল—আপনিও হজম করতে পারবেন না।—বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না। স্টেশনের পথ ধরিল। শহর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া খানিকটা মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরটা পার হইয়া রেলওয়ে স্টেশন। জনবিরল মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আঃ! এইবার তাহার ছুটি। এদিকে সাহায্য-সমিতির কাজ ফুরাইয়াছে; সমিতির হিসাব-নিকাশ ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিয়াছে; সামান্য কিছু টাকা আছে, সে টাকা এখন মজুদ থাকিবে স্থির হইয়াছে। ডাক্তারকেই সে-টাকা সে দিয়া দিয়াছে। এদিকে তিনকড়ির মামলা চুকিয়া গেল; স্বর্ণ বৃত্তি পাইয়াছে। সে জংশনের ইস্কুলে চাকরিও করিবে—পড়াশুনাও চলিবে। শহরের স্কুলের চেয়ে সে অনেক ভাল। বিশেষ করিয়া সে ইস্কুলের সেক্রেটারি শ্রীহরির জানাশুনা লোক, সে মনে করে জমিদারই দেশের প্রভু, পালনকর্তা, আজ্ঞাদাতা, তাহার ইস্কুলে সে কখনই স্বর্ণকে পড়িতে দিবে না। কখনই না। জংশনের ইস্কুল অন্যদিক্ দিয়াও ভাল, ঘরের কাছে; জংশনে থাকিলে—জগন ডাক্তার খোঁজ-খবর করিতে পারিবে। যাক্, স্বর্ণদের সম্বন্ধেও সে একরূপ নিশ্চিন্ত। এইবার তাহার সত্য সত্যই ছুটি। আঃ, সে বাঁচিল।

জংশনে সে যখন নামিল, তখন বেলা আর নাই। সূর্য অস্ত গিয়াছে, দিনের

আলো ঝিকিমিকি করিতেছে ময়ূরাক্ষীর বালুময় গর্ভের পশ্চিম প্রান্তে, যেখানে মনে হয় ময়ূরাক্ষীর দুটি তটভূমি একটি বিন্দুতে মিলিয়া দিগন্তের বনরেখার মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর গর্ভ প্রায় জলহীন। শীতের দিন, নদীর গর্তে বালিতে ঠাণ্ডার আমেজ লাগিয়াছে ইহারই মধ্যে। নদীর বিশীর্ণ ধারায় ক্বচিৎ কোথাও জল এক হাঁটু। ঘাটে আসিয়া দেবু মুখ-হাত ধুইয়া একটু বসিল। তাহার জীবনে কিছুদিন হইতেই অবসাদ আসিয়াছে—আজ সে অবসাদ যেন শেষরাত্রির ঘুমের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। খোকন আগের দিন মারা গিয়াছিল—পরের দিন রাত্রি দুইটার সময় মারা গিয়াছিল বিলু। সেদিন শেষ রাত্রে যেমন ভাবে ঘুম তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—আজ অবসাদও তেমনিভাবে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যাক, কাজ তাহার শেষ হইয়াছে। পরের বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়াছে—ভূতের ব্যাগার খাটার আজ হইতে পরিসমাপ্ত। আর কোন কাজ নাই—কোন দায়িত্ব নাই।

দেবুর মনে পড়িয়া গেল—ন্যায়রত্ন সেদিন ঠিক এইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। সে উদাস দৃষ্টিতে ওপারের দিকে চাহিল। ময়ূরাক্ষীর জল-প্রবাহের পর বালির রাশি; তারপর চর এ-দেশে বলে—'ওলা'; ময়ূরাক্ষীর চর-ভূমিতে এবার চাষ বিশেষ হয় নাই; উর্বর পলিমাটি ফাটিয়া উষর হইয়া পড়িয়া আছে। চর-ভূমির বাঁধ। বাঁধের ওপাশে পঞ্চগ্রামের মাঠ। বন্যার পর আবার তাহাতে ফসলের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে অবশ্য নামে মাত্র! পঞ্চগ্রামের মাঠকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া পঞ্চগ্রাম। সাড়া নাই, শব্দ নাই, জরা-জীর্ণ পাঁচখানা গ্রাম যেন চর্ম-কঙ্কালের বোঝা লইয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। শীত-সন্ধ্যার সূর্যালোকের শেষ আভার মধ্য হইতে উত্তাপ ইহারই মধ্যে উপিয়া গিয়াছে। দেবু উঠিল। জল পার হইয়া বালি ভাঙিয়া সে আসিয়া উঠিল বাঁধের উপর। স্বর্ণদের বাড়িতে খবর দিয়া বাড়ি ফেরাই ভাল মনে হইল। তিনকড়ির সাজা অনিবার্য—এ তাহারাও জানে, তবুও তাহারা উদ্বেগ লইয়া বসিয়া আছে। মানুষের মন ক্ষীণতম আশাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া মানুষ কুটা ধরিয়া বাঁচিতে চায় কথাটা অতিরঞ্জিত; কিন্তু সামান্য একটা গাছের ডাল দেখিলে সেটাকে সে ছাড়ে না—এটা সত্য কথা। স্বর্ণ এখনও আশা করিয়া আছে যে, তাহার বাবা যখন দোষ স্বীকার করিয়াছে, তখন জজসাহেব মৌখিক শাসন করিয়াই ছাড়িয়া দিবেন। সাজা দিলেও অতি অল্প

কয়েক মাসের সাজা হইবে। এ সংবাদে স্বর্ণ আঘাত পাইবে—কিন্তু উপায় কি? স্বর্ণের বৃত্তি পাওয়ার সংবাদটাও দেওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেবু স্বর্ণের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিবে। সব কাজ সারিয়া শেষ করিতে হইলে। আর নয়! সে একবার বাহির হইতে পারিলে বাঁচে!

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল—বাঁধের পাশে ময়ূরাক্ষীর চরের উপর জঙ্গলের ভিতরে যেন নিঃশব্দ ভাষায় কাহারা কানাকানি হাসাহাসিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। পাশেই শ্মশান। দেবুর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার বিলু এবং খোকন এইখানেই আছে। তবে কি তাহারাই? হ্যাঁ, তাহাদের দেহ নাই, কণ্ঠযন্ত্রের অভাবে বুকের কথা শব্দহীন বায়ুপ্রবাহের মত শুনাইতেছে। তাহারা মায়ে-ছেলেতে বোধ করি খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। হাসাহাসি কানাকানির ঢেউ শূন্যলোক ভরিয়া গিয়া—লাগিয়াছে—গাছের মাথায়। শ্মশানের ভিতর জঙ্গলের মধ্যে—অশরীরী আত্মা ছুটি—ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে। খেলায় মাতিয়া তাহারা যেমন নাচিয়া-নাচিয়া চলিয়াছে; তাহাদের চলার বেগের আলোড়ন—শীতের ঝরা পাতার মধ্যে—ঘূর্ণি জাগিয়াছে; বোধ হয়—খোকন ছুটিয়াছে,—তাহাকে ধরিবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে বিলু। ঠিক তাই। তাহাদের উল্লসিত চলার চিহ্ন—পাতার ঘূর্ণি—এ গাছের আড়াল হইতে ও গাছের আড়ালে চলিয়াছে—নাচিয়া নাচিয়া! দেবু আর এক পা নাড়িতে পারিল না। সে যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল! ভয়-বিস্ময়-আনন্দ সব মিশাইয়া সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! তাহার ইচ্ছা হইল—সে একবার চিৎকার করিয়া ডাকে—বিলু—বিলু—খোকন! কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। কিন্তু তাহারা কি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না? তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে তাহাদের এত অবহেলা কেন? পরের বোঝা দশের কাজ লইয়া ভুলিয়া আছে—সেইজন্য? কয়েক মুহূর্ত পরেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য অশরীরীদের পদক্ষেপ স্তব্ধ হইয়া গেল। তবে তাহারা কি তাহাকে দেখিয়াছে? হ্যাঁ! ঐ যে আবার নিঃশব্দ ভাষায় আর হাসাহাসি-কানকানি নাই—এবার নিঃশব্দ অভিমান-ভরা একটানা সুর উঠিয়াছে। এবার যেন তাহারা ডাকিতেছে—আয়—আয়—আয়—আয়! আকাশে বাতাসে—গাছের মাথায় মাথায়—পঞ্চগ্রামের মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে—সেই নিঃশব্দ ভাষার উতরোল আহ্বান। হ্যাঁ, তাহারাই তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার সর্বশরীর ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিয়া উঠিল—সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রী যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। হাতের পায়ের আঙুলের ডগায় যেন আর স্পর্শবোধ নাই। কতক্ষণ যে এইভাবে অসাড়

অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কে জানে, হঠাৎ একটা দূরাগত ক্ষীণ স্বর-ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। শব্দের স্পর্শের মধ্য দিয়া জীবিত মানুষের সঙ্গে অস্তিত্ববোধ তাহার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে সচেতন করিয়া তুলিল ; সকালের রৌদ্রের আলোক এবং উত্তাপের স্পর্শে—রাত্রের মুদিত দল পদ্মের মত আবার দল মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার ভুল ভাঙিল ; বুঝিল—বিলু-খোকনের হাসাহাসি কানাকানি নয়, বাতাস ও গাছের খেলা ; শীতের বাতাসে—তালগাছের মাথায় পাতায়-পাতায় শব্দ উঠিতেছে। জঙ্গলের ঝরা পাতায় ঘূর্ণি জাগিয়াছে। ওদিকে পিছনে—ময়ূরাক্ষী গর্ভে মানুষের গান ক্রমশঃ নিকটে আগাইয়া আসিতেছে।

কাহারা গান গাহিতে গাহিতে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া এই দিকেই আসিতেছে। শুক্লপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ রূপার কাস্তের মত পশ্চিম আকাশে মৃদু দীপ্তিতে জল্-জল্ করিতেছে ; প্রকাণ্ড বড় ঘরে প্রদীপের আলোর মত অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না। লোকগুলি আসিতেছে—অস্পষ্ট ছায়ার মত অনেকগুলি লোক, স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে দল বাঁধিয়া আসিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল—ও! বাউড়ী, মুচি, ডোমেরা সব কলে খাটিয়া ফিরিতেছে। এতক্ষণে দেবু চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে ভাবিতেছিল—বিলুর কথা নয়, খোকনের কথা নয়, ঐ লোকগুলির কথা। উহাদের সাড়ায় সে যে আশ্বাস আজ পাইয়াছে, তাহা সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। উহাদের মঙ্গল হউক! তাহাদের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া দেবুর আনন্দ হইল। তবু ইহারা অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। দেড়মাস এখনও হয় নাই, ইহাদের মধ্যে অনেক তিষ্ঠিয়াছে। অভাব অভিযোগ অনেক আছে, তবুও দু-মুঠো জুটিতেছে। বাড়ি ফিরিয়া গিয়াই সকলে ঢোল পাড়িয়া বসিবে। ইহাদের সম্বন্ধে দেবু নিশ্চিন্ত হইয়াছে। একটা বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়াছে। এইবার আজই স্বর্ণদের বোঝা নামাইবার ব্যবস্থা সে করিয়া আসিবে। অনেক বোঝা সে বহিল—আর নয়! ইহার মধ্যে কতদিন কতবার সে ভগবানের কাছে বলিয়াছে—হে ভগবান, মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও।···কিন্তু মুক্তি পায় নাই। কতদিন বিলু ও খোকার চিতার পাশে কাঁদিবে বলিয়া বাহির হইয়াও কাঁদিতে পায় নাই। মানুষ পিছনে পিছনে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মুহূর্তে তাহার মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল বিলু-খোকাকে ভুলিয়া থাকিয়া তাহার মনের অবস্থা এমন হইয়াছে যে আজ নির্জন ঐ শ্মশানের ধারে দাঁড়াইয়া বিলু-খোকার অশরীরী অস্তিত্বের আভাস

অনুভব মাত্রেই তাহার মন, চেতনা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরে অন্তরে পরিত্রাণ চাহিয়া সারা হইয়া গেল। ঐ মানুষ কয়টির সাড়া পাইয়া তাহার মনে হইর সে যেন বাঁচিল? নিজেকে নিজেই ছি-ছি করিয়া উঠিল। সংকল্প করিল—না, আর নয়, আর নয়।

দেখুড়িয়ায় ঢুকিবার মুখেই কে অন্ধকারের মধ্যে ডাকিল—কে? পণ্ডিত-মশায় নাকি?

চিন্তামগ্ন দেবু চককিয়া উঠিল—কে?

—আমি তারাচরণ।

—তারাচরণ?

—আজ্ঞে হাঁ। সদর থেকে ফিরলেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তিনকড়ির মেয়াদ হয়ে গেল? কতদিন?

—চার বছর।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ বলিল—অন্যায় হয়ে গেল পণ্ডিত মাশায়! ঘরটা নষ্ট হয়ে গেল। তারপর হাসিয়া বলিল—কোন ঘরটাই বা থাকল? রহম-চাচারও আজ সব গেল!

—সব গেল? মানে?

—দৌলতের কাছে হ্যাণ্ডনোট ছিল, তার নালিশ হয়েছিল; সুদে আসলে সমান সমান, তার উপর আদালত-খরচা চেপেছে। প্রথম আজ অস্থাবর হল। কি আর অস্থাবর? মেরেকেটে পঞ্চাশটা টাকা হবে। বাকীর জন্য জমি ক্রোক হবে। জমিতেও খাজনা বাকী পড়ে এসেছে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। সে যেন পথ চলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

পরামাণিক বলিল—এ আর রহম-চাচা সামলাতে পারবে না।—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারাচরণ বলিল—একটা কথা শুধোব পণ্ডিতমশাই?

—বল।

—আপনি নাকি তিনকড়ির কন্যার বিয়ে দেবেন? বিধবা-বিয়ে?

দেবু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কে বললে তোমায়?

তারাচরণ চুপ করিয়া রহিল।

দেবু উষ্ণ হইয়াই বলিল—তারাচরণ?

—আজ্ঞে?

—কে রটাচ্ছে এসব কথা বল তো? শ্রীহরি বুঝি?

—আজ্ঞে না।

—তবে ?

তারাচরণ বলিল—ঘোষাল বলছিল।

—হরেন ঘোষাল ?

—হ্যাঁ।

দপ্‌ করিয়া মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু কি বলিবে দেবু খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ পর বলিল—মিছে কথা তারাচরণ। তবে হ্যাঁ, স্বর্ণ রাজী হলে ওর বিয়ে আমি দিতাম।

স্বর্ণদের বাড়িতে যখন দেবু আসিয়া উঠিল—তখন মা ও মেয়ে একটি আলো সামনে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সমস্ত শুনিয়া তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহ একটা কথা বলিতে পারিল না।

তারপর দেবু স্বর্ণের বৃত্তি পাওয়ার সংবাদ দিল। তাহা শুনিয়াও স্বর্ণ মুখ তুলিল না।

স্বর্ণের মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলাম।

স্বর্ণের মা বলিল—তুমি যা বলবে তাই করব। তুমি ছাড়া আর তো কেউ নাই আমাদের।

এমন সকরুণ স্বরে সে কথা কয়টি বলিল যে, দেবু কিছুতেই বলিতে পারিল না যে, আমি আর কাহারও বোঝা বহিতে পারিব না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—আমি তো এখানে থাকব না খুড়ী-মা!

—থাকবে না ?

স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল ; এতক্ষণে সে বলিল—কোথায় যাবেন দেবু-দা ?

—তীর্থ যাব ভাই।

—তীর্থে ?

—হ্যাঁ ভাই, তীর্থে। শূন্য ঘর আর আমার ভাল লাগছে না।

স্বর্ণ আর কোন কথা বলিতে পারিল না। স্তব্ধ নীরব হইয়া গেল মাটির পুতুলের মত। কিছুক্ষণ পর আলোর ছটায় দেবুর নজরে পড়িল—স্বর্ণের চোখ হইতে নামিয়া আসিতেছে জলের দুটি ধারা। সে মুখ ঘুরাইয়া লইল। মমতায় তাহার অবিশ্বাস নাই, তাহার প্রাণে অফুরন্ত মমতা। এখানকার মানুষকে সে ভালবাসে নিতান্ত আপনজনেরই মত। এক শ্রীহরি ছাড়া

কাহারও সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য নাই। এখানকার মানুষ তো দূরের কথা—এখানকার পথের কুকুরগুলিও তাহার বাধ্য ও প্রিয়। গ্রামের কয়েকটা কুকুর ইদানীং উচ্ছিষ্ট-লোভে জংশনে গিয়া পড়িয়াছে। তাহারা জংশনে তাহাকে দেখিয়া আজও যে আনন্দ প্রকাশ করে—সে তাহার মনে আছে। আজই দুটা কুকুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর ঘাট পর্যন্ত আসিয়াছিল। এখানকার গাছ-পালা, ধূলা-মাটির উপরে তাহার এক গভীর মমতা। এই গ্রাম লইয়া কতবার কত কল্পনাই সে করিয়াছে। কত অবসর-সময়ে কাগজের উপর গ্রামের নকশা আঁকিয়া পথ-ঘাটের নূতন পরিকল্পনা করিয়াছে! কোথায় সাঁকো হইলে উপকার হয়, কোথায় অসমান পথ সমান হইলে সুবিধা হয়, বাঁকা পথ সোজা হইলে ভাল লাগে, বন্ধ পথকে বাড়াইয়া গ্রামান্তরের সঙ্গে যুক্ত করিলে ভাল হয়—কত চিন্তা করিয়া ছবি আঁকিয়াছে। গ্রামের লোক এ অঞ্চলের লোকও তাহাকে ভালবাসে এ কথা সে জানে। তাহারাই আবার তাহাকে পতিত করে, তাহার গায়ে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দেয়, তাহাকে আড়ালে ব্যঙ্গ করে—তবুও তাহারা তাহাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা দেবুও অন্তরে অন্তরে অনুভব করে! কিন্তু সে মমতার প্রতি ফিরিয়া চাহিলে আর তাহার যাওয়া হইবে না। সে আপনাকে সংযত করিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—তোমার ব্যবস্থা—যা বলেছিলাম আমি, তাতে তোমার অমত নাই তো?

স্বর্ণ মাটির দিকে চাহিয়া বোধ করি বারকয়েক ঠোঁট নাড়িল, কোন কথা বাহির হইল না।

দেবু বলিয়া গেল—আমার ইচ্ছা তাই। ভেবে দেখ—এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা কিছু হতে পারে না তোমাদের। জংশনের স্কুলে চাকরি করবে, পড়বে। তোমার মাইনে—বৃত্তি প্রভৃতিতে নগদ পনের-ষোল টাকা হবে। ওদের চেপে ধরলে কিছু বেশীও হতে পারে। এর ওপর সতীশকে আমার জমি ভাগে দিলাম—সে তোমাদের মাসে এক মণ হিসেবে চাল দিয়ে আসবে। স্বাধীনভাবে থাকবে। ভবিষ্যতে ম্যাট্রিক পাস করলে চাকরিতে আরও উন্নতি হবে। লেখাপড়া শিখলে মনেও বল বাড়বে। কতজনকে তখন তুমিই আশ্রয় দেবে—প্রতিপালন করবে। আর—গৌরও নিশ্চয় ফিরবে এর মধ্যে।

দেবু চুপ করিল। স্বর্ণের উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল! কিন্তু স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না। দেবু আবার প্রশ্ন করিল—খুড়ী-মা?

একান্ত অনুগৃহীতজনের মানিয়া লওয়ার মতই স্বর্ণের মা দেবুর কথা মানিয়া লইল—তুমি যা বলছ তাই করব বাবা।

দেবু বলিল—স্বর্ণ ?

—বেশ !···একটি কথায় স্বর্ণ উত্তর দিল।

দেবু এবার মুখ ফিরাইয়া স্বর্ণের দিকে চাহিল। স্বর্ণ এখনও আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, তাহার চোখের কোণের জলের ধারাটি এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

দেবু উঠিয়া পড়িল ; এ সবই তাহার না-জানার অভিনয়ের পিছনে ঢাকা পড়িয়া থাকা ভাল। নহিলে কাঁদিবে অনেকেই।

তিন দিন পর যখন দেবু বিদায় লইল তখন সত্যসত্যই অনেকে কাঁদিল।

বাউড়ীরা কাঁদিল। সতীশের ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল—চোখে জল টল্‌-মল্‌ করিতেছিল। সে বলিল আমাদের দিকে চেয়ে কে দেখবে পণ্ডিতমাশায় !

পাতু নাই, সে অনিরুদ্ধের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে—নহিলে সেও কাঁদিত। পাতুর মা হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিল—আঃ, বিলু মা রে ! তোর লেগে জামাই আমার সন্নেসী হয়ে গেল।

আশ্চর্যের কথা, ইহাদের মধ্যে দুর্গা কাঁদিল না। সে বিরক্ত হইয়া মাকে ধমক দিল—মরণ ! থাম বাপু তুই।—

দেবুর জ্ঞাতিরা কাঁদিল। রামনারায়ণ কাঁদিল, হরিশ কাঁদিল—শ্রীহরিও বলিল—আহা, বড় ভাল লোক ! তবে এইবার দেবু খুড়ো ভাল পথ বেছে নিয়েছে !

হরেন ঘোষালও কাঁদিল—ব্রাদার, আবার ফিরে এসো।

জগন ডাক্তারও দেবুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করিয়া কাঁদিল ; বলিল—আমিও জংশনে জায়গা কিনছি, এখানকার সব বেচে দিয়ে ওখানেই গিয়ে বাস করব, এ গাঁয়ে আর থাকব না।

ইরসাদ আসিয়াছিল। সেও চোখের জল ফেলিয়া বলিয়া গেল—দেবু-ভাই, এবাদতের কাজে বাধা দিতে নাই। বারণ করব না—খোদাতালা তোমার ভালই করবেন। কিন্তু আমার দোস্ত কেউ রইল না।

রহম আসে নাই। কিন্তু সে-ও নাকি কাঁদিয়াছে। ইরসাদই বলিয়াছে—রহম-চাচার চোখ দিয়ে পানি পড়ল ঝর্‌-ঝর্‌ করে। বল্‌লে—ইরসাদ বাপ, তুমি বারণ করিয়ো। সর্বস্বান্ত হয়েছি—এ মুখ দেখাতে বড় সরম হয়। নইলে আমি যাতাম—বুলতাম যেয়ে দেবুকে।

ময়ূরাক্ষী পার হইয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চগ্রামের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। ওপারের ঘাটে একটি জনতা দাঁড়াইয়া আছে। সে চলিয়া

যাইতেছে—দেখিতেছে। তাহাদের পিছনে বাঁধের উপরে কয়েকজন, দূরে শিবকালীপুরের মুখে দাঁড়াইয়া আছে মেয়েরা।

দেবুর মনে পড়িল—এককালে এ রেওয়াজ ছিল, তখন কেহ কোথাও গেলে গ্রাম ভাঙিয়া লোক বিদায় দিতে আসিত। পঞ্চগ্রামে যখন ছিল ঘরে ঘরে ধান, জোয়ান পুরুষ, আনন্দ-হাসি-কলরব। যখন বৃদ্ধেরা তীর্থে যাইত, গ্রামের লোকেরা তখন এমনই ভাবে বিদায় দিতে আসিত। ক্রমে ক্রমে সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। আপনিই উঠিয়া গিয়াছে। আজ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও মানুষের অন্ন জোটে না; শক্তি নাই—কঙ্কালসার মানুষ শোকে ম্রিয়মাণ, রোগে শীর্ণ; তবু তাহারা আসিয়াছে, এতটা পথ আসিয়া অনেকে হাঁপাইতেছে, তবু আসিয়াছে—ঘোলাটে চোখ হতাশা-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া এই বিদায়ী বন্ধুটির দিকে চাহিয়া আছে।

দেবু তাহাদের দিকে পিছন ফিরিল। নাঃ, আর নয়। সকলকে হাত তুলিয়া দূর হইতে নমস্কার জানাইয়া শেষ বিদায় লইল। সে আর ফিরিবে না! সে জানে ফিরিলেও আর সে পঞ্চগ্রাম দেখিতে পাইবে না। এখানকার মানুষের পরিত্রাণ নাই। জীবনের গাছের শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে। পঞ্চগ্রামের মাটি থাকিবে—মানুষগুলি থাকিবে না! পাতা-ঝরা শুকনা গাছের মত বসতিহীন পঞ্চগ্রামের রূপ তাহার চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠিল।

না—সে আর ফিরিবে না।

আসে নাই কেবল স্বর্ণ ও স্বর্ণের মা। স্বর্ণের জন্য স্বর্ণের মা আসিতে পারে নাই। দুর্গা বলিল, স্বর্ণ কাঁদিতেছে; সেদিন সে-রাত্রে বাপের উপর জেলের হুকুমের কথা শুনিয়া সে যে বিছানায় পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে শুরু করিয়াছে, তাহার আর বিরাম নাই।

দেবু কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় স্বর্ণ ও স্বর্ণের মাকে না দেখিয়া সে একটু দুঃখিত হইল। দেবুর মনে হইল—সে ভালই করিয়াছে। আর সে ফিরিবে না।···

মাস ছয়েক পর।

দেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে আবার একটা দেশপ্রেমের জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে। যাদুমন্ত্রে যেন প্রতিটি প্রাণের প্রদীপে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। সে উত্তেজনাও শহর গ্রাম চঞ্চল—পল্লীর প্রতিটি পর্ণ-কুটীরেও সে উচ্ছ্বাসের স্পর্শ লাগিয়াছে। উনিশ-শো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামেও উত্তেজনা জাগিয়াছে।

জগন ডাক্তার আসিয়াছিল জংশন স্টেশনে। তাহার পরনে খদ্দরের জামা-

কাপড়, মাথায় টুপি। ডাক্তারও এই উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। জেলা-কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে সে বিদায় দিতে আসিয়াছে। গাড়ীতে তাঁহাকে তুলিয়া দিল, ট্রেনখানা চলিয়া গেল। জগন ফিরিল। হঠাৎ তাহার পিঠে হাত দিয়া কে ডাকিল—ডাক্তার!

জগন পিছন ফিরিয়া দেখিয়া আনন্দে উৎসাহে যেন জ্বলিয়া উঠিল; দুই হাত প্রসারিত করিয়া দেবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দেবু-ভাই, তুমি!

—হ্যাঁ ডাক্তার, আমি ফিরে এলাম।

—আঃ। আসবে আমি জানতাম দেবু-ভাই। আমি জানতাম।

হাসিয়া দেবু বলিল—তুমি জানতে?

রোজই তোমায় মনে করি, হাজার বার তোমার নাম করি। সে কি মিথ্যে হয় দেবু-ভাই! অন্তর দিয়ে ডাকলে পরলোক থেকে মানুষের আত্মা এসে দেখা দেয়, কথা কয়; তুমি তো পৃথিবীতে, এই দেশেই ছিলে!···ডাক্তার হাসিল।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না ডাক্তার, মানুষের আত্মা আর আসে না! আজ তিনমাস অহরহ ডেকেও তো কিছু দেখতে পেলাম না!

কথাটায় ডাক্তার খানিকটা স্তিমিত হইয়া গেল। নীরবে পথ চলিয়া তাহারা নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবু বলিল—বস ভাই ডাক্তার! খানিকটা বস।

—বসবার সময় নাই ভাই। চলি, আজ আবার মিটিং আছে।

—মিটিং?

—কংগ্রেসের মিটিং। আমাদের এখানে মুভমেন্ট আমরা আরম্ভ করে দিয়েছি কিনা। আজ মাদক বর্জনের মিটিং।

দেবু উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—তুমি চলে গেলে। হঠাৎ একদিন তিনকড়ির ছেলে গৌর এসে হাজির হল একটা মস্ত বড় পতাকা নিয়ে—কংগ্রেস ফ্ল্যাগ! বললে—২৬শে জানুয়ারী এটা তুলতে হবে।

—গৌর ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ। সেই তো এখন আমাদের কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। সে এখান থেকে চলে গিয়ে কংগ্রেস-ভলেন্টিয়ার হয়েছিল। ফিরে এসেছে গাঁয়ের কাজ করবে বলে। তুমি নাই দেখে বেচারা বড় দমে গেল। বললে—দেবু-দা নাই! কে করবে এ-সব? আমি আর থাকতে পারলাম না দেবু-

ভাই,—নেমে পড়লাম। উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ডাক্তার অনর্গল বলিয়া গেল সে কাহিনী। বলিল—ঘরে ঘরে চরকা চলছে, প্রায় সমস্ত বাউড়ী-মুচিই মদ ছেড়েছে, গাঁয়ে পঞ্চায়েত করেছি, চারিদিকে মিটিং হচ্ছে! চল, নিজের চোখেই দেখবে সব। এইবার তুমি এসেছ, এইবার বান ডাকিয়ে দোব। তোমাকে কিন্তু ছাড়ব না। তুমি যে মনে করছ দুদিন পরেই চলে যাবে, তা হবে না।

দেবু বলিল—আমি যাব না ডাক্তার। সেই জন্যই আমি ফিরে এলাম। তোমাকে তো বললাম অনেক ঘুরলাম ক-মাস। ছাব্বিশে জানুয়ারী আমি এলাহাবাদে ছিলাম। সেখানে সেদিন জহরলালজী পতাকা তুললেন, দেখলাম। সেদিন একবার গাঁয়ের জন্য মনটা টন্-টন্ করে উঠেছিল ডাক্তার, সেদিন আমি কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিল—সব জায়গায় পতাকা উঠল—বুঝি আমাদের পঞ্চগ্রামেই উঠল না। সেখানে মানুষ শুধু দুঃখ বুকে নিয়ে—ঘরের ভেতর মাথা হেঁট করেই বসে রইল এমন দিনে। ফিরে আসতেও ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু জোর করে মনকে বললাম—না যে পথে বেরিয়েছিস, সেই পথে চল্।···তারপর কিছুদিন ওখানে ত্রিবেণী-সঙ্গমে কুঁড়ে বেঁধে ছিলাম। দিনরাত ডাকতাম বিলুকে খোকনকে। সেখানে ভাল লাগল না। এলাম কাশী। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে গিয়ে বসে থাকতাম। এই শ্মশানেই হরিশ্চন্দ্রের রোহিতাশ্ব বেঁচেছিল। কিন্তু—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—তোমার কথা হয়তো মিথ্যে নয়। প্রাণ দিয়ে ডাকলে পরলোকের মানুষ আসে, দেখা দেয়। আমি হয়তো প্রাণ দিয়ে ডাকতে পারি নি। ন্যায়রত্ন মশাই কাশীতে ছিলেন তো, তিনি আমাকে বলেছিলেন—পণ্ডিত, তুমি ফিরে যাও। এ পথ তোমার নয়। এতে তুমি শান্তি পাবে না! তা ছাড়া পণ্ডিত, ধ্যান করে ভগবানকে মেলে। কিন্তু মানুষ মরে গেলে সে আর ফেরে না, তাকে আর পাওয়া যায় না। বাইরে দেখতে পাওয়ার কথা পাগলের কথা, মনের মধ্যেও তাকে পাওয়া যায় না। যত দিন যায়, তত সে হারিয়ে যায়। নইলে আর মরণের ভয়ে অমৃত খোঁজে কেন মানুষ। আমার শশীকে আমি ভুলে গিয়েছি পণ্ডিত। তোমাকে সত্য বলছি আমি, তার মুখ আমার কাছে ঝাপসা হয়ে এসেছে! তা নইলে বিশ্বনাথের ছেলে অজয়কে নিয়ে আমি আবার সংসার বাঁধি?···

তা ছাড়া—।···দেবু বলিল—ঠাকুরমশায় একটা কথা বললেন, পণ্ডিত, যে মরে, তাকে আর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না, মানুষের মনেও সে থাকে না; থাকে—সে যা দিয়ে যায়—তারই মধ্যে। শশী আমাকে দিয়ে

গিয়েছে সহ্য গুণ। আমার মধ্যে সে তাতেই বেঁচে আছে। তোমার স্ত্রীকে একদিন দেখেছিলাম—শান্ত-হাস্যময়ী মেয়ে। তোমাকেও আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। তুমি ছিলে অত্যন্ত উগ্র, অসহিষ্ণু। আজ তুমি এমন সহিষ্ণু হয়েছ—তার কারণ তোমার স্ত্রী। সে তো হারায় নি। সে তোমার মধ্যেই মিশে রয়েছে! বাইরে যা খুঁজছ পণ্ডিত, সে তাদের নয়, সেটা তোমার ঘর-সংসারের আকাজ্ক্ষা!…দেবু চুপ করিল। জগনও কোন উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—আজ ঠিক বুঝতে পারলাম না ডাক্তার, আমার মন ঠিক কি চায়! বিলু খোকনকে ভাবতে বসতাম, তারই মধ্যে মনে হত গাঁয়ের কথা, তোমাদের কথা। তোমার কথা, দুর্গার কথা, চৌধুরীর কথা। গৌরের কথা, যাক্ সে দুষ্টু তা হলে ফিরেছে!

ডাক্তার বলিল—অদ্ভুত উৎসাহ গৌরের। আশ্চর্য ছেলে! ওর বোন স্বর্ণও খুব কাজ করছে। চরকার ইস্কুল করছে। চমৎকার সূতা কাটে স্বর্ণ।

—স্বর্ণ! স্বর্ণ পড়ছে তো? চাকরি করছে তো?

—হ্যাঁ। তবে চাকরি আর থাকবে কিনা সন্দেহ বটে।

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যায় যাবে। তাই তো ভাবতাম ডাক্তার। যখন দেখতাম চারিদিকে মিটিং, শোভাযাত্রা, দেখতাম—মাতাল মদ ছাড়লে, নেশাখোর নেশা ছাড়লে, ব্যবসাদার লোভ ছাড়লে, রাজা, ধনী, জমিদার, প্রজা, চাষী, মজুর—একসঙ্গে গলাগলি করে পথ চলছে—তখন আমার চোখে জল আসত। সত্যি বলছি ডাক্তার, জল আসত। মনে হত—আমাদের পঞ্চগ্রামে হয়তো কোন পরিবর্তনই হল না—কিছু হয় নাই। শেষটা আর থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম।

ডাক্তার বলিল—চল, দেখবে অনেক কাজ হয়েছে।…হাসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—যা গৌর-চেলা ছেড়ে গিয়েছে তুমি!

গৌর জ্বলিয়া উঠিল প্রদীপের শিখার মত।—দেবু-দা!

স্বর্ণ প্রণাম করিয়া অতি নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল—ফিরে এলেন!

দুর্গা বলিল—তাহারও লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই,—গাঢ়স্বরে সর্বসমক্ষে বলিল, পরাণটা জুড়ালো জামাই-পণ্ডিত।

গৌর বলিল—এইখানে মিটিং হবে আজ। এইখানেই ডাক, সবাইকে খবর দাও। বল—দেবু-দা এসেছে। সে বাহির হইয়া পড়িল।

দেবুর বাড়িতেই কংগ্রেস কমিটির অফিস। আপন দাওয়ায় বসিয়া দেবু

দেখিল—গৌর আয়োজনের কিছু বাকী রাখে নাই। স্বর্ণ তাহাকে ডাকিল—আসুন দেবু-দা, হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন!

বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেবু বিস্মিত হইল। ঘরখানার শ্রী যেন ফিরিয়া গিয়াছে, চারিদিকে নিপুণ যত্নে মার্জনায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দেবু বলিল—বাঃ! এখন এ বাড়ির যত্ন কে করে?

স্বর্ণ বলিল—আমি। আমরা তো এখানে থাকি!

দেবু বলিল—খুড়ী-মা কই?

স্বর্ণ বলিল—মা নেই দেবু-দা!

দেবু চমকিয়া উঠিল—খুড়ী-মা নেই!

—না। মাস দুয়েক আগে মারা গিয়াছেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বড় দুঃখিনী ছিলেন খুড়ী-মা। হাত-মুখ ধুইয়া সে নিজের স্যুটকেসটি খুলিয়া, একখানা খদ্দরের শাড়ী বাহির করিয়া স্বর্ণকে দিয়া বলিল—তোমার জন্যে এনেছি।

স্বর্ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ম্লান হইয়া গেল, ম্লান মুখে বলিল—এ যে লাল চওড়া পেড়ে শাড়ী দেবু-দা?

দেবু চমকিয়া উঠিল, স্বর্ণ বিধবা—একথা তাহার মনেই হয় নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সেবলিল—তা হোক। তবু তুমি পরবে। হ্যাঁ, আমি বলছি।

গৌর আসিয়া ডাকিল—আসুন, দেবু-দা! সব এসে গিয়েছে।

দেবু বাহিরে আসিল। সমস্ত গ্রামের লোক আসিয়াছে। দেবুকে দেখিয়া তাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া আসিল। শীর্ণ, অনাহার-ক্লিষ্ট মুখের মধ্যে চোখগুলি জল্-জল্ করিতেছে। সে যেদিন যায়—সেদিন এই চোখগুলি ছিল যেন নির্বাণমুখী প্রদীপের স্তিমিত শিখার মত। আজ আবার সেগুলি প্রাণের হবি সংযোগে জল্-জল্ করিয়া জ্বলিতেছে—দীপ্ত শিখায়। উচ্ছ্বাসে, উত্তেজনায় জাগরণের চাঞ্চল্যে, শীর্ণদেহ মানুষগুলি দৃঢ়তার কাঠিন্যে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া আছে! সে অবাক হইয়া গেল। সে পঞ্চগ্রামের মানুষের ধ্বংস নিশ্চিত ভাবিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহারা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে; কণ্ঠে স্বর জাগিয়াছে, চোখে দীপ্তি ফুটিয়াছে, বুকে একটা নূতন আশা জাগিয়াছে।

দাওয়া হইতে দেবু জনতার মধ্যে নামিয়া আসিল।

সাতাশ

তিন বৎসর পর। উনিশ-শো তেত্রিশ সাল।

জেলার সদর শহরে জেল-ফটক খুলিয়া গেল। ভোর বেলা; সূর্যোদয় তখনও হয় নাই, শুধু চারিদিকের অন্ধকার কাটিয়া সবে প্রত্যুষালোকে জাগিতেছে। পূর্বদিগন্তে জ্যোতির্লেখার চকিত ক্রমবিকাশের লেখাও শুরু হয় নাই। পাখীরা শুধু ঘন ঘন ডাকিতেছে।

জেল-ফটক খুলিয়া গেল। দেবু বাহিরে আসিল। উনিশ-শো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সে দণ্ডিত হইয়াছিল। দণ্ডিত হইয়াছিল দেড় বৎসরের জন্য। ত্রিশ সালের জুন মাসে—বাংলা মাসের আষাঢ় মাসে জেলাময় সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী হইয়াছিল। সেই আদেশ অমান্য করিয়া সে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিল—সভা করিয়াছিল। শুধু দণ্ডিতই হয় নাই, মাথায় আঘাত পাইয়া সে আহতও হইয়াছিল, দেড় বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই—গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে—তাহার মুক্তি পাওয়ারই কথা ছিল। অধিকাংশ দণ্ডিত কর্মীই মুক্তি পাইল; কিন্তু মুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে আটক আইনে বন্দী হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার জেলে ঢুকিয়াছিল। মুক্তির আদেশ আসিয়াছে। আজ সে মুক্তি পাইল। ট্রেন খুব সকালে, পূর্ব সন্ধ্যায় মুক্তির আদেশ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবুর মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কর্তৃপক্ষকে সে বলিয়াছিল—ভোরের ট্রেন যাতে ধরতে পারি—তার ব্যবস্থা যদি করে দেন, তবে বড় ভাল হয়।

কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করিতে অবহেলা করেন নাই। ভোর বেলায় স্টেশনে যাওয়ার জন্য মোটর বাসও বলিয়া দিয়াছেন। দেবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে মোটর বাসে হর্ন শুনা যাইতেছে। জেলখানার পাঁচীলের চারিপাশেও প্রকাণ্ড জেল-ক্ষেত, সমস্তটাকে ঘিরিয়া বেশ উঁচু এবং মোটা মাটির পগারের উপর বড় বড় ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের সারি; সেই সারির মধ্যে কতকগুলি সুদীর্ঘ-শীর্ষ ঝাউ গাছ ভোরের বাতাসে শন্‌শন্‌ শব্দে ডাক তুলিতেছে, সদ্য-মুক্ত দেবুর মনে সে ডাক বড় রহস্যময় মনে হইল। মনে কোন্ দূরান্তে ধ্বনিত আকুল আহ্বানের কম্পন ওই গাছের মাথায় মাথায় অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। পরক্ষণেই সে হাসিল। কে তাকে ডাকিবে?

আবার মনে হইল—আছে বই কি! সে তো দেখিয়া আসিয়াছে—পঞ্চগ্রামের মানুষের বুকে সে কী উচ্ছ্বাস—সমুদ্রের জোয়ারের মত জোয়ার—তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রাণের কত মমতা তাহার প্রতি, তাহারাই ডাকিতেছে! গৌর, জগন, হরেন, সতীশ, তারাচরণ, ভবেশ, হরিশ, ইরসাদ, রামনারায়ণ, অটল, দুর্গা, দুর্গার মা—সকলেই তাহার পথ চাহিয়া আছে, সকলেই তাহাকে ডাকিতেছে! স্বর্ণ—স্বর্ণ তাহার পথ চাহিয়া আছে। স্বর্ণ এতদিনে বোধ

হয় ম্যাট্রিক দিবার চেষ্টা করিতেছে। জেলে থাকিতে সে সংবাদও পাইয়াছে—সে পড়িতেছে! স্বর্ণ নিজেও তাহাকে পত্র লিখিয়াছে, তাহার হাতের লেখা, তাহার পত্রের ভাষা দেখিয়া দেবু খুশি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চমক লাগিয়াছে!

এই দীর্ঘ-দিনের বন্দিত্বের মধ্যে তাহারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বন্দিত্বের বেদনা-দুঃখ সত্ত্বেও এই সময়ের মধ্যে নানা আটক-বন্দীদের সঙ্গে থাকাটাকে সে জীবনের একটা আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিয়াছে। পড়াশুনাও সে করিয়াছে অনেক। দীর্ঘকাল পর মুক্ত পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া সে অনুভব করিল—পৃথিবীর রঙ যেন বদলাইয়া গিয়াছে, সুরের যেন বদল হইয়াছে। আগের কালে, এই জেলে যাওয়ার পূর্বে ওই ঝাউগাছের শব্দ কানে আসিলেও হয়তো মনে এমন করিয়া ধরা পড়িত না; পড়িলেও ওটাকে মনে হইত ওপারের সাড়া—বিলু-খোকনের ডাক ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ধারে, সন্ধ্যার পর, নির্জন তালগাছের পাতায় একটা বাতাসের সাড়া যে ডাকের ইঙ্গিত দিয়া তাহাকে একটা দেশ-দেশান্তরে ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিয়াছিল—বুঝি সেই ডাক।

বাসটা আসিয়া দাঁড়াইল। দেবু বাসে চড়িয়া বসিল।

পূর্বমুখে বাসটা চলিয়াছে। শহরের প্রান্তদেশ দিয়া প্রান্তরের বুকের লাল ধূলায় আচ্ছন্ন রাজপথ। সম্মুখে পূর্বদিগন্ত অবারিত। আকাশে জ্যোতির্লেখার খেলা চলিয়াছে, মুহুর্মুহু বর্ণচ্ছটার রূপান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে। রক্তরাগ ক্রমশ ঘন হইয়া উঠিতেছে। সূর্য উঠিতে আর দেরী নাই। গ্রাম সম্বন্ধেই সে ভাবিতেছিল। জেলে বসিয়া সে চিন্তা করিয়াছে, অনেক বই পড়িয়াছে, যাহার ফলে একটি সুন্দর পরিকল্পনা লইয়া সে ফিরিতেছে। এবার সুন্দর করিয়া সে গ্রামখানিকে গড়িবে। যে উৎসাহ, যে জাগরণ, কঙ্কালের মধ্যে যে মহাসঞ্জীবনীর সঞ্চার সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সে কল্পনা করিতেছিল, পঞ্চগ্রামের লোকেরা শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। ভাঙা পথ সংস্কার করিয়া নদী-নালায় সেতু বাঁধিয়া, কাঁটার জঙ্গল সাফ করিয়া, শ্মশানের ভাগাড়ে হাড়ের টুকরা সরাইয়া পথ করিয়া তাহারা ঋদ্ধির পথে চলিয়াছে।

বাসখানা স্টেশনে থামিল!

দেবু নামিয়া পড়িল। একটা স্যুটকেস এবং একপ্রস্থ বিছানা ছাড়া অন্য জিনিস তাহার ছিল না—সেই দুইটা নিজেই হাতে করিয়া নামিয়া পড়িল।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সামনেই পূর্বদিক। সূর্য উঠিতেছে। স্টেশনের সামনের প্রান্তরটার ও-মাথায় কয়েকখানা পাশাপাশি গ্রাম, সেখানে সকালেই ঢাক বাজিতেছে। আশ্বিন মাস। পূজার ঢাক বাজিতেছে। দেবু

প্ল্যাটফর্মটায় ঘুরিতে ঘুরিতে একটা মিষ্ট গন্ধ পাইল। এ যে অতি পরিচিত তাহার চিরদিনের প্রিয় শিউলি ফুলের গন্ধ! চারিদিকে চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল প্ল্যাটফর্মের রেলিংয়ের ওপাশে স্টেশনের কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স-শ্রেণীর পাশে একটি বড় শিউলি গাছ। তলায় অজস্র ফুল পড়িয়া আছে, সকালের বাতাসে এখনও টুপটাপ্ করিয়া ফুল খসিয়া পড়িতেছে; তাহার মনে পড়িল—নিজের বাড়ির সামনের শিউলি-ফুলের গাছটি। সকলের বাতাসের মধ্যেও তাহার সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল—চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিল স্বপ্নাতুর!

টিকিটের ঘণ্টায় তাহার চমক ভাঙিল।

টিকিট করিয়া সে আবার প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল!

প্ল্যাটফর্মে ক্রমশ ভিড় বাড়িতেছে। যাত্রীর দল এখানে ওখানে জিনিসপত্র মোট-পোঁটলা লইয়া বসিয়া আছে—দাঁড়াইয়া পাঁচজনে জটলা করিতেছে। দুই-চারিজনের চেনা মুখও দেবু দেখিতে পাইল। তাহারা সকলেই সদরের লোক; কেহ উকিল, কেহ মোক্তার, কেহ ব্যবসায়ী। দেবু তাহাদের চেনে। সে আমলে দেবুরও মনে হইত, ইহারা সব মাননীয় ব্যক্তি, তাই তাহার মনে পরিচয়ের একটা ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। দেবুকে তাহারা চেনে না। হঠাৎ নজরে পড়িল, কঙ্কণার একজন জমিদারবাবুও রহিয়াছেন। দিব্য সতরঞ্চি পাতিয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই আসর জমাইয়া ফেলিয়াছেন—গড়্গড়ায় নল দিয়া তামাক টানিতেছেন। ভদ্রলোকের সে আমলের চালটি এখনও ঠিক আছে। যেখানেই যান, গড়্গড়া তাকিয়া সঙ্গে যায়—আর গঙ্গাজলের কুঁজা। গঙ্গাজল ছাড়া উনি অন্য কোন জল খান না। নিয়মিত কাটোয়া হইতে একদিন অন্তর গঙ্গাজল আসে। সেকালে দেবু এই গঙ্গাজল-প্রীতির জন্য ভদ্রলোককে খাতির করিত। যাই হোক, তাঁহার ওই নিষ্ঠাটুকু তিনি বজায় রাখিয়াছেন। সে তখন ভাবিত, গঙ্গাজলের ফল কোন কালেও ফলিবে না। সে আজ হাসিল।

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

দেবু মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে সস্তা সাহেবী পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক। সাহেবী পোশাক হইলেও ভদ্রলোকটিকে আধ-ময়লা ধুতি-জামা-পরা বাঙালী ভদ্রলোকের মতই মনে হইল, নিতান্ত মধ্যবিত্ত মানুষ।

দেবু বলিল—আমাকে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাড়ি কি শিবকালীপুর?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো? দেবু আন্দাজ করিল, লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের লোক।

—আপনার নাম বোধ হয় দেবনাথ ঘোষ?

—হ্যাঁ। দেবুর স্বর রূঢ় হইয়া উঠিল।

—একবার এদিকে একটু আসবেন?

—কেন?

—একটু দরকার আছে।

—আপনার পরিচয় জানতে পারি?

—নিশ্চয়। আমার নাম জোসেফ নগেন্দ্র রায়! আমি ক্রিশ্চান। এইখানেই এককালে বাড়ি ছিল—কিন্তু পাঁচ-ছ বছর হল—আসানসোলে বাস করছি। কাজও করি সেইখানে। এখানে এসেছিলাম আত্মীয়দের বাড়ি, আজ ফিরে যাচ্ছি আসানসোলে। আমার স্ত্রী বললেন—উনি আমাদের পণ্ডিত দেবনাথ ঘোষ। আপনার কথা তাঁর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার জেল এবং ডিটেনশনের সময়ও খবর নিয়েছি এখানে। আজ বুঝি রিলিজ্‌ড হলেন?

দেবু অবাক্ হইয়া গেল, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না, শুধু বলিল—হ্যাঁ!

—আমার স্ত্রী একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ। দয়া করে একবার আসতেই হবে! ওই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দেবু দেখিল—একটি দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণ মেয়ে জুতা পায়ে আধুনিক রুচিসম্মত ভাবে ধব্‌ধবে পরিষ্কার একখানি মিলের শাড়ী পরিয়া তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পাশেই তাহার আঙুল ধরিয়া আড়াই-তিন বছরের ছোট একটি ছেলে। তাহার খোকনের মত।

মেয়েটিকে দেখিয়াই দেবুর মনে বিস্ময়ের চমক লাগিল। কে এ? এ তো চেনা মুখ! বড় বড় চোখে উজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টি, এই টিকলো নাক—ও যে তাহার অত্যন্ত চেনা! কিন্তু কে? অত্যন্ত চেনা মানুষ অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে নূতন ভঙ্গিতে অভিনব সজ্জায় সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যাহার মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহার নাম ও পরিচয়। বিস্মিত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেবু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, মেয়েটিও কয়েক পা আগাইয়া আসিল—বোধ হয় ঘনিষ্ঠ মুখোমুখি দাঁড়াইতে বিলম্ব তাহার সহ্য হইতেছিল না। হাসিয়া মেয়েটি বলল—মিতে!

পদ্ম! কামার-বউ! দেবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে সে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই পদ্ম? চোখে জল্-জল্ অসুস্থ দৃষ্টি, শঙ্কিত সন্তর্পিত অপরাধীর মত পদক্ষেপ, জীর্ণ কাপড়, শীর্ণ দেহ কণ্ঠস্বরে উষ্মা, তিক্ততা, কথায় উগ্রতা—সেই কামার-বউ?

পদ্ম আবার বলিল—মিতে! ভালো তো?

দেবু আত্মস্থ হইয়া বলিল—মিতেনী? তুমি!

—হ্যাঁ! চিনতে পার নি—না?

দেবু স্বীকার করিল—না চিনতে পারি নি। চিনেছি, মন বলছে চিনি, হাসি চেনা, টানা চোখ চেনা, লম্বা গড়ন চেনা—তবু ঠাহর করতে পারছিলাম না—কে!

পদ্মের মুখ অপূর্ব আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সে শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল—আমার ছেলে!

এক মুহূর্তে দেবুর চোখে জল ভরিয়া উঠিল। কারণ সে জানে না। চোখ দুইটা যেন স্পর্শ-কাতর, রস-পরিপূর্ণ ফলের মত পদ্মের ওই দুইটি শব্দের ছোঁয়ায় ফাটিয়া গেল।

পদ্মই আবার বলিল—ওর নাম কি রেখেছি জান?

দেবু বলিল—কি?

—ডেভিড দেবনাথ রায়।

পাশ হইতে নগেন রায় বলিল—আপনার নামে নাম রাখা হয়েছে। উনি বলেন—ছেলে আমাদের পণ্ডিতের মত মানুষ হবে।

দেবু নীরবে হাসিল।

পদ্ম দেশের লোকের খবর লইতে আরম্ভ করিল; প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল দুর্গার কথা।

দেবু বলিল—ভালই থাকবে! আমি তো আজ তিন বছর পর ফিরছি মিতেনী!

পদ্ম বলিল—লক্ষ্মীপুজোর দিন দুর্গার কথা মনে হয়! লক্ষ্মী তো আমাদের নাই; কিন্তু আমাদের জমি আছে, ধান উঠলে নতুন চাল ঘরে এলে পিঠে করি, সে দিনে মনে হয়। ষষ্ঠীর দিনে মনে হয়। ষষ্ঠীর কথা মনে পড়ে।

দেবু হাসিল। আনন্দে তাহার বুক যেন ভরিয়া গিয়াছে। পদ্মের এই রূপ দেখিয়া তাহার তৃপ্তির আর সীমা নাই!…

—এই এই ঘণ্টি মারো, ট্রেন আতা হ্যায়।…

দেবু ফিরিয়া দেখিল—নীল প্যাণ্টালুন ও জামা গায়ে একজন লোক লাইন

ক্লিয়ারের লোহার গোল ফ্রেমটা হাতে করিয়া চলিয়াছে, মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল অনি-ভাইকে। সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল—অনি-ভাই মধ্যে ফিরে এসেছিল মিতেনী।

পদ্ম স্থিরদৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

দেবু বলিল—সে কলকাতায় মিস্ত্রীর কাজ করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছিল।...

বাধা দিয়া পদ্ম বলিল—তার কথা থাক্ মিতে। তোমাদের সে কামার-বউ তো এখন আমি নই।

তাহার কথা শুনিয়া দেবু আশ্চর্য হইয়া গেল! পদ্মের কথাবার্তার ধারা স্বদ্ধ পাল্টাইয়া গিয়াছে।

পদ্ম বলিল—সে দুঃখু-কষ্ট অভাবের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে—সুখের মুখ দেখেছে শুনে আমার আনন্দ হল। কিন্তু আমি এই সবচেয়ে সুখে আছি পণ্ডিত। আমার খোকন—আমার ঘর—পণ্ডিত, অনেক দুঃখে আমি গড়ে তুলেছি। পরকাল—?—বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল—পরকাল আমার মাথায় থাক! এ কালেই আমি স্বর্গ পেয়েছি। আমার খোকন!—বলিয়া সে ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

ঠং ঠং ঠং ঠন্‌ন্-ন্-ন্—করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

দেবু বলিল—তাহলে যাই মিতেনী!

নগেন রায় তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে আমি কিন্তু আজ কথা বলতে পেলাম না।

দেবু বলিল—আপনার ছেলের বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করবেন, যাব আমি।

পদ্ম বলিল— তুমি আসবে পণ্ডিত? আমাদের বাড়ি?

—আসব বই কি মিতেনী।

ট্রেনে চাপিয়া চোখ বন্ধ করিয়া সে পদ্মের ওই অপরূপ ছবিখানি মনে মনে যেন ধ্যান করিতে বসিল। পদ্মের ছবি মিলাইয়া গিয়া অকস্মাৎ মনে পড়িল স্বর্ণকে। লেখাপড়া শিখিয়া স্বর্ণ এমনই সার্থক হইয়া উঠে নাই! নিশ্চয় উঠিয়াছে।

জংশনে সে যখন নামিল, তখন বেলা দশটা।

শরতের শুভ্র দীপ্ত রৌদ্রে চারিদিক ঝল্-মল্ করিতেছে। আকাশ গাঢ় নীল—মধ্যে মধ্যে সাদা-হালকা খানা-খানা মেঘের টুকরা ভাসিয়া চলিয়াছে—দ্রুততম গতিতে। ময়ূরাক্ষীর কিনারা ধরিয়া বকের সারি দেবলোকের শুভ্র

পুষ্পমাল্যের মত ভাসিয়া চলিয়াছে! প্ল্যাটফর্ম হইতেই ময়ূরাক্ষীর ভরা বুক দেখা যাইতেছে—জল আর এখন তেমন ঘোলা নয়; ভরা নদীতে ওপার হইতে এপারের দিকে খেয়ার নৌকা আসিতেছে। জংশনের কতকগুলা চিমনিতে ধোঁয়া উঠিতেছে!

সে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া আত্মগোপন করিয়াই একটা জনবিরল পায়ে-চলা পথ ধরিল। এখানে প্রায় সকলেই তাহার চেনা মানুষ। তাহাকে দেখিলে—তাহারা সহজে ছাড়িবে না। তাহারা তাহাকে ভালবাসে।

ময়ূরাক্ষীর ঘাটে গিয়া সে নামিল। খেয়া-নৌকাটা ওপার হইতে এপারে আসিতেছে।

এপারের ঘাটে অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। ওপারের ঘাটেও অনেকে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও দেবুকে দেখিল! কয়েকটি ছেলে দাঁড়াইয়াছিল—তাহারাও ওপার হইতে চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু-দা! দেবু-দা! জন দুয়েক ছুটিয়া চলিয়া গেল গ্রামের দিকে। দেবু হাসিমুখে হাক তুলিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিল।

খেয়া-মাঝি শশী ভল্লা স্মিতমুখে বলিল—পণ্ডিতমাশায়! ফিরে এলেন আপুনি?

—হ্যাঁ! ভাল আছ তুমি?

শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমাদের আবার ভাল থাকা পণ্ডিতমাশায়! কোনরকম বেঁচে আছি, নেকনের, (অদৃষ্ট লিখনের) দুঃখু ভোগ করছি আর কি।

দেবুর অন্তরের আনন্দ-দীপ্তি লোকটির কথার সুরের ভঙ্গিমায় ম্লান হইয়া গেল। পাশে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও সকলেই কেমন স্তিমিত স্তব্ধ; সামান্য দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিল। শশীর সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল কিন্তু সকলেই।

দেবু মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—ছেলেপিলে সব ভাল আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ওই বেঁচে আছে কোনরকমে। জর-জ্বালা, ঘরে খেতে নাই, পরনে কাপড় নাই, এই ভাদ্র মাস—বুঝলেন, দুঃখু-কষ্টের আর অবধি নাই।

সেই পুরানো কথা।—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই! অনাহারে রোগে আবার—আবার পঞ্চগ্রাম মরিতে বসিয়াছে।

দেবু আশ্বাস দিয়া বলিল—এবার বর্ষা ভাল; ধানও ভাল—আর ক'দিন গেলেই ধান উঠবে। অভাব ঘুচবে। ভয় কি!

শশী অদ্ভুত হাসিয়া বলিল—আর ভয় কি! ভরসা আর নাই পণ্ডিত-মশায়। সব গেল।

—দেবু-ভাই! দেবু!···চিৎকার করিয়া বাঁধের উপর হইতে কে যেন ডাকিতেছে। দেবু ফিরিয়া দেখিল। জগন-ভাই, ডাক্তার—ডাক্তার তাহাকে ডাকিতেছে। খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিতেছে। দেবু নৌকার উপরে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বলিল—জগন-ভাই!

ডাক্তার চিৎকার করিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলিও চীৎকার করিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্।

দেবু হাসিয়া বলিল—বন্দে মাতরম্।

ডাক্তার হাঁপাইতেছে, সে ছুটিয়া আসিয়াছে বোধ হয়। সে বেশ অনুমান করিল, সমস্ত গ্রামের লোক বোধহয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

শিবকালীপুরের ঘাটে নামিতেই ডাক্তার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। ছেলেগুলির মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগে প্রণাম করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। হাসিমুখে দেবু তাহাদের মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওই হয়েছে! ওই হয়েছে!

তবু তাহারা মানে না, কিশোর প্রাণের আবেগে চাঞ্চল্যে তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর হাতের স্যুটকেস এবং বিছানার মোটটা কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই মাথায় করিয়া লইল। সারিবন্দী হইয়া পায়েচলার পথে কিশোরবাহিনী আগাইয়া চলিল—দৃপ্ত উল্লসিত পদক্ষেপ। কিন্তু তবু যেন দেবুর মনে হইল, এ বাহিনী সম্পূর্ণ নয়। কই? গৌর কই? সর্বাগ্রে যাহার চলিবার কথা সে কই? দেবু বলিল—ডাক্তার, গৌর কোথায় বল তো?

—গৌর? ডাক্তার বলিল—জেল থেকে এসে সে তো এখান থেকে একরকম চলেই গিয়েছে।

—চলে গিয়েছে?

—হ্যাঁ। সে কলকাতায় কোথায় থাকে। মধ্যে মধ্যে আসে, দু-চারদিন থাকে; আবার চলে যায়। এই ক'দিন আগে এসেছিল।

—চাকরি করতে।

—চাকরি না, ভলেন্টিয়ারী করে। কি করে ভাই, সেই জানে—।—তাহারা বাঁধের উপর উঠিল।

দেবু বলিল—স্বর্ণ? স্বর্ণ কেমন আছে ডাক্তার? সে কি—সে বোধ হয় জংশনেই আছে, না?

—হ্যাঁ। জংশনে সেই থেকে মাস্টারি করে। ওখানেই থাকে। ভারি চমৎকার মেয়ে হে। এবার ম্যাট্রিক দেবে।

দেবু একবার পিছন ফিরিয়া জংশনের দিকে চাহিল। কিন্তু দাঁড়াইবার অবকাশ ছিল না। কিশোরবাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারা থামিতে চায় না।

সম্মুখেই পঞ্চগ্রামের মাঠ। আশ্বিনের প্রথম। বর্ষাও এবার ভাল গিয়াছে। ধান এবার ভাল। ইহারই মধ্যে ঝাড়েগোড়ে খুব জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। নয়া ধান-গাছের ঝাড় যেন কাল মেঘের মত ঘোরালো। মধ্যে মধ্যে কোন নালার ধারে—জমির আলের উপর কাশের ঝাড়ের মাথায় সাদা ফুল ফুটিয়াছে, আউশ ধানের শীষ উঠিয়াছে, ওই কঙ্কণা, ওই কুসুমপুর, ওই তাহার শিবকালীপুর! ওই মহাগ্রাম নজরে পড়তেই সে যেন একটা প্রচণ্ড ঘা খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মুহূর্তের জন্য সে চোখ বুজিল। দেহের সকল স্নায়ু ব্যাপ্ত করিয়া বহিয়া গেল একটা দুঃসহ অন্তর-বেদনার মর্মান্তিক স্পর্শ। জগন পিছন হইতে বলিল—দেবু!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু আবার অগ্রসর হইল; বলিল—ডাক্তার!

ডাক্তার বলিল—কি হল ভাই? দাঁড়ালে?

দেবু সে কথার উত্তর দিল না, প্রশ্ন করিল—ঠাকুরমশায়? ঠাকুরমশায় আর এসেছিলেন?

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।···কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিল—বিশ্বনাথের খবর জান তুমি?

—জানি।—জেলেই খবর পেয়েছিলাম।

বিশ্বনাথ নাই। বিশ্বনাথ জেলের মধ্যেই মারা গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর আত্মসংবরণ করিয়া দেবু মুখ তুলিল। বিশ্বনাথের জন্য অন্ধকার রাত্রে জেলখানার গরাদ-দেওয়া জানালায় মুখ রাখিয়া সে রাত্রির পর রাত্রি কাঁদিয়াছে। আর তাহার কান্না আসে না।

ওই দেখুড়িয়া। বিস্তীর্ণ মাঠখানায় বুকভরা নমনীয় চাপ-বাঁধা ধান কমনীয়-সবুজ; বাতাসের দোলায় মুহূর্তে মুহূর্তে দুলিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিতেছে। কিন্তু কোথাও কোন লোকের সাড়া আসিতেছে না। পাশাপাশি আধখানা চাঁদের বেড়ের মত পাঁচখানা গ্রাম—স্তিমিত—স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ নীরবে চলিয়া দেবু বলিল—তারপর জগন-ভাই, কি খবর বল দেশের!

—দেশের ?

—হ্যাঁ! আমাদের এখানকার ?

—সব মরেছে, সব গিয়েছে, সব শেষ হয়ে গেল। খায় দায় আধ পেটা, ঘুমোয়, ব্যস। সে সব আর কিছু নাই।

—বল কি ?

—দেখবে চল।

আবার নীরবে তাহারা চলিল। ছেলেগুলি নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে গোলমাল করিতেছে। দেবুর মুখের দিকে কয়েকবার ফিরিয়া দেখিয়া তাহাদের কলরবের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছে। ধান-ভরা মাঠে কানায় কানায় ভরিয়া জল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশ্বিন মাস—কন্যারাশি। "কন্যা কানে কান—বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথায় রাখবি ধান!" আশ্বিনে মাঠ ভরিয়া জল দিতে হয়।

মধ্যে নিড়ানের কাজ চলিতেছে। দেবু বিস্মিত হইল, কৃষকেরা অপরিচিত। সাঁওতাল সব।

সে বলিল—এরা কোত্থেকে এল ডাক্তার ?

জগন বলিল—শ্রীহরি ঘোষ আর ফেলু চৌধুরী আনিয়াছে—দুমকা থেকে ওদের।

দেবু আর একটু বিস্মিত হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল।

ডাক্তার বলিল—এসব জমি প্রায় সব শ্রীহরি আর চৌধুরীর ঘরে ঢুকেছে!

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল; পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে।

শিবপুরের পাশ দিয়া মজা চৌধুরী-দীঘিটা ডাইনে রাখিয়া দুধারে বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়া কালীপুরের প্রবেশের পথ।

ডাক্তার বলিল—চৌধুরী খালাস পেয়েছেন।

দেবু একটা ম্লান হাসি হাসিল! হ্যাঁ—খালাস পাইয়াছেন বটে।

ছেলের দল গ্রাম প্রবেশের মুখে আর মানিল না। তাহারা হাঁকিয়া উঠিল—জয়, দেবু ঘোষ কি জয়!

গ্রামের ভিতর হইতে কে ছুটিয়া আসিতেছে।

দেবু নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না! ও কি দুর্গা? হ্যাঁ, দুর্গাই তো। ক্ষারে-ধোওয়া একখানি সাদা থান কাপড় পরিয়া, নিরাভরণা, শীর্ণ দেহ, মুখের সে কোমল লাবণ্য নাই, চুলের সে পারিপাট্য নাই—সেই দুর্গা এ কি হইয়া গিয়াছে!

দেবু বলিল—দুর্গা! এ কি তোর শরীরের অবস্থা, দুর্গা? তুই এমন হয়ে গিয়েছিস কেন?

দুর্গার সব গিয়াছে—কিন্তু ডাগর চোখ দুইটি আছে, মুহূর্তে দুর্গার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

ডাক্তার বলিল—দুর্গা আর সে দুর্গা নাই! দান-ধ্যান—পাড়ায় অসুখ-বিসুখে সেবা—

দুর্গা লজ্জিত হইয়া বলিল—থামুন ডাক্তার-দাদা! তারপরেই বলিল—উঃ, কতদিন পর এলে জামাই!

পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপের উপর শ্রীহরিকে দেখা গেল। শ্রীহরির কপালে তিলক-ফোঁটা। জগন বলিল—শ্রীহরি এখন খুব ধর্ম-কর্ম করছে।

আটাশ

দুর্গা ঘর খুলিয়া দিল। ঘর-দুয়ার সে পরিষ্কার রাখিত; আবারও সে একবার ঝাঁটা বুলাইয়া জল ছিটাইয়া দিল।

দেবু রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিতেছিল! চাষী-সদ্‌গোপ-পল্লীর অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে। প্রতি বাড়িতে তখন ভাঙন ধরিয়াছে। জীর্ণ চালের ছিদ্র দিয়া বর্ষার জলের ধারা দেওয়ালের গায়ে হিংস্র জানোয়ারের নখের আঁচড়ের মত দাগ কাটিয়া দিয়াছে; জায়গায় জায়গায় মাটি ধসিয়া ভাঙন ধরিয়াছে।

জগন অতিরঞ্জন করে নাই; পঞ্চগ্রামের সব শেষ হইয়াছে।

কত লোক যে এই কয় বৎসরে মরিয়াছে—তাহার হিসাব একজনে দিতে পারিল না। একজনের বিস্মৃতি অন্যজন স্মরণ করাইয়া দিল! এমন মরণ তাহারা মরিয়াছে যে, মরিয়া তাহারা হারাইয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহাদের দেহ শীর্ণ, শীর্ণতার মধ্যে অভাব এবং রোগের পীড়নের চিহ্ন সর্ব অবয়বে পরিস্ফুট, কণ্ঠস্বর স্তিমিত, চোখের শুভ্রচ্ছদ, পীত পাণ্ডুর, দৃষ্টি বেদনাতুর, কালো মানুষগুলির দেহ-বর্ণের উপরে একটা গাঢ় কালিমার ছাপ, জোয়ান মানুষের দেহ-চর্মে পর্যন্ত কুঞ্চনের জীর্ণতা দেখা দিয়াছে। শুধু তাই নয়—মানুষগুলি যেন সব বোবা হইয়া গিয়াছে।

দেবু এমন অনুমান করিতে পারে নাই!

তাহার মনে পড়িল সে দিনের কথা। সে যেদিন জেলে যায়—সেই দিনের মানুষের মুখগুলি।

সে কি উৎসাহ! প্রাণশক্তির সে কি প্রেরণাময় উচ্ছ্বাস! সে কথা মনে হইলে—আজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

একে-একে অনেকেই আসিল। মৃদুস্বরে কুশল-প্রশ্ন করিল—দেবু কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উদাসভাবে দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—আর আমাদের ভাল-মন্দ!

এই কথায় একটা কথা দেবুর মনে পড়িয়া গেল।

তিরিশ সালে আন্দোলনের সময় একদিন তাহাকে তাহারা প্রশ্ন করিয়াছিল—আচ্ছা, এতে কি হবে বল দিকিনি?

দেবুও তখন জানিত না এসব কথা। অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র। নিজেরই একটি অদ্ভুত কল্পনা ছিল; তাই সেদিন আবেগময়ী ভাষায় তাহাদের কাছে বলিয়াছিল। সে অদ্ভুত কল্পনা তাহার একার নয়, পঞ্চগ্রামের মানুষ সকলেই মনে মনে এমনই একটি অদ্ভুত কাল্পনিক অবস্থা কামনা করে।

সে সেদিন বলিয়াছিল—উহার মধ্যেই মিলিবে সর্ববিধ কাম্য। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, অভয়। প্রত্যাশা করিয়াছিল—আর কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না, উৎপীড়ন থাকিবে না, মানুষে কেহই আর অন্যায় করিবে না, মানুষের অন্তর হইতে অসাধুতা মুছিয়া যাইবে, অভাব ঘুচিয়া যাইবে, মানুষ শান্তি পাইবে, অবসর পাইবে, সেই অবসরে আনন্দ করিবে, তাহারা হাসিবে, নাচিবে, গান করিবে, নিয়মিত দুটি বেলা ইষ্টকে স্মরণ করিবে।...

লোকে মুগ্ধ হইয়া তাই শুনিয়াছিল।

একজন বলিয়াছিল—শুনে তো আসছি চিরকাল—এমনি একদিন হবে! সে তো সত্যকালে যেমনটি ছিলো গো! বাপ ঠাকুরদাদা সবাই বলে আসছে তা।

দেবু সেদিন আবেগ বশে বলিয়াছিল—এবার তাই হবে!

তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিয়াছিল—সত্যযুগের কথা। শুধু কি ওই-টুকুই সত্যযুগ! গরুর রঙ হইবে ফিট সাদা, মানুষের চেয়েও উঁচু হইবে। গাইগরুগুলি দুধ দিবে অফুরন্ত, পাত্র হইতে উথলিয়া পড়িয়া মাটি ভিজিয়া যাইবে। সাদা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড আকারের বলদের একবারের কর্ষণেই চাষ হইবে। মাটিতে আসিবে অপরিমেয় উর্বরতা, ফসলের প্রতিটি বীজ হইতে গাছ হইবে, শস্যের মধ্যে কোনটি অপুষ্ট থাকিবে না। মেঘে নিয়মিত বর্ষণ দিবে; পুকুরে পুকুরে জল কানায় কানায় টলমল করিবে। মানুষ এমন আকারে ছোট, দেহে শীর্ণ থাকিবে না, বলশালী দীর্ঘ দেহ হইয়া তাহারা পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইবে।...

এবার এই দীর্ঘকাল জেলের মধ্যে থাকিয়া দেবু অন্য মানুষ হইয়াছে। তাহার কাছে আজ পৃথিবীর রূপ পাল্টাইয়া গিয়াছে। সে জানিয়াছে, এদেশের মানুষ মরিবে না। মহামঙ্গলময় মূর্তিতে নবজীবন লাভ করিবে। চার হাজার বৎসর ধরিয়া বার বার সংকট আসিয়াছে—ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে—সে সংকট—সে ধ্বংস সম্ভাবনা সে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নব জীবনে জাগ্রত হইয়াছে। সে সমস্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়া কথাগুলির মধ্যে শুধু পিতৃ-পিতামহের নয়—যুগ-যুগান্তরের অতীত কালে মানুষের এই ইতিহাসের সঙ্গে তাহার নূতন মনের কল্পকামনার অদ্ভুত মিল প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবনী-শক্তির মধ্যে অমরত্বের সন্ধান পাইয়াছে সে! অমর বই কি! দিন দিন মানুষের বুকের উপর মানুষের অন্যায়ের বোঝা চাপিতেছে। অন্যায়ের বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে বিন্ধ্যগিরির মত – মানুষের প্রায় নাভিশ্বাস উঠিতেছে। কিন্তু কি অদ্ভুতমানুষ, অদ্ভুত তাহার সহনশক্তি, নাভিশ্বাস ফেলিয়াও সেই বোঝা নীরবে বহিয়া চলিয়াছে; অদ্ভুত তাহার আশা—অদ্ভুত তাহার বিশ্বাস! সে আজও সেই কথা বলিতেছে, সে দিন-গণনা করিতেছে—কবে সে দিন আসিবে। মানুষ—এই দেশের মানুষ মরিবে না। সে থাকিবে! থাকিবে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরং।

রামনারায়ণ এখন ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। দেবুর পাঠশালা উঠিয়া যাইবার পর সে-ই এখানকার নূতন পণ্ডিত হইয়াছে। দেবুর জ্ঞাতি। সে হাসিমুখে আসিয়া হাজির হইল।—ভাল আছ দেবু-ভাই?

তাহাকে দেখিয়া দেবুর ইরসাদকে মনে পড়িল। কেমন আছে সে?

—ইরসাদ-ভাই? সে কেমন আছে? এখানেই আছে তো?

—হ্যাঁ। পাঠশালা ছেড়ে সে মোক্তারি পড়ছে। আর কৃষক-সমিতি করছে।

—ইরসাদ-ভাই কৃষক-সমিতি করছে? ইরসাদের মাথাতেও পোকা ঢুকিয়াছে!

—হ্যাঁ। দৌলত শেখেরা লীগ করছে! ইরসাদ কৃষক-সমিতি করছে।

—ইরসাদের শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া মেটেনি বোধ হয়?—দেবু হাসিল।

—না। তবে সে আবার বিয়ে করেছে।

—বিয়ে করেও ইরসাদ কৃষক-সমিতি করছে? বলিয়া দেবু আবার হাসিল।

রামনারায়ণ কিন্তু রসিকতাটুকু বুঝিল না – সে বলিল তা তো জানি না ভাই! বলিয়াই অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িল—বলিল—রহম-চাচা কিন্তু গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে দেবু-ভাই!

দেবু চমকিয়া উঠিল! গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে?

রামনারায়ণ বলিল—মনের ক্ষোভে গলায় দড়ি দিলে রহম-চাচা। বাবুরা সেই জমিটা নিলেম করে নিলে। সেই ক্ষোভেই—।…রামনারায়ণ তাহার ঘাড়টা উল্টাইয়া দিল!

দেবু একমুহূর্তে স্তব্ধ স্তম্ভিত হইয়া গেল। রহম-চাচা গলায় দড়ি দিয়েছে।

জগন আসিয়া বলিল—খাবার রেডি দেবু-ভাই, স্নান কর। যাও যাও সব, এখন যাও। উ বেলায় হবে সব।

দুপুরের সময় দেবু একা বসিয়া ভাবিতেছিল।

সামনের শিউলি গাছটার দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—এলোমেলো ভাবনা। শিউলিতলার রৌদ্র-ম্লান করা শিউলিগুলি হইতে একটি অতি সকরুণ মৃদু গন্ধ আসিতেছে। শরতের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র ঝল-মল করিতেছে। সামনে পূজা। দুর্বল দেহেও মানুষ পূজা উপলক্ষে ঘর-দুয়ার মেরামতের কাজে লাগিয়াছে। বর্ষার জলের দাগের উপর গোবরমাটির ঘন প্রলেপ বুলাইতেছে। জগন তাহাকে বলিয়াছিল—সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু না। তাহার কথাই সত্য। তাহারা বাঁচিয়া আছে। বাঁচিতে চায়। তাহারা মরিবে না। তাহারা সুখ চায়, স্বাচ্ছন্দ্য চায়, ঘর চায়, দুয়ার চায়, আরও অনেক চায়—নূতন জীবনে সে সত্যযুগের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে শান্তিতে পুনরুজ্জীবন পরিপূর্ণ চায়। তাহারা নিজেদের জীবনে যদি না পায়, তবে পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া যাইতে চায়—তাহারা সে সব পাইবে।

ওদিকে একটা দমকা হাওয়া শিউলি গাছটাকে আলোড়িত করিয়া দিয়া গেল। গাছের পাতায় যে ঝরা ফুলগুলি আটকাইয়া ছিল, ঝরিয়া মাটিতে পড়িল।

দেবু লক্ষ্য করিল না। সে ভাবিতেছিল, সবাই থাকিবে—মরিবে শুধু সেই নিজে। তাহার নিজের জীবনে তো এসব আসিবে না। তাহার পরে—সন্তান-সন্ততির মধ্যেও সে থাকিবে না। তাহার সঙ্গেই তো সব শেষ!

ঠিক এই সময় শিউলি ফুলের ম্লান গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া ঢুকিল। চকিত হইয়া দেবু চারিদিকে চাহিল। মনে হইল, বিলুর গায়ের গন্ধ পাইল যেন, পরক্ষণেই বুঝিল, না—এ শিউলির গন্ধ!

অথচ আশ্চর্য, বিলুর মুখটা ঠিক মনে পড়িতেছে না। মনে করিতে গেলেই—। চাবুক-মারা ঘোড়ার মত তাহার সারাটা অন্তর যেন চমকিয়া উঠিল।

হায় রে, হায় রে মানুষ!

দাওয়া হইতে সে প্রায় লাফ দিয়া পড়িয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার ফিরিয়া আসিল শিউলি গাছের তলায়। কতকগুলা শিউলি ফুল কুড়াইয়া লইয়া চলিতে শুরু করিল।

আজ তিন বৎসর বিলু-খোকনের চিতার ধারে যাওয়া হয় নাই। সে ফুলগুলি হাতে করিয়া শ্মশানের দিকে চলিল।

সারাটা দুপুর সে সেই চিতার ধারে বসিয়া রহিল।

তীর্থে যাইবার পূর্বে সে বিলু-খোকনের চিতাটি বাঁধাইয়া দিয়াছিল। দেখিল, বৎসর বৎসর ময়ূরাক্ষীর পলি পড়িয়া সে মাটির নিচে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাঁচ সাত জায়গা খুঁড়িয়া সে চিতাটি বাহির করিল। কোঁচার খুঁট ভিজাইয়া ময়ূরাক্ষী হইতে জল আনিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিল। বার বার ধুইয়াও কিন্তু মাটির রেশের অস্পষ্টতা মুছিয়া মনের মত উজ্জ্বল করিতে পারিল না। শেষে ক্লান্ত হইয়া তাহার উপর সাজাইয়া দিল ফুলগুলি।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে হাসিল। ওই শিউলী ফুলগুলির সঙ্গেই তার তুলনা চলে। এতক্ষণে বসিয়া এক-মনে চিন্তা করিয়াও সে বিলু-খোকনকে স্পষ্ট করিয়া মনে করিতে পারিল না। মনে পড়িল ন্যায়রত্নের কথা। তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্র শশিশেখরকে মনে করিতে পারেন না বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—শশিশেখর তাঁহার মধ্যে আছে, শুধু শশিশেখর যাহা তাঁহাকে দিয়া গিয়াছে তাহারই মধ্যে। বিলু-খোকনও ঠিক তেমনি ভাবেই তাহার মধ্যে আছে। রূপ তাহাদের হারাইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চকিতের মত মনে পড়িয়া আবার মিলাইয়া যায়। আবার অন্ধকার রাত্রে শ্মশানে বাতাসের শব্দের মধ্যে তাহাদের অশরীরী অস্তিত্বের চাঞ্চল্য কল্পনা করিয়া দেহের স্নায়ুমণ্ডল চেতনা-শূন্য, অসাড় হইয়া যায়! দেবু হাসিল।

বেলা গড়াইয়া গেল, সে গ্রামে ফিরিল।

তাহার দাওয়ার সম্মুখে গ্রামের লোকজনেরা আসিয়া বসিয়াছে। কোন একটা উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছে। ইরসাদ-ভাইও আসিয়াছে, জগন বসিয়া আছে। সে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইরসাদ আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।—আঃ, দেবু-ভাই, কতদিন পর! আঃ!

উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছে—নবীনকৃষ্ণের একটা জোতের নীলাম লইয়া। রামনারায়ণ বলিতেছে—নূতন আইনেও এ ডিক্রি রদ হইবে না।

নূতন প্রজাস্বত্ব আইন পাস হইয়াছে। সেই আইনের ধারা আলোচনা হইতেছে।

নবীন উত্তেজিত হইয়া বলিতেছে—আলবৎ ফিরবে। কেন ফিরবে না?

জগন মন দিয়া ডিক্রিটা পড়িতেছে। দেবুকে দেখিয়া জগন ডিক্রির কাগজটা রাখিয়া বলিল—আমাদের এখানেও কৃষক-সমিতি করা যাক, দেবু ভাই!

ইরসাদ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। দেবু বলিল—বেশ তো। কালই কর। তাহার মন যেন এমনই কিছু চলিতেছিল। জগন তখনই কাগজ কলম লইয়া বসিয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল হরেন ঘোষাল।—ব্রাদার, তোমার পথ চেয়েই বসে আছি। আমার কথা কেউ শোনে না। এবার লাগবই।

জগন বলিল—থাম ঘোষাল!

দেবু হাসিয়া বলিল—কি?—ব্যাপারটা কি?

ঘোষাল বলিল—সার্বজনীন দুর্গাপূজো। এবার লাগতেই হবে, জংশনে হচ্ছে। আমি কতদিন থেকে বলছি।

দেবু বলিল—বেশ তো। হোক্ না সার্বজনীন পূজা!

ঘোষাল তৎক্ষণাৎ একটা কাগজ কলম লইয়া বসিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইল বাউড়ী-মুচির দল! কলে খাটিয়া তাহারা সবে ফিরিয়াছে! ফিরিয়াই দেবুর খবর পাইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে। দলের নেতা সেই পুরাতন সতীশ। সতীশও আজকাল কলে কাজ করে। তাহার গরু-গাড়ী লইয়া কলের মাল বহিয়া থাকে। চাষও আছে। চাষের সময় চাষ করে। কলের মজুরি পাইয়া সকলেই মদ খাইয়াছে। সতীশ তাহাকে প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—আপুনি ফিরে এলেন —পরাণটা আমার জুড়লো।

অটল বলিল—আমাদের পাড়ায় একবার পদার্পন করতে হবে।

—কেন? কি ব্যাপার?

—গান।—গান শুনতে হবে

—কিসের গান?

—আমাদের গান?

সুতরাং পদার্পন করতেই হইবে।

দেবু হাসিয়া ইরসাদ এবং জগনকে বলিল—চল ভাই। গান শুনে আসি।

লোকগুলি মন্দ নাই; কলে খাটে—পেটে খাওয়ার কষ্ট বিশেষ নাই, পরনের বেশ-ভূষাতে দৈন্য সত্বেও শহরের কিছু ছাপ লাগিয়াছে, কিন্তু ঘর-দুয়ারগুলির

অবস্থা ভাল নয়। কেমন যেন একটা পড়ো-বাড়ির ছাপ লাগিয়াছে। কয়েকখানা ঘর একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে। যাইতে যাইতে দেবু প্রশ্ন করিল—এ ঘরগুলো খসে পড়ছে কেন সতীশ ?

সতীশ বলিল—যোগী, কুঞ্জ, শম্ভু—ওরা সব চলে গিয়েছে সাহেবগঞ্জ। বলে গেল—যাক এখন ভেঙে, ফিরে এসে তখন ঘর আবার করে লোব।

ওদিকে ঢোল বাজিতে আরম্ভ হইল।

সতীশ গান ধরিল—

"ভাল দেখালে কারখানা—
দেবু পণ্ডিত অ্যানেক রকম দেখালে কারখানা ;
হুকুম জারী করে দিলে মদ খেতে মানা।"

দেবু বলিল—না, ও গান শুনব না। অন্য গান কর সতীশ।

—ক্যানে, পণ্ডিতমাশায় ?

—না, অন্য গান কর। ফুল্লরার বার-মেসে গান কর।...

গান যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি অনেক।

ইরসাদকে ঐখান হইতে বিদায় দিয়াই সে ফিরিল। জগন মাঝখানেই একটা 'কল্' আসায় চলিয়া গিয়াছে। বাউড়ী-পাড়া পার হইয়া খানিকটা খোলা জায়গা। শরতের গাঢ় নীল আকাশে পূর্বদিক হইতে আলোর আভা পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ উঠিতেছে। সে দাঁড়াইল। বাড়ি ফিরিবার কোন তাগিদ তাহার নাই। আজ এবেলা খাবার ব্যবস্থা করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। দুর্গারও বোধ হয় মনে হয় নাই। হইলে সে নিশ্চয় এতক্ষণ তাগিদ দিত! দুর্গা এখন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া তাহার শরীর খুব দুর্বল। হয়তো জ্বর আসিয়াছে। উঠিতে পারে নাই।

দূরে তাম্রাভ জ্যোৎস্নার মধ্যে পঞ্চগ্রামের মাঠ নরম কালো কিছুর মত দেখাইতেছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের গাছগুলির কালো চেহারা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঁধের গায়ের চাপ-বাঁধা শরবন কালো দেওয়ালের মত মনে হইতেছে। ওই অর্জুন গাছটার উঁচু মাথা! ওই গাছটার তলায় শ্মশান, বিলু-খোকনের চিতায় সে আজই ফুল দিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য, তাহাদের অভাবটা আছে! তাহারাই হারাইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তেই মনে পড়িতেছে—খাবারের কথা। বাড়ি গিয়া কি খাইবে—তাহার ঠিক নাই। হাসি আসিল প্রথমটা। তারপর মনে হইল—বিলু থাকিলে খাবার তৈয়ারি করিয়া সে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিত। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

সে স্থির করিয়াছে—আবার সে পাঠশালা করিবে। পাঠশালার ছেলেদের সে লেখাপড়া শিখাইবে, তাহাদের কাছে বেতন লইবে! বিনিময়। সেবা নয়, দান নয়। দেনা-পাওনা। সে তাহাদের লেখাপড়ার মধ্যে তাহার জীবনের আশ্বাসের কথা জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যাইবে। বুঝাইয়া দিয়া যাইবে—জানাইয়া দিয়া যাইবে—তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না। সে বাঁচিয়া দুঃখ-কষ্টের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে—পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে ধনুকের মত, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইতেছে মনে হইতেছে, চোখ ছিটকাইয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছে—তবু সে চলিয়াছে সেই সুদিনের প্রত্যাশায়। সেদিন মানুষের যাহা সত্যকার পাওনা—তাহা তোমরা পাইবে। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য, আরোগ্য, অভয়—এ তোমাদেরও পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি—তাহা শোন—আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও চেয়ে ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই. আমাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই!…মানুষের সেই পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেইদিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে! সযত্নে রাখিয়া চলিয়াছে, পালন করিয়া চলিয়াছে—আপন বংশপরম্পরাকে! যে মহা-আশ্বাস সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহার স্থির বিশ্বাস—মুক্তি একদিন আসিবেই। যেদিন আসিবে, সেদিন পঞ্চগ্রামের জীবনে আবার জোয়ার আসিবে; সে আবার ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জমান হইয়া উঠিবে। শুধু পঞ্চগ্রাম নয়, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম হইতে নবগ্রাম, নবগ্রাম হইতে বিংশতি গ্রাম, পঞ্চবিংশতি গ্রাম, শত গ্রাম, সহস্র গ্রামে জীবনের কলরোল উঠিবে। সে হয়তো সেদিন থাকিবে না; তাহার বংশানুক্রমেও থাকিবে না।

চলিতে চলিতে সে হঠাৎ থমকিয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল। তাহার মনের ওই অবসন্নতার যেন চকিতে একটা রূপান্তর ঘটিয়া গেল। সমস্ত দেহের স্নায়ুতে শিরায় একটা আবেগ সঞ্চারিত হইল। সে কি পাগল হইয়া গেল? জীবনের সকল অবসন্নতা কিসে কাটাইয়া দিল একমুহূর্তে? একি মধুর সঞ্জীবনীময় গন্ধ? দমকা বাতাসে শিউলি-ফুলের গন্ধ আসিয়া তাহার বুক ভরিয়া দিয়াছে। সে বুঝিতে পারে নাই, আচমকা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ গন্ধটির মধ্যে যেন কি একটা আছে, অন্তত তাহার কাছে আছে। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, রোমাঞ্চ দেখা দিল শীতার্তের মত। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে গন্ধ অনুসরণ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বাড়ির সামনে সেই শিউলি গাছের তলায়। দেখিল, বাতাসে টুপ্-টাপ্ করিয়া একটি দু'টি ফুল

গাছের ডাল হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িতেছে। পাপড়িগুলিতে এখনও বাঁকা ভাব রহিয়াছে। সবেমাত্র ফুটিতেছে। সদ্য-ফোটা শিউলির গন্ধের মধ্যে সে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কত ছবি তাহার মনে পর পর জাগিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

—কে? কে ওখানে? নারীকণ্ঠে কে প্রশ্ন করিল।

আবিষ্টতার মধ্যেই দেবু বলিল—আমি।

দেবুর দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল—একটি মেয়ে। জ্যোৎস্নার মধ্যে সাদা কাপড়ে তাহাকে অদ্ভুত মনে হইতেছিল, সে যেন অশরীর কেহ। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল ও কে? বিলু? না। চাঞ্চল্য সত্ত্বেও আজ তাহার মনে পড়িল—একদিনের ভ্রমের কথা।

—বাপ্‌রে! সেই সন্ধ্যে-বেলা থেকে এসে বসে রয়েছে—বলিতে বলিতেই সে আসিয়া দাঁড়াইল একেবারে দেবুর কাছটিতে। আরও কিছু মেয়েটি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু বলিতে পারিল না। দেবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে দেখিল; মেয়েটি বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই কি দেবু চিনিতে পারে নাই? অথবা চিনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না? পরমুহূর্তেই দেবু তাহার চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখখানি আকাশের শুভ্র-জ্যোৎস্নার দিকে তুলিয়া ধরিল। এই তো, এই তো—এই তো—নবজীবন—ইহাকেই যেন সে চাহিতেছিল। বুঝিতে পারিতেছিল না।

মেয়েটি বলিল—আমায় চিনতে পারছেন না? আমি স্বর্ণ।

—স্বর্ণ?

স্বর্ণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল! বলিল—হ্যাঁ। বলিয়াই হেঁট হইয়া দেবুকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল—বিকেল বেলা খবর পেলাম। সন্ধ্যের সময় এসেছি। জংশন দিয়েই তো এলেন। একটা খবর দিলেন না।

দেবু কোন উত্তর দিল না। বিচিত্র দৃষ্টিতে সে তাহাকে দেখিতেছিল। এই স্বর্ণ! তিন বৎসরে—একি পরিপূর্ণ রূপ লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া আজ দাঁড়াইল? পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে—শরতের ভরা-ময়ূরাক্ষীর মত স্বর্ণ। চোখেমুখে জ্ঞানের দীপ্তি, সর্বদেহ ভরিয়া তরুণ স্বাস্থের নিটোল পুষ্টি, গৌর দেহবর্ণের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে রক্তোচ্ছাসের আভা। মুহূর্তের জন্য তাহার মনে পড়িল পদ্মকে।

স্বর্ণ তাহাকে ডাকিল—দেবু-দা!

—কি স্বর্ণ!

—আসুন, বাড়ির ভিতরে আসুন। রান্না করে বসে আছি। কতবার দুর্গাকে বললাম ডাকতে। কিছুতে গেল না।

—তুমি আমার জন্য রান্না করে বসে আছ? দেবু অবাক্ হইয়া গেল!

—হ্যাঁ। এখানে এসে দেখলাম, রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থা হয়নি, বেশ মানুষ আপনি! দেবু একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল।

পদ্মের সঙ্গে স্বর্ণের পার্থক্য আছে। পদ্মের মধ্যে উল্লাসের উচ্ছ্বাস আছে—স্বর্ণ নিরুচ্ছ্বসিত। স্বর্ণকে দেখিয়া তাহার পলক পড়িতেছে না।

স্বর্ণ আবার ডাকিল—দেবু-দা! এমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন?

প্রগাঢ় স্নেহ এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে দেবু হাত বাড়াইয়া স্বর্ণের হাতখানি ধরিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু বলবার কথা স্বর্ণ।

স্বর্ণ তাহার স্পর্শে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জ্বর-জর্জর মানুষের মত দেবুর হাতখানি উত্তপ্ত। স্বর্ণ হাতখানা টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল, দেবুর হাতের মুঠা আরও শক্ত হইয়া উঠিল। মৃদু গাঢ়স্বরে সে বলিল—ভয় পাচ্ছ স্বর্ণ। ভয় করছে তোমার?

—দেবু-দা! একান্ত বিহ্বলের মত স্বর্ণ অর্থহীন উত্তর দিল।

—ভয় করো না। তুমি তো সেই চাষীর ঘরের অক্ষরপরিচয়হীনা হতভাগিনী মেয়েটি নও। ভয় করো না। হয় তো এই মুহূর্তটি চলে গেলে আর আমার কথা বলা হবে না। স্বর্ণ, আমি আজ বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাকে—ভালবেসেছি।

স্বর্ণ কাঁপিতেছিল। দেবুকে ধরিয়াই কোনরূপে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রি চলিয়াছে ক্ষণ-মুহূর্তের পালকময় পক্ষ বিস্তার করিয়া। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান-পরিবর্তন ঘটিতেছে। কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমীর চাঁদ আকাশে প্রথম-পাদ পার হইয়া দ্বিতীয়-পাদের খানিকটা অতিক্রম করিল। ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকিত শরতের আকাশে শুভ্র ছায়াপথ আকাশবাহিনী নদীর মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, শুভ্র ফেনার রাশির মত ওগুলি নীহারিকাপুঞ্জ। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের রূপান্তর ঘটিতেছে; চোখ দেখিয়া বুঝা যায় না!

দেবু স্বর্ণকে বলিয়া চলিয়াছে—তাহার যে কথা বলিবার ছিল। তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানো কথা নূতন যুগের আমন্ত্রণ নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা ধর্মের সংসার—

দেবু বলিল—তোমার আমার সে সংসারে সমান অধিকার, স্বামী প্রভু নয়—স্ত্রী দাসী নয়—কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলব আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের—শিশুদের, আমি পড়াব ছেলেদের—যুবকদের। তোমার আমার দুজনের উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার।

দুর্গা তাহাদের কাছেই বসিয়া সব শুনিতেছিল। সে অবাক্ হইয়া গেল।

শুধু তাহাদের নয়—পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্য্যের শক্তিতে—ঔষধের আরোগ্য নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম; মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট সবল-দেহ—আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাঁহারা চলা-ফেরা করিবে। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার, পথ-ঘাট। ঝক-ঝকে বাড়িগুলি অবারিত আলোয় উজ্জ্বল—মুক্ত বাতাসের প্রবাহে নির্মল সুস্নিগ্ধ। সুন্দর সুগঠিত সুসমান পথগুলি বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া, সুদূরপ্রসারী হইয়া চলিয়া যাইবে—শিবকালীপুর হইতে দেখুড়িয়া—দেখুড়িয়া হইতে মহাগ্রাম, মহাগ্রাম হইতে কুসুমপুর, কুসুমপুর হইতে কঙ্কণা, কঙ্কণা হইতে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া জংশনের দিকে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, দেশ হইতে দেশান্তরে যাইবে সেই পথ। সেই পথ ধরিয়া যাইবে পঞ্চগ্রামের মানুষ, পঞ্চগ্রামের শস্য-বোঝাই গাড়ী দেশ-দেশান্তরে। শত গ্রামের—সহস্র গ্রামের মানুষ তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া সেই পথ ধরিয়া আসিবে পঞ্চগ্রামে।

স্বর্ণ স্তব্ধ হইয়া অপলক চোখে দেবুর দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছে; লজ্জা সংকোচ কিছুই যেন নাই! শুধু তাহার মুখখানি অল্প অল্প রাঙা দেখাইতেছে। দুর্গা দেবুর সব কথা বুঝিতে পারিতেছে না—তবু একটা আবেগে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছে; শুনিতে শুনিতে চোখ হইতে তাহার জল গড়াইয়া আসিল।

দেবু বলিল—সে দিনের প্রভাতে মানুষ ধন্য হবে। পিতৃপুরুষকে স্মরণ করবে উর্ধ্ব মুখে—সজল চোখে। আমাদের সন্তানেরা আমাদের স্মরণ করবে; তাদের মধ্যেই আমরা পাব—তাদেরই চোখে আমরা দেখবো সেদিনের সূর্যোদয়।

হঠাৎ দুর্গা প্রশ্ন করিয়া বসিল—সে আর থাকিতে পারিল না—বলিল—জামাই!

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বল্। একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—কিছু বলছিলি?

কথাটা, দুর্গার মত প্রগলভাও বলিতে গিয়া বলিতে পারিতেছিল না। জামাই-পণ্ডিতের ভরসা পাইয়া সে বলিল—আমাদের মত পাপীর কি হবে জামাই? আমরা কি নরকে যাব?

হাসিয়া দেবু বলিল—না দুর্গা—নরক আর থাকবে না রে! সবই স্বর্গ

হয়ে যাবে। ছোট-বড়র ছোট থাকবে না—অচ্ছুৎ-ছুতের অচ্ছুত থাকবে না—ভাল-মন্দের মন্দ থাকবে না—

—তাই হয়? কি বলছ?

—ঠিক বলছি রে। ঠিক বলছি। মানুষ চার যুগ তপস্যা করছে—এই নতুন যুগের জন্যে। এই আশার নিয়মেই রাত্রির পর দিন আসে দুর্গা। দিনের পর মাস আসে, মাসে মাসে বছরের পর বছর আসে—পার হয়। মানুষেরা সেই আশা নিয়ে বসে আছে। সে দিনকে আসতেই হবে।

দুর্গা মনে মনে বলিল—সে দিন যেন জামাই তোমাকে আমি পাই। বিলু-দিদি মুক্তি পেয়েছে আমি জানি। স্বর্ণও যেন সেদিন মুক্তি পায়—নারায়ণের দাসী হয়! আমি আসব এই মর্তে—তোমার জন্যে আসব, তুমি যেন এস। আমার জন্যে একটি জন্মের জন্যে এস। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম না। করছি এই জন্যে। তোমাকে পাবার জন্যে।

কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ মধ্য আকাশে পৌঁছিতেছে, বর্ণ তাহার পাণ্ডুর স্তিমিত হইয়া আসিতেছে; রাত্রি অবসানের আর দেরী নাই।

আশ্বিনের প্রথমে মাঠে চাষীদের অনেক কাজ—নিড়ানের কাজ, অনেকের ক্ষেতে আউশ পাকিয়াছে—ধান কাটার কাজ রহিয়াছে—এই ভোরেই চাষীরা মাঠে যাইবে। মেয়েরা—ঘর-দুয়ারে মাড়ুলী দিতেছে। তাহাদের এখন সমস্ত ঘরগুলিকে ঝাড়িয়া কলি ফেরানোর মত নিকানোর কাজ—তাহার উপর আলপনা-আঁকার কাজ। পূজায় মুড়ি-ভাজার কাজ, ছোলা পিষিয়া সিউই ভাজার কাজ, নাড়ু তৈয়ারীর কাজ—অনেক রহিয়াছে। এমনি করিতে পালে-পার্বণে—ঘর নিকাইয়া আল্‌পনা দিয়া ঘরগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিতে হয়। সম্মুখে মহাপূজা আসিতেজে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশনে শহরে কলের দশ-বারোটা বাঁশী বাজিতেছে—একসঙ্গে। সতীশদের পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—কলের কাজে যাইতে হইবে। কত কাজ! কত কাজ!! কত কাজ!!! গাছে চারিদিকে পাখীরা কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। দুর্গা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—ভোর হয়ে গেল? যাই, ঘরে দোরে জল দি! স্বর্ণও উঠিয়া গলায় আঁচল দিয়া দেবুকে প্রণাম করিল। বলিল—আমায় গিয়ে তুমি নিয়ে এস। যেদিন নিয়ে আসবে, আমি আসব। দুর্গার চোখ হইতে দুটি জলের ধারা নামিয়া আসিয়াছে। ঠোঁটের প্রান্তে প্রান্তে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্ধকার কাটিয়া—সূর্য উঠিতেছে—প্রভাত চলিয়াছে ক্ষণ-মুহূর্ত প্রহর দিন রাত্রির পথ বাহিয়া সেই প্রত্যাশিত প্রভাতের দিকে।

সমাপ্ত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গণদেবতা



পঞ্চগ্রাম

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ্ম-উপন্যাস

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস